অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-১২

Achintya Kumar Rachanavali (Vol. 3)
Achintya Kumar Sengupta
(Chronological Collected Writings)

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬০

উপদেষ্টামণ্ডলী :
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
যোগজীবন চক্রবর্তী,
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

মুদ্রক :
শুকদেবচন্দ্র চন্দ
বিবেকানন্দ প্রেস,
১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
রূপায়ণ, কলকাতা-৬

আলোকচিত্র :
অজিত দত্ত

সূচীপত্র

উপন্যাস

প্রাচীর ও প্রান্তর

শ্রীঅজিতকুমার দত্ত

প্রিয়বরেষু

১৭. ৭. ৩২.

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এক

নতুন নেশা

পুরন্দরের হচ্ছে নর্ম্যান্ টাইপের চেহারা, বছর আটাশ বয়েস,—তেজী মজবুত শরীর, জোয়ালো চোয়াল আর চওড়া থাবা—উদ্ধত নাকে দৃপ্তি আর উন্নত কপালে উজ্জ্বলতা,—ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতা; আর দুই চোখের দৃষ্টি কামনায় তীক্ষ্ণ, কামনায় গভীর, কামনায় করুণ! শরীরে যেমন সামর্থ্য, মনেও তেমনি সক্রিয়তা! এক দণ্ড সে চুপ ক'রে থাকতে পারে না—তার স্নায়ু-শিরায় রক্তের প্রবাহ যেমন অবিরাম,—সৌররঙ্গমঞ্চে পৃথিবী যেমন নিয়তঘূর্ণ্যমতী,—তেমনি সব-সময়েই পুরন্দরের শরীরে সচল বেগ, সবল উৎসাহ, অজস্র উদ্দামতা! মন তার উন্মুখর—বর্ষাবিস্ফারিত ঝর্নার মতো,—কর্ম্মের স্রোতে সমস্ত দুঃখ সমস্ত আলস্য সমস্ত ভাবুকতা প্রভাতের জ্যোতি-র্বন্যার সমুখে নিস্তেজ তারকাকণার মতো সে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। 'সময় নেই, সময় নেই,'—প্রতি স্নায়ু-শিরায় এই তার চিরমুহূর্ত্তের হাহাকার—উত্তপ্ত স্পর্শে প্রতিটি মুহূর্ত্তকে সঞ্জীবিত ক'রে, অনন্তকালের ক্ষণিক অণুগুলিকে নিংড়ে-নিংড়ে মধু বা মদ, সুধা বা বিষ—ভোগ ক'রে লেহন ক'রে তবে সে এগিয়ে চলে, ঝাপ্‌টা দিয়ে চলে, নিজেকে বিকীর্ণ করতে-করতে অগ্রসর হয়। হাতে জমিদারি, তবু তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়া না টেনে, মোসাহেবের ভিড়ে ব'সে মদ না খেয়ে, মেয়েমানুষ না রেখে—সমস্ত সাবেকি চাল উল্‌টে দিয়ে পুরন্দর বিশাল আকাশের নিচে উন্মুক্ত ও উদ্দাম পাখা বিস্তার ক'রে আশ্রয় থেকে বহুতর আশ্রয়ে, আনন্দ থেকে গাঢ়তর আনন্দে, চেতনা থেকে তীব্রতর চেতনায় অভিযান সুরু করেছে।

কিন্তু তাকেই কি না বিয়ে করতে হলো। কবে কখন আকাশ ছিলো ম্লান, মুহূর্ত্তটি এলো স্তিমিত হ'য়ে, রোগক্লান্ত পুরন্দরের দৃষ্টি হলো আচ্ছন্ন,—পুরন্দর আধো তন্দ্রার আব্‌ছায়ায় অস্তিত্বের মাঝে কোথায় যেন একটি শব্দহীন বিরলতার সন্ধান পেলো, বিয়েতে মত দিয়ে বসলে। বাড়ি জাঁকিয়ে উৎসব হলো সুরু, বন্ধুরা ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখতে এসে পেট পুরে খেয়ে একই বিছানায় পুরন্দর সীতাকে বাকি জীবনটা বিশ্রাম করতে ব'লে বিদায় নিলো।

সীতার মাঝে আধুনিকতার ক্ষীণতম আমেজটুকুও ছিল না, কিন্তু যা কোনো কালের নয়, অনন্তকালের কবির কাব্যের মতো—সর্ব্বাঙ্গে তার সেই অগাধ রূপ; সদ্যজাগ্রত চোখে ঘুমের তরল আভাসের মতো কৈশোরের ক্ষীণ একটু লজ্জা ও জড়িমা এসে সেই রূপকে করেছে আরক্তিম ও শুচিস্মিত—আভায় এনেছে সন্ধ্যার

কোমলতা। স্ত্রীকে দুই রাত্রি পাশে রেখে শুয়েই পুরন্দর বুঝেছে এ-রূপে দীপ্তি আছে ত' তাপ নেই—এবং আরো দু'মাস কাটিয়ে সে বুঝলে এ-রূপে প্রাচুর্য্য আছে বটে, কিন্তু বৈচিত্র্য কই।

এবং বছর ঘুরে যেতেই পুরন্দর উগ্র কর্মপ্রবণতার নেশায় সুপ্ত প্রবৃত্তিগুলোকে পুনরায় উজ্জীবিত ক'রে অবকাশের আকাশ থেকে ছাড়া পেয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। আর সীতা সমস্ত কোলাহল-কুটিল আয়োজন-ব্যস্ততার ওপারে নিঃশব্দ নীল আকাশাংশের মতো আপনার অন্তরের নির্জ্জনতায় প্রহর গুনতে লাগলো। বিয়ের লগ্নটিকে জীবনে সে অবিনশ্বর করতে পারলো না।

দুই

কোথা থেকে কোথায়

আরো এক বছর যেতেই ভাগ্যবিপর্যয় সুরু হলো। কাত্রাসগরে কয়লার তিনটে খনি গেলো বন্ধ হ'য়ে, সদর খাজনা দিতে না পেরে চার-চারটে মহাল উঠলো নিলামে। পকেটে টান পড়লো, এবং পয়লা বোশেখ সীতা তার নতুন বৎসরের উপহার পেলো না।

পুরন্দর তার বাড়ির অংশ বেচে দিতে চাইলো—অন্যান্য সরিকরা দিলো বাধা। বললে,—দুর্ভাগ্য খালি তোমার একলারই নয়। কষ্ট ক'রে দু-চারদিন সবুর করলে ক্ষতি কী! হাওয়া ফের বদলাতে পারে।

বাড়িটা অবশ্যি আরো ক'টা দিন সবুর করলে, কিন্তু পুরন্দর তার উদ্দাম পাখাটা একটুও শিথিল ক'রে আনলে না—শিথিলতা তার ধাতেই নেই। অবশেষে পাওনাদারের জোরে বাড়িটায় পার্টিশান্ হ'য়ে গেলো—পুরন্দর এলো আলাদা হ'য়ে। এক সরিক্ পাওনাদারের দাবি মিটিয়ে বাড়িটাকে ক্ষমা করলে বটে, কিন্তু পুরন্দরকে খ'সে পড়তে হলো। ব্যাঙ্কে মাত্র তার হাজার দুয়েক টাকা—আর অকূল সমুদ্রে সীতা আর সে! সব চেয়ে বড়ো ক্ষতি হচ্ছে এই, এজমালি মোটরটাও সে খুইয়ে এসেছে।

মালেন্ ষ্ট্রীট্-এ একতলা একখানা বাড়ি নিলে এবং দু'দিনেই সে-বাড়ির দেয়াল-মেঝে আসবাব-পত্র সীতার রক্তাভ নোখের মতো ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠলো। জানলায় উঠলো নীল পরদা, বসবার ঘরের মেঝেয় পড়লো মোটা কার্পেট। হাজার টাকা বেরিয়ে গেলো। তা যাক্, আরো এক হাজার এখনো আছে।

পুরন্দর বললে,—তুমি না থাকলে বিদ্রোহ করবার জোর পেতাম না, আর তুমি না থাকলে এই নিঃসঙ্গতাই বা বইতাম কী ক'রে?

সীতা বললে,—কিন্তু বাড়ির সবাই বলছে আমিই তোমাকে মন্ত্র দিয়ে আলাদা ক'রে আনলাম।

—সবাইর থেকে আলাদা হওয়াই ত' চাই। ঐ ভিড়ের মধ্যে তোমার সঙ্গে মোটেই আমার প্রেম জমছিলো না।

সীতা মৃদু হেসে বললে,—কিন্তু ভিড়ের মধ্যেই ত' প্রেম ভালো জমে।

—না, না, আমি একটা নিরাবরণ নগ্নতা চাই। ব'লে পুরন্দর সীতাকে কোলের কাছে টেনে এনে অস্থির হ'য়ে প্রথমে তার ঠোঁটে, পরে চিবুকের তলায়, ঘাড়ে ও কাঁধের নিচে বুকের অনাবৃত অংশে চুমু খেতে লাগলো। আকস্মিক আক্রমণে সীতা পড়লো অভিভূত হ'য়ে, উত্তেজনায় কপালে ও চিবুকে কণা-কণা ঘাম দেখা দিলো। নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে-করতে বললে,—ছাড়ো ছাড়ো, কী যে করো দিনে-দুপুরে।

আলিঙ্গন শিথিলতর হ'য়ে আসতেই সীতা নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে। এই উন্মাদনা সে সহ্য করতে পারে না, তাই স্বামীকে সে আততায়ীর মতো ভয় করে। পুরন্দর বললে,—আমি ভাবলাম তুমিও অমনি প্রতিদানে তোমার দেহের ঘ্রাণে স্বাদে গন্ধে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে দেবে। তোমার কিসের এত কুসংস্কার! আমি ত' তোমার স্বামী। এবার সে উঠে দাঁড়ায়, সীতাকে ধরবার জন্যে ছুটে আসে।

বড়ো একটা টেব্‌লের পাশে দাঁড়িয়ে সীতা আত্মরক্ষা করে; বলে,—এখন বুঝি খালি এই বিদ্যেরই চর্চ্চা সুরু করবে, কাজ-কর্ম্ম জোগাড় করতে হবে না কিছু?

—আগে তোমাকে ত' ধরি, পরে যা হয় হবে। ব'লে পুরন্দর সীতাকে ধরবার উদ্দেশ্যে টেব্‌লের চারিদিকে ঘুরতে থাকে—'ব্যাকস্‌-এর বুভুক্ষা থেকে দূরে যাবার জন্যে শ্লথাঙ্গী নায়াড্‌-এর মতো সীতাও চলেছে ছুটে—টেব্‌লের এ-ধার থেকে ও-ধারে। তার ঘোমটা পড়লো খসে, আঁচল পড়লো লুটিয়ে, বিস্ফারিত চুল হলো অন্ধকার, আর মুখখানি হলো চন্দ্রোদয়! সীতাকে পুরন্দর আবার আয়ত্ত করলে, কটির নিচে এক হাত ও অন্য হাত ঘাড়ের নিচে রেখে, তাকে তার উৎসুক মুখ ও আতুর চোখের সামনে রেখে—ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে সে বললে,—কেমন, ধরতে পারি না?

হাত পা ছুঁড়ে, পুরন্দরের চুল টেনে, গালে খিম্‌চি দিয়ে কেঁদে-ককিয়ে সীতা একটা কাণ্ডই বাধালে যা হোক্‌। পুরন্দর তার পরিপূর্ণোচ্ছ্বসিত বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আর্ত্তকণ্ঠে বললে,—আগে আমাকে চুমু খাও, দুই হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরো,—তারপর—

—না। ঝাঁজালো গলায় সীতা ধমক দিয়ে উঠলো ও পরে দৃষ্টি অসম্ভবরকম রুক্ষ ও মুখভাব রূঢ় ক'রে স্বামীকে সে দস্তুরমতো গালি পাড়লে।

তাড়াতাড়ি কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে পুরন্দর বললে,—যাও।

সীতা রান্নাঘরে গিয়ে বিশ্রাম পেলে ও চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে উনুনের পাশটিতে ব'সে পেলো সে তার সত্যিকারের আশ্রয়। স্বামীর কামনার এই উত্তরঙ্গ সমুদ্রে ডুবে তার সমস্ত অস্তিত্ব সঙ্কুচিত হ'য়ে আসে, দেহকে মনে হয় আবিল, স্থূল, অপরিচ্ছন্ন—স্বামীর এই ক্ষুধাকে মনে হয় অত্যাচারীর গ্রাস. মন্দিরে লুণ্ঠনকারীর বিজয়াধিকারের মতো একটা অগৌরবের ব্যাপার। স্বামীর দেহ-বীণার তীক্ষ্ণ তারের সঙ্গে সে তার শরীরের সুর মেলাতে পারে না—সমস্ত উদ্দামতার উপরে সে চায় প্রশান্ত একটা আবরণ,—এই প্রশান্তিই তার জীবন্মৃততায় পর্য্যবসিত হয়েছে। বামুন-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে—স্বভাবে ভীরু মেদুরতা, প্রবৃত্তি-গুলি শীতল, আকাঙ্ক্ষাও চোখের দৃষ্টিটুকুর মতো সীমাবদ্ধ। দেহের বাহিরের প্রসাধনে সে যেমন অপটু, অভ্যন্তরের রহস্যে ও তার সমাধানে ততোধিক তার নিঃস্পৃহতা। অতিমাত্রায় সে সতী,—এবং সে-সতীত্ব সে তার স্বামীর স্থূল স্পর্শে মলিন করতে চায় না।

রান্না-বান্না সেরে সীতা শোবার ঘরে এসে দেখলে পুরন্দর আয়নায় দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে দাড়ি কামাচ্ছে। মুখে তার নির্মেঘ প্রসন্নতা দেখে সীতার মন হাল্‌কা হ'য়ে গেলো; বললে,—রান্না তৈরি, স্নান সেরে নাও—আজ বেরবে না একবার?

—নিশ্চয়। এক্ষুনি। ক'টা বাজলো?

ক্ষিপ্র আঙুলে কামাবার সরঞ্জামগুলি ধুয়ে সীতাকে গুছিয়ে রাখতে ব'লে পুরন্দর বাথরুমে চ'লে গেলো। তারপরে তিন মিনিটে স্নান, পাঁচ মিনিটে খাওয়া আর বাকি দু' মিনিটে সে রাস্তায়। এখন সে চাকরির খোঁজে সমস্ত শহর চ'ষে ফিরবে। জীবনের আদিমতম ক্ষুধার আগুনে ইন্ধন চাই।

এই তার নতুনতরো নেশা। সারা সকালটা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে সে দরখাস্তের পর দরখাস্ত পাঠায় ও দুপুরের রোদে চেনা ও অচেনা জায়গায় এখানে-সেখানে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান খোঁজে। বাড়ি ফিরে এসেও সে একটু মিইয়ে পড়ে না,—ব্যর্থতাবোধের মাঝে অনুভূতির যে একটা প্রখর তীব্রতা আছে তাই ওকে নিরন্তর স্পন্দিত রাখে, জীবনে আরো চাঞ্চল্য আনে, যতো তার থামবার কথা ততোই সে পক্ষপ্রসার করে।

বিকেলে আসে বন্ধুরা—প্রথম চা আর সিগারেট, পরে খালি চা এবং সেই চা-র বদলে যখন একমাত্র গুজবের ধোঁয়ায় মশগুল হ'বার দিন এলো তখন আড্ডাগুলি

সকাল-সকাল ভাঙতে লাগলো। পায়ের ঘা লুকিয়ে বীরদর্পে জুতো মস্‌মসিয়ে চলবার মতো পুরন্দর কালকে ভোর হ'লেই এক মণ চাল কিনবার কথা ভুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে প্রবল উচ্চ হাস্যে যোগ দেয়, টেব্‌ল চাপ্‌ড়ে তুমুল তর্ক চালায়, এবং কোথাও কিছু ঘটেছে কি না সেই বিষয়ে পরম ঔদাসীন্য বজায় রেখে বন্ধুদের নিয়ে সে মাঠের দিকে বেড়াতে বেরোয়।

তিন

নীল সাড়ি

তারপর রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফিরে এসে কী বা আর তার করবার আছে? পুরন্দর হাতে কোনো কাজ পায় না। অগত্যা সীতাকে ডেকে আনে রান্নাঘর থেকে। বলে:

—দু' বেলাই তোমাকে রান্না করতে হবে নাকি? চাকরটা আছে কী করতে?

সীতা ময়লা সাড়ির আঁচলে ভিজা হাত দুটি মুছতে-মুছতে কুণ্ঠিত হ'য়ে পাশে এসে দাঁড়ায়; বলে,—কাজ ত' কিছু একটা করতে হবে।

পুরন্দর বলে,—বেশ, আমার পাশে এসে বোস। আমার সঙ্গে গল্প করবে।

—দাঁড়াও, ওকে তা হ'লে বুঝিয়ে দিয়ে আসি। ব'লে সীতা রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে ও চাকরটাকে ঘুম থেকে তুলে তালিম দিয়ে আসে।

পুরন্দর তখন সীতার গা-ভরা স্পর্শের নদীর মতো কোমল বিছানায় ডুবে গেছে। সীতা তার শিয়রে ব'সে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে: কোনো কিছু সুবিধে হলো?

—নাই হোক। ব'লে পুরন্দর হাত বাড়িয়ে সীতাকে বুকের উপর কেড়ে আন্‌লে; বললে,—এই নোংরা সাড়িটা প'রে আছ কেন? তোমার নেই নীল সিল্কটা পরো।

মাথা তুলে সীতা বললে,—কেন, কোথাও বেড়াতে যাবে?

—বেড়াতে না গেলে বুঝি ভালো সাড়ি পরা যায় না? ঐ সাড়িটা প'রে আমার পাশে এসে শোবে।

কথা শুনে মুখের ওপর চাবুকের বাড়ি খেয়ে সীতা পাংশুমুখে আহতস্বরে বললে,—সব সময়েই তোমার এক কথা!

—আর সব সময়েই তোমার অবাধ্যতা। সাড়িটা পরতে কী দোষ হয়েছে?

—নষ্ট হ'য়ে যাবে না?

—বাক্সে বন্ধ ক'রে রেখেই বা কী লাভ হচ্ছে?

—নষ্ট হ'য়ে গেলে ত' আর কিনে দেবে না!

—বাক্সে বন্ধ ক'রে রেখে ভাবলেই চলবে শাড়িটা অটুট আছে—কষ্ট ক'রে আর কিনতেও হবে না।

—পরছি, তবে তুমি আলোটা নেভাও।

—বা, আলো নেভাবো কেন? আমার কাছে তোমার লজ্জা কিসের?

—না, না, আলো না নেভাও, ও-ঘরে যাও তবে।

—ভারি tired, বিছানা ছেড়ে এখন আর উঠতে পারছি না।

—তবে পরবো না শাড়ি।

—বেশ, আলো নিভিয়ে দিচ্ছি।

স্তব্ধ ঘরে রাশি-রাশি অন্ধকার কিল্‌বিল্ করতে লাগলো।

সীতা ট্রাঙ্ক খুললে, শাড়িটা অন্ধকারে বনমর্মরের মতো শব্দ ক'রে উঠলো ও পুরন্দর টুপ ক'রে সুইচ টেনে দিলে। চকিত আলোকে দেখা গেলো গ্রীক্-ভাস্করের মূর্ত্তি,—সবল ভাবোচ্ছ্বাসময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্বাস্থ্যের পূর্ণতা, রেখায়-রেখায় সুরের সুষমা—কিন্তু অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ ক'রে তাড়াতাড়ি স্তূপীকৃত শাড়িটা কুড়িয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে সীতা পাশের ঘরে অন্তর্হিত হলো।

আলো নিভিয়ে পুরন্দর ডাকলে: সীতা।

ও-ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

সীতা সেই দিন থেকে সারা দেহ দিয়ে পুরন্দরকে ঘৃণা করতে সুরু করলো—মন দিয়ে সুরু করলো, যখন মাসান্তেও সে একটা চাকরি বাগাতে পারলে না।

আর সেই ঘন অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে পুরন্দর ভাবতে লাগলো নারীদেহ হচ্ছে সেই স্তব্ধ সুর যা প্রকাশের প্রবল প্রেরণায় ঘনীভূত হ'তে-হ'তে অবশেষে মূর্ত্তিতে উচ্চারিত হ'য়ে উঠেছে—আর মাসান্তেও যখন তার চাকরি জুটলো না, তখন সে-সুর হলো ম্লান, মূর্ত্তি গেলো ভেঙে।

চার

তবু সাড়া নাই

অতএব মালেন্-স্ট্রীট্ ছাড়তে হলো। এবার উঠে এলো কালিঘাটের ঘিঞ্জি পাড়ায়—একটা তেতলা-বাড়ির ওপরের ফ্ল্যাট্-এ। সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ-হাতি দুটো ঘর, একটা বসবার ও পাশেরটা শোবার—ডান হাতেও দু'খানা—দূরেরটা রান্নার, সামনেরটা আপাতত না হ'লেও চলে—অগত্যা সেটাতে সীতা ভাঁড়ার করেছে। পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া, চাকরের মাইনে সাত—নিচে থেকে

জল এনে দেয়, বাজার করে, মশ্‌লা পেষে—ক'দিন থেকে সীতার অসুখ করেছে ব'লে সে-ই রাঁধে। তা ছাড়া ধোপা, কয়লা, ইলেক্‌ট্রিক্‌—অতো হিসেব পুরন্দর করতে পারে না।

জীবনে স্ত্রী ছাড়া আর তার কিছু নেশা নেই, স্বাস্থ্য ছাড়া অপব্যয় করবার মতো বিলাসিতাও তার গেছে।

কিন্তু সীতার আজ ক'দিন থেকে ঘুস্‌ঘুসে জ্বর—শিয়রের জানলা খুলে সে ঘোলাটে আকাশ আর একঘেয়ে রাস্তা দেখে; পাশের বাড়িতে কোথায় রেডিয়ো হচ্ছে তাই উৎকর্ণ হ'য়ে শোনবার চেষ্টা করে; আর জোরে একটু হাওয়া বইতে সুরু করলে জানলাটা ভেজিয়ে রুগ্ন বিরহী বিছানায় আকুল আগ্রহে স্বামীর স্পর্শ হাতড়ায়।

বসবার ঘরে মাদুর বিছিয়ে দেয়ালে বালিশ দাঁড় করিয়ে তাতে পিঠ রেখে পুরন্দর বই পড়ে। একটা লাইনে এসে সে হঠাৎ বই বুঁজিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকে—ঘুমের মতো জাগরণের উগ্র ক্লান্তি আস্তে-আস্তে তাকে আচ্ছন্ন করে। আলস্যের বোঝা টেনে-টেনে, মুহূর্তের ভিড় ঠেলে-ঠেলে আর সে চলতে পারে না। রুগ্ন সীতার পাশে ব'সে দুটো স্নেহের কথা কইতেও তার স্নায়ুগুলি জোর পায় না। খেয়ে-দেয়ে আলাদা বিছানা ক'রে সে শোয়—চাকরটাই সীতার তদারক করে।

গরিব বামুন-পণ্ডিতের ঘরে জন্ম নিয়েও সীতার জীবনে আকস্মিক সৌভাগ্যোদয় হ'য়েছিল—গাঁয়ের খোড়ো ঘর ছেড়ে সে এলো সহরে—অপ্রত্যাশিত বিলাসের মধ্যে, সমৃদ্ধির মধ্যে—ভাবলে ভাগ্যের হাতে এই সে তার যোগ্য মূল্য পেয়েছে। কিন্তু জীবনে যখন দ্রুত পটপরিবর্ত্তন হলো, সীতা সেই দৃশ্যটাকে অনায়াসে মেনে নিতে চাইলো না—ভাবলে কোথায় নিশ্চয় প্রকাণ্ড একটা অবিচার হয়েছে। এবং সেই অবিচারের জন্যে দায়ী করলে সে স্বামীকে। এমন কথা পর্য্যন্ত বলতে পারলে, যে-স্বামী স্ত্রীকে সুখে রাখতে পারে না বিয়েতে তার কোনো অধিকার নেই।

প্রচণ্ড দার্শনিকের মতো মুখ গম্ভীর ক'রে পুরন্দর বলে,—সুখ কি খালি উপকরণেই নাকি?

সীতা মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলে,—না, বনবাসে।

—সঙ্গিনী পেলে বনবাসেও সুখ আছে বৈ কি, যদি অবশ্যি রাবণ এসে না হানা দেয়।

একমাত্র তাকে কর্ম্মহীন ক'রে রেখেছে, নইলে দারিদ্র্যে পুরন্দরের জীবন সম্বন্ধে

অরুচি ধরেনি। অর্থাৎ তার কল্পনাশক্তি সবল ও প্রাণানুভূতি সুতীক্ষ্ণ ব'লে সে দারিদ্র্য থেকে মাদকতার একটুও সন্ধান পায় না এমন নয়, সীতার মতো এই দুর্গতিকে সে দুর্ভাগ্য ব'লে কপালে করাঘাত করে না।

সীতার কাছে দাঁড়িয়ে পুরন্দর জিগ্‌গেস করে : আজ কেমন আছ?

সীতা বলে,—হঠাৎ এত দয়া যে!

তার গা ঘেঁষে ব'সে পুরন্দর বলে,—তোমার সম্বন্ধে নিষ্ঠুর আর হ'তে পারলাম কই! বরাবর দয়াই ত' ক'রে এসেছি।

সীতার জ্বরটা কাল ছেড়ে গেছে, রোদ প'ড়ে রুক্ষ চুলগুলিতে সোনালি একটু আভা এসেছে। পুরন্দর কপালে হাত রেখে বললে,—গা ত' বেশ ঠাণ্ডা—কী খাবে আজ?

সীতা সমস্ত শরীর উন্মুখ ক'রে রেখে স্বামীর সেই স্পর্শটি আরো গভীরে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পুরন্দর তার হাত কপাল থেকে গলায় যদি বা আনলে—সীতা ঘেমে উঠলো—তবু আর এক চুল অগ্রসর হলো না। তবু চোখ দুটি তুলে কাতর স্বরে বললে,—কী খাবো আজ বলো না?

পুরন্দর তবু নড়লে না; বললে,—আজো দুধ-বার্লিই খাবে,—কাল ডাক্তার যদি বলে ত' পাঁউরুটি।

ঘণ্টা খানেক বাদে দুর্বল পায়ে কাঁপতে-কাঁপতে সীতা পুরন্দরের বসবার ঘরে এসে হাজির। পুরন্দর তাড়াতাড়ি ছেঁড়া বেতের চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বললে,—বোস, বোস। উঠে এলে কেন?

ঘরের চারদিকে চেয়ে সীতা বললে,—ঘর-দোরের এ কী হাল ক'রে রেখেছ? দু'দিন বিছানায় প'ড়ে আছি ব'লে কি নিজের ঘরটাও সামলাতে পারো না? চাকরটা আছে কী করতে?

বাধা দিয়ে পুরন্দর বললে,—তুমি হঠাৎ অতো ব্যস্ত হ'য়ে উঠো না। ঘর-দোর সাফ্ করায় না করায় আমার বড়ো কিছু এসে যায় না। এর মধ্যে যখন থাকতে হবেই জানলাম, তখন বেশ থেকে গেলাম। অসুবিধে কিছু হচ্ছে ব'লে ত' মনে হয় না।

—তা ত' হয় না, কিন্তু সেল্‌ফে ঐ বইগুলো কা'র?

—কা'র আবার হবে? আমার।

—কোথায় পেলে?

—কোথায় আবার পাবো? কিন্‌লাম।

—কিন্‌লে? কবে?

—এই সেদিন।

—আমাকে বলো নি কেন ?

—সব কথাই তোমাকে বলতে হবে নাকি ?

—কতো দিয়ে কিন্‌লে শুনি ? না, তাও বলবে না ?

—কথা যখন উঠেছে, তখন বলতে আর দোষ নেই।

—এবং আশা করি সত্য কথা বলবে।

—নিশ্চয়। চল্লিশ টাকা সাড়ে ন' আনা।

—চল্লিশ টাকা সাড়ে ন' আনা !

—হ্যাঁ, সাড়ে ন' আনা।

—এতো টাকার বই কেনবার কী হয়েছিলো ?

—ইচ্ছা হয়েছিলো। সময় কাটাতে হবে ত' ?

—সময় কাটাবার আর কিছু পেলে না ?

—এক তুমি ছিলে—তা, তোমার দেহ থেকে বইয়ের শুকনো পাতায় স্বাদ বেশি।

—কিন্তু সাত দিন বাদে তোমাকে বাড়ি-ভাড়ার টাকা দিতে হবে খেয়াল আছে ?

—তা ত' নিতান্তই সাত দিন বাদে। এখুনি তার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে লাভ কী !

—কিন্তু কোত্থেকে জুটবে শুনি ?

—সে-ব্যবস্থা একটা হবেই।

সাত দিন না-যেতেই ব্যবস্থা যা-হোক্ একটা হলো। বাইরের ছোট বারান্দা-টুকুর ধারে দাঁড়িয়ে সীতা অন্যমনস্ক হ'য়ে চেয়ে রয়েছিলো, অকস্মাৎ পুরন্দর পেছন থেকে চুপি-চুপি এসে সীতাকে বুকের উপর টেনে আনলে। তার দাঁড়াবার বিষণ্ণ ভঙ্গিটি সন্ধ্যার আবছায়ায় মিশে আলো-না-জ্বালা ঘরে এমন একটি আবহাওয়া এনেছে যে পুরন্দর নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলো না।

সীতা বিরক্তির সঙ্গে বললে,—ছাড়ো।

পুরন্দর তাকে আরো জোরে আকর্ষণ ক'রে বললে,—আমি যে অন্য লোক নই কী ক'রে জানলে তুমি ?

—মাগো, তুমি দিন-কে দিন ভীষণ জঘন্য হচ্ছ। ছাড়ো বলছি।

—ছাড়বো না। দরজা খোলা পেয়ে অন্য লোক ঢুকে প'ড়ে অন্ধকারে যদি তোমাকে জড়িয়ে ধরে, তুমি কী করতে পারো ? তোমার সম্বন্ধে আমার মতো সবাইকে যে নিঃস্পৃহ হ'তে হবে তার কী মানে আছে ?

—ছাড়বে না?

—না। তোমাকে একটা সুসংবাদ দেব।

—বেশ, ঐ চেয়ারটাতে ব'সে বলো, আমি ঠিক শুনতে পাবো।

—বেশ, বস্‌ছি, তুমিও আমার কোলে বসো তা'লে।

—মাথা খারাপ নাকি? বাইরে থেকে যে দেখা যাবে।

—যাক্ না, বিষ্ণুর কোলে লক্ষ্মী—এমন দৃশ্য যে দেখবে সে-ই ত'রে যাবে, দেখো।

দেয়ালের দিকে সরে এসে সীতা বললে,—বলো।

—চাকরি হয়েছে, সীতা!

চুপচাপ।

পুরন্দর বললে,—খবরটা শুনে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে না? চুমু খেলে না? তুমি কী!

—কতো মাইনে?

—প্রেম হয়েছে এইটেই বড়ো কথা—নায়ক-নায়িকা কালো কি ফর্সা সেইটে অবান্তর।

—মাইনে কতো বলো না?

—মাইনে শুনে বুঝি প্রেমের বিচার করবে?

—বলতে হয় বলো, না হয় ছেড়ে দাও। ডাল বসিয়ে এসেছি।

—আগে কী শুন্‌বে—মাইনে কতো, না চাকরিটা কী!

—মাইনে কতো!

—সভয়ে বলবো না নির্ভয়ে?

—না, না, ছাড়ো, তোমাকে কিছু বলতে হবে না।

—আচ্ছা সভয়েই বলছি। সত্তর টাকা।

—তুমি আর কতো পাবে!

—এতোও যে পেলাম তার জন্যে তুমি নিজে যেচে আমাকে একটা চুমু খাবে না?

—ছাড়ো, সব সময়ে ভালো লাগে না।

—কোন্ সময় ভালো লাগে কী ক'রে বুঝবো?

সীতার না হোক্, পুরন্দর মাটিতে পা রাখতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লে। জীবিকাধারণের সঙ্কীর্ণ একটা পথ পেয়ে সে এখন প্রাণধারণের মহাকাশের পথে যাত্রা করতে পারবে।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে পুরন্দর বললে,—তোমার শরীর ত' আজ ভালো আছে?

—তা থাকুক। আমি এখন ঘুমুব।

—আমিও।

—তুমি ত' খাবার পর রোজ দু' ঘণ্টা বই পড়ো।

—আজ তোমাকে যে উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চময় লাগছে। সেই দু' ঘণ্টা—

—দু' ঘণ্টা! আমারো আজ বই পড়বার ইচ্ছে হচ্ছে। বাঙ্‌লা-টাঙ্‌লা কিছু নেই? থাক্ বাবা, আলো জ্বালিয়ে রাখলে আমার মাথা ধরবে।

—আলো নিভিয়েও ত' পড়তে পারো।

—প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুতে পারি। ব'লে সীতা মশারি ফেলে বিছানায় চম্পট দিলে। বললে,—তোমার বসবার ঘরে পড়তে যাবার আগে আলোটা নিভিয়ে দিয়ো।

বিছানার কাছে এসে পুরন্দর বললে,—এই গরমে মশারি?

ভেতর থেকে চাপা উত্তর এলো: আজ্ঞে হ্যাঁ।

পাঁচ

নতুন বন্দোবস্ত

চাকরিটা পুরন্দরের রাত্রে—খবরের কাগজের আপিসে। রাত দশটা থেকে ভোর।

সীতা বলে,—আমাকে তুমি রাত্রে এমনি একলা ফেলে আপিস করবে নাকি?

—কী করা যায়, চাকরি ত' আমার মর্জ্জিতে নয়।

—দিনে বদ্‌লে নিতে পারো না?

—আপাততো না। তা ছাড়া রাত্রে কাজ করতে আমার ভালো লাগে।

—আর একলা আমি থাকি কী ক'রে?

—কিসের ভয় তোমার? ভয় ত' তুমি আমাকেই বেশি করো।

—একদিন এসে দেখবে আমি ম'রে গেছি।

তা অবশ্যি পুরন্দর একদিনো দেখে না। সীতা যাই হোক্, তার মৃত্যুর কথা সে ভাবতে পারে না। বলে,—তুমি একে সতী, তাই সাহসিকা। স্বামীকে যে সত্যিই ভালোবাসে তার ভয় কিসের, মৃত্যুও তাকে ঘেঁষতে পারে না—কী বলো?

—তোমার ওপর-বক্তৃতা রাখো, আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

—আমাকে তবে কে দেখবে?

—কেন, তোমার চাকর!

—আমাকে চাকরের হাতে ফেলে রেখে বাপের বাড়ি থাকতে তোমার মন সরবে?

—আমাকেও এমনি মরণের হাতে ফেলে রাখতে ত' তোমার দিব্যি মন সরছে। আমাকে তুমি ছাই ভালোবাসো। ভালোবাসো খালি দেহটা। গলায় দড়ি বেঁধে দেহটাকে লট্‌কে দিলেই তুমি গেছ।

—আর দেহটাকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে রেখে তুমি নিজে অন্তর্ধান করলেই যেন আমি আছি। দেহটাকে ভালোবাসাই ত' সত্যিকারের ভালোবাসা। দেহ ছাড়া আত্মা ব'লে কিছু আছে নাকি? ভাবের চেয়ে তাপ, স্মৃতির চেয়ে স্পর্শ—

—আর সীতার চেয়ে চাকরি—বক্তৃতা রাখো দিকি এবার। অন্য একটা বন্দোবস্ত না করলে চলছে না।

অন্য একটা বন্দোবস্ত যা-হোক্ হলো—এবং সীতা তাতে সম্মতি দিলে।

পুরন্দরের ছোট মাসতুতো ভাই দিলীপ ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়ছে, ভালো মেস্ খুঁজে পাচ্ছে না, সে-ই এসে থাকবে। যে ঘরটায় ভাঁড়ার ছিলো সেটা তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। সীতাকে রাতের বেলায় পাহারা ত' সে দেবে-ই, উপরন্তু থাকা-খাওয়া খরচ-বাবদ কুড়িটে টাকা প্রতি মাসে নিয়মিত সে গুনে যাবে। চাকরের বদলে বুড়ো একটা ঝি রাখা হলো—সে-ই সীতার ঘরে রাতের বেলায় শোবে।

সীতা বললে,—বন্দোবস্তটায় কেমন যেন ব্যবসার একটা গন্ধ থেকে গেলো।

—তা না'লে আর বন্দোবস্ত কী! সুবিধে ত' খালি আমাদেরই নয়। ওকেও মেস্-এর বিচ্ছিরি রান্না খেতে হবে না,—তা ছাড়া তোমার মতো এমন একটি রূপসীর সঙ্গ পাবে। কুড়ি টাকা আর বেশি কী!

আর যায় কোথা! সীতা পুরন্দরের বাহুর উপর ভীষণ জোরে এক চিমটি বসিয়ে দিলে। পুরন্দর বললে,—মারো কেন? মিথ্যে কথাটা কোথায় বললাম?

সীতা বললে,—তবে ওকে আমি আজই চ'লে যেতে বলি।

—আজই ত' ও এলো।

—তা আসুক্। তুমি যখন এমনি ইতর হয়েছ—

—ছি, পাগলামি করে না। দিলীপের মতো ভালো ছেলে তুমি দেখনি। ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে পর্য্যন্ত জানে না। তাকে তুমি অযথা অপমান কোরো না।

—অপমান ত' তুমি করছ।

—কক্ষনো না। বলছি সে এখানে এসে ভালো থাকবে।

—আবার?

—বা, মেস্-এর চেয়ে এখানে সে ভালো থাকবে না? নইলে সে এলো কেন? ব্যবসার গন্ধ একটু পাচ্ছ না?

—তোমারই ত' বেশি উপকার হচ্ছে।

—নিশ্চয়, সে-কথা কে অস্বীকার করছে ? রাত্রে তোমাকে পাহারা দেবার জন্যে ত' লোক দরকার।

—আবার ?

এবার চিমটি না কেটে সীতা খাটের কাছে পুরন্দরের গা ঘেঁষে এলো। খানিকটা অর্থ হচ্ছে এই যে তাকে সে যতোই কেন না যা-তা বলুক, আসলে সীতা স্বামীরই একলার। পাকে-প্রকারে এই অর্থটি ব্যক্ত না ক'রে সে আর থাকতে পারছিলো না।

তার শুকনো বেণীটা হাতের উপর লুফ্‌তে-লুফ্‌তে পুরন্দর বললে,—এবার খুব নিশ্চিন্ত হ'লে যা হোক্।

—কিসের ?

—অবশ্যি আমিও বেশ নিশ্চিন্ত হ'লাম।

—আমি হ'লাম কী ক'রে ?

—বা, রাতে আমাকে ফিরতে হবে না, তুমি দিব্যি একা-একা গা ছাড়িয়ে ঘুমুতে পারবে। কেউ আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসবে না—বেশ ভালোই হলো, না ?

পুরন্দরের গলা জড়িয়ে গালের উপর গাল রেখে সীতা বললে,—কী যে তুমি বলো, দিনের বেলায় কবে ফের বদলি হবে ?

—বোধ হয় হবো না। চাকরি থাকবে না তা'লে।

—তা হবে কেন ! আমি পাশে শুলে যে তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ে—আমি বুঝি না ?

—কিন্তু পাশে বস্‌লে ত' পড়ে না। উঠে যাচ্ছ কেন ?

—ঠাকুরপো এ-ঘরে এখুনি এসে পড়বে। '

—ও !

—নাও, নাও, এই বস্‌ছি। কী করতে হবে এবার ?

—আমি কী জানি !

—গলা জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেতে হবে ? বাবাঃ, আর পারি না। হলো ত' ? বাঃ, আমার রান্না করতে যেতে হবে না ? ঠাকুরপোর কলেজ নেই ?

—আমার আপিস রাত্রে হ'য়ে খুব ভালো হয়েছে, না ?

—কেন ? আবার কী হলো ?

—আমাকে শিগ্‌গির-শিগ্‌গির চান্ করতে যেতে হয় না।

—বা, সারা রাত জেগে থেকে তুমি সকালে এসেই চান্ করো না একবার ?

—ও ! তাই নাকি ? ভুলে গিয়েছিলাম। ব'লে পুরন্দর হেসে উঠলো।

সীতা তাড়াতাড়ি আরেকটা চিমটি কাটলে।

পুরন্দর বললে,—তারপর কী করতে হবে বলো ত'।

—জানি না। ব'লে সীতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

খানিক বাদেই পুরন্দর গলা ছেড়ে হাঁক পাড়লে : সীতা, সীতা ! সী—তা !

সীতা এসে হাজির। উনুনের আঁচে গাল দুটো সিঁদুরের মতো টক্‌টক্ করছে। গলা ঝাঁজিয়ে বললে,—শুয়ে-শুয়ে কী এমন গাধার মতো ডাকছ !

—গাধার মতো। আমি ভাব্‌ছি প্রায় শিশির ভাদুড়ি হ'য়ে উঠ্‌লাম !

—তবে যাও না, এখেনে কেন ? থিয়েটারে গিয়ে চ্যাঁচালেই ত' পারো।

—আর এটা থিয়েটারের চেয়ে কম কিসে ! বরং বেশি—কী বলো ?

—হ্যাঁ বেশি, কী চাই মশায়ের ?

—ঐ সবুজ বইটা।

—হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে পারো না ? তার জন্যে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছ ? লোকে শুনলে ভাবে কী ?

—শোন্‌বার মধ্যে কে আর ? লোক ত' এক দিলীপ। তাকে তোমার নামটা শুনতে দিতে চাও না ? পাছে ডেকে বসে ?

বইটা নিয়ে সীতা পুরন্দরের বুকের উপর ছুঁড়ে মারলে।

পুরন্দর হেসে বললে,—তারপর কী করতে হবে বলো ত' ?

—জানি না।

সীতা চ'লে যাচ্ছিল, পুরন্দর আবার ডাক্‌লে : ঠাকুরপোর রান্না বুঝি পুড়ে যাচ্ছে ?

—আর পারি নে বাপু। ব'লে সীতা পুরন্দরের বুকের উপর লুটিয়ে পড়লো : এই নাও, হলো এবার ?

তার পরেই ছুট।

ছয়

নৈশ নগরী

পুরন্দরের অনিদ্রাক্লিষ্ট চোখের সমুখ দিয়ে আস্তে-আস্তে ক্লান্তিকর অন্ধকার নিবিড় হ'তে থাকে, কখন চোখ একটু বুঁজে এলেই প্রেসের ছোক্‌রারা এসে তাগিদ্ দেয়—এই 'নিউজ'টা এখুনি সাজিয়ে দিতে হবে। সারাক্ষণ স্নায়ুগুলিকে উচ্চকিত রেখে এই বিচিত্র কর্মতরঙ্গের চূড়ায়-চূড়ায় নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। প্রকাণ্ড বাড়িটা

বিরাটকায় দৈত্যের মতো সমস্ত শূন্যতা জুড়ে গভীর নিশ্বাস ফেলছে। ছোট ঘরটিতে ব'সে পুরন্দর বিরাট ধরিত্রীর স্পর্শ পায়—নিজের অনুভূতি ও চেতনার পরিধি বিস্তৃততর হ'তে থাকে। রাত্রির অন্ধকার সেই আবিষ্কারের আনন্দকে আরো ধারালো ক'রে আনে।

তিনটের পর পুরন্দর ছুটি পায়। তখন কখনো সে টেব্‌লের উপর কাগজের বাণ্ডিলে মাথা রেখে একটু ঘুমোয়, কখনো বা রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ঘুমন্ত পথ-গলি স্বপ্নের মতো মনে হয়—চারিদিকের সুষুপ্তি গাঢ় একটা নেশার মতো ওকে আচ্ছন্ন ক'রে দুর্ব্বল ক'রে ফেলে। বাড়ি সে ফিরতে পারে বটে, কিন্তু সীতার ঘুম ভাঙিয়ে অকারণে তার বিরক্তি উৎপাদন করতে ইচ্ছে হয় না। মাঠে নেমে সে পাইচারি করতে থাকে।

প্রথম-প্রথম সীতা তার কাছে অবান্তর একটা বিলাস-সামগ্রী ছিলো, এখন খাদ্য ও সুনিদ্রার মতোই অতি প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছে। অসুখ থেকে সেরে উঠবার পর শরীরের যেমন একটা বলকারী টনিক্ চাই—তেমনি মনের নিস্তেজতার ওষুধ চাই এই তপ্ত নারী-মাংস! চারদিকে নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের কশাঘাতে এই তার প্রাণান্তকর শ্রম—এর পরে চাই তীক্ষ্ণতম উন্মাদনা, নইলে এই খাটুনি তার সইবে কেন? সীতা তার চারিপাশে খালি প্রাণান্তকর বিশ্রাম সঞ্চিত ক'রে রেখেছে।

মাঠের অন্ধকারে পুরন্দরের ভয় করতে লাগলো। মনে হলো কাকে যেন সে খুন ক'রে পালাচ্ছে। কাকে? ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো, নিজেকেই। শূন্য মাঠে যে সঞ্চরণ করছে সে সে নয়, তার প্রেত। জীবনের বিচিত্র উৎসব-উত্তাল পৃথিবীর থেকে বিদায় নিয়ে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে—অথচ মৃত্যুর সেই উন্মাদ শিহরণের স্বাদ সে পেলো না।

পুরন্দর রাস্তায় উঠে এলো। রাস্তার দুই পারের আলোর সারি উন্নিদ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে তাকে যেন পর্য্যবেক্ষণ করছে। রাত্রির ক্লান্তির বোঝা টেনে মন্থর পায়ে উদ্দেশ্যহীনের মতো যে পেছিয়ে চলেছে—তাকে। এই আলোর চেয়ে মাঠের অন্ধকারই বরং ভালো ছিলো!

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি সাঁ ক'রে চোখের সমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। ছোটার প্রাবল্যে চোখ দিলো ধাঁধিয়ে। সমস্ত সুষুপ্তি ভেঙে-চুরে খান্‌-খান্ হ'য়ে গেলো। এক মুহূর্ত্তেরো বেশি পুরন্দর নিশ্বাস ফেলতে পারলো না।

পেছনের সিট্-এর মাঝখানে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ এক যুবক, টাইটা হাওয়ায় উড়ছে, কলার্-এর বোতাম গেছে খ'সে, কোট পড়েছে এলিয়ে—আর তার দু'পাশে

দু'টি য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ মেয়ে—গুচ্ছ-গুচ্ছ সিল্ক এর মতো থুব্-থুব্ চুল উড়ছে—একজনের লাল সিল্কের ফ্রক, উগ্র ও অনাবৃত দুই বাহু—অন্যেকজনেরটা নীল না ধূসর, পিঙ্ক না ক্রিম্‌সন্—পুরন্দরের ঠিক চোখে পড়লো না। হাওয়ায় ওদের দু'টি পাৎলা পেলব শরীর ফুরফুরে প্রজাপতির রঙচঙে পাখার মতো উড়ে গেলো। চঞ্চল কলস্বরে অন্ধকার হ'য়ে উঠলো অরণ্যের মতো মর্ম্মরিত।

পুরন্দর তার দেহে—অনিদ্রায় কঠিন দেহে—সহসা উদ্দীপ্ত রক্তের জোয়ার অনুভব করলো। ট্যাক্সি তখন অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, কিন্তু পুরন্দরের মনে হলো সেই ছোটার প্রবলতা অন্ধকারে এখনো কাঁপছে, আলোড়িত হচ্ছে—অন্ধকার ছেড়ে তার দেহের স্নায়ুশিরায়, তার মস্তিষ্কে,—বুকের মধ্যে বন্দী পাখীর মতো হৃদপিণ্ড পাখার ঝাপটা দিচ্ছে। খুব জোরে পুরন্দর নিশ্বাস টান্‌লো,—বেগের সুবাসে অন্ধকার ভারি হ'য়ে উঠেছে—নিশ্বাস সে টানতে পারছে না।

তারপর আর সে দাঁড়ালো না; খুব জোরে পা চালিয়ে হাঁটা সুরু করলে।

সাত

স্ন্যাপ্-সট্

সকালবেলা স্নান ক'রে ভিজা চুলে সীতা ঘরে ঢুকছে, দিলীপ চট্ ক'রে বেরিয়ে এসে হাসি-মুখে বললে,—দাঁড়াও, বৌদি।

সীতা থমকে দাঁড়ালো।

দিলীপের হাতে একটা ক্যামেরা। বললে,—দাঁড়াও, তোমার একটা স্ন্যাপ্ নি।

লজ্জায় সীতা কেঁপে উঠলো। বললে,—যাও! ব'লে ঘুরে দাঁড়ালো।

—না, না, ফাইন্ পোজ্ হয়েছে—নড়ো না। এক মিনিট।

—কী করো যা-তা। দাঁড়াও, সিঁদুর প'রে নি।

—না, না, এমনি। সিঁদুর পরলে মোটেই তোমাকে সুন্দর দেখাবে না।

—লোকে বলবে কী!

—কে জানতে আসবে বলো! প্রিণ্ট্ ক'রে লুকিয়ে রেখে দেব। দেখবো খালি আমি আর তুমি।

—না, তুমি দেখছি ভারি ফাজিল হচ্ছ, ঠাকুর পো। ব'লে দিলীপের হাতটা জোর ক'রে ঠেলে দিয়ে সীতা আয়নায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে লাগলো।

দিলীপের বয়েস এই একুশ,—ফুটন্ত জলের মতো টগ্‌বগ্ করছে। কী তার কর্ত্তব্য সব সময়ে তা সে নির্ধারণ ক'রে রেখেছে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এমন একটা সহজ দৃঢ়তা। চুলে বাদামি একটু ছিট্, চোখে তীব্র অনুসন্ধিৎসা—ঐ চোখের কাছে সমস্ত

মেকি আবরণ কুয়াসার মতো উড়ে গিয়ে যেন রূঢ় হাড় বেরিয়ে পড়ে—এই তার বিশ্বাস। অনুভব করতে চায় কম, বেশি চায় কথা কইতে—বাক্যের এই উজ্জ্বল অসংযম তার ব্যবহারে একটা দীপ্তি এনেছে। হাসে সে অনর্গল, খায় সে অদম্য—এবং সব সময়েই সে উৎসুক ও কৌতূহলী। কেউ তার কিছু ক'রে দেবে এমন প্রত্যাশা সে করে না—নিজেকেই সুযোগ খুঁজতে হয়। এবং হাত একবার বাড়াতে পারলে কখনোই সে মুঠো চেপে রাখে না।

—তুমি এখানে ব'সে ঐ ধোঁয়াগুলো আর ছেড়ো না।

—গিলতেই ত' চাই, কিন্তু ফের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। সিগারেট-এর সঙ্গে প্রেমের একটা চমৎকার উপমা হয়, বৌদি।

সীতা কুণ্ঠিত হ'য়ে দিলীপের মুখের দিকে তাকালো, ঘন বাঁকানো ভুরুর নিচে চোখ দুটি হঠাৎ করুণ হ'য়ে এসেছে। দিলীপ বললে,—ধোঁয়া হ'য়ে যায় মিলিয়ে, ফেলে রাখে ছাই।

—তোমার পড়াশুনো করতে মন বসে না? সীতা ধম্‌কে উঠলো : যাও, পড়ো গে।

—তোমার গল্প করতে মন বসে না?

—কতো কাজ আমার।

—আমারো যেন কতো ছুটি। সামনের পার্কে একটু বেড়াতে যাবে, বৌদি? ঘরে কী গরম!

—আমার এখন উনুনের পাশে গিয়ে বসতে হবে। ঝি-টার জ্বর এসেছে।

—তাই ভালো, চলো তোমার সঙ্গে ব'সে রাঁধি গে। আমাকে রান্না শিখিয়ে দাও না! কতো সময়ে দরকার হ'তে পারে।

তারপর রান্নাঘরের চৌকাঠে ব'সে দিলীপ নানা রাজ্যের নতুন-নতুন কথায় সীতাকে মশগুল ক'রে তোলে। সীতা বলে,—এই গরমে কেন এখানে ব'সে আছ? মাঠে যাও না হাওয়া খেতে।

—তুমিই ত' মাঠ!

সীতা হাতের খুন্তি নিয়ে তেড়ে আসে : মারবো এই মাথায়?

দিলীপ হেসে ওঠে, বলে,—লাইট্ নেই, নইলে অমনি পোজ-এ তোমার একটা ফটো তুলতাম।

রাত্রের খাওয়া সেরে নটার সময় পুরন্দর বেরিয়ে গেলে সীতার হাতে আর কোনো কাজ থাকে না। দিলীপকে ঐ সঙ্গেই সে খাইয়ে দেয়। বলে,—বারে-বারে পারি না বাপু, এক সঙ্গে সেরে নাও।

পুরন্দর বলে,—তুমিও এই সঙ্গে ব'সে যাও না। যদি বলো ত' মাইনে পেলে একটা টেব্‌ল কিনি, তিন জনে মুখোমুখি ব'সে খাওয়া যাবে।

সীতা বলে,—দিন-দিন তোমাদের বুদ্ধি যেমন খুলছে! পুরুষদের আগে না খাইয়ে মেয়েরা একসঙ্গে ব'সে গিলবে—মেয়েদের তোমরা এমন হেনস্তা করো কেন?

এই কথার সূত্র ধ'রে দিলীপ বললে,—দাদাকে আগে খাইয়ে দিলেই ত' তোমার পাতিব্রত্য অক্ষুণ্ণ রইলো! ও-সঙ্গে মিছিমিছি আমাকে টানো কেন? আমি খাবো তোমার সঙ্গে! অতো আগে আমার খিদে পায় না।

মুখ গোমরা ক'রে সীতা বললে,—বিকেলে বাড়ি ব'সে না থেকে মাঠে খানিক ছুটোছুটি ক'রে এসো,—ঠিক খিদে পাবে।

তারপর খাওয়া, রান্নাঘর নিকোনো, যাবতীয় গৃহকর্ম সেরে সীতা শুতে যায়। ঘরটা পেরিয়ে যেতেই দিলীপ মরিয়ার মতো ডেকে উঠলো : বৌদি, শোন, শোন, বড়ো মজার খবর।

সীতাকে অগত্যা দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে হয়; বলে,—কী?

—আগে এসোই না এদিকে। বোস চেয়ারটায়।

—তোমার খবর কী আগে বলো? সীতা চেয়ারে গিয়ে বসলে।

চুপচাপ।

—খবর তোমাকে নিতান্তই একটা বলতে হবে? দাবা খেলতে জানো, বৌদি?

—না।

—হুইষ্ট্?

—না।

—প্রুফ-দেখা শিখবে?

—দরকার?

—আমার একটা লেখা শুনবে? মেয়েদের আক্রমণ ক'রে একটা লেখা। একটা জবাব অনায়াসে তৈরি করতে পারো কিন্তু।

—না। ও-লেখায় আমার শ্রদ্ধা নেই।

—বেশ, ঠিক হয়েছে, তোমার বাপের বাড়ির গল্প বলো তা'লে।

—সে হবে। তোমার খবরটা কী আগে বলো—আমার ঘুম পাচ্ছে।

—ও! হ্যাঁ, খবরটা হচ্ছে এই,—কী-রকম খবর তুমি শুনতে চাও? রাজনৈতিক না অবনৈতিক?

—কী বললে?—অবৈতনিক?

—হ্যাঁ, অবৈতনিক খবর।

—সে কী রকম?

—মনে হচ্ছে যে-খবরের জন্যে আমাকে কিছু দাম দেবে না।

—যেমন?

—যেমন ধরো যদি বলি, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে।

— আবার ফাজলেমো!

—একটা সিগারেট খাবে? খাও না। কী হয় খেলে? উনুনের ধোঁয়া ত' আর কম খাচ্ছ না। হোয়াইট্-টিপড্ আঙুলে ধ'রে কর্ক-টিপড্ সিগারেট খাবে।

—কান মলে দেব। ব'লে সীতা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো। দিলীপ উঠলো হেসে। তার পরেই সে গুন গুন ক'রে গান ধরলো।

ও-ঘর থেকে সীতা নালিশ ক'রে উঠলো: অমন গান করলে ঘুমুতে পারে নি কি কেউ?

এ-ঘর থেকে উত্তর হয়: সুর ঠিক হচ্ছে না? কান মলে দেবে নাকি?

—পড়তে পারো না?

— পড়ি ত' আমি আরো চেঁচিয়ে। গানেই বরং তোমার ঘুম আগে আসবে।

সীতা আর কথা কইলো না, দিলীপও হঠাৎ চুপ ক'রে গেলো।

খানিক বাদে সীতা শুধোল: ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

—না। তুমিও জেগে? গান গাইতে বলছ?

—না। করছ কী?

—কবিতা লিখছি।

—কবিতা? কিসের কবিতা?

—এই ঘুম-না-আস্‌বার কবিতা। কবিতার সঙ্গে তোমার নামের খুব ভালো মিল হয়, বৌদি। তোমার বাবার নাম কী? তা'লে 'দুহিতা'র সঙ্গেও একটা মিল দিতে পারি।

—শুনতে পাচ্ছি না।

—কাল দেখতে পাবে। কান-মলা একটা কপালে আছে দেখছি।

আট

খর রৌদ্র

কলে জল আসতে-আসতেই পুরন্দর ফিরে আসে। গায়ের চামড়াটা স্নিগ্ধ হয় বটে, কিন্তু রক্তে লুকিয়ে থাকে সেই উত্তেজনা যা একমাত্র স্বল্প স্নানে ও নিদ্রায়, আহারে ও খাটতে পারবার সুখে তৃপ্ত হয় না। উচ্ছৃঙ্খল সমুদ্রের ঢেউয়ে সাঁতার কাটতে পারলে, আকাশব্যাপী উদ্দাম ঝড়ের মধ্যে পাখা মেলে দিতে পারলে যেন তার এই উত্তেজনার খানিকটা নিবৃত্তি হ'ত। ইদানিং সে যেন বড্ডো বেশি জুড়িয়ে এসেছে। জীবনে একটা সঙ্ঘর্ষ না ঘটলে সে আর বাঁচবে না—এমন একটা বিপুল সঙ্ঘর্ষ চাই যাতে তার নিত্যকার এই কুৎসিত মূর্ত্তিটা ভেঙে গিয়ে আরেকটা রূপ আত্মপ্রকাশ করবে। এই নিয়তপরিমিত দিন-রাত্রির জগতে নিষ্ফল কামনার আবর্ত্তে আলোড়িত হ'তে-হ'তে আর সে নিজেকে ক্ষয় করতে পারে না। কোথায় সে আশ্রয় পাবে? আত্মার এই নির্জ্জনতা তার ঘুচবে কবে? মনে হয় প্রকাণ্ড একটা অমনিবাস কোটি-কোটি যাত্রী নিয়ে তীর বেগে ছুটে চলেছে—সে-ই শুধু ঐ বাস ড্রাইভার-এর মতো নিরালা—সঙ্গে থাকলেও এই যাত্রার আনন্দে তার ভাগ নেই।

স্নান ক'রে গরম এক পেয়ালা চা খেয়ে সাব-এডিটিং সম্বন্ধে খানিকক্ষণ একটা বই পড়ে। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় পাটি বিছিয়ে শুতে না শুতেই ঘুম!

এই ঘুমের মধ্যেই কখন সে টের পায় সীতাও আলগোছে দূরে স'রে শুয়ে পড়লো।

পুরন্দর পাশ ফিরে বললে,—দিলীপ চ'লে গেছে কলেজে?

—ওমা! তুমি ঘুমোও নি?

—ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি পাশে এসে শুতেই—

—না, না, সে কী কথা! আমি নিচে নেমে শুচ্ছি।

—কেন, এইখেনে জায়গা হচ্ছে না?

—ছাড়ো, যা গরম!

—দিলীপ কলেজ গেছে?

—কখন!

—এখন ক'টা?

—প্রায় একটা।

—খানিকক্ষণ ঘুমিয়েছি তা'লে। কাজ সেরে আসতে তোমার এতো দেরি হয় কেন?

—কই আর হলো! অমনি ত' জেগে উঠলে।

—জেগে না উঠলে কী বা করতে তুমি? ঘুমুতে ত'? দিলীপ নেই যে গল্প করবে।

—হ্যাঁ, ভালো কথা। ঠাকুরপোর বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করো।

—কেন?

—বয়েস ত' হলো। তা ছাড়া লুকিয়ে-লুকিয়ে খালি মেয়েদের ফটো তোলে। বারুণী-স্নানের দিনে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে এক বাক্স ছবি তুলে এনেছে। যদি দেখ—মাগো!

—লুকিয়ে তোমারো একটা ফটো তোলে নি? দুপুরে ত' তুমি দরজা খুলে রেখে ঘুমাও। দেখাও না।

—মুখে যে তোমার কিছুই আজকাল বাধে না।

—দেখ না ওর ড্রয়ারটা ঘেঁটে—বেরোতে পারে দু' একটা। দোষ কী, ভালোই ত'! ফোটো-তোলাটাও একটা বড়ো বিদ্যে।

—তোমারই ভাই ত'—বিদ্বান হবে না কেন?

কিন্তু সীতা কথায় বিরক্তি দেখালেও নিচে নেমে আর শুতে পারে না। স্বামীর বুকের মধ্যে ভয়ে-ভয়ে মুখ গুঁজে বলে,—এবারে ঘুমুও, আর জাগে না। শরীর খা'লে যাবে।

পুরন্দর সীতাকে শীতের রাতে গরম গাত্রবস্ত্রের মতো দেহের সঙ্গে ঘনতর সংস্পর্শে জড়িয়ে নেয়; বলে,—দিনই আমার রাত।

তার পরে প্রথম তার ঠোঁটে, পরে চিবুকের নিচে, বুকের অনাবৃত অংশে—শেষে তুলোর মতো নরম গালে, মুদ্রিত অপরাজিতার মতো বোঁজা চোখে, বাহুতে, চুলে, ঠোঁট উত্তীর্ণ হ'য়ে মুখে পুরন্দর সীতাকে অসংখ্য চুমু খেতে লাগলো। রাস্তা-ঘাট নির্জ্জন, দুপুরের রোদে ধুলোর ঝড় উঠেছে—রুদ্ধ জানলা দরজায় ঘরের মধ্যে কৃত্রিম অন্ধকার। দুই হাতে সমস্ত বাধা-বন্ধন ছিন্ন করবার চেষ্টা করতে-করতে পুরন্দর চুপি-চুপি ব'লে উঠলো: সীতা, সাড়া দাও!

একটা বন্য পশু দাঁতে কামড়ে এক অসহায় শিশুকে গভীর অরণ্যে টেনে নিয়ে চলেছে। শিশুর আর সে-জ্ঞান নেই, ম'রেও সে ভাবছে সে বুঝি তার মায়ের কোলে শুয়ে।

পুরন্দর তার দুই কাঁধ ধ'রে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বললে,—সীতা, জাগো। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

নেবানো বাতির মতো সীতা স্তিমিত হ'য়ে আসে। দুর্দ্দান্ত ঝড়ের মুখে

শুকনো পাতার মতো সে উড়ে চলে। অবগাহন করতে গিয়ে শরীরের সমস্ত ভার হারিয়ে অতল সমুদ্রের জলে সে ডুবে যায়।

নয়

প্রয়োজনের অতিরিক্ত

মাস না পুরুতেই দৈনিক খরচ চালাবার জন্যে আপিস থেকে পুরন্দর অগ্রিম কিছু টাকা আনলে। দশ টাকার তিনখানা নোট সীতা হাত পেতে গ্রহণ করলে। দৃশ্যটা একাঙ্ক নাটিকায় গানের অবতারণার মতো পুরন্দরের কাছে কেমন অদ্ভুত ঠেকলো। তবু উপায় নেই—এ নিয়েই মানিয়ে নিতে হবে। প্রকৃতির পরিহাস ত' এমনি নির্লজ্জ।

পুরন্দর বললে,—ওর থেকে একটা আমাকে দাও।

—যাও, মাসকাবারি জিনিসগুলো নিয়ে এসো। ফর্দ আমি ক'রে রেখেছি।

—দিলীপকে পাঠাও দয়া ক'রে। বৌদির আজ্ঞাবহন করতে লক্ষ্মণের চেয়েও সে আগে চলে।

—তবে এই টাকা নিয়ে তুমি কী করবে? বই কিনবে ফের? অতগুলি যে সেদিন কিনে আনলে ক'পাতা পড়লে শুনি? ও-বইয়ে একজামিন্ পাশ ত' আর করতে হবে না—তাই। পাবে না।

—আমি ত' একখানা নোট অনায়াসে পকেটে রেখে বাকি দু'টো তোমাকে দিতে পারতাম!

—তুমি আমাকেও ঠকাবে নাকি? নাও তোমার টাকা—চাইনে। বইর দোকান করো গে।

—না, না, বই নয়, সীতা। বায়স্কোপ দেখবো।

—আপিস নেই?

—আজ রবিবার না?

—দশ টাকাই উড়োবে নাকি?

—পাগল! হয়ত সব মিলে টাকা খানেক।

—এই অবস্থায় তোমার টাকা খানেকও অপব্যয় করা সাজে না। এনামেল্-এর একটা ডেক্‌চি কিনলে কাজ হয়।

—প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু ব্যয় করাই ত' মনুষ্যত্ব। আমরা নইলে সভ্য কিসে?

—স্ত্রীকে দু'বেলা খাটিয়ে নিচ্ছ—একটু কোথাও বেরুতে পাচ্ছি না—সভ্যতার কী নমুনা! একটা সেমিজ্‌ও আমার আস্ত নেই জানো?

—বায়স্কোপ থেকে ঘুরে আসি,—ফর্দ্দ ক'রে রেখো, সব শুনবো।

—চোখ মেলে দেখতে পারো না কিছু?

—সব জিনিসই কি চোখ মেলে দেখতে পাওয়া যায়? আমাকেই কি তুমি দেখতে পাচ্ছ? এই যে রাত-দিন খেটে মরছি, কোথাও এতটুকু ভুলে থাকবার পথ নেই—

—নাও, নাও, যতো খুসি পথ করো।

—তুমিও যাবে আমার সঙ্গে? চলো না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তোমার ঐ নীল সাড়িটা প'রে নাও না।

—থাক্, ঢের হয়েছে। আমি রান্নাঘরে গিয়ে ধোঁয়ার সাড়ি পরছি।

—তোমার বদান্যতায় খুসি হ'লাম। দিলীপকে তা'লে আজ বেরোতে দিয়ো না। বায়স্কোপের চেয়ে ঢের-ঢের চমকপ্রদ ছবি তোমাকে সে দেখাতে পারবে।

—যাও, যাও, বেরোও এবার।

পুরন্দর প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্য একটু সাজগোজ করলে। কোঁচার পাড়ে চুনোট দিতে দিতে সে ভাবতে লাগলো—মোট এক টাকা তার বরাদ্দ। আট-আনায় ভিড় না হ'লে বড়ো জোর এক প্যাকেট নরম গোল্‌ড্‌ ফ্লেইক্, নয়ত শিশুর আহার্য্য—একটা জোলো আইস্-ক্রিম্। ভাবতে লাগলো—এর আগে যৌবন যখন এর চেয়ে ঢের বেশি চেতনাময়, ঢের বেশি শাণিত, ঢের বেশি স্পষ্ট ছিলো—সময় ছিলো বিস্তৃত ও আয়ু ছিলো অফুরান, তখন টাকা সে কী ক'রে উড়িয়েছে? ঠিক কিছু একটা সে হিসেব পেলো না। সিনেমা দেখেছে বটে বহু, কিন্তু দেখিয়েওছে প্রচুর। যতো খেয়েছে, তার চেয়ে বেশি সে খাইয়েছে—যতো বেড়িয়েছে তার চেয়ে সঙ্গী নিয়েছে শতগুণ। একা-একা কোনো জিনিস ভোগ করতে তার মন উঠতো না, অন্য রসগ্রাহীদের সম্ভোগ করবার সুযোগ না দিলে নিজের স্বাদশক্তির তীব্রতা সে পরিমাপ করতে পারতো না কখনো। নিজের উত্তেজনা পরের মধ্যে সংক্রামিত করতে না পারলে সেই উত্তেজনা বহন করবার সুখ নেই। তাই সীতা যখন অন্তঃপুরের নির্জ্জনতায় এসে পুরন্দরকে নীরবে ডাকলে, তখন তার মাঝে বহুল-বৈচিত্র্যময় অজস্রতার উপাদান না পেয়ে পুরন্দর রইলো উদাসীন হ'য়ে। অথচ, নিজেই সে আজ কতো একলা, হোলির দিনের আবিরের ছিটের মতো বন্ধুরা কখন মিলিয়ে গেছে—সে-একাকীত্বে নিজেকে তার অত্যন্ত দুর্ব্বল লাগে—মনে কোথায় একটু বৈরাগ্যের বা উচ্ছৃঙ্খলতার নেশা ধরে।

কিন্তু আজ এই বায়স্কোপ যাবার বিকেলটুকু ঘিরে একটা সূক্ষ্ম উদ্দীপনা পুরন্দরকে হঠাৎ শারীরিক বেদনার তাড়নে তীব্র জ্বরের মতো আচ্ছন্ন ক'রে ধরলো।

চৌরঙ্গি, চতুর্দ্দিকে গতিপ্রাবল্যের ঝড়, রঙ ও লাস্য, অন্ধকারের পিচ্‌কিরিতে আকাশ-ভরা তারার চুম্‌কির মতো গতির জোয়ারে টুকরো-টুকরো কলহাস্য, টুকরো-টুকরো কথা, টুকরো-টুকরো চাউনি,—মোটর আর বাস্‌, ওঠা আর নামা,—আনন্দময় উদ্দেশহীনতা—এবং তারই খরস্রোতে পুরন্দর দিলো নিজেকে ছেড়ে। নোট ভাঙিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনলে—বাকি খুচরো টাকাগুলি পকেটে এক সঙ্গে কথা কইছে—কে কোথায় যাবে তা'র কথা। কেউ যাবে মুদির দোকানে, কেউ বা কয়লার—তার জন্যে পুরন্দর মাথা ঘামায় না। টাকাগুলো তারই পকেটে, খরচ সে না করলেও করতে পারে—এমনি একটা অহঙ্কারে সে ভারি মজা পাচ্ছে।

পকেট বাজিয়ে অতিব্যস্ততার ভান ক'রে সে অবশেষে এলো কি না 'প্ল্যাজা'-র বক্স-অফিস-এ। বাইরের বিজ্ঞাপন দেখে মনে হলো ফিলম্‌টা অতিমাত্রায় জমজমাট্‌ হবে—একসঙ্গে প্রায় দু' ডজন ক্যাবারেট্‌-মেয়ে শূন্যে তাদের এক ঝাঁক পা বকের পাখার মতো লীলায়িত ক'রে দিয়েছে।

দশ

এপ্রিলের দিন

বক্স-অফিস-এর সামনে দাঁড়িয়ে একটি য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌ মেয়ে ষ্টল-এর একখানা টিকিট কাটছে। দেয়াল-জোড়া বিজ্ঞাপনের ছবি যতোই চোখ-ঝল্‌সানো হোক্‌ না, ততো ভিড় হয় নি। মেয়েটি টিকিট কেটে তাড়াতাড়ি স'রে আসতে আরেকটু হ'লে পুরন্দরের গায়ের সঙ্গে লেগে যেতো; অবলীলাক্রমে সামলে নিয়ে সে বললে,—Sorry.

এপ্রিলের দিনটির মতো লঘু, ব্লন্‌ড্‌ মেয়ে, ক্রিম্‌-রঙের পাৎলা ঝলমলে ফ্রক্‌ গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে রয়েছে, আইভরির স্তম্ভের মতো নিটোল নিখুঁত দু'টি বাহু—দেহের ভার সইতে পারছে না এমন দু'টি দুর্ব্বল চক্‌চকে জুতোর ওপর দুটি লীলাঘন পা—চুলে বিলিতি চেষ্ট্‌নাট-এর ফিকে আভাস—মেয়েটি এপ্রিলের লঘু দিনটির মতো পুরন্দরের সামনে দিয়ে তর্‌তর্‌ ক'রে চ'লে গেলো।

তার পরের টিকিটটাই পড়লো পুরন্দরের হাতে। মেয়েটির পাশেই তার জায়গা।

ছোট হাউস, উপস্থিতি স্বল্প। পাশাপাশি দুটি সিট্‌-এ পুরন্দর আর সেই

মেয়েটি। ছবি আরম্ভ হ'তে কিছু এখনো দেরি আছে। ঘরটি এতো ছোট ও গরম যে পুরন্দরের মনে হচ্ছিল মেয়েটির সঙ্গে কেমন যেন একটা তার নৈকট্যের সূচনা হয়েছে। পুরন্দরের হৃৎপিণ্ড গলার কাছে এসে ধুক্‌ধুক্ করছে—একটা-কোনো কথা সে পাড়তে পারছে না। এ-ক্ষেত্রে কথা বলায় নিতান্তই অসৌজন্য,—তবু মেয়েটির বসবার ভঙ্গিতে, ব্যাগ থেকে আয়না বের ক'রে মুখে-গালে পাউডার-ঘসার আস্পর্দ্ধায়, বাঁ পায়ের উপর ডান পা তুলে দিয়ে থেকে-থেকে জুতো দোলাবার ঘটায়, ঘাড়ের ওপর হাত তুলে বিন্যস্ত চুল বারে-বারে অগোছালো এবং অগোছালো চুল বারে-বারে বিন্যস্ত করবার আয়াসে তার চারদিকে এমন একটা চাপল্য ও শিথিলতা এসেছে যে, কথা নেহাৎ বললে কোনো কটু প্রত্যুত্তর পাবার সম্ভাবনা খুব কম ব'লেই পুরন্দরের মনে হচ্ছিল। মেয়েটি রুমাল দিয়ে চোখের পাতার নিচেকার পাউডার মুছছে ও আড় চোখে পার্শ্ববর্ত্তী পুরন্দরকে লক্ষ্য করছে। সেই দৃষ্টির মাঝে শাঠ্যের চেয়ে কৌতূহল বেশি, বিরক্তি ত' নয়ই, বরং যেন একটু করুণার আভাস! পুরন্দরের গায়ে ঘাম দিলো ও ভেতরে-ভেতরে সে অসহিষ্ণু ও বিমর্ষ হ'তে সুরু করলে।

মেয়েটির হাত থেকে ছোট রুমালটি পিছ্‌লে মেঝেয় গেলো প'ড়ে। পুরন্দর নিচু হ'য়ে সে-রুমাল তক্ষুনি তুলে দিলে। মেয়েটি হেসে বললে,—থ্যাঙ্ক।

কিছু বলবার আগেই আলো গেলো নিবে, পর্দ্দা উঠ্‌লো গান গেয়ে, বাজ্‌না বাজিয়ে।

তারপর ছবি হলো সুরু।

খানিক বাদেই নাক কুঁচ্‌কে মেয়েটি বললে,—রট্। তোমার কেমন লাগছে?

পুরন্দর বুঝলে যে তাকেই সম্বোধন ক'রে কথা বলা হয়েছে—এবং বুঝতে-না-বুঝতেই তার ঘাড়ের ছোট ছোট চুলগুলি কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো।

পুরন্দর বললে,—অসাধারণ! ব'লে সেও হাসলে।

মেয়েটি পরের সপ্তাহের প্রোগ্রামটা দিয়ে গলার কাছে একটু-একটু হাওয়া করতে-করতে বললে,—ফিল্‌ম-গোয়ার্সদের রুচি আজকাল অত্যন্ত নেমে গেছে—তোমার কী মত?

ব'লে প্রোগ্রামে মুখের ডান-পাশটা একটু ঢেকে মেয়েটি অন্ধকারে তারই দিকে বাঁ-পাশটা ঠিক বাড়িয়ে দিলো না—অতিমাত্রায় স্পষ্ট ক'রে ধরলে। গালের অংশটুকু যে পাউডার-পাফ্-এর মতো নরম, না-ছুঁয়েও পুরন্দর তা বুঝতে পারলো।

পুরন্দর বললে,—তা আমাকে-তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি।

মেয়েটি শব্দ ক'রে হাসলে না বটে, কিন্তু স্যাটিন্-এর মতো তার ঝক্‌ঝকে মোলায়েম চামড়ার নিচে ছোট ছোট হাসির ঢেউ নীরবে দোল খেতে লাগলো।

মেয়েটি চেয়ারের গদিতে একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে বললে,—তুমি বুঝি প্রায়ই সিনেমা দেখ?

চেয়ারের ওপর পুরন্দরো তার দেহভার খানিকটা অসমান ক'রে বললে,—**Rather.**

প্রোগ্রামটা জোরে চালিয়ে হাওয়া করবার চেষ্টায় মেয়েটি বললে—কী গরম!

পুরন্দর বললে,—ভয়ানক। ব'লে পকেট থেকে রুমাল বের করে সে ঘাড়, গলা ও গালের ওপর থাবড়াতে লাগলো।

তার পরে আর কথা নেই।

পর্দা থেকে চোখ ফিরিয়ে পুরন্দর অন্ধকারে মেয়েটির সান্নিধ্যের তাপ অনুভব করছে। ছবিতে মেয়েটিরো যে মন বসছে না তা ছবির অর্থানুসরণ করার মতো মোটেই কঠিন নয়। এবং মেয়েটির মন যে পুরন্দরের পরেই আকৃষ্ট সেটাও ঘরের এই অন্ধকারের মতোই স্পষ্ট।

মেয়েটি সেই জাতের মেম-সাহেব নয় যা'র কাছে জাত-জিনিসটা আলাপের পক্ষে একটা বাধা হবে। মানুষের চামড়ার ওপরে সূর্য্যের তাপ প্রখর কি মৃদু, এবং তার ফলে সেই চামড়া তামাটে কি রক্তাভ, সেই সম্বন্ধে মেয়েটির কুসংস্কারের কোন সার্থকতা নেই। বরং ওর এমনি একটা স্বভাবগত বদান্যতা ছিলো যে, বাঙালি যুবকের চামড়ার বিবর্ণতা ও পোষাকের ঢিলেঢোলা অপরিপাট্যে মুগ্ধ না হ'য়েও পারতো না। বিশেষ ক'রে পাশে যে যুবকটি ব'সে আছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বলদৃপ্ত সৌষ্ঠবে, গলার দরাজ আওয়াজে, নিজেকে বেষ্টন ক'রে গাঢ় একটি আবহাওয়া তৈরি করবার ক্ষমতায়, সব চেয়ে পুরু ঠোঁট ও তেজী চাউনির বিহ্বলতায় মেয়েটি তার প্রতি একটু পক্ষপাতী হ'য়ে উঠ্‌লো।

তার পরে আর কোনো কথা নেই।

বায়স্কোপ না দেখলেও দেখতে-দেখতে সময় গেলো ফুরিয়ে। এলো ইন্‌টারভেল্।

প্রচুর আলোয় পুরন্দর মেয়েটির দিকে এবার তাকালো। তার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ ক'রে দৃষ্টির বন্যায় তাকে অভিভূত ক'রে ফেল্‌লে। সে দৃষ্টির এতটুকু উত্তরো অবশ্যি মেয়েটির চোখে জাগ্‌লো না, এমন একখানা মুখ ক'রে রইলো যেন তার পক্ষে এখন প্রোগ্রাম-পড়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কাজ নেই। বয় সামনে দিয়ে চকোলেট-

আইস্‌ক্রিম্‌-এর ট্রেটা ফিরি ক'রে নিয়ে বেড়ায়—মেয়েটির পাশে খানিক দাঁড়ালোও কিন্তু প্রোগ্রাম-পড়া ছাড়া পৃথিবীতে মেয়েটির আর দ্বিতীয় খাদ্য নেই।

পুরন্দর সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে যাবার ভাব দেখালে।

অগত্যা মেয়েটিকে জায়গা ছেড়ে সিটটাকে দুম্‌ড়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো।

বাইরে এসে পুরন্দর দেখলে খোলা ছোট মাঠে সোডা-ফাউণ্টেন্‌-এর তলায় অনেক সব রঙের তুফান, ফুলের হাট—রাস্তায় ত' কথাই নেই। পাশে ফির্‌পোর হোটেলে ব্যাণ্ড্‌ বাজছে। অনেক পা, অনেক মুখ, অনেক চুল সে দেখলে, কিন্তু যে-মেয়েটি সিনেমা-দর্শকদের রুচির অধোগতি নিয়ে তার সঙ্গে খানিক আগে একটু আলোচনা করেছে তার মতো জীবন্ত, তার মতো নিবিড়াভ, তার মতো গতিশীল মুখ সে একটিও দেখতে পারলো না। দু'টি মাত্র অযাচিত কথায় মেয়েটি তার লাবণ্যকে আরো মধুর ক'রে এনেছে।

ইন্‌টার্‌ভেল্‌-এর পরে পুরন্দর যখন ঘরে এসে ঢুকলো তখন ফের অন্ধকার হ'য়ে গেছে। নিজের সিট-এ যাবার জন্যে পুরন্দর মেয়েটির পাশে প্যাসেজ্‌-এর ওপর দাঁড়িয়ে রইলো।

আশা ছিলো মেয়েটি এবারো সোজা উঠে দাঁড়িয়ে যাবার রাস্তার সঙ্কীর্ণতাটা প্রশস্ততর ক'রে দেবে। কিন্তু না উঠে হাঁটু দুটোকে গ্রেটা গার্বোর ভঙ্গিতে তেরছা ক'রে একটু দুমড়ে মেয়েটি বললে,—চ'লে এসো।

পুরন্দর তবু ইতস্তত করছে দেখে মেয়েটি অস্থির হ'য়ে কোথায় বন্ধুতার জোর দিয়ে ফের বললে,—চ'লে এসো।

পুরন্দর তার সিট-এ এসে বসতেই মেয়েটি বললে,—কোথায় গেছলে?

প্রায় যুদ্ধজয়ী বীরের মুখভঙ্গি ক'রে পুরন্দর বললে,—একটা ষ্টাউট্‌ খেয়ে এলাম।

—তাই তোমার পা অমন টল্‌ছিলো! একটাতেই এমন!

পুরন্দর চোখে তীক্ষ্ণ কুটিলতা এনে বললে,—পা টলবে না কেন বলো? ষ্টাউট্‌-এর সঙ্গে শেষকালে যে আরেকটা জিনিস পাঞ্চ্‌ ক'রে খেতে হলো।

মেয়েটি বললে,—কি?

—তোমার স্পর্শ।

এই কথাটায় এমন একটা ঔজ্জ্বল্য ছিলো যে মেয়েটি ফ্রক-এর ধারটা হাঁটুর ওপর নামাবার অনর্থক চেষ্টা ক'রে, কানের কাছের চুলগুলি নিয়ে হঠাৎ একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। বললে,—নটার আগে **appointment** ক'রে না রাখলে আমি এখুনি বেরিয়ে পড়তাম,—বাড়ি চ'লে যেতাম। এ-ছবি ভারি বিরক্তিকর।

—ভয়ানক! পুরন্দর বললে,—কোথায় তোমার বাড়ি!

একই হাতলের ওপর দু'জনের কনুই এসে ঠেকেছে। তবু গলায় কপট রাগ মিশিয়ে মেয়েটি বললে,—কী সাহস তোমার! বাড়ির ঠিকানা চাও।

—না দেবে ত' চাই না। কোথায় তোমার দেখা পেতে পারি?

—কেন?

—আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া এই ফিল্‌ম-এর গল্প বলার মতোই শক্ত।

—শক্ত ত' ফিলম্ দেখতে এসেছ কেন?

—ঠিক ফিলম্ দেখতেই কি এসেছি?

—তবে কেন এসেছ?

—সত্যি বলবো?

—বলো।

—রাগ করবে না?

—রাগ করলে ত' স'রেই বস্‌তাম। সিট আরো অনেক খালি প'ড়ে আছে।

—সেই জন্যেই ত' বলছি, রাগ করবে না?

—না। বলো।

—আমার মনে হচ্ছে,—ও কি বলে,—হ্যাঁ,—তোমাকেই দেখতে এসেছি। Rather দেখা পেতে। তা তুমি ত' বলছ নটায় তোমার appointment।

মেয়েটি গুপ্তচরের মতো আবছা গলায় বললে,—আস্তে কথা বলো।

পুরন্দর বললে,—Sorry.

মেয়েটি স্বর আরো নামিয়ে দিলে: না, আজ হবে না।

—কী হবে না?

—থামো।

—থাম্‌বো, তোমার বাড়ির ঠিকানাটা যদি দাও।

—বাড়ি নেই।

—তবে কোনো রাস্তার মোড়? সিনেমা?

—না, রুম্‌স্। ব'লে মেয়েটি তার ব্যাগ খুলে ছোট আরেকটি ব্যাগ বের করলো। তার ভেতর থেকে বের করলো একখানা কার্ড। সেই কার্ডটা আলগোছে পুরন্দরের কোলে ছুঁড়ে ফেলে মেয়েটি ফের ফ্রক্ টানলে, চুলে হাত দিলে ও চেয়ারের হাতল থেকে কনুইটা সরিয়ে নিয়ে মুখ গম্ভীর ক'রে ব'সে রইলো। বললে,—ছবি দেখ।

পুরন্দর কার্ডটা পকেটে পুরে বললে,—ছবি না আর কিছু?

—**Please stop.**

অর্থাৎ সম্প্রতি আর কথা বলবার দরকার নেই। মেয়েটি আর সে দু'জনেই পরীক্ষায় পাশ করেছে—এ-নিয়ে এখন আর মাতামাতি করার মানে নেই। চুক্তিপত্র তৈরি হ'য়ে গেছে, এখন স্বাক্ষরটা শুধু বাকি। সে একদিন হ'লেই হবে।

তবু পুরন্দর গলা নামিয়ে বললে,—কবে গেলে তোমাকে পাবো?

মেয়েটি আর কথা কয় না।

—যে কোনো দিন?

—না, যে কোনো রবিবার।

—ক'টার সময়?

মেয়েটি আবার চুপ।

—যে কোনো সময়?

—না, সাড়ে আটটার পর।

—**Okay.** ব'লে পুরন্দরো ছবি দেখতে সুরু করলে।

তারপর বায়স্কোপ গেলো ভেঙে। এবং পার্শ্ববর্তী পুরন্দরের জন্য আগে রাস্তা ক'রে দেবার আর কোনো দরকার নেই ব'লে মেয়েটি আগেই স'রে পড়লো। ভিড়ের মধ্যে গেলো মিশে। চকিতে পুরন্দর আবার তাকে দেখলে—তার সেই গা-লেপটানো ক্রিম-রঙের ফ্রক্, ফিকে চেষ্ট্‌নাট্-চুল, লীলাঘন পুরন্ত পা—আর সেই দু'টি চঞ্চল অথচ উদাসীন ভুরু, যা দেখলে মনে হয় সব সময়েই সে একটা রোমাঞ্চময় ভাবের মধ্যে বাস করছে! ঘরের অন্ধকারে পুরন্দর এতোক্ষণ বুঝি স্বপ্নে মদ খাচ্ছিল—কিন্তু পকেট হাতড়ে টের পেয়ে আশ্চর্য্য হলো সেই কার্ডটা এখনো আছে। এবং আরো আশ্চর্য্য হলো যখন রাস্তায় নেমে আলোয় সে দেখতে পেলো তাতে মেয়ের একটি নাম ও রাস্তার নাম আর নম্বর দেওয়া আছে। ইটালিক্‌স্-এ নাম ও লং-প্রাইমার-এ ঠিকানা।

মেয়েটি আর নেই—কখন চ'লে গেছে। ঠিক এপ্রিলের একটি হাল্কা দিনের মতো।

এগারো

না, ও যুগাক্

কী-একটা উগ্র ঝোঁকে প'ড়ে পুরন্দর রাস্তা ধ'রে ক্রমাগত হাঁটতে লাগলো। তার পরে কী ভেবে আবার হঠাৎ বাস্ নিলে। এবং হোটেলে ঢুকে বুদ্বুদবিহ্বল রঙিন গ্লাশে চুমুক দেবার কথা ভুলে গিয়ে সটান বাড়ি ফিরে এলো।

শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। খাটের উপর সীতার শরীর আধো-শোয়ার ভঙ্গিতে এলানো, আলো থেকে চোখ বাঁচাবার জন্যে একটা খবরের কাগজ তুলে মুখের আধখানায় একটু ছায়া করেছে। সামনে একটা ক্যান্‌ভাসের ইজিচেয়ারে দিলীপ পা তুলে প্রায় আসন-পিঁড়ি হ'য়ে ব'সে। তার বসবার এই অনায়াস ভঙ্গিটা দেখে সহজেই মনে হয় যে, সে অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে আছে ও দাদাকে আসতে দেখে হঠাৎ সে থাম্‌লো বটে, কিন্তু তার উদ্দীপ্ত বাক্যচ্ছটার আভা এখনো তার মুখে ছড়িয়ে আছে। ঘরে নিকোটিন্‌-এর একটা চাপা গন্ধ পেয়ে মনে হলো এই মাত্র সে সিগারেট টান্‌ছিলো।

পুরন্দরকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সীতা উঠে বসলো ও মাথায় ঘোম্‌টাটা তুলে দিলে। পুরন্দর লক্ষ্য করলে সীতার পরনে ফর্সা মিহি সাড়ি, ব্লাউজটা টগরের রঙের মতো গাঢ় শাদা গরদের বাইরে না বেরুলেও এইটুকু সে সেজেছে। আর এই মাত্র ঘোমটা তার খসা ছিলো ও আধো-শোয়ার নরম ভঙ্গিতে ছিলো খাদের একটা হাল্কা সুরের টান। দৃশ্যটিকে সম্পূর্ণ করেছে দিলীপের অকুণ্ঠ এই উপস্থিতি। পুরন্দর মনে-মনে খুব খুসি হলো বটে।

ঘরটি নতুন এক-পাত পিন্‌-এর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে। যা দু' চারটি জিনিস, সব পরিপাটি ক'রে গোছানো—আল্‌নাটা ভদ্র হয়েছে, স্যুটকেস্‌-এর ওপরে ঢাকনি উঠেছে, বিছানাটা খোলস ছেড়েছে। জুতোয় পড়েছে কালি, আয়নায় পড়েছে স্পিরিট। খুঁটিনাটি জিনিস ক'টিও সীতার আঙুলের ডগার মতো পরিচ্ছন্ন।

কিন্তু সব চেয়ে পরিচ্ছন্ন হচ্ছে সীতা ও দিলীপকে ঘিরে এই স্তব্ধ আবহাওয়াটি।

জামার বোতাম খুল্‌তে-খুল্‌তে পুরন্দর বললে,—রান্না তৈরি ?

সীতা বললে,—কখন। রান্নাবান্না সেরেই ত' ঠাকুরপোর সঙ্গে গল্প করছিলাম।

—তাড়াতাড়ি এসে বাধা দিলাম হয় ত'।

—বাধা বই কি, ওদিকে সব গেলো জুড়িয়ে।

—মাস কাবারি বাজার করিয়েছ ?

—হ্যাঁ। দিলীপ বললে।

সীতা হাত বাড়িয়ে বললে,—কত ফিরলো দাও।

—আট টাকা আট আনা দু' পয়সা। সিনেমায় সামান্য একটু বাবুগিরি করেছি। আর এক প্যাকেট সিগারেট। বাসভাড়া। ব'লে পুরন্দর খালি-প্যাকেটটা পকেট থেকে বের ক'রে জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে বললে,—একেবারে খতম।

—এই তিন ঘণ্টায়ই ? দশটা ক'রে থাকে না ?

—কী করবো বলো—ফিল্ম্‌টা যা boring। কোনো একটা নেশায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে হবে ত' ? কী বল্, দিলীপ ?

দিলীপ হেসে বললে,—কোন্‌টায় গেছ্‌লে ?

—আর বলিস্ নে।

মুখ ভার ক'রে সীতা বললে,—তবে এতো যে সাজগোজ ক'রে ফুর্তি করতে গেলে তা মাঠে মারা গেলো ত' ? খুব হয়েছে। এখন অনুতাপ হচ্ছে ত' ? বেশ হয়েছে।

—অনুতাপ করলে ফের অনুতাপ করতে হয় কেন অনুতাপ করলাম। মনকে আর ক্লান্ত ক'রে লাভ কী! সিগারেট যখন নেই তখন বিড়িই খেতে হবে। যা ত' দিলীপ, দু' পয়সার নিয়ে আয় দিকি।

পয়সা নিয়ে দিলীপ বেরিয়ে গেলো।

এবং সিঁড়িতে ওর জুতোর শব্দ দুর্বল হ'য়ে আসতেই পুরন্দর খাটের উপর ব'সে সীতাকে বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ধরলে। বললে,—তোমাকে কী সুন্দর আজ দেখাচ্ছে।

সীতা নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বললে,—আমাকে, না আমার এই সাজ!

—সাজ ছাড়া নারীর আবার রূপ কী! অন্যের চোখে সুন্দর লাগলেই তুমি আমার চোখে সুন্দরতর।

—এখানে অন্য আবার কে এলো ?

—দিলীপ।

মুখ ভার ক'রে, শরীরে সান্নিধ্যের উত্তাপ কমিয়ে সীতা বললে,—কী যে তুমি বলো সব সময়।

—অন্যায় বলি না। এ ত' খুব ভালোই। আমার কথাকে সহজ ভাবে নিতে পারো না কেন ? আমি বলছি—

—থাক্, আর বলতে হবে না। এখন খেতে চলো।

—দিলীপ আসুক।

দিলীপের না-আসা পর্য্যন্ত—মিনিট সাতেক—মানে, ঘরের সে-আবহাওয়াটি এখনো মিলিয়ে যায় নি ব'লে পুরন্দর আর সীতা বিশেষ ক'রে একটু অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠ্‌লো। পুরন্দর মধুর একটি অবসাদ ভোগ করছে ও সীতা পাচ্ছে নতুন আস্বাদ। কিন্তু রাত ক'রে খাওয়া-দাওয়ার পর পুরন্দর যখন অন্ধকারে ঘরে এসে শুল তখন সেই অন্ধকার ফের ফেনায়িত হ'তে লাগলো। বায়স্কোপের ছবি, আলোর প্রখর

উগ্রতা, অন্ধকারে সেই চাপা কথার উত্তাপ—সমস্ত ঘিরে প্রতীক্ষার একটা তীব্র উন্মাদনা তাকে ক্লান্ত ক'রে ফেলছে। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে এখন রীতিমতো সে বেগ পাচ্ছে। মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে—কিছু যেন সে ঠিক আয়ত্ত করতে পারছে না। অসহিষ্ণু শরীরটাকে তীব্র একটা হাউইয়ের মতো শূন্যে ব্যয় ক'রে দিতে না পারলে তার আর স্বস্তি নেই।

সীতা পাশে এসে শুল। সারা দিনের ক্লান্তির পর এখন তার ঘুম চাই, যেমন পুরন্দরের চাই ক্ষিপ্রতা। স্বামীর স্তিমিত ভঙ্গি ও ঘন-ঘন নিশ্বাস লক্ষ্য ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে সীতা নিশ্চিন্ত হলো। উলটো দিকে মুখ ক'রে নিজেকে সঙ্কুচিত ক'রে স্বামীর উপস্থিতি একটুখানি ভুলতে চেষ্টা করতেই ঘুমে চোখ তার আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো। জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে একটু হাওয়া আসছে। মশারি ফেলা পুরন্দরের বারণ।

খানিক পরেই পুরন্দর পাশ ফিরে বললে,—আমার বেলায় বুঝি এই আটপৌরে শাড়িটা ?

সীতা ভয় পেয়ে ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ভারি গলায় বললে,—সাজগোজ নিয়ে আর পারি না।

—অবশ্য আমি যখন তোমার কাছে একলা তখন নিরাবরণই তোমার সজ্জা হওয়া উচিত। ব'লে সীতাকে সে আকর্ষণ করলে।

অন্ধকার উঠলো ফুঁপিয়ে।

হঠাৎ সমস্ত শরীর পাথরের মতো শক্ত ও স্তব্ধ ক'রে সীতা দুই হাত ছুঁড়ে পুরন্দরকে মারলো এক প্রচণ্ড ধাক্কা। নির্লজ্জতারো একটা সীমা থাকা উচিত—এই একই অভিযোগে পুরন্দরো উঠলো ক্ষেপে। মুহূর্তে তার কী-রকম ক'রে উঠ্‌লো বোঝা কঠিন, পা তুলে লাথি মেরে এক ঝট্‌কায় সীতাকে সে ঠেলে দিলে এবং আঘাতের প্রাবল্যে যতোটা না হোক, অসহ্য অপমানের দুঃখে সীতা মেঝের উপর ছিট্‌কে পড়লো।

তারপর বুক ভেঙে তার নিদারুণ কান্না।

পুরন্দর চুপ ক'রে শুয়ে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সীতার স্বর ক্রমে চড়ছে। তাড়াতাড়ি মেঝেয় নেমে এসে গলা ঝাঁজিয়ে সে ধমকে উঠলো : লজ্জা খালি আমারই একলার নেই, না ? ও-ঘর থেকে দিলীপ শুনতে পাবে না ?

তবু সীতা কান্না থামায় না। দিলীপের নাম শুনে অজানতে কান্না একটু থিতিয়ে আসে।

পুরন্দর বললো,—গলা ছেড়ে চেঁচিয়েই থালি লোকের সহানুভূতি পাওয়া যায় না, বুঝলে ?

সীতা একেবারে থেমে গেলো।

কিন্তু তার এই ভীরুতা এই অপ্রতিবাদ পরাজয়ে পুরন্দরের অস্বস্তিবোধ হ'তে লাগলো। লম্বা-চওড়া একটা তর্ক চালালেও বরং সীতা তার মনুষ্যত্বের কিছু পরিচয় দিতে পারতো। কিন্তু সে কি না বোকার মতো মেঝের উপর মুখ থুবড়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে! কিছুতেই তাকে সচেতন করা যাবে না!

নিঃশব্দতা অসহ্য লাগছে। পুরন্দর নেমে এসে সীতার শিয়রে ব'সে মাথায় হাত রাখলো।

বললে,—উঠে আসবে না ?

আবার তার কান্না।

—চলো।

—আমাকে ছুঁয়ো না তুমি, খবরদার।

—বেশ, ঘুমুবে চলো।

—না।

—সারারাত এইথেনে এমনি প'ড়ে থাকবে ?

সীতার মুখে কথা নেই।

—বেশ, আমিও তবে বসলাম। ব'লে পুরন্দর দেয়ালে পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে ব'সে রইলো।

সীতা তবু নড়লো না।

পুরন্দর তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, কিন্তু সীতা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আরো থানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে ঘুমে সীতার সর্ব্বাঙ্গ বালিশের মতো নরম হ'য়ে আসতেই পুরন্দর তাকে আলগোছে পাঁজা-কোলে ক'রে বিছানায় তুলে আনলে। সীতা আচম্‌কা জেগে উঠে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

পুরন্দর তাকে শুইয়ে দিয়ে বললে,—আমি গো আমি, ভয় নেই।

ঘুমের অন্ধকারে সীতার করুণ মুখ দেখে পুরন্দরের ভারি মায়া করতে লাগলো। না, ও ঘুমাক্‌।

বারো

মাঠ ও হাট

আজ থেকে ফের পুরন্দরের রাতের বেলায় আপিস সুরু ব'লে সীতা হাল্‌কা পায়ে উড়ে-উড়ে হাসিমুখে ঘরের কাজ করে। বিদ্রোহ করে না, অস্বীকার করে না। রাতটা বিস্তৃত একটা স্নেহের মতো তাকে ডুবিয়ে রাখে। বিছানাটা মন্দিরের মতো পবিত্র, জীবন-বীমার মতো নিরাপদ মনে হয়।

সকালে আপিস থেকে এসে পুরন্দর মুখ ধুয়ে স্নান ক'রে চা খেয়ে পড়তে বসে। সে আজকাল ভীষণ খাটে—ঠিক পিঁপড়ের মতো খাটে। আরো পয়সা তার রোজগার করতে হবে। বিকেলের দিকে সে একটা টিউশানি পেয়েছে। তা ছাড়া লিখছেও সে প্রচুর—বম্বের কোন্ একটা কাগজে তার একটা লেখা নিয়েছে। আপিসের ঠিকানায় দাম এসেছে তিরিশ টাকা। তার কিছুটা সীতার হাতে দিতে পারলে ভালো লাগতো বটে, কিন্তু বলা যায় না, পকেটটা একটু ভারি থাকা ভালো।

তারপর খেয়ে-দেয়ে অতি সহজেই তার ঘুম আসে। একেবারে জাগে ঠিক সন্ধ্যায়। সীতার সুনিবিড় উপস্থিতি সে-ঘুমে একচুল চাঞ্চল্য আনতে পারে না। ব্যাপারটা সীতার কাছে যতোটা বিস্ময়ের, তার চেয়ে গভীরতর আরামের। তবু সেদিন সে মুচকে হেসে বললে,—আজকাল যে বড্ড বেশি ঘুমাও।

পুরন্দর নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললে,—না-ঘুমুলে শরীর থাকবে কেন? যা খাটুনি পড়েছে।

—এত খাটো কেন শুধু-শুধু? এই আয়েই ত' আমাদের দিব্যি চলছে। শরীর নষ্ট ক'রে লাভ কী!

—যাক্, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না। এখন এ-ঘর থেকে দয়া ক'রে যাও দিকি।

—বা রে, কোথায় যাবো?

—আরো ত' ঘর আছে।

পড়াতে বেরুবার আগে পুরন্দর বললে,—বিকেলে একটু বেড়িয়ে আসতেও ত' পারো।

—তুমি ত' আর নিয়ে যাবে না।

—নিয়ে যাবার লোকের অভাব কী! দিলীপই ত' পারে। কি রে, দিলীপ, পারিস্ নে?

দিলীপ লাফ দিয়ে এসে বললে,—অনায়াসে। যাবে, বৌদি?

পুরন্দর বললে,—রঙিন সাড়ি প'রে ঘরের মধ্যে বন্ধ হ'য়ে ব'সে না থেকে রাস্তায় ঘুরে এলেই বরং বেশি ভালো লাগবে।

সীতা খেঁকিয়ে উঠলো : কবে আমি ঘরের মধ্যে রঙিন সাড়ি পরেছি শুনি? মুখে যা আসে একটা বললেই হলো?

পুরন্দর ঘাবড়ে গিয়ে বললে,—পরলেই বা দোষ কী!

—মুখ সামলে কথা বলো। যাবো না আমি বেড়াতে।

নিচু হ'য়ে জুতোয় ব্রাশ করতে-করতে পুরন্দর বললে,—তুইও কোথায় যাস্ নে, দিলীপ। একা একা থাকে, বৌদিকে একটু company দিস্।

—আ, কী দরদ!

—আমার এমনি একটি বৌদি থাকলে দরদ একটু হ'ত বৈ কি।

পুরন্দর বেরিয়ে গেলে চোখ পাকিয়ে সীতা বললে,—তুমিও বেরোও।

স্নিগ্ধ হেসে দিলীপ বললে,—কোথায় যাবো?

—কেন, মাঠে।

—বলেছি না, তুমিই আমার মাঠ।

—সব সময়ে ইয়ার্কি ভালো লাগে না—সম্মান ক'রে কথা বলতে শেখ।

দিলীপ তাড়াতাড়ি প্রণামের ভঙ্গিতে সীতার পা চেপে ধরলে; বললে,—উঃ, তোমার পা কী নরম!

এখন না হেসে সীতার উপায় নেই। বললে,—এতো কবিত্ব তুমি শিখলে কোথায়?

—নতুন ভালোবাসার সময় অমন একটু-আধটু কবি সবারই হ'তে হয়।

—ও! তোমাদের সেই কলেজের ছাত্রীটি বুঝি? কি-জানি নাম—

—কি-জানি নাম!

—বলো না।

—নাম বলতে নেই। বোস, অন্য গল্প বলি।

—বা, আমার রাঁধতে হ'বে না?

—চলো তবে রান্নাঘরে।

চৌকাঠের উপর ব'সে দিলীপ পকেট থেকে সিগারেট বের ক'রে বললে,—এটুকু ধোঁয়ায় তোমার নিশ্চয় আর কষ্ট হবে না। আচ্ছা, বৌদি—

ডেকচির জলে চাল ছাড়তে-ছাড়তে সীতা বললে,—কী!

—তুমি কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলে?

—হ্যাঁ—

—কাকে ?

—নাম বলবো কেন ? তুমি বলেছ ?

—বেশ, নাই বললে ! তাকে তোমার এখনো মনে পড়ে ?

—মনে পড়ে মানে ? তাকে আমি এখনো ভালোবাসি।

চোখ কপালে তুলে দিলীপ বললে,—এখনো বাসো ? বলো কী !

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে সীতা বললে,—সারাজীবন বাসবো। ভাবো কী তুমি ?

—ও ! দাদাকে বুঝি ?

—হ্যাঁ। এতক্ষণে বুঝি গোবরগণেশের বুদ্ধি খুললো।

মুখ গম্ভীর ক'রে দিলীপ বললে,—না, আমি তার কথা বলছি না।

—কার কথা বলছ তবে ?

—এমন কেউ নেই, যাকে কোনো একদিন ভালোবেসেছিলে, এখন আর বাসো না।

—রক্ষে করো। কেন, তোমার বুঝি তেমনি ?

—আমি এখনই বরং বাসছি।

—পরে বাসবে না। আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছ ? বেচারিটি কে ?

—নাম বলবার নিয়ম নেই।

—বা, আমি যে বললাম।

—ও একটা বলা-ই হ'লো না। ও-কথার দাম কী !

—সত্য কথার দাম নেই, তবে কোন্ কথার আছে ?

—ও তোমার সত্য কথা ?

—নিশ্চয়। চলো, ঘরে বসি গে। আর একটা মাছের ঝোল শুধু রাঁধবো,—হবে না এতে ?

—যথেষ্ট। এবার চলো। আমার ঘরে।

সীতা বসলো চেয়ারে, দিলীপ তক্তপোষে।

সীতা বললে,—নাম না বলো তার ছবি দেখাও। কোনো ছুতোয় ফটো একটা নিশ্চয় তুলেছ।

—আশা করি। দিলীপ তার অ্যালবাম ঘাঁটতে বসলো। একটা ছবি বাড়িয়ে দিয়ে বললে,—এটা বোধ হয়।

—বোধ হয় মানে ? নিজে জানো না ? ব'লে ছবিটা হাতে ক'রেই সীতা হেসে উঠলো : দূর বোকা। এ ত' আমি।

—তুমি নাকি ? কৈ দেখি ?

—তোমার ভুল হয়েছে। বার করো শিগ্‌গির।

দিলীপ অন্যমনস্কের মতো ফের ড্রয়ার হাতড়াতে লাগলো, বললে,—আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না যে।

—তা পাবে কেন ? এটাও আর পাচ্ছ না। ব'লে সীতা ফটোটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

—না, না, ওটা আমার চাই। ওটা আমি লুকিয়ে তুলেছি। তুমি এমনি ত' আর দেবে না তুলতে।

—লুকিয়ে-লুকিয়ে এই শিখেছ বুঝি আজকাল।

—না, তুমি ওটা দাও। ব'লে দিলীপ তার পিছু নিলে।

এই ছুটাছুটির ব্যস্ততার মধ্যে কেউ বিশেষ লক্ষ্য করতে পারলো না দরজার বাইরে পুরন্দর সন্তর্পণে কখন এসে দাঁড়িয়েছে।

আঁচল পড়েছে লুটিয়ে, ঘাড়ের উপর খোঁপা এসেছে নেমে,—সীতা ফটোটা হাতের মুঠোর মুচ্‌ড়ে তাড়াতাড়ি সেমিজের মধ্যে গুঁজে বললে—নাও দিকি এবার ?

তক্ষুনি দরজার বাইরে পুরন্দরের দিকে নজর পড়তেই সে ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। বললে—ওমা, তুমি কখন এলে ?

মুখ গম্ভীর ক'রে পুরন্দর বললে,—এ অসময়ে না-আসাই আমার উচিত ছিলো। কিন্তু ছাত্র আজ পড়লো না। ব'সে বসবার ঘরে গিয়ে সে বই নিয়ে বসলো।

সীতা সামনে এসে দাঁড়ালো। এটা-ওটা একটু নাড়াচাড়া করলে। পুরন্দর কিছু একটা তাকে জিজ্ঞাসা করুক।

চোখ তুলে পুরন্দর বললে,—রান্না হ'য়ে গেছে ?

—মাছের ঝোলটা শুধু বাকি। তুমি এখুনি বেরুবে নাকি ?

—সবে ত' সাড়ে-সাতটা। বেরুলে ভালো হয় ?

—কিসের ভালো হয় ?

—তা তুমিই জানো। ব'লে পুরন্দর বই-র উপর ঝুঁকে পড়লো।

চেয়ারের কাছে ঘেঁষে এসে সীতা বললে,—একটা কথা শোন—

—আমি এখন পড়ছি।

—শোন না।

—সব সময়ে বিরক্ত করো না। মাছের ঝোল ক'রে ফেল গে। যতো তাড়াতাড়ি রান্না সারবে, ততো আগেই আমি বেরুতে পারবো।

—দেখ, ঠাকুরপো আমার এই ফটো তুলেছে। ব'লে সেমিজের মধ্যে হাত দিয়ে ফটোটা সে বার করলে।

—আসচে মাসে মাইনে পেলে এন্‌লার্জ ক'রে দেব।

—তোমার মন এতো ছোট!

—ফটোটা ত' বড়ো হবে।

—আমার কী দোষ! আমি ঘুমিয়ে থাকলে কেউ যদি লুকিয়ে ফটো তুলে নেয়, আমি কী করতে পারি। কালই আমি ওকে এখান থেকে চ'লে যেতে বলবো।

—কাল!

—কেন, আজই। এক্ষুনি। ব'লে সীতা দরজার দিকে দু' পা এগোলো যা হোক।

পুরন্দর বইয়ের উপর মুখ গুঁজে রেখেই বললে,—ও আমার ভাই। ওকে তাড়াবার অধিকার তোমার নেই। ও এমন কিছুই দোষ করে নি। ঘুমিয়ে আছ দেখে ফটো না তুললেই বরং অপরাধ করতো।

—তবে দোষ করেছে কে?

—আমি।

—কেন?

—ঐ অসময়ে বাড়ি ফেরাটা আমার উচিত হয় নি। শাস্তি পেতে হয়, ত' আমাকেই পেতে হবে। যদি বলো ত' না খেয়েই আপিস যাই।

—না, না, রান্না আমার এক্ষুনি হয়ে যাবে। সাঁৎলানো মাছের ঝোল করতে আর কতোক্ষণ! ব'লে সীতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চ'লে গেলো।

তেরো

নিশি-পাওয়া

তারপরে রবিবার এলো। ছোট পায়ে পিঁপড়ের মতো একটু-একটু ক'রে হেঁটে-হেঁটে মুহূর্তেরা প্রতীক্ষার দীর্ঘ পথ প্রায় পার হ'য়ে এসেছে। কোনো রকমে ভোর যদি হ'লো ত' দুপুর হয় না, দুপুর এলো ত' সন্ধ্যা হ'তে আরো এক যুগ বাকি। কাঁটার উপর যে ব'সে আছে তারো দিন যায়, পুরন্দরেরো দিন ফুরোলো।

স্নান ক'রে কাপড়-চোপড় বদ্‌লে, আয়নায় দাঁড়িয়ে মুখে-ঘাড়ে পাউডার ঘস্‌তে-ঘস্‌তে হঠাৎ একসময়ে তার এমনো মনে হলো যে, অনাবশ্যক তার দেরি হ'য়ে গেছে—আরো ঢের আগে তার বেরুনো উচিত ছিলো। সাড়ে আটটার এখনো দেরি আছে বটে, তবু সেখানে যাবার আগে মদির চিন্তার ঝড়ে নিজেকে রাস্তায়-

রাস্তায় উড়িয়ে না বেড়ালে কোনো তৃপ্তি নেই। ক্ষুধাকে ধারালো করবার জন্যে যেমন হাঁটা দরকার, তেমনি। তাড়াতাড়ি পকেটে রুমাল, ওপর পকেটে এতো দিনের সযত্নে বাঁচানো নোট, আর দুয়েকটা জিনিস—মায় সেই কার্ডটুকু—সব গুছিয়ে নিয়ে বেরবার জন্যে সে পা বাড়ালো।

দরজার কাছেই সীতার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। সেও ইতিমধ্যে স্নান সেরে নিয়েছে—এক-হাতে ভিজে কাপড়ের স্তূপের উপর সাবান-দানি; অন্য হাতটা তাড়াতাড়িতে-পরা কাপড়টাকে কোমরের কাছে সাম্‌লাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাসি হেসে বললে,—তুমি এখুনি বেরুচ্ছ নাকি? দাঁড়াও, আমিও যাবো।

পুরন্দরকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো: তুমি যাবে কোথায়?

কাপড়টা সাবান-দানিশুদ্ধ কাঠের একটা চেয়ারের উপর রেখে বললে,—তা আমি কী জানি! যেখানে তুমি নিয়ে যাবে।

—না, আমার সময় নেই।

—আমার একটুও দেরি হবে না। একটুখানি দাঁড়াও। ব'লে সীতা ক্ষিপ্রহাতে চুল আঁচড়াতে লাগলো: তোমার এ-ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে না, ভয় নেই, তোমার সামনেই ঠিক ড্রেস করবো। ব'লে সে মুচকে হাসতে গেলো, কিন্তু দরজার দিকের ফিকে অন্ধকারটা হঠাৎ ভারি হ'য়ে উঠতেই সে টের পেলো পুরন্দর স'রে যাচ্ছে।

চিরুনিটা চুলে রইলো আট্‌কে, সীতা দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। পুরন্দর সিঁড়ি দিয়ে নামছে। তবুও সীতা না ব'লে থাকতে পারলো না: তুমি একা-একা বায়স্কোপ দেখবে বুঝি? আমাকে নিয়ে চলো না এক দিন।

পুরন্দর ফিরে দাঁড়ালো না: বায়স্কোপ যাচ্ছি কে বললে?

—তবে? ছেলে-পড়ানোও ত' আজ নেই।

—আছে কে বলছে?

—তবে এমন কোন্ কাজে যাচ্ছ?

—বেড়াতে।

সীতা খুকির মতো আবদারের সুরে বললে,—তবে আমাকে নিয়ে যেতে দোষ কী! সারা দিন-রাত বাড়ির মধ্যে বন্ধ হ'য়ে থাকি।

পুরন্দর তখন প্রায় নেমে গেছে: বন্ধ থাকতে বলি নাকি কোনো দিন? দিলীপের সঙ্গে বেড়িয়ে এলেই ত' হয়।

পুরন্দর বাস-এর মাথায় চ'ড়ে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট-এ বাঁক নেবার মুখে নেমে পড়লো। চৌরঙ্গি তার চোখে নেশা লাগায়, কিন্তু আজ সে-চৌরঙ্গি কেমন-যেন নিষ্প্রভ,

—কিন্তু না ব'লে-ক'য়ে সব সময়েই কি ঢুকে পড়া উচিত ?

—ঢুকে পড়লে কী হয় ?

—যেমন ধরো দাদা, ঘরে ঢোকবার আগে কি একবার তাঁর জিগ্‌গেস করা উচিত নয় ?

—যার নিজের ঘর সে পরের অনুমতি চাইতে যাবে কেন ?

—যেমন ধরো আমি, যদি জান্‌তাম ঘরে দাদা আছেন তবে ককখনো তোমাদের আমি বাধা দিতাম না। এটা এটিকেট্ নয়।

—তোমার এটিকেট্ নিয়ে তুমি ধুয়ে খাও গে।

—কিন্তু আজো বেড়াতে বেরুনো হলো না ?

—বাজে কথা ছেড়ে এখন খাবে চলো।

—দাদা আসুন।

—তাঁর জন্যে কষ্ট ক'রে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। সে আমি একাই পারবো।

পুরন্দর এলে তারা দু'জনে একসঙ্গে ব'সে খাবে—এক থালায় না হোক্। এর আগে এমন নিভৃত অন্তরঙ্গতার কথা সীতা কিছুতেই ভাবতে পারে নি। ভাবতে পারে নি ত' নিজে সে সংসার পেতেছে কেন ? তারা দু'জন পরস্পরকে পরিপূর্ণতর ক'রে পাবে ব'লেই ত' দারিদ্র্যকে বহন করতে পারবে। সীতা আছে বলেই ত' পুরন্দর বিদ্রোহ করতে পেরেছে, আর স্বামীকে একান্ত ক'রে পাবে বলেই ত' সে বিদ্রোহ করে নি।

দিলীপ আসনের উপর বসলো। দু' গরস মুখে তুলেই বললে,—আজ তোমার কী হয়েছে বৌদি,—এ কী রেঁধেছ ?

মুখ ভার ক'রে সীতা বললে,—না রোচে মেস্-এ চলে গেলেই ত' পারো।

—পারি নাকি ? দিলীপ হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো : মেস্-এ গেলে এমন বৌদি আমি কোথায় পাবো ?

সীতা বললে,—কা'র সঙ্গে কি-রকম কথা কইতে হয় এ-সব বুঝি কোনোদিন শেখো নি ?

দিলীপের মুখে তখনো সেই স্নিগ্ধ হাসি : তোমাকে ত' আগে কোনোদিন পাই নি, কী ক'রে শিখবো বলো ? তা, তুমি আমার ওপর এতো রাগ ক'রে আছো কেন বলো ত' ? দাদা নিয়ে গেলো না বেড়াতে, তাতে আমার ওপর রাগ না ক'রে আমার সঙ্গে গেলেই ত' পারতে।

—কিন্তু যখন তুমি এখানে ছিলে না ?

—তখন কী হ'ত ?

—এমনি একা-একাই থাকতাম।

—আমি এলাম ব'লে ত' তা'লে ভালোই হলো। অমনি একা-একা আর থাকতে হলো না। অবশ্যি আমারো না। ইচ্ছা করলে গল্প করতে পারো, বেড়াতে পারো, রাগ করতে পারো—আর আমি—লুকিয়ে ফটো তুলতেও পারি। এবার তোমার আর দাদার একটা 'কাপ্‌ল্‌' তুলবো—কী বলো ? বাঃ, অম্বলটা ত' খাসা হয়েছে।

রাত আরো অনেক বেড়ে গেলো, কিন্তু পুরন্দর এখনো ফিরলো না। জানলায় ব'সে থেকে-থেকে সীতা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে—এবার সে ঘরের মধ্যে পাইচারি সুরু করলে। ও-ঘর থেকে দিলীপ ডাক্‌লে : বৌদি !

সীতার সাড়া নেই।

আবার· বৌদি ! আলোটা দয়া ক'রে নিভিয়ে দিয়ে যাও না। গল্প করতে ডাকছি না তোমাকে।

সীতা ধমকে উঠ্‌লো : হাত বাড়িয়ে নাগাল পাও না ?

—সব জিনিসই কি হাত বাড়ালেই নাগাল পাওয়া যায় ?

—যায় না ত' যায় না।

—পড়তে-পড়তে ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে, আলো নেভাতে উঠ্‌তে গেলে ঘুমটুকুও নিভে যাবে। তোমার পায়ে পড়ি বৌদি—দেখ, কত সম্মান ক'রে কথা কইছি—

সীতা চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে জিগ্‌গেস করলে : কী ?

দিলীপ বিছানায় উঠে বসলো। বললে,—কী করতে হবে ভুলে গেলে এরি মধ্যে ?

—বিছানায় উঠেই যখন বসতে পারলে, তখন হাত বাড়িয়ে সুইচ্‌টা আর অফ্‌ ক'রে দিতে পারো না ?

—বিছানায় উঠে বস্‌বো না, কী, বৌদি ! সম্মান দেখাতে হবে না ?

—শোও, আলো নিভিয়ে দিই।

—যখন আসতেই পারলে তখন দয়া ক'রে আলো আর নিভিয়ো না। পায়ে পড়ি তোমার।

—তবে কী করতে হবে ?

—নিতান্তই গল্প। যতোক্ষণ দাদা না আসে। ইতিমধ্যে তোমারো ত' ঘুম আস্‌ছে না। আসছে ?

সীতা ঘরের মধ্যে চ'লে এলো। বললে,—গল্পে আমার মন নেই।

চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে দিলীপ বললে,—নাই থাক্। কান থাকলেই যথেষ্ট। আমি বলবো, তুমি শুনবে।

চেয়ারে সীতা বসলে না; বললে,—এগারোটা কখন বেজে গেছে, কেন যে এখনো আস্‌ছেন না। তুমি মিছিমিছি জাগতে যাবে কেন? তুমি ঘুমাও।

—বা, ঘুম না এলেও ঘুমোতে হবে? তুমি-জাগ্‌ছো দাদার জন্যে, আমি জাগ্‌ছি তোমার জন্যে—তবু তোমার ঘুম-না-আসার সঙ্গে আমার ঘুম-না-আসার সুন্দর একটি মিল আছে,—না?

এমনি সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল—সে-শব্দ যতোই এগিয়ে আসতে লাগলো, মনে হলো ভারি ক্লান্ত, মন্থর, ভারি। হয় ত' পুরন্দরের নয়—কিন্তু শব্দটা দোতলা অতিক্রম করেছে। আর সন্দেহ নেই। তাড়াতাড়ি টুক্ ক'রে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অত্যন্ত চাপা গলায় সীতা বললে,—শিগ্‌গির, দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ো, ঠাকুরপো, শিগ্‌গির। ব'লেই সে নিশ্বাস ফেলার আগে ছুটে চ'লে গেলো নিজের ঘরে।

বৌদির কথার মর্য্যাদা রাখতে এবং তার কথাটায় অনাবশ্যক একটা অর্থ জুড়ে দেবার জন্যেই দিলীপ তাড়াতাড়ি দরজায় খিল লাগিয়ে দিলো।

ষোলো

স্বতোৎসারিত

শোবার ঘরের আলোটা সীতা জ্বালাই রেখে গিয়েছিলো, কিন্তু নেভাবার আর এখন সময় নেই—শব্দটা একেবারে কাছে এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি সীতা মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো,—শোবার কোন্ বিশেষ ভঙ্গিটায় দুঃখের সব চেয়ে বড়ো বিজ্ঞাপন হবে ততটুকু ভেবে নেবারো তার সময় ছিলো না।

হ্যাঁ,—পুরন্দরই এসেছে। চোখ না চেয়েও সীতার বুঝতে বাকি নেই। সেই শব্দের সে স্পষ্ট ও নির্ভুল ঘ্রাণ পাচ্ছে। প্রবল ও পরুষ একটা আলিঙ্গনের স্রোতে নিষ্প্রাণ তরণীর মতো আলোড়িত হবার আশায় সীতা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শিথিল ক'রে আন্‌লো। সেই বন্যা তাকে ধীরে-ধীরে গ্রাস করতে আসছে—নিশ্বাস বন্ধ ক'রে রেখে সীতা তার প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

আলোটা নিভিয়ে কিছুমাত্র বাক্যব্যয় না ক'রে পুরন্দর খাটের উপর শুয়ে পড়লো। এতো বড়ো আঘাত সীতা কোনোদিন পায় নি। তবু সে প্রাণপণে

চোখ বুঁজে সমস্ত অনুভূতি স্তব্ধ ও আচ্ছন্ন ক'রে প'ড়ে রইলো—এই তিনি উঠে এলেন ব'লে। খেতে যাবার সময় ত' অন্তত তাকে ডাকতে হবে। কতোক্ষণ আর শোবেন? হাত-মুখও ত' ধোয়া হয় নি—জামাটাও ছেড়েছেন কি না কে জানে। এমনি একটু জিরোচ্ছেন হয় ত'।

কিন্তু বিশ্রামের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখে অগত্যা সীতাকেই উঠে পড়তে হলো। আলো জালিয়ে পুরন্দরের মুখের চেহারা দেখে সে থেমে গেলো। অত্যন্ত অসহায় ব্যর্থ একটা ভাব সে-মুখের রেখায় উচ্চারিত হচ্ছে—মুখের চামড়াটা ভারি, মুখের রেখাগুলি কেমন দুর্ব্বল! সীতা ভয় পেয়ে পুরন্দরের কপালে হাত রাখলো; বললে,—শুয়ে পড়লে কেন? খাবে না?

—না। ব'লে বালিশে মুখ ঢেকে পুরন্দর উপুড় হ'য়ে গেলো। তার পর মুখ না তুলেই জিগ্‌গেস করলে,—তুমি যাও, খেয়ে নাও গে। আমার জন্যে এতোক্ষণ ব'সে আছো কেন?

—কেন তুমি খাবে না?

—আমি খেয়ে এসেছি।

—না, তবু চলো। একটু বসবে।

—বসতে পারছি না। মাথা ঘুরছে। শরীরটা ভালো নেই।

—কেন, কী হলো? ব'লে সীতা পুরন্দরের পিঠের সঙ্গে লেপ্‌টে এলো।

—ভালো নেই, নেই। তার আবার অতো জবাবদিহি কী! আলো নিভিয়ে দাও বলছি। দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ো।

কথা কেমন আটকে আটকে আসছে, বলবার ভঙ্গিটা কেমন অবসাদগ্রস্ত, শরীরে কেমন যেন একটা নিরানন্দ অপরিচ্ছন্নতা। সীতা আবার ঘেঁষে এলো; বললে,—না, বলো তোমার কী হয়েছে। ব'লে আলোর দিকে তার মুখটা টেনে আনবার জন্যে গালের উপর হাত রাখলে।

পুরন্দর উঠলো মুখ খিঁচিয়ে; দয়া ক'রে নিজের জায়গায় গিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে থাকো। আমাকে একটু ঘুমুতে দাও। ঘুমুলেই আমি ভালো থাকবো।

আস্তে-আস্তে সীতা হাত সরিয়ে নিলো—আস্তে-আস্তে বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টানোর মতো নিজের শরীরটাকে সে ও-পাশ থেকে এ-পাশে একেবারে খাটের প্রান্তে নিয়ে এলো। 'নিজের জায়গায় চুপ ক'রে শুয়ে থাকো।' অর্থাৎ স্বামী তাকে আজো মেঝের উপরেই শুতে বলছেন—তা-ই তার নিজের জায়গা! ঘুমুলেই তিনি আজ ভালো থাকবেন—অর্থাৎ সীতা যেন আজ তাঁর গলা জড়িয়ে না ধরে, যেন তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রে রাতের খানিকটা না কাটায়।

সীতা দরজা বন্ধ করলো ; আলো নেভালো। অন্ধকারে শরীর তার একবার কেঁপে উঠলো, একটা ঠাণ্ডা শিখা পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত উঠে তাকে অবশ, অভিভূত ক'রে ফেল্‌লে। মেঝের উপর সে খালি-বালিশে শুয়ে পড়লো—না, পুরন্দরের ঘুমের ব্যাঘাত সে করবে না।

তবু এখনো তার আশা আছে তিনি সেদিনের মতো তার শিয়রে এসে বসবেন এবং এবারো হয় ত' বলবেন যে সে খাটে উঠে না গেলে তিনিও যাবেন না। এখানে নেমে যদি তিনি আসেন-ই, ওপরে উঠে যাবার আর কি কিছু দরকার আছে? কেমন ঠাণ্ডা মোলায়েম মেঝে—গরমের রাতে দু'জনে স্বচ্ছন্দে এখানে শুতে পারবে—একটুও কষ্ট হবে না।

পুরন্দর নিঝুম হ'য়ে প'ড়ে আছে বটে, কিন্তু ঘুম আসছে না। ঘর-ভরা অন্ধকারে সে খালি তুষারশৃঙ্গের উপরে রৌদ্রের শুভ্রতা দেখচে! কিটির সেই শরীর—যেন আগাগোড়া ঝক্‌ঝকে 'পোর্সলেন্'। কিটির গায়ের সেই চামড়া—এতো স্বচ্ছ যে তাকালে নিজের মুখ দেখা যায়। এই মাত্র সীতা যে গালে তার হাত রাখলো যেন কাটা শশার মতো ঠাণ্ডা, কিন্তু কিটির স্পর্শে ফেনিল ঢেউয়ের স্বাদ! পুরন্দর অন্ধকারে স্পর্শের সে ঢেউ দেখছে।

শরীর অসুস্থ ব'লে পুরন্দর যে ঘুমুতে পারছে না সীতা অনেক আগে তা বুঝতে পেরেছে। রুগ্ন লোকের উপর এই অভিমান তার সাজে নাকি? যাই তিনি মুখে বলুন, সীতার এই উত্তেজনার অভাব আর ঔদাসীন্যই হয় ত' তাঁর অসুস্থতার কারণ। স্বামীকেই যদি সে খুসি করতে পারলো না দেহে-বচনে ছবিতে-ছায়ায়, তবে সে স্ত্রী হয়েছিলো কেন, সুন্দরী হয়েছিলো কেন, তার নিঃস্বতার দিনে একান্তরূপিণী হয়েছিলো কেন? সীতা আর শুয়ে থাকতে পারলো না—অন্ধকারের অরণ্য কাঁপিয়ে সে বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দুই হাতে পুরন্দরের ঘুমে-মন্থর দেহকে জড়িয়ে ধ'রে দুর্ব্বল অনুনয়ের গলায় বললে,—আমাকে মেঝের ওপর ফেলে রেখে শুতে তোমার ভালো লাগে?

আশ্চর্য! পুরন্দরের কোনো উত্তর নেই। সীতা নিজে থেকে সেধে যেচে নির্ভুল একটি সঙ্কেত নিয়ে এসেছে, অথচ সে একেবারে স্থির।

সীতা পুরন্দরের অবসাদে নিঃসাড় দেহকে নিজের কাছে আকর্ষণ ক'রে কুণ্ঠিত গলায় বললে,—তোমার অসুখ আমি ভালো করতে পারি না?

মুখ ঘুরিয়ে পুরন্দর ধম্‌কে উঠ্‌লো: কী খালি বিরক্ত করো? ঘুমুতে দেবে না নাকি?

—না। ব'লে সীতা নিচু হ'য়ে পুরন্দরকে গেলো চুমু খেতে।

অমনি মুখ সরিয়ে নিয়ে প্রায় চীৎকার ক'রে সে ব'লে উঠ্‌লো : তুমি মদ খেয়েছ ?

পুরন্দর খেঁকিয়ে উঠ্‌লো : কে বললে মদ খেয়েছি ?

—তোমার মুখে তবে ঐ কিসের গন্ধ ?

—কিসের আবার ?

—কিসের আবার ! আমি যেন কিছু বুঝি না।

—কোন্‌টা মদের গন্ধ তা তুমি কী ক'রে জান্‌লে ? মদ-খাওয়া ক'টা মুখের সামনে এমনি মুখ নামিয়েছ শুনি ?

—কী ? সীতার আর্তনাদ বিদ্যুতের মতো জ্ব'লে উঠ্‌লো।

—যাও, বেশ করেছি। তোমার তাতে কী ! একশো বার খাবো। তুমি যাও এখান থেকে স'রে। ব'লে পুরন্দর তার গায়ে এক ঠেলা দিলো।

—যাবো না আমি। তুমি যাও দূর হ'য়ে।

—কী ?

—হ্যাঁ, তুমি যাও দূর হ'য়ে। যে মদ খায় সে আমাকে ছুঁতে আসে কোন্‌ সাহসে ?

—আমি যাবো ? ব'লে পুরন্দর সহসা সীতার বাঁ গালে এক চড় বসিয়ে দিলে।

আর অমনি সীতা খাট থেকে মেঝের উপর খ'সে পড়লো। প্রথমটায় হঠাৎ তার কান্না এলো না। আহত পশুর চোখে সে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলো। ব্যাপারটা আয়ত্ত করতে তার সময় লাগছে।

সতেরো

কিউবিজ্‌ম্‌

এর আগে এতো ভোরে সীতা কোনোদিন জাগে নি। স্নিগ্ধ আকাশের নিচে কলকাতাকেও এখন ভারি সুন্দর লাগছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। সীতা জান্‌লায় এসে দাঁড়ালো—অল্প-অল্প হাওয়া শিশুর ছোট-ছোট আঙুলের মতো মুখে এসে লাগছে—সীতার বুক-পিঠ সির্‌সির্‌ ক'রে উঠ্‌লো। সামনের গ্যারেজ থেকে একটা বাস্‌ বেরুচ্ছে—তার বিশ্রী শব্দে বেশিক্ষণ জান্‌লায় আর দাঁড়ানো গেলো না।

ঝি যথাসময়ে উহুনে আগুন দিয়েছে—এখন গিয়ে চায়ের জল বসাতে হবে। রুটি কেটে টোষ্ট ক'রে মাখন মাখাতে হবে। পুরন্দরের খাটের পাশে কাঠের একটা টুল টেনে চা-কা রেখে গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগাতে হবে—না, আজ তাকে সে কিছুতেই জাগাতে পারবে না।

পুরন্দর যখন জাগলো, নিয়মিত অভ্যাসে টুল হাতড়ে চায়ের পেয়ালা হাতে করতেই টের পেলো চা একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। সীতা তাকে জাগিয়ে যায় নি। বাপ, কতোক্ষণ সে ঘুমিয়েছে—জানলা দিয়ে রোদ তার গায়ে এসে পড়েছে যে। তার যে ন'টার আগে এক এডিটারের বাড়ি যেতে হবে—লেখা ও তার রেট্ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করতে। শরীরে তার এখনো দুর্ব্বলতা আছে—তবু সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। কালকের রাতের কাণ্ডটা এখন তার মনে পড়েছে—দিনের আলোয় তার লজ্জাটা আরো বেশি নিদারুণ হ'য়ে তাকে বিধ্‌তে লাগলো। দুঃখের সীমা নেই। জুতো খুঁজতে খাটের নিচে পা বাড়িয়েছে অমনি কি কাজে সীতা ঘরে এসে পড়েছে।

পুরন্দর ডাকলে ; সীতা!

কাজ শেষ হবার আগেই সীতা পিঠের উপর আঁচলটা ভালো ক'রে টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো।

এতো খারাপ চা ও মিউনো রুটি পুরন্দর অন্য সময় হ'লে বরদাস্ত করতে পারতো না। কিন্তু সীতার সঙ্গে নতুন ক'রে বন্ধুতা পাতাতে হ'লে অখাদ্য ব'লে এগুলিকে অবহেলা করা চলবে না। টুথ ব্রাস্ আর পেইষ্ট্ নিয়ে বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে একবার চেয়ে দেখ্‌লো সীতা দুই হাতে তপ্ত ডেক্‌চিটা ধ'রে অত্যন্ত অসুবিধায় ফেন গাল্‌ছে। আগুনের আঁচে মুখটা গরম হ'য়ে উঠেছে।

পুরন্দর ভিজা-মুখে রান্নাঘরেই চ'লে এলো যা-হোক্। তাকের থেকে তেল পাড়বার জন্যে সীতা হাত তুলেছে, পুরন্দর সেই হাত খপ্ ক'রে ধ'রে ফেললো—হেঁচ্‌কা টান লেগে তেলের শিশিটা মেঝের উপর ছিট্‌কে পড়লো।

বন্ধুতায় প্রসারিত পুরন্দরের হাত প্রবল ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে সীতা ঝাঁজালো গলায় চেঁচিয়ে উঠলো : মাতালের হাতে আবার তুমি ছুঁতে এসেছ আমাকে? লজ্জা করে না?

পুরন্দর চোখ-মুখে ইসারা ক'রে চাপা গলায় বললে,—এই, আস্তে। দিলীপ শুনতে পাবে।

সীতা গর্জ্জে উঠ্‌লো : পাবেই ত' শুন্‌তে। রাত ক'রে মদ খেয়ে এসে স্ত্রীকে ধ'রে মারো—এমন কীর্ত্তির কথা লোকে শুন্‌বে না?

পুরন্দর মিনতি ক'রে বললে,—থামো। সীতাকে আবার সে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলো।

সীতা তবু দমলো না: আমার কাছে কেন এসেছ মরতে? যাও না তোমার সেই প্রেয়সীর কাছে যে তোমাকে মদ খাইয়েছে। থামতে বল্‌ছেন! উনি এসে আমাকে মারবেন, আর আমি ফুল-চন্দন দিয়ে ওঁকে পূজো করবো!

পুরন্দর কাঠ হ'য়ে বললে,—তুমি চুপ করবে না?

—না। আমার সামনে থেকে তুমি চ'লে যাও।

—এই কথা ত'? পুরন্দর চৌকাঠের দিকে পা বাড়িয়ে একটু থামলো।

—হ্যাঁ, এই কথা।

পুরন্দর শোবার ঘরে চলে গেলে সীতা কড়ায় তেল ছেড়ে দিলো। পুরন্দরকে সামান্য কতকটা অপ্রস্তুত করতে পেরে গায়ের ঝাল তার কিছু মিটেছে। এইবার আস্তে-আস্তে সে ধরা দিতে পারে হয় ত'। সকাল বেলায় রান্নাঘরে ঢুকে তাকে ধরতে আসার মধ্যে সীতা মনে-মনে একটি আরাম পাচ্ছে। রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ ঝলসে যাচ্ছে, সকাল বেলায় তাঁর ঐ হাত-বাড়িয়ে-দেওয়ার মধ্যে কেমন যেন ক্ষমা-চাওয়ার একটা করুণ আবেদন ছিলো। এইবার উনি নিশ্চয় বসবার ঘরে গিয়ে বই খাতার মধ্যে ডুবে যাবেন। ঠিক সেই ঘরে সে ঢুকবে না, কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াতে কোন দোষ নেই। তাঁকে অতো সহজে সে অবশ্যি ক্ষমা করবে না, কিন্তু অনুতাপের বর্ষায় যদি আবহাওয়াটি একান্তই স্নিগ্ধ হ'য়ে ওঠে, তবে সে-ও না-হয় ধরা দিলোই বা!

কলে হাত ধুতে বেরিয়ে এসেই সীতা দেখলো সেজে-গুঁজে গায়ে চাদর চাপিয়ে সকাল বেলাতেই পুরন্দর বেরিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষোভে-রাগে সে একেবারে মুসড়ে পড়লো। লজ্জায় মুখ ঢাকতে পৃথিবীতে আর তার জায়গা রইলো না। 'এমন লোকের জন্যে কি না সে এরি মধ্যে মনে-মনে দুর্ব্বল হ'তে সুরু করেছিলো! ইচ্ছে হ'লো সব রান্না-বান্না ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছত্রখান ক'রে কোথাও সে বেরিয়ে যায়। কিন্তু একমাত্র বিছানা ও তাতে মুখ ঢেকে কাঁদা ছাড়া তার আর জায়গা বা কাজ নেই। বড়ো লোকের ঘরে বিয়ে দিয়ে মা নিশ্চিন্ত আছেন, কিন্তু আজ তাকে নিজের হাতে দু' বেলা রাঁধ্‌তে হচ্ছে জেনেও মা'র এতটুকু ভাবনা নেই—এ-ছাড়া মেয়েছেলের আর কী কাজ! এবং মদ খেয়ে স্বামী তার গায়ে হাত তুলেছেন এ-খবরটাতেও হয় ত' আভিজাত্য আছে—মা বিচলিত হবেন না। পৃথিবীর সব কিছুর উপর—এমনকি মা'র উপর পর্য্যন্ত তার রাগ হচ্ছে। কাল রাতে

পুরন্দর মদ খেয়ে এসে তাকে মেরেছিলো এই খবরটা খানিক আগে দিলীপের কানে গেছে মনে ক'রে সব চেয়ে বেশি রাগ হ'তে লাগলো দিলীপের উপর। লম্বা-লম্বা কান পেতে সব জিনিস তার শোনা চাই। তাদের স্বামী-স্ত্রীতে কী কথা হয় বা না-হয় সব তাতেই সে মাথা গলাতে আসে কেন?

কি ভেবে অত্যন্ত দ্রুত পায়ে সীতা দিলীপের ঘরে ঢুকে পড়লো। না-তোলা বিছানার উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে দিলীপ কাগজ-কলম নিয়ে কি-একটা হিজিবিজি কাটছে।

সীতাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই দিলীপ পিঠে একটা মোচড় দিয়ে হাসিমুখে বললে,—বোস বৌদি। এই একটা ছবি আঁকছি দেখ।

সীতা প্রায় দিলীপের বুকের কাছের কাগজের উপর ঝুকে প'ড়ে বললে,—কী ছবি?

হাত দিয়ে কাগজটা ঢেকে দিলীপ বললে,—ছবির নাম নেই কিছু। এইটেই ছবির মজা। তোমার যা খুসি তা ভাবতে পারো। ব্যাঙ, ঘোড়া, মানুষের মুখ, ভগবান—যা মন চায়। এতো বড়ো স্বাধীনতা আর তুমি কিছুতেই পাবে না।

সীতা আরো খানিকটা নুয়ে পড়লো ছবির উপর। দিলীপ কিছুতেই হাত সরাবে না। সীতার চুলের শীর্ণ দুটি রেখা দিলীপের গালের কাছে এঁকে-বেঁকে নেমে এসেছে—ফাঁপানো সাড়ির ভেতর থেকে একটা গরম আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। দিলীপ বিছানার এক পাশে স'রে গিয়ে বললে,—এই খানটায় বোস না।

—না, তুমি ছবিটা আগে দেখাও। ব'লে এইবার সে সামান্য একটু আঙুলের কারসাজি ক'রে কাগজটা ছিনিয়ে নিতে পারলো। ছবিটার তত্ত্ব উদ্ধার করবার জন্যে সে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো। এবং খুঁটিয়ে একটু ভালো ক'রে দেখতেই মুখ তার দেখতে দেখতে শাদা হ'য়ে গেলো।

—এ যে দেখছি তুমি আমাকে এঁকেছ! সীতার ঠোঁট কাঁপছে।

দিলীপ হাসির চোটে বিছানার উপর উঠে বসলো। হাত বাড়িয়ে বললে,—কৈ দেখি, তোমার মতো হয়েছে কি না। ভীষণ আশ্চর্য ত'!

কাগজের ফালিটা হাওয়ায় বার কয়েক নেড়ে সীতা বললে,—এ সব তোমার কী হচ্ছে? তুমি কী মনে করো?

দিলীপের মুখের হাসি তেমনি অম্লান। মাথার একটা বালিশ কোলের উপর দুমড়ে নিয়ে সে বললে,—মনে করি তোমার স্নেহ আর উদারতার সীমা নেই। ঐ কয়েকটা আঁচড়কে যদি তুমি তোমার মুখের মতো সমান সুন্দর ভাবো তবে আমার ওপর তোমার পক্ষপাতিত্বই দেখানো হয়। তাই না কি?

দৃপ্ত ভঙ্গিতে সীতা বললে,—এ-সব এখানে চল্‌বে না।

—কী সব? ছবি আঁকা? এখানে চলবে না—অন্যত্র চলবে? এই বা তোমার কি-এমন সুবিচার হ'ল!

হঠাৎ সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হ'ল—কে উপরে উঠ্‌ছে।

দিলীপ অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে বিছানা-বালিশ গুছোতে-গুছোতে মরিয়ার ভঙ্গী ক'রে বললে—শিগ্‌গির, শিগ্‌গির চ'লে যাও বৌদি। আমি দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছি। আলো—আলো কী ক'রে নেভাবে?

কিন্তু সীতার মুখ ভীষণ থম্‌থমে—ভিতরে-ভিতরে সে ফুটছে। গম্ভীর গলায় বললে,—আসুন না, এর একটা প্রতিবিধান করতেই হবে।

জুতোর শব্দটা দোতলার আর উপরে উঠে এলো না।

দিলীপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে,—যাক্, বাঁচলে। পরে বালিশটা খাড়া ক'রে তার মধ্যে চিবুকটা ডুবিয়ে বললে,—কী প্রতিবিধান করতে বৌদি? ছবিটা ছিঁড়ে ফেল্‌তে? এ ত' আর ফটোগ্রাফিক প্লেট্ নয় যে একবার ভেঙে ফেললেই গেলো। তবে সেই তাঁতিদের মতো আমার আঙুল কেটে দিতে চাও?

ছবিটা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে সীতা বললে,—অসহ্য।

দিলীপ তবুও হাসছে: কি অসহ্য বৌদি? আমার আঙুল কেটে দেওয়া! আমার আঙুলের গঠন দেখে জ্যোতিষ কী বলেছে জানো?

—কী অমন দাঁত বের ক'রে নির্লজ্জের মতো হাসছ?

—তোমার ঐ মুখ দেখে কে না-হেসে থাকতে পারবে—যদি সে সত্যিই আর্টিষ্ট হয়, যদি ব্যাঙ আঁকতে গিয়ে সত্যি সে তোমাকে এঁকে বসে! আবার যদি তোমার এই চেহারা আঁকতে পারি কোনোদিন, তোমাকে ঠিক দেখাবো বৌদি।

রাগে গর্ গর্ করতে-করতে সীতা বললে,—তুমি ভীষণ বেড়ে গেছ দেখ্‌ছি। অভদ্রতারো সীমা থাকা উচিত। লেখা-পড়া শিখে দিন-দিন তোমার এই হাল্ হচ্ছে?

—তুমি এতে অভদ্রতা কোথায় দেখলে? তোমার ছবি আঁকা গুনাহ্ নাকি? ছবি-পূজো ত' আমাদের প্রপিতামহদের আমল থেকেই চ'লে আসছে। কী বলো,—আসছে না? তবে লেখা-পড়া সত্যিই এখনো কিছু শিখি নি বটে। শিখলে ব্যাঙ আঁকতে ব'সে বেমালুম ব্যাঙই এঁকে ফেল্‌তাম।

বাইরে যেতে-যেতে সীতা বললে,—এর দস্তুরমতো শাসন দরকার।

—বেশ ত', তুমিই শাসন করো না বৌদি। শুভস্য শীঘ্রং।

বিদ্রূপের সুরে সীতা বললে,—শুভ না আর-কিছু।

—শাসনের পদ্ধতিটা না-হয় কিছু কঠোর হবে—ফলটা ত' শুভ। কী বলো? ছবি ত' আমি আর আঁকবো না কি না! তোমার হাতের শাসন বারে-বারে পাবার জন্যেই যে বারে-বারে ছবি আঁকবো। বারে-বারে তুমি দেখবে।

—বারে-বারে অভদ্রতা যাতে দেখতে না-হয় তারো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সীতা বারান্দা থেকে বললে।

—তার মানে আমাকে তুমি এ-বাড়ি থেকে চ'লে যেতে বল্‌ছো?

সীতা রা করলো না।

—এই ত' কথা? মুখ্ ফুটে বলো না কেন বৌদি, না অভদ্রতা হয়?

সীতা রান্নাঘর থেকে বললে,—আত্মসম্মান যার আছে তাকে আর ব'লে দিতে হয় না।

দিলীপ তক্তপোষ থেকে নেমে পড়লো। বললে,—বেশ, শুভ না হোক্ শীঘ্র হোক। ব'লে সে ক্ষিপ্র হাতে তক্তপোষের তলা থেকে স্যুট্‌কেস্‌টা টেনে, ব্র্যাকেট থেকে জামা-কাপড় ও টেবল্ থেকে বই-খাতা পেড়ে বাক্স বোঝাই ক'রে ফেল্‌লে। বিছানাটা মুড়ে বাঁধ্‌লে। ব্যস্,—জিনিসপত্র তার হাল্‌কা—গাড়ি লাগবে না।

সীতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপন মনে বললে,—কোনো জিনিস ফেলে যাচ্ছি নাকি? না, খালি ঐ ছবিটা গেলো,—যাক্, অমন কতো ছবি আঁকতে পারবো!

তারপর দরজার সামনে এসে সে ডাক দিলে: একটিবার বেরিয়ে এসো বৌদি, তোমাকে প্রণাম ক'রে যাই।

ঘটির জলে হাত ধুয়ে সাড়ির আঁচলে মুছ্‌তে মুছ্‌তে সীতা বেরিয়ে এলো। কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক্। ডান-হাতে স্যুট্‌কেস্ ও বাঁ বগলের তলায় আধ-বাঁধা বিছানাটা ধ'রে দিলীপ মুচ্‌কে-মুচ্‌কে হাসছে।

সীতা ভয় পেয়ে শুকনো গলায় বললে,—এ কী ঠাকুরপো?

—স্বর্গ থেকে বিদায়! দাও, পায়ের ধুলোটা দাও—যদি লেখাপড়া শিখে কোনোদিন ভদ্র হ'তে পারি আবার দেখা হবে। ব'লে ডান-হাতের স্যুট্‌কেস্‌টা মেঝের উপর নামিয়ে দিলীপ নিচু হ'তে গেলো।

আঁৎকে দু'পা পিছিয়ে সীতা বললে,—এ কী, চ'লে যাচ্ছ নাকি?

—এই বেশ দেখে আপাততো তোমার তাই মনে হচ্ছে না? ব্যাণ্ড দেখে এবারো তুমি তোমার নিজের মুখ দেখ্‌ছ?

সীতা হঠাৎ এগিয়ে এসে স্যুট্‌কেসশুদ্ধ দিলীপের ডান-হাতটা চেপে ধরলো। বললে,—কে তোমাকে চ'লে যেতে বলেছে?

—স্বয়ং।

—বা, কখন বললাম। আমি চ'লে যেতে বলবার কে?

—বা, তুমিই ত' সব। রাখলে থাকি, মারলে মরি—আমার ত' সেই 'ধন্ত হরি'-র ভাব।

—না, না, ঘরে চলো। হাত ধ'রে সীতা তাকে ঘরের মধ্যে টানতে লাগলো।

দিলীপ হেসে বললে,—ঘরে ফিরে আসতে বলবারই বা তুমি কে? আমি নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে যেতে পারি না?

নিরুপায় কণ্ঠে সীতা বললে,—তুমি চ'লে গেলে আমি থাকবো কী ক'রে?

মুখ গম্ভীর ক'রে দিলীপ বললে,—হ্যাঁ, সে একটা কথা বটে। ও-কথা আগে ভেবে দেখি নি।

—ঠাট্টা নয়, ঠাকুরপো। তুমি আছো ব'লেই ত' এ-বাড়িতে তবু থাকতে পারছি। দাও, বাক্সটা ছাড়ো।

—বাক্সটা ছাড়লে যে সে-সঙ্গে তোমার হাতও ছেড়ে দেওয়া হবে।

—হোক্। দাও বিছানাটা। পেতে দি। চাদরটা ময়লা হ'য়ে গেছে দেখছি।

বিছানাটা পাততেই দিলীপ ফের লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লো। বললে,—মাঝের থেকে ছবিটা আমার লোকসান গেলো।

সীতা মুচকে হেসে বললে,—আঙুল ত' আর কেটে নিই নি—অমন কতো ছবি আঁকতে পারবে। ব'লে দ্রুত পায়ে সে রান্নাঘরে চ'লে গেলো।

খানিক পরেই আবার সে ফিরে এলো। দেখলে দিলীপ তেমনি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। তক্তপোষের কাছে স'রে এসে মৃদু স্বরে বললে,—দেখো এব্যাপারটা আবার তোমার দাদাকে বোলো না যেন।

—কোন্ ব্যাপারটা? ছবি আঁকার কথা? আমি আবার আঁকতে পারি নাকি? ওটা দেখলে দাদা নিশ্চয়ই ব্যাঙ দেখতেন। খালি তোমারই দেখছি গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে।

—না, না, ও-কথা নয়।

—তবে কোন্ কথা?

—আহা, যেন কিছু বোঝেন না! এই যে তোমাকে রাগ ক'রে বাড়ি থেকে চ'লে যেতে বলেছিলাম।

—বলেছিলে নাকি? তবে বিছানায় এমনি শুয়ে আছি কী ক'রে?

—হ্যাঁ, বলো না যেন। শুনলে ভারি রাগ করবেন কিন্তু।

দিলীপ সীতার শঙ্কাকুল স্তিমিত চোখ দু'টির দিকে চেয়ে বললে,—আর হাত ধ'রে টেনে এনে বিছানা পেতে শুইয়ে দিয়েছ শুনেও তিনি বিশেষ খুসি হবেন না।

সীতা আবার ঘর ছেড়ে চ'লে যেতে-যেতে বললে,—এবার ওঠো, কলেজ নেই আজ?

—এখুনি উঠবো কি! মোটে ত' দশটা এখন। ব'লে সে পরম আরামে পাশ ফিরলো।

আঠারো

আত্মরক্ষার উপায়

এক দমকায় এতগুলি টাকা খরচ না করলেও পারতো! কিন্তু খরচ না করলে কিটিকে পেতো কী ক'রে—প্রথমে সবুজ ও পরে শাদা কয়টি মুহূর্ত্ত! এরোপ্লেনে ক'রে সুদীর্ঘ দূর পথ সে বেড়িয়ে এসেছে—খরচ হবে বৈকি কিছু। তার জন্যে অনুতাপ ক'রে লাভ নেই। বরং আসচে রবিবারের জন্যে কোথা থেকে টাকা জোগাড় হবে তাই পুরন্দর ভাবতে বসলো।

আজ কি না তার হাতে টাকা নেই। আর টাকা নেই ব'লেই ত' এই সস্তা রোমাঞ্চের লালসায় সে এতো অধীর হ'য়ে উঠেছে! আজ মনে ও শরীরে দুর্ব্বল রিক্ত হ'য়ে পড়েছে ব'লেই তার চাঞ্চল্য চাই, প্রতীক্ষা ক'রে থাকবার একটা তীব্র উন্মাদনা চাই—নইলে কী নিয়ে সে বাঁচবে? ভবিষ্যৎ সে দেখতে পায় না, তা মৃতের মতো অসাড়, তাতে স্পন্দন নেই, আশা নেই,—তা নিয়ে কী সে করতে পারে? অনুতাপ করা মিথ্যা, টাকা জোগাড় করতে হবে।

প্রাণপাত ক'রে সে পরিশ্রম সুরু করেছে। এই অপর্য্যাপ্ত খাটুনির মাঝেই তার বিশ্রাম। আপিস্ থেকে ভোর বেলায় ফিরে স্নান ক'রে নিঃশব্দে চা খেয়ে খবরের কাগজটা প'ড়ে তক্ষুনি সে বেরোয় নতুন কোনো কাজ বাগাতে পারে কি না! কারো কোনো বই অনুবাদ ক'রে দেওয়া বা কলেজ-পাঠ্য বইয়ের মানে লেখা। দুয়েকটা খুচরো কাজ জোটেও। টাকা চাই—প্রয়োজনের সংসার আছে, প্রয়োজনের অতিরিক্তও কিছু চাই যদি বাঁচতে সত্যিই হয়। সেই

উড়িয়ে-নিয়ে-যাওয়া দুর্দ্দমনীয় ঝড় না পেলে পুরন্দর বাঁচতেই পারবে না। দুপুরে সে ঘুমোয়—না ঘুমিয়ে এক মিনিটও সে সীতার সঙ্গে অনাবশ্যক গল্প করে না। সীতাকে কাছে ডাকতে গেলেই উত্তরে তার একটা পাথরের মতো কঠিন ভঙ্গি,—কথা বলতে গেলেই একটা সহানুভূতিহীন তর্জ্জন শুনতে হয়। চুপ ক'রে শুয়ে পড়ে। বিকেল হ'লে জেগে খাতা-পত্র একটু নেড়ে-চেড়ে চা খেয়ে সন্ধ্যের দিকে ছেলে পড়াতে বেরোয়। সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা পান চিবোতে-চিবোতে সে বাস্ ধরে। তার পরে রাত ভ'রে তার দীর্ঘ ছুটি!

সীতাকে কি সে সত্যিই ভালোবাসে না? বাসে বৈ কি—এই সুন্দর সুখশয্যা ও এই রুচিকর সুন্দর রান্নার মতো ভালোবাসে। কিন্তু না, ভালো লাগে না। ভালো লাগে না অনেক কারণে।

কিন্তু ক'দিন থেকে মুখ তার অত্যন্ত ফ্যাকাসে, চোখ দুটো ছলছল করছে। জ্বর-জ্বর ভাব। তাই নিয়েই সমানে সীতা কাজকর্ম করে—কোথাও এতটুকু ত্রুটি ঘটতে দেয় না! কী তার অসুবিধে এই নিয়ে অভিযোগ করতে তার হাসি পায়। নিজেকে সর্ব্বসুখবঞ্চিত হতভাগিনী ভাববার মধ্যে সে একটা বিলাস বোধ করে—এতোতেও একটু ঝাপটা মেরে উঠতে পারে না। তার এই অপ্রতিবাদ সহিষ্ণুতা পুরন্দরকে বন্ধ ঘরে গুমোটের মতো জীর্ণ ক'রে ফেলে।

বসবার ঘরটা ভারি নিরালা, তাই পুরন্দর কী ভেবে শোবার ঘরেই খাটের উপর বই-খাতা ছড়িয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লো বুকের তলায় বালিশ রেখে। আশা ছিলো কোনো-না-কোনো সময় সীতা এ-ঘরে একবার আসবেই, এবং একবার এসে কাজ ক'রে চলে যেতে যেটুকু লাগে তার চেয়ে একটু বেশি সময় যদি দাঁড়িয়ে যায়, তবে পুরন্দরই যে ক'রে হোক্ আবহাওয়াটা পাৎলা ক'রে আনবে।

এবং এক সময়ে সীতা এলো-ও। রান্না চুকিয়ে খাটে একটু গড়িয়ে না নেওয়া ছাড়া তার উপায় কী! মুখ ফুটে পুরন্দরকে সে নাইতে যেতে বলবে না। যখন তার মর্জ্জি তখন সে যাবে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই পুরন্দরকে খাটের উপর শুয়ে থাকতে দেখে সে চম্‌কে উঠ্‌লো। এক রাজ্যের খাতা-পত্র বিছিয়ে সে চিৎ হ'য়ে শুয়ে দাঁত দিয়ে একটা পেন্সিল কামড়াতে-কামড়াতে বোধহয় তারই আসবার প্রতীক্ষা করছে এতোক্ষণ।

সীতা ঘরে ঢুকতেই ধড়মড় ক'রে পুরন্দর উঠে বসলো। সীতাকে একটু শীর্ণ দেখাচ্ছে ব'লে কেমন যেন বেশ ভালো লাগছে। অল্প-অল্প হেসে সে বললে: শোন।

পুরন্দরকে দেখেই সীতা চ'লে যাচ্ছিলো, কিন্তু ডাক শুনে দাঁড়াবে, না যাবে, একটু দ্বিধা করতে লাগলো হয় ত'—এবং এই সুযোগে পুরন্দর ছুটে গিয়ে ধরলো তার আঁচল চেপে।

সীতা আঁচলে টান দিয়ে বললে,—ছাড়ো।

—তোমার রাগ পড়লো না এখনো? ব'লে পুরন্দর সীতাকে কাছে আনতে হাত বাড়ালো।

সীতা রুখে উঠ্‌লো: আবার এসেছ আমাকে ছুঁতে? নির্লজ্জ কোথাকার!

পুরন্দরের দুই হাত নিমেষে কঠিন হ'য়ে এলো। বললে,—এতো তেজ তোমার কবে থেকে হলো শুনি? আচ্ছা, দেখা যাবে।

বাকি ক'টা দিনও এমনি গুমোটের মধ্যে কাটলো—কাল রবিবার।

টাকা চাই—সেদিনকার চেয়ে আরো বেশি টাকা। সীতা ঘুমিয়ে পড়লে তার হাত থেকে দু'গাছা চুড়ি খুলে নিলে কেমন হয়? ব্যাপারটা কেমন যেন নীরস, অপরিচ্ছন্ন—অতোটা নামবার এখনো দরকার পড়ে নি। কিছু ধার সে এখনো পেতে পারে। শোধ কী ক'রে দেবে, তার চেয়ে কী ক'রে খরচ করবে সেই চিন্তাটার মধ্যে উদ্দীপনা বেশি আছে।

দিনের বেলা সীতা পুরন্দরকে এড়াবার জন্যে বসবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে লুকোয়। ঘুমিয়ে পড়লেও আগে জাগে না—যতোক্ষণ না কলেজ থেকে দিলীপ ফিরে আসে। দিলীপ এলেই সে আত্মরক্ষার সহজ পথ পায়। বাকি দিনটা সব সময় সে দিলীপের কাছে-কাছে থাকে, রাত ন'টা বেজে গেলেই সে জলের মাছের মতো অতল একটি শান্তি অনুভব করে।

পুরন্দর দেখলো বসবার ঘরের দরজাটা খোলা—সীতা নেই। ব্যস্ত হবার কারণ ছিলো না, তবু অবুদ্ধির বশে কিছু একটা গোঁয়ারতুমি ক'রে না বসে সেই ভয়ে পুরন্দর তাকে একটু এ-দিক ও-দিক খুঁজতে লাগলো। জান্‌লাটা ঠেলে উঁকি মেরে দেখলো সীতা দিলীপের ঘরে দিলীপের তক্তপোষের উপর দিলীপের বিছানায় দিলীপের বালিশে মাথা রেখে বিভোর হ'য়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। মুখের একটা পাশ বালিশে ডুবে আছে, অন্য পাশটা এক রাশি গুঁড়ো চুলে ঢাকা—চুলের ফাঁক দিয়ে কানের সেই ছোট ওপেল্-পাথরটি দেখা যাচ্ছে—ফিকে দুধের মতো শাদা, ক্ষণে-ক্ষণে রঙ বদ্‌লায়। ঘোমটা খ'সে গেছে, বালিশ ভ'রে কালো চুলের মেঘ। পায়ের এক দিকের কাপড় হাঁটুর কাছে উঠে এসেছে। মুখে-কপালে ছোট ছোট ঘামের কণা চিক্ চিক্ করছে। সমস্তটা ভঙ্গি নরম ও নতুন, ঘুমটুকু ভারি মোলায়েম!

দিলীপ ঘরে নেই বটে, কিন্তু তারই ত' তক্তপোষ, বিছানাময় তারই ফেনায়িত স্পর্শ, দেয়ালে-মেঝেয় টেব্‌লে-সেল্‌ফে সব কিছুতে তারই কৌতূহল-দৃষ্টি !

পুরন্দর ক্ষিপ্তের মতো দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো।

সীতা ভাবলো কলেজ থেকে দিলীপ ফিরলো বুঝি। তাই বিশেষ ব্যস্ত না হ'য়ে আস্তে-আস্তে আড়মোড়া ভাঙলো; ঘুমো চোখে বললে,—দাঁড়াও গো দাঁড়াও, খুল্‌ছি। ঘর তোমার উড়ে যাচ্ছে না।

দরজায় করাঘাত ক্ষিপ্রতর হ'য়ে উঠ্‌ছে।

সীতা মাথায় ঘোমটা টেনে, গায়ের সঙ্গে কাপড়-চোপড় লেপটে নিয়ে দরজা খুলে দিলো।

সামনেই পুরন্দর! চোখের দৃষ্টিটা ভীষণ নিষ্ঠুর।

দরজা খুলতেই অকস্মাৎ সে সীতার দুই বাহু শক্ত আঙুলে চেপে ধরলো; বললে,—সারা বাড়িতে ঘুমোবার আর তোমার জায়গা নেই?

সীতাও রুখে উঠ্‌লো : না, নেই-ই ত'।

কি-জানি-কেন সীতাকে বাহুর মধ্যে পেয়ে পুরন্দরের রাগ গেলো জল হ'য়ে। মনে হ'লো নতুন ক'রে জয় করবার সুযোগ তার এলো বুঝি। দিলীপের সম্বন্ধে মিথ্যা টিপ্পনি কেটে এর আগে সে চমৎকার ফল পেয়েছে। বোধ হয় এবারো সে অনুদার একটা মন্তব্য ক'রে অনায়াসে পুরোনো আসনে গিয়ে বসতে পারবে। তাই বড়ো আশায় সে বললে,—আমাকে ফেলে এই বিছানাই তুমি আজকাল বেছে নিয়েছ দেখছি।

কিন্তু সীতা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে বললো,—নিয়েছিই ত'। কী করবে?

—যাই করি, আমার নিজের অধিকার ত' ছাড়তে পারি না। ব'লে সীতাকে পুরন্দর দুই হাতের নিবিড় বন্ধনে লাঞ্ছিত, অভিভূত ক'রে ফেললে।

—ছাড়ো বলছি শিগ্‌গির। সীতা আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সমান জোরে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো।

তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এনে পুরন্দর বললে,—অপরাধ করেছ, শাস্তি নিতে হবে না? আমি তোমার কেউ নই, না?

—কেউই নও ত'। কেউ নও।

—সে-কথা আমি শুনবো কেন বলো? ব'লে সীতার মাথার তলায় হাত রেখে তার মুখটা পুরন্দর মুখের কাছে তুলে আনতে গেলো।

অমনি সীতা পুরন্দরের হাতটা কামড়ে ধরলে। আক্রমণটা একটু শিথিল হ'তেই পুরন্দরের পেটে এক লাথি মেরে সীতা উঠে পড়লো। সমস্ত শরীর তার কাঁপ্‌ছে, অঙ্গারের তপ্ত টুক্‌রোর মতো মুখ দিয়ে তার বেরিয়ে এলো : অসভ্য কোথাকার!

এক মুহূর্ত্তও কাট্‌লো না। টেব্‌লের উপর ছিলো একটা কাঁচের গ্লাশ— পুরন্দর সেটা তুলে নিয়ে সীতার কপালের উপর আছড়ে মারলে। কপাল কেটে, ঝরঝর ক'রে রক্ত ঝরতে লাগলো। সীতা মেঝের উপর লুটিয়ে ককিয়ে উঠ্‌লো : আমাকে মেরে ফেললে গো—

পুরন্দর তার পিঠে লাথি মেরে বললে : চুপ।

উনিশ

একটিমাত্র বারান্দার ব্যবধান

দিলীপ রান্নাঘরে চা খেতে এসেই সীতার চেহারা দেখে চমকে উঠ্‌লো : কপালে এ কী বৌদি? কাটলো কী ক'রে?

মিষ্টি ক'রে হেসে সীতা বললে,—আর বোলো না। তোমাদের জন্মেই ত' এমনি হয়।

—আমাদের জন্মে? কেন, কী হয়েছে?

—পাঁচটা বাজতে-না-বাজতেই ত' চা চাই ব'লে চেঁচিয়ে পড়বে, তাই তাড়াতাড়ি উনুনে জল চাপাতে ছুটে আসতে যেতেই আচলে পা আটকে জান্‌লার সার্সির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। তোমরা ত' কিছু দেখবে না।

দিলীপ এগিয়ে এলো : বলো কী? আইডিন্ লাগাও নি? এখনো যে রক্ত গড়াচ্ছে।

—গড়াক্। নাও, ধরো। ব'লে চায়ের কাপ দিলীপের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

—সে কী কথা? সেপ্‌টিক্ হ'য়ে যেতে পারে,—টিটেনাস্, ইরিসিপ্লাস্—কী না হ'তে পারে এর পর?

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে সীতা বললে,—তোমার ঐ বুক্‌নিগুলি রাখো। তোমাকে সম্মান দেখাতে ও-সব জাঁকালো ব্যারামগুলো ঝাঁক বেঁধে আসবে না—তোমার ভয় নেই। তা ছাড়া আইডিন্ কোথায় পাবো বলো?

—কেন, দাদা ত' ঘরে ছিলেন, এনে দিতে ত' পারতেন। দেখেছেন তিনি?

—না, কী দরকার!

—তুমি বড্ড ছেলেমানুসি করছ। রোস, আমার সেল্ফ্-এ আছে। নিয়ে আসি।

—তোমার চা জুড়িয়ে গেলো যে।

—যাক্।

খানিক পরে ছোট শিশিতে আইডিন ও খানিকটা সার্জিক্যাল তুলো নিয়ে দিলীপ হাজির। বললে,—এসো, লাগিয়ে দিই।

আস্তে-আস্তে দিলীপের কাছে স'রে এসে ভয়ে-ভয়ে সীতা বললে,—খুব জ্বালা করবে না ত'?

—তা একটু করুক্।

আইডিন্ লাগিয়ে দিয়ে দিলীপ বললে,—দাঁড়াও, একটা ব্যাণ্ডেজ ক'রে দি।

বাক্স থেকে নিজের ফর্সা একটা কাপড় ছিঁড়ে সে রোল্ ক'রে ব্যাণ্ডেজ পাকালে। তার পর সীতার চুলের উপর দিয়ে আঁট ক'রে বেঁধে দিলো।

সীতা হেসে বললে,—শক্ত বাঁধুনিটাতে লাভ হ'লো এই, মাথা ধরা সেরে গেলো।

—সব সারবে। দাঁড়াও, আয়নাটা পেড়ে আনি। মুখখানি একবার দেখ।

আয়নায় মুখ দেখে সীতা আঁৎকে উঠবার ভান ক'রে বললে,—এ যে দেখছি একেবারে বাঁদর হ'য়ে গেছি।

দিলীপ হেসে বললে,—তবে দেখো যদি আমি একটা বাঁদর এঁকে বসি, তবে তুমি যেন বোলো না যে তোমার ছবি এঁকেছি!

সীতা হেসে দিলো; বললে,—কষ্ট না ক'রে আয়নায় নিজের মুখখানাই ত' দেখলে পারো। সময় নষ্ট ক'রে ছবি আঁকতে হয় না। ব'লে আয়নাটা সে দিলীপের মুখের কাছে তুলে ধরলো।

দিলীপ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো: বা, বা, আমার চেহারাটা ত' খাসা—এতে দিন কৈ মনে হয় নি ত'? আয়নাটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ফের বললে,—তুমি মনে করো কী? এমন চেহারা তুমি ক'টা দেখেছ?

—আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। এখন আয়নাটা জায়গায় রেখে এসো গে। আমি চা-টা আবার গরম ক'রে দিচ্ছি।

চায়ে চুমুক দিতে-দিতে দিলীপ বললে,—দাদাকে দিয়েছ?

—কখন্। পরে স্বর নামিয়ে অস্বাভাবিক গম্ভীর ক'রে বললে,—শোন। এক্ষুনি বেরিয়ো না যেন।

—কেন?

—তোমার সঙ্গে একটু বেড়াতে বেরুবো ভাবছি। কী এমন রোজ-রোজ বাড়ির মধ্যে ঘুপ্‌টি মেরে থাকা!

—বেরুবে? দিলীপ লাফিয়ে উঠলো: কোথায় যাবে?

তার দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে সীতা বললে,—যেখানে তুমি নিয়ে যাবে সেখানেই। বেশ একটু ফাঁকা—বেশি লোকজন যেখানে নেই।

দিলীপ অস্থির হ'য়ে বললে,—বোস, একটু ভাবি। দাদাকে বলেছ?

চোখ নিচু ক'রে সীতা বললে,—আমার ব'য়ে গেছে। তুমি বলো গে।

বাকি চা-টা এক চুমুকে সাবাড় ক'রে দিলীপ বেরিয়ে গেলো। পড়ন্ত আলোয় পুরন্দর তখনো কী-সব লিখে চলেছে।

—লিখছ?

পুরন্দর কাগজের থেকে চোখ তুলে বললে,—হ্যাঁ। এবার আর টপিক্যাল নিউজ্‌ নয়, দস্তুরমতো একটা উপন্যাস। উপন্যাসে পয়সা আছে।

দিলীও আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বললে,—তা আছে কিছু। কদ্দূর হলো?

—বেশি নয়। স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনা হচ্ছে না, স্বামী অসচ্চরিত্র, স্ত্রী তার প্রতিশোধ নিতে অন্য পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে— এই পর্যন্ত।

অজান্তে দিলীপের হাত-পা কেমন অসাড় হ'য়ে এলো। কী যে ঠিক বলতে এসেছে তা আর মনে করতে পারলো না।

এই সঙ্কোচের ভাবটা পুরন্দর লক্ষ্য করলো। লেখার মধ্যে চোখ ডুবিয়ে বললে,—কি রে, কোথাও বেরুলি না এখনো?

সেল্‌ফ্‌ থেকে একটা বই তুলে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখতে-দেখতে দিলীপ বললে,—এই এবার বেরুবো।

লেখার মধ্যে ততোধিক ডুবে গিয়ে পুরন্দর বললে,—তোর বৌদিকেও ত' এক-আধ দিন নিয়ে গেলে পারিস্।

মৌখিক-পরীক্ষা-দিতে-আসা ছাত্রের মতো জোর গলায় দিলীপ বললে,—বৌদিই আজ যেতে চাচ্ছে।

নির্লিপ্ত নিষ্প্রাণ কণ্ঠে পুরন্দর বললে,—স্বচ্ছন্দে।

এ-ঘরে দিলীপের আর থাকবার দরকার করে না। এবারে পালাতে পারলে

সে বাঁচে। পুরন্দর মাথা না তুলে চোখের নিচে মেঝেকে উদ্দেশ করে বললে: এর জন্যে আমার মত নিতে এসেছিলি? এর আবার একটা মত কী!

দিলীপ ছুটে এসে সীতাকে বললে,—মঞ্জুর! চলো। বাক্ আপ্।

মুখ ভার ক'রে সীতা বললে,—ইস্! মঞ্জুর না হ'লে বুঝি আর আমি যেতে পারতাম না!

মাথা চুলকে দিলীপ বললে,—সে অনেক হাঙ্গাম। ও-সব হচ্ছে উপন্যাসের ব্যাপার। ঘরের জীবনে আমাদের অতো সব বাবুয়ানি সইবে না। চলো।

—তোমার দাদা আর কী বললেন?

—বললেন বেশ ঠাণ্ডা রঙের একখানা শাড়ি প'রে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ আছে ব'লে পিঠে কোনো রকমে বেণী একটা ঝুলিয়ে ঝটপট্ বেরিয়ে পড়তে।

—কোথায় তবে যাবে?

—তা রাস্তায় নেমে ঠিক করা যাবে 'খন। বেড়াতে যাবো এইটেই great—কোথায় যাবো সেইটেতে বিশেষ এসে যায় না।

পুরন্দরেরই চোখের সামনে দিয়ে দিলীপ আর সীতা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো। সীতা একটিবারো এদিকে চেয়ে গেলো না। নম্র গেরুয়া রঙের একখানি পুরোনো সিল্ক, চাঁদের আলো প'ড়ে পাহাড়ে-নদীর মতো ঝলমল্ করছে—কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ব'লে মুখখানি কেমন জানি অদ্ভুত দেখাচ্ছে,—পিঠে শুকনো বেণী—পায়ে ষ্ট্র্যাপ্-বাঁধা স্যাণ্ডেল—সামনে দিয়ে যাবার সময় আঁচলটা পিঠের উপর দিয়ে টেনে অনাবৃত ডান হাতটা ঢেকে নিলে।

পুরন্দর চুপ ক'রে ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ ব'সে রইলো। আলো অনেক আগেই চ'লে গেছে—অক্ষর দেখা যায় না, তবু উঠে দাঁড়িয়ে সুইচ্টা টেনে দিতে ইচ্ছা হলো না। দু'হাতে মুখ ঢেকে অন্ধকারে ব'সেই রইলো। পরে কী ভেবে উঠে পড়লে ও স্নান না ক'রেই গায়ে জামা দিলে। ঘরের বাইরে চ'লে এসে মালেন-স্ট্রীটে-থাকতে-কেনা দু'-দু'টো মোটা তালা দিয়ে শোবার ও বসবার ঘর দুটো বাইরে থেকে বন্ধ করলে। চাবি দু'টো নিজের পকেটেই রইলো। ঝি চা'র বাসনগুলি ধুচ্ছিল, তাকে বললে,—আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। খুব জরুরি কাজ। ওরা এলে বলো যে রাত্রে আমি খাবো না। বুঝলে? মনে থাকবে ত'? কী বলবে বলো দিকি? পুরন্দর একটু থামলো।

ঝি পুরন্দরের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থেকে তার মুখের কথার পুনরাবৃত্তি করলে।

—হ্যাঁ, এই যে বেরুচ্ছি সেই কাল সকালে আসবো। রাত্রে

খাবো না। মনে থাকে যেন। ব'লে পুরন্দর সিঁড়ি দিয়ে হন্ হন্ করে নেমে গেলো।

তারপর—ঘণ্টা খানেক বাদে দিলীপ আর সীতা যখন ফিরে এলো তখন কাপড় বদলাতে শোবার ঘরের দিকে যেতে গিয়ে দেখে দরজায় তালা লাগানো। সীতা চমকে উঠ্‌লো : এ কী ঝি?

ঝি বললে,—তোমরা যেতেই বাবু-ই ঘরে তালা দিয়ে চ'লে গেছেন।

—সে কী কথা? চাবি কোথায়?

—চাবি আমার কাছে দিয়ে যান নি। ব'লে গেছেন সেই কাল সকালে ফিরবেন, রাতে আর খাবেন না।

—তা না খান্, কিন্তু দরজা বন্ধ থাকলে আমার চলবে কী ক'রে? এ কী উৎপাত দেখ ত', ঠাকুরপো।

দিলীপ হাত দিয়ে তালাটার শক্তি পরীক্ষা ক'রে বললে,—এ ত' মন্দ ছেলেমান্‌সি নয়। নিশ্চয়ই কোনো জরুরি কাজে বেরিয়েছেন—এই এক্ষুনি এসে পড়বেন।

ঝি প্রতিবাদ ক'রে উঠলো: না, তিনি আসবেন না। আমাকে বারে-বারে ব'লে গেছেন আপিস ক'রে সেই সকালে ফিরবেন। খাবেনো না।

—তুমি ত' সব জানো। দিলীপ প্রায় ধম্‌কে উঠ্‌লো। পরে সীতাকে বললে,—আমার ঘরে চলো। দাদা যখন আর খাবেনই না তখন আরো একটু দেরী ক'রে রান্না বসালেও চলবে। আর এর মধ্যে যদি এসে গেলেনই, তবে ত' আর কথাই নেই।

দিলীপের ঘরে গিয়ে চেয়ারে ব'সে সীতা বললে,—জন্মের মধ্যে একদিন একটু বেড়াতে বেরিয়েছি, এক ঘণ্টা বাড়িতে ব'সে থাকলে তাঁর কী হ'ত? টিউশানিতে যাবারো তাঁর এখনো সময় হয় নি। আমরা যেতে-না-যেতেই তিনিও বেরিয়ে পড়লেন।

দিলীপ বললে,—ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এই এলেন ব'লে।

তার পর গল্প নিয়ে মেতে উঠ্‌লো—জলযানসঙ্কুল চৌরঙ্গির লীলা-চাঞ্চল্য, এই পারে মাঠের নির্জ্জনতা—আউটরাম ঘাটে নোঙর-নামানো অতিকায় জাহাজের কোন্ একটা ফোকরে ক্ষীণ একটু আলো,—কতো কী অসংলগ্ন কথা, মানে নেই এমন-সব ইসারা, মনে রাখবার মতো নয় এমন-সব টুকরো চাউনি।

এক সময়ে সীতা অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো; বললে,—যাই, উনুন ব'সে যাচ্ছে।

দিলীপ বাধা দিয়ে বললে,—আবার ধরাতে কতোক্ষণ। আমিই ধরিয়ে দেব ঠিক। আমি সব পারি—কবিতা লেখা, ছবি আঁকা, উনুন ধরানো—কী নয়?

—ছাই পারো।

—দাঁড়াও, আমাকে আগে এক গ্লাশ জল এনে দাও। ব'লে দিলীপ উৎসুক হ'য়ে টেব্‌লের দিকে তাকালে: আমার গ্লাশ কোথায় গেলো?

মৃদু হেসে সীতা বললে,—ওটা ভেঙে গেছে।

দিলীপ বললে,—ভেঙে গেছে? কে ভাঙলো? কে আমার টেব্‌ল হাতড়ায়?

—আমি ভেঙেছি। ফিক্ ক'রে সীতা হেসে দিলো।

—তুমি ভেঙেছ! দিলীপ মুখের এমন একখানা ভাব করলো যেন তা হ'লে তার কিছু আর বলবার নেই।

সীতা বললে,—আমি ভেঙেছি শুনে বুঝি জল হ'য়ে গেলে। অন্য লোক ভেঙেছে জানলে তার মাথা ফাটাতে বুঝি। ব'লে সে রান্নাঘর থেকে কাঁসার গ্লাশে ক'রে জল নিয়ে এলো।

জল খাওয়া হ'লে সীতা এগিয়ে এসে বললে,—নাও, ওঠো। উঠে চেয়ারটায় বোস। তোমার বিছানাটা পেতে ফেলি।

তক্তপোষে হামাগুড়ি দিতে-দিতে সীতা বিছানার চাদরটা টান্ করতে লাগলো।

গম্ভীর গলায় দিলীপ বললে,—সত্যি বড়ো অসুবিধা হলো, বৌদি।

তক্তপোষ থেকে নেমে প'ড়ে সীতা বললে,—কিসের?

সীতার মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা ক'রে দিলীপ বললে,—তুমি তবে আজ রাতে শোবে কোথায়?

সর্ব্বনাশ! সীতা এতক্ষণে সব বুঝতে পেয়েছে। দুই ঘরেরই দরজা বন্ধ ক'রে যাওয়ার মধ্যে পুরন্দরের যে কী অন্যায় ও কুৎসিত ইঙ্গিত ছিলো তা ধরা পড়তে আর বাকি নেই। ছি ছি ছি, সর্ব্বাঙ্গ তার ঘৃণায় কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। প্রায় চেঁচিয়ে বললো: যে ক'রে হোক্, ও-দরজা তোমার খুলে ফেলতেই হবে ঠাকুরপো।

স্নিগ্ধস্বরে দিলীপ বললে,—না-ই বা খোলা হ'ল। দরজায় খিল লাগিয়ে তুমি আমার ঘরে শোবে, আমি বারান্দায় পাহারা দেব। আর যদি অচেনা বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে না পারো—

সীতা অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো : না, না, তুমি কয়লা ভাঙবার হাতুড়িটা নিয়ে এসো, যে ক'রে হোক, তালাটা ভেঙে ফেল তুমি—

—তা না-হয় ফেলছি। কিন্তু অচেনা বিছানায় শুয়ে ঘুম যদি তোমার সত্যি না-ই আসত, আমরা দু'জনে ব'সে তোফা গল্প করতাম।

কিন্তু সীতা কয়লা ভাঙবার হাতুড়িটা কুড়িয়ে এনেছে। বললে,—নাও, ধরো—দেখব তোমার হাতের কতো জোর!

দু'চার বাড়ি মারতেই তালার মুখটা খুলে গেলো। সীতা হাঁফ ছেড়ে বললে, —বাঁচলাম।

ঘরে গিয়ে আলো জ্বালালো। দিলীপ তার নিজের ঘরে চ'লে গেছে।

কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে সীতা ভাবতে লাগলো,—ঘরে না-হয় সে শুলো, নিজের চেনা বিছানায়ই, কিন্তু এতো ছোট মনে এমন কদর্য্য সন্দেহ ক'রে যে ঘর বন্ধ রেখে চ'লে যেতে পারে তার কাছে এই ব্যবধানেরই বা মর্য্যাদা কী? ইলেকট্রিকের প্রখর আলোও তার চোখের অন্ধকার দূর করতে পারলো না।

কুড়ি

আবার রবিবার

বড়ো বেলা—হ্যাল্‌বিয়নের শো সুরু হবে সাড়ে ছ-টায়। ছ-টার আগেই পুরন্দর সেখানে পৌঁচেছে। ব্যাঙ্কে তখনো তার টাকা ষাটেক ছিলো—সব তুলে নিয়ে এসেছে। যা থাকে অদৃষ্টে—ধার পরে করলেই চলবে। দিন পনেরো পরে উপন্যাসটার বাবদ এক প্রকাশকের কাছ থেকে এক দমকে একটা মোটা টাকা পাবার সম্ভাবনা আছে। দেখা যাক্। প্রকাশক লোক ভালো, হয় ত' ব্যর্থ করবে না।

সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে সামনের রাস্তায় সে পাইচারি করতে লাগলো। এখনো কিটি এলো না। বোধ হয় এলো না আর! অন্য কোথাও শিকার পেয়েছে নিশ্চয়। সময়নিষ্ঠা সম্বন্ধে কিটির কাছে এতোটা প্রত্যাশা না করলেও চলে।

ফার্ষ্ট-বেল্ প'ড়ে গেলো। আর আশা নেই। আজকের জন্যে নেহাৎই ষাট টাকা তার বেঁচে গেলো যা হোক্। তা হ'লে সে কোনো সিল্ক-ষ্টোর্‌স্‌এ গিয়ে সীতার জন্যে পছন্দ ক'রে একখানা সাড়ি কিনবে, এক বাক্স অডিকোলোন্ সাবান, এক কৌটো মার্মেলেড্,—এবং বাকি সব টাকাটা তার হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে, তার মুখ কি-রকম বদলায় তাই সে দেখবে। এবার আর সে না-হেসে

থাকতে পারবে না, বুকের কাছে টেনে এনে এবার সে স্বচ্ছন্দে তার কপালের কাটা জায়গায় সহজেই হাত বুলিয়ে দিতে পারবে। মনে-মনে সীতার সেই মুখ স্পষ্ট সে দেখতে পাচ্ছে।

সেণ্ট্-এর ঝাঁজে তার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন আড়ষ্ট ক'রে কে একজন প্রায় তার গা ঘেঁষে বক্স-অফিস্এর দিকে এগিয়ে গেলো। কিটি! আনন্দে পুরন্দর আরেকটু হ'লে চেঁচিয়ে উঠেছিলো আর-কি! কিন্তু কিটির নির্ব্বিকার কঠিন মুখ দেখে সে থেমে গেলো। এখন আবার টিকিট কিনবার কি হয়েছে? সোজা বেরিয়ে পড়লেই ত' হয়। টিকিটটা কেটে কিটি একটুখানি দাঁড়ালো। সেকেণ্ড্-বেল্ বাজছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পুরন্দরকে পরের টিকিটটা কিনতে হলো। কিটি সমস্ত পৃথিবীকে উপেক্ষা ক'রে সিটে গিয়ে বসেছে। এবং আলো নিভ্তেই পুরন্দরো গিয়ে দরজায় টিকিট দেখালে। চেকার টর্চ জ্বেলে তাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে এলো। কিটি স্কার্টটা এমন ভাবে একটু গুটিয়ে নিলে যেন একটু ছোঁয়া লাগলেই তার জাত যাবে।

পাশাপাশি আবার তারা বসেছে, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই। ফিল্ম্টা যতোই বাজে হোক না কেন, লোক হয়েছে বিস্তর—তাদের রো-টাও ফাঁকা নয়। খানিক আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অকারণে কেন যে সে বিমনা হ'য়ে পড়েছিলো ভাবতে গিয়ে এখন হাসি পেলো। কিটি ঠিক এসেছে। সেই দিনের পোষাকটা প'রে আসে নি ব'লে তক্ষুনি চিনতে পারে নি। বাইরে বেরুলে তার পোষাকের রঙে বুঝি তেমন উগ্রতা থাকে না—আজকের পোষাকটা ফিকে, ভদ্র, পুরোমাত্রায় সুরুচিসঙ্গত। বডিস্টা একটু ঢিলে—গলার দিকে V-র মতো কাটা, রঙটা যাকে বলে pale saxe; আর স্কার্টটা কালো। কালো রঙ যে সব রঙের চেয়ে গম্ভীর, সব রঙের চেয়ে রহস্যময়—পুরন্দর আজ প্রথম তা বুঝলে। মাথায় টুপি থাকাতে মুখখানি সুকুমার হ'য়ে উঠেছে।

এই কিটিকে সে চেনে—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চেনে, পুরন্দর নিজেই যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

খানিক বাদে ফিস্ফিসিয়ে প্রশ্ন করলে,—টিকিট কেটে ঢুকে পড়লে কেন?

ছবির পরদার দিকে দুই চক্ষু অবিচল রেখে কিটি আপন মনে বল্বার মতো ক'রে বললে,—এখন ত' সবে সন্ধ্যে। আরো একটু রাত হোক্। তারপর পুরন্দর পাছে আরো কিছু অবান্তর কথা পাড়ে সেই ভয়ে তাকে শাসন করবার জন্যে সে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে: ছবি দেখ।

দুই চোখ মেলে পুরন্দর অন্ধকার দেখতে লাগলো! সময় আর ফুরোয় না।

আরো খানিক বাদে কিটি তেমনি স্বগত বললে,—আমি এবার উঠ্‌বো। ঘড়ি ধ'রে ঠিক পাঁচ মিনিট পরে তুমি উঠবে। বুঝলে ?

—তোমাকে পাবো কোথায় ?

—পূবে খানিকটা এগিয়ে। আমার পিছনে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ গজ ব্যবধান রেখে হাঁটতে থাকবে।

নিশ্বাস বন্ধ ক'রে পুরন্দর বললে,—কদ্দূর ?

—যতোক্ষণ না আমি ট্যাক্সি নিই। এ-রাস্তায় কয়েকটা চেনা ট্যাক্সি আমার মিলে যাবে ঠিক।

ছবির পরদায় অভিনয়ের কি-একটা রোমহর্ষক প্যাঁচ দেখে তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনিতে জনতা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে। পুরন্দর তাড়াতাড়ি জিগ্‌গেস করলে : তার পর ?

স্বর একটু চড়িয়ে কিটি বললে,—আমাকে ট্যাক্সিতে উঠতে দেখেই তুমি দাঁড়িয়ে পড়বে। যদি সামনে কোথাও গলি থাকে ত' ভালোই, গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়াবে—তোমাকে তুলে নেব।

—আর যদি ধারে-কাছে কোথাও গলি না থাকে ?

—আমি ট্যাক্সি নিয়ে সামনে বেরিয়ে যাবো। এ-রাস্তার ডাইনে বা বাঁয়ে যেখানে প্রথম গলি দেখবে, সেখানেই আমার ট্যাক্সি পাবে। সেখানে তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা ক'রে আছি। গাড়ির নম্বরটা আগে না-হয় একটু দেখে রেখো যাতে ভুল না হয়।

করতালির শব্দ জুড়িয়ে এলো। কিটি বললে,—এবারে চুপ।

আরো একটুখানি অপেক্ষা ক'রে কিটি স্কার্টটা পাট্‌ ক'রে উঠে পড়লো।

সেই পাঁচ মিনিট আর কাটে না। কী ক'রে বা বুঝবে কখন ঠিক পাঁচ মিনিট পার হ'য়ে গেলো ? পাশের কোনো ভদ্রলোকের হাতে বা পকেটে ঘড়ি আছে কি না জিগ্‌গেস করারো কোনো মানে হয় না। পাঁচ মিনিট তাকে আরো অপেক্ষা করতে বলার অর্থ হচ্ছে যাতে লোকের সন্দেহ না হয় যে সে ঐ শ্বেতাঙ্গীর পদানুসরণ করছে। কিটি তার সম্ভ্রান্ততা বাঁচাবার জন্যে ভীষণ ব্যস্ত।

পুরন্দরের মনে হলো পৃথিবী হঠাৎ দ্রুতলয়ে ছুটে চলেছে—বায়স্কোপটা অনেকখানি এগিয়ে গেছে, তাকে একটু জান্‌বারো অবসর দেয় নি। অন্ধকারে এক যুগ কাটিয়ে তার কি না এতোক্ষণে মনে হলো যে পাশের সিট্‌টা খালি— কিটি নেই। পকেট হাতড়ে দেখলো,—না, নোটের স্তূপটা পাৎলা হয় নি। পাঁচ মিনিট বসতে বলেছিল ব'লে কি বায়স্কোপ প্রায় শেষ ক'রে উঠ্‌তে হয় নাকি ?

এতক্ষণে নিশ্চয় তাকে ধায়ে-পায়ে কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব'সে-ব'সে পায়ের তলায় যে ঘাস গজাতে দেয় তার এমনি হয়।

গা ঝাড়া দিয়ে পুরন্দর উঠে পড়লো। অন্ধকারে একজনের পা মাড়িয়ে দিলে। লোকটা ধমকে উঠ্‌লো : চোখে দেখতে পান্ না? পুরন্দরের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রায় ছুটে সে বাইরে চ'লে এলো—আলো দেখে লোক দেখে গাড়ি দেখে—রাস্তাময় ব্যস্ততার সাড়া পেয়ে তার মনে হলো বেশি দেরি হয় নি। একটু আগে তার মনে হয়েছিল রাস্তাঘাট বুঝি নির্জ্জন হ'য়ে গেছে—দোকান-পাট সব বন্ধ—পেট ভরাবার মতো পর্য্যাপ্ত খাবারো সে হোটেলে গিয়ে পাবে না। টাকাটা শেষ পর্য্যন্ত যদি বেঁচেই যায় তবে সীতার সিল্ক-এর সাড়ির সঙ্গে সস্তা দেখে সে একটা ঘড়ি কিনে নেবে। সময়কে এমনি ভাবে ছাড়া পেতে দেবে না।

পূবে—ওয়েলেস্‌লির দিকে। কয়েক পা এগোতেই পুরন্দর দেখলে—সামনেই কিটি। হাত চারেক মোটে দূরে। আরো একটু দেরী করলে কিছু ক্ষতি হ'ত না—এখন তার ঘাড়ের ওপর গিয়ে না পড়ে। পেছন ফিরে দেখতে পেলে কিটি তাকে কী ভাববে? লজ্জার সীমা থাকবে না। পুরন্দর পিছিয়ে পড়লো। এমন ভাবে চলতে লাগলো যেন জীবনে তার কোনো উদ্দেশ্য নেই—কোথায় যে যাবে তা সে নিজেই জানে না।

হিসেব মিললো পদে-পদে। মট্ লেন্-এর মোড়ে এসে পুরন্দর দেখলে কিটি একটা চকোলেট-রঙের ট্যাক্সিতে চুপ ক'রে ব'সে আছে। ড্রাইভারটা এ-পাশ ও-পাশ চোখ ফেলছে বটে, কিন্তু গাড়ি চালাবার নাম নেই। ও-পাশের ফুট্‌এ দাঁড়িয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে পুরন্দর এ-দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলো। মিছিমিছি দেরি করতে এখন তার বেশ ভালো লাগছে। দেখা যাক না, কিটি কী করে।

কিটি কী আর করবে, ডান হাঁটুর ওপর বাঁ পা তুলে দিয়ে হেঁট হ'য়ে ব'সে তার ব্যাগ ঘাঁটছে। ট্যাক্সিটার গা ঘেঁষে যারা যাচ্ছে তাদের দিকে কিটির কণামাত্র কৌতূহল নেই—তার জীবনে এখন গভীরতর সমস্যা, ব্যাকুলতর বাসনা—পুরন্দর ঠিক আসবে কি না। প্রতীক্ষায় সমস্ত ভঙ্গিটা তার কঠিন।

কিটি আরো খানিকক্ষণ বসুক্। পুরন্দর এক টিন মার্কোভিচ্ কিন্‌লো। চেয়ে দেখলো কিটি তেমনি ব'সে আছে। তার কাছে পুরন্দরের আসা ছাড়া জীবনের এই মুহূর্ত্তে আর কোনো বড়ো ঘটনা সে আশা করতে পারে না।

সেনাপতির ভঙ্গিতে—কোনোদিকে না চেয়ে—সোজা, তীরের মতো সোজা, পিস্তলের গুলির মতো নির্ভুল গতিতে পুরন্দর ট্যাক্সিটার কাছে এগিয়ে গেলো।

সেনাপতিরই বলদৃপ্ত ভঙ্গিতে দরজাটা সে খুলে ফেললে—ড্রাইভারটাকে বিস্মিত হবার পর্য্যন্ত সময় দিলে না। কিটি দুই চোখের দীর্ঘ পাতা দু'টি তুলে একবারটি হয়ত চেয়ে দেখলো, কিন্তু সারা শরীরে কোথাও এতোটুকু চাঞ্চল্য ফুটলো না। ব্যাগে কী যেন সে খুঁজে পাচ্ছে না—তা বের করার আগে পৃথিবীতে আর কোনো কিছু তার আপাততো দেখবার নেই।

ড্রাইভার অবলীলাক্রমে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো।

ব্যাগটা কোলের উপর রেখে কিটি পিঠ ছড়িয়ে এতক্ষণে আরাম ক'রে বললো যা হোক্। কিন্তু পাশের লোকটিকে সে চেনেই না।

পুরন্দর এগিয়ে এসে কিটির বাহু স্পর্শ ক'রে বললে,—এমন চুপ ক'রে ব'সে আছো কেন?

কিটি হঠাৎ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললে,—ও পাশে স'রে গিয়ে বোস। এখন নয়। রাস্তাটা পেরোক্।

পুরন্দর স'রে বসলো। এত হাওয়ায়ো কিটি টুপিটা খুলে মুখে হাওয়া করতে লাগ্‌লো ও একসময় টুপিটা মুখের কাছে এমন ভাবে লাগিয়ে রাখলো যাতে দূর থেকে সহজে মুখ তার চেনা না যায়।

শুকনো গলায় পুরন্দর বললে,—কিছু ড্রিঙ্ক নিতে হবে না?

আপন মনে কিটি বললে,—ড্রাইভারকে বলা আছে। দু'টো বেক্স্ শুধু।

—কিছু ওয়াইন্?

তেমনি মুখ ঢেকে কিটি বললে,—না, দরকার নেই। আমাকে শিগ্‌গির ফিরতে হবে।

কোথা দিয়ে কে জানে ড্রাইভার একটা নির্জন গলিতে নিয়ে এলো। ইজের-পরা একটা লোককে সে কী বললে, সে দু'মিনিট পরে দুটো বিয়ার, দুটো কাঁচের গ্লাশ ও একটা কর্ক-স্ক্রু এনে দিলো। পুরন্দর তার পাওনা মিটিয়ে দিতেই গাড়ি আবার চললো। ঝুঁকে প'ড়ে পুরন্দর ডাকলে: ডার্লিঙ!

কিটি সন্ত্রস্ত হ'য়ে বললে,—চুপ। এ-পাড়াটা আগে ছাড়ি।

—আমরা কোথায় যাচ্ছি?

—ব্যারাকপুর গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড। ধরো মাইল সাতেক। রাজি?

—তার চেয়েও বেশি যেতে পারি—যদি তুমি চাও।

—আজ হবে না, ক্ষমা করো,—আমাকে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরতে হবে।

ধর্ম্মতলা পেরিয়ে সার্কুলার রোডে প'ড়ে কিটি ন'ড়ে চ'ড়ে বসলো। অমনো-

যোগে একখানি পা আস্তে-আস্তে বাড়িয়ে দিয়ে পুরন্দরের পায়ের তলায় নিয়ে এলো। দেখতে দেখতে শেয়ালদাও মিলিয়ে যেতেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে কিটি হাসলে, মুখ থেকে টুপিটা সরিয়ে সিট্-এর ওপর রাখলো। পুরন্দরের একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে ডাকলে : ডার্লিঙ!

মুহূর্তে পুরন্দরের শরীরে গতির এই উদ্দীপ্ত নেশা ধ'রে গেলো। কোথাও কোনো তার আশ্রয় বা পরিচয় আছে ব'লে মনে হলো না। হঠাৎ কিটিকে সে জড়িয়ে ধ'রে রুগ্ন শিশুর মতো নিতান্ত জলো গলায় বললে,—তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না, কিটি।

—বাসি না নাকি? একটু বাসি বই কি ডার্লিঙ! ব'লে কিটি পুরন্দরের ঘাড়ের ওপর আঙুল বুলোতে লাগলো।

পুরন্দর বললে,—তবে খানিক আগে আমাকে তুমি ছুঁতে দাও নি কেন?

—ওখানে যে বড্ড লোক। কেউ যদি দেখে ফেল্‌তো?

—কেউ দেখতে না পেলে মজা কোথায়? এ সব ব্যাপারে উন্মুক্ত একটা নির্লজ্জতা না থাকলে আনন্দ নেই।

—কিন্তু আমার ব্যবসার তাতে ক্ষতি হ'তে পারে।

—কেন?

—তুমি কিছু মনে করো না ডার্লিঙ,—আমি চাই না যে কেউ আমাকে কোনো বাঙালির সঙ্গে ট্যাক্সিতে বেড়াতে দেখে।

—কেউ মানে? তোমার আর-আর য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খদ্দের?

—Don't be a cad. এবার থেকে স্যুট্ প'রে এসো। বুঝ্‌লে?

—হুঁ! অজান্তে কখন পুরন্দর আলিঙ্গনটা একটু শিথিল ক'রে আনলে। বললে,—আমি ত' উপযুক্ত দাম দিচ্ছি।

কিটি তার কাঁধে আস্তে দু'টো চাপড় দিয়ে বললে,—তাতে কী হয়েছে? আমি ত' এখন একমাত্র তোমার।

হ্যাঁ, ঐ তুচ্ছ কারণে মন খারাপ ক'রে লাভ কী? ঐ তুচ্ছ কারণে মুখ ভার করবার মতো হাস্যাস্পদ আর কী হ'তে পারে?

একুশ

অন্ধকারের আভা

টালার পোল্ পেরিয়ে গেলো দেখ্‌তে-দেখ্‌তে। অন্ধকার এবার ক্রমশ ঘন হ'য়ে আসছে। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে, ধুলো উড়িয়ে, ঘন-ঘন হর্ন বাজিয়ে—উদ্দাম গতির নেশার সঙ্গে কিটির উজ্জ্বল চামড়ার গন্ধ ও তাপ পুরন্দরকে বিভোর, অবশ ক'রে ফেললে। তার পর রাস্তা যখন আরো ফাঁকা হ'য়ে এলো, তখন গাড়ির স্পিড্ আরো বাড়িয়ে দিলে। আলো আর দেখা যায় না—মাঠ পেরিয়ে মুটে-মজুরের বস্তির যা দু' একটা আলো এদিকে-ওদিকে মিট্‌মিট্ করছে তা কিছু নয়। সেদিন ছিলো ছোট ঘরে রূঢ় নির্লজ্জ আলো; আজ প্রকাণ্ড আকাশের নিচে অতি নির্লজ্জ অন্ধকার।

পুরন্দর কিটিকে—সাবানের ফেনার মতো নরম শাদা তুল্‌তুলে কিটিকে নিজের বুকের উপর টেনে আন্‌লো। চুলগুলি কপালের দু'পাশে গুছোতে-গুছোতে পুরন্দর স্বপ্নগ্রস্তের মতো ডাকলে,—কিটি! লিলি-লাভ্‌লি! ডিয়ার ডার্লিং। My white blossom!

কিটি চোখ বুঁজে বললে,—Kiss me...here, here...

পুরন্দর কিটির চুলে, কপালে, চোখে, চিবুকে, ঘাড়ে, বুকে অজস্র চুমো খেতে লাগলো। স্পর্শের ঝড়ে সে যেন অন্ধ হ'য়ে গেছে। এই উন্মত্ততায় তার শরীরে যেন নতুন স্বাস্থ্য সঞ্চার হচ্ছে, মনে গভীর বিশ্রাম! এই না হ'লে সে বাঁচে কী ক'রে?

কিন্তু বেক্‌স্ দু'টোর ছিপি এখনো খোলা হয়নি—কিটি শিস দিয়ে উঠ্‌লো।

ড্রাইভার পরম নির্বিকারের মতো ট্যাক্সিটাকে এতোক্ষণ সামনের দিকে অনবরত উড়িয়ে নিয়ে চলেছিলো—কিটির ইসারা পেয়ে দিলো সেটাকে থামিয়ে।

ড্রাইভার বোতল-গ্লাশের ব্যবস্থা করতে লাগলো।

গ্লাশটায় এক চুমুক দিয়েই কিটি নাক কুঁচকে বললে,—বড্ড তেতো। আজকে কেমন ভালো লাগছে না এটা—ব'লে বাইরে বাকিটা উপুড় ক'রে ঢেলে দিলে।

অতএব পুরন্দরো সবটা খেতে পারলো না। বললে,—কিছু ওয়াইন্ নিয়ে এলেই ত' হ'তো—

—না, দরকার নেই। তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেল ওটা।

—তাড়াতাড়ির কী হয়েছে?

—আমাকে যে সকাল-সকাল ফিরতে হবে।

—কেন ?

—আছে কাজ।

—কী কাজ ? পুরন্দর রুক্ষ গলায় বললে,—অন্য কোথাও appointment আছে বুঝি ?

—**Don't be a silly fool.** ড্রাইভারকে এবার স'রে যেতে বলি।

—না। আরো এগোব।

—আজ হবে না। আমাকে বাড়ি যেতে হবে। **Please.** ব'লে কিটি তার নিটোল নিখুঁত বাহু দিয়ে পুরন্দরকে আস্তে বেষ্টন ক'রে ধরলো।

ড্রাইভার গাড়ি ফেলে মাঠের দিকে গুটি-গুটি পা বাড়াচ্ছে।

পুরন্দর হাতের গ্লাশটা রাস্তার ওপর উপুড় ক'রে বললে,—বাড়িতে তোমার কী আছে আজ ?

—তাতে তোমার কিছু এসে যাবে না।

—বলোই না !

—কী করবে তুমি শুনে ?

—বলতেই বা কী দোষ ? আমাকে তুমি তোমার বন্ধু ব'লে ধ'রে নিচ্ছ না কেন ?

বডিস্-এর বোতামের ওপর কিটির আঙুলগুলি অসাড় হ'য়ে এলো। বললে,—আমার ছেলেটির ভারি অসুখ।

—তোমার ছেলে ! পুরন্দরের শরীরের ফুটন্ত রক্তে কে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোসাইয়্যানিক য়্যাসিড্ ঢেলে দিলে। স্নায়ুগুলো প্রথমটা উজ্জীবিত হ'য়ে কেমন অবশ হ'য়ে এলো। মুখ আর জিভে কোনো অনুভূতি নেই।

—অসুখটা বেড়েছে। একা বুড়ো মা—ভাইটা ত' কার্ণিভ্যাল্-এ জুয়োর আড্ডা বসিয়ে দিব্যি পয়সা লুটছে। এ-সব দিকে সে মাথা গলায় না ! মা নিশ্চয়ই ছেলেটাকে নিয়ে ভীষণ বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন ! তাই ত' তোমাকে সকাল-সকাল ফিরতে বলছি। ব'লে কিটি আরো ঘন হ'য়ে স'রে ব'সে পুরন্দরের গালের ওপর তার গাল রাখলো।

তাকে আস্তে সরিয়ে দিয়ে পুরন্দর বললে,—তোমার মা—তোমার মা এ-সব জানেন ?

—জানেন বৈ কি। কিন্তু, **dash it all**—ও-সব ভেবে কী করবে ? বড্ড দেরি ক'রে ফেলছ যে।

—তোমার স্বামী! বেঁচে আছে?

—আছে।

—কোথায়?

—রেঙ্গুনে। কি একটা accident-এ হাঁসপাতালে প'ড়ে আছে পাঁচ মাস।

—সেই জন্যেই কি তোমার এই দুর্দশা নাকি?

—কতকটা।

—টাকা পাঠায় না?

—কী ক'রে পাঠাবে?

—তোমার তবে চলবে কী ক'রে?

—কী ক'রে চলবে তা একটা আঁচ সে করতে পারছে। কিন্তু এতো কথা কেন? রাত অনেক হলো।

পুরন্দর ঘৃণার সঙ্গে বললে,—সেও জানে নাকি?

—জান্‌লে ক্ষতি কী! আমি ত' আর না খেয়ে মরতে পারি না। ছেলেটাকে ত' বাঁচাতে হবে। স্বামীকে ত' আমাকেই খরচ পাঠাতে হয়।

—তোমার স্বামী তা গ্রহণ করে?

—গ্রহণ না করলে বাঁচবে কী ক'রে? আগে প্রাণ, না আগে টাকা?

—আগে প্রাণ,—আমি হ'লে ত' ককখনো ও-টাকা ছুঁতাম না। মরতাম—তাও স্বীকার।

—এতো সামান্য কারণে ম'রে কী এমন স্বর্গলাভ হবে। তুমি কি ব'সে-ব'সে এমনি বক্‌বক্ করবে নাকি? বললাম না আমার ছেলের খুব অসুখ। নিতান্তই টাকার দরকার ব'লে আজ বেরিয়েছিলাম—

কিটি তার ছেলের জন্যে অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষে কেমন যেন জলো হ'য়ে এলো। কিটির রঙ গেলো চুপ্‌সে, স্পর্শের দীপ্তি গেলো জুড়িয়ে। পুরন্দর নিজের মনে অস্বাস্থ্যকর গ্লানি বোধ করতে লাগলো। কিটিকে ছোঁবার জন্যে একটি আঙুলো আর বাড়াতে পারলো না। কিটি এতো কুৎসিত হ'য়ে গেছে—যেন সিংহের চামড়ায় গাধা! দস্তুরমতো তার প্রতি তার নিদারুণ ঘৃণা উপস্থিত হলো। তাড়াতাড়ি সিট্ ছেড়ে উঠে প'ড়ে হর্নটা জোরে বাজিয়ে দিলে।

ড্রাইভার এসে হাজির।

কিটি ভুরু বেঁকিয়ে বললে,—এ কী?

—এবার ফিরবো।

পুরন্দরের ভঙ্গিটা কঠিন, মুখের ভাবে স্থূল ঘৃণা! কিটিও তাই স্বরটা নরম না ক'রেই বললে,—কিন্তু আমার টাকা?

—টাকা পাবে বৈ কি।

—না, এক্ষুনি দাও।

—না দিলে কী করতে পারো?

—কী করতে পারি? এই কথা? ড্রাইভার!

পুরন্দর হেসে উঠ্‌লো; বললে,—ড্রাইভারের আমিও শরণাপন্ন হ'তে পারি। ড্রাইভার শেষ পর্য্যন্ত যে কোন পক্ষে যাবে ঠিক বলা যায় না।

—তোমার মতলব কী?

—মতলব, তোমাকে টাকা আমি দেব,—পুরোই দেব। কিন্তু দয়া ক'রে ড্রাইভারকে পক্ষে নিয়ো না। কেননা, পকেটে আমার নগদ টাকা আছে—তুমি নিতান্তই নিরস্ত্র ও নিঃসহায়—শেষ পর্য্যন্ত ড্রাইভার আমারই দলে এসে যাবে! বুঝলে? অতএব ছোট্ট মা-টির মতো চুপ ক'রে এক কোণে ব'সে থাকো।

অগত্যা কিটি আর চেঁচামিচি করলো না। রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছে। জায়গাটা নির্জ্জন, প্রায় বিদেশী। আর কলকাতার রাস্তা হ'লেই বা কী আর এমন এগোত? সার্জ্জেন্ট্‌ দিয়ে ধরিয়ে দেওয়া! সে একটা কদর্য্য অভিনয় মাত্র। তাতে কান কাটা যেতো তারই। ঐ লোকটার কী!

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছে। এবার ফিরুতি-পথ।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা কইলো না। মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যবধান রেখে দু'জনে দু'পাশে স'রে বসেছে। উল্টোডিঙি প্রায় পেরোলো। পুরন্দর জিগ্‌গেস করলে: তোমার ছেলের কী অসুখ!

কথা শুনে কিটি ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো; বললে,—তুমি কী নিষ্ঠুর! আমার ছেলে মরতে বসেছে, আর তুমি আমার পাওনা টাকাটাও দিচ্ছ না।

তার পরে আরো অনেক সব কান্না-ভাঙা কথা: ছেলেকে বাঁচানোর জন্যে তার টাকা চাই,—সে-টাকার জন্য এমন অনায়াসে সে যাকে-তাকে বিশ্বাস করে, যার-তার সঙ্গে পথে বেরোয়। আর যাদের কি না সে অকপটে বিশ্বাস করে তারাই এতো অনায়াসে তাকে ঠকায়। কী অসহায় তাদের জীবন! হা বিধাতা!

কিটিকে কাঁদতে দেখে পুরন্দর বেশিক্ষণ স্বস্তি অনুভব করতে পেলো না। পকেট থেকে তিন খানা নোট বের ক'রে কিটির হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললে,—নাও। হলো? খুব ঠকালাম, না?

টাকা পেতেই কিটি কান্না থামালো। নোটগুলো গুনে বললে,—একখানা বোধ হয় বেশি দিলে।

কিটির মুখে এমন সাধুর মতো কথা শুনে পুরন্দর একটু বিস্মিত হলো ; বললে,—হ্যাঁ, দিলামই তো।

—তার ত' কথা ছিলো না।

—তুমি যে মা, তারই বা কি কোনো কথা ছিলো ? ওটা তোমার ছেলেকে দিলাম। কিছু ওষুধ-পথ্য কিনে দিয়ো।

মুগ্ধের মতো কিটি খানিকক্ষণ পুরন্দরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঘটনাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অসাধারণত্ব আছে। তাড়াতাড়ি সে পুরন্দরের হাত দু'টো চেপে ধ'রে বললে,—অনেক, অনেক ধন্যবাদ। বলতে-বলতে দু' চোখ তার জলে ভ'রে এলো। সে-উচ্ছ্বসিত কান্না সে আর চেপে রাখতে পারলো না। পুরন্দরের কোলে তার দু' হাতের ওপর মুখ ঢেকে সে ভেঙে পড়লো।

এমন একটা দুঃখময় সমর্পণের স্পর্শকে পুরন্দর প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না। কিটির নোয়ানো ঘাড় ও রমণীয় চুলের ওপর আস্তে-আস্তে হাত বুলুতে-বুলুতে সে বললে,—তোমার ছেলের কী অসুখ ?

মুখ তুলে কিটি সোজা হ'য়ে বস্‌লো। বললে,—নিউমোনিয়া। বুকের দু'দিক ধ'রে গেছে। বাঁচবে কি না সন্দেহ। আমি গেলে পরে তবে নতুন ওষুধ আসবে। হাসপাতালে দিতে পারতাম বটে, কিন্তু ভরসা হয় না। ছেলেটা সব সময়ে আমাকে খোঁজ করে। বিকেলে কোনো রকমে একটু পালিয়ে আসি।

পুরন্দর আবার কখন চুপ ক'রে গেছে।

কিটি সাহস পেয়ে আবার একটু কাছে স'রে এলো। ধরা গলায় বললে,—তোমার দয়া জীবনে আমি ভুলবো না, ডার্লিঙ। কিন্তু তুমি আমার ওপর খুব চ'টে গেলে, না ? কিন্তু ভেবে দেখ আমি কী করতে পারি ? আপিসে কতো আর মাইনে পাই। তা ছাড়া সপ্তাহে-সপ্তাহে স্বামীকেও পাঠাতে হয়। অসুখে পড়ার আগে থেকেই সে বেকার। তাকে না দিলেও ত' পারি !

পুরন্দর বললে,—তবে তাকে দাও কেন ?

—তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু তাকে আমি ভালোবাসি।

পুরন্দর জোরে হেসে উঠ্‌লো।

কিটি বললে,—তুমি বিশ্বাস করছ না ?

—আমার বিশ্বাস করা-না-করায় তোমার লাভ কী? তোমার ছেলের কতো বয়েস হবে?

—এই বছর দুয়েক। তাকে আমার বাঁচাতেই হবে। ছেলেবেলা থেকেই রুগ্ন—কেবল ভুগছে। তার জন্যে কী না আমি করছি। কিন্তু তুমি আমার ওপর এমনি রাগ ক'রে থাকবে, ডার্লিঙ?

—না, না, রাগ কিসের?

—তবে আমাকে আদর করছ না কেন?

—এখন আর ভালো লাগছে না।

—তবে কবে আবার আসবে?

—আর আসবার দরকার কী! আমি বলছি তোমার ছেলে ভালো হ'য়ে যাবে।

—ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন। কিন্তু আর আসবে না কেন?

—তোমার ছেলে ত' ভালো হ'য়েই যাবে।

—ভালো কথা। কিন্তু আসতে বাধা কিসের?

পুরন্দর তাড়াতাড়ি স'রে গিয়ে বললে,—তোমার ছেলের অসুখ করেছে—মিথ্যে কথা! ঠকিয়ে টাকা নেবার ফন্দি।

মুখ ম্লান ক'রে শুকনো গলায় কিটি বললে,—কেমন ক'রে তুমি এ-কথা বলছ?

—ছেলে ভালো হ'য়ে গেলে আবার তবে দেখা করবার কথা আসে কী ক'রে?

কিটি স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। গাল বেয়ে তার জল নেমে এসেছে। বললে,—বিশ্বাস করছ না? বেশ, আমার বাড়ির ঠিকানা দিচ্ছি, এর মধ্যে যে-দিন পারো দয়া ক'রে দেখে এসো। যে-কোনো সকাল বেলা।

রাস্তার নাম বললে। নম্বরো একটা বললে,—যা সেই ছোট রাস্তাটার পক্ষে অসম্ভব নয়!

—আর কারু ছেলে দেখিয়ে দেবে হয় ত'।

—আর কার ছেলে পাবো? ওটা ত' কোনো ম্যান্‌সন্‌ বা কোর্ট নয়—আমাদেরই ছোট একতলা একটা বাড়ি। অন্য ছেলে দেখিয়ে লাভ?

—যদি সহানুভূতি উদ্রেক ক'রে কিছু টাকা খসাতে পারো।

কিটি হঠাৎ ক্ষেপে উঠে বললে,—নাও, নাও তোমার টাকা। কে নিতে বসেছে?

তাকে বাধা দিয়ে পুরন্দর বললে,—রাখো। আগে টাকা, পরে প্রাণ। বেশ, এক দিন যাবো।

'বেশ, এক দিন যাবো'—অর্থ, পুরন্দর কোনোদিন আর যাবে না। কিটি তার কাছে এখন নিতান্ত নিষ্প্রভ, তার সান্নিধ্যে দস্তুরমতো এখন তার জ্বালা করছে। অথচ কারণটা সে সম্পূর্ণ ধরতে পারছে না। এবার বাড়ি যেতে পারলে সে বাঁচে।

টালার পোল্ পেরোতেই পুরন্দর ট্যাক্সিটাকে থামতে বললে। ভাড়া—প্রায় টাকা পনেরো—চুকিয়ে দিয়ে সে নেমে পড়লো। বললে,—তুমি এবার যাও, আমি বাড়ি যাবো।

—তোমার বাড়ি কোন্ দিকে?

—আমার ঠিকানা জেনে লাভ কী। আমার ছেলে নেই।

—কিন্তু আবার তুমি আসবে বলো?

—টাকা দিতে হবে ত'?

—দিয়ো না।

—তবে কী জন্যে আর যাবো?

—না, তুমি এসো।

—আমাকেও ভালোবাসনি ত'?

—তুমি আরেকদিন এলে জানতে পারবে। এসো। প্লিজ্।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলে।

বাইশ

যাও: গেলে?

এখুনিই বাড়ি গিয়ে পুরন্দর কী করবে? বাড়ি গেলে সে বাঁচে,—না? বাড়িতে ত' আবার সেই অবসন্ন নিস্তেজ অবকাশ। তেমনি বিবর্ণ মুহূর্ত, তেমনি স্তব্ধ অস্থিরতা। বাড়ি নয়, খানিক দূর হেঁটে এসে সে ষ্ট্যাণ্ড্ থেকে একটা বাস্ ধরলো। তাড়াহুড়ো ক'রে ট্যাক্সি ক'রে যাবার আর তাগিদ নেই। প্যাসেঞ্জার নিয়ে-নামিয়ে বাস্টা থেমে-থেমেই যাক্।

চৌরঙ্গিতে নেমে পুরন্দর সোজা 'ইম্পিরিয়াল্'-এ গিয়ে ঢুকলো। পকেটে যা টাকা এখনো আছে তা দিয়ে সীতার সাড়ি ও সাবান স্বচ্ছন্দে হ'তে পারে বটে,

কিন্তু তার আগে কিটির সঙ্গে কৃত্রিম অভিনয়ের লজ্জাটা মন থেকে দূর করতে হবে। কিটিও সহসা সীতারই মতো মলিন হ'য়ে গেছে। আর তাতে স্বাদের তীব্রতা নেই। মন থেকে সেই বিষাদ-পাণ্ডুরতা মুছ্তে না পারলে সুস্থ হ'তে পারবে না!

বয় জোরালো কক্‌টেইল্ তৈরী ক'রে দিলো। পুরো এক গ্লাশ স্বচ্ছন্দে সে গলাধঃকরণ করলে।

এবার সে হোটেলের মধ্যেই গলা ছেড়ে হেসে উঠ্‌তে পারে। তিন-দশকে তিরিশটা টাকা, মায় ট্যাক্সি ভাড়া—সমস্ত সে একটা কোন্ কাল্পনিক ছেলের কথায় অক্লেশে দান ক'রে ফেল্‌লে। এই দুর্দ্দিনে এতোগুলি টাকা—কিন্তু বিনিময়ে সে পেলো কী শুনি! ফাঁকা একটা নেশা। বাড়ি ফিরতে আবার হয় ত' একটা ট্যাক্সি করতে হবে! কে কোথাকার একটা ছেলের মায়ায় প'ড়ে সে এই লজ্জাকর কাণ্ডটা ক'রে বসলো। অর্থনীতিশাস্ত্রে কী যে এর মাহাত্ম্য পুরন্দর মদের গ্লাশে চুমুক দিয়ে ঘুণাক্ষরেও তা ধারণা করতে পারলো না।

যেতে যখন বসেছে—যাক্ সব টাকা। পুরন্দর ট্যাক্সি নিলে। সমস্ত চেতনা তখন মূঢ়, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। রাস্তার দোকান-পাট লোক-জন গাড়ি-ঘোড়া কোনো কিছুর আর অর্থ নেই। সে শুধু দেখছে রোগশয্যায় শুয়ে মুমূর্ষু একটি ছেলে—আর তাকে বেষ্টন ক'রে কিটির পৃথিবীব্যাপী প্রবল স্নেহ। যে-স্নেহ কিটিকে আজ রক্ষা করলো, মায়ের মূল্য দিলো। কিটির জাগরণক্লিষ্ট চোখে প্রার্থনাময় প্রণতি, উদ্বিগ্ন অসহায় মুখের চেহারায় স্নিগ্ধ করুণা। বুকের ওপর ছোট্ট একটি ক্রুশ, মুমূর্ষু ছেলেটির শিয়রে দেয়ালে-টাঙানো যীশুখৃষ্টের ছবি। সব সে ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু ছেলেকে পারে না—তার মাংসের মাংস, হাড়ের হাড়, তার আত্মার আত্মা—তার সতীত্বের চেয়েও বড়ো এই ছেলে। এমন মাকে পুরন্দর অসম্মান করে কী ক'রে?

ট্যাক্সির একটা ঝাঁকুনি খেতেই পুরন্দরের তন্দ্রা ভাঙলো। নিজের মনে সে হাসলো,—এই ভেবে আরো হাসলো যে কিটিও সীতারই মতো মলিন হ'য়ে গেছে।

পার্ক-ষ্ট্রীটের মোড়ে গোল্ড্ ফ্লেইক্-এর 'সাইন্'-এ দেখলে বারোটা বাজে। আর কথা নয়—বিছানায় প'ড়ে নিভাঁজ একটি ঘুম। সে-ঘুমের সমুদ্রে সীতার পাতিব্রত্য বা কিটির মাতৃস্নেহ কিছুরই কোনো চিহ্ন থাকবে না।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে হোঁচট খেতে-খেতে মাঝে-মাঝে থেমে হাঁপ নিয়ে পুরন্দর

তেতলায় উঠে এলো। নেশার কুয়াসা ঠেলে স্পষ্ট চোখে পড়লো—দরজাটা আধখানা খোলা, আলো দেখা যাচ্ছে। প্রতীক্ষানিরতা সীতার পাতিব্রত্যের একটা খেলো নমুনা। কিন্তু সে দিকে কে নজর দিতে যাচ্ছে?

দরজাটা ভালো ক'রে খুলে দিতেই নজর পড়লো বৈ কি! সাদা চোখে নয় ব'লে ব্যাপারটার অর্থ অতিকায় হ'য়ে উঠলো দেখতে-দেখতে। কী যে বলবে বা করবে কিছু ঠিক করতে না পেরে পুরন্দর টল্‌তে-টল্‌তে খাটের কাছে চ'লে এসে ধুপ্‌ ক'রে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

দুপুর থেকেই সীতার খুব জোরে জ্বর এসেছে। ক'দিন থেকেই জ্বরটা চামড়ার তলায় চাপা প'ড়ে ছিলো, আজকে হঠাৎ জাঁকিয়ে বসেছে। তবু এ-জ্বর যে এমন কিছুই নয় দিলীপ তা কিছুতেই মান্‌বে না। মাথা তার ভীষণ ধরেছে বটে, তাই ব'লে কপালে জলপটি চাপিয়ে হাত-পাখায় হাওয়া করতে হবে এটা ঠাকুরপোর বাড়াবাড়ি। কিন্তু ভালো যে বিশেষ লাগছে না তাও নয়। জ্বরের খবরটা সীতা তাকে বলেছেও অনেক পরে, রাতের রান্না চুকিয়ে। নইলে কক্‌খনো সে আজ বৌদিকে রাঁধতে দিতো না। হাত-পা পুড়িয়ে একটা কাণ্ড ক'রে বসতো।

পরিবেষণ ক'রে দিলীপকে খাইয়ে পুরন্দরের ভাত ঢেকে রেখে সে তাড়াতাড়ি ঘরে চ'লে এসে শুয়ে পড়লো। পুরন্দর কখন ফিরবে কে জানে। দিলীপ খানিকক্ষণ ঘরে-বারান্দায় ঘুর-ঘুর ক'রে অবশেষে দরজায় এসে ডাক দিলে: বৌদি। দেখলে হাঁটু দু'টো দুম্‌ড়ে পেটের কাছে গুটিয়ে এনে সীতা হু হু ক'রে কাঁপছে। দিলীপ তাড়াতাড়ি ছুটে এসে উদ্বিগ্ন হ'য়ে প্রশ্ন করলো: কী হ'ল, বৌদি? সীতা জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'টো ভিজিয়ে নিয়ে বল্‌লে: ভীষণ জ্বর এসে গেলো, ঠাকুরপো।

আর যায় কোথা! থার্মোমিটার, পাথরের বাটি ক'রে গোলাপ-জল, ন্যাকড়ার পটি, পাখা,—যা-কিছু সেবার প্রাথমিক সরঞ্জাম—সমস্ত নিয়ে দিলীপ এক হাট বসালে যা-হোক্‌। মাথার ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেল্‌লে, কপালের রগ দুটো যেখানে দপ্‌-দপ্‌ করছে সেখানে ধীরে-ধীরে আঙুলের চাপ দিতে লাগলো। বিকেলে সীতার আজ চুল বাঁধা হয় নি, মেঝের ওপর খোলা চুলগুলি এলোমেলো প'ড়ে আছে, আঙুল দিয়ে-দিয়ে দিলীপ তার জট ছাড়াতে বসলো। এবং ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় বৌদির চোখ যে ভীষণ জ্বালা করছে তা বুঝতে পেরে একসময় আলোটা সে নিভিয়ে দিলে। এতো সে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে যেন নিজের ক্ষমতায় হ'লে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে তার বৌদিকে সুস্থ ক'রে তুল্‌তো। সীতা বললে: তুমি

এবার ঘুমুতে যাও, বেশি রাত জাগলে তোমারো ফের অসুখ করবে। দিলীপ প্রায় ধমকে উঠ্‌লো : রুগী হ'য়ে তোমাকে আর ডাক্তারি করতে হবে না। একজামিনের আগে তাস খেলে কতো রাত ভোর ক'রে দিলাম, সামান্য একটা হাই পর্য্যন্ত তুললাম না কোনদিন। আর বাবর-এর মতো তোমার অসুখ নিয়ে যদি তোমাকে ভালো ক'রে দিতে পারতাম—বার্গেইন্‌টা মন্দ হ'ত না। কী বলো? তখন তোমাকেই আমার সেবা করতে হ'ত—আর রাত বেশি হচ্ছে ব'লে কক্‌খনো তোমাকে ঘুমুতে যেতে বল্‌তাম না। সেবা পেতে রুগীর কুণ্ঠিত হওয়া ঠিক সুস্থ লোকের সেবা করতে কুণ্ঠা দেখানোর মতোই খারাপ।

তবু ভাগ্যিস, পুরন্দরের আসবার আগে আলোটা দিলীপ জ্বেলেছিলো টেম্পারেচার দেখতে। তবু উগ্র আলোয় সীতার জ্বরটা খানিক হয় ত' স্পষ্ট দেখাবে। নইলে অন্ধকার থাক্‌লে জ্বরটা আর পুরন্দরের চোখে নেহাৎ স্বাস্থ্যবিকৃতি ব'লে ঠেকতো না। আলোয় সীতা যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে। পুরন্দর ঘরে ঢুকতেই সীতা ও দিলীপ একসঙ্গে তার দিকে তাকালো। মুখে একটা রূঢ় ভাব —কিন্তু সেটা যেন এই কারণে নয়। কী যে কারণ সীতা তা বুঝেছে।

সীতা খানিক পরে ভাঙা গলায় বললে,—এবার তুমি যাও।

দিলীপ বৌদির কপালের ওপর নুয়ে প'ড়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললে,—যাই। এবার তোমাকে ত' ভালো জিম্মায় রেখে যাচ্ছি।

ব'লে সে উঠ্‌লো। কিন্তু তক্ষুনি ঘর ছেড়ে চ'লে না গিয়ে পুরন্দরের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো। সীতার যদি শক্তি থাকতো তবে দিলীপকে সে ঠেলে ঘরের বা'র ক'রে দিতো। কেন সে অমনি ঝুঁকে প'ড়ে তার স্বামীর লজ্জা ধ'রে ফেলবে—কী তার অধিকার আছে সব জিনিস খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখা, কড়ায়-ক্রান্তিতে হিসেব নেওয়া! পুরন্দর যে মদ খেয়ে মুখ-চোখ ফুলিয়ে কাপড়-জামা নোংরা ক'রে বাড়ি ফিরেছে এ-কথা জান্‌বার তার কী এমন দরকার পড়েছিলো? তার এই বেয়াদবিকে স্বামী শাসন করতে পারেন না? মদ খান, বেশ করেন—এই নিয়ে দিলীপ যদি সীতাকে সহানুভূতি দেখাতে আসে তবে তা সে কক্‌খনো সইবে না। নিজের রাগ, নিজের দুঃখ, নিজের অসহযোগ নিয়ে সে দিন কাটাবে,—তাতে দিলীপের কী এসে যায়! তার সহানুভূতির দাম কী!

দিলীপেরো বুঝতে কিছু বাকি নেই। আস্তে সে ডাকলে: দাদা!

পুরন্দর ফুলো-ফুলো চোখ মেলে বললে,—উ!

—বৌদির ভীষণ জ্বর এসে গেছে—প্রায় তিন টেম্পারেচার। মেঝের ওপর প'ড়ে আছেন। বিছানায় কতো উঠে যেতে বলছি, কিছুতেই যাবেন না।

পুরন্দর পাশ ফিরে বললে,—আচ্ছা।

সীতার সমস্ত গা জ্ব'লে গেলো। তার জ্বর হয়েছে সে-কথা দিলীপকে গিয়ে পেশ্‌ করতে হবে? মেঝের ওপর প'ড়ে আছে, সে-জন্যে তারই কিনা দরদের অন্ত নেই! তারই কথায় বিছানায় উঠে যেতে হবে। জ্বর শুনে স্বামী যে তাকে কোলে ক'রে বিছানায় তুলে নেবেন সে-কথা ত' আর সে জান্‌তে আসবে না।

দরজার কাছে এগিয়ে দিলীপ বললে,—আলোটা নিবিয়ে দেব, বৌদি?

সীতা ঝাঁজালো গলায় বললে,—তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। এবার যাও।

দিলীপ চ'লে গেলো অবশ্যি, কিন্তু পুরন্দরো যে নেমে আসবে না তার অনুপস্থিতিতে তা হঠাৎ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। দরজা খোলা, আলো জ্বলছে, শিয়রে দিলীপ নেই। কেন যে হঠাৎ তার চোখ ঠেলে কান্না নেমে এলো বোঝা কঠিন। দিলীপের সামনে কান্নাটা ভাগ্যিস্‌ সে এতোক্ষণ চেপে রাখতে পেরেছিলো—নইলে সে ভাব্‌তো, তার মতো দুঃখী বুঝি পৃথিবীতে আর কেউ নেই,—সত্যি বুঝি সে তার স্বামীকে ভালোবাসে না।

এবং হঠাৎ সেই কান্না শুকিয়ে দু' চোখে তার প্রখর জ্বালা ক'রে উঠলো। এমন স্বামীকে তার স্নেহ ও সেবা দিয়ে তাঁর এই কুৎসিত পাপ সে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চেয়েছে। তাতে তার নিজের লজ্জা ব'লে, নিজের সতীত্বের অবমাননা ব'লে। কী যে সে করবে, কিছু বুঝতে না পেরে শেষকালে সে দুর্ব্বল পায়ে উঠে দাঁড়ালো। এবং আশ্চর্য্য, ঘর ছেড়ে কোথাও চ'লে না গিয়ে পুরন্দরেরই বিছানায় এসে বস্‌লো। গায়ে ঠেলা দিয়ে বললো: আজো মদ খেয়ে এসেছ বুঝি?

ও-পাশে স'রে গিয়ে বিকৃতস্বরে পুরন্দর বললে,—হ্যাঁ, নেশা সবারই একটু-না-একটু করতে হয়। খবরদার, ছুঁয়ো না আমাকে।

ভয় পেয়ে সীতা বললে,—কেন?

—তোমারো যেমন মাতালকে ছুঁতে নেই, আমিও তেমনি অসতীকে ছুঁই না।

—কী, কী বললে?

—বল্‌লাম, স্বামী বাড়ি না থাকলে লুকিয়ে যে অন্য লোকের সঙ্গে প্রেম করে তাকে আমি ছুঁই না। বুঝেছ?

—লুকিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে প্রেম করি! মানে তুমি ঠাকুরপোর কথা বল্‌ছ! তুমি এতোদূর নষ্ট হ'য়ে গেছ?

—এই প্রশ্নটা ত' আমিই করবো ভেবেছিলাম।

সীতার চোখ ছাপিয়ে অশ্রুর বান ডেকে এলো : আমার এমন ভীষণ জ্বর, ঠাকুরপো শিয়রে ব'সে হাওয়া করছিলো, তাইতেই তোমার এই নোংরা কথা !

সীতা কাঁদছিলো ব'লে পুরন্দর যেন সন্দেহে জোর পেলো ; বললে,—ও-রকম ফ্যাসান ক'রে গায়ে একটু জ্বর না আনলে চলবে কেন ? কিন্তু রোজই ত' আর য়্যাদ্দিন ধ'রে জ্বর হচ্ছে না ! ও কী, অমন কাছে ঘেঁষে এসো না বলছি।

সত্যি, স্বামীকে সে দেদার আস্কারা দিয়েছে—সমস্ত শরীর তার অচল হ'য়ে এলো। এমন কদর্য্য সন্দেহ যে করতে পারে—তার কাছে আবার নিজের আচরণের সবিস্তার ব্যাখ্যা দিতে হবে ! রুক্ষ কর্কশ গলায় বললে,—কে তোমার গা ঘেঁষে স'রে আসতে চায় ?

—হ্যাঁ, পাশের ঘরে যাও এবার, খেলা সাঙ্গ ক'রে এসো।

—মুখ সামলে কথা কও বলছি।

—ভালো কথাই বলছিলাম। আবার শুচ্ছ এখানে ? যাও ও-ঘরে।

—যেতে হ'লে যাবো, ইচ্ছে করলে যাবো না—তোমার মত জিগ্‌গেস করতে হবে নাকি ? আমার বিছানায় আমি শোব না ? এ ত' আর তোমার একার নয়। ইচ্ছে করলে মেঝেয় গিয়ে গড়াও গে।

—কী ?

সীতা প্রখর গলায় বললে,—তোমার সতীদের কুঞ্জেও ফিরে যেতে পারো, কেউ তোমাকে ধ'রে রাখছে না।

—আর এই ফাঁকে ও-ঘরে গিয়ে দরজায় তুমি খিল দাও, না ? বেরোও, বেরোও শিগ্‌গির এখান থেকে।

—তুমি বেরোও।

—কী ? ব'লে দিগ্বিদিক না তাকিয়ে পুরন্দর পা তুলে সীতাকে এত জোরে আঘাত করলো যে সে মেঝের ওপর ছিটকে পড়লে।

সীতাও নিজেকে আজ আর চেপে রাখতে পারলে না, সামনে ছিলো তাক, তাতে হাতের কাছে ছিলো পিতলের একটা ফুলদানি। সেটা তুলে এমন ভাবে সে বিছানার ওপর পুরন্দরের দিকে ছুঁড়ে মারলো যাতে তাঁর গায়ে না লাগে। অর্থাৎ এই নির্ম্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেও যে প্রতিবাদ করতে পারে তার একটা ক্ষীণ পরিচয় সে পাঠালে। কিন্তু এর সম্যক রসবোধ করবার ক্ষমতা পুরন্দরের ছিলো না।

খাট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে প'ড়ে মুঠি ক'রে সে সীতার খোলা চুলগুলি চেপে ধরলো। তার পর তার মাথাটা মেঝের ওপর সজোরে ঠুকতে লাগলো—দারুণ নেশায় সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে ব'লে প্রহারের পরিমাণটা সহজে সে আয়ত্ত করতে পারলো না।

যন্ত্রণায় সীতা একেবারে অন্ধ হ'য়ে গেছে। অসহায় আর্ত্ত বেদনায় ঘর-দেয়াল ভেঙে-চুরে সে চীৎকার ক'রে উঠলো: ঠাকুরপো, ঠাকুরপো, শিগ্‌গির এসো। আমায় বাঁচাও। একেবারে মেরে ফেল্‌লে—

এটা বলাই বাহুল্য হবে যে পাশের ঘরে দিলীপের তখনো ঘুম আসে নি। চীৎকার শুনে সে ধড়মড়িয়ে উঠলো—বৌদি তারই নাম ধ'রে ডাকছে, তারই কাছে সাহায্য চাইছে—অনুভূতিটা কেমন যেন স্বপ্নের মতো মধুর। তাড়াতাড়ি এ-ঘরে চ'লে এসে যা সে দেখলো তাতে তার সমস্ত শরীর আতঙ্কে ও লজ্জায় কাঠ হ'য়ে এলো। দেখতে-দেখতে তার হাতের মুঠি দৃঢ়, বুকের পেশীগুলো স্ফীত, রক্ত তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। দু' পা সে ধীরে এগিয়ে এলো। একটা হিংস্র বন্য পশুর আক্রমণের প্রাবল্য থেকে ছাড়া পাবার জন্যে দুর্ব্বল একটি পাখি যেন ঝট্‌পট্ করছে। ধীরে আরো দু' পা।

কিন্তু দিলীপকে ঘরে ঢুকতে দেখেই পুরন্দরের হাতের মুঠি আল্‌গা হয়ে এলো। ধাক্কা মেরে সীতাকে দেয়ালের দিকে ঠেলে দিয়ে সোজা সে বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলে।

দিলীপ সীতার কাছে স'রে এলো। কপালের ব্যাণ্ডেজ আগেই খুলে গেছে, জায়গায়-জায়গায় ফুলে নীল হ'য়ে গেছে, আগের কাটা জায়গা থেকে প্রচুর রক্ত বের হ'য়ে নাক-মুখ বুক-গলা সব ভেসে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সীতার হাত একখানা টেনে ধ'রে ব্যস্ত হ'য়ে সে বললে,—শিগ্‌গির কলকাতায় চলো, বৌদি। শিগ্‌গির।

জোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গায়ের ওপর কাপড় রাশীকৃত করতে-করতে সীতা বিরক্ত হ'য়ে বললে,—তুমি আবার উঠে এলে কেন?

জ্বরে মুখ রাঙা, রক্তের ছোপে সে-মুখের শোভা ঝড়ের সমুদ্রের মতো উদ্দীপনাময়! দিলীপ আবার তার হাত ধরলে; বললে,—উঠে যখন এলামই, তখন চলো, ঘা-টা পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে দি।

—আমি নিজেই পারবো। তোমাকে সর্দ্দারি করতে হবে না।

দিলীপ ঘরের দেয়ালের মতো স্থির হ'য়ে রইলো। একবার তাকালো পুরন্দরের

দিকে। বালিশে মুখ ঢেকে সে যেন তার এই অপমানের দুঃখকে উপভোগ করছে।

তবু সে আবার চঞ্চল হ'য়ে উঠলো : না, তুমি চলো। অবুঝ হয়ো না।

সীতা ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রুক্ষ গলায় বললে,—তার চেয়ে তুমি যাও এ-ঘর থেকে। এবার দোর দেব—আমার ঘুম পাচ্ছে। যাও : গেলে? এখানে কেন মরতে এসেছ?

দিলীপ বিমূঢ়ের মতো আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো। স্পষ্ট শুনতে পেলে সীতা তার পেছনে ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ ক'রে দিচ্ছে।

তেইশ

এক পেয়ালা চা

ঘরে ফিরে গিয়ে চেয়ারে ব'সে দিলীপ ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবতে বসলো—কিন্তু স্পষ্ট কিছু সে অনুধাবন করতে পারলো না। মনে হলো এ এক ধরনের অস্বাস্থ্যকর সতীত্ব—উদ্যত অন্যায়ের সামনে চিত্তকে যা কুণ্ঠিত ক'রে রাখে, দাসত্বে বা আত্ম-বিলোপে যা মনে একটা ভীরুতা বা চরিত্রদৌর্ব্বল্যের সান্ত্বনা আনে। সমস্ত গায়ে তার সূঁচ ফুটতে লাগলো। তেজোহীন শাসনবিমুখ এই সতীত্বের অহঙ্কার জীবনের পক্ষে যে কত বড়ো গ্লানির বোঝা—এই নিয়েই সীতা সারা জীবন সন্তুষ্ট থাকবে। একটু উদ্ধত হবে না, একটুও দীপ্তি দেবে না কোনোদিন। পুরন্দর যদি অতো সহজে মুঠি তার শিথিল ক'রে না আনতো, তা হ'লে মুহূর্ত্তে সে কী যে ক'রে বসতো, সীতা এখন শুনলে হয় ত' তার মুখ দেখতো না,—তখন দেখলে রীতি-মতো তাকে পুলিশেই ধরিয়ে দিতো নিশ্চয়। কিন্তু পুরন্দরকে শাসন ক'রে তার লাভ কী, স্বার্থ কোথায়! সীতাও বা তার কে? তবুও নারীর এই নির্জ্জীবতা সে সইতে পারে না—পাপের সামনে তার এই পরাজয়ের কলঙ্ক জগতের সমস্ত যৌবনকে অশুচি ক'রে তোলে।

ভোর বেলার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, রান্নাঘরে টুং-টাং আওয়াজ শুনতে পেয়ে তার ঘুম ভেঙে গেলো। বুঝলে সীতা অভিমান ভুলে, শরীরের অস্বাস্থ্য ভুলে, নিত্যকার মতো চা করতে বসেছে। দরজাটা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলে নিত্যকার মতোই সসার্-এ কাপ সাজিয়ে সীতা স্বামীর জন্যে বেড্-টি নিয়ে যাচ্ছে। মুখখানিতে তরল একটু গাম্ভীর্য্য, চেহারায় কোমল পাণ্ডুরতা—যেন মুখে আত্মার গভীর আভা এসে পড়েছে।

দিলীপ তার সামনে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে বললে,—যে তোমাকে মেরে-ধ'রে জখম ক'রে ফেলেছে তার জন্যে ভোর বেলায় আবার চা ক'রে নিয়ে যাচ্ছ ?

সীতা ম্লান হেসে বললে,—বা, তাই ব'লে এক পেয়ালা চা খাবে না ?

— না। তোমার না জ্বর !

—আর নেই। দেখ না হাত দিয়ে—গা দিব্যি ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। ব'লে বাঁ হাতখানা ধরতে সে দিলীপের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

দিলীপ তা ধরলো না ; বললে,—যে অত্যাচার করে, তাকে অতো সহজে ক্ষমা করতে নেই, বৌদি।

—কিন্তু এক পেয়ালা চা খেতে দিলে এমন-কী দোষ হয় ?

— দোষ হয় না ? যথেষ্ট হয়। নিজেকে এর চেয়ে আর কী অপমান করা যেতে পারে ?

—অপমান ?

—অপমান নয় ? যে মদ খেয়ে এসে তোমার কপাল ফাটিয়ে দিলে, তার সামনে তুমি ষোড়শোপচারে খাবার সাজিয়ে ধরছ, আবার সে তোমার ওপর একমাত্র প্রথার জোরে প্রভুত্ব করছে—অপমান নয় ?

সীতা হেসে বললে, —দাঁড়াও, চা-টা আগে রেখে আসি। পরে তোমার লম্বা-লম্বা বক্তৃতা শোনা যাবে।

ব'লে দ্বিতীয় কথা না ব'লে সীতা তার শোবার ঘরে চ'লে গেলো।

পুরন্দর তখনো ঘুমুচ্ছে। টিপয়ের ওপর কাপ্ রেখে সীতা তক্ষুনি ফিরে এলো বটে, কিন্তু ঢুকলো এসে রান্নাঘরে। চাল-ডাল ধু'লো, তার পর ঝিকে বাজারে পাঠিয়ে বঁটি পেতে তরকারি কুটতে বসেছে ! ডাকলো : ঠাকুরপো।

ঘর থেকে দিলীপ সাড়া দিলো : কি ?

—তোমার কলেজ কখন ? সেই বারোটায় ত' ?

—কেন ?

—আজ একটু মাংস রাধ্‌বো ভাবছি। খেয়ে যাবার সময় হবে ত' তোমার ?

—না। চান ক'রে আমি এখুনি বেরুব।

—বা, সে কী কথা ? এতো মাংস তবে খাবে কে ? আমার ত' জ্বর-ই।

—কেন, দাদা খাবেন।

আর কারু কোনো কথা নেই। দিলীপ কেন-জানি এ-বাড়িতে আর টিকতে পারছে না। তাড়াতাড়ি সে স্নান ক'রে নিলো। জামা গায়ে দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, সীতা এসে বললে,—এখুনি বেরুচ্ছ নাকি ?

—হ্যাঁ, আমার নেমন্তন্ন আছে।

—কখন ফিরবে ?

—দেখি ; রাত হ'তে পারে। ভয় নেই, আমাকে তোমার তোয়াজ করতে হবে না।

—বা, তুমি চ'লে গেলে সারা দুপুর-সন্ধ্যা আমি কেমন ক'রে থাকবো ?

—দরকার কী ! দাদাই ত' সশরীরে বর্ত্তমান থাকবেন। ব'লে হাতের তোয়ালেয় ঘাড়ের জল মুছে দিলীপ বেরিয়ে গেলো।

চব্বিশ

উন্মুক্ত পথ

ফিরতে কিন্তু দিলীপের সন্ধ্যাও হলো না। এসে দেখ্‌লে সীতা জান্‌লার কাছে দাঁড়িয়ে মোটা-দাড়া চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। নিতান্ত উদাসীনের মতোই চ'লে যাচ্ছিলো, কিন্তু সীতা এগিয়ে এসে ডাক্‌লে : ঠাকুরপো, শোন।

না শুনে চ'লে যাওয়া দিলীপের সাধ্য ছিলো না। ফিরলো ; মুখের দিকে চেয়ে বললে,—কি ?

—বিকেলে আবার দারুণ জ্বর এসে গেছে। দাঁড়াতে পারছি না।

দিলীপ থম্‌কে দাঁড়ালো। করুণ কাহিল চেহারার দিকে চেয়ে তার সমস্ত শাণিত বিদ্রূপ ভোঁতা হ'য়ে গেল। তবু কোথায় মনের মধ্যে অভিমানের বাষ্প ছিলো, তাই ভিজা গলায় বললে,—কাল্‌কেও ত' তোমার জ্বর ছিলো। তাই নিয়েই ত' দিব্যি মাংস রাঁধ্‌লে। আমার ভাগেরটাও খেয়ে ফেলেছ বুঝি !

—ছাই। মাংস রেঁধেছি না হাতি।

—কেন, মাংস কি দোষ করলে ?

দিলীপের মুখের দিকে চেয়ে শুক্‌নো একটু হেসে সীতা বললে,—তুমি যে খাবে না।

—তাতে কী ! তোমার পতিসেবা ত' চরিতার্থ হ'ত।

সীতার মুখ আবার ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো। সারা দুপুরটা তার কী বিশ্রী যে কেটেছে। পুরন্দর যতোক্ষণ ঘুমোয় নি ততোক্ষণ থেকে-থেকে খালি তাকে প্রাণান্তকর অপমানে বিদ্ধ করেছে ; বলেছে : ঘরে বুঝি আর মন টিকছে না, খাঁচায় পাখির মতো উড়ুউড়ু করছো। দেওরটি গেলেন কোথায় ? তা যাই বলি, দুপুরের চেয়ে রাত অনেক ঠাণ্ডা। তা ছাড়া রাতে দিব্যি আবার শারীরিক জ্বর এসে যাবে'খন।

সত্যি, সীতায় আর এ সয় না। অথচ কী সে করতে পারে? স্বামীর এই নির্লজ্জ চরিত্রহীনতার বিরুদ্ধে কোথায় বা কী ক'রে সে তেজস্বী হবে? এক দিলীপকে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে বললে হয়। ছি, কোথায় সে কী অন্যায় করলো? তাকে চ'লে যেতে বলার মধ্যেই ত' সীতার ভয়ানক অবমাননা, প্রকাণ্ড পরাজয়। আর সে চ'লে গেলেই বা কি পুরন্দর তার প্রতি প্রসন্ন হবে? সব খানেই তার সমান অত্যাচার। সমান প্রভুত্ব। সীতা আর সইতে পারে না। কিন্তু না স'য়েই বা সে করে কী! তার বুঝতে আর বাকি নেই যে তার সতীত্বের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ ক'রে পুরন্দর পরম নিশ্চিন্ত হ'য়ে তার ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে পারছে। এমন লোককে সে কি না শরীর দিয়ে মন দিয়ে এতদিন পুজো ক'রে এসেছে! তবু এ ছাড়া করবার আর তার কী ছিলো? সারা দুপুরটা তার কী বিশ্রীই যে কেটেছে।

সারা দিনে ঘরের বদ্ধ গুমোটের পর দিলীপ এসে যেন দেয়ালের সমস্ত বাধা-আড়াল ভেঙে চারদিক ফরসা ক'রে আনলে। এখন সীতার কতো যে হাল্কা লাগছে। কাল তাকে কী ব'লে যে শুধু-শুধু অমনি আঘাত দিতে পেরেছিলো ভাবতে বুক তার ব্যথায় টন্‌টন্ ক'রে উঠ্‌লো। আরো একটু এগিয়ে এসে চিরুনি-শুদ্ধ ডান হাতখানা দিলীপের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে,— সত্যি, জ্বর এসে গেছে। কী যে আমার সুরু হ'ল। গিঁটে গিঁটে ব্যথা, একটু কাজ করতে গেলেই হাঁপিয়ে পড়ি—চোখে সব আগুনের ফুল্‌কি দেখি। দেখ না একবার ধ'রে, কতো জ্বর।

দিলীপ হাত ত' বাড়ালোই না, বরং জামার নিচের দু' পকেটে হাত দু'টো ঢুকিয়ে দিলে। বললে,—হলোই বা জ্বর! তাতে সংসারের কী-এমন অসুবিধে হচ্ছে? দিব্যি ত' দেখছি উনুনে ধোঁয়া দেখা দিয়েছে—রাতের পাট-ও বন্ধ হবে না। একচুল এদিক-ওদিক হবার যো নেই। সব ঠিক-ঠাক। ঠাট ক'রে দেখি খাটের ওপর দিব্যি বিছানা ক'রে রেখেছ।

সীতা হেসে বললে,— বা, রাতে খাবে না?

—কে খাবে? আমার পেট ত' ভরা-ই, তোমার ত' অসুখই—আর ঝি, তাকে আনা দুয়েক পয়সা দিলে—বাসন মাজতে ঘর ধুতে হবে না ভেবে খুসির তার শেষ থাকবে না।

ঠোঁটের আড়াল থেকে সীতার দু'পাটি দাঁত ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠলো; বললে,—আর তোমার দাদা?

—সে আবার খাবে কী! মদ খেয়ে এসে যে স্ত্রীকে ধ'রে মারে, স্ত্রীর হাতে আবার রান্না খেতে তার লজ্জা করে না?

—তার না-ই বা লজ্জা করলো, কিন্তু ক্ষুধার্ত্তের মুখে ভাতের থালা না ধ'রে কী করে পারি বলো ?

—কী ক'রে পারি বলো ! দিলীপ মুখ ভেঙচে উঠলো : ভারি-হাতে অসুখ ক'রে যখন অচল হ'য়ে পড়বে, তখন কী ক'রে পারবে ?

—তখন না-হয় যে ক'রে হোক্ একটা রাঁধুনি ঠাকুর রাখা যাবে।

—তখন সেটার মধ্যেও তোমার অসহায় ভাবটাই ফুটবে বেশি। দিলীপ ঘরের মধ্যে সামান্য একটু স্থান পরিবর্ত্তন ক'রে বললে,—কিন্তু যখন,—এখনো তোমার শক্তি ছিলো, এখনই তোমার সে-শক্তি প্রত্যাহার করা উচিত।

সীতা এমন ভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো যেন এক বর্ণও সে বুঝতে পারছে না।

দিলীপ বললে,—পাপের সামনে রূঢ় হ'য়েই দাঁড়াতে হয়, বৌদি, তোয়াজ ক'রে তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। তোষামোদ করতে গেলেই সে মাথায় ওঠে। বাধ্য হ'য়ে বর্জ্জন করার চেয়ে—ধরো, তোমাকে যদি দাদা একদিন তাড়িয়ে দেয়—নিজের ইচ্ছায়ই বর্জ্জন করায় ঢের বেশি শিক্ষা দেওয়া হবে। দেখবে তখন আরেক চেহারা, মুখ কাঁচুমাচু ক'রে হাত কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে নিজেই এসে সবিনয়ে বশ্যতা স্বীকার করবে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারো না একবার ?

সীতা অভিভূতের মতো চেয়ে থেকে বললে,—আমি কী করতে পারি ?

—কী করতে পারো ? আত্মসম্মান থাকলে অনেক কিছু করতে পারো। সতীত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব অনেক বড়ো জিনিস। মিথ্যে একটা সংস্কার বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নিজেকে দিনে-রাতে এই জঘন্য অপমান করতে কোথাও তোমার এতোটুকু বাধে না ? কী করতে পারো ? বলবো ?

ভয়ে-ভয়ে সীতা বললে,—বলো না ! চুলে চিরুনি তার আর উঠ্‌ছে না।

দিলীপ অনর্গল ব'লে যেতে লাগলো : ওর জন্যে রান্না বন্ধ ক'রে দাও। থাক্ তোমার ঘরের কাজ প'ড়ে, যে তোমাকে অকারণ অন্যায় সন্দেহ ক'রে মারে, শত প্রলোভনেও তাকে ছুঁয়ো না—কেন তার জন্যে এমনি তুমি ঘর গুছিয়ে, বিছানা ক'রে রেখেছ ? তুমি ত' শোও দেখ্‌ছি মেঝের ওপর। কিসের তবে তোমার এই বিলাস শুনি।

খিল খিল ক'রে হেসে উঠে সীতা দিলীপের সমস্ত উৎসাহ এক নিশ্বাসে নিবিয়ে দিলো। বললে,—না রাঁধ্‌লে-বাড়লে ভারি ত' তাঁর ব'য়ে গেলো। বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দিব্যি এক হোটেলে গিয়ে উঠ্‌বেন—আমি বেচারি আকাশের দিকে চেয়ে হাওয়া খাই ব'সে-ব'সে। ভারি ব্যবস্থা করলে যা-হোক্।

—না, কিছু মার না খেলেও তোমার পেট ভরে না যে। আর মার খেয়েও ফের বিনিয়ে-বিনিয়ে খোসামোদ করতে চাও। আমি বলি কি—

সীতা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো।

—আমি বলি কি—যাতে সে আগেই গিয়ে হোটেলে না উঠ্‌তে পারে তার পথ দেখ। তুমি এই অত্যাচারী অসচ্চরিত্র মাতাল স্বামীর—

গম্ভীর হ'য়ে সীতা বললে,—দয়া ক'রে আমার স্বামীর নিন্দা না-ই করলে, ঠাকুরপো।

কিন্তু কথা যখন একবার বলতে সুরু করেছে, মাঝ পথে দিলীপ থামবে না: এই অত্যাচারী মাতাল স্বামীর ঘর ছেড়ে আগেই তোমার চ'লে যাওয়া উচিত। এ-ঘরে কোথাও এতোটুকু পবিত্রতা নেই, সম্মান নেই। আমি মেয়ে হ'লে অমন স্বামীর পা আঁকড়ে ধ'রে গোঁজ হ'য়ে প'ড়ে থাকতাম না।

তেমনি গম্ভীর গলায় সীতা বললে,—ভাগ্যিস হও নি। জন্মে-জন্মে যেন না হও।

—অন্য দেশ হ'লে তারো নতুন ক'রে প্রণয়িনী হ'বার স্বাধীনতা থাক্‌তো। চিরকাল এমনি পুরোনো চাল ভাতে বাড়িয়ে খিদে মেটাতো না।

আতঙ্কে সীতার মুখ শুকিয়ে গেলো; বললে,—ওরে বাবা, বলো কী? বেরিয়ে যাবো কোথায়?

—আশ্রয় চাইলে এতো বড়ো পৃথিবীতে তার অভাব হয় না।

—কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো পথ কি আর নেই, ঠাকুরপো?

—সদর রাস্তাই খোলা প'ড়ে আছে—যে-পায়ে স্বামী লাথি মারবে সে-পায়ে তেল মাখবে ব'সে'-ব'সে, মদ খেয়ে বমি ক'রে ঘর ভাসিয়ে দিলে কোমরে আঁচল বেঁধে ঝাঁটা-ফিনাইল্ নিয়ে ঘর সাফ করবে—

সীতা হেসে বললে,—তা না হ'লে ঘর-দোর সারা রাত অমনি নোংরা রাখতে বলো নাকি? মাছি ভন্-ভন্ করবে না?

—আর ভবিষ্যতে এক দিন গণিকা নিয়ে বাড়ি এলে গায়ে জ্বর নিয়ে তেমনি তাঁদের তুমি রেঁধে খাওয়াবে। স্বর্গের আসন তোমার মারে কে শুনি?

ব'লে দৃক্‌পাত না ক'রে হন্ হন্ ক'রে দিলীপ তার ঘরে চ'লে গেলো।

পঁচিশ

চারদিকে দেয়াল

আর, এতো কথা শোনার পরেও সীতা কি না চুপি-চুপি রান্নাঘরে এসে উনুনের মাথায় ডেকচি চাপিয়ে দিলে। দিলীপের নিদারুণ লজ্জা করতে লাগলো—এতো কথা অকারণে কেন সে বল্‌তে গেছ্‌লো এবং কাকে? সতীকে সে কি না মানুষ করতে চায়—কার এমন দায় পড়েছে! কে তাকে খেতে দেবে, কোথায় সে আশ্রয় পাবে, ভালোবাসা এক নতুন বিপদ, এগিয়ে চলা জীবনের এক ক্লান্তিকর উপসর্গ—তার চেয়ে সতী হওয়া ঢের বেশি সহজ, ঢের বেশি আরামের। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, তবু সে সীতার ওপর বিমুখ হ'তে পারে না, আক্রমণটা পুরন্দরকে লক্ষ্য ক'রেই মনের মধ্যে গর্‌জাতে থাকে। অন্যায় একটা অমিতাচারের মতোই সাম্প্রদায়িক বক্তার ঢঙে অনর্গল এতোগুলি কথা অনর্থক ব'লে এসে তার এখন যেন কেমন অস্বস্তি লাগছিলো। আবার লঘু ও সহজ হ'তে না পারলে সারা সময়ই সে খালি পুরন্দরের প্রতি ফুঁসতে থাকবে, ভালো ক'রে রাতে একটু অনিদ্রাও সে উপভোগ করতে পারবে না।

দিলীপ নিঃশব্দে রান্নাঘরে চ'লে এলো। ধোঁয়া তখনো ঘর ছেড়ে সম্পূর্ণ পালায় নি, উনুনটা আগুনে গন্‌গন্‌ করছে। দিলীপকে দেখতে পেয়ে সীতার চোখ আরো ফিকে হ'য়ে এলো; কাতরস্বরে বললে,—দু'টি রান্না ক'রে না-হয় দিলামই, ঠাকুরপো। এখুনি পড়িয়ে ফিরবেন, বিকেলে চা করতে একটু দেরি হলো ব'লে রাগ ক'রে না খেয়েই চ'লে গেলেন বেরিয়ে। নিশ্চয়ই খুব খিদে নিয়ে ফিরবেন দেখো।

দুর্ব্বল কৃশ শরীর জ্বরে টলমল করছে, শুকনো চুলে ও ক্ষতাক্ত কপালে মুখখানি তার ভারি করুণ, দুটি রিক্ত হাত মমতায় উছ্‌লে পড়ছে, নড়া-চড়ার পলকা ভঙ্গিতে মধুর একটি ভঙ্গুরতা—দিলীপ খানিকক্ষণ মুগ্ধের মতো চেয়ে রইলো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার হাত থেকে হাতাটা কেড়ে নিয়ে অভিভাবকের সুরে বললে,—যাও, আগুনের আঁচে তেতে-পুড়ে তোমাকে আর রাঁধতে হবে না। বাইরের বারান্দায় হাওয়ায় একটু বসো গে, যাও।

সীতা অবাক হ'য়ে বললে,—সে কী! তুমি রাঁধবে নাকি?

—তোমার সঙ্গে আমিও না-হয় অপমান একটু ভাগ ক'রে নিলাম। যাও, দিব্যি রেঁধে দিতে পারবো। পাহাড়ে-বিলে কতো পিক্‌নিক করলাম—তোমার স্বামীর কাছে আমার রান্না আর নেহাৎ অখাদ্য হবে না।

মুচকে হেসে সীতা বললে,—কী ক'রে বুঝবো? আমাকে ত' একটু চাখ্‌তে দেবে না!

—দেখ না, ঘ্রাণেই ঠিক বুঝতে পারবে। কী বসিয়েছ হাঁড়িতে? খালি জল?' বেশ, চালে-ডালে বসিয়ে দি। এক জনের আন্দাজ।

—আর তুমি?

—বললাম যে পেট ভরা, খিদে নেই।

—না, না, তা হবে না। দু'জনের আন্দাজ—আমার মাথা খাও।

—তোমার মাথা খাবার অন্য লোক আছে—এবং তা ধর্ম্মত ত' বটেই, আইনত। তুমি যদি রাঁধতে, তবে তোমার এ-অনুরোধ খানিকটা অন্তত সাজ্‌তো।

—তবে সরো, আমিই রাঁধ্‌ছি। দেখি কেমন তুমি না খেয়ে পারো।

—বোস চুপ ক'রে।

—এই না বল্‌ছিলে খুব ভালো রাঁধ্‌তে পারো,—তবে খাবে না কেন?

—পারিই তো। খাবো না, নিজের মুখে নিজের রান্না রোচে না কোনোদিন। তাতে স্বাদ পাওয়া যায় না। যেমন ধরো নিজের স্ত্রী। ঘরে ডিম আছে ত'?

ধরা গলায় সীতা বললে,—আছে। ঐ কালো হাঁড়িটায়। হ্যাঁ, ওটার নিচে—ঐ পাশে। একেবারে বোকা!

—বুদ্ধি দেখাতে ধোঁয়ার মধ্যে তোমায় না এলেও চল্‌বে। পেয়ে গেছি। তুমি এবার দয়া ক'রে মেঝের ওপর শুয়ে-শুয়ে স্বামীর পদধ্বনির প্রতীক্ষা করতে থাকো। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি নামিয়ে ফেলছি। খিচুড়ি—আর দু'টো ডিম সিদ্ধ। আর কতো খায়! পেঁয়াজ,—পেঁয়াজ কই?

—দাঁড়াও, আমি কুটে দিই।

—থাক্‌, জ্বরে ত' একেই চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে, পেঁয়াজ কাটতে ব'সে শেষকালে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেল আর কি।

—তা কাঁদবার কী হয়েছে?

—বা, এমন সুন্দর ক'রে স্বামীর জন্যে রেঁধে দিতে পারলে না—প্রত্যেক সতী-নারীরই ত' কান্না আসা উচিত। ভয় নেই, রান্না ভালো হোক্‌, মন্দ হোক্‌, তোমার নামেই চ'লে যাবে। আমি তুক্‌ জানি বৌদি, দেখবে তারপর কী হয়—সেবা করতে আমাকে আর ডাকতে হবে না।

—কী যে বলো। তোমার ভ্রাতৃভক্তিরো অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছ।

—দেখাচ্ছি, না? অলক্ষ্যে কখন একগাদা লঙ্কা ঢেলে বসবো,—সাবধান হ'য়ে কথা বলো।

—বা, চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছে ত'।

—এরি মধ্যে? আশ্চর্য্য তোমার রসবোধ, বৌদি। তুমি দাদার ঠিক সহধর্ম্মিনী হ'তে পারবে। ঔপন্যাসিকের চমৎকার সমালোচক। দাদা কী নিয়ে উপন্যাস লিখছে জানো?

কৌতূহলী হ'য়ে সীতা বললে,—কী নিয়ে?

হাতা দিয়ে হাঁড়ির ভেতরটা নাড়তে নাড়তে দিলীপ বললে,—স্বামী চরিত্রহীন মাতাল—স্ত্রী তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে অন্য প্রণয়ীর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার তোড়-জোড় করছে। বেরিয়ে ঠিক গেলো কি না এখনো খবর পাই নি। কিম্বা হয় ত' আবার ফিরে এসে স্বামীর পা চুল দিয়ে মুছে দিচ্ছে কে জানে। যাই বলো, খুব জোরালো আধুনিক উপন্যাস। চরিত্রগুলি অবশ্যি খাতার পৃষ্ঠা উল্টে লুকিয়ে একদিন দেখে নেব।

সীতা ফের গম্ভীর হ'য়ে গেলো। বিমনা হ'য়ে বললে,—কৈ, এখনো ত' তিনি এলেন না পড়িয়ে।

—খিদে নেই বৌদি, খিদে নেই। জগৎ জুড়ে এই আজকের মানুষের সমস্যা। খিদে করবার জন্যে শক্তির প্রচুর অপব্যয় চলেছে। কিন্তু আসুন বা না আসুন, দুর্ব্বল শরীরে খোলা বারান্দায় আর তোমার বসতে হবে না। তোমার 'রয়্যাল্' বিছানায় শুয়ে পড়ো গে যাও।—তার পর কালকের রাতের সীতার গলা নকল ক'রে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য এনে দিলীপ বললে,—যাও : গেলে?

অল্প একটু হেসে উঠ্লো সীতা ; বল্লে,—সব ঠিক-ঠাক্ ক'রে রাখতে পারবে ত'?

—সব।—তারপর সীতাকে চ'লে যেতে দেখে খুসি হ'য়ে দিলীপ বললে,—বা, বেশ মেয়ে। আমারই মতো বাধ্য।

তার পর কোনো রকমে দিলীপ রান্না-বান্না নামিয়ে ফেললে। থালায় ক'রে ভাত বেড়ে রাখবে না ছাই! নিজে এলে বেড়ে নেবে। বাড়ি ফিরে তৈরি খাবার যে পাবে এই তার অনেক ভাগ্যি।

মালকোঁচা নামিয়ে কাপড়ে ভিজে হাত মুছ্তে-মুছ্তে দিলীপ সীতার ঘরে এসে দেখলে ঘর খালি। পড়বার ঘরেও কেউ নেই—বারান্দায় ঝি ব'সে মশা তাড়াচ্ছে। কোথায় গেলো তবে? উন্মনস্ক হ'য়ে সে শেষে নিজের ঘরে এসেও উঁকি মারলে। সীতা তারই তক্তপোষে বিছানা ক'রে গা ঢেলে দিব্যি শুয়ে আছে।

ঘরে আলো জ্বালা নেই—আবছা অন্ধকারে সীতার এলানো কৃশ দেহটি রাত্রে ভাটা-নদীর জলের মতো টল্‌টল্ করছে। খোলা জান্‌লা দিয়ে অল্প-অল্প হাওয়া

আসছে, মাথার শুকনো দুয়েক গুচ্ছ চুল, আঁচলের ছিলের খানিকটা উড়ছে। আবহাওয়াটি ভারি কোমল, ভারি নিঃশব্দ। এতো কোমল যে পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকতে হয়; এতো নিঃশব্দ যে কে এসে ঘরে ঢুকলো বুঝতে পারা যায় না।

আস্তে-আস্তে দিলীপ সীতার শিয়রে গিয়ে বস্‌লো। শোবার ভঙ্গিটিতে স্পর্শ পাবার এমন একটি প্রশ্রয় আছে যে দিলীপ অনায়াসে তার গালে হাত রাখলে। হাতটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো; তীব্র জ্বরে গা দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। ঠোঁট দুটি পিপাসায় খস্‌খসে, চোখের পাতা দুটো যেখানে এসে বুঁজেছে, পাশে-পাশে তার কণা-কণা জল! দিলীপ ডাকলে: বৌদি।

সীতা আস্তে চোখ মেল্‌লো; ভঙ্গিটা সম্বৃত করলে না। বললে,—তোমার রান্না হ'য়ে গেলো?

—হ্যাঁ। তোমার ত' দেখছি ভীষণ জ্বর এসে গেলো ফের। কী করা যায়!

—ঘুমুনো ছাড়া আর ত' কোনো কাজ দেখছি না। কিন্তু যা মাথা ধরেছে। ব'লে সীতা দিলীপের অসাবধান হাতখানা তার গাল থেকে তুলে মাথার ওপর রাখলে।

চুলগুলি আস্তে-আস্তে টানতে-টানতে দিলীপ বললে,—কিন্তু ডাক্তার একজন ডাকতে হয়।

ডাকলে হয় বৈ কি। সীতা মৃদু-মৃদু হাস্‌ছে: কিন্তু তোমার দাদা যে এখনো আসছেন না।

—হ্যাঁ, সেই তো তোমার বড়ো ডাক্তার—সিভিল্ তো নয়, ক্রিমিন্যাল্ সার্জেন। কিছু উত্তম-মধ্যম প্রয়োগ করলেই গা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

সীতা উঠ্‌লো খিল খিল্ ক'রে হেসে; বললে,—দাদার ওপর হঠাৎ এমন অপ্রসন্ন হ'লে কেন?

—না, লক্ষ্মণের মতো ফল ধরতে বললে ধ'রেই থাকবো! নিতান্ত তুমি ব'লে, নইলে আমি একবার দেখে নিতাম।

—ছি!

এমনি সময় সিঁড়িতে কা'র ভারি-পায়ের জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেলো। সীতা হঠাৎ অলক্ষিতে একটু সন্ত্রস্ত হ'ল, সাড়িটা অকারণে গায়ের সঙ্গে ঘন ক'রে সংলগ্ন করতে লাগলো, পাশ ফিরে কাৎ হ'য়ে শোবার ভঙ্গিটাকে অপ্রশস্ত ক'রে আন্‌লে।

দিলীপ তাড়াতাড়ি তার মাথায় এক ঠেলা দিয়ে বললে,—যাও, যাও, পালাও শিগ্‌গির। জ্বর হয়েছে ত', হয়েছে কী! বাঘ যে ঐ এসে পড়লো।

জুতোর আওয়াজ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। সীতা শঙ্কিত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—পালাবার কী হয়েছে, আমাকে না ধরলে এক পা-ও আমি হাঁটতে পারবো না।

—ধরবার লোক এখন আপাততো পাচ্ছ না। পা চলতে চাইছে না এ নিতান্তই বাজে কথা—কেউ বিশ্বাস করবে না। ধরবার লোক ঐ এগিয়ে এলো, বৌদি।

বিছানার চাদরের একটা কোণ মুঠিতে শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে ভাঙা-গলায় সীতা বললে,—আসুক। আমি ভয় করি না।

—ভয় কর না ত'? দিলীপ উঠে দাঁড়ালো: হ্যাঁ, কিসের ভয়? কোথায় কী অন্যায় হচ্ছে?—কিছু না। মন যার ছোট, সেই খালি চারিদিকে পাপ খুঁজে বেড়ায়, নিজের দিকে চেয়ে পরকে প্রতিক্ষণে কেবল নষ্ট হ'য়ে যাবার কল্পনা করে। আসুক না। এই দরজাটা আমি বন্ধ ক'রে দিলাম, বৌদি।

মুখ-চোখ পাংশু ক'রে সীতা বললে,— দরজা বন্ধ করতে গেলে কেন? না, না, দরজা খোল।

হেসে দিলীপ বললে,—বা, নিচে থেকে ধোঁয়া আস্‌ছে যে। খিল আর লাগাচ্ছি না, হাওয়ায়ো ত' বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।

—না, না, খুলে রাখো দরজা। আলো জ্বালো। অন্ধকারে নিশ্বাস আমার বন্ধ হ'য়ে এলো।

দিলীপ আবার এসে সীতার শিয়রে বসলো। আবার চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিলে—চুলে পর্য্যন্ত সীতার ভয় সঞ্চারিত হচ্ছে। দিলীপ বললে,—আলো জ্বালবার আর দরকার নেই। জুতোর শব্দটা দোতলায় উঠেই থেমে গেছে। অমন আর কুঁকড়ে থেকো না।

সীতা ফের আরামে দেহবিস্তার করলো। ভারি-গলায় আপন মনেই যেন বললে,—এলেন না এখনো? কেন আসছেন না বলো ত'?

দিলীপ বললে,— এলেই সত্যি খুব ভালো ছিলো। হয় ত' সোজা আপিস্ চ'লে গেছেন, কিম্বা—। নিতান্তই যদি না আসেন আজ, রান্না আমি সব সাবাড় ক'রে ফেলবো, কিছু ফেলতে দেব না। আমার দিব্যি এখন খিদে পাচ্ছে।

ছাব্বিশ

অসুখের সুখ

অসুখটা যে তার কী, সীতা একটু-একটু ক'রে বুঝতে পারছে! জ্বর হয় আর ছেড়ে যায়, কিছু খেতে রুচি নেই, গায়ে-হাত-পায় ব্যথা আর বাসা ছাড়ছে না, মাথাটা সব সময়ে ধ'রেই আছে। বাড়িতে এমন কোনো মেয়েছেলে নেই যার কাছ থেকে অসুখের আসল পরিচয়টা সে জেনে নিতে পারে—সন্দেহের একটা সুরাহা হয়! দোতলার বউটির সঙ্গে সামান্য তার ভাব আছে বটে, কিন্তু খোলাখুলি কিছু জিগ্‌গেস করবার মতো ঘনিষ্ঠতা হয় নি; এতোটা রসিকতা করবার সম্পর্ক এখনো পাকা হয় নি যে এ-কথাটা নিতান্ত রহস্যচ্ছলে চালিয়ে দেবে। স্বামীকেই বললেই ত' সে পারে—সর্ব্বনাশ, উল্‌টে কী তিনি ব'লে বসেন কিছু ঠিক আছে নাকি তার? তা ছাড়া স্বামীকে বলতে হবে ভেবে সারা গা তার ঘিন্‌ঘিন্ ক'রে উঠ্‌লো—চিন্তাটা পর্য্যন্ত কী নিদারুণ অশ্লীল! দিলীপ ত' ডাক্তার ডাকবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগে গেছে—নিতান্ত দাদা মাথার উপর অভিভাবক হ'য়ে আছে, তাই এক্ষেত্রে তার এই ব্যস্ততাটা অশোভন ব'লেই কিছু সে একটা ক'রে উঠ্‌তে পারছে না। না, না, ডাক্তার আসবে কী! সব জানাজানি হ'য়ে যাবে—দিলীপের থেকে পর্য্যন্ত খবরটা লুকোনো যাবে না। শরীরের সেই লজ্জা সে ঢাকবে কী ক'রে? ডাক্তার লাগবে না, নিজেই সে বুঝতে পারছে। কিন্তু ভয় করছে নিদারুণ, বোধ হয় সে মরে'ই যাবে শেষকালে। মরতে তার সত্যিই ইচ্ছা করে না, কাণ্ডটা একবার নিজের চোখে দেখে নিতে চায়। এখুনি ভেবে সারা হবার কী হয়েছে? দেরি আছে ঢের। অগত্যা স্বামীকেই একদিন বলতে হবে আর কি। তাঁরই তো জিনিস—যা তিনি ভাবুন—তাঁরই তো ব্যভিচারের ফল!

গায়ের চামড়া দিন-কে-দিন ফ্যাকাসে হ'য়ে আসে, ঘুম থেকে উঠে বমি করে, চুলও দু'চারগাছ ক'রে পাৎলা হ'য়ে এলো—ঘুস্‌ঘুসে জ্বরে হাড় ক'খানা ভাজাভাজা হলো। তাই নিয়েই সে রাঁধে-বাড়ে, ঘর গুছোয়, তাই নিয়েই সে—দিলীপ কলেজ চ'লে গেলে—লুকিয়ে-লুকিয়ে ছোট-ছোট কাঁথা সেলাই করে।

দিলীপ হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসে বললে,—কী, আবার তুমি রান্নাঘরে এসেছ? তোমার না জ্বর!

ম্লান হ'য়ে সীতা বললে,—চোখ চেয়ে কে আর তা দেখতে এসেছে বলো?

—দেখতে না চায়, চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেখাতে হবে। আমি যাচ্ছি এখুনি

দাদার কাছে, দেখি একবার। এ কী অন্যায়! ব'লে সে ফের হন্-হন্ ক'রে চ'লে যাচ্ছিলো।

সীতা খপ্ ক'রে একখানি হাত চেপে ধরলো; বললে,—না, তোমাকে আর ফোঁপরদালালি করতে হবে না।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দিলীপ বললে,—কতো কাল আর তুমি এমনি ভুগবে? দেখি, একটা ব্যবস্থা ক'রেই ফেলতে হবে যা-হয়।

—শোনো, শোনো, দাঁড়াও। দিলীপ দাঁড়ালো। সীতা অনুনয়ের সুরে বললে,—আমার হ'য়ে কিছু তুমি তাঁকে বলতে যেয়ো না, তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুরপো।

—তোমারো পায়ে আমি একশো বার পড়তে পারবো অনায়াসে, কিন্তু এমনি ক'রে জ্ব'লে-পু'ড়ে শুকিয়ে-শুকিয়ে তোমার এই নির্ব্বিবাদ আত্মহত্যা আমি দেখতে পারবো না।

—নিজের স্ত্রী হ'লে এতো আদর মানাতো,—কেন আমার জন্যে মিছিমিছি অপমানিত হ'তে যাচ্ছ!

—এই যেমন নিজের স্ত্রীর জন্যে আদরে দাদার সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে! নিজের স্ত্রী হ'লে কী যে করতাম তা না-ই বা শুনলে। ব'লে দিলীপ সোজা পুরন্দরের বসবার ঘরে গিয়ে হাজির হলো।

পুরন্দর বুকের তলায় বালিশ রেখে ফুলস্কেপ কাগজে মোটা-মোটা অক্ষরে খস্-খস্ ক'রে উপন্যাস লিখছে। বিড়ির ছাইয়ে মেঝেটা নোংরা, খাতা-পত্র উল্টোনো, পুরন্দরের জামা-কাপড়েও শ্রী নেই, শরীরে অপরিসীম একটা ক্লান্তির কালিমা মাখা। ঘরের মধ্যে দ্রুতপায়ে আগন্তুকের আবির্ভাব দেখে পুরন্দর ত্রস্ত হ'য়ে চোখ তুলে দিলীপকে একবার দেখলে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিষ্ঠুর উপেক্ষায় চোখ নামিয়ে এনে লেখায় মগ্ন হ'য়ে গেল। অভিনিবেশ যে তার কতো গভীর তাই প্রতিপন্ন করবার জন্যে যা-খুসি তাই সে এখন দুর্নিবার বেগে লিখে চলেছে—সব আবার সে নিঃসন্দেহে কেটে ফেলবে, এই, দিলীপ তার কথাটা সেরে নিলেই—কিন্তু কান পেতে রেখেছে, দিলীপের আজকের কথাটা না-জানি কী! মুখ-চোখের চোখা-চোখা ভাব দেখে পুরন্দর বিশেষ আশ্বস্ত হ'তে পারলো না।

অনাবশ্যক রূঢ়তায় কোনো লাভ নেই, এটুকু বিবেচনা দিলীপের আছে—তা ছাড়া গায়ে প'ড়ে তার এই ওকালতি করবার মধ্যে কোথায় যে একটা অনধিকারের আতিশয্য ছিলো তাও যে সে না বুঝতে পারছে তা নয়। তাই ভঙ্গিটা সে অনেক নরম ক'রে আনলো,—কলহের সুর নেমে গেলো একেবারে উদারার খাদে। স্পষ্ট

অথচ নম্র কণ্ঠে বললে,—বৌদির আজ অনেক দিন থেকেই জ্বর—একজন কোনো ডাক্তার ডেকে আনলে হয় না ?

—জ্বর নাকি ? পুরন্দর যেন আকাশ থেকে পড়লো : কৈ, দিব্যি ত' ঘরের কাজকর্ম্ম রান্নাবান্না করছে—কবে জ্বর হলো ? আমার চোখে ত' পড়ে নি !

দিলীপ বললে,—চোখে পড়ে নি কি-রকম ? জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—ছেড়ে-ছেড়ে আবার হয়, আজ বোধহয় মাস দুই। এই নিয়েই নিজেই যে ক'রে হোক্ রান্না করেন, খাওয়া-দাওয়া ত' নেই-ই বলতে হয়। বৌদির চেহারা কী-রকম শুকিয়ে গেছে এও তোমার চোখে পড়লো না ?

চোখ নামিয়ে কাগজের লেখাটা পড়বার মতো ক'রে পুরন্দর বললে,—কী করবো, চোখের অতো গভীরতা নেই, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে কি না হাত দিয়ে দেখবারো এতোদিন সময় পাই নি। তুমিই ভালো বলতে পারো।

দিলীপের কান দুটো জ্বালা ক'রে উঠলো। স্থির কণ্ঠে বললে,—ডাক্তার একজন নিয়ে আসবো ভাবছি। কাকে আনবো ?

—আনো, যাকে তোমার মন চায়।

—বেশ, আমি যাচ্ছি এখুনি কল্ দিতে। ভিজিট ও ওষুধ-পথ্যের টাকা জোগাড় ক'রে রাখো।

পুরন্দর মুখ তুলে এবার স্পষ্ট ক'রে চাইলো। কটু কণ্ঠে বললে,—টাকা ? টাকার আমি কী জানি ?

— তোমার স্ত্রীর অসুখ, তুমি জানো না ?

—স্ত্রীর অসুখ ব'লেই জানি না !

—বেশ, এবার ত' জান্‌লে। টাকা ঠিক ক'রে রাখো। ডাক্তার নিয়ে এখুনি আমি এসে পড়ছি।

পুরন্দর আবার লেখায় চোখ নামিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে,— টাকা নেই।

—টাকা নেই মানে ? দিলীপ উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো : মদ খাবার সময় ত' বিস্তর টাকা হয়। স্ত্রীর অসুখের বেলায়ই আর হাত ওঠে না।

কিন্তু পুরন্দর নির্লজ্জের মতো হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লো, হাসি থামিয়ে বললে, — ছেলেমানুষ, রামকৃষ্ণের শিষ্য, তুমি তা বুঝবে কী ! এখন এখান থেকে যাও, বিরক্ত করো না। ডাক্তার ডাকতে হয় নিয়ে এসো গে, কিন্তু এমন কিছু হয়নি যে গাঁট থেকে পয়সা খরচ করতে হবে ! নিতান্তই ছোট ভাই হ'য়ে জন্মেছ, নইলে সত্যি কথাটা আরো সহজ ক'রে বলতে পারতাম।

রাগে দুঃখে দিলীপের ঠোঁট দুটো থর্-থর্ ক'রে কাঁপছে, চোখে জল এসে

কপালে ঘাম দিয়েছে। কটু কণ্ঠে বললে,—ছোট ভাই ব'লে ত' চমৎকার সম্মান দেখাচ্ছ। কিন্তু নিজের স্ত্রীর অসুখে এমন কেউ কসাই থাকতে পারে এ আর কোনোদিন দেখি নি।

তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে পুরন্দর বললে,—কতোটুকু তোমার বয়েস—কী-ই বা এমন অভিজ্ঞতা হবে! যাও, এখেনে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, ডাক্তাররা সব বেরিয়ে গেলো। নিজের পয়সা থাকে, একটা ছেড়ে পঁচিশ গণ্ডা ডাক্তার নিয়ে এসো না, ইচ্ছে করলে তোমার বৌদিকে নিয়ে সিমলে-পাহাড়েও বেড়িয়ে আসতে পারো।

—পয়সা থাকলে কী পারি না পারি তা তোমাকে বলতে হবে না। ডাক্তার আমি নিয়ে আসছি। ব'লে দিলীপ ঘর থেকে বেরোতেই দেখতে পেলো সীতা স্খলিত-আঁচলে ছুটে পালাচ্ছে। দেয়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে এতোক্ষণ সে সব কথা শুনতে পেয়েছে নিশ্চয়।

নিশ্চয়। রান্নাঘরে দিলীপ তাকে অনুসরণ করলে। গিয়ে দেখলে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে ব'সে সীতা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এ যে কী অসহায় কান্না—দেখে দিলীপের গা-হাত-পা নিমেষে কালিয়ে এলো, মুখ দিয়ে একটিও কথা বেরুলো না।

দিলীপ কাছে এসে দাঁড়াতেই সীতা সহসা মুখ তুলে ক্ষিপ্তের মতো বললে—কেন তুমি ডাক্তার ডাকবার বায়না ধরতে গেলে—কী তোমার অধিকার আছে যে আমার জন্যে পয়সা খরচ করতে চাও? খবরদার, আমার জন্য ডাক্তার আনতে পারবে না। ব'লে আবার তার তেমনি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না।

দিলীপ থ হ'য়ে গেলো। বললে,—সে কী কথা, বৌদি। তোমার যে কতো দিন থেকে জ্বর।

—আহা, হোক্ না জ্বর—তোমার তাতে কী! ডাক্তার আনলে ঠিক আমি গলায় দড়ি দেব দেখো।

দিলীপ বললে,—বেশ, ডাক্তার না আনলেই কি তোমার কান্না ফুরুবে?

সীতা সাড়া দিলো না, নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। সাড়া দিলো না দেখে দিলীপ তার মাথায় একটু হাত রাখলে।

সীতা আবার ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে: স'রে যাও এখান থেকে! কী সাহসে তুমি আমাকে ছোঁও শুনি? জ্বর হয়েছে—বেশ হয়েছে।

দিলীপ হাসবে না কাঁদবে কিছু বুঝতে পারলো না—ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলো।

সাতাশ

জঠরানল

অগত্যা রাত্রে আর দিলীপের খিদে নেই।

পুরন্দর খেয়ে-দেয়ে আপিসে বেরিয়ে গেছে—সারা দিনে সীতার সঙ্গে একটিও কথায় তার দরকার হয় নি। হাতের কাছেই সব কাজ তৈরি পেয়েছে—তেলের বাটিটি থেকে সুরু ক'রে শোবার কাছে গ্লাস-ভর্ত্তি জল পর্য্যন্ত। সীতাকে একমাত্র তার দরকার—যখন বাজারের পয়সা—বরাদ্দ আট আনা তাকে সময়মতো দিতে হবে। টিপয়ের উপর রেখে ঝিকে উদ্দেশ ক'রে খবরটা নেপথ্যে ঘোষণা করলেই সীতা সঙ্কেতটা বুঝতে পারে। এই জায়গাটুকুতেই ব্যবধান একটু সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে—নইলে দিন-রাত্রি একরকম কাটছে মন্দ না। যাই হোক্ সে, ঝি এলো দিলীপকে তাড়া দিতে,—খেতে যেতে হবে। দিলীপ সরাসরি রায় দেবার মতো ক'রে বললে,—না, খাবো না, খিদে নেই।

পুরুষের মধ্যে আর সমস্তর অভাব মেয়েরা বরদাস্ত করতে পারে, কিন্তু খিদে নেই—এর চেয়ে বড়ো অকর্ম্মণ্যতা তারা হয়তো ধারণা করতে পারে না। অগত্যা সীতা নিজেই আবির্ভূত হলো। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললে,—খাবে না কী! এক গা জ্বর নিয়ে এতো কষ্ট ক'রে রাঁধলাম, একটু মায়া করে না তোমার?

দিলীপ চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো; তবু রুক্ষস্বরে বললে,—রাঁধ্‌বে না মানে? বিনা পরিশ্রমে খেতে-পরতে পারছ, চোর-ডাকাতের আক্রমণ থেকে অহোরাত্র তোমাকে রক্ষা করা হচ্ছে—রেঁধে দেবে না কী-রকম! জ্বর হয়েছে তাতে কী—জ্বর হয় কেন? তার জন্যেই ত' তোমার ওপর মার-ধর করা উচিত। একশো বার উচিত। নইলে জ্বর তোমার ছাড়বে কেন? তোমায় মায়া করতে যাবে কোন্ মূর্খ?

সীতা দুষ্টুমির হাসি হাসতে-হাসতে বললে,—কিন্তু মূর্খরা ত' অন্তত নিজের ওপর মায়া দেখায়। পেটে খিদে চেপে রেখে কেউ এমন বক্তৃতা করে না।

দিলীপ বিরক্ত হ'য়ে বললে,—যাও, আমাকে পড়তে দাও। এ-বাড়িতে পড়া-শুনোও হয় না ছাই। আমি এখান থেকে চ'লে যাবো ভাবছি।

—কোথায়?

—যেখানে আমার খুসি।

—সিমলে পাহাড়? তবে আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও না।

দিলীপ চুপ। বইয়ের কোন্ জায়গাটা যে সে ঠিক পড়বে তার পৃষ্ঠা খুঁজে পাচ্ছে না।

এগিয়ে এসে তার ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলে সীতা বললে,--সত্যি আমাকে নিয়ে যাবে না, ঠাকুরপো ?

—যাও, বিরক্ত করো না এখন। ঢের কাজ তোমার এখনো প'ড়ে আছে।

—থাক্‌ প'ড়ে। আমাকে কোথাও সত্যি নিয়ে চলো, ঠাকুরপো। কী ছাই খালি বই পড়ছ, মানুষের মন পড়তে পারো না ?

দিলীপ মুহূর্ত্তমধ্যে মরিয়ার মতো চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। সীতার একখানি হাত চেপে ধ'রে বললে,—যাবে আমার সঙ্গে ?

—ছাড়ো, ছাড়ো, উঃ, কী চোয়াড়ে তোমার হাত! বাবা, কব্জিটা গুঁড়ো হ'য়ে গেছে! তোমার সঙ্গে যাবে না হাতি! চলো, এবার খেতে চলো। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, হাঁটু দুটো ঠক্‌-ঠক্‌ করছে। তোমার সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথই কি নেই ?

—আছে বৈ কি।

—আছে ? কী ?

—দাঁত বের ক'রে হাসা, কিম্বা ম'রে যাওয়া।

—কোনোটাই আমার পোষাবে না। দুটোতেই আমার ভয় করে।

—আর এই খুব ভালো লাগে ? যাও, আমি খাবো না।

—বেশ, তবে চেয়ারে উঠে গিয়ে পড়ো গে, বিছানাটা পেতে দি। একেবারে ভেঙে পড়ছি।

—নিজের ঘরে যাও।

—সেখানে ত' মেঝের ওপর শুতে হবে। একা-একা জ্বর গায়ে আমার ভয় করে।

দিলীপ চেয়ারে উঠে গেলো না; বললে,—বাপের বাড়ি চ'লে যেতে পারো না ?

—সেখানে কে আছে ? এক মা—কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত পক্ষাঘাতে প্রায় অসাড়। সুরেন-দাদা—আমার জ্যাঠতুতো ভাই—প্রকাণ্ড সংসার মাথায় নিয়ে হাঁপাচ্ছেন। জেঠাইমা সে-বছর হার্ট ফেল্‌ ক'রে মারা গেলেন—সুরেন-দাদার একগাদা ছেলে-পিলে। জোত-জমি কিছু ছিলো, খাজনা-পত্র এক পয়সাও আদায় হয় না। তাঁদের চোখে আমি ত' দিব্যি সুখে আছি। কেন আমি তাঁদের বিব্রত করতে যাবো বলো ? কিন্তু তুমি এবার ওঠ, বিছানাটা পেতে ফেলি।

দিলীপ বললে,—তোমার সুরেন-দাদাকে চিঠি লিখে দি, তিনি এসে তোমাকে নিয়ে যান। তোমার এ-দৃশ্য আমি চোখ মেলে আর দেখতে পারি না।

—বা, এই না আমাকে স্বচ্ছন্দে ম'রে যেতে বললে ?

সীতার দুই হাত সহসা নিজের হাতের মধ্যে জড়ো ক'রে দিলীপ বললে,—না, তোমার সুরেন-দাদা আসুন। বাপের বাড়ি গেলে শরীর তোমার সেরে যাবে দেখো।

সেই নিরুত্তাপ স্পর্শের মাঝে নিজেকে সমর্পণ ক'রে সীতা বললে,—নিজে কিছু করতে পারলেন না, এখন বুড়ো সুরেন-দাদাকে ডাকতে যাচ্ছেন।

—আর তোমার কেউ নেই ?

গভীর চোখ তুলে সীতা বললে,—তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ত' দেখতে পাচ্ছি না।

—আমি ত' তোমার দু' চোখের বিষ।

—আর আমি বুঝি তোমার দু' চোখের জল! চলো, খেতে যাবে এবার। বিশেষ কিছু রাঁধিনি, ঘরে সব এখন বাড়ন্ত। মাস-কাবারের টাকাটা তোমার দাদার থেকে চেয়ে আনতে পারো না ?

—আমার কী মাথা-ব্যথা। আমি ত' কালই চ'লে যাবো।

—ইস্!

—তবে এখেনে উপোস ক'রে মরবো নাকি ?

—বা, আমি উপোস করছি না ?

—করো না। যতো তোমার খুসি। আমার দস্তুরমতো ক্ষুধাবোধ অপমানবোধ ব'লে একটা অনুভূতি আছে।

—আছে ত' ? সীতা দিলীপের হাত ধ'রে টানাটানি করতে লাগলো : তবে ওঠ, খিদের জিনিস তোমার তৈরি।

অর্ধস্ফুটকণ্ঠে দিলীপ বললে,—কোথায় ?

—কেন, রান্নাঘরে! দু' পা এগিয়েই। এসো। খুব পড়েছ যা-হোক্। একজামিনে তুমি ফার্ষ্ট হবে।

আটাশ

সুরেন-দাদা

দিলীপ যা ভেবেছিলো তাই, রোগা জ্বরো শরীর নিয়ে রাঁধতে গিয়ে সীতা ভির্মি খেয়ে মাটিতে প'ড়ে গেলো। তবু পুরন্দরের ডাক্তার ডাকবার পয়সা নেই। ঠিক হলো, দু' ভাই মিলে পাশের একটা মেস্ থেকে আপাততো গিয়ে খেয়ে আসবে—

যদ্দিন না সীতা সারে। কিন্তু প্রথম দিন খেয়েই পুরন্দরের যখন পেট খারাপ হলো, তখন সে ঝাঁজালো গলায় বললে,—এক মুঠো ভাতই যদি না রেঁধে দিতে পারবে, তবে তাকে নিয়ে কী ক'রে ঘর করা যায়। দেহ যেমন একটা দড়ি, স্বভাবটিও তেমনি কাঠ।

অগত্যা কাৎরাতে-কাৎরাতে সীতা খুন্তি-হাতা নিয়ে ফের নাড়াচাড়া করতে বসে। কিন্তু পাতিব্রত্যের মতো শরীরেরো একটা সীমা আছে। সীতা আবার মূর্চ্ছিত হ'য়ে ঘুরে পড়লো।

দিলীপ বললে,—একটা ঠাকুর ডেকে আনি।

পুরন্দর রুক্ষ গলায় বললে,—তোমার পয়সা বেশি থাকে যা খুসি তুমি করতে পারো।

—পয়সা বেশি আছে কি না জানি না, কিন্তু তোমার চেয়ে মনুষ্যত্ব একটু বেশি আছে ব'লেই মনে হয়।

—বেশ, শুনে খুসি হলাম। মাইনে যখন আমি দিতে পারবো না, তখন তোমার ঠাকুরের রান্নাও যে আমার মুখে তুলবার অধিকার নেই সেটুকু মনুষ্যত্ব অন্তত আমার আছে। ব'লে পুরন্দর বাইরে বেরিয়ে গেলো।

দিলীপের আর সন্দেহ নেই যে পুরন্দর এমনি ক'রে দিনের পর দিন সীতাকে ক্ষয় ক'রে-ক'রে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দিক, তাতে তার কী এসে যায়! কা'র জন্যে সে যুদ্ধ করবে—আর কা'র বিরুদ্ধে? দুর্ব্বল স্নেহ অমিতবলী মৃত্যুকে কবে কখন পরাভূত করতে পেরেছে? কাল রাত পোহালেই সে বিদায় নেবে। চোখের সামনে মনুষ্যত্বের এমন হীন অবমাননা সে আর সইতে পারছে না। সীতা বেঁচে উঠ্‌লেই বা এ-সংসারে কোথায় তার আসন—কতোদিনের? আঘাতে যার কেবল ক্ষয় হয়, আঘাতের অনুপাতে চেতনাকে যে বিস্ফারিত করতে পারে না, তার ওপর দিলীপের কোনো সহানুভূতি নেই। নিতান্ত অন্যমনস্কের মতো দিলীপ সীতার শোবার ঘরে চ'লে এলো। এবার খালি-মেঝেয় নয়, মেঝের ওপর একটা মাদুর পেতে সীতা শুয়ে-শুয়ে ধুঁকছে। গাঢ় ক'রে আঁকা এক পোঁচ বিবর্ণ পাণ্ডুরতা—কোথাও এতোটুকু রক্ত আছে ব'লে সন্দেহ হয় না। এই স্পন্দনহীন রক্তলেশশূন্য একঝুড়ি হাড়ের ওপর কী সে অভিমান করবে? নিশ্বাস নিচ্ছে ত'? হ্যাঁ, এখনো বোধ হয় প্রাণ আছে। ইচ্ছে করলে এখনো চুপি-চুপি দিলীপ তাকে বুকে ক'রে এই অন্ধকূপ থেকে পালাতে পারে—এখনো তাকে বাঁচানো যায়! কিন্তু বাঁচিয়েই বা কী লাভ! জীবন পেলেই ত' পাখি আবার শিকল ছিঁড়বে, বরং মৃত্যুর বিরহের মাঝেই বোধকরি স্নেহের অবিনশ্বরতা আছে। কিন্তু এই অসহায় অপ্রতিবাদ মৃত্যুকে যৌবন

তার কী ব'লে ক্ষমা করে? বিপদ বা অপবাদ দুই-ই সে তুচ্ছ করেছে। না, আর দেরি নয়। সীতাকে সে মরতে দেবে না।

দুই বাহু ভ'রে সীতাকে তুলে নেবার জন্যে দিলীপ হাঁটু গেড়ে মেঝের ওপর ব'সে পড়লো। কিন্তু এমনি ভাগ্যের চক্রান্ত, সিঁড়িতে কা'র স্পষ্ট জুতোর আওয়াজ হচ্ছে। দিলীপ হাত গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, সে-শব্দ দোতলা পেরিয়েছে। পা টিপে-টিপে গুপ্তচরের মতো পুরন্দরই আসছে বুঝি আড়ি পাততে? জামার আস্তিন গুটিয়ে দিলীপ দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো—সিঁড়ির সুইচ্ টেনে দিলে।

না, পুরন্দর নয়। মোটা-সোটা বেঁটে প্রৌঢ় একজন অচেনা ভদ্রলোক, মাথার সামনের দিকে চুল অনেক পাৎলা হ'য়ে এসেছে—একগাল খোঁচা-খোঁচা গোঁফ দাড়ি, পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো, হাতে একটা ছাতি, খবরের কাগজে জড়ানো পরনের দু'একখানা কাপড়। দূর দেশ থেকে ট্রেনে-ষ্টিমারে ক'রে কলকাতায় এসেছেন এবং বেশি দিন যে মোটেই থাকবেন না চেহারা দেখেই তা স্পষ্ট ধরা পড়ে। যাক্, য়্যাদ্দিনে তবু এলেন যা-হোক্। আচ্ছা আত্মীয় বটে। তবু দিলীপ মনে-মনে দায়িত্ব-মুক্তির গাঢ় একটি আরাম অনুভব করলো।

ভদ্রলোক দ্বিধাগ্রস্ত চোখে দিলীপের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন: পুরন্দর এখানে থাকে? সীতা? তার নাকি ভারি অসুখ! আজকাল কেমন আছে?

—ও! আসুন ভেতরে। দিলীপ ভদ্রলোককে ঘরের ভিতরে নিয়ে এলো।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকেই মেঝের ওপর রোগশায়িতা সীতাকে দেখতে পেয়ে সরাসরি শুধোলেন: কেমন আছিস্, সীতা? ছাখ্ চেয়ে, আমি এসেছি।

—সুরেন-দাদা! সীতা আতঙ্কে বিস্ময়ে শিউরে উঠলো: তুমি কোত্থেকে এলে এ-সময়?

দিলীপ তাঁকে একখানা চেয়ার টেনে দিলো। তাতে ব'সে প'ড়ে সুরেন-দাদা বললেন,—এলাম বাড়ি থেকে চিটাগং মেইলে। কী অসুখ? খুব বাড়াবাড়ি নাকি?

উঠে ব'সে সীতা বললে,—না ত'। সামান্য জ্বর হয়েছে মাত্র। আশ্চর্য্য, তুমি ব্যস্ত হ'য়ে ঘর-দোর ফেলে চ'লে এলে কেন? কে তোমাকে খবর দিলো?

সুরেন-দাদা খানিক বিরক্ত ও খানিক আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন,—কে এক তোর দেওর। এই যায় না সেই যায়—এমনি নাকি অবস্থা। ছাখ্ দিকি একবার আক্কেল, ছা-পোষা মানুষ—গাঁয়ে-হাটে সামান্য পাঁচ-ছ টাকার জন্যে ভীষণ-ভীষণ ডাকাতি হচ্ছে—এর মধ্যে মিথ্যে উদ্বেগ নিয়ে ছেলেপুলে ফেলে এতোটা পথ ছুটে আসা। খরচান্ত হওয়া ছাড়া আর লাভ হ'ল কী!

সীতা দিলীপের দিকে চেয়ে তীব্র ভ্রূকুটি করলে।

সুরেন-দাদা বললেন,—কী, তুই নাকি বাড়ি যেতে চাস্? এখেনে নাকি চিকিৎসা হচ্ছে না?

সীতা গম্ভীর হ'য়ে বললে,—না ত'!

—ছাখো দিকি কাণ্ড। আমিও ত' তাই ভাবি, কলকাতার মতন সহরে চিকিৎসা হবে না, চিকিৎসা হবে কি তবে আমাদের জঙ্গলে? দিব্যি উঠে ব'সে কথা কইছিস্, শুধু-শুধু কেন এমনি হায়রান করা বল্ ত'! পুরন্দরকে কিছু লিখ্‌লে না, একেবারে ধোঁকায় প'ড়ে গেলাম। কেঁদে-কেটে খুড়িমা একসা করলেন, ধ'রে-বেঁধে পাঠিয়ে তবে নিশ্চিন্তি। কী লাভটা হলো? একটুখানি জ্বর—তায় কিনা সাতকাণ্ড রামায়ণ!

ম্লান চাপা গলায় সীতা বললে,—না, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। মাকে বলো, ভালোই আছি আমি।

—নিশ্চয়। সুরেন-দাদা গলা ঝেড়ে ব'লে উঠ্‌লেন: কে তোর সেই গুণধর দেওরটি যে আমার সঙ্গে এমন একটা ইয়ার্কি করলে। বে-দিনেও এমনি এপ্রিল-ফুল করতে হয় নাকি?

সীতা বললে,—মাঝে একটু বেড়েছিলো ব'লেই হয় ত' ব্যস্ত হ'য়ে তোমাকে চিঠি লিখেছিলো। তা, এখন আর ভয় নেই। দিব্যি উঠে ব'সে কথা কইতে পারছি, নিজের চোখে দেখেই ত' গেলে। তা, কলকাতায় তোমার আর কোনো কাজ আছে নাকি?

—কী আবার কাজ! এই দুর্ভোগ। যতো সব আদেখ্‌লে মেয়েমানুষ ত'—মেয়ের একটু অসুখ শুনেছে কি অমনি কেঁদে-ককিয়ে রাজ্য তোলপাড় করা। খুড়িমাকে কতো বললাম: জামাই যখন নিজে থেকে কিছু লেখেনি, তখন ভয়ের কিছু নেই। তোমার মা কি তা শোনবার মেয়ে! পা দুটোই খালি অসাড় হয়েছে, জিভখানা তেমনি লক্‌লকে ক্ষুর!

—কাজ যখন আর কিছু নেই, তখন কালকের ভোরের ট্রেনেই তুমি চ'লে যাও। মিছিমিছি কেন দেরি করতে যাবে?

—তা আর বলতে! একা-একা সবাইকে ফেলে এসেছি, এক মুহূর্তও মন আমার তিষ্ঠোতে চায় না। রাজধানীতে ব'সে আছিস, গাঁয়ের খবর ত' রাখিস না? পাঁচ শো রকম ব্যাধি, পাঁচ শো রকম অত্যাচার, ফর্দে আর কুলিয়ে ওঠে না।

দিলীপের জিভে ভাষা অসাড় হ'য়ে গেছে। সুরেন-দাদার প্রকৃতিতে ও কথায়-বার্তায় সীতার বাপের বাড়ির চেহারাটা স্পষ্ট তার চোখে ধরা প'ড়ে গেলো। তবু

না ব'লে সে পারলো না : কিন্তু মায়ের কাছে গেলে বৌদি নিশ্চয়ই অনেক বিশ্রাম পেতেন।

দিলীপের আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ চোখে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে নাক-মুখ কুটিল ক'রে সুরেন-দাদা বললেন,—আজকালকার ছেলে কি না, না ভেবে-চিন্তে ফাল্‌তু একটা কথা ব'লে ফেল্‌লেই হলো। ঘন্নি-গিন্নি মেয়ের বিশ্রামের তুমি কী বোঝ হে বাপু? এমন দিব্যি কল খুল্‌লে গঙ্গার জল, হাতের টোকা মারলে বিজ্‌লি-বাতি, দিব্যি খটখটে মেঝে-দেয়াল—এ ফেলে বিশ্রাম নিতে যাবে পানাপুকুরে? বিয়ে-থা করেছ? বিশ্রামের তুমি বোঝ কী হে! দুয়েক পাতা ইংরিজি প'ড়ে খুব যে বড়ো-বড়ো কথা বলতে শিখেছ— চলো না একবার, দেখি তোমার কথার কামানে গাঁয়ের ক' ঝাঁক মশা মারতে পারো।

তার পর সীতার দিকে চেয়ে বললেন,—এই বুঝি তোর সেই গুণধর দেওরচন্দ্র—কথায় কথায় যে উড়ো চিঠি ছাড়ে!

চোখ নামিয়ে সীতা বললে,—না, ও নয়। সে আরেক জন, বাড়ি নেই বোধহয়।

এমনি সময় টিউশনি সেরে পুরন্দর এসে হাজির। বিয়ের সময় সুরেন-দাদাকে সে একবার দেখেছিলো। চেহারাটা এমন নয় যে মনে থাকবে না।

অবাক হ'য়ে পুরন্দর বললে,- আপনি হঠাৎ এখানে? কী মনে ক'রে?

চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে সুরেন-দাদা বললেন,—আর বলো কেন ভায়া, দুর্ভোগ! খবর গেলো সীতার নাকি যা-দশা, এখুনি তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। কথাটা একবার শুনলে? যদি যাবারই দশা হবে, তবে বাড়ি নিয়ে যাবার সময় কোথায়? এসে দেখি দিব্যি খাসা মেয়ে, টস্‌টস্‌ ক'রে কথা কইছে, ঐ, ঐ দেখ, হাসছে পর্য্যন্ত। সামান্য একটু জ্বর কা'র কবে না হয়েছে শুনি? সেবার আমি যে সমানে একুশ দিন ভুগলাম, কোন্‌ শালা আমাকে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছিলো?

ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে পুরন্দর বললে,— ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারেন।

—ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে ত' পারি, কিন্তু ইচ্ছেটাই হ'তে যাবে কেন? বেছে-বেছে দেশের মধ্যে সেরা ঘরে বিয়ে দিলাম,—না-হয় এখন একটু অবস্থার হেরফের হয়েছে, তা আর কার না হয়? আমাদের গাঁয়ের রামলোচন লগ্নির কারবার ক'রে এতো জমালে—এক রাত্রের ডাকাতিতে লোপাট। তা মেয়ে দিব্যি

সুখে স্বচ্ছন্দে আছে—এমন ঘর-দোর, সোয়ামি-দেওর, বিজ্‌লি-বাতি ছেড়ে কোন্ চুলোয় সে মরতে যাবে?

পুরন্দর আবার বললে,—কিন্তু আমার কোনো আপত্তি নেই।

—তোমার আপত্তি থাকবে কেন? তুমি কি আমাদের তেমনি জামাই! আপত্তিটা ত' ষোলআনা যাকে নিয়ে যেতে বলছ তার। কোন্ দুঃখে সে যাবে? আর কোন্ দুঃখেই বা আমি নিয়ে যেতে চাইবো? আমার কি একটা সামান্য কাণ্ডজ্ঞান নেই? কে বা কাকে দেখে, কে বা কোথায় ডাক্তার! টাট্‌কা দেখে এক ফোঁটা য়্যাকোনাইট্ খাইয়ে দাও না—জ্বর জল হ'য়ে যাবে। হোমোপাথির মতো ত্রিভুবনে আর চিকিৎসা নেই। তা, কী চিকিৎসা ওর হচ্ছে?

পুরন্দর ঝাঁজালো গলায় বললে,—চিকিৎসা কী করতে হবে না হবে তা আমি জানি। আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না।

হেঁ হেঁ হেঁ। সুরেন-দাদা হেসে উঠলেন: তোমার জিনিস—তোমারই ত' সব। আমরা হচ্ছি পরস্য পর, মেয়ে বিদেয় ক'রে খালাস। কী বলো, ঠিক কি না। তুমিই বলো না হে, আজকালকার ছেলে।

পুরন্দর রুক্ষ গলায় বললে,—তবে আর-কি! কাল ভোরেই আপনি চ'লে যান। মিছিমিছি কেন এখানে কষ্ট পাবেন?

—ঠিক, ঠিক। এই ত' কথার মতো কথা! জামাই কি তোকে আর যা-তা দিয়েছিলাম সীতে? কই, চাকর-বাকর নেই কেউ? জল-টল দিক্ না, হাত পা ধুয়ে নিই। একজনের আন্দাজ রান্নার জোগাড় নিশ্চয়ই এখনো আছে। বুঝলে পুরন্দর, ছোট ভাইদের একটু শাসন করো—এমন উড়ো চিঠি ছেড়ে নিরীহ ভদ্রলোকদের ব্যতিব্যস্ত করা কি ঠিক?

সীতা দিলীপকে বললে,—দয়া ক'রে সুরেন দাদার খাবার-দাবার একটু ব্যবস্থা করো। হোটেলে ব'লে এসো। বেশি রাত হ'য়ে গেলে পাওয়া যাবে না।

ঊনত্রিংশ

তেজস্বিনী

পর দিন ভোর বেলায়ই সুরেন-দাদা বিদায় নিলেন। যাবার সময় সীতাকে ব'লে গেলেন: আমি চ'লে গেলে আবার যেন কাঁদুনি গেয়ে তোর মাকে এক দিস্তে চিঠি লিখে বসিস্ নে। তা হ'লে সে আমার হাড়-মাস ঝরঝরে ক'রে ছাড়বে। আমাকে না পারুক্, গাঁয়ের আর-কাউকে ধ'রে তোকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে সে মস্ত এক কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসবে কিন্তু।

সীতা পায়ের নোখ খুঁটতে লাগলো ; বললে,—লোক পাঠালেই আর যাচ্ছে কে ! ওঁকে এখানে একা ফেলে গোঁ ধ'রে আমার গেলেই হ'ল আর-কি ! কে ওঁকে রেঁধে দেবে ? হোটেলে একদিন খেতে গিয়েই অসুখ ক'রে বসলো। মাকে আমি চিঠি লিখে দেব'খন—

সুরেন-দাদা আঁক্ ক'রে উঠ্‌লেন : চিঠি লিখে দিবি মানে ?

—চিঠি লিখে দেব, আমার জন্যে যেন কিছু ভাবনা না করেন। এ আবার একটা কিছু অসুখ নাকি ? দু'দিনেই সেরে যাবো। তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ি যাও, সবাই আবার তোমার জন্যে ভাববে।

—বা, এই ত' লক্ষ্মী বোনটির মতো কথা ! সুরেন-দাদা সীতার মাথায় হাত রাখলেন, সীতা তাঁকে প্রণাম করলো। সুরেন-দাদা বললেন,— কালকেই তবে চিঠি-খানা লিখে দিস, দিদি ! আমি তবে এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে রওনা হই। দুর্গা, দুর্গা—

দিলীপ ও-ঘর থেকে প্রবল শব্দে হেঁচে উঠ্‌লো : হ্যাঁচ্চো !

আর সীতা উঠ্‌লো হেসে।

তবু সুরেন-দাদা দাঁড়ালেন না, কাগজের পুঁটলিটি তেমনি বগলে চেপে তরতর ক'রে নেমে গেলেন। একলা যে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন এই রক্ষে। এতো বড়ো জামাই—ভদ্রতাটাও হলো, সীতাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে হলো না। সামান্য একটা হাঁচিতে তাঁর ট্রেনে কলিশান্ লেগে যাবে না ছাই !

সুরেন-দাদা চ'লে গেলে সীতা ব'সে-ব'সে একমনে স্বামীর আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলো। এখনো আপিস থেকে তিনি ফেরেন নি। সুরেন-দাদা তাকে নিয়ে যেতে ততোটা না চাইলেও সে জোর ক'রেই এই সঙ্গে এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারতো— কিন্তু স্বামীকে তার আজো সে-কথা বলা হলো না। না বলা পর্য্যন্ত তার স্বস্তি নেই। হয় ত' সেই সত্যের আলোয় তিনি তাকে নূতন মূল্য দেবেন, তাঁর কাছে তার নূতন প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হবে। তার পর যখন সে স্বাস্থ্যের অজুহাতে স্থান-পরিবর্ত্তনের জন্য মিনতি করবে, মা'র কাছে যেতে চাইবে, তখন তিনি সন্তানের সম্মানে তাকেও সম্মান দেখাবেন, নিজেই ছুটি নিয়ে মা'র কাছে তাকে রেখে আসবেন। এবার আর তিনি মুখ গোম্‌রা ক'রে ব'সে থাকতে পারবেন না— নূতন ক'রে আবার তাদের শুভদৃষ্টি হবে। সে আর পুরন্দরের স্ত্রী নয়, পুরন্দরের শিশুর জননী—কতো তার মর্য্যাদা, কতো তার ঐশ্বর্য্য ! পুরন্দরের স্পর্শের কালিমা ভেদ ক'রে পঙ্কজের অভ্যুদয়—সমস্ত স্থূলতা অপসারিত হ'য়ে শুচিসুন্দর প্রেমের। এবার তার স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিতে আসবে নূতন ভঙ্গি, বিচারে নূতন বোধশক্তি, ব্যবহারে স্নিগ্ধ সংযম। সীতা আর বনবাসিনী নয়, রাজ্যেশ্বরী।

সে এখন থেকে আর স্বামীর জন্যে নয়, সন্তানের জন্যে,—তাই এখন পুরন্দরের দৃষ্টি দিতে হবে তার রূপের দিকে নয়, স্বাস্থ্যের দিকে, প্রধানত সে আর এখন কামনার নয়, সম্মাননার। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে এই চেতনাটার স্বাদ নিতে-নিতে আনন্দে অহঙ্কারে সীতা অভিভূত হ'য়ে পড়লো। স্বামীকে সে আজ নূতন ক'রে আবিষ্কার করবে।

মাঝখানে এ-ঘরে ও-ঘরে অনেক সব কাণ্ড ঘ'টে গেলো—কিন্তু সীতার পক্ষে তা একান্ত অবান্তর। তারপর সিঁড়িতে পুরন্দরের জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেলো। সন্তানধারণের গৌরবে স্বামীকে সে আজ শুধু ক্ষমা নয়, পরিপূর্ণ ক'রে গ্রহণ করতে পেরেছে। স্বরেন-দাদা চ'লে যাবার পরেই এই অনুভূতিটা তার দেহ-মন পরিব্যাপ্ত ক'রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠলো। তাই স্বরেন-দাদা চ'লে গিয়ে ভালোই করেছেন—সীতা নইলে আর জাগ্‌তো না। স্বামীকে খবরটা জানাবার প্রয়োজনীয়তা আজকে হঠাৎ বুঝতে পেরেই সে এই চেতনার আস্বাদ নিতে পারছে।

জামা ছেড়ে ব্রাস্‌-পেইষ্ট নিতে পুরন্দর এখুনি এই ঘরে ঢুকবে। তাড়াতাড়ি সীতা কাপড়টা গুছিয়ে নিলো, শুকনো চুলগুলি দু' হাতে জড়ো ক'রে খোঁপা বাঁধলে। তারপর পুরন্দর ঘরে ঢুকতেই লাজুক মেয়েটির মতো চল-চল চোখ মেলে বললে,—শোন।

পুরন্দর অবাক হ'য়ে গেলো—এতো দিন বাদে হঠাৎ কেন যে সীতা মৌনভঙ্গ করলে বুঝে উঠতে পারলো না। বললে,—কী।

—শোনই না আগে।

—কানে কি আমি তুলো দিয়েছি যে ওখান থেকে বললে শুনতে পাবো না?

—চেঁচিয়ে বলবার কথা ত' নয়, কানে-কানে বলতে হবে। সীতা হেসে বললে: এসো না একটু এগিয়ে।

—তুমিই এসো না এখানে উঠে—যদি বলতেই হয়। পুরন্দর খাটের ওপর বসলো।

—উঠতে পারলে ত' যেতামই—পা যে ভীষণ কাঁপছে। বেশ উঠ্‌ছি, কিন্তু ট'লে প'ড়ে গেলে হাত বাড়িয়ে ঠিক ধ'রে ফেলবে বলো? ব'লে সীতা শীর্ণ দুর্ব্বল পায়ে ভর রেখে উঠে দাঁড়ালো। অতটুকুন পথ হেঁটে আসা তার পক্ষে অসম্ভব। কে জানে, ইচ্ছে ক'রেই সে ট'লে পড়ছিলো কি না, পুরন্দর তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরলো। কাঠি-কাঠি কয়েকখানা হাড়, কোথাও এতটুকু মাংসের উচ্ছলতা নেই।

সীতা কয়েক সেকেণ্ড সেই স্পর্শের সমুদ্রে মূর্চ্ছার অপূর্ব্ব একটি আনন্দ উপভোগ করলে। পুরন্দর ব্যস্ত হ'য়ে জিগ্‌গেস করলো : কী কথা?

হাত দিয়ে পুরন্দরের গলা জড়িয়ে ধ'রে সীতা বললে,—আমার মুখের কাছে একটু নুয়ে এস, বলছি। শুনে তুমি খুব,—খুব খুসি হবে দেখো। আমাকে কী খাওয়াবে বলো দিকি?

তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো ধীরে-ধীরে পুরন্দর মাথা নামিয়ে আন্‌লো।

তার কানের কাছে পাংশু দুটি ঠোঁট ঠেকিয়ে সীতা তার পর তাকে বললে। স্পষ্ট ক'রে বললে। নিতান্ত নির্লজ্জের মতো বললে। কী যে বললে তা নিজেই সে ভালো ক'রে জানে না, নিঃসংশয় হ'য়ে জানে না, তবু সে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলতে গিয়ে জোরে-জোরে বললে।

মুহূর্ত্তে পুরন্দরের মুখ খড়ির মতো শাদা ও চোখ বরফের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। শরীরে যেন কোনো সাড়া নেই। খানিকক্ষণ অপ্রকৃতিস্থের মতো একবার সিলিং ও আরেকবার সীতার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে; তার পর আস্তে তাকে মাটির ওপর নামিয়ে দিলো। সীতা একেবারে জলের মতো দুর্ব্বল. মাটিতে গড়িয়ে পড়তে তার বেগ পেতে হ'ল না।

তবু সে প্রাণপণে তার জিহ্বাগ্রে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ক'রে বললে,—আমাকে তুমি এবার মা'র কাছে নিয়ে চলো। সুরেন-দাদার সঙ্গে চেষ্টা-চরিত্র করলে যেতে পারতাম,—কিন্তু দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে মা কতো খুসি হবেন বলো ত'?

কোনো দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে পুরন্দর গম্ভীর গলায় বললে,—যেতে চাও, যাও। কেউ তোমাকে আর ধ'রে রাখতে চায় না। আমিও বাসা তুলে দিয়ে মেস্-এ উঠছি এবার।

সীতা সহসা কিছু বুঝতে পারলো না; বললে,—কী বলছ তুমি? কার সঙ্গে তবে যাবো?

দৃপ্ত কঠিন ভঙ্গিতে পুরন্দর ফিরে দাঁড়ালো; বললে,—কেন দিলীপের সঙ্গে! এই অবস্থায় তারই ত' তোমার দায়িত্ব নেওয়া উচিত।

সীতা চেঁচিয়ে উঠলো : কী বললে?

—সত্য কথাই বললাম। দিলীপকেই ত' এখন থেকে তোমায় তদারক করতে হবে। কথাটা এমন কী আর খারাপ শোনাচ্ছে। যার জিনিস, কর্ত্তব্যও ত' তারই।

সীতা হাতের আঙুল মেলে মেঝেটাকে আঁকড়ে ধরতে গেলো, কিন্তু আঙুলের ফাঁক দিয়ে সমস্ত আশ্রয় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। দু' হাতে মুখ ঢেকে অস্ফূট আর্ত্তস্বরে সে গুঙিয়ে উঠলো : ছি, ছি, এতোদূর তুমি অধঃপাতে গেছ!

—আর তুমিই কোন্ উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করলে শুনি?

সীতা টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, অসহায় দুই চোখে অথচ আহত অহঙ্কারের স্বরে বললে,—তোমার এই কথা?

—হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কোনো কথা আছে ব'লে ত' মনে হয় না। কী অমন তেজ দেখাচ্ছ!

সামনের দেয়ালটায় পিঠ রেখে কাঁপতে-কাঁপতে সীতা হঠাৎ গলা চিরে চীৎকার ক'রে উঠলো: ঠাকুরপো, ঠাকুরপো!

পাশের ঘর থেকে দিলীপ তক্ষুনি এসে দরজার বাইরে হাজির।

কিছুই যেন বিশেষ হয়নি, এমনি নির্লিপ্ত নিস্তেজ গলায় পুরন্দর বললে,—তোমার বৌদি তাঁর মায়ের কাছে যেতে চাইছেন। তুমিই তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও আপাততো তাঁর ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছে করলে তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি না-ও নিয়ে যেতে পারো। যেখানে তোমার খুসি। তোমার সঙ্গেই উনি যাবেন। ব'লে পুরন্দর ঘুরে গিয়ে ঘরের বিপরীত দেওয়ালের মুখে হাঁটতে লাগলো।

মাথামুণ্ডু দিলীপ কিছুই বুঝতে পারলো না। দু' পা এগিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দেখলে, দেয়ালে পিঠ রেখে সীতা নিঝুম হ'য়ে দাঁড়িয়ে, আর তার দুই শূন্যদৃষ্টি চক্ষু থেকে অবিরাম জল ঝ'রে পড়ছে। একবার পুরন্দর ও আরেকবার সীতার দিকে ঘন-ঘন সে চোখ ফেরাতে লাগলো।

সামনে তার উপস্থিতি টের পেয়ে সীতা মরিয়ার মতো ব'লে উঠলো: শিগ্‌গির, শিগ্‌গির একটা গাড়ি নিয়ে এসো, ঠাকুরপো। এক্ষুনি আমরা বেরুবো, এই মুহূর্ত্তে।

পুরন্দরের মুখে কোনো কথা নেই। পেছন ক'রে দাঁড়িয়ে জান্‌লা দিয়ে সে রাস্তা দেখ্‌ছে।

সীতা ধমক দিয়ে উঠলো: হাঁদার মতো কী অমনি দাঁড়িয়ে আছ? আমাকে এ-বাড়ি থেকে বা'র ক'রে নিয়ে চলো। এ-বাড়ি আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়ায় না—আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে। শিগ্‌গির গাড়ি নিয়ে এসো বলছি। আমি দাঁড়াতে পারছি না।

আহাম্মকের মতো ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থেকে দিলীপ বললে,—কোথায় নিয়ে যাবো?

—ঐ শুনলে না কথা—যেখানে তোমার খুসি। চিটাগং-মেইল্ ছেড়ে গিয়ে থাকে, যাক্—তবু আমাকে তুমি এখান থেকে নিয়ে চলো। আর দেরি করো না মিছিমিছি। অমন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কা'র অনুমতির তুমি অপেক্ষা করছো? আমি বলছি, তোমারই সঙ্গে আমি যাবো।

পুরন্দর ফিরে দাঁড়ালো; কুৎসিত কটু স্বরে বললে,—নিশ্চয় যাবে। এক্ষুনি যাবে। কে আর তোমাদের সখ ক'রে এখানে ধ'রে রাখবে শুনি? মিছে আর দেরি করো না, দিলীপ। গাড়ি নিয়ে এসো। ব'লে সে সেই পোষাকেই হন্-হন্ ক'রে তক্ষুনি বেরিয়ে গেলো।

সীতার আর তা সইলো না। মেঝের ওপর গুঁড়ো হ'য়ে ভেঙে প'ড়ে যাচ্ছিলো—দু' হাত বাড়িয়ে দিলীপ তাকে ধ'রে ফেললে।

তিরিশ

প্রথম বিরহ

রাস্তায় খানিক এদিক-ওদিক পাইচারি ক'রে পুরন্দর বাড়ি ফিরলো। ফিরে এসে দেখলো ঘরে সীতা নেই, দিলীপের সঙ্গেই সে চ'লে গেছে। কথাটা যেন সে তবু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলো না। রান্নাঘরের ভেজানো দরজাটা আস্তে ঠেলে দিলে,—উনুন তখনো সমানে জলছে, কিন্তু আর-কেউ সেখানে ব'সে নেই। দিলীপের ঘরটা ত' গোড়া থেকেই খোলা—জিনিস-পত্রে মেঝেটা এক-হাঁটু হ'য়ে আছে। তবে নিশ্চয়ই তারা গেছে—পুরন্দর বসবার ঘরটাও উঁকি মেরে একবার দেখে এলো। দিলীপ ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিলো ত'? নইলে ছ্যাকড়া-গাড়ি ক'রে গেলেই বরং দুলুনিতে সীতার এ-সময়ে খুব অপকার হ'ত। এ-সময়ে সত্যি তারা গেলো? টাকা-পয়সাই বা পেলো কোথায়? পুরন্দর ক্ষিপ্র হাতে আলমারি খুলে দেরাজটা টানলে। যেন দেখতে পায়, দেরাজটা ঘর-দোরের মতোই শূন্য হ'য়ে গেছে, কিন্তু না—তহবিলে এতোটুকুও আঁচড় পড়ে নি। দিলীপের কাছেই আছে হয় ত' টাকা। গয়নার বাক্সটাও ত' নিয়ে যেতে পারে। চাবি? দেয়ালের পেরেকে চাবির রিঙটা ঝুলছে। পুরন্দর ট্রাঙ্ক খুললে—ঐ ত' হাতির দাঁতের বাক্সটা। বাক্সর ডালাও একবার খুলে দেখলো—সব অটুট রয়েছে। নিজেরই ত' জিনিস—এ নিয়ে গেলে সীতার কোনই কিন্তু অপরাধ হ'ত না। বাক্সটা রেখে সে অন্যান্য জিনিসগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বসলো। থরে-থরে সাড়ি সাজানো, পুরন্দর উল্‌টে-পাল্‌টে তাই দেখতে লাগলো—এতোগুলির একখানিও সীতা কোনোদিন পরেছে ব'লে মনে পড়লো না। এ-সব না প'রে নিতান্ত আটপৌরে সাড়িগুলি প'রেই সে দারিদ্র্যের সঙ্গে সহজ একটি সামঞ্জস্য রেখেছে, কিন্তু এ-রঙটাতে তাকে সত্যি যে কী মানাতো, মেয়েমানুষ তার বুঝবে কী? ট্রাঙ্কের এ-পাশে বাঁশের একটা ঝাঁপি—পুরন্দর তাও খুলে দেখলে। বিয়ের সময়কার গাছ-কৌটোটা সে এখনো সেখানে যত্ন ক'রে রেখে

দিয়েছে—আর এ কী, কতোগুলি ছোট-ছোট জামা—একটা ডল্-এর গায়ের মাপে ; তাতে আবার লেস্-এর সুন্দর কাজ করা—আর কতোগুলি কন্ধা-কাটা, নানা-রকম নক্সার কাঁথা। পুরন্দরের হাত দু'টো কাঠ হ'য়ে গেলো,—বুঝতে আর তার বাকি নেই। কিন্তু এগুলো সে নিয়ে গেলো না কেন? এগুলো নিয়ে যেতে কী দোষ হয়েছিলো!

সব যেন কেমন ফাঁকা লাগছে,—সীতাকে ছাড়া এই তার প্রথম বিরহ-যাপন। তবু কিছুই যেন হয় নি—বরং এই যে সে সতেজ চরিত্রবলে এমনি ক'রে দিলীপেরই হাত ধ'রে সোজা বেরিয়ে যেতে পারলো, এতে সে মনে-মনে প্রচুর আরাম বোধ করলো। কিছুই যেন হয় নি—বরং অভাবনীয় আনন্দের কিছু একটা হয়েছে, এমনি পরম নিশ্চিন্ত মুখে পুরন্দর ব্রাস্-পেইষ্ট, সাবান-তোয়ালে নিয়ে স্নান করতে গেলো। সীতা কাছে না থাকলেও সমস্ত জিনিস তার হাতের কাছে রয়েছে—পান থেকে চুনটুকু পর্য্যন্ত খসে নি। ভাঁজ করা রুমাল, বোতামের সেট্, জুতোর কালি, সামান্য ইঙ্ক-ড্রপার থেকে সুরু ক'রে ধোপা-বাড়ির হিসেবের খাতাটুকু পর্য্যন্ত সে গুছিয়ে রেখে গেছে। স্নান সেরে এসে—আরো যতোই সময় যাচ্ছে ততোই—আরো নতুনতরো দৃষ্টিতে সীতার এই সেবার অজস্র পরিচয় নিয়ে-নিয়ে মনকে সে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলতে লাগলো।

বুড়ো ঝি এতোক্ষণে বাজার ক'রে ফিরলে। পুরন্দর বললে,—মাসের আজ সাত দিন, তোমাকে পুরো মাসেরই মাইনে দিচ্ছি, তুমি যাও। বাসা আমি এখানকার তুলে দিলাম।

ঝি অবাক হ'য়ে রইলো। বললে,—মা কোথায়?

—শরীর কি রকম খারাপ দেখছিলে ত'? বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

—আপনার রান্না তা হ'লে কোথায় হবে?

—ও আমি হোটেলেই খেয়ে নেব এখন থেকে। ঐ রোগা শরীর নিয়ে আগুনের তাতে কতো আর পুড়বে! তোমার মায়া প'ড়ে গিয়েছিলো বুঝি, কিন্তু তোমার মা ফিরে এলে আবার যখন বাসা নেব, তখন তোমাকেই ফের রাখবো।

কথাটা নিতান্তই স্তোক, তবু যা উপলক্ষ ক'রে কথাটা সে বললো সেটা মনে-মনে আওড়াতেও তার ভালো লাগলো এখন।

মাইনে নিয়ে ঝি চ'লে গেলে পুরন্দর খাটের ওপর শুয়ে পড়লো। বালিশের তলায় কী এগুলো—তাকে ঘিরে সীতার শীর্ণ দু'টি হাত রোমাঞ্চিত হচ্ছে নাকি? বালিশ দুটো তুলে দেখ্‌লে তার তলায় সীতা তার হাতের সোনার চুড়ি ক' গাছও রেখে গেছে। ছি ছি, এটা তার ভীষণ বাড়াবাড়ি। কেউ সব চুরি ক'রে নিয়ে গেলে

সে করতো কী! তার হাত দু'খানি এখন না-জানি কী-রকম খালি-খালি দেখাচ্ছে—পুরন্দর সেই রিক্ততাটুকু যেন এই চুড়ি ক' গাছের মধ্যে স্পর্শ করতে পাচ্ছে। হাতের আঙুল ক'টি দিয়ে ডায়মন-কাটা সরু চুড়ি ক' গাছ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সে সীতার হাতের ডৌলটি পরীক্ষা করতে লাগলো।

মেঝের ওপর সীতার পরিত্যক্ত ময়লা বিছানার দিকে পুরন্দর চেয়ে রইলো। কখন ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে এলো আস্তে-আস্তে। মনে হলো:

দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা সে খুলে রেখে শোয় নি? ছি ছি, সীতাকে সে অমনি বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে দরজায় খিল দিয়েছে নাকি? তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পুরন্দর দরজা খুলে দিলো। হ্যাঁ, সীতাই ফিরে এসেছে—একা নয়, কোলে তার মোটাসোটা থক্‌থকে একটি ছেলে। কে আর তার পথ রুখে দাঁড়াবে? সীতার কপালে শিশুসূর্যের মতো উজ্জ্বলকোমল সিন্দুর-বিন্দু, দেহ ভ'রে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের গাঢ় স্থিরতা, মুখে প্রশান্ত একটি হাসি। অবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো গভীর তার রূপ। ছেলেটির এক হাতে ঝুমঝুমি, অন্য হাত মা'র স্তনের লোভে সীতার বুকের কাছে আঁকু-পাঁকু করছে। চোখের কাজল গালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, ড্যাবডেবে চোখে অপার একটি কৌতূহল—পুরন্দরকে কী যেন সে প্রশ্ন করছে। সীতা এগিয়ে এসে ছেলে কোলে নিয়ে পুরন্দরকে প্রণাম করলো, পুরন্দর পাথরের মূর্ত্তির মতো স্থির! দিগ্বিজয়ী ছেলে এতোক্ষণে তার রাজ্য পেয়ে গেছে—সীতা হার মেনে মেঝের উপর জোড়াসন হ'য়ে বস্‌লো; পুরন্দরের সামনে আর তার অনাবরণে লজ্জা নেই, বরং অপূর্ব্ব দীপ্তি, অপূর্ব্ব মহিমা। ছেলের দন্তহীন তুলতুলে মাড়ির ফাঁকে সে তার স্তনাগ্র তুলে দিলো। সমস্ত দেহ নিংড়ে রক্ত ও কামনা, যৌবন ও লাবণ্য মাতৃস্নেহ হ'য়ে গ'লে-গ'লে ছেলের মুখে ঝ'রে পড়তে লাগলো। তা ছেলের দেহে আনবে কান্তি ও আয়ু, মনে আনবে নির্ভয় জীবনাভিযানের দুরন্ত বাসনা।

পুরন্দর ধড়মড় ক'রে বিছানার উপর উঠে বসলো। এবং কী করছে, ঠিক কিছু বুঝতে না পেরে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা খেয়াল না ক'রে, জামা গায়ে দিয়ে, জুতোয় পা গলিয়ে ফিতে বাঁধতে বসলো। সিঁড়ির দিকে এগোবে, অমনি দরজার চৌকাঠে একটা ধাক্কা খেয়ে তার হুঁস্ হলো—সত্যি কোথায় সে যাচ্ছে! কেন, ইষ্টিশানে!

দিলীপ কি আর সীতাকে তার বাপের বাড়িই নিয়ে যাবে নাকি?

একত্রিশ

মাইকেল মধুসূদনের কবর

ট্যাক্সিতে উঠে কেউ কতোক্ষণ কোনো কথা কইলো না। হুড্-এর নিচে হাতের ওপর মাথা রেখে সীতা কোনো-রকমে একটু এলিয়ে শুয়েছে—দিলীপ বিমূঢ়ের মতো রাস্তার জনতা দেখ্ছে। সঙ্গে একটা বিছানা নেই, বাক্স নেই, পকেটে তার খরচের চল্লিশটি মাত্র টাকা—সীতা এতো দুর্বল যে যে-কোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হ'য়ে পড়তে পারে—এ কোথায় তারা চলেছে? তবু বৌদি যে মিথ্যার অত্যাচার থেকে মুক্তির পথে মৃত্যুর পথে বেরিয়ে পড়লেন—ভাবতে দিলীপের গর্ব্ব হয় বটে, কিন্তু কতো বড়ো দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে কী অনিশ্চিত বিরাট ভবিষ্যতের মধ্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভাবতে ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে আসে। কোথায় সে সীতাকে নিয়ে যাবে? যেখানে তার খুসি! পুরন্দরের সঙ্গে সমস্ত নিকট-সম্পর্ক সে চুকিয়ে এসেছে,—শুকনো পাণ্ডুর কপালে ও সিঁথায় সিঁদুরের এতোটুকু চিহ্ন নেই—হাত থেকে চুড়ি ক'গাছও সে তখন খুলে রাখ্লো। তা যেমন রাখলো, তেমনি পুরন্দরের সাংসারিক যাবতীয় জিনিসও সে তাড়াতাড়িতে যতোটুকু সম্ভব গোছগাছ ক'রে দিয়ে এসেছে—আজকার দিনটা অন্তত যাতে সে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে। সবই স্বচক্ষে তার দেখা। তবু আজকের এই মুহূর্ত্তে সীতা তারই আশ্রিতা, তারই রক্ষণাবেক্ষণে। দায়িত্ব যদি সে নির্ব্বিঘ্নে বহন করতে না পারে, তবে পৃথিবীর যৌবনের সামনে মুখ সে দেখাবে কি ক'রে?

কোথায় যাবে এবার সত্যি? হাঁসপাতাল? চাঁপাতলায় তার রাঙাদির বাড়ি? কোনো একটা হোটেল? আস্তে হাত বাড়িয়ে সীতার একখানি হাত সে গ্রহণ করলে। বললে,—কেন এমন তুমি চ'লে এলে, বৌদি।

সীতা হাত সরিয়ে নিলো না, ক্লান্ত স্বরে বললো: কেন যে এলাম জানি না। বোধকরি পাপের সামনে তোমার কথা মতোই রূঢ় হ'য়ে দাঁড়ালাম। থাকতে পারলাম না। কিন্তু সত্যিই জিতলাম কি না এ-বিষয়ে এখনো আমার নিদারুণ সন্দেহ হচ্ছে।

দিলীপ সীতার সেই হাতে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। নিরুৎসাহ কণ্ঠে বললে,—কোথায় এবার তবে যাবে?

সীতা এ ক'দিন ধ'রে দিলীপের প্রত্যেকটি কথা যেন ধ'রে-ধ'রে মুখস্থ করেছে। অল্প হাসতে গিয়ে মুখ তার আরো করুণ হ'য়ে উঠ্লো। বললে,—পৃথিবীতে আশ্রয়ের কিছু অভাব আছে নাকি? যেখানেই যাই না কেন, একবার যখন বেরিয়ে

এসেছি, তখন অমনি ফিরে আমি আর যাচ্ছি না। তোমার দাদাকেই এবার এগিয়ে আসতে হবে—তেমনি মুখ কাঁচু-মাচু ক'রে, তেমনি—তুমি যা বলেছ!

দিলীপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো : দাদাকেই আসতে হবে?

—হ্যাঁ, আসতে হবে বৈ কি। নূতন জোর পেয়ে সীতা দিলীপের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সোজা হ'য়ে বসলো। বললে,—না এসে উপায় কী তাঁর? তুমি তো জানো না, মনে-মনে আজো আমাকে তিনি ভালোবাসেন, বাইরের ঐ শক্ত খোলসটার পেছনে নরম শাঁস আছে—সে-খবর তিনি নিজেই হয় ত' জানেন না।

বিদ্রূপ ক'রে দিলীপ বললে,—কবে পাবেন সে-খবর?

প্রসন্ন হ'য়ে হেসে সীতা বললে,—ক' দিন ওঁকে সবুর করতে দাও না—ধরো আর মাস ছয়েক কি কিছু বেশি।

—মাস ছয়েকেই এই অসাধ্যসাধন হবে ব'লে তুমি বিশ্বাস করো?

—বিশ্বাস আমি কিছুই জোর ক'রে করি না, ঠাকুরপো। কিন্তু অসাধ্যসাধন মানুষের জীবনে এক মুহূর্ত্তেও হ'তে পারে। পারে না? ব'লে সীতা দিলীপের মুখের ওপর চক্ষু দুটি প্রসারিত ক'রে ধরলো।

দিলীপ বললে,—পৃথিবীতে সব কিছুই হ'তে পারে। রুগ্ন স্ত্রীকে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে যে বাড়ির বা'র ক'রে দিতে পারে সেও ত' এক মুহূর্ত্তেরই অসাধ্যসাধন। কিন্তু কোথায় এবার তোমায় নিয়ে যাবো বলো?

সীতার মুখ ভয়ে এতটুকু হ'য়ে গেলো। বললে,—পাশের ঘর থেকে তুমি শুনেছ নাকি সব কথা?

ভ্যাবাচ্যাকা হ'য়ে দিলীপ বললে,—কি?

—কেন আমাকে শেষ পর্য্যন্ত চ'লে আসতে হলো?

—ঐ যে বললে পাপের সামনে রূঢ় হ'য়ে দাঁড়ালে।

—ও ত' কবিত্ব ক'রে বলা হলো, কিন্তু কাণ্ডটা কী কিছু জানো?

—জানি না ব'লেই ত' তখন জিগ্‌গেস করেছিলাম।

—জেনে আর কাজ নেই।

—জান্‌বার কী-ই বা আছে? এর আগে যে-কোনো মুহূর্ত্তেও তুমি চ'লে আসতে পারতে—আসাই ত' উচিত ছিলো। আজকেও তাই আশ্চর্য্য হইনি। কিন্তু কোথায় আমার সঙ্গে তুমি যাবে বলো দিকি?

সীতা ধাবমান রাস্তার দিকে সামনে চেয়ে বললে,—বা, কোথায় আবার যাবো। মা'র কাছে।

—তোমার মা'র কাছে! দিলীপ একেবারে ব'সে পড়লো: সেই জন্তেই তুমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লে নাকি? দারুণ বীরত্ব ত'!

—বীরত্ব না? সীতা একটুও বিরক্ত না হ'য়ে হেসেই বরং বললে,—তোমাকেই যে সঙ্গে ক'রে বেরুলাম এটা বীরত্ব না?

—কিন্তু তোমার সুরেন-দাদা কী দোষ করেছিলো?

—বা, সেটা নেহাৎই বাপের বাড়ি যাওয়া হ'ত—আর এটা হচ্ছে দস্তুরমতো বেরিয়ে যাওয়া, দস্তুরমতো পাপের সামনে রূঢ় হ'য়ে দাঁড়ানো। ট্যাক্সিটাকে শেয়ালদার দিকে যেতে বলো।

দিলীপ বললে,—কিন্তু মা'র কাছে ফিরে যাওয়ার মধ্যে মাহাত্ম্য কী?

—মা'র কাছে ফিরে যাওয়ার মধ্যে মাহাত্ম্য নেই? স্বামীর আশ্রয় ত' ছাড়লাম—মা যখন এখনো আছেন, তখন তাঁকে ফেলে আগে আর কা'র কাছে যাই বলো? ট্যাক্সি শেয়ালদা ত' যাচ্ছে, কিন্তু গাড়ি কই এ-সময়? চিটাগং-মেইল্ ত' কখন ছেড়ে গেছে।

মুখ ভার ক'রে দিলীপ বললে,—প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ওয়েটিং রুম্-এ বা প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে হবে। তা হ'লে মা'র কাছে সশরীরে আর যেতে পারবে না। তার চেয়ে চলো, আজকের দিন ও রাতটার জন্ম একটা হোটেলে আমরা উঠি গে। তেমন জানা হোটেল আমার আছে, সেখানকার ম্যানেজার তোমার স্বামীর চেয়ে ঢের বেশি উদার।

সীতা বললে,—তা হোন্। কিন্তু তাই ব'লে হোটেল?

—মন্দ কি! কোথাও তোমার এতোটুকু অসুবিধে হবে না। চলো, একটু তুমি জিরিয়ে নিলেই আমি খুব একজন বড়ো ডাক্তার নিয়ে আস্‌বো, চিকিৎসার ও সেবার তোমার ত্রুটি হবে না।

—সেবার এতদিনো কোনো ত্রুটি হয় নি, কিন্তু হোটেলে যাওয়ার চেয়েও ভালো উপায় আছে।

—কি?

—মেইল্ চ'লে গেলেও প্যাসেঞ্জার একটা-না-একটা খানিকবাদে পেয়ে যাবো। টিকিট কাটবো রাজবাড়ির।

—রাজবাড়ি?

—হ্যাঁ, গোয়ালন্দর আগে। সেখানে আমার দিদি আছেন, বিয়ের পর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। জামাইবাবু সেখানকার ষ্টেশন-মাষ্টার। ষ্টেশনের সামনেই কোয়ার্টার। কিছুই অসুবিধে হবে না।

থানিক থেমে আবার বললে,—তোমার অবশ্যি অনেক অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু বৌদি যখন হয়েছি, তখন এই ঋণ একদিন আমি তোমার শোধ করবো, ঠাকুরপো। এমন টুক্‌টুকে একটি বউ এনে দেব যে, অসুবিধের আর তোমার শেষ থাকবে না।

দিলীপ তবু তেমনি চুপ ক'রে ব'সে রইলো। সীতা বললে,—এতোতেও মনটা তোমার অত্যধিক খুসিতে একটুও অসুবিধে ভোগ করছে না?

দিলীপ চুপ। সীতা কী ভাব্‌লে। দিলীপের এই স্তব্ধতার পিছনে যেন স্বপ্নভঙ্গের গোপন একটি দুঃখ আছে। স্বপ্ন যখন তার ভাঙলোই, তখন ঘুমের কুয়াসাটাও উড়িয়ে দেওয়া উচিত। খবরটা যে কী ক'রে দিলীপকে বলা যেতে পারে সীতা সরাসরি কিছু ভেবে পেলো না। অনেক পর বললে,—আমার জন্যে অনেক পয়সা তোমার বেরিয়ে যাবে, ঠাকুরপো। তবু তোমার হাতে কিছু টাকা ছিলো ব'লেই রক্ষা। নইলে তোমার দাদার সামনে আমার সমস্ত গর্জ্জনই অসার হ'ত। ছি ছি, কী লজ্জা!

দিলীপ বললে, কেন, পতিদেবতার কাছে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে টাকাটা ভিক্ষা করলেই পারতে। শাস্ত্রে ত' তাই চিরকাল বলেছে।

—শাস্ত্রের কথা সত্য করবার জন্য টাকাটা তোমাকে শোধ করতে এই পতিদেবতাকেই লিখে দেব।

—তা দিয়ো। কিন্তু আমি তা গ্রহণ করতে পারবো না। টাকা তোমার লাগে, যে ক'য়ে হোক্ জোগাড় আমি ক'রে দেব ঠিক, কিন্তু তাই ব'লে ঐ অমানুষের হাত থেকে টাকা আমি ফিরিয়ে নিতে পারবো না।

—না নিলেই যে তুমি খুব বড়ো মানুষ হ'লে, তার প্রমাণ হয় না। তা ছাড়া সে অমানুষ পতিদেবতাই যে আমার কথায় পত্রপাঠ তোমাকে টাকা ফিরিয়ে দেবেন সে-ভরসা আমার নেই। বরং কী যে তিনি উল্‌টে ব'লে বসবেন না, তাই আমি ভেবে পাচ্ছিনে।

দিলীপ বললে,—চোখের সামনে এতোদিন ধ'রে তোমাকে দেখেও ওষুধ-ডাক্তারের পিছু যার একটি পয়সাও বেরুলো না, ঠাকুরের মাইনে দিতে চাইলার ব'লে যে শেষে তোমাকে দিয়ে রাঁধবে না ব'লে ঠিক করলে—সে দেবে টাকা! তা আবার আমাকে! যার সঙ্গে তুমি বাড়ী ছেড়ে গেলে! আর, সেই টাকা আমিই নিতে গেছি!

মুখের ভাব আকাশের মতো প্রশান্ত ক'রে সীতা বললে,—তা হ'লে টাকাটার জন্যে অনেক দিন তোমার অপেক্ষা করতে হবে। তারপর তোমায় দেব।

—কী ক'রে ?

—আমার ছেলে যখন বড়ো হ'য়ে চাকরি ক'রে প্রথম মাসের মাইনে পাবে। আমি নিশ্চয় ততোদিন বাঁচবো। না বাঁচলেও তাকে ব'লে যাবো ঠিক। আমার ছেলে তোমার দাদার ঋণও ভূমিষ্ঠ হ'য়েই শোধ ক'রে দেবে। ব'লে সীতা আস্তে তার চক্ষু দুটি মুদ্রিত করলে।

খানিক পরে চেয়ে দেখলো দিলীপের মুখের সেই সহজ প্রফুল্লতা কখন অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। মুখের প্রতিটি রেখা কেমন চঞ্চল, চোখে যেন মৃগয়াক্লান্ত শিকারীর ব্যর্থতা! সীতার ভয় করতে লাগলো; তাড়াতাড়ি দিলীপের কুনুইয়ে একটা ঠেলা দিয়ে কাছে একটু এগিয়ে এসে সীতা বললে,—এটা কী, ঠাকুরপো? এটা বুঝি সায়েবদের গোরস্থান ?

দিলীপ বাইরে একবার চেয়ে দেখে বললে,—হ্যাঁ।

—এখানে মাইকেল মধুসূদনের কবর আছে, না ?

—শুনেছি।

—মাইকেল্‌এর শেষ জীবনটা খুব দুঃখে কেটেছিলো, না? কী হয়েছিলো ?

—জানি না।

—না, তুমি আবার জানো না! কতো রাজ্যের বই প'ড়ে শেষ করলে! মশায়ের একটু অহঙ্কার হচ্ছে বুঝতে পারছি। জিগ্‌গেস করলাম কি না!

বত্রিশ

বন্ধু

আশ্চর্য্য, রাজবাড়িতে একদিনেই সীতার চেহারায় আভা দিয়েছে। দিলীপের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে,—দেখ, দেখ, জ্বর আজ কতো কম। বাড়িতে থাকলে অনায়াসে রাঁধতে পারতাম। কষ্ট ক'রে তোমাদের আজ আর মেস্‌এ খেতে হ'তো না।

দিদিকেও সীতা সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু ছোট ঘরে ছেলেপিলের এই প্রকাণ্ড সংসার ফেলে সে কোথায় যাবে? কী ছোট বাসাখান! সামনেই ট্রেন্‌-লাইন্‌। কতো গাড়ি যায় আর দাঁড়ায়। কতো যাত্রীর কতো রকম মুখ, কতো রকম কথা। দিদির ছেলে-মেয়েরা জান্‌লায় দাঁড়িয়ে ট্রেনের যাত্রীদের মুখ ভেঙচায় আর অনর্গল হাসে। সব জড়িয়ে কেমন সুন্দর যে তার লাগছে। এমনি একটি ছোট ঘর, এমনি একটি শিশুর মুখ।

তারপরে, পর দিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে দিলীপ আর সীতা ফের ট্রেন চাপ্‌লে। তারপরে ষ্টিমার। সেখান থেকে সোজা চাঁদপুর। তার পর মেহের-কালীবাড়ি ইষ্টিশান্। রাত তখন কতো?

রাস্তা-ঘাট সীতার সব নখদর্পণে। গরুর গাড়ি একটা যোগাড় হলো। গাড়োয়ান সীতার জানা, কতো দিন ওদের বাড়িতে ঘরামির কাজ করেছে। তাকে আর কিছু বলতে হলো না। গাড়ির তলায় কেরোসিনের একটা ডিবে ঝুলিয়ে সহুরে-সুরের একটা গজল ধ'রে সে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলে। মিটিমিটি জ্যোৎস্না, ঝোপে-ঝাড়ে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ ডাকছে। গাড়িতে ছই নেই, হাওয়ায় মিঠে-মিঠে ঠাণ্ডা লাগছে। এইখানে ওদের বাজার -- কালীমন্দির হচ্ছে ঐ রাস্তায়।

সীতা গাড়ীর ধারে পা ঝুলিয়ে বসেছে, কপালের কাছে গুঁড়ো-গুঁড়ো রুখ্ চুল সাপের ফণার মতো ফু'লে-ফু'লে উঠ্‌ছে। বললে,—গরুর গাড়ি চড়তে তোমার ভালো লাগছে না?

নিষ্প্রাণ কণ্ঠে দিলীপ বললে,—বিশেষ না। থামলে এবার বাঁচি।

—এই থাম্‌লো ব'লে। ঐ মাঠটা পেরোলেই ত' আমাদের বাড়ি। সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে হয় ত'। কিন্তু আমাদের দেখে সুরেন-দাদা কী যে ক'রে বসেন দেখতে তোমার নিশ্চয়ই খুব মজা লাগবে।

বেড়ার পাশে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সুরেন-দাদা ধড়মড় ক'রে উঠ্‌লেন। ডাকাত পড়লো নাকি? বামুন-পণ্ডিত—পূজো-যজমানি ক'রে খান্, তাঁর ঘরে ডাকাত পড়বে কী! বলা যায় না, যে দিন-কাল—সামান্য পাঁচ টাকার জন্যেও গলায় দা বসাবে। অতিশয় ভীত কণ্ঠে সুরেন-দাদা চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন : কে?

পরিচিত কণ্ঠে বাহির থেকে কে বললো : আমি।

—আমি কি রে? সুরেন-দাদা স্ত্রীর গায়ে ধাক্কা দিতে লাগলেন : ওগো, বাইরে থেকে সীতার গলায় কে যেন কথা কইছে। ওঠ, ওঠ, শিগগির।

স্ত্রী সুরেন-দাদাকে দুই হাতে আঁকড়ে রইলেন : না, না, তুমি যেয়ো না। ডাকাতের গলা।

—আমি সীতা। দরজা খোলো, সুরেন-দাদা। বাইরে স্বর উঠলো।

—ঐ, ঐ শোনো। কী ব্যাপার? সুরেন-দাদা উঠে লণ্ঠন জ্বালালেন। বাড়ির লোক-জন সবাইকে জাগালেন, লাঠি-সোটা দা-কুড়ুল সব হাতের কাছেই রইলো। সাবধানের মার নেই। সীতার গলা শুনে তার মা'র অসাড় পায়ে যেন নতুন বল এলো, বেড়ার কাঠি ভেঙে-ভেঙে ছোট একটুখানি ফাঁক ক'রে বাইরে তিনি চেয়ে রইলেন। গরুর গাড়িটা বুঝি ও-দিকে দাঁড়িয়েছে।

সুরেন-দাদা চারদিক থেকে সবলবিক্রমে সুরক্ষিত হ'য়ে দরজা খুলে দিলেন। হ্যাঁ, সীতাই ত'! সঙ্গে সেই হালফ্যাসান্এর দেওরটিও হাজির। সুরেন-দাদার স্ত্রী আঙুল দিয়ে মূর্ত্তিটার দিকে নির্দ্দেশ ক'রে বললো,—হ্যাঁ, সীতা ব'লেই ত' মনে হচ্ছে।

সীতা ক্লান্ত পায়ে ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগ্‌লো। তার চেহারা এমন বিবর্ণ ও কঙ্কালসার হ'য়ে গেছে যে সুরেন-দাদার স্ত্রী ত' ভয়েই দু'পা পিছিয়ে গেলো। সশরীরে সীতাই ঠিক এসেছে কি না তার সন্দেহ উপস্থিত হলো। সীতা কাছে এসে প্রণামের ভঙ্গিতে নুয়ে পড়তেই সুরেন-দাদাও তথৈবচ পিছিয়ে গেলেন; বললেন,—সত্যি তুইই ত' এসেছিস, সীতা? কিন্তু এ কেমনধারা কাণ্ড!

—ভিতরে চলো, সব বলছি। এসো, ঠাকুরপো।

সুরেন-দাদার স্ত্রী বললে,—এই না তোর এখন-তখন অবস্থা, আর দিব্যি কিনা ট্যাঙস্-ট্যাঙস্ করতে এসে পড়লি। দাদা গেলো, তাকে দিলি বিদেয় ক'রে? সঙ্গে এই ছোঁড়াটা কে?

সুরেন-দাদা বললেন,—কে আবার? শুনলে না—দেওর।

—ও! সুরেন-দাদার স্ত্রী গালে হাত দিয়ে প্রকাণ্ড একটি হাঁ করলেন: তাই। তাই দাদা গিয়ে এত ঝুলোঝুলি করলেও তাঁর সঙ্গে শ্রীমতীর আসা হলো না!

সুরেন-দাদা দাঁত খিঁচিয়ে বললেন,—এখানে মরতে আসার হঠাৎ সখ হলো কেন?

—মরতে হ'লে ত' স্বামীর কাছেই মরতে পারতাম। মরলে আমার আর এখন চলবে কেন? কিন্তু, মা কই? মা কেমন আছেন? সীতা ঘরের দিকে অগ্রসর হলো।

ঘরের মধ্য থেকে মা ব্যাকুলকণ্ঠে ডেকে উঠলেন: এই যে আমি, এই ঘরে। আয়, সীতা।

সীতা পেছন ফিরে বললে,—বাইরে ঠাণ্ডায় আর দাঁড়িয়ে থেকো না, ঠাকুরপো। ইষ্টিমারে তোমার সর্দ্দি লেগেছে। ভেতরে চ'লে এসো। তোমার খাবার-শোবার বন্দোবস্ত আমি এখুনি ক'রে দিচ্ছি।

সীতার ভঙ্গিটা দৃঢ়, নিজের ওপর অগাধ তার নির্ভর—এমনি উদাসীন নির্ভয় ভাব, অতুলনীয় প্রাপ্তির গৌরবে সংসারে সে আর কোনো দীনতা কোনো অপমান গায়ে মাখবে না—এমনি অবিচল অহঙ্কার। সীতা ভিড় সরিয়ে মা'র ঘরের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললো।

বাধা দিলো সুরেন-দাদার স্ত্রী। তার হাতটা ধ'রে ফেলে শরীরটা ঘুরিয়ে মুখ-ঝামটা দিয়ে ব'লে উঠলেন : এখেনে কে তোমার চিকিচ্ছে করবে শুনি ?

সুরেন-দাদা বললেন,—সঙ্গে একটা মাল-পত্রও তো আনিসনি দেখছি। এ কেমনতরো বাপের বাড়ি আসা! অত বড়ো সহরে অত বড়ো-বড়ো ডাক্তার-হাঁসপাতাল—তা ফেলে এই পাড়াগাঁয়ের শ্মশানটাই তোর ভালো লাগলো ? এমন মেয়েও ত' কোথাও দেখিনি বাপু।

সীতা আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে,- আমার অসুখের জন্যে কিছু তোমার ভাবতে হ'বে না। খরচ-পত্র যা করবার আমিই করবো, আর সত্যিই যদি মরি, গাঁয়ের শ্মশানই বা মন্দ কি। ব'লে ছুটে অন্ধকারে সে তার মা'র বিছানায় মা'র বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মা অনেক পর কান্না মুছে বললেন,– এ কী চেহারা ক'রে এসেছিস্ ?

—আমার যে কতো দিন থেকে জর। তোমায় বলবো কি মা, কলকাতা ছাড়তেই জর আমার নেমে গেছে।

—কিন্তু এ কী, গায়ে যে তোর একখানাও গয়না নেই। জামাইর সঙ্গে ঝগ্ড়া করেছিস বুঝি ?

মুচকে হেসে সীতা বললে,—তা একটু ঝগড়া-ঝাটি এমন কোন্ না-হয় !

—এমন ঝগড়া যে, গয়না-গাটি ফেলে বাড়ি ছেড়ে চ'লে আসতে হয় ? জামাই জানে ত ?

—জানে বৈ কি। ঝগড়া কদ্দিন সে আর করবে ? তোমার ভয় নেই মা, আর আমাকে তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না।

সীতার চুলে হাত বুলিয়ে মা বললেন,— কী যে সব অলক্ষুণে কথা বলিস্ !

পাশের ঘরে সুরেন-দাদার স্ত্রী তখনো গজ্গজ্ করছে : কেন, কেন, এই সব হ্যাঙ্গাম ? ফের সোজা চ'লে যেতে বলতে পারো না ? এক রুগীকে নিয়েই ঝালাপালা, তা আবার গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া।

সুরেন-দাদা চাপা গলায় বললেন,—থামো। এসে যখন পড়েইছে একবার, ভগ্নীপোতের কাছে উচ্ছহারে কিছু দক্ষিণা হাতড়ানো যাবে। নারায়ণ! নারায়ণ।

দিলীপ কাছে এসে বললে,—বৌদিকে একবার দয়া ক'রে ডেকে দিন না। একটু দরকার আছে।

সুরেন-দাদা তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে-করতে বললেন,—এখনো দরকার ! তুমিও কি দয়া ক'রে এখানে বায়ু-পরিবর্তন করতে এসেছ নাকি ?

—না। দিলীপ ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে নিজেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। একটা কোঠা পেরতেই ডাকলো : বৌদি।

—এই যে, এদিকে। সীতা তাড়াতাড়ি পিল্‌সুজের ওপর বাতি জ্বাল্‌লো : এসো। ইনি আমার মা। পুকুরের ঘাট্‌লায় আছাড় প'ড়ে পা দুটো তাঁর অবশ হ'য়ে গেছে।

দিলীপ মাঐমাকে প্রণাম করলে। সীতা বললে,—আর এ আমার মাসির ঘরের দেওর। চমৎকার ছেলে, অন্ধকারে চেহারার ঠিক হদিস্ পাবে না। ছবি আঁকা বলো, পদ্য লেখা বলো, রান্না করা বলো, বাসন-মাজা বলো সব দিকেই সমান ওস্তাদ। তিন-তিনটে পাশ দিয়ে এই এম্. এ. পড়ছে—এর জন্যে আমাদের এখেনে ভালো কোনো পাত্রী নেই, মা? আমার ওপরেই ভার, এর পাত্রী বেছে দেব। আর, গাঁয়ের মেয়েই ওর পছন্দ!

কষ্ট ক'রে মা বিছানায় একটু স'রে শুয়ে বললেন,—বোস, বাবা। দেখে ভারি খুসি হলাম। এর জন্যে রান্নার জোগাড় ক'রে দে—ক্ষেন্তিকে বল্।

দিলীপ নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললে,—বসবো না। এখুনিই আমি ফিরবো।

—বলো কী, ঠাকুরপো? তুমি পাগল হ'লে নাকি? এখুনি—এই রাত্রে?

—হ্যাঁ, গাড়িটাকে তাই বিদায় করিনি! ষ্টেশনে কোনরকমে ফিরতি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করবো—কোনো কষ্ট হ'বে না।

—না, না, পাগলামি করো না। এখানে এক রাত্তির থাকলেই যেন তোমার কতো কষ্ট হ'বে! আর আমার জন্যে কষ্টকে ত তুমি ভালোই বাসো। দাঁড়াও, আমি পূবের ঘরে তোমার জায়গা ক'রে দিচ্ছি।

ম্লান একটু হেসে দিলীপ বল্‌লে,—না, শোন। আজই আমার ফিরতে হ'বে। আমার কাজ ত এবার ফুরোলো আর-কি! এবার যাই।

সুরেন-দাদা ততোক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। দিলীপের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,—যাবে বৈ কি। এখানে—বলে কি—বায়স্কোপও নেই, থিয়েটারও নেই, হপ্তায়-হপ্তায় চকচকে ক'রে ঘাড় চাঁছবার জন্যে একটা দোকানো নেই। এখেনে এর মন টিকবে কেন? তারপর যেমন মশা, তেমনি ডাকাতের উপদ্রব ভালয়-ভালয় এখুনি লম্বা দাও, দাদা।

দিলীপ আস্তে-আস্তে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে সীতাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে,—আর কলকাতাতেই আমার সব কিছু আছে! চললাম। ব'লে আবার সে মাঐমাকে প্রণাম করলে। সীতাকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলো, সীতা তাড়াতাড়ি খানিক দূরে ও সেখান থেকে ঘরের অন্ধকার একটা কোণে চ'লে গিয়ে দিলীপকে ডাকলে : শোন।

দিলীপ কাছে এসে দাঁড়ালো।

সীতা অস্ফুট গলায় বললে,—তোমাকে এখানে ধ'রে রাখবার আর কোনো মানে হয় না, তা আমি বুঝি। তারপর নিজের কানেই তো বৌঠানের ফোড়ন শুনলে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলি ঠাকুরপো, কলকাতায় ফিরেই তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করো।

—দরকার?

—আমাকে যে বাপের বাড়িতেই রেখে এসেছ এটা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া ভালো। কতো-কী নইলে না-জানি ভাববেন।

—তাকে এতো উদার হ'তে দিতে আমার ইচ্ছে নেই।

—না, না দেখা করো তুমি। তোমার যে-টাকাটা খরচ হয়েছে তাও তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ো। এখন তাঁর খরচ কম, সহজে দিয়ে দিতে পারবেন।

—তার কোনো দরকার নেই। তোমার ছেলের জন্যে আমি অনেক—অনেক দিন অপেক্ষা করতে পারবো।

সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভব করতে-করতে সীতা বললে,—দেখা ক'রে তাঁকে বলো যে আমি এখন বেশ ভালো আছি। জ্বর নেই। তিনি যেন না ভাবেন। আর বলো, আমাকে টাকা পাঠাবার দরকার নেই কিছু। কষ্টে-সৃষ্টে দিন কোনোরকমে কেটে যাবে। তোমার কতো দরকার, তোমারই টাকাটা আগে পাওয়া উচিত।

দিলীপ বললে,—অতো কঠিন কাজ আমাকে দিয়ো না, বৌদি।

—কঠিন ব'লেই ত তোমাকে দিচ্ছি। তুমি ছাড়া কে আর পারবে বলো? আমার জন্যে তুমিও কিছু ভেবো না,—আমার আর কোনো ভয় নেই। আবার দেখা হ'বে।

দিলীপ নত হ'য়ে সীতাকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলো, তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধ'রে সীতা বললে,—ছি, বন্ধুকে এমনি ক'রে অসম্মান করতে হয় নাকি?

ব'লে সীতা তার হাতের মুঠির মধ্যে দিলীপের হাতখানা অনেকক্ষণ ধ'রে রইলো।

তেত্রিশ

এখানেই গুদের শেষ

সাত দিন যখন থেকেছে, এ-বাড়িতে পুরো মাসটাই পুরন্দর থাকতে পারে। কিন্তু এতোগুলো ঘর ও তাদের এই অবারিত শূন্যতা নিয়ে তিন দিনেই সে হাঁপিয়ে উঠলো। আরো তিন দিন! এতো দিনেও তাদের কোনো একটা খবর এলো না। দিলীপের রোল্-কল্এর খাতায় একবার খোঁজ নিয়ে আসবে নাকি? কিন্তু কী দরকার! একদিন ফিরে আসতে তাদের হ'বেই। সমাজ তা বলছে, আইন তা বলছে, পুরন্দরের বিবেক তা বলছে।

সীতার যৌবনে উদ্দামতা ছিলো না, কামনা-ফেনিল তরঙ্গমত্ততা ছিলো না,-- না-হয় সে বৈচিত্র্যহীন জীবনোপন্যাসের অলিখিত সাদা একটা পৃষ্ঠা, না-হয় সে প্রকাশ-পরাঙ্মুখ মৃত্যুর মতো বিস্বাদ, বিবর্ণ—হলোই বা না সে একটু ঝগড়াটে, অবুঝ, বোকা —কিন্তু তার সামান্য শারীরিক উপস্থিতির যে এতো মূল্য, তা পুরন্দর স্বপ্নেও কোনোদিন কল্পনা করতে পারতো না। রান্নাঘরে ব'সে সে হাতা-খুন্তি নাড়ে না, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে চুল বাঁধে না, বা শয্যায় শুয়ে তারকিনী রাত্রির মতো আনন্দ-স্পন্দিত হয় না—এ-সব কিছু নয়; মাত্র সে নেই,—ঘরে নেই, সামনে নেই, কোথায় আছে তাও জানা নেই—শুধু এই উপস্থিতির অভাব। সকাল বেলা আপিস্ থেকে এসে চায়ের সসার্ হাতে সীতাকে সে দেখতে পায় না, বা আপিসে যাবার সময় ছোট্ট পানের ডিবেয় ন্যাকড়ায় ভেজানো পান নিয়ে সে এসে দাঁড়ায় না -- তাতে আর এমন-কী হয়েছে, শুধু সে এখানে নেই—মাত্র এই একটা স্থূল, প্রত্যক্ষ অনুভূতি। নইলে দিন ত' তার তেমনি চলছে—খবরের কাগজে বড়ো-বড়ো হেড-লাইনে জাঁকালো খবর বেরচ্ছে-- শুধু তার যাওয়াটিই শূন্যতার অক্ষরে ঘরে-দুয়ারে দেহে-মনে লেখা হলো।

ঘর-দুয়ার সে ছোট ক'রে আনলে। জিনিস-পত্র আস্তে-আস্তে বেচতে সুরু করলো। খাট, টেবিল, আলমারি, চেয়ার, বাসন কোসন, আলনা-র‍্যাকেট্। যে যা দাম দিলো তাইতেই সে খুসি। খালি বেচলো না সীতার ভরতি সেই ট্রাঙ্কটা— যাতে ওপরেই একেবারে ছোট-ছোট ক'টি জামা আর কাঁথা আছে। বেচলো না সেই পেতলের ফুল-দানিটা—যাতে ক'রে আগে-আগে সীতা রজনীগন্ধার দীর্ঘ বৃন্ত-গুলি গুচ্ছীকৃত ক'রে শিয়রের জান্লার কাছে সাজিয়ে রাখতো ও যেটা একদিন সে অনন্যোপায় হ'য়ে তাকে লক্ষ্য ক'রেই ছুঁড়ে মেরেছিলো। কেই বা এ সব কিন্বে! আর বেচলেই ত' তা কিন্তো? বইগুলিও পুরোনো বইর দোকানে জড়ো হ'তে

লাগলো। আর এই তার সেই অর্দ্ধসমাপ্ত উপন্যাসটা। অতিমাত্রায় আধুনিক, উগ্র-ভাবাপন্ন, সমালোচকের-দুঃস্বপ্ন-জাগানো উপন্যাস। জীবনের প্রতি পঙ্কিল ব্যঙ্গ, মনুষ্যত্বকে তুচ্ছ ক'রে দেখিয়ে এই অপমান, সত্যের নামে কল্যাণের ওপর এই বিদ্রোহ—কী হ'বে লোকের চক্ষু ঝল্‌সে অন্ধ ক'রে দিয়ে, কী হ'বে এই উগ্র আত্ম-পরায়ণতায়? এমন কি তার ক্লান্তি যা দূর করবার জন্যে তার লেখনীর শরণ নিয়ে কল্পনা-কণ্ডূয়ন করতে হ'বে? নতুন কী সে এমন সৃষ্টি করতে চায় যার আবির্ভাবে পৃথিবী ধন্য হ'বে, কাল হ'বে অবিনশ্বর? পুরন্দর উপন্যাসের পৃষ্ঠাগুলি এক-এক ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। অতীতের সুখের দিনগুলির মতো ছেঁড়া পৃষ্ঠার টুকরোগুলি সে মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে এলো।

উঠলো এসে মেস্‌এ। টিনএর পার্টিসান্ দেওয়া বন্ধ সঙ্কীর্ণ ঘরে। আস্‌বাব-পত্রের বাহুল্য নেই, নিজের ক্লান্তি ও বিরহের অবকাশে ঘরের অপরিসর শূন্যতা ছোট চোখে সঙ্কেতের গভীরতার মতো পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে। হাতে কোনো কাজ নেই। সকালে আপিস থেকে ফিরে তখুনি আর সে স্নান করে না, একেবারে খাবার তৈরি হ'লে করে; দুপুরে উপন্যাস না লিখে ঘুমোয়—ওঠে সন্ধ্যায়; সন্ধ্যার পড়ানোটা সে ছেড়ে দিয়েছে। অভ্যাসের একটা ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে তার রক্ষা ছিলো না। রবিবারের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—খাওয়া-দাওয়ার সময় ছাড়া—মেস্‌এই সে পাশা পাড়ে, তাস ভাঁজে, দাবার ছক নিয়ে বসে।

সীতাকে সত্যি সে কোনো দিন ভালোবেসেছিলো কি না, আর, ভালোবাসা কাকেই বা বলে—এতো বড়ো একটা উপন্যাসে হাত দিয়েও সে তা কিছুমাত্র অনুধাবন করতে পারে নি। চিরকাল সে ঝড় চেয়েছে, প্রবল আবর্ত্ত, অন্ধ উন্মাদনা—কিন্তু এখনকার এই অপরিসীম বিশ্রামে প্রতীক্ষার যে একটি চঞ্চলতা আছে, তার স্বাদে পুরন্দরের দেহ-মন বিভোর হ'য়ে উঠ্‌লো। কিছুই তার নেই, কোনো বন্ধন, কোনো অবলম্বন—জীবন তাকে একেবারে রিক্ততার মরুভূমিতে নিয়ে এসেছে—অনায়াসেই সে বৈরাগী হ'য়ে বেরিয়ে যেতে পারে। অথচ কিছুতেই এই ছোট ঘরটি আপনাকে ঘিরে প্রতীক্ষার এই শূন্যতাটি ছেড়ে তার পা ওঠে না। মাত্র সীতা কাছে নেই—অপূর্ব্ব রিক্ততা দিয়ে সে তার ঘর ও হৃদয় পূর্ণ ক'রে রেখেছে।

এক রবিবার ঘরের মধ্যে সে আর বন্দী হ'য়ে থাকতে পারলো না। কিটিকে কেন-জানি একবার দেখতে ইচ্ছে করছে—নতুনতরো অর্থে। সেই নতুনতরো অর্থে সীতার সঙ্গে তার অস্পষ্ট একটি মিল আজ পুরন্দর খুঁজে পেলো।

তবু অবিশ্যি পকেট ভ'রে সে টাকা নিলো। যদি কিছু কিটির প্রয়োজন হয়, যদি এখনো তার ছেলে সম্পূর্ণ ভালো হ'য়ে না থাকে!

অথচ সীতা তার কাছে একটি পয়সাও আজ অবধি চেয়ে বসলো না। দিলীপই সব চালাচ্ছে হয় ত কোথায়ই বা সে টাকা পাচ্ছে কে জানে। দিলীপের সংস্পর্শে এসে সীতা নতুন যে চিত্তবৃত্তির অভিজ্ঞতা পেলো, তার মনের পক্ষে তা কতো স্বাস্থ্যকর,—সে একান্ত ক'রে স্বামীরই অন্ধ অনুবর্তিনী ব'লেই ত' তার মনে এতোদিন স্বজাতসুন্দর লাবণ্য ছিলো না। অন্য পুরুষের মনের দর্পণে সীতা হয় ত' এতোদিনে তার স্বামীর দারিদ্র্যের চেহারাটা দেখতে পেয়েছে। নইলে কী যে সে তার চরিত্রের দীপ্তি ও সংস্কারের দৃঢ়তা, তা স্বামী হ'য়ে পুরন্দরের বুঝতে আর বাকি নেই। কিন্তু এই সীতাকেও সে জাগাতে পেরেছে আঘাতে, সন্দেহে, অত্যাচারে, অবহেলায়; তার সেই দীপ্তি আরো উজ্জ্বলতরো হ'য়ে উঠেছে—সংস্কারের নির্মোক ফেলে মুক্তির প্রেরণা তার ফণা তুললো। দিলীপকে সে ভালোবাসে এবং তাকে অবলম্বন ক'রে পুরন্দরকেও সে ভালোবাসবে—অতোখানি আঘাত ও অত্যাচার, কামনা ও প্রেমের চিহ্ন সে মুছবে কী ক'রে?

পুরন্দর ট্র্যাম নিলো। রাস্তা ও নম্বরটা সে ভোলে নি।

শহরে যেন প্রাণহীন গতির একটা নিরানন্দ গতানুগতিকতা চলেছে। উৎসাহিত হ'বার কিছুই পুরন্দর পেলো না। সেখানে কেনই বা সে যাচ্ছে তারো একটা স্পষ্ট ধারণা নেই। তবু কিটিকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে। ছেলের জন্য এমন ক'রে নিজেকে সে ত্যাগ করছে ব'লে তার প্রতি সহানুভূতি হয়।

হ্যাঁ, এই সেই নম্বর। গেইটের সামনে থাকির হাফ-প্যান্ট পরা এক দরোয়ান। দীর্ঘ এক সেলাম ঠুকে পুরন্দরকে সে সম্বর্দ্ধনা করলে।

পুরন্দরের কেমন খট্‌কা লাগলো। এটা ঠিক বাসা মনে হচ্ছে না, পর্দার আড়ম্বরে ও আলোর সু-উচ্চ প্রাখর্য্যে ব্যাপারটা কেমন-যেন তার অন্যরকম মনে হলো। হাফ্‌-প্যান্ট-পরা দরোয়ান বললে,—আইয়ে না বাবু।

পুরন্দরের মনে হলো কিটি আগের বাসা ছেড়ে এখানে এসে বসে আজকাল। কিন্তু তার মা ও ছেলে তবে থাকে কোথায়? দরোয়ান দরজার বাইরে থেকে ইলেকট্রিক বেল টিপে দিলো। ভিতরে থেকে কোনো আওয়াজ আসবার আগেই পুরন্দর পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

তেমনি ড্রয়িং-রুম, কৌচে-চেয়ারে আকীর্ণ, এক পাশে একটা ড্রেসিং-টেবিল, আর শ্বেতাঙ্গিনীর দল ছেঁচা বরফের টুকরোর মতো এখানে-ওখানে ছিটিয়ে রয়েছে। তাকে দেখে সবাই রঙে ও রেখায় উপচে উঠলো।

ম্লান মুখে অত্যন্ত নার্ভাস্ হ'য়ে পুরন্দর জিগগেস করলে: কিটি আছে?

অটি ওরফে বুড়ি বাড়িউলি বললে—বোস।

—বলবো না। কিটিকে চাই।

—কিটি? কিটি বেরিয়ে গেছে।

—কোথায়?

—Goodness knows where.

—কখন আসবে?

অন্টি ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে বললে,—কিটিকে আজ পাবে না। এদের কারু সঙ্গে আজকে বন্ধুতা করো না। এরাও খুব ভালো ব্যবহার করবে। এক জনকেই যদি আঁকড়ে থাকতে চাও, তবে বিয়ে করলেই ত' পারো।

—তাই করবো ভাবছি। পুরন্দর খালি একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বা'র ক'রে বল্লে,— আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তার সঙ্গে আমার দরকার আছে।

পুরন্দর সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত বসলো ব'লে মেয়ের দলে রেখার ও ভঙ্গির লীলা সুরু হলো। কেউ সোফায় এলিয়ে প'ড়ে হাঁটুর ওপর মোজার গার্টার দেখালে, কেউ আঙুল বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে চুল ফাঁপাতে লাগলো, কেউ ছোট আয়না বের ক'রে রুজ্ রগ্ড়ে-রগ্ড়ে গাল দুটোকে প্রায় আপেল ক'রে তুললে। পুরন্দর জিগগেস করলো: তার ছেলে কেমন আছে বলতে পারো?

—ছেলে? অন্টি খন্খনে গলায় হেসে উঠলো,—তুমি কি বলছ?

—তার ছেলের না খুব অসুখ!

মেয়ের দল পাহাড়ে-ঝর্ণার মতো খিল-খিল ক'রে হেসে উঠলো। বিদ্রূপের, বিস্ময়ের হাসি,— তাতে এতোটুকু শোভা নেই! মেয়েদের দিকে চোখ ফিরিয়ে পুরন্দর ওদের খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলে। ঘৃণায় স্নায়ু-শিরাগুলি কিল্‌বিল্ ক'রে উঠলো। এতো তাদের অপর্য্যাপ্ত যৌবন, কিন্তু কোথাও এতোটুকু সুষমা নেই। জীবনের এইখানেই ওরা থেমে পড়েছে—এখানেই ওদের শেষ। সেই গতানুগতিকতা, সেই দিনের পর রাত। আর বৃদ্ধি নেই, চেতনাকে বিস্ফারিত, জীবনকে অপরিমিত করবার সক্লেশ সাধনা নেই, নতুন পৃষ্ঠা উলটে জীবনের নতুন পাঠোদ্ধারের অনুপ্রেরণা নেই— এইখানেই ওরা অস্ত গেলো। এইখানেই ওদের আত্মার অপমৃত্যু ও অকালমৃত্যু। এই ওদের জীবনের আসল দুর্ঘটনা।

পুরন্দর বললে,—না, তুমি জানো না। তার ছেলে একেবারে মৃত্যুর মুখে। তোমরা কি মানুষের চেহারা দেখে তার ভেতরের ট্র্যাজেডি আন্দাজ করতে পারো?

—তা পারিই না ত' আমরা। অন্টি ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ গম্ভীর করলে। সচকিত হ'য়ে বললে,— এই যে কিটি। দেখ তাকিয়ে She's very married.

পাশের ঘর থেকে কিটি বেরুলো, সাদা সিল্কএর একটা ঝল্‌মলে পাইজামা পা থেকে কোমর পর্য্যন্ত উঠে গেছে, বুকে সাদা সিল্ক-এরই চলচলে একটা বডিস্‌। কিটি বেরুলো এক হাইল্যাণ্ডারএর বাহুবদ্ধ হ'য়ে,—চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, দু'পায়ের পাতার ওপরটা খালি, জুতোর গোড়ালিটা পায়ের ভারে দুম্‌'ড়ে-দুম্‌'ড়ে আসছে—এতো সে টলছে যে জুতোর মধ্যে পা দুটো সে জুৎ-মতো গলাতে পারছে না।

প্রবল আকর্ষণে পুরন্দর দাঁড়িয়ে পড়লো। কিন্তু সেদিকে কিটি কণামাত্র লক্ষ্য করলে না। হাইল্যাণ্ডারকে বাইরে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে তেমনি জুতোর গোড়ালির ধার দুটো দুম্‌ড়াতে-দুম্‌ড়াতে সে ফিরে এলো; চেঁচিয়ে বললে,—**Hello.**

পুরন্দর তার দিকে তাকাতে পারছে না। তবু গলায় সমস্ত শক্তি ডেকে এনে সে জিগ্‌গেস করলে: তোমার ছেলে কেমন আছে?

—**Damn it.** সে কবে ম'রে গেছে। কিটি দুই অনাবৃত নিটোল বাহু দিয়ে পুরন্দরের গলা জড়িয়ে ধরলো; বললে—শিগগির এসো আমার ঘরে—**I'm dying for a kiss.**

অন্যান্য মেয়েগুলি প্রবল উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

পুরন্দরের এতোক্ষণে হঠাৎ জ্ঞান হলো। তাড়াতাড়ি কিটির প্রসারিত বাহুর তলা দিয়ে ঘাড়টা পিছ্‌লে নিয়ে সে হ'টে দাঁড়ালো। আর একমুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়ালো না।

চৌত্রিশ

বেতের দোলনা

যেটুকু সীতার সন্দেহ ছিলো সংসারের অভিজ্ঞ মহিলাদের আশ্বাসে তা কুহেলিকার মতো অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। তা ছাড়া দেহেও তার নতুন ক'রে পরিবর্ত্তন হচ্ছে, প্রতি রোমকূপে সে-পরিবর্ত্তনের পুলকাঙ্ক সে অনুভব করছে। তার দেহ ভ'রে এমন উদ্বেল কান্তি, বুক ভ'রে এই পীবরতা, চোখ ভ'রে এই অতল গভীর দৃষ্টি পুরন্দর দেখতে পেলো না ভেবে মনে মনে সীতার কষ্ট হয়। শরীর-পক্রিয়ার এই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনে সে তার স্বামীরই স্পর্শের শিহরণ পায়, উত্তাপের গাঢ়তা, সীতার মধ্য দিয়ে নিজেকে অবিনশ্বর ক'রে রাখবার ব্যাকুল অনুপ্রাণনা। নিজের রূপ দেখে নিজেই সে মুগ্ধ হ'য়ে গেছে।

এখানে এসে গাঁয়ের ফাঁকা হাওয়ায় জ্বর তার আস্তে-আস্তে জুড়িয়ে গেলো, দেহে পূর্ণতার আভা ফুটলো, অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে সূর্য্য জাগবার আগেকার

মুহুর্তে আকাশ যেমন কাঁপে তেমনি সর্ব্বাঙ্গ তার কম্পমান। নিজেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সে দেখে,—দেহের মধ্যে এতো সুগোপন কৌশলে এতো রহস্য এতো বেদনা এতো আনন্দ—প্রথম আবিষ্কার করতে পেরে সীতা অভিভূত, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়ে। নিজের ক্রমস্ফীত জঠরের ওপর দুই হাত স্থাপন ক'রে সে দুর্ব্বল একটি প্রাণকণার অস্ফুট চাঞ্চল্য অনুভব করতে চায়, দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু সেখানে প্রেরণ ক'রে তাকে তপ্ত, পূর্ণ, বলদৃপ্ত করবার জন্য ধ্যানিনীর মতো অবিচল প্রতীক্ষায় ব'সে থাকে। সে একদিন এই দেহের দুয়ার বিদীর্ণ ক'রে উন্মত্ত বিজয়ীর বেশে অবতীর্ণ হ'বে—সে-আনন্দ সীতা সইবে কী ক'রে ?

মা অস্থির হ'য়ে বলেন,—জামাইকে একখানা চিঠি লিখে দি, সে একবার আসুক।

সীতা বলে,—আসবে বৈ কি, মা. না, এসে সে থাকতে পারবে নাকি ?

—কই, এতোদিনে একখানা চিঠিও তো লিখলো না।

—তোমার কাছে আছি,—আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে,—চিন্তা করবার তাঁর সময় নেই।

—কিন্তু তার জন্যেও ত' আমাদের ভাবনা হয়।

—ভালোই তিনি আছেন, মা; আমি যখন কাছে নেই, ভালোই তিনি থাকবেন।

—কিন্তু কী যে তোদের এই ঝগ্‌ড়া, বুঝতে পারি না। আমার ভয় করে।

—আমারও ভয় করতো, যদি রিক্ত হাতে আস্‌তাম। অমূল্য সম্পদ আমার হাতে—সেই জোরেই বেরিয়ে আসতে পারলাম। নইলে বিচ্ছিরি বদ্ধ ঘরে জ্বরে ভুগে-ভুগে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রে যেতাম ঠিক। বাঁচবার এমন ভয়ানক আকাঙ্ক্ষাও কখনো হ'তো না। আর কিছুকে কি একটুও আমি এখন ভয় করি ?

—কেন তোদের এমন ঝগড়া হলো ? জামাইর স্বভাব-চরিত্র ভালো ত' ?

—ছি, স্বভাব-চরিত্রের আমি কী বুঝি বলো ? তা বুঝবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না।

—তবে তাকে একটা চিঠি লিখ্‌ছিস না কেন ?

—তাঁরই তো আগে লেখবার কথা।

দিন গড়িয়ে-গড়িয়ে মাস পুরতে লাগলো। ততোই দেহ তার সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠছে। ততোই জঠরের অন্তরালে নবীন একটি প্রাণচাঞ্চল্য আর সম্বরণ মানতে চাইছে না। এতো রূপ তার নিজের চোখেই কুলিয়ে ওঠে না,—স্থির, ঘন, মন্থর,—যেন তপতীর কঠোর সুষমা! স্নায়ুতে-শিরায় পেশীতে-মজ্জায় সে নিঃশব্দে চীৎকার

করছে : আমাকে মুক্তি দাও, দাও মাটির আস্বাদ, দাও আর্তনাদ করবার অজস্র মুখরতা! যেন সেই দুরন্ত দুর্দ্ধর্ষ বিজয়ী ছোট-ছোট মুঠি তুলে সীতাকে আঘাত করছে, এ-পাশে ও-পাশে ন'ড়ে চ'ড়ে অবিরাম অস্থিরতা জানাচ্ছে—তার ভার ও অত্যাচার বহন ক'রে-ক'রে সীতা ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো।

নতুন সম্ভাবনার স্বপ্নে সীতার চোখের পাতা দুটি মধুলিপ্ত প্রজাপতির পাখার মতো ভারি হ'য়ে আসে। সেই তেতলার ওপর দেয়ালের হুকে ঝোলানো বেতের ছোট একটি দোল্‌না - ততোদিনে শীত প'ড়ে যাবে নিশ্চয় - মাথায় তার ছোট উলের টুপি, পায়ে উলের মোঝা—দোল্‌নার ওপর পুরন্দর নুয়ে পড়েছে ; তার চুল ধরবার জন্য সে ছোট-ছোট আঙুল বাড়াচ্ছে, মুখটা আরেকটু কাছে আনলেই নাকটা তার সে চুষি-কাঠি ভেবে চুষতে থাকবে। সীতার তখন কতো কাজ, অবকাশে কী চমৎকার পরিপূর্ণতা!

রঙ্গমঞ্চের পট আস্তে-আস্তে উঠে যাচ্ছে। এইবার নতুন অঙ্ক সুরু হ'বে! একটি শিশুর প্রবেশ!

পঁয়ত্রিশ

লাইফ-ইন্‌সিয়োরেন্স্‌

অনেক খুঁজে-পেতে কাছাকাছি এক ছুটির দিন দিলীপ পুরন্দরের সঙ্গে এসে দেখা করলে। পুরন্দর তার মেস্‌এর একলা ঘরে তক্তপোষে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। দরজা খোলা। দিলীপের জুতোর শব্দে তার ঘুম ভাঙলো না। ঘরে একটা চেয়ার নেই যে বসা যায়। অগত্যা দিলীপ পুরন্দরের গা বাঁচিয়ে চৌকির ওপরই বসলো। বিকেল হ'য়ে এলো—এখুনিই হয় ত জাগবে।

দড়িতে নোংরা কয়েকখানা কাপড় ঝুলছে, পেরেকে লট্‌কানো পাঞ্জাবির পিঠে চাপ্‌টা একটা হলুদ দাগ, সু-জোড়ায় বহুদিন কালি পড়ে নি, চিরুনির দাড়াগুলি ভেঙে যাচ্ছে। পুরন্দরের চেহারায়ো সেই সবল পৌরুষ নেই, কয় দিন দাড়ি কামায় নি, গায়ে একটা গেঞ্জি নেই—সারা শরীরে কেমন একটা ক্লিষ্ট কাতর ভাব গাঢ় হ'য়ে চামড়ার সঙ্গে মিশে আছে। ঘরে আশে-পাশে কোথাও একটা বই বা খবরের কাগজ নেই যার পৃষ্ঠা উলটে এই নিঃশব্দ প্রতীক্ষার অস্বস্তিটা সে একটু তরল ক'রে আনতে পারে।

টান হ'য়ে পাশ ফিরবার সময় পায়ের তলায় কিসের একটা বাধা পেয়ে পুরন্দরের ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ ভালো ক'রে মেলতে পারছে না এমনি বিরক্তিকর কৌতূহলে পুরন্দর জিগগেস করলো : কে?

—আমি।

—কে? দিলীপ? পুরন্দর চৌকির ওপর উঠে বসলো; এবং পাছে স্বরে বা মুখভাবে কোনোরকম চাঞ্চল্য দেখিয়ে বসে সেই ভয়ে বালিশের তলা থেকে দেয়াশলাই ও বিড়ি বা'র করলে। একটা বিড়ি ধরাতে তিন-তিনটা কাঠি খরচ ক'রে খানিকটা সে নিজেকে প্রকৃতিস্থ ক'রে আনলে। বিড়িটা টানতেই আবার নিবে গেলো। যাক্, হাতে আরো খানিকটা সময় এসে পড়েছে।

তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললে,—হাঁ, তারপর—কোথায় আছো তোমরা?

দিলীপ অতিশয় ক্লান্ত স্বরে বললে,—বৌদি তাঁর বাপের বাড়িতে, আমি আমাদের পোষ্ট-গ্র্যাডুয়েট্ মেস্‌এ। বৌদি ত তখুনিই তাঁর মা'র কাছে চ'লে গেলেন। কেন, তুমি কিছু খবর পাও নি?

বিড়িটা ফের নিবলো। ওটা ফেলে দিয়ে আরেকটা ধরিয়ে পুরন্দর বললে,—কে আমাকে খবর দেবে?

—কেন, বৌদি—বৌদি তোমাকে কোনো চিঠি লেখেন নি?

—আমাকে লিখতে যাবে কেন? তুমি চিঠি-ফিঠি কিছু পেলে? কেমন আছে আজকাল?

—কাল পেয়েছি একটা কার্ড। ভালোই আছেন এখন। জ্বর টর আর নেই।

হাত বাড়িয়ে পুরন্দর বললে,—দেখি, দেখি চিঠিটা। কী লিখেছে! লিখতে পারে নাকি একটু-আধটু? ক'টা বানান ভুল পেলে?

অলক্ষিতে পকেটে হাত দিয়ে মুখ কাঁচু-মাচু ক'রে দিলীপ বললে,—চিঠিটা ত' সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসিনি।

মুহূর্তে পুরন্দরের মুখ ম্লান হ'য়ে এলো। বিড়িটাতে খুব ক'সে তিন চরটে টান্ দিয়ে অন্যমনস্কের মতো বললে,—চিঠিতে আরো অনেক সব লেখা ছিলো বুঝি? আমায় বুঝি বলবে না, না?

—লেখা ছিলো, চিঠি পাওয়ামাত্রই তোমার সঙ্গে যেন দেখা করি। আমি লিখেছিলাম কি-না, তোমার বাপের বাড়ি যাবার সংবাদটা এখনো দাদাকে জানানো হয় নি—তাই তিনি ব্যস্ত হ'য়ে আমাকে এই হুকুম ক'রে পাঠিয়েছেন। অমান্য করবার জোর পেলাম না।

—এ ছাড়া আর কিছুই লেখে নি?

—আর কী লেখবার আছে?

—বা, আমি কেমন আছি, আমার দিন কী ক'রে কাটছে, মদ খেয়ে এখনো টাকা উড়োই কি না—কিছু সে জান্‌তে চায় নি?

দিলীপ স্তম্ভিতের মতো পুরন্দরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

বিড়িটা যে ফের নিবে গেছে পুরন্দরের লক্ষ্য নেই। বললে,—তা ছাড়া ওখানে আছে—এ-কথা আমাকে নিজে লিখে জানালে বুঝি তার জাত যেতো? তোকে এতোটা ধাওয়া করালে?

ঢোঁক গিলে দিলীপ বললে,—তোমাকে লেখাই ত' উচিত ছিলো।

—ছিলো না? অসুখে প'ড়ে বাপের বাড়ি গেলে—তাদের অবস্থাও কিছু ভালো নয়,—যে-কোন সময়ে টাকা পয়সার দরকার পড়তে পারে। তা ছাড়া, একখানা কাপড়ো সে নিয়ে যায় নি, হাতের চুড়ি ক' গাছও খুলে রেখে গেছে—বাপের বাড়িতে সেইটেই বুঝি খুব সম্মানের কথা?

কী বলবে দিলীপ কিছুই ভেবে পেলো না। পরে বললে,—এবার তুমি তাঁকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও—নিশ্চয়ই খুব অভাবে পড়েছেন।

দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে পুরন্দর বললে,—আমার ব'য়ে গেছে। সে চাইতে পারে না। স্বামীর কাছে টাকা চাইতে তার লজ্জা করে?

খানিক থেমে আবার বিড়িটা ধরিয়ে সে বললে,—এখন কী-ই বা আমার খরচ। মাইনে যা পাই তার বেশির ভাগই ত' এখন ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা হয়।

—ব্যাঙ্কে জমা করো? দিলীপ অবাক হ'য়ে গেলো।

—তা ছাড়া কী করতে পারি? সম্প্রতি একটা লাইফ্-ইন্সিয়োরেন্স্ও ক'রে ফেলেছি। কখন ম'রে যাই ঠিক কী!

দিলীপের মন সহানুভূতিতে নরম হ'য়ে এলো। বললে,—কিন্তু কাপড় চোপড়ের এ কী চেহারা ক'রে রেখেছ?

অল্প একটু হেসে পুরন্দর বললে,—উপায় কি! বিয়ের পর কোনোদিন ত' নিজেকে নিয়ে এমন একা হ'য়ে যাইনি। আদিকাণ্ডে পাঁচ-সাতটা চাকর-বাকর ছিলো, তারাই সব তদারক করতো, অরণ্যকাণ্ডে সীতাই ছিলো সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—কোথায় কী অভাব টেরও পেতাম না—এখন একেবারে লঙ্কাকাণ্ড সুরু হ'য়ে গেছে। কাপড়-চোপড় কেই বা এতো লক্ষ্য করে? দিন যা-ক'রে একরকম কেটে গেলেই হলো।

দিলীপ বললে,—ও-বাড়ির জিনিসপত্র সব কী করলে?

—বেচে দিলাম।

—বেচলে?

—হ্যাঁ, অনাবশ্যক ভার বাড়িয়ে লাভ কী! ফাঁকা যখন হ'লামই, তখন উপকরণ না-কমিয়ে উপায় নেই! তখন একসঙ্গে কিছু মোটা টাকা হাতে এসে

পড়তেই ব্যাঙ্কে রাখবার কথাটা মনে পড়লো। সেই থেকেই থাই-খরচ বাদ কিছু-না-কিছু প্রতি মাসেই জমাচ্ছি। কখন কী দরকার পড়বে বলা যায় না আগে থেকে। হ্যাঁ, চলো, তোমাকে নিয়ে একটু সিনেমা দেখে আসি। যাবে?

—চলো।

জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে পুরন্দর বললে,—তোমার বৌদিকে যদি চিঠি লিখতে হয় ব'লে দিয়ো তার কোনো জিনিসেই আমি হাত দিই নি। টায়ে-টায়ে সব সে মিলিয়ে নিতে পারে ইচ্ছে করলে।

দিলীপ হেসে বললে,—তাঁর সব জিনিসই ত' তোমার জিনিস। তাই ত' কিছু ফিরিয়ে নিচ্ছেন না।

—কা'র জিনিসই বা কে ফিরিয়ে নিতে পারে? না, তোমাকে চিঠি লিখতে হ'বে না, দিলীপ।

দিলীপ বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলে: কেন?

মাথাটা আঁচড়ে নিতে-নিতে পুরন্দর বললে,—চিঠি লিখতে বসলেই ত' তুমি অনেক সব অবান্তর কথা ব'লে বসবে। না, দরকার নেই—তুমি আবার কবি।

পুরন্দরের কথাটা কী লক্ষ্য করছে বুঝতে না পেরে দিলীপ বললে,—সংযম না শিখলে সে আবার কবি কী!

—তা হোক্, তবু চিঠি লিখতে গিয়ে এ-কথা অনায়াসেই উঠবে যে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিলো। আমি আজকাল ব্যাঙ্কে টাকা জমাচ্ছি ও কাপড়-চোপড় ময়লা রেখে দাড়ি না কামিয়ে সন্ন্যাসের প্রথম পাঠ প্রায় শেষ করলাম—এ-কথা ত' তুমি লিখবেই, এমন-কি তোমার মন-গড়া কারণো একটা আরোপ ক'রে বসবে। সব চেয়ে মারাত্মক হ'বে এই, তুমি না-লিখে ছাড়বে না: দাদা ভালো আছেন। অর্থাৎ বেঁচে আছেন। দরকার নেই চিঠি লিখে। ইচ্ছে হয় নিজে এসে দেখে যাক্। চলো। দাঁড়াও, তালা দিয়ে নি।

দরজায় তালা লাগাতে-লাগাতে পুরন্দর বললে,—তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভালোই হলো। যাক্, ভালো আছে, এই ঢের।

পরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বললে,—চিঠি ফস্ ক'রে লিখে বসো না, দিলীপ। খবরদার। আর যদি লেখই, আমাকে দেখিয়ে নিয়ো। দরকার হ'লে একটু মাষ্টারি করতে পারে।

দিলীপ বললে,—আচ্ছা।

হ্যাঁ, বৌদির সঙ্গে-সঙ্গে দাদার কথাটাও একটু মাস্ত কোরো।

ছত্রিশ

আভ্যুদয়িক

পট-পরিবর্তনের সময় হ'য়ে এলো। সন্ধ্যা হ'তেই সীতার ব্যথা উঠেছে।

বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে যেটা নোংরা ঘর, সেইখানে একটা নড়বড়ে তক্তাপাষের ওপর ছেঁড়া একটা পাটি পেতে শুয়ে সীতা সন্তানের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। বুড়ি ধাই এলো অপরিচ্ছন্ন হাতে, ছেঁড়া-খোঁড়া ময়লা কাপড়ে।

তীব্র যন্ত্রণায় সীতা চীৎকার করছে, কোমর থেকে পা অব্ধি তার খ'সে পড়লো। একটু গোঙায়, আর থেকে-থেকে চারদিকের স্তব্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে, চীৎকার ক'রে ওঠে। একজন ডাক্তারো এসে পৌঁছুলো, পরীক্ষা ক'রে দেখলে কোনো ভয় নেই। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই হ'য়ে যাবে।

কারাগার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বন্দী কয়েদি দেয়ালে মাথা কুটছে,—সীতার শরীর নির্মম আঘাতে কাঁচের বাসনের মতো গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে গেলো। সত্যিই সে এবার ম'রে যাবে—সন্তানকে দেখে যেতে পারবে না। পুরন্দর এখন কোথায়? হয় ত' নিশ্চিত মনে ব'সে বিড়ি ফুঁকছে।

নদীর প্রমত্ত অভিঘাতে পারের মাটি যেমন চিড় ধ'রে গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে ধ্ব'সে পড়ে, তেমনি সীতার দেহ দুর্দমনীয় বেদনার ঢেউয়ে ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। আর সে সইতে পারবে না। চোখের সামনে সব কেমন নিমেষে তন্দ্রার কুয়াশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো।

আবার সেই নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর ব্যথা। তীব্র আর্ত্তনাদ ক'রে সীতা অন্ধকারের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাকেও এবার মুক্তি দেওয়া হোক্। কা'র মুক্তির জন্য অকাতরে সে দেহের এই মূল্য দিচ্ছে—এই বেদনার অর্ঘ্য! এর বিনিময়ে কী সে না জানি পাবে! প্রত্যেক সৃষ্টির পেছনেই ত' এমনি একটা বেদনার সুদীর্ঘ আয়োজন আছে, নইলে আর সৃষ্টির মাহাত্ম্য কী!

সীতা পাগলের মতো চীৎকার ক'রে উঠলো। মা অতিকষ্টে শিয়রে ব'সে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ সীতার মনে হলো মাটির তলা থেকে গাছের শিকড় যেমন উদ্ধত মাথা তুলে সমস্ত মাটি শত-চির ক'রে দেয়, তেমনি তার দেহের মাংসগুলিও যেন কার আবির্ভাবের বিদ্রোহে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সীতা যন্ত্রণায় অবশ হ'য়ে প'ড়ে রইলো। ও মা, তার কান্না ফুরুতে-না-ফুরুতেই তার বিছানায় ও কে কাঁদে! একটি অপরিচিত স্বর। ঘরে যা লোক ছিলো তার চেয়ে হঠাৎ একজন বেড়ে গেছে।

মা, বৌঠান—সবাই মিলে পাঁচ-ঝাঁক উলু দিয়ে উঠলেন।

সীতা সেই উলুর সঙ্গে ছেলের কান্না মিলিয়ে শুনতে লাগলো। এবার তার একটু ঘুম আসবে।

পাড়ার স্বর্ণ-মাসি ঘরে আছেন। সীতাকে বললেন—ত্যাখ্ চেয়ে ত্যাখ্—কী সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছে।

আশে-পাশে কেউ কোথাও তাকে দেখছে কি না সীতা দেখে নিলো। তার-পর কেউ কোথাও নেই দেখে আস্তে-আস্তে পাশ ফিরে সে ছেলের দিকে মুখ ফেরালো। সমস্ত দেহে নতুন ক'রে নিবিড় স্বাদ এসেছে—ছেলের দিকে চেয়ে স্নেহের অমিতোচ্ছ্বাসে সর্ব্বাঙ্গ তার টন-টন্ ক'রে উঠলো। লম্বায় মাত্র আধ-হাত, চোখ পুট্‌পুট্ করছে, আর এখুনি তার প্রচণ্ড ক্ষুধা, এখুনি তার টন্‌টনে আরামজ্ঞান! ওর দিকে চেয়ে সীতার ভারি মজা লাগে,—কেমন ক'রে এতো দিন এই ছোট মাংসপিণ্ডটা তার ভিতরে লুকিয়ে ছিলো, যেই মাটিতে পড়লো, অমনি তার নিশ্বাস ফেলবার প্রয়াস, ক্ষুধার জন্যে কান্না! সৃষ্টির কোথাও এতোটুকু ত্রুটি ঘটে নি, কচি অঙ্কুরের মতো হাতে-পায়ের সব ক'টি আঙুলই অটুট আছে, হৃৎপিণ্ডটি অতি-অস্ফুট শব্দে ধুক্-ধুক্ করছে,—আর আবার এই কণ্ঠে একদিন ফুটবে ভাষা, চোখে স্বপ্ন, দুই বাহুতে জাগবে বলিষ্ঠ কামনা, বাধাকে পরাভূত করবার প্রবল পিপাসা।

দু' দিন যেতে-যেতেই সীতার দুই বুক ভ'রে সুধা উপচে পড়লো। দুষ্টু ছেলে একটা দিন মধু খেয়ে ছিলো, আজ মায়ের বুকে মুখ দিয়ে তার কান্না জুড়িয়েছে। ছোট-ছোট ঠোঁট ও মাড়ি দিয়ে ছেলে তার খাদ্য সংগ্রহ করছে মায়ের বুক থেকে —অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখানুভূতিতে সীতার শরীরে গাঢ় একটি আবেশ আসে। পুরন্দর এসে এখন একবার তাকে দেখে যাক্।

কিন্তু ছেলেটা ভারি দুর্ব্বল হয়েছে—একেবারে এতোটুকু। সীতার মনে হলো ছেলে পাবার এই কামনা সে কোনোদিনই তাদের মিলনের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেয় নি। নিজেকে চিরকালই সে ছেলের থেকে অস্পৃশ্য রেখেছে। অথচ এর মতো সুন্দর, এর মতো সুখরোমাঞ্চময়, এর মতো মহাকাম্য আর কী থাকতে পারে! কেউ কোথাও লুকিয়ে কিছু দেখছে কি না সেই বিষয়ে সাবধান হ'য়ে সীতা তার কপালে, হাতের মুঠোয়, পায়ের তালুতে চুমু খায়। স্নেহের আতিশয্যে ছেলে অস্বস্তি বোধ ক'রে কেঁদে ওঠে; তাকে তক্ষুনি কোলে ক'রে তার চীৎকার-বিস্ফারিত মুখের মধ্যে স্তন দেয়।

ছেলেকে কোলে ক'রে সীতা কতো কথাই ভাবে। এই ছেলে তাদের

দু'জনেরই অকাঙ্ক্ষিত ছিলো, আপনার ইচ্ছায় জোর ক'রে এসেছে। পুরন্দর চেয়েছিলো ভোগ, সীতা চেয়েছিলো বিরাম,—পুরন্দরের কামনা অজস্র, অপার—সীতার কৃপণ, কুণ্ঠিত। তবু তাকে আসতে হলো দু'জনের মাঝে ব্যবধানটা সঙ্কীর্ণ ক'রে সেতু তুলে দিতে। কামনায় আনবে সে গাম্ভীর্য, আবেগের ওপর বুদ্ধির আলো পড়বে—নতুন ক'রে বাড়ির ও তার পরিপার্শ্বের, চিত্তের ও তার আবহাওয়ার রঙ ফেরাবে। কতো সুন্দর, কতো সুন্দর! মানিক, সোনা, চাঁদ, জাদু, —তোমার যে এতো রূপ, এতো অর্থ—আমার যে এতো রহস্য, এতো মহিমা কই আগে তা জানতাম বলো। সীতা ছেলেকে বুকে নিয়ে বাহু দোলাতে-দোলাতে তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে।

মা বললেন,—জামাইকে এবার লিখে জানাই। ছেলে হলো, আবার কী!

—এখনো সময় হয় নি, মা; ছেলে আমার বড়ো হোক—নিজে গিয়ে সিংহাসন দখল ক'রে বসবে।

—কী যে পাগলামি করিস।

—না, মা, আগে আঁতুড় থেকে বেরোই, একেবারে দু'জনে একসঙ্গে গিয়ে উদয় হ'বো। ছেলে তার বাপের চুলের ঝুটি ধ'রে টেনে, আঁচড়ে-কামড়ে ঠিক সায়েস্তা ক'রে দেবে। ঠাকুরপোর থেকে তাঁর সব খবরই ত' পাচ্ছি মা, ভালোই আছেন। তুমি ভাবনা করো কেন?

—কিন্তু সে ত' আর তোর খবর নিচ্ছে না।

—ঠাকুরপোর থেকে কোন্ না একটু নিচ্ছেন? প্রায়ই যখন দেখা হয় তখন একদিনো কি আমার কথা ওঠে না ভেবেছ? আর আমার কথা যদি না-ই উঠবে, তবে ঠাকুরপোই বা এতো ঘন-ঘন তাঁর কাছে যাবেন কেন?

—কিন্তু ছেলের এই ষষ্ঠী এসে গেল, ভাসুরপো খরচ-পত্র কিছুই করবে না।

—না করুন, ছেলে আমার কোনো উৎসবের অপেক্ষা রাখে না। আমাদের চেয়েও যারা গরিব তারা কী করে?

—তোর দেওর যে টাকা পাঠাতে চায়, তা তুই নিস না কেন?

—তার টাকা আমি নিতে যাবো কেন?

—তবে যার টাকা নিবি তাকে লিখলেই ত' পারিস।

—দরকার হ'লে লিখতে হ'বে বৈ কি।

—এখনো হয় নি দরকার? কী জানি বাপু তোদের কাণ্ড-কারখানা!

ষষ্ঠীর আগের দিন থেকেই ছেলে কেবল কাঁদছে। কেন যে কাঁদছে বোঝা দায়। তক্তপোষে ছারপোকা হয় ত'—পেট ব্যথা করছে, হয় ত' না-জানি কী—

বাপের দেখা পাবার জন্যেই বা কাঁদছে কি না কে বলতে পারে। নিজের শরীর এখনো শুকোয় নি, তবু সীতা দিন-রাত ছেলেকে কোলে ক'রে ব'সে থাকে, সময়ে-অসময়ে স্তন দেয়, অস্থির হ'য়ে ওঠে—কী যে করবে ভেবে পায় না।

আবার ডাক্তার এলো। বললে,—ভয় কি, মা? ছেলে কাঁদছে ব'লে এতো ভাবনা? কান্নাই ত' তার স্বাস্থ্যের পরিচয়।

সাঁইত্রিশ

মেঘ্‌লা রাতের ভোর

দিলীপের কেয়ারে পুরন্দরের নামে হঠাৎ সেদিন এক টেলি এসে হাজির: ছেলে হয়েছে, যদি দেখতে চাও ত' এসো। টেলি পেয়ে দিলীপ তখুনি মেস্‌এ ছুটলো।

খবরটা শুনে পুরন্দর বাইরে খানিকটা লজ্জিত হলো, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে সে গভীর তৃপ্তি অনুভব করছে। শুয়ে ছিলো, উঠে বসলো। বললে,—তবে কাল সকালেই বেরুতে হয়।

দিলীপ বললে,—যাবে তুমি?

—যাবো না? টেলিটা আমাকে করেছে ত'? পুরন্দর টেলিটা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখতে লাগলো: হ্যাঁ, আমাকেই ত'। আর না-যাওয়াটা কি ভালো দেখায়?

দিলীপ চুপ ক'রে রইলো। পুরন্দর বললে,—এখুনি তবে ব্যাঙ্কে যেতে হয়। নিজের নামে চেক্ কেটে কিছু টাকা তুলে নি। কতো ভাড়া সেখানকার?

—কতো—থার্ড-ক্লাসে এই টাকা ছ-সাত হ'বে।

—একশোটা টাকা তুলে নিলেই হ'বে—কী বলো? আবার ওদের নিয়ে আসতে হ'বে ত'? যদি অবিশ্যি আসে।

—দিলীপ কথা কইলো না।

পুরন্দর জামার বোতাম দিতে-দিতে বললে,—তুমিও আমার সঙ্গে চলো না।

একটু খানি হেসে দিলীপ বললে,—আমি গিয়ে কী করবো!

—বা, তোমাকে দেখলে তোমার বৌদি কতো খুসি হ'বেন। গেলে মন্দ কি। কলেজে প্রক্সির বন্দোবস্ত ক'রে নিলেই চলবে।

—সে-জন্যে কিছু নয়,—দিন কয়েক বাদেই ত' এক্‌স্‌-মাস।

—তবে আর-কি! পুরন্দর দিলীপের কাঁধ চাপড়ে দিলে: চলো চলো। দিব্যি হৈ-হৈ ক'রে যাওয়া যাবে 'খন।

পুরন্দরের উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দিলীপ বললে,—না, তোমাদের মাঝে ওখানে গিয়ে আমি করবো কী?

—বা, এতোদিন আমাদের মাঝেই তুমি ছিলে না?

—তা ছিলাম, কিন্তু এখন অন্য লোকই ত' এসে পড়লো। ব'লে দিলীপ হাসলে।

পুরন্দর গায়ের ওপর রং চটা ময়লা র‍্যাপারটা গুছোতে-গুছোতে বললে,—বুঝছ না, ছেলেপিলে নিয়ে ফেরা—শীতকালে একা-একা ভারি কষ্ট হ'বে।

—শীতটা সেখানে বেশ কাটিয়েই দিয়ে এসো না।

—বাবা, চাকরি নেই? এখন থেকে খরচ ত' আরো বেড়ে যাবে।

আমতা-আমতা ক'রে দিলীপ বললে,—তা একদিকে তেমনি খরচ ক'মেও যাবে এবার।

—হ্যাঁ, কমাতে হ'বে বৈ কি। বুঝে-সুঝে চলতে হ'বে। খবরদার দিলীপ, বিয়ে কোরো না।

—তোমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছ ত'? ব'লে দিলীপ হেসে উঠলো। বললে, —তোমাকে আমার বিশ্বাস হয় না।

—নাও, হয় না,—বিয়ে একবার ক'রে দেখ, তখন বুঝবে। আচ্ছা, এবার চলো। ক'টা বাজে এখন?

পাসের খবরের টেলি-পাওয়া কিশোর ছাত্রের মতো পুরন্দর অত্যন্ত লঘু পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

টেলিটা কতো শিগগির আসতে পেরেছে, অথচ তারই মতো তাড়াতাড়ি সে যেতে পারছে না। সমস্ত সন্ধ্যা-রাত্রি অপেক্ষা ক'রে তবে তাকে ট্রেন ধরতে হ'বে। সে-ট্রেন থেমে-বদ্‌লে শেষে পৌঁছুবে, প্রায় যখন মাঝরাত। ইস, এতোটা সময় তার কাটবে কী ক'রে? এতোদিন কী ক'রে কেটেছে? কী ক'রে যে কেটেছে কিছুতেই সে ভেবে উঠতে পারলো না।

সারা বিকেল ধ'রে সে কেবল ট্রাঙ্ক গুছোলো। কী-কী জিনিস নিতে পারে এক-কথায় কিছুতেই সে ঠিক করতে পারছে না। সীতার ট্রাঙ্ক খুলে কিছু গরম-জামা-কাপড় সে অবিশ্যি নিলে—এখানি কবেকার পুরোনো; এই মাপের ফ্ল্যানেল-এর একটা সেমিজ নিলে হয়, আরেকটা পেটিকোট। কিছু ভ্যানিসিং ক্রিম্। কালীঘাট থেকে কিছু ঝুমঝুমি, গাটাপার্‌চা-র রঙিন একটা বল, আর সীতার

হাতে-করা ছোট ছোট সেই জামা ক'টি, সেই কাঁথা ক'খানা। কিছুই পুরন্দর ভোলে নি।

তারপর ভোর বেলা ট্যাক্সিতে সে যখন বাক্স-বিছানা সাজিয়ে বসলো, কে বলবে সে প্রথম-শ্বশুরগৃহযাত্রী জামাই নয়।

তারপর ট্রেনে উঠে সেই কেবল একঘেয়ে মাঠ, ষ্টিমারে উঠে সেই একঘেয়ে জল—পথ আর ফুরুতে চায় না। চাঁদপুরে নেমেও আবার সেই ট্রেন।

তার পর মেহের-কালীবাড়ি ষ্টেশনে সত্যিই যখন সে নামলো, তখন শীতের রাতে কোথাও একটা গরুর গাড়ি পাওয়া গেলো না। কাকে বা সে কী জিগগেস করবে? তবে সমস্ত রাতই তার এই খোলা ষ্টেশনে প'ড়ে থাকতে হ'বে নাকি? অসম্ভব।

অনেক কষ্টে একটা কুলি সে বাগাতে পারলে যা-হোক। দুনো বকসিস দিতেও পুরন্দর পেছ-পা হ'বে না। আজ এই রাতেই তার সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে হ'বে —যতো দূরই হোক না কেন, যতোই অন্ধকার থাক! কুলি মাথায় গামছার বিড়ে পাকিয়ে তাতে পুরন্দরের সাহায্যে বাক্স-বিছানা তুলে বললে,—সুরেন-ঠাকুরের বাড়ি বললেন ত'?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মাত্র সুরেন-ঠাকুরই বেঁচে আছেন। তাঁর খুড়োর নামই হচ্ছে রমাবল্লভ ঠাকুর। চিনিস ত'?

—হ্যাঁ, চলুন। লণ্ঠন একটা সঙ্গে নেই বাবু?

টর্চ একটা সে নিয়ে এলে পারতো; তখন খেয়াল হয় নি। পুরন্দর বললে,— চল দুর্গা ব'লে—ও, তুই মুসলমান নাকি? আল্লার নাম করতে-করতে এগো। পথ তিনিই দেখিয়ে নেবেন।

আগাগোড়া অন্ধকার—তায় ফাঁকা মাঠে হু-হু ক'রে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। পুরন্দরের গা-হাত-পা অসাড় হ'য়ে এলো, হাড়ে পর্য্যন্ত কাঁপুনি ধ'রে গেছে। তবু র‍্যাপার দিয়ে ভালো ক'রে গা ঢেকে কুঁজো হ'য়ে পুরন্দর কুলির মাথার বোঝা লক্ষ্য ক'রে-ক'রে এগিয়ে চললো।

যাক, এতোক্ষণে দুয়েকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। সব নিঝুম, ঘুমে বিভোর। একটি বাড়ির বেড়ার ফাঁকে আলোর একটু ইসারা দেখতে পেয়ে পুরন্দর আশ্বস্ত হলো। আরেক বাড়িতে কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। দু' জনে জেগে-জেগে কী যেন কথা কইছে। আরেক বাড়িতে কে যেন কাঁদছে—মেয়েমানুষের গলা। এই আরেকটা বাড়ি—দরজা জানলা বন্ধ, চালের উপর চালকুমড়ো হয়েছে। পুরন্দর কুলির মাথার বোঝা লক্ষ্য ক'রে-ক'রে এগিয়ে চললো।

কুলি হঠাৎ থেমে পড়লো। এই লাইনএ আর বাড়ি কই? পুরন্দর বললে,—কি রে?

কুলি বললে,—সুরেন-ঠাকুরের বাড়ি বললেন না?

—হ্যাঁ,—কতো বার বলবো? চিনিস না? পুরন্দর হাঁপিয়ে উঠলো: এখেনে জিগগেস বা কাকেই করা যায়?

—না, চিনি বৈ কি। পেছনে ফেলে এসেছি।

আবার তারা পেছনে ফিরতে লাগলো। কোন্ বাড়িটায় যে সীতা থাকতে পারে, কোন্‌টাতে যে তাকে মানায়, বাড়ির চেহারা দেখে পুরন্দর কিছুতেই তা ধারণা করতে পারে না।

কুলি থেমে বললে,—এই বাড়ি।

পুরন্দরের মুখ পাংশু ও কণ্ঠস্বর ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো। বললে,—এই বাড়ি কি রে? ভেতরে কে কাঁদছে শুনতে পাচ্ছিস্ না?

কুলি জোর গলায় বললে, হ্যাঁ, এই বাড়ি। ডেকে জিগ্‌গেস করুন না একবার।

শীতে—অন্ধকারে পুরন্দর স্তব্ধ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। শীত বা অন্ধকার · ও-সব কিছুই তার মনে হলো না। হ্যাঁ, এই বাড়িই বটে। সন্দেহ কি! আসতে তার কিছু দেরি হ'য়ে গেছে।

কুলির মাথা থেকে মোট-ঘাট বাড়ির সামনেকার জমিতে নামিয়ে পুরন্দর মনি-ব্যাগ খুলে তাকে তার পয়সা চুকিয়ে দিলে। বললে,—এবার তুই যা। বাড়ি ভুল হয় নি।

কুলি মাথার গামছা খুলে ফতুয়ার উপর জড়িয়ে নিয়ে চ'লে গেলো। পুরন্দর ট্রাঙ্কটার ওপর সেই মাঠের মধ্যে বাড়ির বেড়া ঘেঁসে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

হ্যাঁ, সীতার গলা। সে-গলা পুরন্দর ভোলে নি। রাজ্যহারা অনাথার মতো করুণ কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করছে:

—ওকে আমি কোনোদিন চাই নি মা, তাই ও অমন অভিমান ক'রে চ'লে গেলো। আমার খোকা আর নেই, যদি নাই থাকবে, কেন এলো তবে? বলো, কেন এলো? এখন আমি তাঁকে কী ক'রে মুখ দেখাবো? কী বলবো? আমার তবে কী রইলো, মা? আমি ত' তাঁর কাছে আবার তেমনি ফুরিয়ে গেলাম। কী দাম আর রইলো বলো? তারপর আবার থেমে। সত্যি মা, খোকন নেই? তোমরা টেলি তাঁকে ঠিক করেছিলে? কী বলেছিলে তাকে? ছেলের অসুখ ব'লে কিছু লেখোনি? আসবার সময় সত্যি গেছে? কেনই বা আর আসবেন?…খোকন

গেলো, মা ? ওকে ওরা জোর ক'রে আমার কোল থেকে কেন ছিনিয়ে নিয়ে গেলো ? কেন ওদের নিয়ে যেতে দিলে ?

কে যেন কাছে ব'সে সান্ত্বনা দিচ্ছে : রেখে কীই বা আর করতে ?

— তবু যতোক্ষণ না তিনি আসতেন আমি ওকে কোলে ক'রে রেখে দিতাম। তাঁকে দেখাতাম, মা,—ঠিক তাঁর মতো নাক, তাঁর মতো চোখ। আমার সেই শোভা তাঁকে দেখাতে পারলাম না, মা, তুমি আর কাউকে একটু এগিয়ে দেখতে বলো না, মা, বোধহয় সত্যিই ও মরেনি, এখনো বাঁচানো যেতে পারে। কলকাতায় থাকলে কতো বড়ো-বড়ো ডাক্তার আনতে পারতাম…

পুরন্দর বাইরে শীতে পাথরের মতো কঠিন হ'য়ে ব'সে রইলো।

আরেক জন কে বলছে : কী একটা ছা, তার জন্যে এমন হাঁক পেড়ে কান্না! আজকালকার মেয়েদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি। কেন, হয়েছে কী, সোমথ বয়েস—কতো আবার হ'বে। এমন দু'-পাঁচটা ফাউ কার না যায় শুনি ?

সীতা তাতে কান পাতে না, বলে : মা, তুমি কাউকে বলো না একবার দেখ্‌তে—ওকে আরেকবার আমার কাছে নিয়ে আসুক। আমার বুকটা ভীষণ টন্‌টন্ ক'রে উঠেছে, মা,—এখন যে ওর দুধ খাবার সময় হলো।

পুরন্দর একটু এগিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলে। ভিতর থেকে স্বরেন-দাদা রুক্ষ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন : কে ?

অভয়ময় পরিপূর্ণ গলায় পুরন্দর বললে,—আমি পুরন্দর। দরজা খুলুন।

ভিতরের কান্না হঠাৎ এক নিমেষে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো।

স্বরেন-দাদা দরজা খুলে দিলেন। পুরন্দর বললে,—বাইরে আমার জিনিস-গুলি আছে, কাউকে ভেতরে নিয়ে আসতে বলুন।

লোক কোথায় পাবেন, স্বরেন-দাদা নিজেই তুলে আনলেন। বিস্তর ভারি ট্রাঙ্ক। কী-কী জানি সব আছে!

পুরন্দর কান্না লক্ষ্য ক'রে বাইরের দাওয়ায় চ'লে এলো! দেখলে মাটির দাওয়ায় সীতা চুল ও কাপড় বিস্রস্ত ক'রে লুটিয়ে প'ড়ে আছে। মাথার কাছে মা ব'সে।

পুরন্দর কাছে এসে দাঁড়ালো। শব্দে সচকিত হ'য়ে সীতা মুখ তুললে। নিতান্ত করুণ অথচ নিরশ্রু কণ্ঠে বললে, জানো, খোকন চ'লে গেছে ? এই ঘণ্টা তিনেক আগে ?

পুরন্দর স্তব্ধ হ'য়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

জামাইকে দেখে মা সহসা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে উঠলেন। সীতার

চোখে কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই। অন্ধকারে নিস্তব্ধ মূর্তির দিকে চেয়ে বুকের তলা থেকে কতোকগুলি কাপড়-চোপড় বের ক'রে বললে,—এই দেখ খোকনের ফ্রক, এই তার বালিশ, ব'সে-ব'সে এতোদিন তার জন্যে এই কাঁথাটা সেলাই করেছিলাম—

পুরন্দর নত হ'য়ে সীতার শিথিল একখানি হাত ধ'রে সামান্য একটু আকর্ষণ করলে। বললে—ঠাণ্ডায় এখানে প'ড়ে আছো কেন? ঘরের ভেতর উঠে চলো। শরীর ত' তোমার ভালো নয়।

সীতা অসম্বৃত অবস্থায়ই পুরন্দরের হাত ধ'রে উঠে পড়লো।

দরজা ফাঁক ক'রে স্থরেন-দাদার স্ত্রী ফিক্-ফিক্ ক'রে হাসতে লাগলেন। মা'র শোক উথ্‌লে উঠেছে ব'লে তখনো তেমনি আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছেন। সামনের ঘরেই সীতা পুরন্দরকে বা পুরন্দর সীতাকে নিয়ে এলো। তক্তপোষে বসলো দু'জনে। আলো জ্বালাবার কথা মনেও হলো না।

পুরন্দর সীতাকে বাহুর মধ্যে ঘিরে ধরলো। সীতা পরিপূর্ণ সমর্পণের তৃপ্তিতে স্বামীর গালে চোখে চুলে ঘাড়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে-করতে কান্না-কাঁপা গলায় বললে,—খোকার ডাকে সত্যিই তুমি এসেছ? সত্যি?

পুরন্দর তাকে আরো ঘন ক'রে কাছে এনে শুকনো কপাল থেকে রুক্ষ চুলগুলি মাথার দিকে তুলে দিতে-দিতে গাঢ় গলায় বললে,—তোমাকে ছেড়ে কদ্দিন আর থাকতে পারি বলো?

সীতা পুরন্দরের কাঁধের ওপর মুখ গুঁজে রইলো। তার কী যে প্রচণ্ড দুঃখ এই মুহূর্তে আর-কিছু তার মনেই পড়লো না!

প্রথম প্রেম

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

অবতরণিকা

১

প্রকাণ্ড বাড়ি, দক্ষিণে দুর্দমনীয় নদী ভাঙিতে-ভাঙিতে সামনের বাগানের ধারে আসিয়া থামিয়া পড়িয়াছে। বহুদূরবিস্তৃত চর। আগে ছিল ফেনপঙ্কিল লোনা জলের ঢেউ, এখন তৃণহীন শূন্য মাঠের। দক্ষিণের অবারিত দাক্ষিণ্য - হাওয়ায় একেবারে উড়াইয়া নেয়।

বার্ধক্যে অতিকায় বাড়িটা জীর্ণ হইয়া আসিলেও তাহার মধ্যে অভিজাততার লক্ষণ স্পষ্ট ধরা পড়ে—ফটকে মণ্ডপে, এমন কি প্রাচীর-গাত্রে। একদিন এ-বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ লাগিয়া ছিল, দোল-দুর্গোৎসব হইতে শুরু করিয়া যম-পুকুরের ব্রতটি পর্যন্ত বাদ পড়িত না। এখন আর কিছুই নাই। পূজার বরাদ্দ টাকা উমাকান্ত এখন মদে উড়ায়।

বাড়ির মালিক এখন উমাকান্ত। বলিষ্ঠ দেহ, সর্ব অবয়বে উচ্ছ্বসিত দৃঢ়তা! বয়স ত্রিশের কোঠা পার হইয়াছে; অমায়িক প্রফুল্ল মুখ, কিন্তু চোখের দৃষ্টির অন্তরালে কি-একটা গূঢ় অবিশ্বাস ও সন্দেহের সঙ্কেত রহিয়াছে! উগ্রস্বভাব, উচ্ছৃঙ্খল—পরিণামের প্রতি একটি সবল ও দুঃসাহসিক উপেক্ষা।

সংসারে স্ত্রী সুমতি—আর বংশে বাতি দিবার জন্য নাবালক একটি শিশু। বিরাট পুরীর আনাচে-কানাচে পিসি-মাসির দল ছিটানো রহিয়াছে, উমাকান্তের সে-সব দিকে নজর নাই। সরকার তদারক করে, দাস-দাসীরা ছিনিমিনি খেলে, পিসি-মাসির দল কোঁদল করিয়া পাড়া ঝাঁকায়, আর সুমতি বধূটির মতো রোজ রাত্রে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনিয়া-গুনিয়া অবশেষে শয্যাপ্রান্তে বিধুর চন্দ্রলেখাটির মতো নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

উমাকান্ত কোনো কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না—খাও-দাও, পায়ের উপর পা তুলিয়া হাই তোল—সংসারে কে বা কাহার, কোথায়ই বা কে!

চক্ষু বুজিলেই ফক্কিকার!

অতএব—

উমাকান্ত মদের বোতল লইয়া বাহিরের বৈঠকখানা হইতে একেবারে শুইবার ঘরে আসিয়া হাজির হইল। ঘরে ঢুকিয়া কাণ্ড দেখিয়া সুমতির চক্ষু স্থির! কোনদিন স্বামীর বিরুদ্ধবাদিনী হয় নাই, শুধু সঙ্গবিমুখ থাকিয়া তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা হইতে সন্তর্পণে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু আজ আর সহিল না। সমানে আগাইয়া আসিল কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল: এ সব হচ্ছে কী?

নিতান্ত নির্লিপ্তের মতো উমাকান্ত কহিল—দেখতেই তো পাচ্ছ।

সুমতি মদের বোতলটা সহসা কাড়িয়া নিয়া কহিল—এতদিন স্বচক্ষে দেখতে না পেলেও বুঝতে আমার আর কিছু বাকি ছিলো না। কিন্তু সব-কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত।

উমাকান্ত হাসিয়া কহিল—সব-কিছুরই সীমা হয়তো একটা আছে, কিন্তু মদ ও মন—দুয়েরই কোনো মাত্রা নেই। দাও, বাইরে যদি চলে, ঘরেও চলবে। বাইরে এত ভাগীদার জোটে যে তলানি ছাড়া কিছুই বড়ো আর জিভে ঠেকে না। দাও। সুমতি দুই পা পিছাইয়া গেল: এ ঘর আমার, এর শুচিতা আমি নষ্ট হতে দেব না।

—কবিত্ব করে বলছ বটে, কিন্তু দায়ভাগের বিধান অনুসারে আমি স্বচ্ছন্দে তোমার দায় থেকে মুক্ত হতে পারি জানো? দাও, ইয়ার্কি করো না। তোমার ঘরের শুচিতা রাখবার জন্যেই তো বন্ধুদের আর এখানে নিয়ে আসিনি। তারা এতক্ষণে হয়তো বৈঠকখানাটাকে ইন্দ্রসভা বানিয়ে ফেলেছে।

—যাও না সেখানে, এখানে মরতে এসেছ কেন?

উমাকান্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই উদাসীন স্বরে কহিল—মরতে ঠিক তোমার কাছে ফিরে আসবো কি না তার কোনো ঠিকানা নেই। কেননা সুমতি আমার হবে না কোনোদিন।

কথার সুরে করুণ একটি বেদনাভাসের পরিচয় পাইয়া সুমতি নিজের রূঢ় ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইল। কহিল—কিন্তু এমন উচ্ছৃঙ্খল হলে মরবার আর বাকি কী?

—যেটুকু বাকি আছে সেই ক'টি মুহূর্তকেই ফেনিল করে যাই, সুমতি। দাও, তোমার যৌবনের চেয়ে এই রঙিন বোতলটায় বেশি স্বাদ। বলিয়া বোতলটা ছিনাইয়া লইবার জন্য উমাকান্ত সহসা স্ত্রীকে জড়াইয়া ধরিল।

সুমতি সেই আলিঙ্গনে বশ্যতা স্বীকার করিল বটে, কিন্তু সামনের খোলা জানালা দিয়া বোতলটা বাহিরের উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

উমাকান্ত স্ত্রীকে ছাড়িয়া দিয়া জানালায় ঝুঁকিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল: আহাহা! মদটার কত দাম জানো? তোমাকে ত্যাগ করে বছরে তোমাকে ঐ টাকায় খোরপোশ দিলে তুমি নেহাৎ অসন্তুষ্ট হতে না। কিন্তু তোমাকে ত্যাগ করতে চাই না বলেই তো তোমার শরণ নিয়েছিলাম। কৈ তুমি আমাকে এই পাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে, না, আবার তারি দিকে ঠেলে দিচ্ছ। এখন আমার বন্ধুদের মহলে না গিয়ে আর উপায় কি! মদের সঙ্গে তোমার উপদেশ

আর পাক্ক করে খাওয়া হল না। কে জানে হয়তো একসময় তোমার উপদেশেই বেশি নেশা লেগে যেত। মদ যেত মিইয়ে।

বলিয়া সে দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিল : বোতলটা যখন শব্দ করে ভেঙে গেলো, তখন তার আর্তনাদটা কেমন চমৎকার লেগেছিলো বল তো। আমি মরে গেলে তুমি অমনি অকপটে চীৎকার করতে পারবে?

স্বামী অন্তর্হিত হইয়া গেলে সুমতি দুই চোখে আর পথ খুঁজিয়া পাইল না। স্বামীকে সে কী করিয়া ফিরাইবে? উপদেশ শুনিলে উপহাস করেন; স্ত্রীর পক্ষে পরমতম শাসন সহশয়নবিমুখতা—তাহাতেও উমাকান্তের অরুচি নাই। অশ্রুজল? উমাকান্ত প্রবোধ দিয়া বলে : লোনা জলে এমন সোনালী নেশা তুমি মাটি কোরো না, লক্ষ্মীটি। তবে কি সুমতি আত্মহত্যা করিবে? তাহাতে উমাকান্ত নামের সঙ্গতি রাখিয়া একেবারে উদভ্রান্ত হইয়া যাইবে আর কি! বরং বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়িবে মাত্র। এক ফাঁকে একটি চারুবর্ধনা কিশোরীর মুখমদিরা পান করিয়া ফিকে রাত্রিগুলা সে রঙিন করিয়া তুলিবে মাত্র। স্বামীকে সুমতি এইভাবে জিতিতে দিবে না।

দেয়ালের বড়ো আয়নাটাতে ছায়া পড়িতেই সুমতি থামিল। সে যে কত সুন্দর এই কথা কোনো পুরুষের মুখে শুনিয়া সে রোমাঞ্চিত হইতে চায় না, নিজেরই রূপে সে অন্তরে-দেহে একটি স্বাদময় স্নিগ্ধ মাদকতা অনুভব করিল। যৌবন আজ তাহার বর্ণলীলায় উজ্জ্বল নয়, একটি স্থির শ্যামল সুষমা তাহার যৌবনকে শীতল, সুচিস্মিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রগল্‌ভ প্রাচুর্য নয়, একটি অবারিত স্নিগ্ধতা! মুখমণ্ডল মাতৃত্বমণ্ডিত, পাতিব্রত্যের দীপ্তি ললাটে বিচ্ছুরিত হইতেছে। দেহ তার লাবণ্যের নদী নয়, লাবণ্যের লেখা!

কিন্তু এই ধীর-নীর প্রশান্ত হ্রদে উমাকান্ত অবগাহন করে না; সে চায় উত্তরঙ্গ ফেনসঙ্কুল বিশাল সমুদ্র! সে চায় আবর্তময় পরিবর্তন। সে চায় চঞ্চলতা!

উমাকান্ত আজকাল শুইবার ঘরে বসিয়াই মদ খায়। প্রসাদভোজী বন্ধুদের সংসর্গ হইতে স্বামীকে সরাইয়া আনিলেও শয়নগৃহ সুমতির কাছে সুখস্বর্গ হইয়া উঠে নাই।

তবু স্বামীকে নিজের কাছে বসাইয়া গ্লাশে মদ ঢালিয়া দিতে সে একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। প্রতিদিন একটু-একটু করিয়া পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু একটা বোতল কখন সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইবে এ সম্বন্ধে উমাকান্তের অটুট দিব্যজ্ঞান দেখিয়া সুমতি হতাশ হয়।

খামখেয়ালি মাতালের নির্লজ্জ আবদার রাখিতে গিয়া সুমতি একেবারে দেউলে

হইয়া পড়ে। শালীনতার খোলসটুকুও বিসর্জন দিতে হয়। তবু স্বামীকে সে বিপণিবীথিকার ক্রেতা হইতে দিবে না।

উমাকান্ত বলে : এইবার নাচটা শিখতে পারলেই তোমাকে সোনার ঘুঙুর গড়িয়ে দেব, সুমতি! তোমাদের যে বেহুলা, সেও স্বামীর জন্যে স্বর্গসভায় গিয়ে নেচেছিলো, খবরটা রাখ তো?

স্বামীকে অবশেষে ঘুম পাড়াইয়া অসহায় সুমতি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে বসে। স্বামীর জন্যে নয়, সন্তানের জন্য। মানব যেন মানুষ হয়। মানব যেন মায়ের মান রাখিতে পারে।

দিনের পর দিন এই কুৎসিত একঘেয়েমি সুমতিকে ক্লান্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু একদিন তাহার আর সহিল না। স্পষ্ট করিয়া প্রখরকণ্ঠে সে কহিল—মদ আজ আর পাচ্ছ না।

উমাকান্ত বিচলিত হইল না, কোঁচাটা ঝাড়িয়া গোঁফের দুই প্রান্তে তা দিতে-দিতে সে খাটের উপর বসিল। মৃদু-মৃদু হাসিয়া কহিল—আজকে মহারাণীর হঠাৎ এই কার্পণ্য কেন? আমাকে অন্তর থেকে বর্জন করতে গিয়ে একেবারে অন্দর থেকেই তাড়িয়ে দিতে চাও নাকি?

সুমতি স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল—তুমি সর্বনাশের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছ, জানো?

উমাকান্ত হাসিয়া কহিল—যার সর্ব আছে, তারই সর্বনাশের নেশা করতে সাধ যায়, সুমতি। যার কিছুই নেই সেই নেংটি পরে সন্ন্যাসী সাজে, তাতে তার খর্বতার সমর্থনও সহজেই মিলে যায়। স্বভাবেই যে ক্লীব, সহজেই সে ব্রহ্মচারী!

সুমতি দৃঢ়ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া বলিল—অতশত আমি বুঝি না। মদের জন্যে তুমি নাকি আজকাল ধার করতে শুরু করেছ?

—আজকাল মানে? বহুদিন থেকে। খবরটা তুমি আজ পেলে বুঝি? তোমার শ্বশুরকুলের এত সুবুদ্ধি ছিল না সুমতি, যে, আমার এই রসের জন্যে অপর্যাপ্ত রসদ যোগান। কয়েক বিঘে জমি আর এই বাড়িটকু! দাম কষে দেখলে মোটমাট পাঁচ লাখ পেগ মাত্র। দিনে আট-দশ পেগ সাবাড় করলে কত দিনে সম্পত্তি পটল তোলে একটা হিসেব করে দেখ না।

সুমতি ভয়ার্তকণ্ঠে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল : তুমি এ বলছ কী? এমনি করে তুমি সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে দিতে বসেছ নাকি?

উমাকান্ত নির্লিপ্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল : তোমার শ্বশুরের হাতে সম্পত্তিটা উড়েই এসেছিলো। যা উড়ে আসে তা কখনো জুড়ে বসে না, সুমতি। প্রজা

ঠেঙিয়ে, তাদের পাকা ধানে মই দিয়ে, খাজনা না পেয়ে তার প্রতিবিধানে নারীর অমর্যাদা করে, খুন-খারাপি, লুঠ-তরাজ, দাঙ্গা-লড়াই—সব কিছু সাবেকি অত্যাচার করেই আমার প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেব এই ঐহিক কীর্তিটি অর্জন করেছিলেন। এ-গ্রামে ভুলে এখনো কেউ তাঁর নাম নিলে তাকে নাকি উপোস করতে হয়। কত লোকের অভিশাপ কুড়িয়ে তাঁর এই সম্পত্তি—আমার হাতে এর চেয়ে আর কী এমন সদ্ব্যয় হতে পারতো? আমি তাঁরই উপযুক্ত উত্তরাধিকারী—একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি।

বলিয়াই উমাকান্ত অজস্র হাসিতে রুদ্ধশ্বাস ঘরের অটল স্তব্ধতাকে চূর্ণ-চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

খানিকক্ষণ সুমতি কথা কহিতে পারিল না। অপলকে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—সে-মুখে চিন্তা বা অনুশোচনার একটিও ক্ষীণ রেখা নাই, অনির্ণীত ভবিষ্যতের দুঃখ-দুর্দশার চির-রাত্রির ছায়া সেই মুখকে ম্লান করে নাই—সে-মুখ পাষাণ-ফলকে খোদিত রেখামূর্তির মতো প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ! উমাকান্ত তার স্ত্রীর হাতে একটা ছোট ঠেলা দিয়া অনুনয় করিয়া কহিল—নিয়ে এসো। বিধাতা নারীদেহলতিকায় যেমন মধু দিয়েছেন তেমনি দ্রাক্ষালতায় দিয়েছেন মদিরা। লগ্ন যে উৎরে যাচ্ছে, সুমতি।

সুমতি সরিয়া বসিল; কহিল—কিন্তু মানবের কী হবে?

উমাকান্তের সেই উদাসীন কণ্ঠ: যা হবার তাই হবে। সে-ভাবনা ভেবে এই সোনার সন্ধ্যাটা তুমি ঘোলাটে করে তুলো না। দাও, চাবিটা আমাকেই দাও না-হয়।

বলিয়া উমাকান্ত সুমতির আঁচল চাপিয়া ধরিল।

সুমতি আঁচলটাকে শিথিলতর করিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল: তুমি মানুকে পথে বসাতে চাও নাকি?

উমাকান্ত সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল—যদি নিতান্ত ভয় না পাও, তো বলি, মানুকে আমি পথেই বসিয়ে যেতে চাই। যে-টাকা ও নিজে রোজগার করেনি, অনায়াসে তা লাভ করে তার বদলে ও যেন ওর মনুষ্যত্ব খুইয়ে না বসে! ওকে আমি একেবারে গরিব করে রেখে যেতে চাই। কিন্তু এ কথাগুলি নেহাৎ শাদা চোখে কইছি বলে তোমার কাছে নিশ্চয়ই খুব মানানসই ঠেকছে না, না? দাও চাবি।

উমাকান্ত শ্লথবদ্ধ আঁচলটা আরো জোরে আকর্ষণ করিল।

সুমতি বাঁকিয়া বসিল: কক্‌খনো দেব না।

—দেবে না মানে ?

—দেব না মানে দেব না। তুমি এমনি মদের গেলাশে সমস্ত সম্পত্তি ফুঁকে দেবে, মানুকে পথের ভিখিরি করে ছাড়বে—আর আমিই কি না পরিমাণ কমাবার চেষ্টায় তোমাকে নিজের হাতে মদ ঢেলে দেব! কক্‌খনো আর না, মরে গেলেও না। সরকার-মশায়ের খবরটা ভাসা-ভাসা করে পেয়েও তখনো বিশ্বাস করিনি।

উমাকান্ত পিশাচের মতো অট্টহাস্য করিয়া উঠিল: শুধু মানু নয়, দয়া করে তার মায়ের কথাও মনে রেখো সুমতি। এই ঐশ্বর্য সম্ভোগ করবারই বা তোমার কি এমন অধিকার ছিলো? গরিবের ঘরের মেয়ে, দু' বেলা পেট পুরে খাওয়াও জুটতো না সব দিন—গাছের তলাটাই তো গন্তব্য ছিল! আঙুল ফুলে যে কলা-গাছ হয় তার এটা মনে রাখা ভালো—কলার ফসল একবারের বেশি ফলে না।

সুমতি দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল—আমার জন্যে তোমাকে কে বলতে এসেছে? কিন্তু সন্তানের বাপ হয়ে তুমি তার ভবিষ্যৎ এমন নষ্ট করে দিতে চাও—তুমি কি মানুষ?

উমাকান্ত কহিল—তোমার কাজ প্রসব করা, প্রস্তুত করা নয়। সে দায়িত্ব আমার, সে আমি বুঝবো।

—সেই বুঝেই তো এই সব কীর্তি করে চলেছ? লজ্জা করে না? বাপ সন্তানের চোখে কোথায় একটা ভালো দৃষ্টান্ত ধরে রাখে, তা নয় এ কী জঘন্য কদাচার!

উমাকান্ত বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া কহিল—আমার এই ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার মতো মহৎ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর কী হতে পারে? তুমি মেয়েমানুষ—এর মর্যাদা বোঝবার মতো তোমার মস্তিষ্ক নেই। কিন্তু বৃথা কথা কাটাকাটি করে তো কিছু লাভ নেই। আমার অনুরোধ যদি না শোনো তবে তোমার কোনো বাধাও আমি মানবো না।

সুমতি বিস্তৃত আঁচলটাকে বুকের উপর রাশীকৃত করিতে-করিতে স্বামীর কাছে আগাইয়া আসিল। অসহায়ের যে কণ্ঠস্বর সেই অনুনয়ময় ভাষায় সে কহিল—তুমি কিছুতেই কি এই অভ্যাস ছাড়তে পারো না?

উমাকান্তর ভাষা নিদারুণ, নিষ্ঠুর: কিছুতেই না, কোনো যুক্তিতেই না। যা আমার ভালো লাগে তাই আমার ধর্ম! তোমরা যাকে পাপ বলো সেই আমার ভালো লাগে। স্বাস্থ্যের ওজর তোল, বলবো পেট ফেঁপেও টেঁসে যেতে পারি। সমাজস্থিতের কথা তোল, বলবো যা সম্পূর্ণ আজ, তাই আমার সমাজ। অত

কাছে সরে এসো না। তোমার দৈহিক সান্নিধ্যে এত মাদকতা নেই যে তোমার দেহকেই আমি মদের গ্লাশ বলে চুমুক দেব।

উমাকান্ত সহসা স্ত্রীর হাত চাপিয়া ধরিল: আমাকে বাধা দেবার তোমার অধিকার আছে কি না জানি না, কিন্তু শক্তি নেই। চাবি দাও। পাকস্থলীতে 'লেবার মুভ্‌মেণ্ট' চলেছে।

সুমতি এক ঝট্‌কায় হাত কাড়িয়া নিয়া দূরে সরিয়া গেল: কক্‌খনো দেব না চাবি। দেখি তুমি কি করতে পারো।

উমাকান্ত কহিল—অনেক কিছুই করতে পারি। গায়ে হাত তুলতে পারি, ঘাড় ধরে দেউড়ির বার করে দিতে পারি, ইচ্ছা করলে টুঁটিটা টিপে ধরে বোবাও করে দিতে পারি। কিন্তু দু' পাত্র বেশি খাওয়া ছাড়া কিছুই হয় তো আমি করবো না। স্নায়ুগুলোকে অকারণে উত্তেজিত করতে ইচ্ছে নেই। লাভ কি?

সুমতি ঝংকার দিয়া উঠিল: কিন্তু আমি কি করতে পারি জানো?

—আফিং খেয়ে বড় জোর জুড়িয়ে যেতে পারো। লাভের মধ্যে মদ তা হলে আর জুড়োয় না কোনোদিন।

সুমতি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি মরে গেলে তুমি ফের বিয়ে করবে তো?

—বিয়ে করবার ইচ্ছে থাকলে তুমি বেঁচে থাকতেও করতে পারতাম। ওটায় বৈচিত্র্য নেই বলে স্বাদ নেই। তুমি যদি আমার স্ত্রী না হয়ে রক্ষিতা হতে তবে তোমার সম্পর্কে হয়তো মাধুর্য থাকতো! তুমি চলে যাচ্ছ কি রকম? চাবি দিয়ে যাও।

অপস্রিয়মান সুমতিকে উমাকান্ত ধরিয়া ফেলিল: এই তোমার প্রতিশোধের নমুনা? মাত্র ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া? মৌলিক আর কিছুই ভাবতে পারলে না?

—আমাকে কেটে ফেললেও আমি চাবি দেব না।

—বেশ, দিয়ো না। বলিয়া সুমতিকে ছাড়িয়া দিয়া উমাকান্ত কোনোদিকেই দৃকপাত না করিয়া একটা কাঠের চেয়ার তুলিয়া আলমারির উপরে জোরে ছুঁড়িয়া মারিল। পুরু কাঁচের দরজা—প্রবল ঘায়ে খান্‌-খান্‌ হইয়া গেল। ফাঁকের ভিতর হাত বাড়াইয়া স্কচ্‌ হুইস্কির বোতলটা বাহির করিতে তাহার দেরি হইল না।

বোতলের ছিপিটা দাঁতে কামড়াইয়া খুলিতে-খুলিতে উমাকান্ত কহিল—কাঁচের আলমারি তোমরাও, কিন্তু দেহের অন্তরালে এর মতো তোমাদের আত্মার সম্পদ কোথাও নেই, সুমতি। তোমরা অন্তঃসারশূন্য!

বোতলের মুখটা মুখ-গহ্বরে উমাকান্ত প্রায় উপুড় করিয়া ধরিবে, একটা স্পর্ধিত

ঈগলের মতো সুমতি দুই হাত তুলিয়া তাহার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বোতলটা মেঝের উপর ছিটকাইয়া চুরমার হইয়া গেল, উমাকান্তর জামা-কাপড়ের আর কোনো শ্রী রহিল না। উৎকট উগ্র গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

উমাকান্ত অসংযমী এ কথা কে বলিবে? ম্রিয়মান মুখে বোতলটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাসিয়া কহিল—ওর দুর্দশা দেখে আমার খালি একটা উপমা মনে পড়ছে, সুমতি। যৌবনে প্রথম প্রেম যখন ব্যর্থ হয় তখন তার বেদনার মূর্তিটা বোধ করি এমনিই। কিন্তু বাইরেই যখন আমাকে ঠেলে দিচ্ছ তখন আমাকেই আবার তোমার একদিন অনুগমন করতে হবে। বেশি আর দেরি নেই। হীরালাল মুখুজ্জে শিগগিরই আসচে ক্রোক করতে।

উমাকান্ত বাহিরের দরজা দিয়া অন্তর্ধান করিতেছিল, সুমতি সহসা তাহার পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া কাতর কাকুতিতে আর্তনাদ করিয়া উঠিল: তুমি যেয়ো না, দাঁড়াও—

উমাকান্ত দাঁড়াইল না।

২

রাত্রির পুঞ্জীকৃত স্তব্ধতা সরাইয়া অজস্র-বন্যায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল। খোলা জানালায় বসিয়া সুমতি কখন এই তামসী রাত্রির সঙ্গে মিতালি পাতাইয়াছে!

স্বামী কখন ফিরিয়া আসিবে তাহার জন্য সে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে নাই, সে প্রতীক্ষা করিতেছে আকাশপ্রান্তে তিমিরাপসরণের প্রথম রোমাঞ্চময় রঙিন মুহূর্তটিকে!

এই বর্ণচ্ছটাহীন আকাশ তাহার জীবন—এমনি মেঘ-মন্থর, বেদনা-বিহ্বল; এই করুণাহীন অন্ধকার তাহার স্বামি-সান্নিধ্যের বীভৎস প্রতিবেশ; তাহার সন্তান তাহার অসাড় আকাশে অরুণোদয়ের প্রথম-রোমাঞ্চময় রঙিন মুহূর্ত!

কত কথাই আজ সুমতির মনে পড়িতেছিল—কত দিনের কত অস্পষ্ট কাহিনী। অতীতের সেই সব মুহূর্তগুলি ম্রিয়মান চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সেই তাহার প্রথম বিবাহ-রাত্রি, স্তূপীকৃত বসনের অন্তরালে সে সেদিন সর্বাঙ্গে তারকিনী রাত্রির সুখাবেশ সম্ভোগ করিয়াছিল; তাহার পর স্বামীর প্রথম স্পর্শে সে সহসা প্রতি ধমনীতে রমণী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই শিহরণটি প্রত্যহের অভ্যাস মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার পর তাহার প্রথম সন্তান-

সম্ভাবনায় গৌরবময় স্বপ্ন! প্রতি রোমকূপে তাহার অমৃতস্বাদ! কিন্তু সেই অমৃত আজ মৃতস্বাদ হইয়া গিয়াছে।

সুমতি আর অমিতাচারী ব্যভিচারী স্বামীর স্ত্রী নয়, সন্তানের মাতা—একটি সুমহান আবির্ভাবের প্রসূতি। ঋষিকণ্ঠে যেমন সূক্তি, কবিচিত্তে যেমন ধ্যানছায়া, ভারতবর্ষের যেমন স্বাধীনতা—সুমতির তেমনি মানব। মানব তাহার মায়ের রচনা, মায়ের ধ্যান, মায়ের উপলব্ধি।

ঘুমের মধ্যে মানব হঠাৎ স্বপ্ন দেখিয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিতেই সুমতি তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিল, ডাকিল : মানু!

ঘুমের ঘোরে মানব সাড়া দিতে পারিল না। অতিললিত গভীর পরিচয়ের সুরে মানুষ যেমন করিয়া দেবতাকে ডাকে, তেমনি ভাবে কানের কাছে মুখ নিয়া সুমতি আবার ডাকিল : মানু!

এই ডাকেই সুমতির এতদিনের বঞ্চিত প্রার্থনায় সান্ত্বনা মিলে। এই ডাকটিই তাহার সফল স্বপ্ন! শৃংখলে ঝংকার!

মানু তো মাত্র এই শ্রাবণে আটের কোঠা ডিঙাইয়াছে। তবু তাহার দুই চোখের বাতায়নের মধ্য দিয়া সুমতি অনাবিষ্কৃত উন্মুক্ত আকাশের সন্ধান পায়।

রাত অনেক হইয়াছে, সুমতির ঘুম আসিতেছে না! হঠাৎ জানালার বাহিরে মানদাকে এদিকে আসিতে দেখিয়া সে একটু আশ্চর্য হইল। মানদা এ-বাড়ির পুরানো ঝি, বুকে করিয়া উমাকান্তকে সে মানুষ করিয়াছে। যদি উমাকান্তকে কেহ ধমক দিতে পারিত, তবে সে এই মানদাই। সুমতিরও তাহাকে সমীহ করিয়া চলিতে হয়।

মানদা জানালার কাছে আসিয়া সুমতিকে ঝাঁঝালো গলায় বকিয়া উঠিল : তুই কেমনতরো মেয়ে শুনি? সোয়ামিকে আবার বাইরে পাঠিয়েছিস্?

সুমতি ভয় পাইয়া দরজা খুলিয়া দালানে আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল—কেন, কি হয়েছে?

—কী হয়েছে? চুচ্চুরে মাতাল হয়ে এসে বাইরের ঘরে ফরাসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বললাম, শুতে চল, উমাকান্ত। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে উমাকান্ত বললে—সুমতি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, মানি-মা।

সুমতির বিস্ময়ের সীমা রহিল না· উনি কেঁদে উঠলেন? তুমি বল কি, মানি-মা? তুমি ওঁর চোখে জল দেখলে?

—দেখলাম না? স্ত্রী স্বামীকে তাড়িয়ে দরজায় খিল এঁটে দিলে কোন স্বামীর না দুঃখ হয়! তুই হাসছিস কি পোড়ারমুখি? কোথায় তুই তোর স্বামীকে আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখবি, না, তাকে নিয়ে তুই ঘুড়ি ওড়াচ্ছিস্। যা করুক, গায়ে তো আর তোর হাত তোলে না! রুপোর খাটে পা রেখে সোনার খাটে শুস্—এত দেমাক তোর কেমন করে হয়?

একটু মলিন হাসি সুমতির ঠোঁটের প্রান্তে ভাসিয়া উঠিল: তুমি বললে না কেন মানি-মা, ঐ স্ত্রীর চুলের ঝুঁটি ধরে এক্ষুনি ওটাকে হিড়-হিড় করে টেনে কাঁটা-বনে ফেলে দিয়ে এস। ওর সাধ্য কি তোমাকে বাধা দেয়? ওর সাধ্য কি তোমার মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে রাখে?

—বলিনি? একশো বার বলেছি। তোমারই তো ঘর দোর উমাকান্ত, সোনার সংসারে তোমারই তো সোনার সিংহাসন।

—উনি কি বললেন?

—সেই কান্না! খালি বলছে সুমতি আমাকে ডেকে না নিয়ে গেলে কখনোই আমি শুতে যাবো না, মানি-মা!

কথা শুনিয়া সুমতি একেবারে আকাশ হইতে পড়িল আর-কি: তুমি বলছ কী, মানি-মা? তুমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখে উঠে এলে নাকি?

—স্বপ্ন! মানদা সুমতির একটা হাত ধরিয়া তাহাকে সামনের দিকে টানিতে-টানিতে কহিল—তুই নিজের চোখে দেখবি আয়।

সুমতি হাসিয়া কহিল—নিজের চোখে অনেক দেখেছি, দেখতে-দেখতে চোখ আমার ক্ষয়ে গেছে।

—কিন্তু তোর জন্যে আজ সে কাঁদছে, দেখবি আয়। এর আগে দেখেছিস কোনোদিন?

—আমার জন্যে নয় মানি-মা, মাত্রাটা বোধহয় আজ বেশি হয়েছে।

—তবু বৈঠকখানায় একবার যাবি চল্।

—অত লোভ না দেখালেও আমাকে যেতে হতো। স্বামী মাতাল হয়ে বাইরের ঘরে পড়ে আছেন, আর আমি তাঁর সেবা করবো না? বমি কাচাবো না? সে আর বলতে! তুমি ততক্ষণ মানুর কাছে একটু বোস, আমি যাই, দেখি গিয়ে নিজের চোখে।

সুমতি নিজের অলক্ষিতেই বেশ-বাস বিন্যস্ত করিয়া লইল, সর্বাঙ্গে তাহার নূতন ব্রীড়ার মন্থরতা! দালান পার হইয়া তবে বৈঠকখানায় ঢুকিতে হইবে—অনেকটা পথ। এতটা পথ পার হইতে-হইতে সে তাহার স্নায়ু-শিরায় যেন

ঝংকার শুনিতেছে! বিবাহের পর প্রথম রাত্রি যাপন করিবার জন্য সে যেমন কুন্ঠিতকায়ে লজ্জাবিজড়িত পায়ে স্বামী-শয্যার সম্মুখীন হইয়াছিল—এ যেন তেমনি! প্রশস্ত ফরাশে স্বামী অসুস্থ শরীরে একা শুইয়া আছেন অর্ধ-অচেতন, ঘরের পুঞ্জিত অন্ধকার যেন সুমতিরই প্রতীক্ষার স্বপ্নে মৌনমগ্ন হইয়া আছে!

আকাশে খানিক-খানিক মেঘ করিয়াছে, তন্দ্রা-স্তিমিত চোখে দু-একটা তারা গাছের শিয়রে জ্বলিতেছে—সুমতিকে পরিবেষ্টন করিয়া একটি অনির্বচনীয় স্তব্ধতা—কুমারীর প্রথম প্রেমানুভবের মতো! আজিকার এই রাত্রি, মেঘঘন ম্লান মুহূর্ত ক'টি, এই একটি গোপনলালিত ভঙ্গুর আশা—সুমতি সর্বদেহ ঘিরিয়া যৌবনের একটি প্রখর ও স্পন্দমান শিহরণ অনুভব করিল! স্বামী তাহাকে ডাকিয়াছেন—এই তাহার আকাশময় ঐশ্বর্য! মানদা কি আর গায়ে পড়িয়া মিথ্যা কথা বলিতে আসিয়াছিল?

বৈঠকখানার দরজার কাছে আসিয়া সুমতি থামিল। ভিতর হইতে একটা চাপা পরিশ্রান্ত আর্তস্বর কানে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি ভেজানো দরজাটা ধাক্কা মারিয়া খুলিয়া দিল।

স্পষ্ট অন্ধকারেও সে সমস্ত দৃশ্যটি একমুহূর্তে আয়ত্ত করিয়া লইল। অত্যন্ত ক্লান্ত ভঙ্গিতে স্বামী ফরাশের উপর লুন্ঠিত হইয়া আছেন—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল, বসন বিন্যাসহীন! তবু আজিকার এই স্তব্ধ রাত্রে কি-একটা নিবিড় আবেশ সুমতিকে ঘিরিয়া ধরিল! খোলা জানালার বাহিরে নিষ্পাদক শূন্য মাঠ ও তাহার উপরে অতন্দ্র স্তব্ধ অন্ধকার—একটি ভাবঘন প্রতিবেশে সুমতি সহসা স্বামীর প্রতি কি যে গভীর মায়া অনুভব করিল তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না।

সুমতি ধীরে স্বামীর শিয়রের কাছে বসিল। রুক্ষ অসংস্কৃত চুলগুলিতে আঙুল বুলাইতে-বুলাইতে সহসা তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া কেন যে জল নামিয়া আসিল, কে জানে!

স্বামীকে কেন যেন তাহার অত্যন্ত দুঃখী, অত্যন্ত বঞ্চিত মনে হইল। কখন তাহার মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বেদনায় একেবারে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে সে-দিকে এতটুকু তাহার খেয়াল ছিল না।

কতক্ষণ পরে উমাকান্ত কথা কহিল—কে, সুমতি?

সুমতি নীরবে স্বামীর কপালে করতলখানি বিস্তৃত করিয়া রাখিল। একটিও কথা কহিল না, উঠিয়া বাতিটা জ্বালাইলেই এই সুকোমল দৃশ্যটি অসম্পূর্ণ আলোকে যেন একেবারে মাটি হইয়া যাইবে!

উমাকান্তও নিঃশব্দে স্ত্রীর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া একটি সুরক্ষিত দুর্গের আশ্রয়ে বিশ্রামের সুখস্বাদ অনুভব করিতেছিল।

এই অবিচল স্তব্ধতাতে যেন দুইজনের পরম আত্মীয়তা!

উমাকান্তই আবার কথা কহিল—তুমি ঘুমুতে যাবে না, সুমতি?

কথার সুর কেমন করুণ!

সুমতি ফরাশের উপর পা দুইটি তুলিয়া সান্নিধ্যে ঘনতর হইয়া বসিল, কহিল—খুব বেশি ঘুম পেলে এখেনেই তোমার পাশে শুয়ে পড়ব না-হয়।

কথার সুরে অযাচিত করুণা!

হঠাৎ উমাকান্তও দুই হাতে সুমতিকে বুকের কাছে আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ কণ্ঠে কহিল—আমার সঙ্গে তুমি গরিব হতে পারবে, সুমতি? এই দালান-বালাখানা ছেড়ে আমার হাত ধরে তুমি পথের ধুলোয় নেমে আসতে পারবে? পারবে না?

নিশীথরাত্রি মন্ত্র জানে। সুমতি স্বামীর বুকের মধ্যে বড় সুখে মুখ গুঁজিয়া গদ গদ স্বরে কহিল—খুব পারব।

—সত্যি-সত্যি পথের ধুলোয় মাথার উপরে ছাত নেই—রূঢ় রৌদ্র, রুক্ষ আকাশ। ঘর ছেড়ে ঝড়, ছায়া ছেড়ে শূন্যতা। শুতে বিছানা পর্যন্ত পাবে না।

স্বামীর প্রসারিত বুকের উপর মাথা এলাইয়া অস্ফুটস্বরে সুমতি বলিল—এই তো আমার বিছানা। তোমাকে সত্যিই যদি পাই, পাবার মতোই পাই যদি, তবে দালান বিলিয়ে দিতে পারি। গাছের তলায় তত সুখ ইন্দ্রাণীও কল্পনা করতে পারে না।

উমাকান্ত হাসিয়া বলিল—তা ইন্দ্রাণীর দুর্ভাগ্য। তোমরা নেহাৎ সতী হবে বলেই তোমাদের এই অকর্মণ্য ভাবপ্রবণতাকে ক্ষমা করতে হয়। কিন্তু কথাটা তুমি সত্যিই মন থেকে বলছ সুমতি?

স্পর্শবিহ্বল হইয়া সুমতি বলিয়া বসিল—মন থেকেই বলছি বৈ কি। ভাগ্য যদি বিরূপ হয়, তবে পথ ছাড়া আর গতি কৈ? তোমাকে পেলে আমার আর দুঃখ কী!

—আমাকে পাওয়া মানে, আমি মদ ছেড়ে ভালোমানুষটির মতো তোমার আঁচল ধরে অচপল থাকবো—এই তো? অবিকল তাহ তো হতে চলেছে। আমার মদ খাবার জন্য একটা কানাকড়িও এ-বাড়ির আনাচে-কানাচে আর কোনোদিন মিলবে না সুমতি।

সুমতি চমকিয়া উঠিল—ব্যাপার কি?

—যা তোমাকে এতক্ষণ কবিত্ব করে বললাম—সেই গাছতলা, সেই আকাশময় আশ্রয়হীনতা, আর শূন্য শুষ্ক উদর। ভাষাটা মোলায়েম বলে অর্থটাও কিন্তু তদনুপাতে রুচিকর নয়।

সুমতি ভয় পাইয়া স্বামীকে আঁকড়াইয়া ধরিল—তুমি এ-সব বলছ কী?

নির্লিপ্তের মতো উমাকান্ত বলিতে লাগিল—জীবনের ভীষণতম দুর্ভাগ্যকে খুব নিরাকুল স্বস্থ চিত্তে গ্রহণ না করিলে সে দুঃখকে অপমান করা হয়। ছিলাম মসনদে, এখন নর্দমায়। গাছতলায় মানে ছায়াবীথিতলে নয়, দস্তুরমতো গাছতলায়।

সুমতি আর্তনাদ করিয়া উঠিল—এ-সব তুমি কি বলছ?

সুমতির ঘুমমালিন্যময় মুখখানি ধীরে ধীরে বুকের উপর শোয়াইয়া দিয়া শ্যামসঙ্কেতহীন দূর বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে চাহিয়া উমাকান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলিল; কহিল—সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি কাজ-কারবার দু-গ্লাশ মদেই ডুবে গেল, সুমতি। হীরালালবাবুর কাছে সমস্ত কিছু বন্ধক ছিলো, ধার শোধ করবার ধার দিয়েও যাইনি বলে সপরিবারে আমি তাঁর বন্ধনে। তিনি হুকুম করলেই তা তামিল করতে আমাদের গাছতলার আশ্রয় নিতে হবে। পরোয়ানা এই এসে গেল বলে। তবু কিছু আমি কেয়ার করি না।

প্রচণ্ড আঘাতে সুমতি তাহার কামনীয় উপাধান হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। সোজা হইয়া বসিয়া ভয়ার্ত বিবর্ণমুখে সে হাহাকারের মতো বলিয়া উঠিল—সত্যি সরকার-মশায়ের কাছে সেদিন যা শুনছিলাম তার একবর্ণও তাহলে মিথ্যা নয়?

উমাকান্ত শ্লথপদে জানালার কাছে উঠিয়া আসিয়া কহিল—এক বিন্দু নয়। বরং সর্বনাশের পরিমাণ যে কতোখানি সে-ধারণা তাঁর ছিলো না, সে-ধারণা করবার মতো উদার মনোবৃত্তি সংসারে দুর্লভ, সুমতি। এই সর্বনাশের মধ্যেও একটা উগ্র নেশা আছে—ঠিক একটা হাউইয়ের ফেটে যাওয়ার মতো। তুমি ছেলেমানুষের মতো গলে গিয়ে এত কাঁদছো কেন? এতে হয়েছে কী?

সরিয়া আসিয়া উমাকান্ত স্ত্রীকে নিবিড় সহানুভূতিতে কাছে টানিতে গেল। সুমতি এক ঝটকায় উদ্যত আলিঙ্গন ফেলিয়া দিয়া ফুঁপিয়া-ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

উমাকান্ত কহিল—সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে তুমি একটা মজা পাচ্ছ না? ছিলাম জমিদার, এখন হতে চলেছি জমাদার—এর মধ্যে একটা প্রবল রোমাঞ্চ আছে। ভাগ্যের চাকা প্রতি মুহূর্তে ঘুরে যাচ্ছে—এর জন্যে শোক করবার

মতো মূর্খতা নেই। জীবনে এই তো মজা। একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার মতো আনন্দ আর আছে কিসে?

উমাকান্ত আবার স্ত্রীকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া কোমল করিয়া কহিল—আমার সঙ্গে তুমি গরিব হতে পারবে না, সুমতি? পথের ধারে ছোট্ট পাতার কুঁড়ে ঘরে আমি আর তুমি মানবকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করবো—এই আরম্ভের আস্বাদ নিতে তোমার লোভ হয় না একটুও?

সুমতি গম্ভীর; দুই চোখ দিয়া অশ্রুরেখা নামিয়া আসিয়াছে।

উমাকান্ত তাহার চুলগুলিতে হাত ডুবাইয়া কহিল—মানবের জন্যে কিছু তুমি ভেবো না। একমাত্র জন্মের সার্টিফিকেটে হাত পেতেই এতো সহজে আমি যদি এই প্রকাণ্ড সম্পত্তিটা না পেতাম তো এমন করে হয়তো দেহে মনে ব্যর্থ হয়ে যেতাম না। মানব জীবনে বহুতর আঘাত পাক, বহুতর দারিদ্র্যের সঙ্গে সে সংগ্রাম করুক—মা হয়ে এই তাকে আশীর্বাদ কোরো।

সুমতি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

স্বামী তাহার প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন কি না তাহাই সে ভাবিয়া পাইতেছে না।

উমাকান্ত আবার কহিল—থাকে না, পৈত্রিক সম্পত্তি থাকে না, সুমতি। কি করেই বা থাকবে! দরিদ্রদলন করে তিলে-তিলে সে সম্পত্তি বাবা আহরণ করেছিলেন তার এই যদি সদ্গতি না হয়, তবে সৃষ্টির যে সামঞ্জস্য থাকে না। তোমার চোখের জলের কোনোই মানে হয় না, সুমতি। এই সম্পত্তির জন্য বাবা ও তাঁর অনুচরের অত্যাচারে কত মেয়ে কত চোখের জল ফেলেছে তার হিসেব আজ আর কেউ রাখে না। কত লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে এই প্রাসাদ। তারাও একদিন এমনি কেঁদেছিল।

সুমতি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল—এর আগে আমার মরণ হল না কেন?

উমাকান্ত বিদ্রূপ করিয়া কহিল—তা হলে আমার পথের বোঝাটা আরো একটু হালকা হতো। মানবকে একটা অনাথ আশ্রমে-টাশ্রমে ঢুকিয়ে দিয়ে কাছাটা নামিয়ে বম ভোলানাথ বলে সরে পড়তাম। এই না? কিন্তু ভাগ্যের কাছে এত আবদার কি খাটে?

সুমতি জ্বলিয়া উঠিল—যাও না তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে। কে তোমাকে ধরে রাখছে?

উমাকান্ত সান্ত্বনা দিবার ভান করিয়া কহিল—যে দুঃখের প্রতিকার নেই

তাকে হাসিমুখে স্বীকার করতে না পারলেই, দুঃখ সুমতি। আমি তো এই দুঃখে একটা নতুনের সূচনা দেখছি। তক্তপোশের নিচে বোতলে আরো খানিকটা মদ ছিলো, দাও না বার করে—আমার হাত-পা আর নাড়তে ইচ্ছা করছে না।

সুমতি চীৎকার করিয়া উঠিল—তুমি এখনো মদ খাবে? এততেও তোমার শিক্ষা হল না?

উমাকান্ত জোরে হাসিয়া উঠিল, কহিল—মদ খাব না তো এই সর্বনাশের সুখের স্বাদ বুঝব কি করে? তমি নেহাতই সেকেলে। এমন একটা উত্তেজনা জীবনে তমি কোনোদিন অনুভব করেছ? পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ার মধ্যে অধঃপতনের একটা অত্যাশ্চর্য আনন্দ আছে। তুমি তার কি বুঝবে বলো।

বলিয়া সে নিজেই উবু হইয়া তক্তপোশের তলায় হাত ঢুকাইয়া বোতলটা বাহির করিল। সুমতির আর সহিল না।

অন্য সময় হইলে স্বামীকে হয় তো একবার বাধা দিত—বোধহয় এখনো ফিরাইবার সময় ছিল। কিন্তু একটিও কথা না কহিয়া দুয়ার ঠেলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

জনশূন্য সঙ্কীর্ণ একটা ঘর—তাহারই মধ্যে সুমতি আসিয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ-উদ্গত শোকাশ্রুর মতো রাশি-রাশি অন্ধকার সেই ঘরে ফেনায়িত হইতেছে। সেই স্তব্ধতা এমন স্থূল ও নিরেট যে, কান পাতিয়া তাহার আর্তনাদ শোনা যায়, চক্ষু খুলিয়া তাহার ভয়াবহ বীভৎসতার আর পরিমাপ করা চলে না।

ইহা যেন তাহার প্রত্যাসন্ন ভবিষ্যতের একটা সঙ্কেত!

এই অন্ধকারে সুমতি যেন তাহার নিজের মূর্তি দেখিতেছে। মেঝের উপর অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল।

অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সে যেন শুনিতে পাইল পাশের ঘরে উমাকান্ত মদের ঝোঁকে উন্মত্ত প্রলাপ শুরু করিয়াছে—অভিশাপ, ভাগ্যের নয় সুমতি, শত-শত নির্যাতিত নিরন্নের। এ-ঘরের প্রত্যেকটি ইট তাদের বুকের পাঁজর, তোমার-আমার ফুলশয্যায় এদের কামনার কীট। ওদের বিলাপে আমাদের বিলাস, ওদের অপমানে আমাদের অপচয়। অভিশাপ না ফলে কি পারে? এ যে হতেই হবে।

৩

অভিশাপ সত্য-সত্যই ফলিল।

অবশেষে একদিন হীরালালবাবু উমাকান্তের সেই প্রশস্ত ফরাশের উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া প্রসন্ন পরিতৃপ্ত মুখে সট্‌কা টানিতে লাগিলেন। পিসি-খুড়ি-মাসি-জেঠি—পরিবারের যত কিছু আগাছা ছিল প্রচণ্ড ঝড়ে সব কিছু ছত্রখান হইয়া গেল। দুই হাতে যে যাহা পারিল পোঁটলা-পুঁটলিতে বাঁধিয়া লইয়া উমাকান্তকে মুখে গালি পাড়িতে-পাড়িতে ক্রমশ সরিয়া পড়িল—কেহ কাশী, কেহ বৃন্দাবন, কেহ বা অন্য কোনো আশ্রয়-নীড়ের সন্ধানে। ভিমরুলের চাকে কে যেন একটা প্রকাণ্ড ঢিল ছুঁড়িল। একটা বিরাট অশ্বত্থকে মূলচ্যুত করিয়া কে যেন দূরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

উমাকান্ত ও সুমতি মানবের হাত ধরিয়া দেউড়ি পার হইয়া বাড়ির বাহির হইয়া আসিল। একবস্ত্রে, বিশ্বময় নিঃস্বতার মধ্যে!

মানদা সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল, উমাকান্ত তাহাকে ধমকাইয়া বিদায় করিয়া দিয়াছে।

উমাকান্ত একবার সেই বিশাল বাড়িটার দিকে চাহিল—এই বাড়ির ঘরে-ঘরে কত দিন ধরিয়া কত বাতি জলিয়াছে, সব সে আজ নিজ হাতে নিবাইয়া দিয়া আসিল। এই বাড়িতে কত জন্ম, কত বিবাহ, কত মৃত্যুর সুগম্ভীর আবির্ভাব—সমস্ত স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া এই সীমাশূন্য নিরালোক ভবিষ্যতে তাহাকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।

চমৎকার!

হীরালালবাবুর কাছে আসিয়া উমাকান্ত সবিনয়ে কহিল—চললাম, নমস্কার!

হীরালাল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—সে কি? পায়ে হেঁটেই চললেন নাকি? একটা গাড়ি ডেকে দি—ছেলেপিলে নিয়ে—

স্নিগ্ধহাস্যে উমাকান্ত কহিল—অজস্র ধন্যবাদ! এখন আর গাড়ি নয়, কঠিন পথ। আপনার দয়া চিরকাল মনে থাকবে।

হীরালাল কহিলেন—যাচ্ছেন তো স্টেশনে?

—হ্যাঁ, মাইল দুয়েক মোটে রাস্তা, হেঁটে যেতেই হবে কোনোরকমে। সেজন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। সম্পদের বেলাই সহধর্মিণী, দারিদ্র্যের দিনে স্বামীর সঙ্গে দু-মাইল পথ হাঁটতে পারবেন না এমন স্ত্রী পাতিব্রত্যের আদর্শরূপিণী বলে হিন্দুশাস্ত্রে কীর্তিত হয়নি।

সেই কথা হীরালাল কানেও তুলিলেন না, গলা ছাড়িয়া ডাক পাড়িলেন—ওরে বলাই, সোভান-মিঞাকে বলে শিগগির একটা গাড়ি নিয়ে আয়। স্টেশনে পৌঁছে দেবে বাবুকে।

উমাকান্ত বাধা দিয়া কহিল—মদ খেতে যখনই আপনার কাছে হাত পেতেছি আপনি স্বচ্ছন্দে আমার হাতে কাঁচা টাকা গুঁজে দিয়েছেন। আপনার দয়া অসীম। কিন্তু দয়া করে আমাকে আর ঋণী করবেন না। বলিয়া উত্তরের কোনো প্রতীক্ষা না করিয়াই সে পথে অগ্রসর হইল। পিছনে সুমতি—তাহার হাত ধরিয়া মানব।

সুমতির দুই চক্ষু ছাপাইয়া অজস্র অশ্রুর আকারে অনপনেয় লজ্জা ও অসহনীয় অপমান ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। হালদার-বাড়ির বৌ রাস্তায় বাহির হইয়া কঠিন মাটিতে পা রাখিবে বছর কুড়ি আগে এই কল্পনা পাগলেও করিতে পারিত-না—শহরের এই দিককার সকল লোক জড়ো হইয়া এই ঘটনা হইতে কত যে নীতিমূলক গবেষণা শুরু করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সব কথা আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো সুমতিকে দগ্ধ করিতেছিল। উমাকান্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল—পা চালিয়ে চল একটু, কাঁদবার সময় ঢের পড়ে আছে। বিকেলের ট্রেন আমাকে ধরতে হবে একটু কৃপা করে মনে রেখো।

সুমতি পিছন ফিরিয়া আরেকবার বাড়িটার দিকে তাকাইল। বাড়িটা যেন ম্লান অসহায় চোখে নীরবে কাকুতি জানাইতেছে। দশ বৎসর আগে স্বামীর অনুগামিনী হইয়া সে যখন প্রথম পিত্রালয় ছাড়িয়াছিল, তখন ঘোড়ার গাড়ির বন্ধ জানালার পাখির ফাঁকে সে তাহার বাবাকে দেখিয়াছিল সিঁড়ির উপর বিরস বিষণ্ণ কাতর চোখে তাহাকে দেখিতেছেন। সে যেন এমনিই অসহায় মূর্তি এমনি উদাস। বাড়িটার দিকে চাহিয়া আজ তাহার খালি বাবার কথাই মনে পড়িতেছে। সেই শেষবার সুমতি তাহার বাবাকে দেখিয়াছিল। গ্রামে সেই বছর কোথা হইতে যে কলেরার বন্যা আসিল, সমস্ত ভাসিয়া-খসিয়া একাকার হইয়া গেল—শ্যামলতা হইল শ্মশান! ভিটে মাটির এক ফোঁটা চিহ্নও কোথাও রহিল না।

গাছ-পাতার অন্তরালে ক্রমশ হালদার-বাড়িটা অপসৃত হইতেছে। সেই বাড়িরই একটি বহুলালোকিত গৃহকোণে যেদিন উমাকান্তর বাসর-শয্যার পাশে শয়না সঙ্কোচভীতা নববধূ প্রিয়তমের প্রথম স্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তখন কে জানিত তাহাকে একদিন রুক্ষ রাজপথেই সেই শয্যা প্রসারিত করিতে হইবে!

উমাকান্ত তীব্রস্বরে আরেকটা হাঁক পাড়িল।

মানব বাপের হাত ধরিয়া কহিল—মা অমন কাঁদছে কেন, বাবা?

উমাকান্ত কহিল—কলকাতায় যাবে শুনে ভয় পাচ্ছে। যাও তো বাবা, মাকে একটু বোঝাও।

মানব বিস্মিত হইয়া কহিল—কলকাতায় আবার ভয় কিসের? তুমিই তো বলেছিলে সেখেনে সারারাত ধরে রাস্তার রঙ-বেরঙের তুবড়ি জ্বলে—এখেনেই অন্ধকারে তো সাপ-খোপের ভয় ভূত? মানব হঠাৎ বুক ফুলাইয়া তাহাতে ডান হাতটা ঠেকাইয়া বীরদর্পে কহিল—রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি? তাহার পরে সে হাসিয়া ফেলিল—মা নেহাত ছেলেমানুষ, বাবা।

উমাকান্ত হাসিয়া কহিল—সেই কথাটাই তোমার মাকে একটু বুঝিয়ে বল।

মানব ম'ার একটা হাত ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে কহিল—কেন তুমি অমন কাঁদচ? এখন আমরা গিয়ে ট্রেনে চাপবো, অন্ধকার ঠেলে হুস্-হুস্ করতে-করতে এঞ্জিনটা হাউইর মত ছুটতে থাকবে—ফুর্তিতে সারারাত তো আমার ঘুমই আসবে না। তার পর ভোরবেলা চাপবো স্টিমারে, চারদিকে খালি ঢেউ আর ঢেউ। যদি ঝড় আসে মা, স্টিমারটা নাগর-দোলার মতো দুলতে থাকবে; নাগর-দোলা চড়তে তোমার ভালো লাগে না?

সুমতি বিহ্বলের মতো মানবকে পথের মধ্যেখানেই বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল।

—ছাড়, ছাড়, লোকে দেখলে বলবে কি? এত বড়ো ধাড়ি ছেলে মা'র কোলে চড়ে স্টেশনে যাচ্ছে। তোমারই বরং হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, না? আমি যদি আরেকটু বড় হতাম তো তোমাকে পাঁজা-কোলে করে ছোট্ট খুকিটির মতো নিয়ে যেতাম, মা। কেন তুমি কাঁদছ, কলকাতায় কত জিনিস তুমি দেখতে পাবে। সেখানে শুনেছি—এক রকম গাড়ি চলে তাতে ধোঁয়া নেই, ভোঁ নেই—খালি ঠুং ঠুং করে ঘণ্টা বাজায়। সেই গাড়ি চড়তে তোমার ইচ্ছে করে না? তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, মা। সুমতি ছেলের বিস্ময়দীপ্ত চোখের দিকে তাকাইয়া করুণ কণ্ঠে কহিল - এ বাড়িতে আর ফিরে আসবো না, মানু।

মানব ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল—বয়ে গেল। কলকাতায় এর চেয়ে অনেক বড়ো-বড়ো বাড়ি আছে, এক-একটা বাড়ির চূড়ো নাকি মেঘের সমান উঠে গেছে! বাবা বলছিলেন নিচের তলায় কি রকম একটা বাক্স আছে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে কল টিপে দিলেই দেখতে-দেখতে পাঁচ-ছ তলায় বাক্সটা উঠে আসে। ভূগোলে আমেরিকার কথা পড়েছ মা? সেখানে নাকি একরকম বাড়ি আছে—তার তলায় রেলের মতো চাকা, এক জায়গা থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে হাজির হয়—বলিয়া মানব খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু মা'র যে কেন তবু কান্না থামে না সে ভাবিয়া পাইল না। কহিল—বেশ তো, তারপর একদিন এ-বাড়িতে ফিরে এলেই হবে।

সুমতি কহিল—এ বাড়িতে আর ফিরে আসতে দেবে না।

কপাল কুঁচকাইয়া মানব কহিল—ফিরে আসতে দেবে না? কে?

—যারা এখন বাড়ির মালিক—হীরালালবাবুরা।

এমন ব্যাপারেও কেহ মুখ ভার করিয়া থাকে? মানব হাসিয়া উঠিল, পরে গম্ভীর হইয়া কহিল—তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, মা। আমরা কলকাতা বেড়াতে যাচ্ছি কি না, তাই বাবা এ ক'দিন হীরালালবাবুকে বাড়িটাকে দেখতে বললেন। কেউ পাহারা না দিলে বোসেদের চাকররা এসে পুকুর থেকে সব মাছ চুরি করে নিয়ে যাবে, বাগানের একটা আমও আর ফিরে এসে খেতে পাবো না। ফিরে আসতে দেবে না কি, মা? আমাদের ঘর-বাড়ি পুকুর-বাগান কার সাধ্য কেড়ে রাখে? তা হলে হীরালালবাবুর দাড়ি ছিঁড়ে দেব না?

মা'র বিষাদ-ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া মানব আর উৎসাহ পাইল না। কখন তাহার নিজেরই মুখ ব্যথায় থমথম করিয়া উঠিল; কহিল—কলকাতায় যাচ্ছি মা, অথচ না নিলে একটা বাক্স-ট্রাঙ্ক, না বা কিছু খাবার। গাড়িতে কি পেতেই বা শোবে, সেখানে গিয়ে চান করেই বা কি পরবে? গাড়ি ছাড়তে তো এখনো কতো দেরি আছে। কুলির মাথায় করে তোমার সেই হলদে তোরঙ্গটা নিলেই সব চুকে যেত। বাবাকে এত বললাম, অন্তত আমার প্যাটরাটা নিই, কিছুতেই তিনি তাতে হাত দিতে দিলেন না। আমার বাঁশি-নাটাই টিনের লাট্টু, বইখাতা সব পড়ে রইলো। সেখানে গিয়ে আবার তো সব কিনতে হবে?

সুমতি মানবের মুখখানা আবার কোলের কাছে চাপিয়া ধরিল। অশ্রু-গদগদস্বরে কহিল—কিনবার আর আমাদের কিছুই নেই, বাবা। বাক্স-প্যাটরা খাট-পালঙ সিন্দুক-আলমারি সব—সব হীরালালবাবুদের! আমরা আজ পথের ভিখিরি।

চলিতে-চলিতে মানব হঠাৎ থামিয়া পড়িল। এমন একটা কথা বলিলেই হইল? সে হাসিয়া কহিল—হীরালালবাবুর তো আচ্ছা আবদার। দাঁড়াও, বাবাকে জিগগেস করে আসি।

কিন্তু উমাকান্তর মুখে স্নেহ বা সহানুভূতির এতটুকু আভাস নাই। বাপের সেই মুখ দেখিয়া ভয়ে মানবের মুখে কথা সরিল না।

মানব ফিরিয়া আসিয়া আবার মা'র হাত ধরিল; কহিল—এ কখনোই হতে পারে না, মা। হীরালালবাবুর সাধ্য কি আমাদের বাড়িতে আমাদের

ঢুকতে দেবে না। ঐ বুড়ো আমাদের সঙ্গে পারবে নাকি? এক ভজুয়াই তো ওকে আলুর দম বানিয়ে ছাড়বে। আমি দাড়িতে ওর আগুন লাগিয়ে দেব, মা! আমাকে তুমি যে এত হনুমান বলতে তা এতোদিনে ঠিক হবে।

মাকে এত সে প্রবোধ দিল, তবু কি না তাহার চোখের জলের বিরাম মানিতেছে না। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া মানব শেষে মা'র হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়া কহিল—গরিব হলাম বলে তোমার এত ভাবনা কিসের মা? আমার লাট্টু-নাটাই কিচ্ছু চাই না, বিদ্যাসাগরের মতো আমি না-হয় রাস্তার ল্যাম্প্-পোস্টের তলায় টুল টেনে বসে পড়া মুখস্ত করবো। হাত পুড়বে বলে ভয় পাচ্ছ, মা? না, না, বিদ্যাসাগরের মতো রান্না করতে আমি না-ই বা পারলাম, আমি হব পিওন, খাকির প্যাণ্ট পরে পায়ে ফেটি আর মাথায় পাগড়ি বেঁধে আমি কলকাতায় চিঠি-বিলি করবো। গাড়ি ঘোড়া ঠিক বাঁচিয়ে চলবো দেখো, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই।

মা তবু কথা কহে না, আঁচলে চোখ মুছিতে-মুছিতে ক্লান্তপায়ে পথ ভাঙে।

বিকালের আকাশ ফিকা হইয়া আসে, হাটের পথে গরুর গাড়ি সার বাঁধিয়া ঢিমাইয়া চলে। মানব গরুর ল্যাজ টানিয়া দেয়, রাস্তা হইতে ঢিল কুড়াইয়া বাদামগাছের ডালে তন্দ্রাচ্ছন্ন প্যাঁচাটাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারে—কখনো বা সামনের পুকুরে; বিন্দুবৎ জলচক্রটা কেমন করিয়া ক্রমশ বাড়িতে-বাড়িতে অস্পষ্টতর হইতে থাকে তাহাই দাঁড়াইয়া একটু দেখে; বলে: গুলতিটাও সঙ্গে আনলে না মা, ঐ পাখির বাসাটা তা হলে ভেঙে দিতাম।

মা কেমন করিয়া যেন চাহিল।

প্রথমটা মানব একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, কিন্তু কি ভাবিয়া সাহস সংগ্রহ করিয়া কহিল—ঐ পাজি হীরালাল আমাদের এতো বড়ো বাসা ভেঙে দিলো, আর আমি সামান্য একটা পাখির বাসা ভাঙতে পারবো না? মারি এই ঢিলটা, মা। পাখির ছানাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। ওয়ান্, টু—

একটা ঢিল তুলিয়া মানব টিপ করিতেছে, কিন্তু মা'র দুইটি অশ্রুকোমল সস্নেহ চক্ষু যেন তাহার উদ্যত হাতকে সহসা নিস্তেজ, শিথিল করিয়া ফেলিল। ঢিলটা ফেলিয়া দিয়া সে আবার মা'র গা ঘেঁষিয়া চলিতে চলিতে কহিল—সব হীরালালবাবুদের হয়ে গেল, মা? আমাদের ধলি-গাইটা পর্যন্ত?

মা স্বচ্ছন্দে ঘাড় হেলাইল।

—পুঁইশাকের মাচা, কাঁটালগাছের তলায় পিঁপড়ের সেই ঢিপিটা, সব?

সুমাতর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভীত অস্ফুট শব্দ বাহির হইল: সব।

—তুমি বলো কি মা? আমার সেই দোলনাটায় আর দুলতে পাবো না? নিজ হাতে সেই যে একটুখানি বেগুনের খেত করেছিলাম, সে-বেগুন খেতে পাবো না? বঁড়শি ফেলে পুকুরের বেলে-মাছ ধরলে সে-মাছ হীরালালবাবুদের দিয়ে দিতে হবে? তুমি পাগল হলে নাকি, মা? মানব থামিয়া পড়িল।

সুমতি মানবের হাত ধরিয়া খালি বলিল—দাঁড়াসনি মানু, চল। উনি কতদূর এগিয়ে গেছেন দেখছিস্? তাড়াতাড়ি না চলতে পারলে ট্রেনে আর চাপতে পাবি না।

মানব বলিল—তাই বলো, তুমি আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিলে! এ কখনো হতে পারে? আমি বাড়ি ঢুকতে গেলে ভজুয়া তেড়ে আসবে ভেবেছ, মানিদিদি ভাবছ হাত-পা ধুয়ে দিতে আসবে না, আমার ভেলু খুশিতে ল্যাজ না নেড়ে কামড়াতে আসবে? ভেলু সঙ্গে আসতে চাইছিলো মা, কেন ওকে বাবা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন? ও হয় তো দাঁত দিয়ে শেকল কাটবার জন্যে কতো মাতামাতি করছে। ওকে খুলে নিয়ে আসবো, মা? ওরো তো হাফ-টিকিট।

মা'র হাত ছাড়িয়া মানব খসিয়া পড়িবার সামান্য একটু চেষ্টা করিল হয়তো, কিন্তু সুমতি কিছুতেই বাঁধন আলগা করিল না।

—গাড়ি ছাড়তে এখনো অনেক দেরি আছে, মা। তিনটে ঘণ্টা দেবে, তবে ছাড়বে। তার মধ্যে ঠিক আমি ভেলুকে ছাড়িয়ে আনতে পারবো। বাবা একমনে এগিয়ে চলেছেন, টেরও পাবেন না। ইস্কুলের ফ্ল্যাট-রেসে আমি ফার্স্ট হয়েছি। রুপোর সেই মেডেলটাও আনা হয়নি। কোটের ওপর ঝুলিয়ে রেখে কলকাতার ছেলেদের তাক লাগিয়ে দেব। যাই না, মা।

সুমতি ধমক দিয়া উঠিল: না।

নিষ্ফল অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া মানব আপন-মনে বলিতে লাগিল: হুঁ! উনি আমার কুকুর কেড়ে রাখবেন, ওঁর খেঁদি মেয়েটা আমার দোলনায় দুলবে, আর আমি ওঁকে সহজে ছেড়ে দেবো? ককখনো না। দাঁড়াও না, বড়ো হই একটু—আমাদের ক্লাবের ক্যাপ্টেন চিন্তাহরণদাকে চেন, মা? দাঁত দিয়ে তিন মণ পাথর তোলেন। অমনি আমাকে একবারটি বড়ো হতে দাও, দেখে নেব আমার বেগুনের খেত কে নষ্ট করে? ছাড় মা, ছাড়—

বলিয়া, মানব জোর করিয়া হাত ছিনাইয়া লইয়া বুক ফুলাইয়া লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া সোজা আগাইয়া যাইতে লাগিল!

কিছুটা আবার ফিরিয়া আসিয়া মা'র গায়ে গা ঘষা বাঘের মতো [illegible] হল—

তোমাকে পেছনে একলা ফেলে এগিয়ে যাব কী? আমি কাছে না থাকলে তোমার ভয় করবে যে।

রমেশ পোদ্দার ও তাহার ছেলে ফণী হাট হইতে বাজার করিয়া ফিরিতেছে ; ফণীর বয়স মানবের চেয়ে কিছু বেশি, গায়ে নূতন একটা কোট উঠিয়াছে। গায়ে পড়িয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাচ্ছিস রে মানু? কাইজারি ভঙ্গিতে মানব কহিল—কলকাতা।

ফণী হাসিয়া কহিল—বাড়ি থেকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলো বুঝি? বেশ হয়েছে। আর আমাকে পোদ্দারের পো বলে খ্যাপাবি?

মানব কঠোর স্বরে কহিল—তুই পোদ্দারের পো না তো কি বামুনের বাচ্চা? বলবোই তো, একশো বার বলবো, যতক্ষণ না মুখ খসে পড়ে :

গরু অর্থ গো,
পোদ্দারের পো

কি করবি তুই?

ফণী কটুকণ্ঠে কহিল—কি আর করবো? আমাদের মা তো আর পথে বেরোয় না।

মানব হঠাৎ বাঁ হাতে ফণীর চুলের ঝুঁটি চাপিয়া ধরিয়া ডান-হাতে তাহার গাল-গলা বাড়াইয়া এমন এক চড় মারিল যে, সে অদূরে একটা খাদের মধ্যে ছিটকাইয়া পড়িল। কাদায় তাহার কোটটার কিছু রহিল না।

ফণীর হইয়া রমেশ পোদ্দার নিজে একেবারে তাড়িয়া আসিল।

মানব দুই হাত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া এক পা বাড়াইয়া দিয়া কহিল—এসো না এগিয়ে, চোখ পাকাচ্ছ কি ওখান থেকে? এসো না, দেখি তোমার কত মুরোদ!

সুমতি তাহার গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। নিচে খাদ হইতে ফণী তখন অশ্রাব্য ভাষায় গালি পাড়িতেছে ও রমেশের মুখে তাহারই নির্ভুল প্রতিধ্বনি।

গোলমাল শুনিয়া উমাকান্তও পিছু হটিয়া আসিল। রমেশের পিঠে ও ফণীর চুলে হাত বুলাইয়া কহিল—ও আমার গোঁয়ার ছেলে রমেশ, ওর কথায় রাগ করো না। বাড়ি যা, ফণী।

পরে সুমতির দিকে চাহিয়া কহিল—ঐটুকু অপমানেই এমন মুষড়ে পড়লে চলবে না। এখন আর এমন কি হয়েছে! ঢের পথ পড়ে আছে এখনো।

সুমতি মানবের কান মলিয়া দিয়া বকিয়া উঠিল : যত গায়ে পড়ে ঝগড়া। কারু সঙ্গে না লেগে আর স্বস্তি নেই। গোঁয়ার, অবাধ্য কোথাকার।

উমাকান্ত স্ত্রীর হাত ছাড়াইয়া নিয়া কহিল—তোমার এই গোঁয়ার ছেলেকে আশীর্বাদ করো।

মানবের মুখে আর কথা নাই; সামনে দিয়া গরুর গাড়ি চলিয়া গেলেও গরুর ল্যাজ টানিয়া দিতে সে আর হাত তোলে না, পায়ের কাছে কাঁচা একটা বাতাবি লেবু পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াও তাহার সাহায্যে তাহার ফুটবল খেলিতে সাধ হয় না—অন্যমনস্কভাবে ম্লান মুখে সামনে সে হাঁটিয়া চলিয়াছে!

কিন্তু কত দূর যাইতেই চোখের সামনে গাছ-পালার ভিড় সরাইয়া খোলা আকাশ মুখ বাড়াইল। একটা লাল বাড়ি দেখা যাইতেছে—তাহারই একটু দূরে কতগুলি মাল-গাড়ি ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া রহিয়াছে। স্টেশন আসিয়া পড়িয়াছে বুঝি—মানব লাফাইয়া উঠিল। হ্যাঁ আর সন্দেহ নাই, রাস্তার উপর ভাঙা নড়বড়ে ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানরা কোলাহল শুরু করিয়াছে। হঠাৎ কোথায় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

মানব ব্যস্ত হইয়া বাবাকে কহিল—গাড়ি এবার ছাড়বে বুঝি? তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসো, মা।

উমাকান্ত নীরব হইয়া রহিল। সোজা সে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দিকেই অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সুমতির হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল—তাহারা সত্যই তবে একেবারে বিদায় নিয়া চলিয়াছে! মানব ঘাড় বাঁকাইয়া মাকে ঝাঁঝালো গলায় কহিল—আমার সঙ্গে পর্যন্ত পা মিলিয়ে চলতে পারো না, মা। শেষকালে তোমাকে ফেলেই কিন্তু চলে যাব আমরা।

কিন্তু বাবা প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়াও টিকিট কাটিতে কোনোই ব্যস্ততা দেখাইতেছেন না। এ-দিক ও-দিক তাকাইতেছেন শুধু।

মানব অস্থির হইয়া উঠিয়াছে: এঞ্জিনের ঐ ধোঁয়া দিয়েছে, বাবা। ট্রেন ছাড়বার আর দেরি নেই। ইস্কুলের শেষে কতো দিন আমি ট্রেন দেখতে একা-একা চলে এসেছি এখানে। আমাদের স্কুলের ছেলেরা কোথায় কোন দাড়ি-ওলা সন্নেসি এলো বা কোথায় কে সাপে-কাটা পড়লো তাই খালি দেখতে যাবে, একবার ট্রেন দেখতে আসবে না। ট্রেন যখন এসে স্টেশনে দাঁড়ায় তখন আমার খুব ভালো লাগে। এমন জোরে ঢুকে পড়ে মনে হয় থামবেই না, কিন্তু—ঐ যে ঘণ্টা দিলো, বাবা। আমাদের বুঝি টিকেট লাগবে না? গাড়ির ড্রাইভার বুঝি তোমাকে চেনে?

উমাকান্ত ধমক দিয়া উঠিল: চুপ কর্।

মানব চুপ করিতে জানে না: ঐ যে, অজিত ওরাও যাচ্ছে বুঝি। বেশ হবে

—কাগজ পেন্সিল পর্যন্ত সঙ্গে আনোনি মা, স্টেশনের নামগুলি লিখে রাখতাম যে। বলিয়া অজিতের উদ্দেশে ছুটিল: আমরাও এই গাড়িতে কলকাতা যাচ্ছি ভাই। আমি আর তুই এক গাড়িতে। বুড়োরা আলাদা!

অজিত বলিল—আমার সঙ্গে 'স্নেক্ য়্যাণ্ড ল্যাডার' আছে।

মানব খুশি হইয়া তাহার ঘাড় চাপড়াইয়া কহিল—তা হলে তো একশো মজা। আমাদের গাড়িতে কাউকে উঠতে দেবো না। দরজার কাছে কেউ এলেই সোজা বলে দেব—রিজার্ভড্। তার পর একা দুজনে খেলবো, ইচ্ছে করলে জানলায় বসে-বসে পাখি দেখবো, মাঠ, নদী, টেলিগ্রাফের থাম—পথে ব্রিজ পড়লে চাকায় কি সুন্দর আওয়াজ হয় বল্ তো! জানিস্ ভাই, দেড়ে হীরালাল জোর করে আমাদের বাড়িটা কেড়ে নিয়েছে। নিক গে—গাড়ি ঐ এসে গেলো। রেডি, অজিত—

বলিয়াই মানব আবার মা'র কাছে আসিয়া হাজির: ওকি, শিগগির চলে এসো মা। সামনে ওই মেয়েদের গাড়ি রয়েছে। একটু পা চালিয়ে এগিয়ে এসো লক্ষ্মী, তোমার জন্যে গাড়ি তো আর এখানে চিরকাল হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে না। তুমি ছেলে হলে না কেন মা? চাদরটা দাও গা থেকে ছুঁড়ে। ফের ঘণ্টা দিচ্ছে মা, উঠে পড়ো। বাবা কোথায়? উঠে পড়েছেন বুঝি? তুমি তা হলে থাক দাঁড়িয়ে, আমি উঠলাম—

হঠাৎ উমাকান্ত খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল: দাঁড়া।

মানব থামিয়া গেল। তাহারই বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে দিয়া ট্রেন তখন ধীরে চলিতে শুরু করিয়াছে। জানলায় অজিত মুখ বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে বুঝি, ছলছল চোখে মানব চাহিয়া রহিল—যতদূর ট্রেনটাকে দেখা যায়।

৪

গাড়ি ক্লিয়ার হইয়া গেলে উমাকান্ত স্টেশন-মাস্টারকে পাকড়াও করিল। তারিণী তাহার আলাপী—দুইজন একত্র মদ খাইত। কিন্তু তারিণীকে খাটিয়া খাইতে হইত বলিয়া উমাকান্তর মতো এত অনায়াসে সে ভাসিতে পারে নাই। রাত্রি বারোটার সময় তাহাকে আর-একটা প্যাসেঞ্জার 'পাস্' করিয়া দিতে হয়। ভোর না হইতেই আবার একটা মাল-গাড়ি আসে। তাই, সে চুমুক দিত বটে, কিন্তু গিলিত না। দলের সবাই তাহাকে বলিত আর্টিস্ট।

উমাকান্তকে দেখিয়া তো সে অবাক। মামলা-মোকদ্দমার কথা আগেই

সে শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু উমাকান্তকে এমন সর্বস্বান্তের মতো পথে বাহির হইতে হইবে তাহা সে কোনোদিন ভাবে নাই। তাহার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না।

উমাকান্ত আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল—দেখ, কী চমৎকার অধঃপতন! পাহাড়ের চূড়া থেকে একেবারে অতল পাতালে! আমি তোমারো চেয়ে বড় আর্টিস্ট, তারিণী!

তারিণী তাহাকে কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল—কী ব্যাপার?

—অত্যন্ত সরল—জলের মতো পরিষ্কার! তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা করতে এসেছি, বন্ধু।

তারিণী তাহার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল—ভিক্ষা? তুমি কী বলছ এ-সব? সঙ্গে উনি কে?

হাসিয়া উমাকান্ত কহিল—বল তো কে! দেখে তোমার কী মনে হয়?

তারিণী আমতা-আমতা করিয়া কহিল—তোমার—

—হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। অনুগামিনী। তোমার খুব আশ্চর্য লাগছে না, তারিণী? কিন্তু চাকা যদি না-ই ঘুরবে তবে চলায় আর মজা কৈ?

তারিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিল: ওঁরা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? ডেকে নিয়ে এসো ওঁদের। আমার বাড়ি তো এই সামনেই। তোমরা যাচ্ছ নাকি কোথাও?

—যাবার ইচ্ছে তো তাই ছিলো। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো আর উড়ে যাওয়া যায় না।

—সে হবেখন। তুমি এখন ওঁদের নিয়ে এসো দেখি শিগগির। আমি বাড়িতে খবর দিচ্ছি। গরিবের ঘরে একটু জিরিয়ে নেবে না-হয়।

উমাকান্ত তাহার হাত ছাড়িল না; কহিল—তুমি গরিব বলেই তো এত সহজে তোমার কাছে আসতে পারলাম ভাই। বড়লোক বন্ধুও আমার ঢের ছিলো, কিন্তু সেখানে আর যাই কেন না পেতাম, বিশ্রাম পেতাম না। তুমি গরিব বলেই তো তোমার কাছে হাত পাততে পারবো—

অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া তারিণী কহিল—তোমার সম্পদের দিনে তুমি আমাদের কম উপকার করেছ? ও কি একটা কথা হল? যাও ওঁদের নিয়ে এসো। সীতাকে পেয়ে গুহক চণ্ডাল কৃতার্থ হবে। বলিয়া তারিণী বাড়ির ভিতর খবরটা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আগেই চলিয়া গেল।

কিন্তু সুমতি কিছুতেই স্টেশন-মাস্টারের আতিথ্য নিতে পারিবে না। সে

রেল-লাইনের ধারে কুলিদের মতো বরং হোগলার ছাউনি খাটাইয়া স্বামী-পুত্রকে নিয়া দিন কাটাইবে, তবু করুণার অন্ন সে গ্রহণ করিবে না ইহা যে জীবন-দেবতার একটা বিরাট তামাশা মাত্র, ইহার মধ্যে এতটুকুও যে অসামঞ্জস্য নাই—উমাকান্ত সুমতিকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিল না।

উমাকান্ত কহিল—কিন্তু পরের ট্রেন যে সেই রাত বারোটায়।

সুমতি কহিল—বেশ তো। ততক্ষণ এইখেনেই বসে থাকবো।

—এই ঠাণ্ডায় ?

শুকনো হাসি হাসিয়া সুমতি কহিল—বাড়ি থেকে বেরোবার সময় গায়ে ঠাণ্ডা লাগবে না এমন কোনো কথা ছিলো না।

উমাকান্ত রুক্ষস্বরে কহিল—কিন্তু কোথাও যেতে হলে কিছু রেস্তও তো চাই। তারো তো যোগাড় করতে হয়। তারিণী আমার বন্ধু, তার কাছ থেকে হাত পাততে আমার লজ্জা নেই। তোমারো লজ্জা না দেখালেই মানাতো, সুমতি।

সুমতি কহিল—তোমার নির্লজ্জতা তোমারই একলার থাক। এতো বড়ো একটা সম্পত্তি মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পথে বেরিয়েছ, তোমাকে নিয়ে শহর-শুদ্ধু লোক মিছিল করছে না কেন ?

—তাই করা উচিত ছিলো। কিন্তু তা নিয়ে তর্ক করে তো কোনো ফল হবে না। চলো, তারিণীর কাছ থেকে সম্প্রতি কিছু ধার করে বেরিয়ে পড়ি—পরে কোথাও কিছু হিল্লে একটা হবেই! নতুন করে ফের শুরু করবার জন্যে আমি একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি।

তবুও সুমতি রাজী হয় না। বলে : তোমার বন্ধুর কাছে হাত পাতবে, তুমি যাও। আমি এখান থেকে নড়বো না।

উমাকান্ত ঠাট্টা করিয়া প্রশ্ন করিল—একা যেতে পারবে ?

সুমতি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল : দরকার হলে তাও পারবো বৈ কি।

মানব বাবার হাত ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ-গাড়িতে গেলে না কেন বাবা ? সেই রাত দুপুরে তো ফের ট্রেন! এখনো তার সাড়ে সাতঘণ্টা বাকি। রাত্রে কিছু দেখা যাবে না যে!

তাহার হাত সরাইয়া দিয়া উমাকান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল—চুপ কর্। পরে সুমতির দিকে চাহিয়া : এতই যখন পারো, তখন দয়া করে আর দু কদম এগিয়ে এসো না! এতটা পথ হেঁটে এসে নিশ্চয়ই তোমার বেশ খিদে পেয়েছে, ঘুমও পেয়েছে হয়তো—ট্রেন তো সেই কখন। খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবে,

স্বচ্ছন্দে। তুমি গেলে তারিণী নিশ্চয়ই আর কৃপণতা করবে না। তোমাকে দেখে নিশ্চয়ই সে বদান্য হয়ে উঠবে দেখো।

কথা শুনিয়া লজ্জায় সুমতির মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল।

—একটু ব্যবসাদার হতে হয়, সুমতি। সেইটেই স্বাভাবিক। এতে লজ্জা নেই, দৈন্য নেই। যখন ছিলো, কুসঙ্গে পড়ে ফুঁকে দিয়েছি; এখন নেই, হাত পেতে তাই ভিক্ষা চাই। এর চেয়ে সহজ আর মানুষে কী করে হতে পারে?

সুমতি কটুকণ্ঠে কহিল—যখন হাত পেতে ভিক্ষা মিলবে না তখন করবে কী?

উমাকান্ত নির্লিপ্তের মতো কহিল—কেড়ে নেব।

তারিণী পুনরায় দেখা দিলে উমাকান্ত গম্ভীর হইয়া কহিল—তোমার বৌদি কিছুতেই তোমাদের বাড়ি যাবে না।

তারিণী অপরাধীর মতো মুখ করিয়া বিনীতস্বরে কহিল—কেন?

উমাকান্ত ঠাট্টা করিয়া কহিল—এতো বড়োলোকের স্ত্রী হয়ে তোমাদের মতো গরিবের কুঁড়ে ঘরে পায়ের ধুলো ফেললে যে ওঁর জাত যাবে। স্বামীটি অবিশ্যি আর বড়লোক নেই, তা বলে স্ত্রী তো আর তাঁর গর্ব খোয়াতে পারেন না। ঐশ্বর্য পরোপার্জিত হতে পারে, কিন্তু অহঙ্কারটুকু একলা তোমার বৌদিদিরই। তার দাম আছে বৈ কি।

সুমতি মনে-মনে তাহার জন্ম-ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছিল, কিন্তু তারিণীর স্ত্রীকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে স্বামীর পিছে-পিছে আসিতে দেখিয়া তাহার সঙ্কল্প আর রহিল না। তারিণীর স্ত্রীকে অনুরোধ করিবার আর কোনো অবসর না দিয়াই সে তাহার হাত ধরিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল—ঐ তো তোমাদের বাসা, না? খুব সামনে তো? চমৎকার ফাঁকা দেখছি, চারধারে মাঠ আর মাঠ। রাত্রে একা-একা তোমার ভয় করে না?

অপরিচিতা বধূটি সুমতির আপ্যায়নের ত্রুটি রাখিল না; কিন্তু সুমতি আঁচলের তলায় হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল—না ধুইল হাত-মুখ, না ছুঁইল একটুকরা ফল। বধূটি দুঃখ করিয়া কহিল—গরিবদের কি আপনি এমনি করেই অবজ্ঞা করবেন?

সুমতি সহসা বধূটির দুই হাত সম্মুখে আকর্ষণ করিয়া বলিল—আমার চেয়ে গরিব কি আর পৃথিবীতে কেউ আছে ভাই? সংসারে একমাত্র অর্থের অনটনই তো দারিদ্র্যের পরিচয় নয়। কিন্তু সত্যি আমি কিছু মুখে তুলতে পারবো না, মিছামিছি অনুরোধ করে কিছু লাভ নেই। যদি বাঁচি, তবে তোমার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

উমাকান্ত ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে-হইতে কহিল—এতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই, বন্ধু। আমার বিপদের দিনে তুমি টাকা ভিক্ষা—হ্যাঁ ভিক্ষা দিচ্ছ—এ আমি বলেই স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারলাম। শোধ করতে পারবো কি না এবং কবেই বা পারবো তার যখন ঠিক নেই, তখন তাকে ভিক্ষা বললেই শব্দের যথার্থ অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, তারিণী। সুমতি নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলেই লজ্জায় অধোবদন হচ্ছে, কিন্তু লক্ষপতি উমাকান্ত হালদারই না যদি গরিব স্টেশন-মাস্টার থেকে ভিক্ষা নেবে তবে সৃষ্টির মাহাত্ম্য আর রইলো কোথায়? খালি ভোগ করবো, কোনোদিন পথের ধুলোয় হাঁটু গেড়ে বসে ভিক্ষা করবো না—এতে সৃষ্টির সামঞ্জস্য থাকতো না।

উমাকান্ত ঘরের মধ্যে আসিয়া মুঠি খুলিয়া তিনখানা দশটাকার নোট দেখাইয়া সুমতিকে কহিল—এখনো জমিদারির কিঞ্চিৎ রেশ আছে—বন্ধুত্বের খাজনা আদায় করেছি। এত ম্লান হয়ে যেয়ো না। কলকাতা যাবার মতো আড়াইখানা থার্ডক্লাস টিকিট—মাল-পত্র নেই যে কুলি লাগবে, আর, কলকাতায় পৌঁছে নিঃসম্বল অবস্থায় দু চার দিনের খোরাকি—খোরাকি বলতে অবশ্যি মুড়ি-মুড়কি। মহাত্মা হতে আমাদের আর বাকি নেই। জীবনে এতো বড়ো ঐশ্বর্যের স্বাদ খুব কম লোকেই পেয়ে থাকে, সুমতি। আমার ভবিষ্যৎ যে বংশধর—তাকে সর্বস্বান্ত রিক্ত করে রেখে যেতে পারলাম, আজকের দিনে এই আমার একমাত্র অহঙ্কার।

উমাকান্ত আর্তনাদের মতো হাসিয়া উঠিল।

—তুমি এমন একটা সর্বনাশকে উৎসব করে মহিমান্বিত করে তোল। যাত্রাই আমাদের উৎসব। ঘূর্ণমান চাকা সুমতি, ঘূর্ণমান চাকাই হচ্ছে নামান্তরে সভ্যতা। চোখের জল মুছে সভ্য হও। বলিয়া দ্রুতপদে উমাকান্ত অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিন্তু রাত করিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, দস্তুরমতো তাহার পা টলিতেছে। কাছাকাছি ট্রেন আসিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া স্টেশনের আলোগুলি নিবানো রহিয়াছে, কুলিরা কাপড়ের খুঁটে গা মুড়িয়া প্ল্যাটফর্মের উপরেই ঘুমাইয়া আছে। দূরে লাইনের ধারে একটি মাটির টিপির উপর কে-একটা ছেলে শূন্য দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া—তাহার দুই চোখে অসহনীয় প্রতীক্ষা, কখন ট্রেন আসিবে, কখন দুইটা নিস্তেজ অবসন্ন রেল-লাইন চাকার নিষ্পেষণে উচ্চকিত হইয়া উঠিবে! এমনি একটা প্রত্যাশিত ভয়ঙ্করের আবির্ভাবের আশায় মানবের অবুঝ ভীরু মন দুলিয়া উঠিতেছিল।

মানবকে উমাকান্ত চিনিতে চাহিল না।

স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টারে তখনো বাতি জ্বলিতেছে। সুমতি না-ঘুমাইয়া স্বামীরই জন্য খোলা বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু, উমাকান্তের চেহারা দেখিয়া সে দেয়ালে কপাল কুটিবে, না, চীৎকার করিয়া উঠিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। উমাকান্ত আগাইয়া আসিয়া কহিল—টিকিটের জন্যে তারিণী যা টাকা দিয়েছিলো সব উড়িয়ে দিয়ে এসেছি। ও-ও ভিক্ষার ধন কি না, হাতে রইলো না। মাটি খুঁড়ে না পেলে বুঝি টাকা-পয়সার মায়া পড়ে না।

সুমতি এক ঝটকায় উঠিয়া দাঁড়াইল, নির্মম ঘৃণায় মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইল না। উমাকান্ত বারান্দার দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—তবু আমার শিক্ষা হল না—কলকাতা যাওয়ার খরচ যা যোগাড় করলাম তাও অবধি ফুঁকে দিয়ে এলাম—এর জন্যে তোমার আফশোষ হচ্ছে? এ একান্ত আমি বলেই পারলাম সুমতি, কিন্তু আমি যে আর দাঁড়াতে পারছি না।

সুমতি কর্কশ হইয়া কহিল—আবার ফিরে এলে কেন? কে তোমাকে ফিরতে বলেছিলো?

—না এলে একা-একা কি করে কলকাতা যেতে?

—তোমার ফিরে আসাতেই তো তার অনেক সুবিধে হয়ে গেলো! দুঃসময়ে হাতে যা সম্বল ছিলো তা পর্যন্ত উড়িয়ে দিতে তোমার বাধলো না। তুমি যে কতো বড়ো অমানুষ তা তুমি জানো না। তোমার সঙ্গে আর আমাদের সম্পর্ক নেই।

উমাকান্ত বারান্দার এক ধারে বসিয়া পড়িয়াছে। মৃদু একটু হাসিয়া কহিল - আমি যে কতো বড়ো অমানুষ তা সত্যিই আমি জানি না। আমি পৃথিবীতে কী না করতে পারি। আমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চাইলে অনায়াসে আমি সরে পড়তে পারি জানো?

সুমতি তীব্রতর কণ্ঠে বলিল—স্বচ্ছন্দে। তুমি এক্ষুনি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও না।

—পর মুহূর্তে। কিন্তু আমি খসে পড়লে তুমি কী করে যাবে? যাবে বা কোথায়?

—সে-সব ভাবনা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

—তবু দেখি না ব্যবসা-বুদ্ধিতে কতো দূর তুমি পেকেছ! তারিণীর কাছে ধার চাইবে তো? স্বামীকে পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ ইত্যাদি বলে ওর সহানুভূতি উদ্রেক করে কিছু টাকা খসাতে পারবে? ও, তোমার হাতে এখনো যে সোনার

একজোড়া শাঁখা আছে দেখছি। হীরালাল ওটা বুঝি আর ছুঁতে পারেনি। আইনে বেধেছে। আমারই মুখের ওপর আমার নিন্দে করলে তারিণীর মন নিশ্চয়ই ভিজে উঠবে। দেখব তুমি কেমন অভিনয় করতে পারো। শাঁখা-জোড়া তারিণীকে লুকিয়ে দিতে পারলে দিব্যি ওর কাছে তোমার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে।

সুমতির স্বর কঠিন স্নেহহীন : সে-ব্যবস্থা আমিই সব করতে পারবো। কিন্তু যে-টাকা আমি যোগাড় করবো তাতে তোমার কোন অধিকার নেই। তুমি তোমার পথ দেখ।

উমাকান্ত হাসিয়া উঠিল : ধন্যবাদ।

এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া টলিতে-টলিতে ঘর হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

৫

সেই যে উমাকান্ত বাহির হইয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিল না।

সংসারে কেহ কাহারও নয়—এই নির্বাণানন্দ অনুভব করিতে-করিতে উমাকান্তও হয়তো এক দিন নিবিয়া গেল। কেহ তাহার খোঁজ রাখে নাই।

জীবনে তাহার যে অমেয় গ্লানি ও ম্লানতা—একাই সে তাহার উত্তরাধিকারী; তাহার স্বাদ লইতে সে স্ত্রী-পুত্রকে আহ্বান করিবে না। এই অধঃপতন তাহার নিজের রচনা। অর্জনে যদি সে একা, বিসর্জনেও। আর সুমতি! তাহারও বা কী হইল কে জানে! যাহাদের খুশি, ভাবিতে পারো সুমতি স্বামী-বিরহে ধীরে-ধীরে দেহক্ষয় করিল, যাহারা একটা ধর্মমূলক সিদ্ধান্ত পাইলে খুশি হয়, তাহারা তাহাকে কোনো দেবতার মন্দিরে ভক্তি-বিনতা পূজারিণীরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে ধন্য করিও—আর যাহারা নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন নির্লজ্জ সংসারের রুক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়াছে, তাহারা ইহাই ভাবিও যে, সুমতি অবনত মানুষের জনতায় আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে—হয়তো বা দেহ-পণ্যবিপণির পারে! যাহার যাহা ইচ্ছা ভাবিয়া লইও, গল্পের পক্ষে তাহার প্রয়োজন নাই।

মানবের জীবনে তাহার মা'র সেই ব্যথাপাণ্ডুর মুখের ছায়া পড়িয়াছে। অনাহারশীর্ণ অপমানাহত নিরানন্দ মুখের ছায়া! কিন্তু ছায়ার আয়ু কতটুকু!

৬

ইহার পর যে-দৃশ্যে উপন্যাসের যবনিকা তুলিলাম—

স্থান : কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চল, রসা রোড ; সময় : উমাকান্তের তিরোধানের বারো বৎসর পর।

চাকা আবার কখন ঘুরিয়া গিয়াছে।

ভোর হইতে তখনো খানিকটা বাকি—এইমাত্র বোধকরি রাস্তায় জল দিয়া গেল। স্লেট-রঙ আকাশে অস্পষ্ট তারার অক্ষরে কাহার হস্তলিপি লেখা!

মানব তাহার বিছানায় হাঁটু দুইটা বুকের কাছে দুমড়াইয়া তালগোল পাকাইয়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

দরজা ঠেলিয়া একটি অনতিবয়স্কা মহিলা ঘরে ঢুকিলেন। আকারে সেইটুকু মাত্র স্থূলতা যাহা আভিজাত্য নষ্ট করিতে পারে নাই। বেশ-বিন্যাসে একটি নির্মল রুচি, চলায় ও কথায় এমন একটা গাম্ভীর্য আছে যে মাঝে-মাঝে তা নির্মমতার নামান্তর হইয়া উঠে।

সুইচ-বোর্ডে হাত রাখিয়া তিনি ডাকিলেন : মানু!

শয্যার নিকটবর্তী হইতে হইল। মাথায় আস্তে কয়েকটা ঠেলা মারিতেই মানব ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া উঠিল : কি ব্যাপার? ডাকাত পড়েছে? ঐ —ঐ ঘরে আমার মুগুর!

মানব পাশের ঘরের দিকেই বুঝি ছুটিতেছিল, মহিলাটি তাহাকে বাধা দিলেন : না রে পাগলা, তোকে একবারটি শেয়ালদা যেতে হবে।

—কোথায়?

বলিয়াই মানব বালিশের তলায় হাত ঢুকাইয়া, মাথা ডুবাইয়া বিস্তৃততর হইয়া শুইয়া পড়িল : পাগল আবার তুমি আমাকে বলো!

তাহার চুলে আঙুল বুলাইতে-বুলাইতে মহিলাটি কহিলেন—তোকে সেদিন বললাম না আমার বোন-ঝি এখানে কলেজে পড়তে আসবে—বালিশের মধ্যে মুখটা বারকয়েক ঘষিয়া মানব বলিল—কিন্তু স্টেশন থেকে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে এমন কথা তো বলোনি কোনোদিন।

—কথা ছিলো উনিই স্টেশনে যাবেন, কিন্তু রাত থেকে শরীরটা নাকি ওঁর ভালো নেই। তা ছাড়া মির্জা আজ বাড়ি পালিয়েছে। এই সাতসকালে গাড়ি কে বার করবে?

—তবে পায়ে হেঁটেই তোমার বোন-ঝিকে পার করে নিয়ে আসবো নাকি? তোমার বোনঝির আবদার তো মন্দ নয়। এমন মজার ঘুমটা তুমি মাটি করে দিলে, মা। প্রথম রাতের অলস কল্পনা আর শেষ রাতের নরম ঘুম—এই দুটিতেই হচ্ছে স্বাস্থ্যের স্বাদ! আমি তা খোয়াতে রাজী নই। অন্য ব্যবস্থা কর গে যাও!

মা। কিন্তু সুমতি নয়। মিসেস্ অনুপমা চ্যাটার্জি।

মানব আরো ভালো করিয়া শুইল। কিন্তু চোখ গিয়া পড়িল জানালার বাহিরে, অনুচ্চার ভাষার মতো যেখানে দুয়েকটা তারা মৃদু-মৃদু কাঁপিতেছে। মা আবার কি বলেন তাহা শোনা শেষ হইলে পর সে চোখ বুজিবে।

অনুপমা বলিলেন—একটুখানি না ঘুমুলে আর তুই মাথা ঘুরে পড়বি না। মানব এক ঝটকায় উঠিয়া বসিল: শুধু ঘুম? সকালে উঠে আমাকে মুগুর ভাঁজতে হয়; তার পর স্নান—সব তুমি স্রেফ ভুলে গেলে নাকি? বোন-ঝি কলেজে পড়তে আসছেন—রাতারাতি তোমাদের সব পাখা গজালো আর কি। আচ্ছা বেশ।

মানব খাট ছাড়িয়া মেঝেয় নামিয়াছে যা হোক।

অনুপমা বলিলেন- তাই তো আগে থেকে জাগালাম। তুই চটপট তৈরি হয়ে নে, আমি চা করছি।

ব্যায়াম—তার পর স্নান! খুব তাড়াতাড়ি সমাধা হইল—পঁচিশ মিনিটের জায়গায় আট মিনিট। ঢাকা মেইলটার এরাইভ্যাল্ অত্যন্ত বেয়াড়া টাইমে—স্টেশনে একটু আগে পৌঁছানোটা প্রাচীনপন্থী নয়। মাথায় এত জল না ঢালিলেও চলিবে—দস্তুরমতো মেঘ করিয়া আসিয়াছে দেখিতেছি। তাড়াতাড়ি! দূরে একটা ট্রেনের ফুঁ শোনা যায়! একদিন নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইলে কী এমন যায়-আসে?

হ্যাঁ, তার পর প্রসাধন—কেশ-বেশ। স্টেশনে আবার বেশি আগে থেকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকার চেয়ে এঞ্জিন-ড্রাইভ করা ভালো। জাপানি হেয়ার-ড্রেসারটা চুল মন্দ কাটে নাই বটে। আঃ, কী মিষ্টি গন্ধ এই সেণ্টটার! না গো, এত তাড়াতাড়ি না করিলেও চলিবে। ওটা তো বালিগঞ্জের ট্রেন? ফাঁপা বাসনেই বেশি আওয়াজ!

—তোর চুল ঠিক করতেই তো আধঘণ্টা!

অনুপমা চায়ের বাটি ও রুটি-মাখন লইয়া প্রবেশ করিলেন।

দেরাজ টানিয়া এক মুঠা নোট-টাকা পকেটে লইয়া মানব কহিল—আমার টাকা-পয়সা রোজ-রোজ এত কমে যায় কেন বলতে পারো?

অনুপমা হাসিয়া কহিলেন—পকেটে অতো বড়ো একটা ফুটো থাকলে টাকা পয়সার আর দোষ কী?

পাঞ্জাবির পকেট উলটাইয়া মানব কহিল—ফুটো? কই?

অনুপমা আবার হাসিলেন: নে, খেয়ে নে, শিগগির। পকেটের ফুটো তোর চোখে পড়বে না।

মানব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ও! তুমি আলঙ্কারিক ভাষা প্রয়োগ করছ। কিন্তু হাতের মুঠোয় পয়সা যখন পেলাম তখন তাকে পাঁচ আঙুলেই খরচ করতে হয়। তার পর চায়ের কাপে চুমুক দিয়া: তুমি বেশ কিন্তু। তোমার বোন-ঝিকে খুঁজে বার করবো—আমি কি অকাল্‌টিস্ট নাকি? নাম কি মেয়েটির?

—মিলি। ঢাকা থেকে এক দঙ্গল মেয়ে আসছে—তাদেরই সঙ্গে।

—ঐ ব্যূহ ভেদ করে তোমার মিলিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে। সেই বা আমার সঙ্গে আসবে কেন?

—বা, তোকে বুঝি সে আর চেনে না? সেবার ঢাকায় ফুটবল খেলতে গিয়ে ক্লাবের সেক্রেটারী পরেশবাবুর বাড়িতে এক রাত্তির ছিলি, তোর মনে নেই? সেই বাড়ি থেকেই তো মিলি ইডেনে পড়তো। ওটা ওর কাকার বাড়ি যে।

টোস্টে কামড় দিয়া চিবাইতে-চিবাইতে: কাকার পরে মাসি। তা এক রাত্রেই সে আমার চেহারা মুখস্থ করে রেখেছে নাকি? যাক গে। 'বোনাফাইডিস' প্রমাণ করতে পারবোই। সিল্কের রুমালে হাত মুছিতে-মুছিতে: নিতাইকে বলে ফুল আনিয়ে রেখো, মা। বারান্দায় আসিয়া: অক্স-আই ডেইজি। সিঁড়ি দিয়া নামিতে-নামিতে: আমার তিনটে ঘরের একটাও যেন হাতছাড়া না হয় মা দেখো। আমি কিন্তু একটুও সঙ্কুচিত হতে পারবো না। নিচে সদর দরজা খুলিতে খুলিতে—ছি শেষকালে মানব একটা সুর ভাঁজিতে লাগিল নাকি?

মখমলের মতো নরম মোলায়েম ফিকে অন্ধকার। মৃদু মভ্‌ রঙের আকাশ। বাতায়নবর্তিনী প্রোষিতভর্তৃকার চক্ষুর মতো ম্লান একটি তারা। একটা বাস লইলে মানবের ক্ষতি হইত না। এখনো ঢের সময় আছে। কিন্তু খোলা ট্যাক্সিতে প্রচুর হাওয়ায় গা ছাড়িয়া দিতে না পারিলে এত ভোরে ওঠার উদ্দীপনার কোনো মানে নাই।

সন্ধ্যার আকাশে তারা ফোটার মত একটি-একটি করিয়া মানুষ পথে বাহির হইতেছে: দোকানি, মজুর, ভিক্ষুক। জীবন-সমুদ্রে ফেনকণা! ক্রম-উদ্বেল! কেহ কাহারও মুখ চিনিয়া রাখে না—যায় আর আসে, আসে আবার ভাঙিয়া

পড়ে। কত ক্ষুধা, কত ক্ষোভ, কত প্রত্যাশা। মানব ট্যাক্সির সিটে হেলান দিয়া বুক বিস্ফারিত করিয়া নিশ্বাস লইল।

স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম। মানব বার-কয়েক এ-প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করিতেই ফিনফিনে সিল্কের মতো এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা গেল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘাড় না রগড়াইয়া কী করা যায় আর?

মেয়েদের ইণ্টার-ক্লাসটা বোঝাই। কতগুলি খোঁপা আর সিল্কের প্যাটার্ণ। এখান হইতে উঁকি মারিয়া লাভ নাই—আগে উহারা নামুক। এক, দুই, তিন—অনেকগুলি, রোগা, লিকলিকে, সোডার বোতল, দীপশিখা! মানব একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

হস্‌টেলে যাহারা থাকে তাহারা একসঙ্গে গাড়ি করিবার উদ্যোগ করিতেছে; যাহাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাইবার কথা, তাহারা কেহ তাহাদের নিতে আসিল কি না তাহারই তালাস করিতেছে হয়তো।

এমন একটি মেয়ের সঙ্গে মানবের হঠাৎ চোখাচোখি হইল।

নির্ভুল সঙ্কেত। মানব মেয়েটির সমীপবর্তী হইয়া গলা একটুও না খাঁখরাইয়া প্রশ্ন করিল: আপনিই কি মিলি?

মেয়েটি সপ্রতিভ; তাহার নাসিকাগ্র দেখিয়াই তাহাকে তীক্ষ্ণধী ভাবা উচিত। এতগুলি মেয়ের মধ্যে এ-ই কেবল এলো খোঁপা বাঁধিয়াছে—ঐ খোঁপাতে যেন ব্যক্তিত্বের আভাস, আর ব্যক্তিত্ব দীপ্যমান তাহার চিবুকে। একটু চাপা তাই মনে হয় দৃঢ়। অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার একটা নিশ্চিত ধারণা আছে।

মেয়েটি কহিল—ভালো নাম বলতে পারেন?

—ভালো নাম? মানব একটুও ঘাবড়াইল না: ভালো নাম কী হতে পারে ভেবে একটা ঠিক করুন না। ঢাকা ও তার পাশাপাশি গাঁ থেকে এক দঙ্গল মেয়ে আসছেন - তাদেরই তিনি সাথী। ডাক-নাম মিলি হয়ে ভালো-নাম মলিনা বা মালিনী এমনিই কিছু একটা তো হওয়া উচিত। একবারটি সঙ্গিনীদের জিগগেস করে দেখুন না কেউ ঐ নামে সাড়া দেন কিনা? তার পর নিচের ঠোঁটটা একটু কাঁপাইয়া:

—আপনি নন তো?

লজ্জায় মেয়েটির চোখের পাতা হয়তো একটু নুইয়া আসিল: না।

—আপনি নন? খুঁজে বার করে দিন না। এঁরা সবাই যে জিনিস-পত্র নিয়ে খেপে উঠেছেন।

মেয়েটি পার্শ্ববর্তিনীকে জিজ্ঞাসা করিল: মিলি কে রে?

মানব আরেকবার সবগুলি মেয়ের মুখ দেখিয়া লইল, কিন্তু আর কাহাকেও তাহার মিলি বলিয়া পছন্দ হইল না।

পার্শ্ববর্তিনী অনুচ্চস্বরে কহিল—ও! আমাদের মঞ্জরী।

এইবার নামধারিণীর হুঁস হইল! এদিকে তাহার দৃষ্টি পড়িতেই, যে-মেয়েটি অতি সহজেই মিলি হইতে পারিত বলিয়া উঠিল—এই! ভদ্রলোক তোমাকে খুঁজছেন।

মানব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হতাশ হইয়া গেল: আপনিই মিলি?

বাঙালি মেয়ের শ্যামবর্ণমাত্রই উত্তম, মিলিও হয়তো তাই তরিয়া যাইবে; কিন্তু যে-মেয়েটি অনায়াসেই মিলি হইতে পারিত তাহার চেহারায় শুধু লালিত্যই নয়, একটা প্রশান্ত দীপ্তি ছিল। এই মেয়েটি চন্দ্রলেখার অদূরবর্তী তারকাকণার মতো বিবর্ণ, ঝাপসা।

সত্যিকারের মিলি উত্তরে একটু হাসিল। হাসিতে তাহার দুইটি জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠিল; ঠোঁটের উপরে ছোট একটি কাটার দাগ, আর উপর পাটির একটি দাঁত পঙক্তির সঙ্গে অমিল রাখিয়া একটু বড়ো, একটু উদ্ধত।

মানব আগাইয়া আসিয়া কহিল—আমি আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি। আমাকে চিনতে পারছেন তো?

মিলি হাসিয়া কহিল—একটু-একটু।

—তা হলেই যথেষ্ট। বেশি চেনাটাও প্রত্যক্ষ অমিতাচারের মতোই অস্বাস্থ্যকর। এই আপনার জিনিস? চলুন। এ আমিই নিয়ে যেতে পারবো—ঐ তো স্যাণ্ড। কুলি ডাকছেন কী!

পা বাড়াইবার আগে মিলি সহযাত্রিণীদের কাছে একে-একে বিদায় নিল। যে-মেয়েটি ইচ্ছা করিলেই মিলি হইতে পারিত, সে কহিল - একদিন হস্টেলে এসো। মিলি ঘাড় হেলাইল যা হোক।

মানব সেই অপরিচিতার উদ্দেশে নমস্কার করিয়া কহিল—চললাম।

ট্যাক্সি। হাওয়ায় উড়াইয়া নিয়া চলিয়াছে। পার্কস্ট্রিট কর্নার পার হইল। এইবার কথা শুরু হোক:

মানব গম্ভীর হইয়া কহিল—আপনি এক ডাকেই যে আমার সঙ্গে চলে এলেন, আমি যদি আপনাকে গন্তব্যস্থানে পৌছে না দিই?

মিলি যথেষ্ট দূরত্ব রক্ষা করিয়া সিটের বাঁ প্রান্তে একেবারে মিশিয়া বসিয়াছে। তাহাতেও হয়তো তাহার তৃপ্তি ছিল না, মধ্যখানে তাহার ছোট ব্যাগটা তুলিয়া

দিয়াছে। মানবের সেই চাপা স্বর শুনিয়া মিলি রীতিমতো ভয় পাইয়া গেল: পৌঁছে দেবেন না মানে?

—মানে, ভবানীপুর না গিয়ে সোজা তিল্‌জলা চলে যাবো। সেখানে রেল-লাইন পেরিয়ে ফাঁকা মাঠ। টুঁ শব্দটি করবার লোক নেই। কাছাকাছিই আমাদের আড্ডা। কী না করতে পারি ইচ্ছা করলে? সঙ্গে কতো টাকা আছে?

নিদারুণ বিপদের মুখে পড়িয়াও মানুষে হাসে—মিলির মুখে সেই পাণ্ডুর হাসি। হাঁটু দুইটা আরো সঙ্কুচিত ও বসিবার স্থান আরো সঙ্কীর্ণ করিয়া সে তরলকণ্ঠে কহিল—ছাই পারেন। কিন্তু এই কথার উচ্চারণেই তাহার হৃৎপিণ্ডের দ্রুতধাবনের শব্দ শোনা যায়।

—ছাই পারি? আচ্ছা। চালাও পাঁয়জি—বাঁয়ে।

ট্যাক্সি বালিগঞ্জ-সার্কুলার রোডে ঢুকিল।

মিলির মুখ শুকাইয়া একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে। ভ্রূরেখা দুইটি নিস্তেজ, ললাট ক্লিষ্ট। ঠোঁট দুইটির দিকে চাহিলে, মায়া করে। অতি শুকনো ভাঙা গলায় মিলি প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল: এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

মানব স্বরটা একটু বিকৃত করিয়া বলিল—ঠিকই নিয়ে যাচ্ছি।

ড্রাইভারকে উদ্দেশ করিয়া: হ্যাঁ, ঐ মালেন স্ট্রিট হয়ে চক্রবেড়ে—মিলি আর্ত অস্ফুটকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

অমনিই মানবের খিলখিল করিয়া হাসি: ছি-ছি, আপনি দেখছি নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমি থাকতে কার শরণ নিতে চাচ্ছেন? আমি আছি কি করতে? দু-মাস মুগুর ভেঁজে ফেদার-ওয়েট থেকে লাইট-ওয়েটে প্রমোশন পেয়েছি খবর রাখেন? চ্যাঁচাবেন কী? হ্যাঁ, হাসুন একটু। ভয়ে যে একেবারে এতটুকু। দেখি আপনার পাল্‌স্‌-বিট্‌।

অন্য কেহ হইলে হয়তো দ্বিধা করিত: কিন্তু মানব জানে সুযোগ ঝাঁক বাঁধিয়া আসে না, আসে একাকী, আসে কুণ্ঠিত। যেখানে দ্বিধা, সেখানেই দৌর্বল্য।

মিলি স্বচ্ছন্দে মানবের মুঠির মধ্যে হাত তুলিয়া ধরিল। ভীরু, ভিজা হাত। পায়রার পালকের মতো ফুরফুরে আঙুল।

যতটুকু কাল সমীচীন তাহার সামান্য অতিরিক্ত। তাহার পর হাত ছাড়িয়া দিতেই যেন স্পর্শ অর্থবান হইয়া উঠিতে চাহিল। মানব কহিল—আরো একটু বেড়াবেন, না সটান বাড়ি?

মিলি মানবের দিকে পরিপূর্ণ করিয়া চাহিয়া কহিল—কেন, আপনার কোথাও আর কাজ আছে?

—হ্যাঁ, কাজই বলুন না তাকে। কবিতাকেও তো আমি কর্তব্য বলি। আপনি ফুল নিশ্চয়ই ভালোবাসেন। তা হলে চলুন না কিছু ক্রিস্তানথিমাম কিনে আনি।

মিলির স্বর মানবের পরিচ্ছন্ন ও প্রখর বেশবিন্যাসের প্রতি সামান্য অবজ্ঞাসূচক : ফুলের বদলে সম্প্রতি এক-পেট খেতে পেলে আমি প্রকৃতিস্থ হতাম। সঙ্গে যা খাবার ছিলো কেড়ে-কুড়ে রাক্ষুসিরা সব উজাড় করে দিয়েছে।

মানব কহিল—রাক্ষুসির দলে এক রাজকুমারী ছিলেন কি করেই বা বিশ্বাস করি বলুন। কিন্তু রুক্ষ চুলেই ফুল বেশি মানায়।

হাসিলে যে মিলির চিবুকের কাছে ছোট একটি টোল পড়ে তাহা এতক্ষণ মানবের চোখে পড়ে নাই। মিলির ঠোঁট সেই উদ্ধত দাঁতটি উত্তীর্ণ হইয়া প্রসারিত হইল : আমি যখন এক-পেট খেয়ে এক-খাট ঘুম দেব তখন না হয় আপনি ফুল নিয়ে আসবেন।

মানব একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—কিন্তু ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় পড়তে এলেন কেন? সেখানেও তো কলেজ ছিলো।

—ঢাকা আমার ভালো লাগে না।

—ভালো না লাগবার কারণ?

—অনেক।

—একটা শুনি?

—সেই একটা আপনিই আন্দাজ করে নিতে পারবেন।

একটু স্তব্ধতা।

মানব আবার কথা পাড়িল : কোন ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করেছেন?

মিলিও স্বর অনুকরণ করিয়া কহিল—আপনার এবার কোন ইয়ার?

মানব স্বচ্ছন্দে কহিল—ফোর্থ।

মিলিও হটিবার পাত্র নয় : অনার্স আছে? কোন সাবজেক্ট?

—ম্যাথাম্যাটিকস্। তারপর, আর কী জানতে চান?

—আবার কী জানতে চাইব!

—আমি একজন খুব ভালো বক্সার, ফুটবলে রাইট-হাফ, ট্যাঁস ঠ্যাঙাতে ওস্তাদ—আর কী গুণাবলী চান? নিজেকে অ্যাডভারটাইজ করতে আমার ভালো লাগে! হ্যাঁ, এবার আপনাকে প্রশ্ন করি। ঘাবড়াবেন না তো?

একটা উদ্গত হাসি চাপিয়া মিলি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—না।

—বেশ। মানব নড়িয়া চড়িয়া বসিল : ঠিক-ঠিক জবাব দেবেন। শুকতো কি করে রাঁধে? চিংড়ি মাছের মালাই-কারিতে কি-কি মশলা লাগে?

ছোট-ছোট নুড়ির মাঝখানে নির্ঝরেরেখার খুশির মতো মিলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ক্ষণিক নীরবতা।

মিলি কহিল—আপনাদের বাড়ি কতো দূরে ?

—বা, আমরা তো বাড়ি কতক্ষণ পেরিয়ে এসেছি। এখন চলেছি তো টালিগঞ্জের দিকে। সামনে ঐ ওভার-ব্রিজ দেখছেন ওখান দিয়ে বজবজ-এর ট্রেন যায়। মাঝেরহাট হয়ে আমতলা বেড়িয়ে আসবেন একদিন ?

—আমতলা! সে আবার এমন কী জায়গা!

—অখ্যাত বলেই তো তার আকর্ষণ! যাবেন ?

মিলির নাকের দুইপাশে বিরক্তির রেখা ঘন হইয়া উঠিল : বা, আমার বুঝি খিদে পায়নি! হাওয়া খেলেই বুঝি পেট ভরবে ?

মানবের মুখ অন্যদিকে—স্বর গম্ভীর : একটুখানি উপোস করলেই খিদে পায়, কিন্তু বহুদিন প্রতীক্ষা করেও এমন সুযোগ মেলে না।

আবহাওয়াকে মিলি তরল করিতে চাহিল : ভারি সুযোগ। ট্যাক্সি করে ভোর বেলায় ফাঁকা রাস্তায় বেড়ানো। আপনি যেন কোনোদিন আর বেড়ান না! মানবের চোখ হইতে মিলি নিমেষে কি-যেন পড়িয়া লইল : ও! আমি আছি বলে? এবারের কথা তাহার স্বগত : কিন্তু আমি তো আর দু-দিনেই পালাচ্ছি না।

—কিন্তু রুক্ষ চুল যে আপনার চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করবে। কপালের ওপর চুলের ঐ ঘুঙরি দুটি তৈলমার্জনায় অদৃশ্য হবে। অস্থির হইয়া মিলি যেন কি বলিতে যাইতেছিল তাহাকে বাধা দিয়া : দেখুন কবিতার আইডিয়ার মতো একেকটা সান্নিধ্য ঈশ্বরদত্ত।

না, মিলি এইবার সত্যই কাতর কণ্ঠে কহিল—না, না, এবার ফিরুন।

—বটে! ফিরে চল পাঁয়জি।

ট্যাক্সিটা সত্যই ফিরিল দেখিয়া মিলির স্বর একটু তরল হইল হয়তো : চলুন না একবার বাড়ি, মেসোমশাইর কাছে নালিশ করবো।

মানব মুখে আবার কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোশ টানিয়া দিয়াছে : হ্যাঁ, চলুন না আমাদের আড্ডায়—তিলজলায়। দেখবেন সবাই সেখানে মহিষমশাই। অচেনা লোকের সঙ্গে পথে বেরুলে কী বিপদ হয় টের পাবেন এবার।

দক্ষিণ দিকের পাশাপাশি তিনটি ঘরই মানবের একেলার—এ-পাশেরটা শোবার—বিশেষত্ব এই, শয্যার দুই প্রান্তে দুইটি প্রকাণ্ড আয়না; মাঝেরটা পড়ার বা বসিবার, সংক্ষেপে আড্ডা দিবার; শেষেরটাতে আধাআধি স্নান, সজ্জা ও ব্যায়াম।

মুক্তহস্তে ব্যয় ও মুক্তবাহুতে ব্যায়াম—মানবের ইহাই ছিল ব্রত ও বিলাস; আজ তাহার জীবনে নারীর প্রথম অবতরণ।

এবং এই দিনেই মানবের প্রথম জন্মদিন।

কী-ই বা এমন মেয়ে! কিন্তু ঐ রুক্ষ চুল, হাওয়ায় উড়িয়া-উড়িয়া কপালের কাছে ঘুঙরি করিয়াছে, রাত্রিতে ঘুম না হওয়ায় চোখের পাতাতে একটি ফিকে অবসাদ। ডাক-নাম মিলি!

ইচ্ছা করিলে এ মিলি 'হইতে পারিতো' না, সত্য-সত্যই এ মিলি।

বায়স্কোপ হইতে মানব ফিরিয়া আসিল। তাহার ঘরে বন্ধুরা তখনো জাঁকাইয়া আড্ডা চালাইতেছে। নিখিলেশ, বিজন আর সুধীর। একজন ঘাঁটিতেছে বই, একজন ফুকিতেছে সিগারেট, সুধীর অন্যমনস্কের মতো জানালা দিয়া চাহিয়া রাস্তার জন-যানের শব্দ শুনিতেছে। মানবের মোটর-বাইকের আওয়াজ পাইয়া সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল: এতক্ষণে এলেন।

মানব ঘরে ঢুকিতেই সবাই হৈ-চৈ করিয়া উঠিল।

ইতিপূর্বে দুই কেপ হইয়া গিয়াছে, নিতাই জানিতে চাহিল আর একবার চা দিবে কিনা।

মানব একটা চেয়ারে গা ছড়াইয়া কহিল—আন্।

পরমুহূর্তে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল: ও, তোমার টাকা চাই, না সুধীর? কত?

সুধীর নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া কহিল—যা তুমি পারো।

—যা আমি পারি নয়, যা তোমার দরকার।

—এই ধরো গোটা কুড়ি। কলেজের মাইনে ছাড়া দিদিকেও কিছু পাঠাতে হবে। কোলের ছেলেটা সেদিন শুনলাম মারা গেছে—

—ফিরিস্তি দেবার কিছু দরকার দেখছি না। আর, (নিখিলের প্রতি) তোমাদের ম্যাগাজিনের ছাপাখানার বিল কতো হয়েছে? আছে সঙ্গে? একশো বত্রিশ। নিতাই। (নিতাইর আবির্ভাব) দেরাজ থেকে আমার চেক বইটা

নিয়ে আয় তো। (সুধীরকে) তোমাকে আমি ক্যাশই দিচ্ছি। চাবি নিয়ে যা নিতাই।

বিজনের হয়তো কিঞ্চিৎ চক্ষু টাটাইল : তুমি এতো স্বচ্ছন্দে ধুলোর মতো টাকা উড়োতে পারো।

মানব চেক কাটিতে-কাটিতে : ধুলো ছাড়া আর কি।

বিজন ঠাট্টার সুরে : অসীম বৈরাগ্য দেখছি যে।

নিখিলেশ হাত বাড়াইয়া চেকটা গ্রহণ করিল : যার আছে সে-ই যদি না দেবে, তবে চলবে কেন ?

সুধীরের স্বর কিন্তু উচ্ছল : অনেকেরই হয়তো আছে, কিন্তু এমন দক্ষিণ হাত কারুর নেই।

মানব বিরক্ত হইয়া কহিল—এইগুলোই তোমাদের ন্যাকামি। আমাকেই বা কে দিলে ? কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলাম।

সুধীর চেয়ার ছাড়িয়া কহিল—আমি এবার চলি। আমাকে এখুনি গিয়ে আবার ছেলে পড়াতে হবে।

—এখুনি ? এতো রাতে ?

—আর বলো কেন ? এক বেলা না গিয়েছি কি মাইনে কেটে নিয়েছে।

নিখিলেশও উঠিল : আমিও ফেরার হই। পেমেণ্ট করলে পরে প্রেস ডেলিভারি দেবে।

বিজন রহিয়া গেল।

নিতাই চা দিয়া গেলে ট্রে হইতে এক কাপ তুলিয়া মুখে ঠেকাইবার আগে বিজন বলিল—তুমি আরেকটুকু সংযম অভ্যাস কর, মানু।

কথা বলার ধরন দেখিয়া মনে হয় বন্ধুদের মধ্যে বিজনই বেশি অন্তরঙ্গ, কেননা সে যখন-তখন টাকা চাহে না।

মানব কহিল—কিসের ? অর্থ-ব্যয়ের ?

—এ তো ব্যয় নয়, ব্যসন। দোহাত্তা এমনি উড়োতে থাকলে দুদিনেই দেউলে—

—হব। মানব হাসিয়া বলিল—সেই পরমতম সর্বনাশের লগ্নের জন্যেই তো অপেক্ষা করছি। যতো দিন তা না আসে, নেশা করে যাই।

— নেশা ? বিজন ব্যস্ত হইয়া উঠিল : মদ ধরেছ নাকি ?

মানব মৃদু-মৃদু হাসিয়া কহিল—ধোঁয়া পর্যন্ত আমি গিলি না। ও-সব খেলো নেশায় আমার মন ওঠে না। এ-বিষয়ে আমার আভিজাত্য আছে।

—যথা ?

—ধরো, আমার যা মাসহারা তা দিয়ে যথাসাধ্য আমি পরোপকার করছি। অর্থে আর সামর্থ্যে।

—এ অত্যন্ত মামুলি ! কিন্তু যাকে-তাকেই 'না চিনিতে ভালোবাসার মতো' দান করতে হবে এমন অধিকার তোমার নেই।

— আমার কাছে লোকে এসে প্রার্থনা করবে সে-অধিকারও আমার ছিলো নাকি ? এক দিন যদি সব ভেঙে-চুরে উলটে-পালটে ছত্রখান হয়ে যায়, যাবে। সে-রোমাঞ্চ সহ্য করবার মতো স্নায়ু আমার আছে। আমি স্রোত চাই, নিত্য নতুন পরিবর্তনের বেগ। আমার রক্তে কিসের চাঞ্চল্য আছে তা তো আর তোমরা জানো না।

—কিসের ? বিজনের স্বর একটু সিনিকাল।

—সন্ধানের। সে তুমি হঠাৎ বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমাকে দেখে সত্যিই কি তোমার মনে হয় না যে পৃথিবীতে আমি খুব প্রকাণ্ড একটা দুঃখ পেতে এসেছি ? এই বেশে আমাকে মানায় না—আমি হব রাস্তার মজুর, জেলের কয়েদি, খনির কুলি। কিম্বা এখান থেকে অন্য কোথাও, অন্য কোথাও থেকে আরো দূরে—

বিজন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল : তুমি একেবারে গোল্লায় গেছ।

—তা হয়তো গেছি, কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই। যতক্ষণ সেই পরমক্ষণ এসে না পৌছয়, মুঠি-মুঠি করে মুহূর্তগুলি আমি উড়িয়ে দিয়ে যাই।

সেই সুযোগ একবার মাত্র আসিয়াছিল। ধূসর ভোরবেলায়, ঝরঝরে ওভারল্যাণ্ডে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড হইতে মালেন স্ট্রিট-এ বাঁক নেবার সময়।

তাহার পর বাড়িতে মিলিকে মানব আর চোখ ভরিয়া দেখিতেও পায় নাই। বাঁশের বেড়ার ফাঁকে উঠন্ত রোদের সোনার ঝিকিমিকির মতো টুকরো-টুকরো করিয়া তাহাকে চোখে পড়িয়াছে—ভাঙা-ভাঙা স্বপ্নের মতো। বিলীয়মান স্বপ্ন।

ইচ্ছা করিলেই মানব মিলির ঘরের পর্দা ঠেলিয়া আলাপ জমাইতে পারে না—চাঁদের প্রথম শশীলেখাটির মতো অবসরের আকাশে সোনার সুযোগের ধ্যান করিতে হয়।

এইবার সে কোন মূর্তি নিয়া আসিবে কে জানে।

পাশাপাশি দুইটি মুহূর্তের দুই রকম রঙ—একটি সোনালী, অন্যটি মেটে ; একই মুখ সামনা-সামনি দেখিলে অর্থহীন, অর্ধান্তরেখায় তা সঙ্কেতময়—একই

কথা দুপুরের নির্জনতায় অনর্গল বলা যায়, কিন্তু নিশীথরাত্রির স্তব্ধতায় তা ভাবাও যায় না।

মানব অন্যমনস্কের মতো বারান্দায় পায়চারি করিতেছিল—যে বারান্দা মিলির পড়ার ঘর ছুঁইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গিয়াছে—

মিলির ঘরের দরজায়—বারান্দার দিকের দরজায়—সবুজ পর্দা ঝুলিতেছে; ইচ্ছা করিলেই মানব আর সেই পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিতে পারে না। সেই সোনালী মুহূর্তটিতে মর্চে পড়িয়াছে। মানব তাই বারান্দায় পায়চারি করিতে-করিতে মিলির পড়া মুখস্ত করার মৃদু গুনগুনানি শোনে।

তাহার পায়ের শব্দও তো শোনা যাইতেছে—পড়া কি আর একটু থামানো যায় না!

কতক্ষণ পরেই অনুপমার প্রবেশ—এই দিক দিয়া কোথায় কোনো কাজে যাইতেছিলেন বুঝি। মানব তাঁহাকে পাইয়াই কাহাকে যেন শুনাইয়া বলিয়া উঠিল: আমি কাল রাত্রে রাঁচি যাচ্ছি, মা।

অনুপমা কহিলেন—তা তো যাবি, কিন্তু, মিলি বলছিলো কালকেই ওকে হস্‌টেলে রেখে আসতে।

—কই, আমাকে বলেনি তো।

—তোকে বলতে যাবে কেন? বাড়িতে একা-একা ও হাঁপিয়ে উঠছে।

—বেরুলেই তো পারে।

—কার সঙ্গে যাবে?

—বেড়াতে বেরুবার জন্যেও সঙ্গী চাই নাকি? আমাকে কিছুই বলে না কেন?

পড়া কখন বন্ধ হইয়া যায়।

এবং কাল রাত্রে যে রাঁচি যাওয়া যায় না তাহাও এই সামান্য স্তব্ধতায় স্পষ্ট হইয়া উঠে।

অনুপমা নিচে নামিয়া গেলে মানব এইবার স্বচ্ছন্দে সিল্কের রুমালে ঘাড় মুছিতে-মুছিতে ঘরে ঢুকিতে পারিত। পড়ার ঘর মিলি কেমন করিয়া সাজাইয়াছে তাহাও এ-পর্যন্ত দেখা হয় নাই। টেবিলটা সে কোথায় পাতিয়াছে বা আলনার নিচে শাড়িগুলি তাহার স্তূপীকৃত হইয়া আছে কিনা—এটুকু দেখিলেই তাহার চরিত্র ধরা পড়িত হয়তো। হাতে তাহার কয় গাছি করিয়া ঝুরো চুড়ি আছে তাহাও ঈশ্বর বলিতে পারেন।

রাঁচি যাইবার জন্ত সামান্য স্যুটকেশও কাহাকে গুছাইয়া দিতে হইবে না,

নিতাই আছে। ঘর-দোর সব সময়েই ফিটফাট, দেয়াল মেঝে আয়নার মতো ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে- লোকটা অতিমাত্রায় গোছালো। বই না পড়িয়া শেলফে সাজাইয়া রাখিবার এমন একটুও বড়লোকি বাতিক নাই যে ঘরে গিয়া লুকাইয়া পড়িয়া আসিবে, বরং কলেজ হইতে মিলিই কত রাজ্যের বই আনিয়াছে—পড়িতে যাহা স্নায়ু-শিরা ভরপুর হইয়া ওঠে। মোটর-সাইক্লের যন্ত্রপাতি বা ডন ব্রাডম্যানের কীর্তিকলাপের কাহিনী শুনিতে-শুনিতে মিলিও তাহার কলেজের মেয়েদের দুয়েকটা ন্যাকামি বা দুয়েকটা নাক-সিঁটকানোর সরস উদাহরণ দিতে পারিত।

কিন্তু এই বিরক্তিকর নিঃসঙ্গতার বিরুদ্ধে কোনো নালিশই পেশ না করিয়া আলগোছে সরিয়া পড়িলে লোকে তাহাকে বলিবেই বা কী!

৮

এবং তার পরদিন রাত্রে ঝড় উঠিল।

এক টুকরা সিল্কের মতো আকাশকে কে কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। তারাগুলি আগুনের হালকা ফুলকির মতো শূন্যে উড়িতে-উড়িতে নিবিয়া গেল। অন্ধকারের জোয়ার আসিল।

সেই ঝড়েরই সঙ্গে পাল্লা দিয়া মানব তাহার ট্রায়াম্‌ফ ছুটাইয়াছে।

বাড়ি আসিয়া পৌঁছিতে-পৌঁছিতেই বৃষ্টি—প্রথম ঈষদুষ্ণ, অনেকটা বধূর চুম্বনের মতো—এবং ক্রমশঃ শীতলতর। নিতাই তোয়ালে ও কাপড় নিয়া আসিল। একবার যখন ভিজিয়াছে, ভালো করিয়াই স্নান করিয়া নিবে। বসিবার ঘরে কেহ নাই—বৃষ্টির জন্যই আসিতে পারে নাই বোধহয়। তাহা ছাড়া রাত্রির গাড়িতে মানব রাঁচি যাইবে এমন একটা গুজব কাল সন্ধ্যায় রটিতেছিল।

অতঃপর—শুইবার ঘরে।

আলো নিবানো—ঘর ভরিয়া সুনীল অন্ধকার। পশ্চিমের জানালা দুইটা খোলা এবং তাহারই মধ্য দিয়া অবাধ্য বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া মেঝেটা ভাসাইয়া দিতেছে। কিন্তু এখুনি জানালা দুইটা বন্ধ করিয়া কোনো লাভ নাই—তাহার বিছানায় কে যেন শুইয়া আছে। হ্যাঁ, তাহারই বিছানায়। মিলি—মিলি কখন তাহার বিছানার সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়া ঘুমের পদ্ম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আগের মুহূর্তেও এই অপ্রত্যাশিতের আভাস ছিল না, তবু মানব যেন বহু আগে হইতেই মনে-মনে জানিত। ঝড় মিলিকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

মানব খাটের দিকে আগাইয়া আসিল এবং মিলিকে ভালো করিয়া চিনিতে

অল্প-একটু মুখ বাড়াইল। অন্ধকারে এমন দেখা ঠিক আত্মায় অনুভব করিবার মতো।

কিন্তু এতো মিলি নয়—এ তাহার মা'র মতো। সুমতির মতো। মুখে তেমনি একটি আভাময় পাণ্ডুরতা—শুইবার ভঙ্গীতে তেমনি যেন শ্রান্তি।

স্পষ্ট ও গভীর অন্ধকারে মিলিকে মনে হয় ট্র্যাজেডির নায়িকা।

মিলিকে মানব স্পর্শ করিবে। ঝড় তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে—বৃষ্টি আনিয়াছে—ঘুম। স্পর্শ করিয়া তাহার ঘুম ভাঙাইবে। এমন রাতে তাহাকে স্পর্শ না করিবার মতো অতৃপ্তি সে বহন করিতে পারিবে না।

অগত্যা মানব মিলিকে স্পর্শ করিল—আলো না জ্বালাইয়াই—স্পর্শ করিল দেহে নয়, মুঠি ভরিয়া কতগুলি চুল লইল। এবং জাগিয়া উঠিয়া সমস্ত পৃথিবীতে মিলির আর মরিবার জায়গা রহিল না।

মিলি জাগিয়া উঠিল প্রেস-ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাশলাইটের চেয়েও দ্রুত।

মানব দিল আলো জ্বালাইয়া। এবং সেই রূঢ় ইলেকট্রিক আলোতেও স্পষ্ট দেখা গেল সামনে যেন তাহার মা বসিয়া। মিলির সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া তাহার মা'র ম্লান ছায়া নামিয়াছে—গভীর কালো দুই চোখে—মিলির চোখের মণি যে এত কালো তাহা কে কবে জানিত—তাহার দুইটি হাতের তালুতে, কানের পাশ দিয়া চুলের গুচ্ছ পুঞ্জিত হইয়া নামিয়া যাইবার রেখাটিতে! সেই তাহার দুঃখিনী মায়ের প্রতিমা!

মানবের তন্ময় চোখের সামনে পড়িয়া মিলি স্তূপীকৃত শাড়ি হইতে চাহিল। এবং ভুলক্রমে মানবের বিছানায় একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই—একমাত্র সেই কারণেই এখন আর তাহার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কোনো মানে হয় না।

সেই সময়ে একটা বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিতেই মিলির সাহস হইল। না-হাসিয়া তাহার আর উপায় ছিল কী: আপনার ঘর দেখতে সাহস করে ঢুকে পড়েছিলাম —কালই আমি হস্টেলে যাচ্ছি কিনা—

মানবের মুখে সেই সম্বিৎসু হাসি যা দৃষ্টিকে রমণীয় করিয়া তোলে: আমিও তো আজ রাঁচি যাচ্ছিলাম। কিন্তু কী বিচ্ছিরি রাত করে এলো দেখেছ! আই মীন—কী সুন্দর রাত! চা খাই, কি বলো? নিতাই!

নিতাই তটস্থ। চা আসিতেছে।

মিলি বলিল—কেমন করে যে ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝতে পারছি না—

মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া মানব: চুল ছড়িয়ে বাঁ কাৎ হয়ে—

বাহিরে এমন অজস্র বৃষ্টি ও দুর্দান্ত ঝড় না থাকিলে এই কথা কখনোই মানবের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না।

—একে শীতের বেলা তায় আসছি লাস্ট ট্রিপএ, শরীর ভেঙে পড়েছে, ঘরে ঢুকেই দেখি দিব্যি বিছানা পাতা। হাসিতে-হাসিতে মিলি হাত তুলিয়া এলো চুলে একটা ফাঁস বাঁধিতে লাগিল।

ফাঁস বাঁধা হইয়া গেলেও মিলি উঠিল না।

মানব কহিল—বাইরে এমন ঝড়, তার মধ্যে তোমার ঘুম এলো?

—সেই তো আশ্চর্য! জানালাগুলি বন্ধ করুন না।

মানব জানালা বন্ধ করিতে-করিতে: তুমি নাকি একা-একা একেবারে হাঁপিয়ে উঠছ?

সামান্য একটু লজ্জিত হইয়া মিলি কহিল—নিশ্চয়। তাই তো ভাবছি হস্‌টেলে চলে যাবো।

—ভাবছ? মানবের কাছে মিলি ধরা পড়িয়া গিয়াছে: কালই যাবে না তাহলে?

—আপনিও তো আজ আর রাঁচি যাচ্ছেন না।

—দেখছ না কী বৃষ্টি!

—বা, বৃষ্টিতেই তো যেতে মজা।

মানবের মাথায় চট করিয়া এক আইডিয়া আসিল: চলো না। বেড়াতে বেরুই। আমার মোটর-বাইকে।

কথাটা আয়ত্ত করিতেই মিলির দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। একটু থামিয়া ধীরে সে কহিল—দাঁড়ান, চা-টা খেয়েনি।

চা খাইয়া নিতে-নিতে বৃষ্টি থামিয়া গেল। বর্ষণান্তে ভিজা মলিন আকাশের মতোই ঘোলাটে মিলির হাসি! মুখ হইতে চায়ের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া: এই যা!

—তাতে কি? বেড়ানোটাই উদ্দেশ্য।

—মিথ্যে কথা। বৃষ্টিটাই কারণ।

মানব থামিয়া গেল। ঘনীভূত অন্তরঙ্গতায় শীতল মুহূর্তটিকে তপ্ত করিবার ইচ্ছায় মানব চেয়ারটা খাটের কাছে টানিয়া আনিল। মিলি কিন্তু একটুও সরিয়া বসিল না।

ঠিক, ঠিক তাহার মায়ের মুখ! মানবকে ঘুম পাড়াইতে-পাড়াইতে যে-মুখ নিচু হইয়া তাহার চোখের পাতায় চুমু খাইয়াছে। এই সেই মুখ—দুঃখিনী

কঙ্কাবতীর গল্প বলিতে-বলিতে যে-মুখে নরম মোমের আলো পড়িয়া বেদনায় কোমল দেখাইত! এই মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া কতো রাতে মানবের দেহ ভরিয়া ঘুম আসিয়াছে।

মিলির দুইটি চক্ষুর জানালায় বসিয়া মা যেন তাহার দিকে ক্ষণে-ক্ষণে উঁকি মারিতেছেন।

স্টেশনে মিলির মুখকে মনে হইয়াছিল কলিকাতার আকাশের মতো সাধারণ বিরস—এখন মনে হইল সে-মুখে গভীর প্রশান্তি! সমস্ত মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া একটি অন্তরলালিত বেদনার সুষমা! মিলিও যেন তাহারই মতো জীবনে অমিত দুঃখ পাইতে আসিয়াছে।

ঘন নিঃশব্দতায় অন্ধকার ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

মিলি বসিয়া-বসিয়া হাতের চুড়িগুলি নিয়া মৃদু-মৃদু নাড়া-চাড়া করিতেছে, আর মানব দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া অকারণে পকেট হাঁটকায়।

বৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে সে-মুহূর্তটি মিলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত আকাশে তাহার একটি কণিকাও আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। এখন আবার সেই কঠিন ও করুণ স্তব্ধতা!

মানবের আজ আর রাঁচি যাওয়া হইল না, মিলি হস্টেলে যাইবে কিনা সে-কথা না-হয় পরে ভাবিয়া রাখা যাইবে, চা-ও এক পেয়ালা করিয়া উদরস্থ করা গেল—তারপর? এইবার হাই তুলিতে হইবে নাকি? এমন করিয়া বৃষ্টি আসার যে কোনোই মানে হয় না—তাহা তো স্বচক্ষেই দেখা যাইতেছে, পরস্পরকে তাই বলিয়া তাহা মনে করাইয়া দিতে হইবে নাকি? অতএব মিলি খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল: যাই, আমার এখনো চুল বাঁধা হয়নি।

বলিয়া ঘর ছাড়িয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া যাইতে তাহাকে দরজার কাছে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। বৃষ্টি বন্ধ হইলেও ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া তখনো ঝড় বহিতেছে—ঢেউয়ের মতো উচ্ছ্বসিত হাওয়া হঠাৎ মিলিকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিল। তাহার খোঁপা খসিয়া পড়িয়া এক-পিঠ চুল রাশি-রাশি কালো শিখার মতো চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল; শাড়িটা গায়ের সঙ্গে সহসা লিপ্ত হইয়া যাইতেই দেহের প্রতিটি রেখা সূক্ষ্ম ও লীলায়িত হইয়া উঠিল। অবিন্যস্ত বেশ-বাস লইয়া ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে সেই যে মিলি সামান্য একটু বাধা পাইল, তাহাতে কী যে সুন্দর লাগিল, দুই চোখ ভরিয়া দেখা আর মানবের কুলাইয়া উঠিল না।

৯

মানবের শুইবার ঘর : রাত বারোটা বাজিয়া দশ মিনিট :

মিলিকে দেখিয়া তাহার মাকে আজ অত্যন্ত কাছে মনে হইতেছে। রোগে কৃশ, নিরাভ, বিমর্ষ মা'র মুখ। আয়নার মতো ঠাণ্ডা অন্ধকারটি যেন মার অন্তরঙ্গ উপস্থিতি। মা তাহার আজ কোথায়? তাহাকে এই সৌভাগ্যের হাটে পৌঁছাইয়া দিয়া তিনি কোথায় পথ হারাইলেন? কেহ বলিয়াছে কোন সালে না-জানি কলিকাতার কোন কোন বস্তিতে কলেরা লাগিয়াছিল, সেই যে তিনি হাঁসপাতালে গেলেন, আর ফিরেন নাই; কেহ ইহার চেয়েও জঘন্যতর কথা বলে। মানব তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না, বরং তিনি চলন্ত ট্রেনের তলায় পড়িয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছেন ভাবিতে তাহার স্বস্তিবোধ হয়।

সেই মা-কে মানব বহুবার ভাঙা-চোরা চাঁদের মতো বহু জনের মুখে ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়াছে, কিন্তু মিলির মাঝেই সে তাঁহাকে আজ ঘনিষ্ঠ ও সম্পূর্ণতম করিয়া দেখিল—প্রতিটি গতিরেখায় উল্লসিত, প্রতিটি দৃষ্টিপাতে সমাহিত, সৌম্য! এই প্রচুর ও প্রগলভ চাকচিক্যের অন্তরালে মার উপবাসখিন্ন দুঃখী মুখখানি সে ভুলিতে পারে না।

মিলির শুইবার ঘর : রাত বারোটা বাজিয়া দশ মিনিট :

পাশের বাড়ির ছাতে একটা বাতি দেখা যাইতেছে। বোধহয় -- তাই দেখিবার জন্য মিলি মানবের বিছানায় সামান্য-একটু গা এলাইয়াছিল। একেবারে কাৎ না হইলে বাতিটা চোখে পড়ে না; কিন্তু বাতি দেখিতে-দেখিতে মিলি মেঘ দেখিল। সেই মেঘ ক্রমশ ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকাইতে-পাকাইতে আকাশময় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—অন্ধকার মাটির মতো ঠাণ্ডা ও ব্যথার মতো নিবিড় হইয়া উঠিল এবং বৃষ্টি আসিবার আগেই কখন যে তাঁহার চক্ষু ভরিয়া ঘুম নামিয়া আসিল কে বলিবে।

জাগিয়া দেখিল চারিদিকে ঝড় আর জল - সামনে মানব; আর সে কিনা এতক্ষণ কিছুই টের পায় নাই। মানব তাহাকে না জানি কী ভাবিয়া বসিয়াছে!

কিন্তু ঘুমাইয়া যখন পড়িয়াছিলই, তখন না জাগিলেই তো পারিত। কেন যে জাগিয়াছে মিলি যেন স্বপ্নে তাহার ইশারা পাইয়াছে কিন্তু মানবের সেই স্পর্শে মিলির মনে আরেকটি মুখ জাগিয়া উঠিল—সে তাহার খেলার সাথী—নাম নরেন। দুইজনে কলাই-শাকের খেতে ছাগল তাড়াইয়া কতো ছুটাছুটি করিয়াছে, পেয়ারা গাছের ডালে নারকেলের দড়ি বাঁধিয়া বালিশ ভাঁজ করিয়া বসিয়া কত দোল

খাইয়াছে, কতো দুপুরে বোতলের গুঁড়া করিয়া গাবের আঠার সঙ্গে সুতায় মাঞ্জা দিয়া তাহারা দুইজনে ঘুড়ি উড়াইয়াছে।

রাত্রির এই মলিন ও ভিজা কয়েকটি মুহূর্ত সেই কিশোর নরেনের স্মৃতিতে ভরিয়া উঠে।

গর্জমান ভাঙন-নদী – বান দেখিবার জন্য নরেন দুপুরবেলায় কখন না-জানি একা-একা চলিয়া আসিয়াছে। আগের দিন মিলিকে লইয়া মড়াপোড়া দেখিবার জন্য সে কাহাকেও না বলিয়া শ্মশান-ঘাটে চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া মিলির বাবা নরেনকে ঠাসিয়া বকিয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্যই সে রাগ করিয়া মিলিকে সঙ্গে লয় নাই। সঙ্গে লইলে মিলি নিশ্চয়ই নদীর পারে একাকী তালগাছটার তলায় নরেনের গা ঘেষিয়া দাঁড়াইত—এক ঝাঁক গাঙ-শালিকের মতো দূর হইতে কখন বান আসে তাহাই দেখিবার আগ্রহে মিলিও নিশ্চয় নরেনের মতোই টের পাইত না পায়ের তলে কখন প্রকাণ্ড চিড় ধরিয়া তালগাছ সুদ্ধ জমিটা আলগা হইয়া অসিয়াছে। তাহা হইলে সেও নিশ্চয় নরেনের মতোই ঢেউয়ে ভাসিতে-ভাসিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত কে জানে।

কতো দিন ধরিয়া কতো খোঁজ করা হইল, রাক্ষুসি নদী নরেনকে কিছুতেই ফিরাইয়া দিল না।

মানবের স্পর্শে আজ তাহার জীবনের প্রথম বেদনার কথাটি মনে হইতেছে।

সেই নরেন আজ যৌবনে বলদৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষের সৌন্দর্য বাহুতে, নারীর যেমন করতলে। নারীর যদি গ্রীবায়, পুরুষের স্কন্ধে।

সেই নরেন আজ ঢেউ ভাঙিয়া সমুদ্র ডিঙাইয়া মিলির জীবনে কুল পাইল নাকি।

এই সংসারে মানবের এই আকস্মিক প্রতিষ্ঠার নানা-রকম কাহিনী শুনিয়া সে এখানে আসিবার আগে হইতেই মানবের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু যাহা কিছু চেষ্টার তাহা ইচ্ছার কাছে অবশেষে হার মানিয়া যায়।

যে-বসন্ত অরণ্যে মুখর, তরঙ্গে ফেনায়িত, আকাশে সুনীল—সেই বসন্তই মিলির দেহে রেখাসঙ্কুল ও আত্মায় অনুভবময় হইয়া উঠে। মিলি বুকের উপর দুই হাত উপুড় করিয়া রাখিয়া একমনে সমস্ত দেহের রক্ত চলাচল শুনিতে থাকে।

মাঝখানে মাত্র এক দেয়ালের ব্যবধান।

বহু স্তব্ধতার; বহু প্রতীক্ষার, অনেক অনুনয়ের।

মানব চুল ব্রাস করিতে-করিতে এই ঘর থেকে : তোমার হল ?

মিলি কাঁধের কাছে ব্রোচ আঁটিতে-আঁটিতে ও-ঘর-থেকে : প্রায়।

দুইজনে নিচে নামিয়া আসিল। মিলির পরনে শিল্কের মোলায়েম শাড়ি, উদয়াস্তের আকাশের মতো লাল! অতিমাত্রায় প্রখর ও প্রকাশিত হইতে না পারিলে মিলির বুঝি লজ্জার আর অন্ত থাকিত না। এই শাড়ির আবরণে সে নিজের কুণ্ঠাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

মানব কহিল সাইড-কারটা আর চলে না এখন। পেছনে বসতে পারবে না? মিলি ভয় পাইয়া কহিল—যদি ছিটকে পড়ে যাই!

—পড়বে কেন? ভয় করলে স্বচ্ছন্দে আমার কাঁধ ধরবে।

মিলি হাসিয়া ফেলিল : তা হলে আপনাকে সুদ্ধু। আর ভয় নেই।

বুক বিস্ফারিত করিয়া মানব হাওয়ায় চুল ও শার্টের চওড়া কলারটা উড়াইতে-উড়াইতে প্রায় উড়িয়া চলিয়াছে। পাশে মিলি স্তব্ধ ও সঙ্কুচিত। শুধু দুই তিনটি চুল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো ভুরুর কাছে কখনো বা চোখের পাতার উপর ঘুরিয়া-খেলা করিতেছে; এমন ভাবে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে যে দেখিলে মায়া হয়।

মিলি না বলিয়া পারিল না : আরেকটু আস্তে চালালে কি ক্ষতি হতো? মানব মিলির দিকে দৃকপাত না করিয়াই কহিল—সাড়ে-ছ'টা এই বাজলো। এখুনি ঘোর অন্ধকার হয়ে যাবে।

আরেকটু হইলে ঐ বিয়ুইকটার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়াছিল আর কি! এক চুলের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে। মিলি দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিল। মানব হাসিয়া কহিল—তুমি নিতান্ত ভীতু। ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যেতে তোমার ভালো লাগে না? বলিয়া লিণ্ডসে ষ্ট্রিটে সে বাঁক নিল। মিলির ঠোঁটে হাসি—হাসিলে আবার চিবুকের ডান দিকে ছোট একটি টোল পড়ে : সব চেয়ে ভালো লাগতো যদি দয়া করে আমাকে ফুটপাতে নামিয়ে দেন। আমি একটা রিকসা ডেকে বাড়ি ফিরি।

মানব কহিল—বেশ তো, দুজনে একদিন না-হয় রিকসা চড়েই বেড়ানো যাবে। এ যেন তুমি অনেক দূরে বসে আছ।

কথাটা মিলির মানবের ছোঁয়ার মতোই মনোরম লাগিল।

সিনেমায় পিছনের দুইটা গদি-আঁটা চেয়ারে দুইজনে বসিয়াছে—মাঝে একটা হাতলের মাত্র ব্যবধান। মিলি কনুইটা আঁচলের তলায় গুটাইয়া নিল।

পর্দা কথা কহিতেছে বটে, কিন্তু পরস্পরের সান্নিধ্যে অভিভূত দুইজনে স্তব্ধ হইয়া বোধ করি একটি অপ্রত্যাশিত স্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সমস্ত ঘর ভরিয়া মধুর ও সুগন্ধময় অন্ধকার!

মানব হাত বাড়াইয়া মিলির হাতের নাগাল পাইল—সে-হাত ধরা দিবার জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। মানব মিলির হাতখানি মুঠার মধ্যে তুলিয়া লইল। আবেগে যে-বাণী অর্ধস্ফুট, আবেশে যে দৃষ্টি অর্ধনিমীল—ঠিক তাহাদেরই অনুরূপ এই স্পর্শকুণ্ঠ হাতখানি—পায়রার বুকের মতো ভীরু! মানবের মুঠির মধ্যে মিলি তাহার হাতখানি যেন ঢালিয়া দিল—মানব এই স্পর্শের মধ্য দিয়া মিলির হৃৎস্পন্দন শুনিতেছে।

এই স্পর্শের মধ্য দিয়া মিলি তাহার আত্মাকে অবারিত করিয়া দিয়াছে। মানবের সমস্ত চেতনা অনুভবের গভীরতায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠে।

তার পর দিন প্রিনসেপস ঘাট:

সন্ধ্যার আকাশে মৃত সূর্যের ঐশ্বর্য, মুখর নগরের চলমান শোভাযাত্রা দেখিতে মেঘের বাতায়নে ঐ দূর প্রবাসিনী তারাটির সলজ্জ দৃষ্টি, সমুদ্রের ঢেউ ভাঙিয়া পারহীন পরিধিহীন নিরুদ্দেশের পানে যাত্রা কী যে সে উন্মাদনা, নিয়মিত ও পরিমিত জীবনের ছোট সুখ লইয়া দিনকাটানোর চেয়ে দুই বিশাল ও শক্তিশালী পাখা ঝঞ্ঝা-বিদীর্ণ আকাশে বিস্তারিত করিয়া দিতে কী যে সে রোমাঞ্চ, অভ্যাস নয়, বৈচিত্র্য--গতানুগমন নয়, অগ্রগতি—এই সব কথার শেষে:

মিলি বলে—ঐ একটা নৌকো করে একটু বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? মানব তক্ষুনি নৌকা ঠিক করিয়া ফেলে। মানব পাটাতনের উপর লাফাইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া মিলিকে পার হইতে তুলিয়া আনে। স্রোতের ফুলের মতো হালকা নৌকাটা ঢেউয়ের গায়ে-গায়ে দুলিয়া-দুলিয়া চলে। মানব বলে—এই যেমন তুমি! আমার জীবনে অভ্যুদয় তোমার নবীন—সমস্ত পুরানো খোলস আমি খসিয়ে এসেছি।

মিলি হাঁটুর উপর গাল পাতিয়া ঢেউয়ের ছলছলানি শুনিতে-শুনিতে তন্ময় হইয়া বলে—আর আমার জীবনে আপনার অভ্যুদয় প্রথম—এখান থেকেই হয়তো আমার জীবনের সত্যিকারের সূচনা।

রাত্রি একটু-একটু করিয়া ঘনাইয়া আসে—নদীর জলের উপরের ম্লান ও শীতল স্তব্ধতাটি অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। মানব মিলির কথা—বাড়ির কথা, শৈশবের কথা সব খুঁটিয়া-খুটিয়া জানিতে চায়।

মিলি উৎসাহিত হইয়া বলে: পুরোনো বাড়ি বেচিয়া তাহারা কবে নতুন

বাড়িতে উঠিয়া আসিয়াছে, দক্ষিণে নদী শুকাইয়া প্রকাণ্ড চর পড়িয়াছে একটু-একটু করিয়া এখন আবার ভাঙিতেছে নাকি—তিন বৎসর হইল তাহার মা মারা গিয়াছেন, সেই হইতে বাবা কেমন উদাস হইয়া পড়িয়াছেন, নিরালায় বসিয়া খালি সেতার বাজান—একবার ছুটিতে সে দেশের বাড়িতে বেড়াইতে যাইবে—সে এতকাল ঢাকায় পড়িতেছিল, কলিকাতায় না আসিলে তাহার জীবনে সত্যকারের রঙ ফুটিবে না বলিয়াই এখানে কলেজে সে পড়িতে আসিয়াছে।

একটা ফেরি-ষ্টিমার এ দিক দিয়া আসিতেছে।

মানব কহিল—ছেলেবেলায় তোমার জীবনে একটাও কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটেনি? বলো না একটা।

মিলির মনে নরেন-দার মৃত্যুর কথাই জাগে—উহা ছাড়া এমন আর কী ঘটিয়াছে যাহা মনে করিতে আজো তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠে! চোখ বুজিয়া তাহার মুখ মনে করিতে গেলে খালি সেই রাক্ষুসি নদীর কথাই মনে পড়ে—সে-মুখ জলের মধ্যে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে।

প্রথমতম দুঃখানুভবের কথা বলিতে-বলিতে মিলির চোখ রাতের নদীর মতো স্নিগ্ধ হইয়া উঠে; সেই চোখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে-থাকিতে মানবের আবার মা'র কথা মনে পড়ে।

মিলি বলে—আপনার কথাও কিছু বলুন না—

কিন্তু হঠাৎ দুর্বল নৌকাটা ভীষণভাবে দুলিয়া উঠিল; নদী আর নির্জীব নয়, ঢেউগুলি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—নৌকাটা বুঝি এইবার উলটাইবে।

মিলি চোখের পলকে মানবের কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। উচু তালের পাতার মতো মিলির বুক কাঁপিতেছে, শরীরে যতখানি ভয় ততখানি স্নেহ—নরেন-দার সঙ্গে এইবার তাহাকেও বুঝি জলের তলায় বাসা নিতে হইল! নরেন-দা তাঁহাকে সেই চির-বিস্মৃতির দেশে ডাকিয়া নিতে আসিয়াছে বুঝি।

মানব মিলির পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল: ভয় নেই ষ্টিমারটা পাশ দিয়ে চলে গেল কি না, তাই নৌকাটা টাল সামলাতে পারেনি। মাঝিরা বেশ হুঁসিয়ার।

নদী ফের প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিতেছে, তবু সেই স্পর্শসান্নিধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সরাইয়া নিতে মিলির কেমন যেন ইচ্ছা হয় না। সর্বাঙ্গ দিয়া একটি নিবিড় উত্তাপের স্বাদ পাইতে থাকে। বলে—পাড়ে নৌকা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলো।

কপালের উপর হইতে তাহার কয়েকটি চুল কানের পিঠের দিকে তুলিয়া দিতে-দিতে মানব বলিল—তুমি নিতান্তই মেয়ে, মিলি। বেশ তো, এক সঙ্গে না-হয় ডুবেই যেতাম।

মিলির মুখে এইবার হাসি ফুটিয়াছে : পাড়ের কাছে এসে পড়েছি কিনা, তাই এখন যতো বীরত্ব! ষ্টিমারের চাকার তলায় পড়লে তখন বোঝা যেতো আপনিও নিতান্ত ছেলে কিনা। আপনিও তো কম কাঁপছিলেন না।

মানব হাসিয়া কহিল—সে কি ভয়ে নাকি? তোমাকে নিয়ে মরবার চমৎকার সম্ভাবনায়। তুমি কিচ্ছু বোঝ না।

—দরকার নেই বুঝে। বুঝতে গেলেই ফরসা। তার চেয়ে দয়া করে বাড়ি নিয়ে চলুন।

—বাড়ি ফিরবার পথও বিশেষ সমতল নয়। জলে যদি নৌকা, ডাঙায় তেমনি মোটর। মরতে তোমার এতো ভয়?

—এতো ভয়! চোখ বুজে রাম-রাম জপতে-জপতে যদি কোনোরকমে এবার তরে যাই, তবে বিছানা ভরে গা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে সে যে কী আরাম পাবো, আপনার সঙ্গে মরে তার এককণাও পাওয়া যাবে না। ঐ তো ঘাট, না? বাঁচলাম।

এক নিশ্বাসে পথ ফুরাইয়া গেল। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া মিলি মুখে কিছু গুঁজিল, কি না-গুঁজিল, তারপর বকের পাখার মতো নরম তকতকে বিছানা!

বলা-কহা নাই, কেনই বা যে পাশ দিয়া ষ্টিমার ছুটিয়া আসে, নৌকা বেসামাল হইয়া উঠে, মাঝিরা হিমসিম খায়—সমস্ত দৃশ্যজগৎ আড়াল করিয়া মুহূর্তের জন্য মৃত্যু ঘন হইয়া আসে।

কেন এমন হয়!

খোলা জানালা দিয়া শীতের ধোঁয়াটে আকাশের দিকে মিলি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে—সারা আকাশে কোথাও এতটুকু উত্তর লেখা নাই!

তার পর ফিরপোতে—একতলায় :

মুখোমুখি চেয়ারে মিলি আর মানব—টেবিলের উপর রাশীকৃত খাদ্য। মিলি কোনোদিন তাহাদের নামও শোনে নাই; দাম জানিয়া এইবার সে দস্তুরমতো রাগ করিল।

কহিল- এমনি করে আপনি খালি টাকা উড়োন কেন?

চিবাইবার শব্দ করিতে-করিতে মানব নির্লিপ্তের মতো কহিল – টাকা আছে বলে।

—আছে বলেই কি এমনি অপব্যয় করতে হবে নাকি?

—অপব্যয় হচ্ছে অজস্রতার প্রমাণ। হাতে যা আছে—তা ত্যাগ করতে না পারলে আমি মুক্তি পাই না।

কাঁটা-চামচের মৃদু-মৃদু শব্দ করিতে-করিতে মিলি বলিল—মেশোমশাই আপনাকে এতো টাকাও দেন।

ঘাড় হেলাইয়া মানব কহিল দেন। ফুরোলে যদি ফের হাত পাতি, সে-প্রার্থনাও অপূর্ণ থাকে না। কার জন্যেই বা এতো টাকা জমাচ্ছেন তিনি? একদিন আমার হাতেই তো এসে পড়বে। তবে যৌবনের এ কয়টা দিনকে দীপ্ত ও তপ্ত করে যাই না কেন!

মিলি কি বলিতে যাইতেছিল তাহাতে বাধা দিয়া: পূর্ব-পুরুষের সঞ্চিত টাকা উত্তরাধিকারীরা সাধারণত যে-রকম করে ভোগ করে সেই প্রথাটা বড্ড পুরানো হয়ে গেছে। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র আভিজাত্য নেই। মদ বা তার আনুষঙ্গিক অনুপানগুলিতে না আছে স্বাদ, না বা মাদকতা। জীবনকে ভোগ করা অর্থ নিজেকে ক্ষয় করা নয়। আমার আদর্শ মহত্তর।

বিশ্বাসগভীর আয়ত দুইটি চোখ তুলিয়া মিলি কহিল—যথা?

—আমার ভোগ করার আদর্শ নিজেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া—কর্মে, প্রচেষ্টায়, অনুধাবনে। এ তুমি আমার কি ব্যয় দেখছ? আমি নিজেকে কতো দূর পর্যন্ত উজাড় করে দিতে পারি তা তুমি জানো না। কিন্তু খেতে আর ভালো লাগছে না, না?

মিলি স্বচ্ছন্দে খাবারের প্লেটটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল—একটুও না!

—তবে চলো, এবার পালাই।

বিল দেখিয়া মিলির চক্ষু স্থির: সাড়ে বাইশ টাকা?

মানব পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিতে-করিতে হাসিয়া কহিল—তাই শুধু নয়, ওয়েটারকে আড়াইটে টাকা বকশিস দিতে হবে।

—আড়াই টাকা? মিলি আকাশ হইতে পড়িল: কিন্তু কী বা আপনি খেলেন!

—এতো খাওয়ার জন্যে নয়, তোমাকে নিয়ে খাওয়ার জন্যে।

—এমনি করে ধুলো-মাটির মতো দু-হাতে টাকা উড়াতে থাকলে আপনার আর ছড়িয়ে পড়বারই বা বাকি কি? দুদিনেই সম্পত্তি যাবে উবে, একটি বৃহদাকার শূন্য আপনার মূলধন।

মানব মিলির মুখের দিকে চাহিতে পারিল না: সে-শূন্য আমার জমার ঘরেরই শূন্য, মিলি। তুমি কাছে থাকলে সেই শূন্যই আমার ঐশ্বর্য হয়ে উঠবে।

এ-সব কথা শুনিতে মিলিরও ভালো লাগে।

মানব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল : চলো, বেরুই।

রাস্তার ও-ধারে মির্জা গাড়ি নিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—মিলির সঙ্গে গাড়িতে একটু আলস্যসুখ ভোগ করিবার জন্যই মানব মির্জাকে নিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখন আর গাড়ি নয়। মানব কহিল—চলো, মাঠে একটু হাঁটি।

নিশ্বাস ভরিয়া শিশিরার্দ্র অন্ধকারের গন্ধ নিতে-নিতে মানব কহিল—আমার রক্তের মাঝে এক বৈরাগীর বাসা আছে, মিলি। সে আমাকে এক মুহূর্তও বিশ্রাম করতে দেয় না। এইখানে এসো একটু বসি।

মিলি আর মানব মুখোমুখি বসিল। দুইজনকে ঘিরিয়া একটি মধুর অনির্বচনীয় স্তব্ধতা রাশীকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই নিঃশব্দতাকে মিলির কেমন যেন ভয় করিতেছে। সে যেন নিমেষে আত্মার এই অপার নিঃশব্দতায় তাহার অস্তিত্ব-বোধকে হারাইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ দুইজনে তাহারা এমন করিয়া চুপ করিয়া গেল কেন? ও-পারে চৌরঙ্গীতে সারি সারি আলো ও কোলাহলের টুকরা— এ-পারে একটি অনিমেষ প্রতীক্ষা—কে কখন আগে সম্বোধন করে।

মানবই কথা কহিল—তোমাকে দেখে খালি আমার মা'র কথা মনে পড়ে, মিলি।

বলিতে-বলিতে গভীর স্নেহে মানব মিলির বাঁ-হাতখানি হাতের মুঠায় তুলিয়া লইল। সেই স্পর্শে তাহার মা'র সান্ত্বনাটি অম্লান হইয়া আছে। হাতখানি কখনো ছাড়িয়া দেয়, আবার কখনো গ্রহণ করে, কখনো কপালের উপর রাখে, কখনো-বা নিচু হইয়া তাহাতে মুখ ঢাকে। মিলির দেহ অন্ধকারের মতো নিঃশব্দ-স্পন্দিত হইতে থাকে।

মিলি কহিল—আপনার মা এখন কোথায় আছেন কিছুই জানেন না?

—আছেনই বা কিনা তাই বা কে জানে। আমার বাবা সন্ন্যাসী, মা গৃহ-ত্যাগিনী—একজনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও আরেকজনের দুঃখ, একজনের ঔজ্জ্বল্য ও আরেকজনের গভীরতা—আমার দিন-রাত্রি এই দুই সুরে বাঁধা আছে। আমি নিজের কথা খুব বেশি বলতে চাই—আমার বিষয় আমি নিজেই—

—বেশ তো বলুন না। আপনার মা'র কথা আমার এতো জানতে ইচ্ছা করে।

—আমারো। কিন্তু কী করেই বা জানবো বলো।

—কী করে এ-বাড়িতে আপনারা এলেন, কেনই বা তিনি চলে গেলেন—

মানব উদাসীনের মতো কহিল—সব এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু

তোমার মুখ দেখে আমার ভয় হয় মিলি, মা'র হয়তো আর দেখা পাবো না। এই বলিয়া মানব মিলিকে নিজের কাছে আকর্ষণ করিল।

মিলি টলিল না, কহিল—সতীশবাবু আপনাকে তা হলে পোষ্য নেননি? তবে—

—না। এ-সব কথা এ-সময়ের জন্যে নয়। এবার উঠবে?

—না, আরো একটু বসি।

কিন্তু যে-দিনের কথা বলিতেছিলাম :

মিলি মোটর সাইকেলে মানবের পিছনেই বসিয়াছে—ভয় করিতেছে বটে, কিন্তু এই বেগের আনন্দ তাহার দেহের প্রতিটি রেখায় উচ্ছলিত। পরনে শাদা-সিধে শাড়ি—আঁচলটা দড়ির মতো পাকাইয়া কোমরে বাঁধা, তাহাতে সমস্ত শরীরে একটি ক্ষিপ্রতা আসিয়াছে। একটা এলো খোঁপা বাঁধিয়া আসিয়াছিল, গাড়ির ঝাঁকুনীতে খোঁপা কখন খুলিয়া গিয়া পিঠময় চুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হাত তুলিয়া হাওয়াকে শাসন করিবার যো নাই।

একটা মোটরকে পাশ কাটাইয়া মানব কহিল—একটা দুর্ঘটনা ঘটলে কেমন হয়?

মিলি বলিল—চমৎকার। আমার আর ভয় নেই।

—ভয় নেই?

—না। চাই-ই এমন দ্রুত ছোটা আর দ্রুত পদস্খলন। তার জন্যে আমি তৈরি হয়ে আছি। মিলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বালিগঞ্জ এভিনিউ হইয়া গড়িয়াহাট রোডে দু-তিন চক্কর দিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। রাস্তার পাশে গাড়ি রাখিয়া দুইজনে ঘাসের উপর বসিল। পথে লোকজন বেশি চলাফেরা করিতেছে না।

মানব বলিতে লাগিল : দুদিন বাবার প্রতীক্ষায় সেই স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টারে থেকে গেলাম, কিন্তু একবার যখন সরেছেন তখন আর যে তিনি ফিরবেন না—মা'র এই সন্দেহ কিছুতেই দূর হচ্ছিল না। অন্যায় যদিও বা তিনি করেন তো অনুতাপ করতে শেখেননি। নিশ্চিত মুক্তির কাছে স্ত্রী-পুত্র তাঁর কাছে একান্তই তুচ্ছ মনে হয়েছিলো। বাবাকে আমি দোষ দিতে পারি না, মিলি।

মিলি বিস্মিত হইল : এই নিষ্ঠুরতাকে আপনি সমর্থন করেন?

বুক ভরিয়া নিশ্বাস নিয়া মানব কহিল—করি। জীবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুর না হলে চলে কী করে? আমি আর মা ওঁর উচ্ছৃঙ্খলতার বাধা ছিলাম—আত্মবিকাশের বাধা! কারু-কারু আত্মবিকাশ অধঃপতনের মধ্য দিয়েই

ঘটে—তাকে বাধা দিয়ে খর্ব করে রাখলে তার জীবনের প্রবলতম সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। বাবা যে মিথ্যা মোহে পড়ে নিজের চরিত্রকে কর্তব্য বা দায়িত্বের বাঁধনে বেঁধে পঙ্গু করে ফেলেননি, সেজন্যে আমি তাকে প্রণাম করি। সবাই আমার বাবাকে ভিলেইন বলে নাক কুঁচকোয়, কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে আমি তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না?

মিলি কহিল—এ আপনার পক্ষপাতিত্ব ছাড়া কিছু নয়।

—বরং তাঁর ছেলে বলেই তো আমার তাঁকে ক্ষমা করা উচিত ছিলো না। তাঁর জন্যেই যে মা পরমতম দুঃখের পথে হারিয়ে গেছেন, সে আমি ছাড়া আর কে বেশি অনুভব করে বলো? ভাগ্য না ভোজবাজি খেললে বাবার অপরাধে আমি সমাজের কোন আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়তাম তা কল্পনা করলে তুমি শিউরে উঠবে। তবুও এতো সবের কোথাও নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। বাবার চরিত্রের এই মহত্ত্ব আমাকে খুব একটা নাড়া দেয়, মিলি।

—কিছু মনে করবেন না, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে অসহায় স্ত্রী-পুত্রকে ঠেলে দিয়ে পালানোকে মহত্ত্ব বলতে মন সরে না।

মানব জোর দিয়া কহিল—তোমাদের মনে যে মরচে পড়ে আছে। ধর্মের জন্যে স্ত্রী-পুত্রকে কেউ তুচ্ছ করলে তোমরা দু-হাত তুলে স্বস্তিবাচন করবে, কিন্তু জেনো ধর্মও আত্মবিকাশই।

মিলি হাসিয়া কহিল—আপনার এ-সব মতগুলিকে আমার ভয় করে।

—যাই বলো, পৃথিবীতে দারিদ্র্যই একমাত্র দুঃখ নয়—সে দুঃখ উত্তীর্ণ হয়ে একদিন বাবার এই দৃষ্টান্তকে আমি সম্মান করতে পারবো এ-আশা তিনি করেছিলেন নিশ্চয়। আমার রক্তে এমনি একটি বন্ধনমোচনের সুর আছে। তোমার আমাকে ভয় করে, মিলি?

মানবের হাতের মধ্যে নিঃশঙ্ক স্নেহে হাত দুইখানি সমর্পণ করিয়া মিলি কহিল —আপনার মা'র কথা বলুন। সেদিন বলতে-বলতে থেমে গেলেন।

—শেষটা আমি জানি না। গোড়ার পরিচ্ছেদগুলি অতিমাত্রায় দীর্ঘ ও করুণ। তা শুনলে বাঙালি মেয়ের চোখের জল এসে পড়বে। পরের দুঃখে অকারণ অশ্রু-বর্ষণ করে লাভ নেই। সেই সব দুঃখের রাত কাটিয়ে যেদিন আমার মা'র প্রথম সুপ্রভাত হল সেদিন আমরা এ-বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছি মাত্র। সেদিন এ-বাড়িতে তোমার মাসিমার বিয়ে হচ্ছে।

একটু শীত-শীত করিতেছিল বলিয়া আঁচলটা পিঠের উপর দিয়া পুরু করিয়া টানিয়া লইয়া মিলি কহিল—ঠিক সেই দিনই?

—হ্যাঁ, বড়লোকের বাড়িতে উৎসব দেখে মা'র হাত ধরে ঢুকে পড়লাম। তিনদিন তখন খেতে পাইনি কিছু. নেমন্তন্ন-বাড়িতে ঠাঁই হয়ে গেল। কিন্তু সেই থেকে যে কী করে এ-বাড়িতে শিকড় গেড়ে বসলাম ভাবতে আমি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাই, মিলি। মা'র দৈন্যের মালিন্য তাঁর চেহারার সে স্বাভাবিক আভিজাত্যটুকুকে নষ্ট করতে পারেনি। তোমার মেসোমশাই সতীশবাবু তা বুঝতে পেরেছিলেন।

একটু থামিয়া : সতীশবাবু মা-কে আশ্রয় দিলেন। মা নিচের ঘরেই পড়ে রইলেন বটে, আমি এক-এক ধাপ ডিঙিয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগলাম। জানোই তো তোমার মাসিমা তৃতীয় পক্ষ। প্রথম স্ত্রী শুনেছি নাকি সন্তানবতী হতে পারেনি বলে শাশুড়ির বাক্য-যন্ত্রণা সইতে না পেরে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছিলো—দ্বিতীয়টি নাকি এখনো পিত্রালয়ে বর্তমান আছেন। তা, তোমার মাসিমারও তো এই দশ বছর পুরতে চললো। কিন্তু আমাকে পেয়েই তোমার মেসোমশাই নিবৃত্ত হলেন—কিন্তু কেন যে তিনি আমাকে ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করতে শুরু করলেন সেইটেই আমার কাছে রহস্য থেকে গেল। পোষ্য নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না—তাঁর পিতৃহৃদয় আমার জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন একেবারে।

মিলি ব্যস্ত হইয়া কহিল—মাসিমাও আপনাকে কি তেমনি করে নিতে পেরেছেন?

—তাঁর স্বামী যেখানে সদাব্রত, সেখানে তাঁর কৃপণতাকে আমি কেয়ার করি না। কিন্তু ছেলে হবার সময় তাঁর এতোদিনে পেরিয়ে গেছে মনে করে তিনিও ইদানিং আমার প্রতি সদয় হয়ে উঠছেন। কিন্তু আমি কোথাকার কে বলো তো—কী অসাধ্যসাধন না করছি! এতো সব দেখে তোমার সত্যিই কি সন্দেহ হয় না মিলি, সত্যিই আমি জীবনে সুখ পেতে আসিনি?

—কিন্তু আপনার মা'র কী হল?

দীর্ঘনিশ্বাস দমন করিয়া মানব কহিল—আমাকে এ-বাড়ির দোতলায় পৌঁছে দিয়েই তিনি অন্তর্ধান করলেন। কোথায় তিনি গেলেন—কেউ কিছু বলতে পারলো না।

মিলি মানবের হাতের উপর হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল—হয়তো তিনি স্বামীরই খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন।

—বাবার প্রতি মা'র সেই মিথ্যা অনুরাগ ছিলো না, মিলি। সংসারে এমন

কোন অত্যাচার তাঁকে সইতে হল যে আমাকে পর্যন্ত তিনি হারিয়ে যেতে দিলেন ? আমার জীবনে অন্তত লুকিয়ে উঁকি দিতেও তিনি এলেন না—

মিলির দুইটি সান্ত্বনাসিক্ত চোখের দিকে চাহিয়া, তাহাকে দেহের কাছে একটু আকর্ষণ করিয়া : শুধ্ তোমার এ-দুটি চক্ষু ছাড়া !

১১

ইহার পর আরো একদিন আছে। প্রায় এক বৎসর পরে।

দিন নয়—রাত্রি। খাওয়া-দাওয়া কখন চুকিয়াছে—যে-যার ঘরে ঘুমাইবার কথা।

মিলি তাহার ঘরে টেবিলের কাছে বসিয়া কি-একটা বই পড়িতে চেষ্টা করিতেছে, হঠাৎ চোখ ফিরাইয়া দেখিল পর্দা ঠেলিয়া মানব ঘরে ঢুকিল, একটু হাসিল—কোনো কথা না কহিয়া সেল্‌ফ হইতে একটা ছবির পত্রিকা লইয়া একেবারে বিছানার উপর গড়াইয়া পড়িল।

কাগজের পৃষ্ঠা উলটাইতে-উলটাইতে : তুমি পড়ায় এতো মনোযোগী হয়ে উঠলে কবে থেকে ?

মিলি ঘাড় না ফিরাইয়া কহিল—খেয়ে-দেয়ে তক্ষুনি শুতে নেই।

—কিন্তু বিছানায় আসতে কিছু দোষ আছে ?

—তুমিই বরং চেয়ারটা টেনে পাশে এসে বোস না।

—তার পর ?

—খুব খানিকটা আড্ডা দেওয়া যাবে। পরশু ছুটি—তুমি যাচ্ছ তো আমার সঙ্গে ?,

—কোথায় ?

—বা, সেই কবে থেকেই তো নাচছ যে পুজোর ছুটি হলে আমাকে সঙ্গে করে আমাদের দেশের বাড়িতে যাবে !

—আরো অনেক দেশ আছে, মিলি। তাদের এক-আধটার নাম শুনলে দস্তুরমতো তুমি লাফাতে শুরু করবে।

মিলি চেয়ারটা ঘুরাইয়া বসিল : যথা ?

যথা, ধরো নিউইয়র্ক। ঐ পুঁচকে পদ্মা নয়, বিরাট আটলান্টিক।

মিলি নিচের ঠোঁটটা সামান্য উলটাইয়া ফুঃ করিল।

বালিশ ছুইটাতে বুকের ভর রাখিয়া মানব কহিল—তুমি বিশ্বাস করছ না বুঝি? সত্যি বলছি চলো না, ভেসে পড়ি! নিউইয়র্ক পছন্দ না হয়, ভেনিসে না-হয় বাসা বাঁধবো। বাসা বাঁধতে হলে অবশ্যি ইটালিতেই—

মিলি পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া কহিল—সেখানে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে শেষকালে য়্যাড্রিয়াটিকে ভাসিয়ে দাও আর কি। তখন বুঝি আর আমার মুখের দিকে তাকাবে ভেবেছ! আমি তো তখন তোমার কাছে নেহাতই বাঙলাদেশের নরম তুলসী-পাতা। তার চেয়ে কায়ক্লেশে এখানেই থেকে যাও না-হয়।

উত্তেজনায় মানব বালিশ ছাড়িয়া ছুই কনুইয়ের উপর ভর রাখিয়া একটু সোজা হইল: না, না, সুযোগ পেলে ছাড়তে নেই। আমি তোমার মেসোমশায়কে সেদিন বলেছিলাম, তিনি টাকা দিতে প্রস্তুত। তোমার প্যাসেজ আমি নিজেই যোগাড় করে নিতে পারবো। কিসের তোমার এই বটানি, কিসের বা ইলিসিট মাইনর। চলো, মোটা-সোটা স্যুটকেশ সাজিয়ে ছুজনে পড়ি বেরিয়ে! বাধা না থাকলে ভালো লাগে না।

মিলি চেয়ার ছাড়িয়া ধীরে-ধীরে বিছানার একটি ধারে আসিয়া বসিল। স্নিগ্ধস্বরে কহিল—কেমন যেন খুব সহজ লাগে। সহজ লাগলেই নিজেকে কেমন যেন ছুর্বল মনে হয়। বলিতে-বলিতে পা ছুইটি গুটাইয়া মিলি সেতার বাজাইবার ভঙ্গিতে বসিল।

মানব কহিল—অন্তরের বাধা কবে যে পার হয়ে এলাম। আজ ছ-মাসের ওপরে তোমার মাসিমা তাঁর বাপের বাড়িতে আছেন—কেন আছেন বলতে পারো?

—কি করে বলবো?

—তাই অন্তঃপুরেরও সমস্ত বাধা শিথিল ছিলো। তোমার মেসোমশাই সারা দিন-রাত্রি সাধু-সন্ন্যাসী নিয়েই মশগুল—আমরা কে কোথায় কি করছি চোখ ফেরাবারও তাঁর সময় নেই।

মিলি একটা বালিশ লইয়া তাহাতে সামান্য একটু কাৎ হইল—বাঁ-হাতের তালুর উপর এলো খোঁপাটা আলগোছে নোয়ানো: কিন্তু ছেলেবেলায় শুনেছিলাম যে তিনি দারুণ ডাকসাইটে অত্যাচারী ছিলেন। প্রথম স্ত্রী তো আত্মহত্যা করতেই বাধ্য হল, দ্বিতীয় স্ত্রীকে নাকি লাথি মেরে বাড়ির বার করে দিয়েছিলেন। তবু তাঁর সন্তান চাই—তাই আবার তাঁর সহধর্মিণীর প্রয়োজন ঘটলো। আজকাল নেহাত ধর্মে-কর্মে মন দিয়েছেন বলেই এখানে আসতে দিতে কাকীরা আর আপত্তি করলে না। নইলে তো বোর্ডিঙেই চলে যেতাম।

এইবার মানব-মিলির ডান-হাত ধরিল: যাও না।

মিলি হাসিয়া কহিল—তুমি বোর্ডিঙের দারোয়ান থাকবে বলো, ঠিক যাবো।

—কিন্তু রাত্রে তোমার বিছানায় ঠিক শুতে দেবে ?

মিলি মানবের হাতের কব্জিতে জোরে এক চিমটি কাটিয়া বসিল।

মানব কহিল—তুমি মেয়ে হয়েছ বলেই যে তোমার গায়ে হাত তোলা যাবে না এটা নারীর সমানাধিকারের দিনে মেনে চললে তোমাদের অসম্মান করা হবে ; অতএব—

নিটোল বাহু দুইটির কি সুন্দর ডৌল—মানব দুই হাত দিয়া মিলির দুই বাহু মুঠি করিয়া ধরিয়া একেবারে তাহাকে কাছে লইয়া আসিল।

মিলি তাড়াতাড়ি দুইটা আঙুল দিয়া মানবের ঠোঁঠ চাপিয়া ধরিল, দরজার পর্দার দিকে সভয়ে দৃষ্টি ফেলিয়া চাপা গলায় কহিল—চুপ ! দেখছে।

মানব ভয় পাইয়া আকর্ষণ শিথিল করিয়া প্রশ্ন করিল—কে ?

মিলি তক্ষুনি ছাড়া পাইয়া এলো খোঁপাটা আঁট করিয়া বাঁধিতে-বাঁধিতে ইলেকট্রিক বালবটার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল—আলো।

মানব তৎক্ষণাৎ টুপ করিয়া সুইচটা অফ করিয়া দিল।

তীর অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের যেমন ঢেউ আসে, তেমনি করিয়া অন্ধকারে ঘর ভরিয়া উঠিল। সেই অন্ধকার ক্রমশ একটু তরল হইতেই মানবের মনে হইল এই বিছানাটা যেন হ্রদ, আর মিলি যেন একটা রাজহংস।

দেহের প্রতিটি রেখা স্বচ্ছ, প্রতিটি ভঙ্গি সুষম, প্রতিটি লীলা লঘু।

অনেকক্ষণ কেহ কোনো কথা কহিল না। শুধু, রাত্রি যে গভীর, নীরবতা যে নিদ্রাচ্ছন্ন এবং অন্ধকারে সমস্ত অন্তরাল যে অপসৃত—দুইজনে নিঃশ্বাস নিতে-নিতে তাই কেবল অনুভব করিতে লাগিল।

মানব মিলির কোলের উপর মাথা রাখিয়া আস্তে কহিল—চলো, নতুন বাড়িতেই যাই।

মানবের কপালে ডান-হাতখানি পাতিয়া মিলি কহিল—চলো, বাবা তোমাকে দেখে নিশ্চয়ই খুব সুখী হবেন।

—কিন্তু প্রস্তাব শুনে হবেন কি ?

কপাল হইতে হাত গালের উপর নামিয়া আসিয়াছে : আপত্তি করবার কোনোই তো কারণ দেখছি না।

—আপত্তি একটু করলে ভালো হতো, মিলি।

হাত পাঞ্জাবির তলা দিয়া বুকের কাছে লুকাইয়াছে : আপত্তি করলে কে আর শুনছে বলো। আমাদের ভেনিস তো পড়েই আছে।

দুই হাত দিয়া মিলির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া জানুর উপর মুখ রাখিয়া মানব তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ, বাধা কোথাও পেলে লাভ করবার মধ্যে বেশ একটা উন্মাদনা পাই। আচ্ছা এক-হিসেবে তুমি তো আমার মাসতুতো বোন— তোমার বাবা বা কাকারা কেউ আপত্তি করবেন না?

মানবের ঘাড়ের কাছের চুলগুলিতে আঙুল বুলাইতে-বুলাইতে মিলি কহিল—বাইরের ঐ-সব কৃত্রিম বাধাকেই তুমি বড়ো করে দেখ নাকি? আমরা যদি এমন-তরো ঘনিষ্ঠ হয়েই উঠি কোনোদিন, তবে সে-ই তো আমাদের বড়ো পরিচয়।

—সেই আমাদের বড়ো পরিচয়, না মিলু?

মানব মিলির রাশীভূত শাড়ির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তাহার সর্বাঙ্গের ঘ্রাণ নিতে লাগিল।

কতক্ষণ কেহই কোনো কথা কহিল না।

মুখ না তুলিয়াই মানব কহিল—তবু কোনো বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে কাউকে পাবার মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি নেই, মিলি। প্রেয়সীর জন্যে যদি জীবন ভরে আঘাতের স্বাদ না পাই, তবে সে যে মৃত্যুর চেয়েও প্রিয়তরা এ-কথা বুঝি কি করে?

মিলি এই স্পর্শবন্যোচ্ছ্বাস হইতে হঠাৎ নিজেকে নির্লিপ্ত করিয়া লইল। অভিমানে করুণ করিয়া বলিল—ধরো, আমার অনিচ্ছাই যদি সেই বাধা হয়?

মানব অবাক হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল! তাহার এই স্পর্শবিরহিত অস্তিত্ব যেন সে সহিতে পারিবে না। তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সে অসহায়ের মতো প্রশ্ন করিল—তোমার অনিচ্ছা মানে?

মিলি তখন বিছানার অন্য প্রান্তে সরিয়া গিয়াছে: ধরো, একদিন যদি আমি বুঝি যে এ শুধু উদ্বেগ, ভালোবাসা নয়— এতে খালি দাহ আছে, সুধা নেই—অর্থাৎ আমার ইচ্ছা বা বাসনা যাই বলো, যদি একদিন মিলিয়ে যায় আর সমস্ত প্রতীক্ষার উপরে ধীরে-ধীরে উপেক্ষা নেমে আসে -

—সেই তোমার বাধা, মিলি? সেই বাধাকে আমি জয় করতে পারবো না ভাবছ?

বলিয়া মানব দুই হাত বাড়াইয়া মিলিকে বুকের মধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিল। ডাকিল—মিলি!

মিলি মানবের বুকের মধ্যে এতটুকু হইয়া গিয়াছে। অর্ধস্ফুট কণ্ঠে উত্তর করিল—বলো।

—যে-দেহে দাহ নেই সে-দেহে স্বাদও নেই।

মিলিকে ঘনতর স্পর্শে আরো সন্নিহিত করিয়া মানব কহিল—আমাদের প্রেমে এই ভঙ্গুর ভাবপ্রবণতা নেই, মিলি। আমরা পরস্পরের কাছে প্রখররূপে প্রকাশিত।

মানবের দুই অধর মিলির চক্ষুর কাছে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মিলি কথা না কহিয়া মানবের কাঁধের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিল।

মানব হাত বাড়াইয়া সুইচটা টানিয়া দিয়া কহিল—এমন দৃশ্য চোখ ভরে না দেখে আর পারছি না।

কিন্তু আলো জ্বালিতেই চোখের পলকে কী যে হইয়া গেল মানব বুঝিতে পারিল না। মিলি হঠাৎ দুই হাতে সবলে সমস্ত স্পর্শের ঢেউ ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। একেবারে টেবিলের ধারে চেয়ারে গিয়া বসিল। তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না। হাত তুলিয়া চুল ঠিক করিয়া কাপড়ের আঁচলটা পিঠের উপর দিয়া প্রসারিত করিয়া দুই কাঁধ ও বাহু ঢাকিয়া হঠাৎ সে বই নিয়া মনোযোগী হইয়া উঠিল।

উগ্র আলোক মানবের চোখেও সহিতেছে না।

কিন্তু পলাতক মুহূর্ত কি আর ফিরিয়া আসে?

তবু মানব আরেকবার আলোটা নিভাইয়া দিল।

মিলির স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি: বা, আমাকে পড়তে দাও।

—কাল পোড়ো।

—না।

—বেশ, কালকেও পোড়ো না। কালকে রাতে তাহলে—

সত্যি বলছি আমাকে পড়তে দাও। তোমার না-হয় চাকরি না করলে চলবে, কিন্তু আমার একটা ইস্কুল-মাস্টারি তো অন্তত চাই।

মানব হাসিয়া উঠিল: তোমাকে আমি অনায়াসে অন্য চাকরি দিতে পারবো। এখন একবারটি উঠে এস দিকি।

—না, তুমি আলো জ্বালো।

— জ্বালবো, তুমি আমার দিকে মুখ করে বসবে বলো?

মিলি এইবার মামুল ব্রহ্মাস্ত্র হানিল: দরজা খোলা আছে জানো? ঘর অন্ধকার করে বসে আছি, যদি কেউ দেখে ফেলে?

—যদি কেউ দেখে ফেলে, সেই জন্যে তো তাকে ভালো করেই দেখতে দেওয়া উচিত। অন্ধকার ঘরে এই কৃত্রিম দূরত্ব রেখে আমাদের নির্জীবের মতো বসে থাকাটাই তো অস্বাভাবিক। অথচ দরজা বন্ধ করলেই আমরা পরস্পরের কাছে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়বো। তার চেয়ে চলো না একটু বেড়িয়ে আসি।

মিলির স্বরে সেই ঔদাসীন্য: না, আমার এখন মুড নেই।

মানব এইবার বিছানা ছাড়িয়া দাঁড়াইল; কহিল—আলো জ্বালতেই বুঝি টের পেলে যে দরজা খোলা আছে। আর দরজা খোলা পেয়ে রাশি-রাশি লজ্জা আর

ভীরুতা বুঝি তোমাকে গ্রাস করলো। বুঝতে পারছি তোমার এই লজ্জাই হচ্ছে আমার প্রেমের বাধা। তাকে কি আমি জয় করতে পারবো না?

বলিয়া মানব ঝুইয়া পড়িয়া মিলির উপর নিশ্বাস ফেলিল।

একটি মুহূর্ত্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মতো মিলির সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। প্রতীক্ষার তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে স্নায়ু-শিরাগুলি অভিভূত, ক্লান্ত হইয়া আসিল।

কিন্তু মানব কহিল—আজ থাক।

বলিয়া ফের সুইচটা টানিয়া দিয়া ঘর আলো করিয়া সে কহিল—তুমি বরং পড়ো।

তারপর বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় একটা মোটর-বাইকের ঝকঝকানি শুরু হইয়াছে। মিলি তবুও জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া একটিবার দেখিল না। ঘড়িতে একবার নজর পড়িল। এখন না-পড়িয়া শুইতে পারিলে সে বাঁচে। বিছানাটার দুর্দশা দেখিয়া তাহার শুইতেও ইচ্ছা হইল না। বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল। পরে ফের ঘরে গেল। আলো নিভাইল। এবং চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। ঘুমের জন্য নয়, কখন আবার মানব ফিরিয়া আসে!

অনেকক্ষণ পরে।

সিঁড়িতে ও-কাহার জুতার শব্দ মিলিকে বলিয়া দিতে হইবে না। মিলি চট করিয়া আলো জ্বালিয়া আবার তেমনি মাথা হেঁট করিয়া বসিল। ঘরে আলো দেখিয়া যদি সে একবার আসিয়া প্রশ্ন করে—এখনো পড়া শেষ হয় নাই? কিম্বা অসাবধানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে বলিয়া যদি একবার ছোঁয়!

মিলি একমনে ঘড়ির কাঁটার শব্দ অনুধাবন করিতে লাগিল।

কিন্তু মানব হয়তো জানিত আজ রাত্রে মিলির ঘুম না আসিবারই কথা।

১২

অনেক দিন সুধীরের দেখা নাই, তাই মানব তাহার খোঁজ নিতে বাহির হইয়াছে।

ক্রিক রো পার হইতেই টিপি টিপি বৃষ্টি শুরু হইল এবং শাঁখারিটোলা লেইনে ঢুকিতে-না-ঢুকিতেই মুষলধারে। এই গলিরই গা হইতে অপরিসর সংকীর্ণ একফালি রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে—তাহারই শেষ প্রান্তে সুধীরের বাড়ি—টিনের চাল ও মাটির দেয়াল।

মানব সজোরে দরজায় আঘাত করিতে লাগিল।

ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের সাড়া আসিল : আরেক ধাক্কা দিলেই কষ্ট করে দরজা আর আমাকে খুলতে হবে না। বৃষ্টিতে কে-ই বা তোমাকে বেরুতে বলেছিলো শুনি? দরজা খুলিতেই মানব অপ্রস্তুত হইবার ভান করিয়া কহিল—এই যে আশা। সুধীর বুঝি বাড়ি নেই?

আশা সংকুচিত হইয়া কহিল—না। আসুন।

ভিতরে একখানা মাত্র ঘর—এককোণে একটা তক্তপোশ পাতা। তক্তপোশের উপরেই কেরোসিন কাঠের একটা সেল্‌ফ, তাহাতে বই, চায়ের বাসন ও দাবার কতগুলি ঘুঁটি ছত্রখান হইয়া আছে। ছেঁড়া ময়লা বিছানাটা একপাশে তুলিয়া রাখিতেই তাহার দীনতা আরো বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। নিচে মাদুর বিছাইয়া সুধীরের বৃদ্ধা মা একটা কাঁসার বাটিতে করিয়া মুড়ির সঙ্গে মুলো কামড়াইয়া খাইতেছেন—আর আশা হয়তো ঐ কাঁথাটাই সেলাই করিতেছিল।

সেই অর্ধ-অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে মানব একটা রূঢ় অট্টহাসের মতো আবির্ভূত হইল। চোখ মেলিয়া ঘরের এই নিদারুণ কদর্যতা দেখিয়া তাহার সমস্ত স্নায়ু-শিরা কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিল—বাহিরে যে প্রচুরপ্রবাহে বৃষ্টি হইতেছে সে কথাও তাহার মনে রহিল না। কিছু টাকা ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেই হয়। সঙ্গে চেক্-বইটা সে লইয়া আসিয়াছে।

মানবকে দেখিয়া সুধীরের মা অভিভূতের মতো মুলোটা দাঁত দিয়া কামড়াইয়া রহিলেন। কথা কহিল আশা :

—একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি, বসুন। একটা তোয়ালে এনে দি।

মানব দাঁড়াইয়াই রহিল : না, বসবো না। সুধীরের সঙ্গে একটা কথা ছিলো। কোথায় গেছে?

আশা কহিল—কাজ তাঁর চব্বিশঘণ্টা, অথচ একটা কাজ আজ পর্যন্ত তাঁকে পেতে দেখলুম না। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না। এই তক্তপোশে বসতে বুঝি আপনার ঘেন্না হচ্ছে?

মা-ও এইবারে সায় দিলেন : বোস বাবা। গরিবের ঘরে তোমার যোগ্য অভ্যর্থনা কী করে করবো বলো? সেই তোর উলের আসনখানা বের করে পেতে দে না, আশা। এই জলে কোথায় আবার বেরুবে? (নিম্নস্বরে) তোমার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিলো।

নিতান্ত সংকুচিত হইয়া তক্তপোশের একধারে মানব বসিল। একটা কুৎসিত আবহাওয়ার মাঝে পড়িয়া সে যেন নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। এইবার আবার

তাহাকে এক সবিস্তার দুঃখের কাহিনী গিলিতে হইবে। চলিয়া যাইতেই বা তাহার পা উঠিতেছে না কেন?

কারণ খুঁজিতে গিয়া আশার দিকে চাহিতেই দেখিল, সে হাতে করিয়া একখানা তোয়ালে নিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

—যদি বসলেন ই, তবে ভিজে মাথাটা মুছে ফেলুন।

—না, দরকার নেই। বলিয়া মানব পকেট হইতে প্রকাণ্ড একটা গরদের রুমাল বাহির করিয়া প্রথমে কপাল ও পরে ঘাড়ের খানিকটা মুছিল। চুলে হাত ঠেকাইল না। রুমালটা বিস্তৃত করিতেই একটা সতেজ, প্রগল্‌ভ গন্ধ ঘরের কুণ্ঠিত স্তব্ধতাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

আশা কহিল—তোয়ালেটা কিন্তু ফর্সাই ছিলো। আজ সকালে কেচেছিলাম।

বিদ্রূপের খোঁচায় মানবের চোখ ফুটিল। আশাকে সে ইহার আগে আরো অনেকবার দেখিয়াছে—নিতান্ত মামুলি দু-একটা আলাপও যে না হইয়াছে তাহা নয়, তবু এমন মুখোমুখি হইয়া কোনোদিন সে দেখে নাই। ময়লা সেমিজের উপর ততোধিক ময়লা একখানি শাড়ি পরিয়া আছে সজ্জা-উপকরণ গাত্রবর্ণের সঙ্গে চমৎকার সামঞ্জস্য রাখিয়াছে বটে—চুলগুলি রুক্ষ, রিক্ত হাতে ও সকরুণ ধৈর্যশীল মুখে অবিচল একটি কাঠিন্য। তাহাতে আকৃষ্ট হইবার মতো কোনো সঙ্কেতই মানব খুঁজিয়া পাইল না। যুবতী সে নিশ্চয়ই, কিন্তু যৌবন অর্থ তো শুধু ষোলোটি বৎসরের ভারে আক্রান্ত হওয়া নয়; যৌবন অর্থ সেই লীলা বা ছটা, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উর্মিচূড়ায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে—যৌবন অর্থ লাবণ্যের চঞ্চল নির্ঝর-লেখা! না গতিচাপল্যে উজ্জীবিত, না লীলাবিভ্রমে কৌতুকময়ী—সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া একটি গাঢ় সহিষ্ণুতা—মানব তাহাতে উন্মাদনা পাইবে কেন?

আশার উপস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া মানব সুধীরের মাকে প্রশ্ন করিল—কী কথা ছিলো বলুন। আমার বেশি সময় নেই। বলিয়া মানব উঠিয়া দাঁড়াইল—মাটির দেয়াল হইতে কেমন একটা চাপা অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ তাহার নিশ্বাস চাপিয়া ধরিতেছে।

আশা কথা না কহিয়া পারিল না: এই বৃষ্টিতে বেরুলে আপনার দামী চাদর-খানা একেবারে কাঁথা হয়ে যাবে।

মানব উদাসীনের মতো কহিল—একখানা চাদর নষ্ট হলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না।

আশা সামান্য একটু হাসিয়া কহিল—কিন্তু চলে গেলে মা'র বোধকরি একটু অসুবিধে হবে।

সেই জন্যেই তো খবরটা জেনে যেতে চাইছি।

মা মেয়েকে ধমক দিয়া উঠিলেন : তুই যা দিকি, বাসনগুলো মেজে ফেল এবার।

আশা যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে : উলের আসনখানা বের করে দিয়ে যাই। ঐ শুকনো কাঠে বসতে ওঁর অসুবিধে হচ্ছে।

অগত্যা মানবকে আবার শুকনো কাঠেই বসিতে হইল।

সামনের নিচু দাওয়ায় আশা এক-পাঁজা এঁটো বাসন লইয়া বসিয়া বাঁ হাতে কাক তাড়াইতে লাগিল। মাথায় উপর একটা ভিজা গামছা চাপাইয়া সে অনর্থক বৃষ্টির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে চায়—দেখিতে-দেখিতে সর্বাঙ্গ সিক্ত হইয়া উঠিল—খোলা জানালা দিয়া হঠাৎ একটু নজর পড়িতেই মানবের কেমন যেন মনে হইল এই অযাচিত বর্ষার শ্যামশ্রীর সঙ্গে আশার এই কমনীয়তাটুকু না মিশিলে কোথায় বোধহয় অসঙ্গতি থাকিত।

মা কথাটা কিছুতেই পাড়িতে পারেন না।

মা'র কথার লক্ষ্য কি মানব তাহা জানিত। তাই সে উসকাইয়া দিল : সুধীরের সেই টিউশানিটা বুঝি গেছে? আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলো—কতো তার চাই?

মা'র রুদ্ধস্বর এইবারে অনর্গল হইয়া উঠিল : চাকরিটা গেছে তো সেই কবে। তারপর একটা কুটোও যোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু তা তো নয়। তার চেয়েও বড়ো বিপদে পড়েছি, বাবা।

মানব প্রস্তুত। ঘরের বাহিরে বাসন-মাজার আওয়াজও যেন ক্ষীণতর হইয়া আসিল।

মানবের মুখে সহানুভূতির আভাস পাইয়া মা বলিয়া চলিলেন—মেয়েও আমার গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আগুনের মতো হু-হু করে বয়স বেড়ে গেল—মাথার উপরে কেউ নেই যে একটা পাত্র জুটিয়ে দেয়! তা সুধীরই আজ ছ'মাস ধরে হাঁটাহাঁটি করে সম্বন্ধ যোগাড় করেছে। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার দুঃসাহস তো আর আমাদের মানাবে না, বাবা—অদেষ্ট যেমন করে এসেছি তেমনি তো হবে।

মানবের সামান্য একটু কৌতূহল হইল : ছেলেটি কি করে?

—শ্যামপুকুরে নাকি মনিহারি দোকান আছে। দোকান শুনছি ভালোই চলছে। তবে ছেলেটির বয়স কিছু বেশি--প্রথম স্ত্রী এই বৈশাখে মারা গেছে। ছেলেপুলে হয়নি—এমন মন্দ কি বলো?

মানব মুক্তকণ্ঠে সায় দিল : না, মন্দ কি ! তা, ছেলের পছন্দ হয়েছে তো ? কথাটা আশাকে শুনাইয়া বলে মানবের ইচ্ছা ছিলো না ; তবু হঠাৎ বাসন-মাজার শব্দ একেবারে বন্ধ হইয়া গেলো দেখিয়া সে ঠিক স্বস্তি বোধ করিল না।

—হ্যাঁ বাবা, ছেলে নিজে এসেই দেখে গেছে। যতোক্ষণ সে দেখছিল ততোক্ষণ দম বন্ধ করে ইষ্টমন্ত্র জপ করেছি – এই যাত্রায় মেয়ে যেন আমার পাশ করে। আর-আর যে-কয়জন এর আগে মেয়ে দেখতে এসেছিল, তারা কেউ ঘর-দোরের হাল-চাল দেখে, কেউ বা মেয়ের রঙ ময়লা দেখে নাক সিঁটকে চলে গেছে ! কিন্তু নেহাত কপালজোরেই বলতে হবে যে মেয়েকে আমার তার চোখে ধরলো। পাত্র এর চেয়ে ভালো আর আশা করতে পারি ?

মানব রুমাল দিয়া গাল রগড়াইতে-রগড়াইতে কহিল – না, দিব্যি পাত্র। দোকান-পাট আছে, স্ত্রীকে ভরণপোষণ করবার জন্যে কারু কাছে হাত পাততে হবে না—পায়ে দাঁড়ানো ছেলে, কলেজের ছোকরাদের চেয়ে ঢের ভালো। আর দেরি নয়, লাগিয়ে দিন তাহলে। এই দুর্দিনে কোথায় কে ফ্যা-ফ্যা করতো, তার চেয়ে করে-কম্মে স্বচ্ছন্দে সংসার চালিয়ে নিতে পারবে।

কথাটা আশাকে মর্মমূল পর্যন্ত বিঁধিল।

বসা অবস্থাতেই মা প্রায় মানবের পায়ের কাছে আগাইয়া আসিলেন ; স্বর নামাইয়া কহিলেন—কিন্তু বিপদ জুটেছে অন্যদিক থেকে। ছেলে পাঁচশো টাকা পণ না পেলে কিছুতেই বিয়ে করবে না। সাধ্যসাধনা করতে সুধীর আর কিছু বাকি রাখেনি বাবা, কিন্তু বড় জোর সে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ছাড়তে পারে বলে শেষ কথা দিয়েছে—

ঢোক গিলিয়া মা আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন। মানব নির্লিপ্তের মতো কহিল – তা পণ তো সে চাইবেই।

কথাটা মানব সমাজতত্ত্বের একটা স্বতঃসিদ্ধ সূত্র ধরিয়াই বলিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিয়া আশার মুখ-চোখ নিদারুণ অপমানে জ্বালা করিয়া উঠিল। সে ভাবিল মানব বুঝি তাহারই রূপহীনতার প্রতি কঠিন শ্লেষ করিয়া এমন নিষ্ঠুর কথা উচ্চারণ করিয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, মানবের তাহাতে কিছু যায় আসে না। এই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে যতোদিন পর্যন্ত নর-নারী স্বেচ্ছায় ও আত্মপ্রেরণায় না মিলিত হইবে ততোদিন এই পণপ্রথাকে কিছুতেই দূর করা যাইবে না। একমাত্র প্রেমই পণ্য নয়।

মা'র পাংশুমুখের রুক্ষ রেখাগুলি একটু কোমল হইয়া আসিল। তিনি কহিলেন —অতো টাকা কোথা থেকে দিই বলো ? টাকার জন্যেই তো দিন পিছিয়ে যাচ্ছে!

এতোটুকু দ্বিধা নাই, না বা এতোটুকু লজ্জা—মানব উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল—সুধীর আমাকে এতোদিন এ-কথা বলেনি কেন? কতো আগেই তাহলে আমি দিয়ে দিতে পারতাম। পাত্র হাতে এসে পড়লে কি আর ছেড়ে দিতে আছে? ওদের সময় দিতে গেলেই তখন আবার ওরা নানান রকম খুঁত বার করে বসবে। তা, কতো টাকা আপনাদের এখন চাই?

আহ্লাদে মা'র সারা দেহ যেন কেমন করিয়া উঠিল; এই ঘর-দুয়ার বিছানা-বালিশ কিছুই যেন আর তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে রহিল না। নিষ্পলক চোখে মানবের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন—সব সুদ্ধু ছশো টাকা তো লাগবেই, বাবা। তুমিই কি সব দিতে পারবে? মানব চাপা ঠোঁটে একটু হাসিয়া কহিল কেন পারবো না? টাকা তো মাত্র ছশো! হাতে যখন আছেই তখন পরের একটা উপকারেই না হয় ব্যয় করে যাই? কী যায় আসে।

এ কী দয়া না উপেক্ষা, উপকার না ঔদ্ধত্য—বাহিরে দাঁড়াইয়া আশা থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগল। দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল মা একেবারে মানবের পায়ের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়াছেন, আর মানব পকেট হইতে ব্যাঙ্কের চেক বাহির করিয়া মোটা ফাউনটেনপেনএ তাহাতে দস্তখৎ করিতেছে!

আশা ভিজা পায়েই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সৌজন্যলেশহীন রুক্ষস্বরে কহিল—আপনার বৃষ্টি যে কখন থেমে গেছে তার বুঝি খেয়াল নেই? এই বিচ্ছিরি নোংরা ঘরে বসে অনর্থক সময় নষ্ট করছেন কেন? একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে আনবো?

সই-র একটা টান দিবার মুখে মানব থামিয়া পড়িল।

আশার এই মূর্তি দেখিয়া মা-ও ভড়কাইয়া গেলেন। চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, ভিজা গামছাটা কোমরে আঁট করিয়া জড়ানো—চোখে যেন তাঁহার ধাঁধা লাগিয়া গেলো, একবার মনে হইল সামান্য দোকানির দোকান আলো না করিয়া কোনো হাকিমের পার্শ্ববর্তিনী হইয়া একত্র মোটর হাঁকাইলে নিতান্ত বেমানান হইত না।

তবু মেয়েকে তাঁহার শাসন করিতে হইল তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—তুই কেন তোর কাজ ফেলে এখানে কর্তৃত্ব করতে এলি? যা, কাপড়টা ছেড়ে আয় শিগগির করে।

আশা তবু নড়িল না। কথায় প্যাঁচ দিয়া কহিল—সময়ের দামও তো ওঁর কম নয়—

মানব হাসিয়া কহিল—কিন্তু এই মিনিটটির দাম ছশো টাকা। তোমাকে পার করার মাশুল দিয়ে যাচ্ছি।

আশা সহসা জ্বলিয়া উঠিল। কান দুইটা লাল করিয়া কহিল—কি ?

মা কহিলেন—কী আবার ? তোর এতে মাথা গলাবার কী হয়েছে ? তুই যা না এখান থেকে।

আশা মাকে নিষ্ঠুর দৃষ্টির আঘাত করিল ; এক পা আগাইয়া আসিয়া কহিল—তুমি বুঝি আবার এঁর কাছ থেকে ভিক্ষা চাইছ ? এমনি করে কি তুমি দাদার সমস্ত প্রচেষ্টার মহত্বকে খর্ব করবে নাকি ?

মা কহিলেন—তুমি ওর কথায় কান দিয়ো না, মানু। লেখাটুকু শেষ করে ফেলো।

মানব আবার কলম তুলিল।

মানবের দিকে ফিরিয়া আশা প্রশ্ন করিল—কী আপনার স্পর্ধা যে এমনি করে সবাইকে আপনি অপমান করতে সাহস পান ? আমরা গরিব হয়েছি বলেই কি আপনার এই অত্যাচার সইতে হবে নাকি ?

মা কাতরকণ্ঠে শোক করিতে লাগিলেন—তুই একে অত্যাচার বলিস নাকি হতভাগী ? তুমি ওর কথায় কিছু মনে কোরো না বাবা, দুঃখে-তাপে মাথা-মুণ্ডু কিছু আর ওর ঠিক নেই। তুমি ঐটুকুন লিখে ফেলো।

মানব সই করিয়া চেকটা নিতান্ত অবহেলায় আশারই দিকে ছুঁড়িয়া উঠিয়া পড়িল। মা-কে লক্ষ্য করিয়া কহিল—দিন-ক্ষণ এবার ঠিক করে ফেলুন। গয়না যা দু-একখানা লাগবে মা-কে বলে আমিই পরে দিয়ে দিতে পারবো।

আশা মেঝে থেকে চেকটা কুড়াইয়া লইয়া গম্ভীর হইয়া কহিল—কিন্তু আপনার এই দানের মর্যাদা আমরা রাখতে পারলাম না। দয়া করে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

মা কথা ঘুরাইলেন—সুধীর তোমাকে রাত্রে বাড়িতে গিয়ে পাবে তো ? এতোক্ষণে ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

—পাবে।

মানব দরজার কাছে পৌঁছিবার আগেই আশা পথ আটকাইয়াছে।

মানব কহিল—সরো।

—আপনার এই চেক আপনি ফিরিয়ে নিন।

এ কি তোমার আদেশ নাকি ?

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু এ-চেক তো আমি তোমাকে দিইনি। পড়তে জানো ? দেখ তো কার নাম।

কিন্তু আমাকে উদ্দেশ্য করেই তো দিয়েছেন। আমি বেঁচে থাকতে এ-অপমান আমি নিতে পারবো না। নিন ফিরিয়ে!

মা এইবার মেয়ের প্রতি রুখিয়া আসিলেন— তুই এ-সবের কী বুঝিস লো হতভাগী? ছাড় দরজা। দিন-দিন যতোই ধিঙ্গি হচ্ছে ততোই ওর বুদ্ধি খুলছে। তুমি ওর কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না, মানু।

মানব মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসিল—না, না, সে আবার একটা কথা! বিয়ের কথা শুনে সবারই একটু বুদ্ধি ঘুলোয়।

মা ফের ধমক দিলেন—সরে দাঁড়া বলছি।

আশা তবু অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল। অত্যন্ত নম্র ও ধীর স্বরে কহিল—আপনি যান, কিন্তু এই চেক আমি ছিঁড়ে ফেলবো।

মা উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন: ছিঁড়ে ফেলবি কি? তবে বিয়ে না করে আমাদের মুখ পোড়াবি নাকি?

আশা কহিল—তার জন্যে একজনের অসংযত ও উদ্ধত দান আমি গ্রহণ করতে পারবো না, মা।

অমন দৃঢ় সতেজ ও সহজ কণ্ঠে মেয়ে তাঁহার কথা কহিতে পারে মা শূন্যমনেও কখনো তাহা চিন্তা করেন নাই; মানবও অবাক হইয়া গেলো। এমন যাহার তেজ সে কিনা অপ্রতিবাদে যাহার-তাহার সঙ্গেই আঁচলের গিঁট বাঁধিয়া বনবাসে বাহির হইয়া পড়িবে।

তাই সে টিপ্পনি কাটিয়া কহিল—কিন্তু চেকটা যদি ছিঁড়ে ফেলো তাহলে এ-যাত্রায় আদর্শ পতিব্রতা হবার সুযোগ আর মিলবে না দেখছি।

—সে-সুযোগ আপনার টাকা দিয়ে কিনতে চাই না।

—কিন্তু এই টাকারই জন্যে তো সেই সুযোগ এতোদিন পিছিয়ে ছিলো।

—তাহলে তা চিরদিনের জন্যেই পিছিয়ে থাক! বলিয়া আশা সহসা ক্ষিপ্তের মতো সেই কাগজের ফালিটা টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

আর এক মুহূর্তও সে সেখানে দাঁড়াইল না।

শুধু চলিয়া যাইবার সময় তাহার পিঠের উপর চুলের স্তূপ ভাঙিয়া কীর্ণ-বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেই তাহাকে নিমেষে একটা অপস্রিয়মানা ঝটিকার মতো মনে হইল। অন্ধকারের সে দীপ্তি মানবের দুই চক্ষু ঝলসাইয়া দিল।

মা খানিকক্ষণ অভিভূতের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং অবশেষে মানবকেও চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেই পরিত্যক্ত কাঁসার বাটিটা তুলিয়া লইয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিলেন।

হরীতকীবাগান লেইনএ মেয়েদের যে হস্‌টেল ছিলো মিলি সেখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। পরিয়াছে আগুনের মতো লাল সিল্কের শাড়ি—তাহার গায়ের শ্যামল রঙের সঙ্গে একটা অনির্বচনীয় ছন্দ লাভ করিয়াছে, যেন অপরাহ্নে একটি বিষণ্ণ ও ক্ষীণাঙ্গী নদীর জলে সূর্যাস্ত হইতেছে। মোনা লিসার হাসির মতো দুইটি রঙের এই অতিন্দ্রিয় সৌহার্দ্যটুকু যদি কেহ তুলিকায় ধরিয়া রাখিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে অন্নসংস্থান করিতে আর দ্বিতীয় ছবি আঁকিতে হইত না।

ভিজিটার্স রুম পার হইতেই প্রথমে মিলির সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হইল যে শেয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্মে মানবের প্রথম কল্পনায় সহজেই মিলি হইতে পারিত। নাম তার শোভনা। হস্‌টেলের ছাত্রীদের সেই এক রকম কর্ত্রী—ধোপাবাড়িতে শাড়ি-সেমিজ পাঠাইবার তদারক করিতেছে। বিধুর গোধূলিবেলায় একটি দীর্ঘ রশ্মিরেখার মতো মিলির আবির্ভাবে সমস্ত বাড়ি-ঘর-দোর সহসা ঝলমল করিয়া উঠিল।

তাহার দিকে চাহিয়া শোভনা বলিল—ঘরে হঠাৎ আগুন লাগলো কোত্থেকে?

ধরিত্রী বলিল—ঘরে কোথায়, দেখছিস না ওর শরীরে।

নির্ধূম অগ্নিশিখার মতো মিলির দেহ কাঁপিয়া উঠিল। নিচে যতোগুলি মেয়ে ছিলো তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া মিলি উপরে উঠিয়া আসিল; ধরিত্রীর হাত ধরিয়া কহিল—সত্যিই ভাই, শরীরে আগুন লেগেছে।

মিলি এই বোর্ডিঙবাসিনীদের থেকে ভিন্ন কলেজে পড়িত, তাই তাহার সম্বন্ধে সামান্য কানাঘুষা ছাড়া তেমন কোনো মারাত্মক খবর তাহারা পায় নাই। তেমন কানাঘুষা কোন কৈশোরোত্তীর্ণা বোর্ডিঙবাসিনীর সম্বন্ধে না শুনা গিয়াছে! পুরুষের সংস্পর্শ-রূপ অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা এড়াইয়া একে-একে কতকগুলি বৎসর অতিক্রম করাই তো অস্বাভাবিক। কিন্তু সেই সংস্পর্শে যে শরীরে আগুন জাগিয়া উঠিবে ও সেই রোমাঞ্চময় দহনানুভূতি যে সমস্ত জীবনে সঞ্চারিত, পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে তাহারই চমৎকার অভিজ্ঞতা কয়টা মেয়ে লাভ করিয়াছে শুনি?

তাই মিলির এই একটি সামান্য কথার শুক পাইয়া সমস্ত মেয়ের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। এক নিমেষেই তাহারা বুঝিল এ ঠিক স্লিপার বা ব্লাউজের প্যাটার্নের মতো প্রেমের ফ্যাশান নয়—এ নিতান্ত একটা সমুচ্ছ্বসিত আনন্দের বুদ্বুদ।

সবাই মিলিকে ছাঁকিয়া ধরিল। মিলির মনের কাছাকাছি হইবার আশায় উষা কহিল—কে এই আগুন লাগালো?

—তোরা সবাই তাকে দেখেছিস।

—আমরা দেখেছি? এমন ভাগ্যবান কে? কোথায়?

—শেয়ালদা স্টেশনে—সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ভোরবেলায়। ঢাকা মেইল যখন ইন্ করলো। সূর্য ওঠবার আগে। মানে আকাশে আর আমার মনে একসঙ্গে যখন সূর্য উঠলো।

ধরিত্রী চিনিয়াছে, বুলা চিনিয়াছে, শোভনাও নিচে থেকে আসিয়া চিনিবে। আরো একটি মেয়ে হয়তো চিনিল—নাম অণিমা—সাঁওতালি ঝুমকোর ঝালরগুলি গালের আধখানায় আসিয়া টিক-টিক করিতেছে—কহিল—ও! সেই গুণ্ডাটা?

এক পশলা হাসির শিলাবৃষ্টি হইয়া গেলো।

মিলি কহিল—তোমরা এখন হাস বা তারপর কাঁদ, আমাকে খাওয়াও শিগগির।

শোভনা পিছন-মোড়া নাগরাটাকে চটি জুতায় রূপান্তরিত করিয়াছে, দুই পায়ে তাহাই ফট-ফট করিতে-করিতে উপরে উঠিয়া আসিল।

—শোভা-দি, খাওয়াও আমাকে।

উষা কহিল—ও প্রেমে পড়েছে শোভা-দি, অতএব কিছুকাল ও হাওয়া আর হাবুডুবু খাচ্ছে। এর পর কিছু ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে ওকে ছেড়ে দাও।

শোভনা বয়সে একটু ভারি বলিয়া সবাই তাহাকে একটু সমীহ করিয়া চলে। সে দুই হাতে ভিড় সরাইয়া দিয়া কহিল—কী তোরা ফাজলামো করছিস (মিলির হাত ধরিয়া) আয় মঞ্জু, আমার ঘরে।

দল বাঁধিয়া সবাই আবার শোভনার ঘর আক্রমণ করিল। নিচু তক্তপোশে, টেবিলের উপর থেকে বই সরাইয়া, ট্রাঙ্ক-সুটকেসের উপর যে যেখানে পারিল বসিয়া পড়িল। ধোপাকে কাল আসিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। শোভনা মিলির বাঁ হাতখানি নিজের কোলের উপর প্রসারিত করিয়া কহিল—কলেজ ছুটি হচ্ছে কবে? এখানেই থাকবি, না—

ধরিত্রী দুই হাঁটুর উপর কনুয়ের ভর রাখিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল, সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল: এ-সব বাজে কথা কী জিগগেস করছ, শোভা-দি? বলো, কবে ও পিঁড়িতে চড়ে মূর্তিমানের চারপাশে সাত-পাক ঘুরবে?

শোভনা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—এতোদূর গড়িয়েছে নাকি?

শোভনা সেই জাতের মেয়ে যার মাত্র পালিশই আছে, ধার নাই—আঙুলের নখ থেকে ললাট-ফলক পর্যন্ত পাতলা আয়নার মতো ঝকঝক করিতেছে ; তাহার গাম্ভীর্যটা মেকি—জীবনে কোনোদিন ভাবাকুল হইতে পারে নাই বলিয়াই তাহার এই সারশূন্য কঠিনতা। সে নিজেকে সবার থেকে যে একটু দূরে সরাইয়া রাখে সে তার মিথ্যা প্রাধান্যবোধের দোষে। তাহার ভাবখানা এই : সে ভাবের স্রোতে পড়িয়াও শোলার মতো ভাসে, অন্ধের মতো আচ্ছন্ন হয় না! অর্থাৎ দেহের সবল স্বাস্থ্যে ও প্রাণের সতেজ প্রাচুর্যে নিজেকে ও বিকীর্ণ করিতে পারে না বলিয়াই বয়োধর্মের এই স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসের প্রতি উহার কপট বিতৃষ্ণা আছে। ইহাই এক ধরনের অস্বাস্থ্য, এবং এমন অসুস্থ মেয়ের সংখ্যা দিন-দিন বাড়িতেছে। মিলি কথা না কহিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতেছে দেখিয়া শোভনা কিঞ্চিৎ শাসনের সুরে কহিল—সত্যিই এতো দূর গড়িয়েছিস নাকি?

মিলি পা দুইটা ঈষৎ দুলাইতে-দুলাইতে কহিল—আমরা তো আর 'বিবাহের চেয়ে বড়ো'-তে বিশ্বাস করি না। খালি বাবার একটা ফর্ম্যাল্ মতের অপেক্ষা করছি। খবরটা নিজে গা করে দিতে এলাম।

শোভনার মুখ-চোখের এমন একটা ভয়াবহ অবস্থা হইল যেন কি একটা সর্বনাশের খবর শুনিয়াছে। এখনো কি মিলিকে রক্ষা করা যায় না?

অণিমা সামনে সরিয়া আসিয়া কহিল—একেবারে শেষ কথা দিয়ে ফেলেছিস?

মিলি হাসিয়া বলিল—ব্যাকরণ ঠিক করে শুদ্ধ ভাষায় এতে আবার কোনো কথা দিতে হয় নাকি?

ঊষা টিপ্পনি কাটিয়া বলিল—এ-ক্ষেত্রে মুখই একমাত্র নীরব, অথচ শরীরের সমস্ত স্নায়ু-শিরা মুখর হয়ে ওঠে।

শোভনা মুখের উপর সেই কৃত্রিম গাম্ভীর্যের পরদা টানিয়া কহিল—কথা দিলেই বা কি! ফিরিয়ে নিতে কতোক্ষণ!

মিলি অবাক হইয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তলাইয়া বুঝিবার সময় তাহার নাই! সে চঞ্চল হইয়া কহিল—এখুনি আবার হয়তো রাস্তায় আমার জন্যে হর্ন বেজে উঠবে। কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে তারপর। বাবার মত নিতে কালই আমরা চিটাগং মেইলে বেরিয়ে পড়বো!

—কাল-ই? বাবা যে তোর মত দেবেন তুই ঠিক জানিস?

মিলি মুখ টিপিয়া হাসিল : বাবার অমত করবার কিছুই নেই। আমি তো

আর অপাত্র খুঁজিনি। আর যদি মত না-ই দেন, সেই তবে আমাদের বাধা। কোনো বাধার বিরুদ্ধে লড়তে না পারলে 'জেষ্ট' থাকে না।

অণিমা এক পাশে এতোক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে নাকটা ঈষৎ একটু কুঁচকিত করিয়া কহিল—না, অপাত্র আর কিসে! দু' হাতে টাকা উড়োয়—শুনছি না কি শিগগিরই বিলেত যাবে—

কথার বন্যায় অণিমার নিঃশ্বাস রোধ করিয়া মিলি একেবারে উথলিয়া উঠিল : এবার আর ওঁর একা বেরুনো হচ্ছে না। আমিও সঙ্গে থাকবো। আর আমিও সঙ্গে থাকবো বলেই নীল সমুদ্র অতো উত্তাল হয়ে উঠতে পারবে। ভেনিসে গিয়ে বাসা বেঁধে থাকবো—সেই তো আমাদের আইডিয়া। চাষ করবো দুজনে।

শোভনার শুকনো ঠোঁটে নিরাভ একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল। হাসির অর্থখানা এই : হে বিধাতা, স্বপ্নবিলাসিনীকে ক্ষমা করিয়ো। নির্বোধ বালিকা জানিতেছে না যে ও কি করিতেছে।

অণিমার কথা তখনো শেষ হয় নাই : কিন্তু চরিত্রখানা কি—

প্রেমের ব্যাপারে চরিত্র লইয়া আলোচনাটা অবিবাহিতা মেয়েদের কাছে অত্যন্ত মুখরোচক।

শোভনা আচার্যার মতো মাথা নাড়িয়া কহিল—না, না, সে-কথা কেন?

—সে-কথা নয়ই বা কেন, শোভা-দি? অণিমাও অপগতমোহ বিংশ শতাব্দীর মেয়ে প্রেমে অবিশ্বাসী হওয়াই তাহার ফ্যাশান : এখনো মঞ্জুকে সাবধান করে দেবার সময় আছে।

মিলি খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল : আমাকে সাবধান করবে কি অণু-দি? আমি কি আর ফিরবো ভেবেছ? একেবারে ভেনিসে—

অণিমার নাসাকুঞ্চন অধরে ও চিবুকে সংক্রামিত হইল : আঁস্তাকুড়ে। পুরুষ-মানুষকে তো জানিস না। দুদিন নেড়ে-চেড়ে নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন মুখ দেখাবি কাকে? মোটর-বাইকের পেছনে বসে হাওয়া খাচ্ছিস, ভাবছিস একেবারে উড়ে গেলাম! কয়েকদিন উড়ে পরে দেখবি নিঃশ্বাসের জন্যে হাওয়া গেছে ফুরিয়ে।

মিলি হাসিয়া কহিল—তখনকার কথা তখন। যাক, ঐ হর্ন বাজলো। আমি চললাম, শোভা-দি।

হর্ন কোথায় একটা বাজিল বটে, কিন্তু গাড়ি কোনো দুয়ারে দাঁড়াইল না।

মিলি ফের ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—পুরুষের নামে অকারণ দুর্নাম করা-ই

তোমার ব্যবসা, অণু-দি। দয়া করে চুপ করো, এ-সব কথা আমি শুনতে চাইনে।

শোভনা সেই ঘোলাটে মুখে—মিলির শাড়ির আঁচলটা পাট করিতে করিতে কহিল—চটিসনে। তোর ভালোর জন্যে বলছে। ও-ছেলের বাজারে খুব নাম-ডাক নেই। শেষকালে তোকে নিয়ে একটা কাণ্ড হোক এ আমরা সইতে পারবো না। পুরুষমাত্রেই নিতান্ত 'হ্যাংলা'—তাই দুদিন রঙিন ফানুস উড়িয়েই নেয় ছুটি। ফানুস যায় ফেটে, চুপসে।

রেলিঙ ধরিয়া নিচে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মিলি কহিল—যাক্, কিন্তু এখনো আসছে না কি রকম!

অণিমা টিপ্পনি কাটিয়া কহিল—আর আসে কি না ছাখ।

—কিন্তু আমিও তো যেতে পারি। বলিয়া মিলি সত্য-সত্যই চলিবার জন্য পা বাড়াইল।

শোভনা কহিল—দাঁড়া। ঠাট্টা নয়, মিলি। তোর ভালোর জন্যেই বলছিলাম। একেবারে তলিয়ে না গিয়ে চোখ তুলে চারদিক একবার চেয়ে দেখিস।

মিলি গভীর স্বরে কহিল—বিচার-বিশ্লেষণ করে ভালোবাসতে পারি না। সম্পূর্ণ মানুষকেই যখন গ্রহণ করবো, তখন তার সমস্ত অসম্পূর্ণতাও স্বীকার করে নেব বই কি। তলিয়ে যেতেই আমি চাই—নিঃশেষে নিমগ্ন না হতে পারলে আমার স্বস্তি নেই।

—একেবারে কি ঠিক করে ফেলেছিস?

গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলিয়া মিলি বলিল—সম্পূর্ণ।

—কিন্তু মানব যদি এখন তোকে প্রত্যাখ্যান করে?

অণিমার চোখে-মুখে এক হিংস্র দীপ্তি ভাসিয়া উঠিল। সেই দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ করিতে মিলি কহিল—সে স্বাধীনতা তার নিশ্চয় আছে, কিন্তু সাধ্য হয়তো নেই। তবু যদি সে প্রত্যাখ্যান করে, করবে—আমি তবু মিথ্যা সন্দেহে বা অবিশ্বাসে এই উন্মাদনাকে ম্লান করে দেব না, শোভা-দি। তেমন ব্যর্থতা আমাদের জীবনের ঐশ্বর্য। ব্যর্থ হবার মাঝেও একটা গভীর আনন্দ আছে।

শোভনার ঠোঁটের কিনারে আবার সেই কৃষ্ণপক্ষের ডুবন্ত চাঁদের হাসি ভাসিয়া উঠিল, যাহার অর্থ: হে বিধাতা, এই অবোধ অনভিজ্ঞ শিশুকে দয়া করিয়া আঘাত করিয়ো না। মুখ ভারি করিয়া কহিল—কিন্তু তোর বাবাই যেন এ বিয়েতে বাধা দেন—

—তাই আশীর্বাদ করো, শোভা-দি। কঠিন বাধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেন প্রেমকে আরো সহিষ্ণু ও সবল করে তুলতে পারি। যুদ্ধে যদি হেরেও যাই, তবু সে-পরাজয়কে আমি ক্ষুণ্ণ করবো না দেখো।

অণিমার অস্ত্র তখনো ফুরায় নাই। সেই কণ্ঠস্বরটাকে বিকৃত করিয়া কহিল—দেখিস শেষকালে সূর্পণখা সেজে বসিসনে।

মিলি স্বচ্ছ হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া কহিল—তবু যুদ্ধ করবার রোমাঞ্চ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবো না। নিশ্চিত সর্বনাশ জেনেও—যখন একবার পাখা মেলেছি—ঝাঁপিয়ে আমি পড়বোই।

আর কি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা যায় শোভনা হয়তো তাহাই ভাবিতেছিল, এমন সময় একথালা মিষ্টি লইয়া ঊষা আসিয়া হাজির।

—আয় শিগগির মিলি, আমাদের ঘরে। কিছু মিষ্টিমুখ করে যা পোড়ারমুখি।

এই বিশ্রী আবহাওয়া থেকে ছাড়া পাইয়া মিলি বাঁচিল। অণু আর শোভনা নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এখন আর কোনো কথা নাই; বিমর্যমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া কোনো কথা আর থাকিতেও পারে না। কে কাহাকে অন্ধকারে একা ফেলিয়া আগে অন্তর্ধান করিবে মনে-মনে দুইজনে বোধকরি তাহাই ভাবিতেছে।

হিড়-হিড় করিয়া মিলিকে ঘরে টানিয়া আনিয়া বিছানায় বসাইয়া দিয়া ঊষা কহিল—কতো খেতে পারিস খা।

ধরিত্রী আর বুলারও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তাহারাও হাত লাগাইল।

ঊষা বলিল—কিন্তু আমাদের মিষ্টিমুখ হচ্ছে কবে?

—তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। কিন্তু তোদের মিষ্টিমুখের আবার তারিখ কি! যে কোনো দিন।

বুলা কহিল—ভেনিসে যাবার আগে দেখা কোরো ভাই।

তাহার কথা-বলার ধরন দেখিয়া মিলি হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল: ভেনিস ততোদিন ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করলে হয়।

জল খাইতে-খাইতে হঠাৎ থামিয়া ঢোক গিলিয়া: ঐ এলো আমার ডাক। আমি এবার চলি।

ঊষা মধুর অন্তরঙ্গতার স্বরে কহিল—শোভাদিদের ঐ সব বাজে কথায় মন খারাপ করিসনে। পরের নিন্দা করতে পারলেই ওদের হলো।

নিচে হর্ন আবার বাজিয়া উঠিল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে-নামিতে মিলি হঠাৎ থামিয়া পড়িল। গলা তুলিয়া অন্ধকারকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—চললাম, শোভা-দি। নেমতন্ন করলে যেয়ো কিন্তু তোমরা।

অন্ধকার নিরুত্তর।

আরো এক ধাপ নামিয়া: ভীষণ কোনো ব্যর্থতাও যদি জীবনে আসে তার ভয়ে আমি এ-আনন্দকে ত্যাগ করতে পারবো না। অতোটা সঙ্কীর্ণতা আমার সইবে না কখনো।

ধরিত্রী, উষা আর বুলা মিলির পিছে-পিছে নামিয়া আসিয়াছে - তাহাকে বিদায় দিবার ছলে একেবারে সামনের রোয়াকটুকুতে। ইচ্ছা, মানবকে একবার দেখিয়া লয়—তাহাদের যে পরিচিতা, তাহার জীবনে এ কোন জ্যোতির্ময় সূর্যোদয় হইল। আশা, কবে আবার তাহারা মিলির মতো এতোখানি অহংকারে জীবনের ব্যর্থতাকে পরাভূত করিবার প্রতিজ্ঞা করিতে পারবে।

বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া অণু ও শোভনাও কিঞ্চিৎ ঝুঁকিয়া পড়িল। মানবকে ভালো করিয়া দেখা গেলো না।

মোটরটা অদৃশ্য হইলে অণিমা কহিল—এই মেয়েটাও মারা পড়লো।

দুর্বল, ভীরুস্বরে শোভনা কহিল—আলোর পোকা।

১৪

স্টিমারের নাম টাইফুন।

নদীর জল ঝির-ঝির করিয়া কাঁপিতেছে: রুপোর চুমকি-বসানো সিল্কের শাড়ি রোদে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে—জায়গার-জায়গায় কুঁচকানো। ফার্স্ট-ক্লাশের ডেকএ বেতের সোফায় বসিয়া মানব সকালবেলাকার খবরের কাগজটা নিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। মিলি রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া একটা চাষার ছেলের মাছ-ধরা দেখিতেছে।

মানব কহিল—স্নান করে নাও না।

—স্টিমারটা আগে ছাড়ুক।

—এই ছাড়লো বলে। কী খাবে তার পর? ভাত?

—নিশ্চয়।

—খুখানিকে তাহলে বলি।

—ব্যস্ত হবার দরকার নেই। এ-দিকে এসো এগিয়ে। দেখ, দেখ, কী

সুন্দর! মানব মিলির গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। রোদে হাওয়া একটু তাতিয়া উঠিয়াছে : মিলির বেণী-ছেঁড়া কয়েক টুকরা চুল মানবের গালে মৃদু-মৃদু লাগিতেছে। মানব কহিল—কোথায়?

মিলি কহিল—চারদিকে।

—আমি তো দেখছি আমার পাশেই।

মিলি আরো ঘেঁষিয়া আসিল : আমার কিন্তু ট্রেনের চেয়ে স্টিমার বেশি ভালো লাগে! ঢেউ দেখলেই মন আমার উথলে ওঠে। বেশ একটু ভয়-ভয় করে কিনা—তাই।

মানব জিজ্ঞাসা করিল—ঐ হাল্কা ডিঙিটা করে নদী পাড়ি দিতে পারো?

—পারি, যদি তুমি সঙ্গে থাকো।

—আমি সঙ্গে থাকলে আর কী এগোবে?

—যদি ডিঙিটা নেহাত ডোবে-ই, তোমাকে আঁকড়ে ধরতে পারবো তো? জানি তুমি আমাকে নদীতে ফেলে রেখেই পাড়ে উঠবে, তবু—

গালে গাল লাগাইয়া মানব কহিল—তোমাকে ফেলে উঠে পড়বো কী করে বুঝলে? তোমার ওজন কতো? বলিয়া মিলির কোমরে হাত দিয়া তাহাকে শূন্যে তুলিয়া তখুনি নামাইয়া দিয়া কহিল—ফুঃ! আমার রেইন-কোটটার চেয়ে হাল্কা। আমার মাথার পালকের বালিশ মাত্র। দিব্যি মাথায় করে তুলে আনবো।

এমনি সময় ভোঁ দিয়া ষ্টিমার পাড় হইতে সরিয়া আসিতে লাগিল, ক্রমশ ঘুরিয়া গেল—মিলির চোখের সমুখে নূতন দৃশ্য। তীরে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা দাঁড়াইয়া আছে, পিছনে পাতার কুটির—ঘন কলাগাছের বেড়ার সীমায় ছায়া-নিবিড়। বিধবার সিঁথির মতো শাদা পায়ে-চলা পথ। ঐ বুঝি ঘেঁটু ফুল ফুটিয়া আছে!

মিলি কহিল—তোমার ও-রকম পাতার ঘরে থাকতে ইচ্ছা করে না?

মানব হাসিয়া কহিল—মনে-মনে করে বৈ কি।

—আমি যদি সঙ্গে থাকি?

—তুমি থাকবে বলেই তো দু'দিন অন্তর ফিরপোতে ডিনার খেতে কলকাতায় চলে আসি সটান।

—না, না, একেবারে এখানকার বাসিন্দা হয়ে যাবো। তুমি লাঙল হাতে নিয়ে চাষ করবে, আর আমি কুলো নাচিয়ে ধান ঝাড়বো। তুমি কাঠ ফাড়বে, আর আমি কুড়োব শুকনো পাতা।

—কিম্বা ঐ নৌকোয় থাকতে তোমার আপত্তি হবে? আমি মাঝি হয়ে

দিন-রাত দাঁড় বাইবো, আর তুমি ছইয়ের ভেতর বসে রান্না করবে। জাল পেতে আমি ধরবো মাছ, তুমি কুটবে কুটনো।

—রাত্রি বেলা?

—পাড়ে কোথাও নৌকো লাগিয়ে জলে পা ডুবিয়ে দুজনে বসে-বসে গল্প করবো।

—কিসের গল্প?

—এই, এখানে আর ভালো লাগে না। নিউ-এম্পায়ারে নতুন যে রাশ্যান নর্তকী নাচছে, তা চলো একবার দেখে আসি। মোটর-বাইকে লেইকটা বার কতক চক্কর মারি। চীনে হোটেলের হ্যাম কিন্তু অনেকদিন খাইনি। মিলি খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল—যাই বলো, তুমি নিতান্ত শহুরে। শহর তোমার কাছে মদের মতো।

—আর গ্রাম বুঝি তোমার কাছে পাথরের গ্লাশে মিছরির পানা। দুদিনেই ঠাণ্ডা। টেম্পারেচার পঁচানব্বুয়েরও নিচে।

মিলি গাঢ় গভীর স্বরে কহিল—যাই বলো, আমি হয়তো কিঞ্চিত কবি হয়ে উঠেছি। পৃথিবীতে সুন্দর বলে অনুভব করাই তো কবি হওয়া, না?

—কিন্তু আমরা সে-স্টেইজ পার হয়ে এসেছি। আমরা পৃথিবীকে সুন্দরী বলে অনুভব করি বলেই তাকে জয় করতে চাই। কী বলো? বলিয়া মিলিকে সে ধীরে আকর্ষণ করিল।

মিলি সেই স্পর্শের মাঝে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া কহিল—যাই, চুলটা খুলি।

—দেখি আমি তোমার বেণীর বন্ধন মোচন করতে পারি কিনা।

মানবের উৎসুক হাত হাতের মুঠির মধ্যে টানিয়া নিয়া মিলি বলিল—আমি চান করতে গেলে তুমি ভাতের কথা বলে দিয়ো। খিদে পেয়েছে বেশ।

তবু মিলির মুক্ত হইবার চেষ্টা দেখা যায় না।

কে-একটি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ভুল করিয়া এ দিকে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল; তাহারা প্রথমে টের পায় নাই। পরে সেই যাত্রীটি তাহার বন্ধুদের এই মনোরম দৃশ্যটি দেখাইবার জন্য কখন দুয়ারের বাহিরে জড়ো করিয়াছে। অসাবধানে কে-একজন একটা আওয়াজ করিয়া উঠিতেই মিলির প্রথমে নজর পড়িল। অমনি সবাই চম্পট।

মিলি কহিল—না, বেলা বেড়ে চললো। বাথরুমে জল আছে তো?

হাঁটু গাড়িয়া নিচু হইয়া ডেকএর উপর বসিয়া মিলি স্যুটকেশ খুলিয়া কাপড়

সেমিজ ব্লাউজ পেটিকোট তোয়ালে তেল সাবান খোলস ইত্যাদি বাহির করিতে লাগিল। শীর্ণ শুকনো বেণী দুইটা দুই কাঁধের উপর দিয়া বুকের উপর নামিয়া আসিয়াছে – আঁচলটা এলোমেলো, পায়ের দুমড়ানো পাতা দুইটি নদীর ফেনার মতো শাদা।

মিলি স্নানের ঘরে প্রচুর জল লইয়া একটা বড় মাছের মতো খলবল করিতেছে —ষ্টিমারের ঢেউ-ভাঙার শব্দ ভাঙিয়া সেই স্বর জলতরঙ্গের মতো মানবের কানে লাগে।

মিলি বলে : নদীর উপর কি-কি দৃশ্য দেখছ আমাকে বঞ্চিত করে—শিগগির বলো।

মানব বলে : আমি সম্প্রতি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ছি।

ঘরের ভিতর হইতে কথা আসে : বলো কি ? প্রতি মুহূর্তে নদীর নতুন রূপ— প্রথম-প্রেমে-পড়া কিশোরীর মতো।

—আমি তো দেখছি জল আর জল। মুখে দিলে নোনতা, চোখে অত্যন্ত ঘোলা। পান করবার যেটুকু, সেটুকু তোমার ঠোঁটে। তুমি নেহাত অদৃশ্য বলেই কথাটা বলতে পারলাম। অপরাধ মার্জনা কোরো।

একটুখানি পরে আবার কথা আসে : আমি হলে নদীর বা তীরের এক কণা সৌন্দর্যও হারাতে দিতাম না। এ-জায়গাটা কি খুব ফাঁকা ?

—না, এখানে দিব্যি চর জেগেছে—নতুন চর। উড়ি ঘাস ; দু-চারটে বক দেখা যাচ্ছে।

প্রায় কান্নার স্বরে : বা, আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—তোমার ঘরে জানলা নেই ?

—আছে একটা, কিন্তু পাখি-তোলা। এঁটে বসেছে। কী হবে ? ওদের থামতে বলো।

—মাঝিরা চরে জাল শুকোচ্ছে। দুটো বক এই উড়লো। এখেনে রাজ্যের কচুরিপানার ভিড়।

—তারপর ?

—দাঁড়াও। টিকিট-চেকার এসেছে।

কতক্ষণ বাদে : গেছে ?

—হ্যাঁ।

—বাবাঃ, মরেছিলাম আরেকটু হলে।

—কেন ?

—কচুরিপানা দেখতে ভিজে গায়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম! বড়ো জোর বেঁচে গেছি।

—কিন্তু এখনো অনেক জিনিস দেখবার আছে। এই একটু বাদেই মিলিয়ে যাবে। যদি দেখতে চাও তো বেরিয়ে এসো। জীবন ক্ষণস্থায়ী দৃশ্যপথ নিয়ত-পরিবর্তনশীল।

—কবরেজি ভাষায় কথা কইছ যে। কী এমন দৃশ্য?

—একটা কুমির ডাঙায় উঠে রোদ পোহাচ্ছে।

মিলি হাসিয়া বলে: মিথ্যা কথা।

—আচ্ছা, বেশ। দেখ, দেখ, কী প্রকাণ্ড হাঁ।

—জু-তে ঢের দেখেছি।

—এই দেখ একটা হাল্কা ডিঙি ষ্টিমারের মুখে পড়ে উলটে গেল আর কি।

—উলটে যায়নি তো?

—যায়নি বটে, কিন্তু ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছে।

—ও রকম তো আমাদের নৌকোও একবার হয়েছিলো। গঙ্গায় তোমার মনে নেই? এ তেমন নতুন কী!

মানব তবু আশা হারায় না: কিন্তু গাঙ-শালিক তুমি দেখেছ কোথাও? ঝাঁক বেঁধে ষ্টিমারের রেলিঙে এসে বসেছে।

—কই দেখি।

মিলি দরজা ঠেলিয়া শুকনো কাপড়ে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিল।

—কোথায় গেলো তোমার গাঙ-শালিক?

মানব হাসিয়া বলিল—তোমাকে বেরিয়ে আসতে দেখে পালিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া দুইজনে সামনের ডেকএ চেয়ার টানিয়া বসিয়াছে; হাওয়ার জোয়ারে চুল আঁচল খবরের কাগজ উড়িয়া পড়িতেছে। তৃপ্ত চোখে রৌদ্র-মদির নদীর লাবণ্য দেখিতে-দেখিতে হঠাৎ মিলি কহিল—এসো, খানিকটা ড্র ব্রিজ খেলি।

বেতের একটা টিপয় দুইজনের মাঝে রাখিয়া মানব তাশ ডিল করিতে বসিল। তাশ না তুলিয়াই ডাক পড়িল: ফোর নো-ট্রাম্পস্।

মিলি হাসিয়া বলিল—স্টেইক রেখে খেলতে হবে।

—যুধিষ্ঠিরের মতো দ্রৌপদীকে পণ রেখে?

—দ্রৌপদীকে নিয়ে আমি কী করবো?

—তবে এই মনি-ব্যাগটা?

—ওটা তো ফাঁকা—টাকার পুঁটলি তো তোমার বাক্সে।

—তবে এই আংটিটা?

—ওটা অমনিই পরিয়ে দাও না।

মানব বলিল—তুমি যেমন ভাবে কথা বলছ তাতে মনে হচ্ছে আমি যেন রাশি-রাশি ডাউন দিয়ে বসে আছি। কিন্তু মহারাণী যদি হারেন, তিনি কী দেবেন?

হাতের তাশ গুছাইতে-গুছাইতে মিলি বলিল—মহারাণী হারতে বসেননি।

—কিন্তু যদিই দয়া করে হারেন, কী পাওয়া যাবে?

—কী আবার! ফলের ঝুড়ির ছাড়ানো খোসাগুলি।

—এ মোটেই সমান-সমান হল না। তুমি তোমার হাতের চুড়িগুলো!

—আর, এই বুঝি সমান ভাগ হল? তার চেয়ে অন্য হিসেব করা যাক এসো!

—আমারো মাথায় এসেছে কিন্তু।

লজ্জায় রাঙা হইয়া মিলি বলিল—আমারো।

কিন্তু পরক্ষণেই হাতের সমস্ত তাশ উল্টাইয়া কহিল—বাবাঃ, এই হাতে ভদ্রলোক খেলতে পারে? হেরে ভূত হয়ে যেতাম!

মানব তাড়াতাড়ি দুই হাত বাড়াইয়া টিপয়ের বাধা ডিঙাইয়া মিলিকে বুকের মধ্যে টানিয়া নিয়া কহিল—আমার হাতের তাশ নিয়ে খেলে জিতেই বা তোমার ভূত হতে বাকি থাকতো কী!

মুখখানি নিজের বাহুর মধ্যে লুকাইয়া মিলি মানবকে মৃদু-মৃদু বাধা দিতে লাগিল। এই মধুর বাধাটুকুর বোধকরি তুলনা নাই! মানব মিলির মাথাটা কাঁধের তলায় ধীরে-ধীরে শোয়াইয়া কানের পিঠের চুলগুলি নিয়া আস্তে-আস্তে আদর করিতে লাগিল।

,ডান-হাতের মধ্যমায় কখন মানব তাহার আংটিটি পরাইয়া দিয়াছে।

মিলি হঠাৎ মাথা তুলিয়া কহিল—এখন এক পেয়ালা করে চা খেলে হত।

মানব কহিল—এ নিতান্তই তোমার কথা পাড়বার ছল মাত্র। বেলা দুটোয় তুমি চা খাও?

দুই চোখে টলটলে খুশি নিয়া মিলি কহিল—আজ সব দিক থেকেই অনিয়ম করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঐ একটা স্টেশন এলো বুঝি। এখেনে ষ্টিমার থাকবে। বলিয়া মিলি চেয়ার ছাড়িয়া রেলিঙ ধরিতে ছুটিল।

মানব স্মিত হাস্যে মিলির এই দ্রুত পলায়নটি উপভোগ করিল।

অথচ ইচ্ছা করিলে মিলিকে সে বাহুর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিত। ইচ্ছা

করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। ইহার উপর এই অপ্রতিহত প্রভুত্ব খাটানোর মতো বিলাস কী আর হইতে পারে। হাতের মুঠোয় ব্যয় করিবার মতো জিনিশ পাইলেই মানব তাহা অনায়াসে উড়াইয়া দিয়া বসিয়াছে—হাতের মুঠাও তাহার কোনোকালে তাই শূন্য থাকে নাই। কিন্তু মিলিকে সে অনন্তকালের জমার ঘরে রাখিয়া দিতে চায়—কোথাও এতটুকু ব্যয়ের ক্ষতি যেন তাহার সহিবে না। কেন জানি এই কেবল তাহার মনে হয়, মিলি তাহার সঙ্কীর্ণ অস্তিত্বটুকু দিয়া মানবের জীবনব্যাপী অবকাশের আকাশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—সে-পূর্ণতাকে সে কৃপণের মতো সঞ্চয় করিয়া রাখিবে। মিলির দিকে চাহিয়া তাহার বড় মায়া করে, ইচ্ছা করে উহাকে কোলে করিয়া জাগিয়া-জাগিয়া দুঃখের রাত সে পোহাইয়া দেয়!

মিলি যেন তেমন বাতি নয় যাহা উস্কাইয়া দিলে বেগে জ্বলিয়া উঠিবে। মিলি যেন সেই দূরের তারা—সমস্ত রাত্রি ভরিয়া যাহার স্তিমিত দ্যুতি! মিলি বলিল—এই স্টেশনে অনেক লোক উঠবে। ঐ দেখ, জলে নেমে আঁকশি তুলে দোতলার প্যাসেঞ্জারের থেকে ভিক্ষা চাইছে। চলো, ডেকটা একবার ঘুরে আসি।

মিলি যেন ছুটির দিনে দুপুর-বেলায় বাড়িতেই আছে—তাহার তেমনি বেশ। গায়ে সেমিজ—ব্লাউজের হুক না আটকাইয়াই ইস্ত্রি-ভাঙ্গা মচমচে আঁচলটা কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়াছে; প্রান্তমূলে চাবির গোছার ভার রহিয়াছে বলিয়াই হাওয়ায় যা হোক স্খলিত হইতেছে না। চুলগুলি এলো—তেলে কুচকুচ করিতেছে—পিঠে-বুকে একাকার হইয়া আছে। পায়ে অয়েল-ক্লথের চটি। মুখে পথ-ভ্রমণের এতটুকু মালিন্য নাই। সম্মুখের ডেকএ বাহির হইয়া আসিতেই অগণিত যাত্রীর সমবেত দৃষ্টি তাহার মুখে পড়িল। অগত্যা আঁচলটা সামলাইয়া মাথার উপর একটা ঘোমটার মতো করিয়া টানিয়া দেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।

মিলি বায়না ধরিল: কিছু পাত-ক্ষীর কেনো। চায়ের সঙ্গে খাওয়া যাবে। মানব ঠাট্টা করিয়া বলিল—কিছু গরম দুধও কিনে রাখ। হাঁড়ির চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছে।

—কলা? এই অমৃতসার কলা কত করে।

মিলি দস্তুরমতো দরদস্তুর শুরু করিয়াছে।

মানব বলিল—আঁচলটা বিছোও দিকি। কিছু চিঁড়েও কিনে নিই। কামিনীভোগ চিঁড়ে।

মিলি মানবের কথায় কান দিবে না। সে পাত-ক্ষীর ও কলা কিনিল। কহিল—তুমি এখেনে দাঁড়াও, আমি এগুলো রেখে আসি। পরে নিচে নামবো একবার।

এক হাতে কলার কাঁদি ও অন্য হাতে কলাপাতায় বাঁধা শুকনো ক্ষীর লইয়া মিলি যাত্রীদের প্রসারিত পাদপদ্মের অরণ্য ভেদ করিয়া অন্তর্হিত হইল। এইবার যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার কেশ-বেশের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

বেমজবুত কাঠের সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করিতে যাত্রীরা নাকাল হইতেছিল। মানব আর মিলি নিচে নামিয়া আসিল—এঞ্জিনের পাশে। জায়গাটা ভীষণ গরম। ভয়ে মিলির গায়ে ঘাম দিল। তাঁতের মাকুর মতো দুটো বিশাল লৌহদণ্ড এমন বেগে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ওঠা নামা করিতেছে—মিলির মনে হইল কখন নির্দিষ্ট পথ হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া তাহাকেই গ্রাস করিয়া ফেলে বুঝি।

মিলি ব্যস্ত হইয়া বলিল—শিগগির ওপরে চল। দৈত্যের পাকস্থলী আর দেখতে চাইনে।

জায়গাটা জল পড়িয়া পিছল হইয়াছে; তাড়াতাড়ি মিলির হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া মানব কহিল—পাকস্থলীর ক্রিয়া ঠিকমতো না চললেই তো মৃত্যু।

—তবু পাকস্থলীর চেয়ে বাইরের স্বাস্থ্যটাই আমরা কামনা করি। পাকস্থলী নিয়ে মাথা ঘামাই না।

—যেমন তোমার রূপ। যেমন তুমি। কোথায় এমনি কলকজার সোরগোল চলেছে খবর রাখি না। তোমার চোখের অন্তরালে কোন স্নায়ুর কি কাজ—জানতে আমার বয়ে গেছে।

উপরে আসিয়া হাওয়া পাইয়া মিলি বাঁচিল। খোঁপাটা খুলিয়া পিঠের উপর চুল ছাড়িয়া দিয়া বুকের কাপড় আলগা করিয়া সে গভীর নিঃশ্বাস ফেলিল। ট্রে সাজাইয়া বয় চা দিয়া গিয়াছে।

গরম চায়ের বাটিতে—হ্যাঁ, বাটিই বটে—ঠোঁট ডুবাইয়া তক্ষুনি মুখ সরাইয়া আনিয়া মিলি জিভ উলটাইয়া মৃদু-মৃদু ঘষিতে-ঘষিতে উপর-ঠোঁটটা ঠাণ্ডা করিয়া কহিল—চাঁদপুর কতোক্ষণে পৌছুব?

—রাত সাড়ে-আটটা হবে। স্টিমার কিছু লেইট আছে।

—বাড়ি পৌছুতে প্রায় ভোর, না? আমাদের নতুন বাড়িটা কতোদিন আমি দেখিনি। সামনে বিরাট নদী—এখন নাকি শুকিয়ে এসেছে। ধু-ধু মাঠও আমার ভালো লাগে।

—প্রকাণ্ড কিছু-একটা মুক্তির চেহারা দেখলে আমিও অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করি।

—ওটা আমাদের সাহেব বাড়ি নয়। কয়েক বছর আগে ওর পোজিশান দেখে বাবার ভারি ভালো লাগে। ওটা উনি কিনেছেন। এতোদিন তো ওটা মালি-মজুরের জিম্মাতে থেকে ভেঙে-ধ্বসে একসা হয়ে যাচ্ছিলো। বাবার শখ হলো ওটাতে উনি কায়েমি হয়ে বসবেন! তাই ওটার গায়ে শুনছি নতুন করে চুন বালি উঠেছে। বাড়িটা বিশাল—সামনে সমুদ্রের মতো মাঠ।

মানব টোস্টে ছুরি দিয়া মাখন মাখাইতে-মাখাইতে কহিল-- বাড়িতে আর কে আছেন?

—আর, আমার এক বিধবা পিসিমা, গোরাও আছে নিশ্চয়।

—কে গোরা?

এই সব অত্যাবশ্যকীয় খবর মানব আগে লয় নাই কেন?

মিলি কলার খোসা ছাড়াইতে-ছাড়াইতে কহিল—পিসিমার ছেলে। এই বোধহয় ন'য়ে পড়েছে। পুঁটি-মাছের মতো চঞ্চল। ঐ ছেলেকেই পেটে নিয়ে পিসিমা বিধবা হন। স্বামী মারা যাবার পর শ্বশুরবাড়িতে ওঁর স্থান হলো না। বাবা-কাকাদের ঐ একটিমাত্র বোন—সবাইর ছোট। বাবাই তাঁর ছোট বোনকে আগলে ফিরছেন।

কলায় একটা কামড় দিয়া: দেখবে আমার পিসিমাকে। যেমন নিষ্ঠা তেমনি ধৈর্য। পিসিমাকে পেয়ে মায়ের দুঃখ আমি ভুলে আছি।

প্রত্যেকটি শব্দ স্নেহে ভিজাইয়া মানব কহিল—মা-কে তোমার মনে পড়ে?

চিবানো বন্ধ করিয়া মিলি বলিল—মনে পড়তে পারে না বটে, তবু আমি মনে-মনে মায়ের মুখ রচনা করি। বাবার জীবনে মায়ের যে দীর্ঘ ছায়া পড়েছে তার থেকে আমি তাঁর একটা শান্ত ও সুন্দর পরিচয় পাই।

বেলা এখন পড়িয়া আসিয়াছে, গাছের তলাগুলি মায়ের কোলের মতো ঠাণ্ডা। মানব কহিল—তোমার বাবাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

মিলির হাসি কোণের সেই উদ্ধত দাঁতটি ছুঁইয়া ধীরে-ধীরে মিলাইয়া আসিল।

—ইচ্ছে তো করে, কিন্তু যুগলমূর্তি দেখে তিনি যদি ঠ্যাঙা নিয়ে তেড়ে আসেন?

মানব না-হাসিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল—না, তিনি উপদ্রবই করতে পারেন না। রাত থাকতে উঠে যিনি সেতার বাজিয়ে উপাসনা করেন, তাঁর মনে নিশ্চয়ই

এমনি একটি উদার শান্তি আছে যা আমাদের মিলনের পক্ষে অনুকূল বায়ুসঞ্চার করবে। স্ত্রীর বিরহ যাঁর জীবনে এমন লাবণ্য বিস্তার করেছে তিনি কখনোই স্বয়ম্বৃতা মেয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না।

চা-টা এইবার ঠাণ্ডা হইয়াছে; নিশ্চিন্ত হইয়া ঠোঁট ডুবাইয়া মিলি কহিল—কিন্তু ষ্টিমারের ঐ পাকস্থলীটা তো দেখলে? আমি কিন্তু তাতে বেশি জোর দিই না। আমি ভাবছি—

মিলি টোস্টে কামড় দিয়া ঠোঁট ও নাক ঢাকিয়া মানবের দিকে কেমন করিয়া চাহিল।

মানব কহিল—তা ছাড়া কী আবার ভাববার আছে। তোমার বাবার কর্তৃত্ব ছাড়া আর-কিছু আমি মান্যই করবো না। তোমার বাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে বরং তাতে কিছু শ্রী থাকবে, অন্য কেউ এতে মাথা গলাতে এলেই তা নির্বিবাদে গুঁড়ো হয়ে যাবে। আমি তখন দুঃশাসন। তেমনি করিয়া চাহিয়া মিলি বলিল—কিন্তু তার চেয়েও দুঃসহ দুঃখের কারণ ঘটতে পারে।

মানব প্রথমে কিছুই ভাবিয়া পাইল না; একেবারে যেন জলে পড়িয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। পরে কি একটা কথা ভাবিয়া লইয়া উত্তেজনায় চায়ের তলানিটা ডেক-এর উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া জোর গলায় কহিল—আর কিছুই ঘটতে পারে না।

ভীত, বিমর্ষকণ্ঠে মিলি কহিল—তুমি যদি ঐ চায়ের তলানির মতো অমনি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও?

পীড়িতমুখে মানব কহিল—তেমন কোনো সূচনা তুমি দেখেছ নাকি?

মানবের মুখ দেখিয়া মিলির কষ্ট হইতে লাগিল। তবু দৃঢ় হইবার ভান করিয়া বলিল—আমার মাঝে আকৃষ্ট হবার কী-বা থাকতে পারে আমি ভেবে পাইনে। বাইরের জৌলুস যে-টুকুন আছে তা মিলিয়ে যেতে কতোক্ষণ।

—তুমি কি খালি বিধাতার সৃষ্টি নাকি—আমার নও? আমি তো আমার প্রতিমাকে বিসর্জন দেবার জন্যে তৈরি করিনি।

কেহ আর অনেকক্ষণ কথা কহিল না। ষ্টিমার সমানে চলিয়াছে। দুইজনের চোখের সামনে দিনের আলো তরল হইয়া আসিতেছে। পাখিদের দল বাঁধিয়া বিদায় নিবার সময় আসিল।

মানবের কাছে মিলি মাত্র সামান্য নারী নয়—যে-নারীকে এতদিন সে ভাবিত ঝক্‌ঝকে গয়না আর চকচকে শাড়ি। মিলি তাহার কাছে মূর্তিমতী প্রেম—পৃথিবীর আদিম নরের কাছে পরিধিহীন আকাশ। ঐ ভঙ্গুর মৃন্ময় দেহটি মানবের

কাছে সমুদ্রের মতো পরমতম বিস্ময়। যে নামহীন বিধাতা এতদিন অগোচরে কাল কাটাইতেছিলেন, তিনি সহসা মিলির দেহে বাসা নিলেন। নদীর উপরে এই ঘনায়মান সন্ধ্যা পার হইয়া মানব যেন বহুবিস্তীর্ণ পৃথিবী অতিক্রম করিয়া একা একা কোথায় যাত্রা করিয়াছে!

মিলির হাতের উপর ধীরে-ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে মানব কহিল—এই সন্ধ্যা হলো। অল্প-অল্প মেঘ জমেছে। পূবে হাওয়া দিয়েছে। ঝড় না ওঠে।

মিলি কথা না কহিয়া সর্বাঙ্গে সন্ধ্যার এই কোমল মুহূর্তটির শ্বাস অনুভব করিতে লাগিল।

মানব বলিল—সময়টা ভারি ভালো লাগছে। এই দুর্লভ সোনার সন্ধ্যাটি আমার মনে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। এমন বিশ্রাম জীবনে আর কোনোদিন পাইনি, মিলি।

আবহাওয়াকে সহজ ও সরল করিবার সুযোগ আসিয়াছে। মিলি কহিল—তুমি যে দেখছি হঠাৎ বুড়িয়ে গেলে। এ কী কথা শুনি আজ 'মন্থরের' মুখে! তুমি বিশ্রামের ভক্ত!

—আমরা আজকের দিনে প্রতিমুহূর্তে রোমাঞ্চ চাই বলেই প্রতিমুহূর্তে শ্রান্ত হচ্ছি। বিশ্রামের ক্ষণগুলিকে উপভোগ করার আর্ট ভুলে গেছি বলেই আমরা জগৎ জুড়ে নিরুদ্দেশ গতির ঝড় তুলে দিয়েছি। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে আজকের দিনে এরোপ্লেনে অ্যাল্‌পস্‌ ডিঙিয়েও আমরা গরুর গাড়ির যুগের চেয়ে বেশি সুখ পাইনি।

মিলি মজা পাইয়া কহিল—তোমার হঠাৎ এই পক্ষাঘাত শুরু হলো?

মানব তন্ময় হইয়া বলিয়া চলিল: যতোই আমরা ছোটার নেশায় ধূমকেতু সাজি না কেন, আমাদের মন আজও ছন্দের অনুবর্তী, মিলি। আমার কেন জানি না এখন খালি এই কথাই মনে হচ্ছে, আমাকে হাউই-এর মতো মঙ্গলগ্রহের দিকে ছুঁড়ে দিলেও এই গা এলিয়ে বসে থাকার চেয়ে বেশি রোমাঞ্চ আমি পাবো না। পুরাকালে পরীরা যেমন ধরো ড্যাফনে—য়্যাপোলোর ভয়ে কেমন দিশেহারা হয়ে ছুটতো, খবর রাখো তো? আমরাও তেমনি ছুটছি—জীবনকে অবসন্ন হতে দেব না ভেবে। একটু থামতে পারলে হয়তো দেখতাম ড্যাফনের মতো আমরাও পালিয়ে বেঁচে কখন ফুল হয়ে ফুটে উঠেছি। উদ্দাম ছোটার চেয়ে একটি গাঢ়তম মন্থরতম মুহূর্ত ঢের সুখের।

—আপাততো নয়। মিলি বলিল—বেশ ভালো করেই মেঘ জমছে।

ঝড় উঠবে। যা স্টিমারের নাম! আমার ভয় করছে। যদি স্টিমার ডুবে যায়!

—পাগল! এ-স্টিমারের সারেঙ খুব ওস্তাদ সারেঙ। অনেক ঝড়কে সে হালের বাড়ি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওঠ, একটু বেড়াই।

—চাঁদপুর পৌঁছুতে আর কতোক্ষণ?

ঘড়ির দিকে চাহিয়া: ঘণ্টা দেড়েক হয়তো।

—তা হলেই হয়েছে। বাবার মত নেবার আগেই এ-যাত্রা সমাধা হবে। ভগবানে বিশ্বাস কর তো তুমি? আমার মোটেই আসে না।

মানব হাসিয়া উঠিল: ভগবান যে এতো বেরসিক নন সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

—মরতে আমার সত্যিই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমাদের ইটালি যাওয়া বাকি আছে। যাবে তো?

মানব মিলির কতগুলি চুল মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—মেঘনার ওপরে সামান্য মেঘ দেখেই তুমি শিউরে উঠছ!

—দাঁড়াও, চুলটা বাঁধি। বাক্সগুলি এলো—গুছোতে হবে না? হোল্‌ড্-অল্‌টা তখন শুধু-শুধু মেললে। বাঁধো এবার।

—এখনো দেরি আছে। দাঁড়াও, একটা মজা দেখ।

মিলি ফিরিল।

মানব তাশগুলি হাওয়ার মুখে ছুঁড়িয়া দিল। মনে হইল এক ঝাঁক উড়ন্ত পাখি।

মুখ টিপিয়া মিলি হাসিল। বলিল—তোমার পুঁটলি থেকে নোটগুলি বের করে অমনি ছুঁড়ে দি?

তারপর বৃষ্টি নামিল। অন্ধকারের ঢেউয়ের উপরে দূরে-দূরে কয়েকটি বাতির কণা দুলিতেছে।

মানব কহিল—বৃষ্টি দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। বৃষ্টি না এলে মেঘনা সর্বাঙ্গসুন্দরী হতে পারে না। দেখ, কতো দূর পর্যন্ত সার্চ-লাইট পড়েছে। মিলি আর কথা কয় না। নদীর সীমা আর দেখা যায় না। মনের সঙ্গে মিলিয়া নদীও বুঝি তট হারাইয়াছে।

খুব কাছে মুখ সরাইয়া আনিয়া মানব কহিল—ভয় করছে?

মিলি আবদারের সুরে ভেঙচাইয়া কহিল—খিদে পাচ্ছে? চোখ ঢুলছে? দেখ না তোমার ঘড়িটা? দিনে এতোখানি স্লো যায়—কলকাতায় থাকতে সারিয়ে আনোনি কেন?

কখন আবার দেখিতে-দেখিতে বৃষ্টি থামিয়া গেল! সঙ্গে-সঙ্গেই ষ্টিমার যেন আনন্দে বাঁশি বাজাইল।

—এই. এসে গেছে চাঁদপুর!

মানব কহিল—না, এখনো দেরি আছে।

—ছাই দেরি। শিগগির জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলো বলছি। সঙ্গে আবার চাল করে এই লাঠিটা এনেছ কেন?

—বৃষ্টি তাড়াবার জন্য!

—না, আমাকে তাড়াতে?

মানব মিলিকে ধরিয়া ফেলিল। বুকের কাছটিতে ঘন করিয়া টানিয়া আনিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই বলা হইল না।

মিলি কহিল - থাক, হয়েছে। ছাড়ো। মানব তাহাকে আস্তে ছাড়িয়া দিল।

নোয়াখালিতে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইল—তখনো বেশ অন্ধকার আছে। গাড়ি দাঁড়াতেই বুড়া চাকর ভীম প্রত্যেকটি কামরার জানলায় মুখ বাড়াইয়া মিলিকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

মিলি তখনো ঘুমাইতেছে; তাহার গায়ে ঠেলা মারিয়া মানব কহিল—গাড়ি এইখেনেই খতম। নামতে হবে না? ওঠ, পাততাড়ি গুটোও। দেখি, তোমাকে নিতে কেউ এলো কিনা।

জানলা তুলিয়া মানব মুখ বাড়াইল।

—তুমি এ-দেশের কাকে চিনবে? বলিয়া মিলি মানবের পাশে মুখ-বাড়াইল। তারপরে ঈষৎ গাল ফিরাইয়া: আমাদের কেউ এখন একটা স্ন্যাপ নেয় না? ঠিক টুরিস্টের মতো লাগছে।

ভীম নিরাশ হইয়া লণ্ঠন হাতে করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল; মিলি গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল—এ কেমন ধারা হলো? বাবা কাউকেও পাঠালেন না?

মানব কুলির মাথায় স্যুটকেস দুইটা চাপাইয়া দিতে-দিতে কহিল—পা দিতে-না-দিতেই অভ্যর্থনার চমৎকার আভাস পাচ্ছ। আমি সঙ্গে আসছি এ-কথা শখ করে লিখতে গেলে কেন?

চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে মিলি বলিল—এ কক্‌খনো হতে পারে না। বাবা অত্যন্ত গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—এখুনিই গিয়ে লাভ নেই। অন্তত ভোর হলে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে

বুঝিয়ে বলতে পারবে। সদ্য ঘুম থেকে উঠেছেন এখন ওঁকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না। বরং ওয়েটিং-রুমে—ইজিচেয়ার আছে তো?—যে রোখো স্টেশন! এ কোন ভূতের দেশে নিয়ে এলে? বরং চলো ওয়েটিং রুমে—মশার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও খানিকক্ষণ গুঞ্জন করি।

কুলিকে উদ্দেশ করিয়া মিলি কহিল—স্টেশনে গাড়ি আছে রে?

একটা গাড়োয়ানই যাত্রী পাকড়াইতে এ দিকে আসিতেছে দেখা গেল। তাহার হাতে চাবুক—অর্থাৎ মেহেদি গাছের লিকলিকে একটা ডাল; কিন্তু কুলি বলিল, ও হাঁকায় গরুর গাড়ি, বাবুদের নেহাতই দূরদৃষ্ট।

মানব উৎফুল্ল হইয়া বলিল—আপ-টু-ডেইট হও, মিলি। গরুর গাড়িই সই। বিছানা বিছিয়ে একটু ঘুমোনোও যাবে, আর বাড়ি যেতে যেতে ফরসা। এক ঢিলে দুই পাখি।

অগত্যা মিলি গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকেই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হীরালালবাবুর বাড়ি চেন?

এতক্ষণে বুঝি ভীমচন্দ্রের হুঁস হইল। সে এতক্ষণ লণ্ঠন উঁচাইয়া মিলিকেই দেখিতেছিল—তাহার দিদিমণি যে রাতারাতি মেমসাহেব হইয়া উঠিয়াছে বুড়া চক্ষু কচলাইয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া সঙ্গে এ কোন নবাবজাদা আসিয়াছেন, দিদিমণি স্বচ্ছন্দে তাঁহার হাতে একটা ঝটকা টান মারিয়া কহিল—চলো গরুর গাড়িতেই।

কর্তার নাম শুনিয়া ভীমের সন্দেহ ঘুচিল। আগাইয়া আসিয়া কহিল—আমিই তো এসেছি।

—এতোক্ষণ ঘুমুচ্ছিলে বুঝি? মিলির মুখ খুশিতে ভরিয়া উঠিল: বাঁচলাম। আরো আগে আসতে পারোনি?

—কতো আগেই তো এসেছিলাম। কিন্তু আপনি যে ফাস্টো কেলাসে আছেন তা কে জানতো। সোভান মিঞা গাড়ি নিয়ে বসে আছে।

মানব তখনো গরুর গাড়িতে উঠিবারই সরঞ্জাম করিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া মিলি বলিল—লোক পেয়েছি। চলে এসো। গাড়ির আর দরকার নেই।

মানব কয়েক পা ফিরিয়া আসিয়া কহিল—এ তো গাড়ি নয়, রথ। চলো, একশো বছর আগে পিছিয়ে যাই একটু। সেই তো আধুনিক হওয়া।

—কিন্তু বাবা যে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—ঐ গাড়ি চড়ে মাল-পত্র নিয়ে তোমার লোক আগে বেরিয়ে যাক,

আমরা পরে যাচ্ছি। নদীতে চোখের সামনে সন্ধ্যা দেখেছিলে, এবার দেখবে ভোর।

প্রস্তাবটায় নবীনতার উন্মাদনা আছে বটে, কিন্তু বাবাকে যত তাড়াতাড়ি পারে দেখিবার জন্য মিলির চোখের দৃষ্টি এখন ব্যাকুল, উধাও। সে কহিল —না। বাবা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেই গাড়িতেই যাবো! গরুর গাড়িতে ধুঁকতে ধুঁকতে আমি যেতে পারবো না। গিঁটে-গিঁটে ব্যথা ধরে যাক! চলে এসো। মালগুলি তুলে ফেলো, ভীম।

মিলি তাহার চেনা মাটিতে পা দিয়াছে--তাই তাহার কথায় আদেশের সামান্য একটু তেজ আছে। মানবের প্রভুত্ববোধ অলক্ষিতে যেন একটু ঘা লাগিল। একবার বলিতে ইচ্ছা হইল : তোমরা যাও, আমি আসছি পিছে। কিন্তু বিছানা পাতিয়া মিলি আসিয়া পাশে না বসিলে এই অভিনব অভিযানের অর্থ কী! কথাটা বলিলে নেহাতই একটা খেলো অভিমানের মতো শোনাইবে। অথচ এতো সহজে হারিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

প্রথম দেখাতে মানবের প্রতি ভীমের মন ভক্তি-গদগদ হইয়া উঠে নাই—ঐ লোকটিই তাহার দিদিমণিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। ফাস্টো কেলাসে আসিয়া এখন কি-না গরুর গাড়িতে চড়িবে! নিম্নস্বরে কহিল—সঙ্গে উনি কে, দিদিমণি?

মানব কহিল—দয়া করে দাদা বলে পরিচয় দিয়ো না।

মিলি গায়ের উপর আঁচলটা ঘন করিয়া টানিয়া কহিল—শীত পড়ে গেছে দেখছি এখানে। মাল উঠেছে সব? আর মায়া বাড়িয়ে কী হবে? চলো।

পরিচয় দিবার কুণ্ঠাটুকু ভীমের কেমন অদ্ভুত ঠেকিল। লণ্ঠনটা সে নিভাইয়া দিয়া কহিল—সব সুদ্ধু সাতটা উঠেছে। আর কিছু নেই তো? চলিতে চলিতে হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মিলি কহিল—আমার আংটি! আংটিটা কোথায় পড়ে গেছে।

—কিসের আংটি?

—সেই যে তুমি ষ্টিমারে পরিয়ে দিয়েছিলে। এই আঙুলটাতে।

—পড়ে গেছে?

মানবের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সেই বিবর্ণতা ধরা পড়িল তাহার কণ্ঠস্বরে।

মিলি কহিল—লণ্ঠনটা ফের জ্বালাও, ভীম। দেখি গাড়িতে কোথাও পড়েছে নাকি। তখনই ভেবেছিলাম বুড়ো আঙুল ছাড়া ও-আংটি কোথাও বসবে না। যে মোটা মোটা আঙুল। কেন যে শখ করে পরিয়ে দিতে গেলে!

লণ্ঠন লইয়া গাড়ির আনাচ-কানাচ তন্ন-তন্ন করিয়া খোঁজা হইল। ঐ দিকে আবার সোভান মিঞা হাঁক পাড়িতেছে।

—দাঁড়াতে বলো না একটু। কারুরই যেন তর সয়না। কেন যে শখ করে আংটি পরিয়ে দেওয়া! গেলো হারিয়ে।

ফিরিয়া আসিয়া ম্লান-মুখে মিলি কহিল—পাওয়া গেলো না।

—আমি তা জানতাম।

রিক্ত আঙুলটাতে ডান-হাতের আঙুল বুলাইতে—বুলাইতে মিলি কহিল—কত দাম আংটিটার?

ততোধিক ঔদাসীন্যে মানব কহিল—যৎসামান্য। টাকা ষাট হবে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মিলি কহিল—মোটে? অমন কতো ষাট টাকা তুমি জলে ফেলে দিয়েছো।

—অনেক।

দুইজনে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়া উঠিল। মিলি বসিল মানবের মুখোমুখি সিটটাতে।

কাদার রাস্তায় গাড়ির চাকা বসিয়া যাইতেছে—ঘোড়া দুইটার পিঠে চাবুক মারিবার জায়গা না-ই বা থাকিল: তবুও গাড়োয়ান রেহাই দিতেছে না। রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে বলিয়া ব্যাঙেরা চারদিক থেকে মহা সোরগোল শুরু করিয়াছে—রাস্তার পরে করবী-গাছের ঝোপে অসংখ্য জোনাকি। ঝিঁঝিঁর আওয়াজে কানে তালা লাগে। কেহ কোনোই কথা কয় না—গাড়ির খোলা দরজা দিয়া ভিজা অন্ধকারে অস্পষ্ট গাছ-পালার দিকে তাকাইয়া আছে।

কতো দূর আসিতেই একটা পাঁউরুটির দোকানে কুপি জ্বলিতে দেখা গেল।

এইবার মিলি কথা কহিতে পারিবে। মানব কতোক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারে সে অস্থির হইয়া তাহাই এতোক্ষণ পরীক্ষা করিতেছিল।

তাড়াতাড়ি সে সামনের সিট ছাড়িয়া মানবের পাশে প্রায় তাহার কোলের উপরই বসিয়া পড়িল। স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—আংটিটা হারিয়ে ফেলেছি বলে তোমার লাগছে?

তেমনি উদাসীন হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মানব কহিল না, কী বা ওটার দাম! অমনি কতো টাকা আমি জলে ফেলেছি।

মিলি বিমর্ষ হইয়া কহিল—আমাকে কি শকুন্তলার মতো আংটি দেখিয়ে পরিচয় দিতে হবে নাকি যে ওটার শোকে মুখ গোমড়া করে বসে থাকবো?

—মুখ গোমড়া করে কে বসে আছে?

—তুমি। আমার চেয়ে তোমার ঐ আংটিটাই বড়ো হলো নাকি ?

কোলের উপর মিলি মানবের বাঁ-হাতখানি টানিয়া লইল।

হাতের স্পর্শটি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মানব তাড়াতাড়ি মিলির অভিমানী হাতখানা দুই হাতের মধ্যে নিবিড় করিয়া ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

পথ আর ফুরায় না। কোথা দিয়া যে কোথায় নিয়া চলিয়াছে দিশা পাওয়া ভার। অন্ধকারে সমস্ত কিছু ঝাপসা।

একটা বাঁক নিতেই হু-হু করিয়া হাওয়া ঢেউয়ের মতো তাহাদের ডুবাইয়া ফেলিল। সামনেটা হঠাৎ যেন প্রকাণ্ড একটা আকাশ হইয়া গিয়াছে। কোথাও এতটুকু গাছ-পালার চিহ্ন নাই—একেবারে ফাঁকা।

দুইজনে চোখাচোখি হইল।

মানব কহিল—এই বুঝি নদী ?

মিলি কহিল—চর। জলের আর চিহ্ন নেই। নদী এখন বাঁয়ে বেঁকে গেছে। জোয়ারের সময় ঝির-ঝির করে জল আসে শুনেছি। পায়ের পাতা ডোবে মাত্র। দুয়েকটি নতুন ঘর উঠেছে দেখছি।

শুকনো নদীর সঙ্গে-সঙ্গে কি-একটা বিস্তৃত ব্যথার সুর মানবকে ঘিরিয়া ধরিল। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া ভাবিবার তাহার অবসর নাই। সহসা তাহার গায়ে ঠেলা মারিয়া মিলি কহিল—ঐ, ঐ আমাদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমি ও-বাড়িতে একবার মাত্র এসেছিলাম খুব ছেলেবেলায়। কি প্রকাণ্ড একেকটা কোঠা, আমরা দস্তুরমতো লুকোচুরি খেলতে পারবো। দেখতে পাচ্ছ ?

ঘননিবিষ্ট কতোগুলি গাছের ফাঁকে আবছা করিয়া বাড়ি একটা দেখা যায় বটে। কিন্তু কোথা দিয়া যে সে কোথায় চলিয়াছে মানব কিছুই আয়ত্ত করিতে পারিল না।

শেষকালে গাড়িটা বাড়িরই সিংহদরজায় আসিয়া থামিল।

অন্ধকারে মনে হয় যেন রূপকথার বিশাল রহস্যপুরী। গাড়ি হইতে নামিয়া মানব একদৃষ্টে বাড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল। রাত থাকিতে এমন সময় কোনো-দিন সে বিছানা ছাড়িয়া আকাশের নিচে দাঁড়ায় নাই, তাই যেন সে কিছুই ধারণা করিতে পারিল না। শুধু একটা অকারণ বেদনা তাহার মনকে ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

সামনের কম্পাউণ্ডে হীরালালবাবু চটি-পায়ে পায়চারি করিতেছিলেন।

মিলি আসিয়া পায়ের উপর গড় হইতেই হীরালালবাবু তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন। পিঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিলেন—রাস্তায় কোনো কষ্ট হয়নি ?

—বিকেলে আকাশে ভীষণ মেঘ করেছিল। ভাবলাম হল বুঝি কাণ্ড।

পিসিমা কোথায়? এখেনে কবে বাগান করলে, বাবা?

দেখাদেখি মানবকেও প্রণাম করিতে হইল।

হীরালালবাবু তাহার মাথায় আশীর্বাদ-হস্ত রাখিয়া কহিলেন—একেবারে ভেতরে চলে যাও। সোজা শুয়ে পড়ো গিয়ে। তোমাদের জন্যে বিছানা তৈরি। ঘর দেখিয়ে দে, ভীম। এক ফোঁটাও যে ঘুমুতে পারোনি মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। এখনো দিব্যি রাত আছে—বেশ একটু গড়িয়ে নিতে পারবে।

মিলি কহিল—আমরা এখন চা খাবো বাবা।

—বিছানায় বসে-বসেই খাবেখন। নিরু সব ঠিকঠাক করে রেখেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে আর হিম লাগিয়ো না। নিয়ে যা, ভীম। আলোটা জ্বালিয়েছিস?

—আর তুমি?

—আমি আরো একটু বেড়াবো।

ভীম পথ দেখাইয়া নিয়া চলিল।

মিলি মানবের পাশে আসিয়া কহিল—কেমন লাগছে?

মানবের প্রেতাত্মা যেন উত্তর দিল: ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না।

বারান্দা পার হইয়া ভিতরের দালানে পা দিতেই দেখা গেল পিসিমা কাঠের একটা বড়ো টেবিলের উপর ষ্টোভ ধরাইয়াছেন। পিছনে পায়ের শব্দ শুনিতেই খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। মিলি প্রণাম করিয়া কহিল—তুমি এতো সকালেই উঠেছ? বাবাকে লুকিয়ে দু-পেয়ালা চা চট করে দিতে পারবে আমাদের?

মানব যন্ত্রচালিতের মতো প্রণাম করিয়া উঠিল।

পিসিমা হাসিয়া কহিলেন—ভীম এখন গিয়ে গরু বের করবে। টাটকা দুধে তবে চা হবে। তোমরা ততোক্ষণ গড়িয়ে নাও একটু। এই হল বলে।

—একটু 'র' পেলেই বা মন্দ হতো কী। কী বলো?

মানব কিছুই বলিতে পারিল না। শূন্যদৃষ্টিতে কোন দিকে যেন চাহিয়া আছে।

মানবের কাছ থেকে সাড়া না পাইয়া মিলি কহিল—গোরা ঘুমিয়ে আছে বুঝি? ওর জন্যে এয়ার-গান এনেছি একটা। খবরটা ওকে দিয়ে আসি।

স্টোভের উপর কেটলি চাপাইয়া পিসিমা কহিলেন—খবর পেলে তোকে আর ও শুতে দেবে না। কেরোসিন কাঠের বাক্সে প্রকাণ্ড এক মিউজিয়াম বানিয়েছে, তাই নিয়ে এখুনি হুলুস্থুল বাধাবে! আরেকটু সবুর কর। ভোর হোক।

মিলি একটা চেয়ারে বসিয়া জুতার স্ট্রাপ খুলিতে-খুলিতে কহিল—আমার কোন ঘর? কোণেরটা? ওঁর?

প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মানব ঘরের দেয়াল পর্যবেক্ষণ করিতেছে।

—ভীম দেখিয়ে দেবেখন। কোথায় গেল ও? তুমি এসো আমার সঙ্গে। এই দিকে।

মানবকে বলিয়া দিতে হইবে না।

১৫

বাহির হইতে দরজা ভেজাইয়া পিসিমা অদৃশ্য হইলেন।

প্রকাণ্ড ঘর—মধ্যখানে স্প্রিঙের খাট পাতা। ঝলক-দেওয়া দুধের মতো ধবধবে বিছানা—শিয়রে ছোট একটা টিপয়ের উপর বাতির একটা স্ট্যাণ্ড। বাতিটা সদ্যোজাত শিশুর চোখের মতো মিটমিট করিতেছে। নূতন চুনকামে দেয়ালগুলি অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন হাত ঠেকাইলেই যেন শিহরিয়া উঠিবে।

ঘরের মধ্যে আসিয়া সে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া পড়িল। আর এক পা-ও চলিবার তাহার ক্ষমতা নাই। সে শুইবে, না বাতিটা জোর করিয়া নিভাইয়া দিবে, না, দরজা ঠেলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবে—কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। হঠাৎ নজরে পড়িল ও-পাশের জানালা একটা খোলা—অন্ধকার ফিকে হইয়া আসিতেছে। বাহিরের আলো সে সহ্য করিতে পারিবে না—খেয়াল হইল জানালাটা বন্ধ করিতে হইবে।

কিন্তু জানালা বন্ধ করিতে আগাইতে তাহার সাহস হয় না। ভয় করে। স্পষ্ট মনে হয় কে যেন জানালার বাহিরে তাহার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। স্পষ্ট। তাড়াতাড়ি সে দেয়ালের কাছে সরিয়া আসিল। দেয়ালটা ঠাণ্ডা। কাহার চোখের জল দিয়া তৈরী। উঃ, কী হাওয়া। হ্যাঁ, সত্যিই তো, কে যেন কাঁদিতেছে।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মানব বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। বালিশে মুখ ডুবাইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া তাহার চোখের দৃষ্টি অন্ধ করিয়া ফেলিল। মনে হইল মৃত্যুবিবর্ণ চোখে শিয়রের বাতিটা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে। হাত তুলিয়া বাতিটা নিভাইতে যাইতেই ধাক্কা লাগিয়া মেঝেতে পড়িয়া সেটা চুরমার হইয়া গেল।

ঘরের ভিতর কে যেন ঢুকিয়াছে।

বালিশে মুখ ডুবাইয়াই রুদ্ধ ভীতস্বরে মানব প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল : কে ?

—আমি পিসিমা। বাতিটা পড়ে ভেঙে গেল বুঝি ?

মানব আশ্বস্ত হইল।

—তা যাক। তুমি ঘুমোও। আমি ঝাঁটা এনে কাঁচগুলি জড়ো করে রাখছি। না, না, তোমার উঠতে হবে না।

পিসিমা চলিয়া গেলে মানবের আবার ভয় করিতে লাগিল। বালিশ হইতে কিছুতেই সে মুখ তুলিতে পারিল না।

একমনে মায়ের মুখ স্মরণ করিতে-করিতে আস্তে-আস্তে শরীরের কঠিনতা শিথিল হইয়া আসিল। পিসিমাকে আগেই বলিয়াছিল—জানালাটা বন্ধ করে দিন। হাওয়া তো নয়, তুফান। বাহিরে কোথায় ভোর হইতেছে জানিয়া কাজ নাই। মানব যেন নিমেষে পূর্বজন্মলোকের অন্ধকারে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মিলি একটুখানি শুইতে-না-শুইতেই উঠিয়া পড়িয়াছে।

—পিসিমা, চা ?

একমাথা রুক্ষ চুল ও এক-গা এলো শাড়ি লইয়া মিলি দালানে ছুটিয়া আসিল।

পিসিমা কহিলেন—এই তোর ঘুম হল ?

—চা না খেলে কি ঘুম হয় ? দাও শিগগির। এটা শুধু ফাউ হচ্ছে। চান করে এসে রিয়েল চা খাবো।

পিসিমা কাপ-এ চা ঢালিতে লাগিলেন : মানব এখনো ওঠেনি বুঝি ?

—ওঠাই গিয়ে।

—না, না, ঘুমুচ্ছে।

চায়ে চুমুক দিয়াই কাপটা নামাইয়া রাখিয়া মিলি কহিল—যাই, গোরাকে তুলে আনি।

গোরা নিজেই আসিয়া হাজির। লজ্জায় ও খুশিতে লাল হইয়া মিলির ডান-হাতটা ধরিয়া কহিল—আমাকে এতোক্ষণ জাগাওনি কেন ? ভীমের সঙ্গে স্টেশনে যাবো বললাম, মা কিছুতেই যেতে দিল না।

হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়া মিলি কহিল—তোর জন্যে একটা জিনিস এনেছি, গোরা। কী বল দিকি ?

গোরা হাসিয়া বলিল—লজেন্স-এর শিশি নয় তো ? তোমার যেমন বুদ্ধি, এক পাতা জলছবি, নয় তো একটা হাফ-প্যান্ট সেলাই করে এনেছ।

—না রে, দুষ্টু। একটা বন্দুক।

—বন্দুক ? গোরার চোখ দুইটা বড়ো হইয়া উঠিল : সত্যি কি আর ! খেলনা, না ?

—সত্যিকারের বন্দুক দিয়ে তুই কী করবি ?

—বা, আমাদের পুকুর-পাড়ে দস্তুরমতো সেদিন নেকড়ে-বাঘ এসেছিল। শেয়ালগুলো তো উঠোনের ওপর এসেই হল্লা করে। তারপর পাখি ! পাখির মাংস কোনোদিন খেলাম না, মেজদি। যাই হোক, বার করো শিগগির। শক্ত হবে তো ?

গোরা মিলির আঁচল ধরিয়া টানাটানি শুরু করিল।

তাহার মা ধমক দিয়া উঠিলেন : আগে মুখ ধুয়ে আয় বলছি। একবাটি গরম দুধ খেয়ে তবে কথা। রোজ সকালবেলা দুধের বাটি নিয়ে আমাকে জ্বালায়।

—আসছি মুখ ধুয়ে। মোটে তো এক বাটি দুধ। সত্যিকারের বন্দুক পেলে কড়া-সুদ্ধ্ খেয়ে ফেলতে পারি।

রোদ উঠিয়াছে। হীরালালবাবু বাগান তদারক করিতে বাহির হইয়াছেন। বাগানের মালীকে ডাকিয়া কহিলেন—জেলে ডেকে আনো জলদি। কিছু মাছ ধরাতে হবে। মৃগেলের বাচ্চা নিশ্চয়ই এখন বড়ো হয়েছে। পেঁপে কিছু পাকলো কিনা দেখি গে।

গোরার মিউজিয়ম দেখা সারা হইল। যত রাজ্যের ঝিনুক, কড়ি, শামুক, লাট্টু, ভাঙা কাঁচ, পাঁচ-ফলা ছুরি, শ্মশান থেকে কুড়াইয়া আনা হাড়ের টুকরো। সমস্ত কিছুর সঙ্গেই গোরা একটা করিয়া গল্পের লেজুড় জুড়িয়াছে—তাহাতে যেমন কল্পনার বিভীষিকা আছে, তেমনি আছে মজা।

—এই যে ঘোড়ার খুর দেখছ মেজদি, এটা হচ্ছে চৈতকের। প্রতাপাদিত্য যে একসময় ঐ বালির রাস্তা ধরে বেড়াতে এসেছিলেন। আর এই যে পেতলের আংটিটা দেখছ ওটা সতীর বাঁ-পায়ের কড়ে আঙুলে ছিল। বিষ্ণু যখন তাঁর চক্র দিয়ে সতীকে কেটে ফেললেন, আংটিটা পড়লো এসে আমাদের কলাবাগানের ঝোপে। ওখানে একটা মন্দির করা উচিত—

এমনি সব গল্প।

কে-এক পাড়ার সাথী গোরাকে ডাকিতে আসিয়াছে। পেয়ারা গাছের ডাল কাটিয়া ডাং বানাইতে হইবে। এয়ার গান্‌টা লইয়া লাফাইতে-লাফাইতে গোরা বাহির হইয়া গেল।

এ কেমন ধারা ঘুম ! অবারিত মাঠের উপর এমন সূর্যোদয় সে কবে দেখিয়াছে ?

রাতের আকাশের তারার মতো কতো পাখির কতো রকম স্বর! মোটর-বাইকের ঝকঝকানি শুনিতে-শুনিতেই তো কান দুইটা ঝালাপালা হইয়া গেল। বিশ্রামেও একটা শ্রী থাকা উচিত!

ঘাটলার কাছে হিঞ্চে শাকের ভিড় জমিয়াছে। নিচের ধাপে বসিয়া দুই পায়ে মিলি তাহা সরাইয়া দিতে লাগিল। অনেক দিন সে সাঁতার কাটে নাই। সে যে ডুব-সাঁতারে পুকুরটা পার হইয়া যাইতে পারে আর সবাইর চক্ষু এড়াইয়া মানব তাহা দেখিয়া গেলে পারিত। কিন্তু জলে বেশিক্ষণ থাকিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

দরজা এখনো খোলে নাই। চুল না আঁচড়াইয়াই মেঝের উপর ভিজা পায়ের দাগ ফেলিতে-ফেলিতে মিলি নিঃশব্দে দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ক্লান্ত একটা পশুর মতো মানব তখনো ঘুমাইতেছে। ঘরে এতোক্ষণ রোদ আসে নাই বলিয়াই মিলি জানালা দুইটি খুলিয়া মানবের দিকে তাকাইল। তবু সে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল না।

মিলি নিঃশব্দে তাহার শিয়রে আসিয়া বসিল। বালিশের উপর রোদের ও-দিকে মুখ তাহার কাৎ হইয়া আছে—মিলি নিচু হইল—গাঢ় নিশ্বাসের শব্দে সে মাঝপথে হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। ঘুমে মানুষের মুখ এমন করুণ ও অসহায় দেখায় নাকি? মানব বোধহয় এখন কোনো দুঃখের স্বপ্ন দেখিতেছে। একান্ত মমতায় মিলি তাহার কপালে হাত রাখিল।

স্পর্শে যাদু আছে। মানব চোখ মেলিয়াছে।

মোমের মতো পরিষ্কার বিছানা—সাবানের মতো নরম। জানালার উপরে ঐ বুঝি সেই সিঁদুরে আমগাছটা দেখা যায়—ঝড়ের সন্ধ্যায় যাহার তলায় সে মায়ের সঙ্গে আম কুড়াইয়াছে। সেই বুড়া নারিকেল গাছটা বয়সের ভারে বাঁকা হইয়া এখনো বাঁচিয়া আছে। শিয়রে কে বসিয়া? মা নয় তো?

না, মিলি। মা হয়তো কোনো সকালবেলা তাহাকে জাগাইতে আসিয়া এমনি শিয়রে বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইয়া থাকিতেন। স্পষ্ট তাহার মনে পড়ে না বটে, কিন্তু এমন ঘটনা ঘটে নাই-ই বা কে বলিল? মানব ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল: অনেক বেলা হয়ে গেছে যে।

মিলি হাসিয়া কহিল—না, তোমার জন্যে বসে আছে।

—তুমিও এতোক্ষণ ঘুমুচ্ছিলে নাকি? আমাকে জাগাতে পারোনি?

—জাগাবো কি? তোমার স্বাস্থ্যের যে ব্যাঘাত হবে। আমি বরং সাত-সকালে পুকুরে নেমে স্বাস্থ্যক্ষয় করলাম।

মানব বিছানা হইতে এক লাফে নামিয়া পড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। সেই! অবিকল! অতীতের স্মৃতির অন্ধকারে আর তাহাকে হাতড়াইয়া ফিরিতে হইবে না। ভিতরের বারান্দায় কড়িকাঠের ফাঁকে-ফাঁকে খড়কুটা গুঁজিয়া সার বাঁধিয়া সেই চড়ুই-পাখিদের বাসা। অগণিত সন্ততির ভিড়। সব সেই—খালি পেন্সিলের রেখার উপর রঙ বুলানো হইয়াছে। রান্নাঘরের সেই বাঁধানো দাওয়া-ঐখানটায় মেঝে খুঁড়িয়া সে মার্বেল-খেলার গাব্‌ব্‌ করিয়াছিল—সেটা এখনো অটুট আছে। ঐ থামটায় ঠেস দিয়া না বসিলে খাওয়া হইত না—এই ডালিম-গাছটার তলায় সে একবার পড়িয়া গিয়া বিছানায় সাত দিন শুইয়া ছিল। তাহারই মতো কে-একটি ছেলে—এই বোধকরি গোরা—পেয়ারা গাছটায় দোল খাইতেছে। সেই ভেলু কুকুরটা এখন নিশ্চয় আর বাঁচিয়া নাই।

এই বাড়ি হইতেই একদিন সে মায়ের হাত ধরিয়া বাবার সঙ্গে শূন্য হাতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সেই রাস্তা—শাদা মাটির রাস্তা—কতোদূরে গিয়া নদীর চরের সঙ্গে সমতল হইয়া গিয়াছে।

হীরালাল—হ্যাঁ, তাহার দাড়ি ছিল—নামটা মনে পড়ে বটে। নোয়াখালি, বাঙলার মানচিত্রে নয়, মনেরই কোথায় যেন নামটা লুকাইয়া ছিল। অথচ দুয়ে মিলিয়া যে এমন চেহারা নিয়া দাঁড়াইবে কে জানিত। মিলি ডাকিয়া বলিল—তুমি এখুনি বেরুচ্ছ কি রকম? চা খাবে না?

ম্লান হাসিয়া মানব কহিল—একটু মর্নিং-ওয়াক করে আসি।

—না, না, রোদে আর মর্নিং-ওয়াক নয়। কোঁচড় ভরিয়া একগাদা ফুল লইয়া হীরালালবাবু পথের মাঝখানে বাধা দিলেন: স্নান করে নাও আগে। এসো। সামনের এক ভদ্রলোককে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—বেটারা মাছ কিছুই পেল না হে বিপিন। দু-চারটে শোল আর পুঁটি। বাজারটা একবার ঘুরে এসো।

হীরালালবাবুকে দেখিতে প্রায় ঋষির মতো। দাড়িগুলি পাকিয়া বুকের উপর ঝুলিয়া আছে। কণ্ঠস্বরটি অকারণে কোমল! দেখিয়া ভক্তি হইবারই কথা। কিন্তু মানবের মন গোঁ ধরিয়া বাঁকিয়া বসিল। তাঁহার সঙ্গে একটা সঙ্ঘর্ষ তাহাকে বাধাইয়া তুলিতেই হইবে।

তাই বাড়ির মুখে পা না বাড়াইয়াই সে কহিল—নতুন শহরটা একবার ঘুরে আসি।

—এ আবার শহর! নদীতে কিছু আর এর রেখেছে? সেই দীঘিই বা কই, সেই সুব-ঝাউগাছের সারই বা কোথায়? এসো, এসো, শহর হবেখন।

মানব তবু অবাধ্যতা করিতে চায়।

কিন্তু দুয়ারের পাশে দাঁড়ানো মিলির দুইটি চক্ষু তাহাকে বাধা দেয়। কী ভাবিয়া মন তাহার খুশি হইয়া উঠে।

চা খাইতে-খাইতে মানব মিলিকে বলিল—ভারি সুন্দর বাড়ি। আমার এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না।

হীরালালবাবু কহিলেন—থাকো না যদ্দিন খুশি। কিন্তু এ-বাড়ির কী চেহারা যে ছিলো আগে! বহু পুরনো আমলের বাড়ি—আমিই কিনে নিয়ে এর ভোল ফিরিয়েছি।

মানবের গা আবার জ্বলিতে থাকে। সে গম্ভীর হইয়া কহিল—পুরনো আমলের বাড়িকে পুরনো করেই রাখা উচিত। সংস্কার করে তার মর্যাদাহানি করা পাপ।

কথায় একটা রূঢ়তা আছে। কিন্তু বৃদ্ধ প্রসন্ন হাসিতে ললাট ও চোখ উদ্ভাসিত করিয়া বলিলেন—তা হলে এ-বাড়িতে বাস করতাম কি করে?

—বাস করবেন কেন? বাস করতে কে বলেছে?

মিলি কহিল—সামান্য একটু বিরক্ত হইয়াই কহিল—পয়সা দিয়ে কিনে তা হলে শুধু-শুধু বাড়িটাকে খাড়া করে রাখা হবে?

—না, না তা বলছি না। মানব চায়ের কাপে মুখ ডুবাইল।

হীরালালবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

আবার কথা উঠিল—কলকাতার জীবনযাত্রা নিয়া। তাহার কল-কারখানা, কুশ্রিতা-কোলাহল—সব কিছুর উপর হীরালালবাবুর আমানুষিক বিরক্তি। মানব জোর গলায় কহিল—শহরে দিবারাত্র যে উদ্দাম শক্তির ঝড় বইছে তা আপনাদের বুড়ো হাড়ে সইবে কেন? যারা অকর্মণ্য হচ্ছে, তারাই চায় শান্তি।

উত্তর দিল মিলি—সুরে কোথায় একটি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ আছে: এই না ষ্টিমারে আসতে-আসতে তুমি এরোপ্লেন ছেড়ে গরুর গাড়ির ভক্ত হয়ে উঠেছিলে। স্টেশনে নেমে বাবা, উনি এক গরুর গাড়ি ঠিক করে বসলেন। নামানো মুশকিল।

হীরালালবাবু আবার হাসিয়া উঠিলেন।

মানব এই বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের সুযোগ কামনা করে—মিলির সঙ্গে সে তর্ক করিতে বসে নাই। হীরালালবাবুর মনে কোথাও এতটুকু জ্বালা নাই, স্বভাবে নাই বিন্দুমাত্র অস্থিরতা। সব-কিছুর প্রতি তাঁহার নিরুদ্বেগ প্রশান্ত দৃষ্টি।

না হইলে—তাঁহার মেয়ের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ট হইয়া এত দীর্ঘ পথ সে সকালে চলিয়া আসিল, তিনি এতোটুকু আপত্তি তুলিলেন না। চাকরকে

য়া বিছানা পাতাইয়া রাখিলেন। ঘরে আসিয়া পা দিতে-না-দিতেই অভ্যর্থনার টা শুরু হইয়া গেল। তাঁহার মেয়ের এই অন্তরঙ্গতার প্রতি তিনি এতোটুকু ভ্রুকুটি করিলেন না।

হীরালালবাবু কহিলেন—বেশ তো, গরুর গাড়ি চড়ে একদিন সোনাপুর বেড়িয়ে এসো। তুইও যাবি নাকি মিলি?

মৃদু হাসিয়া মিলি কহিল—তার চেয়ে গোরার কাঠের বাক্সের গাড়ি চড়ে গলেই হয়!

হীরালালবাবুর হাসির বিরাম নাই।

ঘাটের পথটুকু চলিতে-চলিতে মানব কহিল—বিয়ের পর আমরা এ বাড়িতে এসে কয়েকদিন থাকবো। কি বলো?

সর্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া মিলি গভীর সুখস্বাদ অনুভব করিল। কহিল—কেন ভাবিস?

—এখানে থেকে-থেকে যখন শ্রান্ত হয়ে উঠবো তখন। তোমার সঙ্গে-সঙ্গে আমি এ-বাড়িটারও প্রেমে পড়ে গেছি।

মিলি কহিল—চমৎকার বাড়ি।

—সত্যি, চমৎকার। তোমার বাবার কাছে কথাটা আজ রাত্রেই আমি পাড়ি।

দুষ্টু হাসিয়া মিলি বলিল—এখানে থাকবার কথা তো?

—কায়েমি হয়ে থাকবার কথা। কিন্তু এমন হেঁয়ালি করে নয়। সোজা স্পষ্ট কথায়।

—না, না, সে ভারি বিশ্রী হবে। মিলি কহিল—তুমি অমন ব্যস্ত হয়ে কিছু তাঁকে বলতে যেয়ো না। তাঁকে বুঝতে দাও। তিনি নিজের থেকেই বলবেন একদিন।

মানব আপত্তি করিল: নিজের থেকে বলবার মতো অসহিষ্ণু তিনি হইবেন না কোনোদিন।

মিলি গম্ভীর হইয়া কহিল—আমরাও না-হয় একটু সহিষ্ণু হলাম। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদটা একটু দীর্ঘ হলে ক্ষতি কি। বাবাকে আরো খানিকটা বুঝতে দিয়ে মত চাইলেই ব্যাপারটায় আর বিস্ময় থাকবে না। এ-বাড়িতে থাকতে চাও, যদ্দিন মন চায়।

বিকেলে মানব বলিল—চলো, গায়ের পথে বেড়িয়ে আসি একটু।

মিলি কহিল—তুমি যাও একা। রাত্রে আমি রান্না করবো ভাবছি।

হীরালালবাবু কহিলেন—আয় না একটু বেড়িয়ে। অন্ধকার হবার আগে ফিরে এলেই চলবে।

— তা আমি যেতে পারি, দাঁড়াও জুতো পরে আসি।

আসিয়া দেখিল, বাবার কথা উপেক্ষা করিয়াই মানব চলিয়া গিয়াছে।

মানব যখন ফিরিল তখন রাত অনেক। শ্মশান হইতে মড়া পুড়াইয়া আসিবার মতো চেহারা। ঘর-দোর সব বন্ধ, কোথাও একটা আলো জলিতেছে না। বাড়িটা যেন একটা বিরাটকায় দৈত্যের মৃতদেহ। চাহিয়া থাকিতে ভয় করে।

মানব অন্দরের উঠান পার হইয়া বারান্দায় উঠিয়া দরজায় করাঘাত করিয়া ডাকিল: মিলি।

মিলি দরজা খুলিয়া দিল। বিছানায় উপুড় হইয়া গায়ে একটা চাদর টানিয়া দিয়া মোমের আলোতে এতোক্ষণ সে বই পড়িতেছিল। ঘরের কোণে একটা লণ্ঠনও নিবু-নিবু করিতেছে।

মিলির কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি: এ কি তুমি কলকাতার রাত পেয়েছ?

—মোটে ন'টা। এরি মধ্যে রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া সব চুকে গেছে?

—চুকে গেছে মানে? সবাইর এখন একঘুমের পর পাশ ফেরবার সময়। চলে এসো রান্নাঘরে। তোমার জন্যে এখনো আমার খাওয়া হয়নি।

হাত-পা ধুইয়া পিঁড়েতে বসিয়া মানব কহিল—তুমিও আমারই সঙ্গে একই থালায় বসে যাও না।

মিলি মুখোমুখি বসিয়া বলিল—ও আমার অভ্যেস নেই। এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?

—কোথায় আবার থাকবো। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। খুব ভালো লাগছিল।

—চেহারাখানা তো 'গাবুরের' মতো হয়েছে।

—চেহারা দেখে কী আর বোঝা যায় বলো। এই বাড়ির চেহারা দেখেই কি বোঝা যায় এর পেছনে কান্নার কী করুণ ইতিহাস আছে?

দুই গরাস মুখে তুলিয়াই থালাটা ঠেলিয়া দিয়া মানব কহিল—আমার খিদে নেই, মিলি।

—খিদে নেই মানে?

—শরীরটা ভালো লাগছে না।

—কলকাতায় তো তোমার এই ফ্যাশান ছিলো না।

—সত্যি বলছি, উলটে আসছে।

মুখ নামাইয়া করুণ স্বরে মিলি কহিল—আমি রান্না করেছি কিনা, তাই।

—তুমি রান্না করেছ নাকি? ম্লান হাসিয়া মানব ভাতের থালাটা ফের টানিয়া আনিল।

—কী করবে গরিবের বাড়িতে অভ্যর্থনার ত্রুটি কিছু ঘটবেই।

—বিনয়ে তুমি মহাজন।

মানব খাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

কোথায় যেন তাল কাটিয়া গিয়াছে। আলাপ আর জমিতে চায় না।

ভাতগুলি থালার চারিদিকে ছিটাইয়া ফেলিতে-ফেলিতে মিলিও উঠিয়া পড়িল।

তোলা-জলে আঁচানো সাঙ্গ করিয়া মানব কহিল—অন্ধকারে মাঠে একটু বেড়াবে, মিলি?

—আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আর দাঁড়াতে পারছি না। বলিয়াই সে দ্রুত পায়ে ঘরে গিয়া বিছানায় ডুব মারিল। যেমন খাওয়া, তেমনি ঘুম।

মানব বারান্দায় পায়চারি করিতেছে। ঘরে আসিয়া যে একটু গল্প করিবে তাহাও তাহাকে আজ মনে করাইয়া দিতে হইবে নাকি? মোম জ্বালাইয়া আবার সে পড়িতে চেষ্টা করিল। সারি-সারি অক্ষরে সে কান পাতিয়া খালি মানবের পদশব্দ শোনে।

বিছানা ছাড়িয়া শেষে তাহাকে হার মানিতে হইল, বাহিরে আসিয়া মানবকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—ঘুমুতে যাবে না? কিন্তু ভালো করিয়া তাহার চোখের দিকে চাহিতেই মিলি অবাক হইয়া গেল।

শুকনো, রুক্ষ চুল। মুখাভাসে কঠিন পাণ্ডুরতা। চেহারা দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত পীড়িত ও পরিশ্রান্ত বলিয়া মনে হয়।

মানব তাহার কাছে একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল—তোমাদের এ-বাড়িতে ভূত, আছে, মিলি?

—ভূত! মিলি হাসিবে না ভয় পাইবে কিছু বুঝিতে পারিল না।

মানব বিমর্ষমুখে কহিল—আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই এসো।

—কেন, এই না তুমি এ-বাড়ির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলে।

—না, না, এই বিশ্রী জায়গায় একা-একা কতো দিন থাকা যায় বলো।

—একা-একা নাকি?

—প্রায়। আমার ঘরটা তো ও-দিকে, না?

—তুমি এখুনিই শুতে যাবে নাকি?

—তোমার তো ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছো কি করে?

—না, এবার শোব।

মিলি দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

আবার সেই ঘরে মানবকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে। চারপাশের দেয়ালের চাপে দম বন্ধ হইয়া আসে। দুই চক্ষু মেলিয়া ধরিয়া সে অন্ধকার দেখে।

শেষ রাত্রে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া হীরালালবাবু সেতার বাজান। মানবের ঘুমের মধ্যে স্বরটা মিশিয়া যায়। ঘুমের মধ্যেই মনে হয় তাহার মা যেন এই বাড়ির কক্ষে-কক্ষে কাঁদিয়া ফিরিতেছেন।

১৬

মানব পাঁচ দিনের বেশি টিকিতে পারিল না। এই পাঁচ দিনে সে শুকাইয়া গিয়াছে কাল রাত থেকে জ্বর-ভাব। ইহার আগে কোনোদিন তাহার শরীর খারাপ হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। মিলিকে সে কহিল—এদিকে-ওদিকে আমার জামা-কাপড় জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে আছে। একটু গুছিয়ে দাও দয়া করে।

—কেন?

—আজকেই আমি এখান থেকে পালাবো। আমার ভালো লাগছে না।

—কী ভালো লাগছে না? মিলি কুণ্ঠিতস্বরে কহিল—আমাকে?

—তোমাকে খুব বেশি ভালো লাগছে বলেই তো পালাচ্ছি। শরীরটাই এখানে ভালো থাকলো না।

—তুমি এ-কদিন যে অনিয়ম করেছ।

মানব হাসিয়া কহিল—বেশি-রকম নিয়মে থেকে। কলকাতায় গিয়ে দুদিন মোটর-বাইক হাঁকালেই সেরে যাবে।

মিলি মানবের কাছে একটু সরিয়া আসিয়া কহিল—কলকাতায় গিয়ে ভালোই থাকবে তা হলে।

—আশা করি। হ্যাঁ—আমার স্মেলিং-সল্টের শিশিটা খুঁজে পাচ্ছি না। গোরা সেদিন ওটা চাইছিল। হয়তো ওটা ওর মিউজিয়মে জমা হয়েছে।

—দেখি।

মিলি অনেকক্ষণ আর দেখা দিল না।

কথাটা হীরালালবাবুর কানে উঠিল। তিনি কহিলেন—জোর করে তোমাকে

এখানে বেঁধে রাখি কী করে? তোমার এখানে যে নিত্য-নতুন অসুবিধা হচ্ছে তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।

মানব মুখের উপরেই কহিল—সে-কথা সত্যি। তবে অসুবিধেটা যে নিতান্তই শারীরিক আমার কপালে হাত দিয়ে বুঝতে পারবেন।

হীরালালবাবু তাহার কপালে হাত রাখিয়া বলিলেন—এ কী! তোমার দেখছি দিব্যি জ্বর হয়েছে। তুমি যাবে কি রকম?

কি একটা কাজে মিলি এই দিকে আসিয়াছিল; হঠাৎ মানবের চোখে পড়িয়া যাইতে সে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, হীরালালবাবু তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন - মানবের জিনিসপত্র আর গুছিয়ে দিতে হবে না। একেবারে ওকে বিছানায় চালান করে দে। দিব্যি জ্বর হয়েছে দেখছি।

মানব হাসিয়া কহিল - সেই জন্যেই তো বিছানাপত্র নিয়ে পাড়ি দিচ্ছি রোগে ভুগে অসুবিধের চূড়ান্ত হোক আর-কি।

মিলি চলিয়া যাইতে-যাইতে রুক্ষস্বরে কহিল—অসুখ করলে এখানে ওঁর যোগ্য চিকিৎসা হবে নাকি। ওঁকে দেখবার মতো এখানে ডাক্তার আছে?

মানব কহিল—চিকিৎসা করবার ডাক্তার আছে কিনা জানি না, কিন্তু সেবা করবার একটিও নার্স এখানে পাওয়া যাবে না। সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

হীরালালবাবুও আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। বড়োলোকের বংশধরকে লইয়া পরে বিপদে পড়িতে হয় মিলির কথায় সেই আভাস পাইয়া তিনি থামিয়া গেলেন।

মানব অনেকক্ষণ ধরিয়া মিলিকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে, নিভৃতে সে একটি-বারও ধরা দিতেছে না। কাপড় কুঁচাইয়া আলনাতে সাজাইয়া রাখিয়া এখন সে পিসিমার সঙ্গে তরকারি কুটিতে বসিল। এখানেই গল্পের আসর জমাইতে মানব আসিয়া জলচৌকির উপর বসিতেই মিলি উঠিয়া পড়িল: যাই, চুলটা বেঁধে আসি গে।

মনে-মনে মানব খুশি হইল। সে কলিকাতা যাইবে—এই বেগের মুখেই তাহার মন হাওয়ার মুখে তুলার মতো উড়িয়া চলিয়াছে। ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো এই বাড়িটা যে এতদিন তাহার বুকে চাপিয়া বসিয়াছিল, মুহূর্তে তাহা তাশের বাসার মতো ঝরিয়া পড়িল। ইহার জন্য তাহার মায়া নাই—পচা জায়গায় নদীর শ্মশান বুকে লইয়া চিরকাল জাগিয়া থাকুক! এইখানে কোনোদিনই সে আর মরিতে আসিবে না। কতো বাসা ছাড়িয়া কতো নূতন নীড়ের সন্ধানে তাহার বেগ-চপল ডানা প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে - মাটি কামড়াইয়া গাছের শিকড়ের মতো পড়িয়া থাকিতে তো সে আসে নাই।

মানব উঠিয়া পড়িয়া কহিল—আমাকেও তা হলে উঠতে হল, পিসিমা।

মৃদু হাসিয়া পিসিমা বলিলেন—জানি।

পরের দিকের কোণের ঘরটার জানলার কাছে মেঝের উপর মিলি বসিয়া আছে। হাতে একটি চিরুনি আছে বটে, কিন্তু চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো। সন্ধ্যার আকাশ তাহার আয়না।

মানব কাছে আসিয়া বসিল—এতো কাছে বসিয়াও স্পর্শ না করাটি মানবের ভারি ভালো লাগে।

মানব কহিল—আমি চলে যাচ্ছি বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে?

মিলি হাসিয়া উঠিল: ভীষণ। বুকটা ফেটে যাচ্ছে একেবারে।

—তা যাচ্ছে না জানি। কিন্তু আমাকে থাকতেও তো একটিবার বলছ না।

—যে-অনুরোধ তুমি রাখবে না আমি তা করতে যাবো কেন?

—কি করে তুমি জানো যে তোমার অনুরোধ আমি রাখতাম না?

—সে আমি জানি। আমাকে আর তা বলে দিতে হয় না।

—তুমি আমার সঙ্গে চলো না।

—বয়ে গেছে। আমি দেওঘরে ছোটকাকার বাড়িতে যাবো ভাবছি! এখানে একা-একা আমারও মন টিঁকবে কি করে? বাকি ছুটিটা সেখানেই কাটাবো কোনোরকমে।

—কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যাবো বলে আমার মন ভালো লাগছে না। ঠোঁট উল্টাইয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মিলি কহিল—ছাই!

মিলির চুলে হাত রাখিয়া মানব কহিল—সোনা। তোমার জন্যে আমার আরো বড়ো দুঃখ সহ্য করতে সাধ হয় মিলি। তোমার বাবাকে কথাটা আজ বলেই ফেলি যা হোক করে। আপত্তি যদি তোলেন, তবে অন্ধকারে গা ঢেকে দুজনেই না-হয় বেরিয়ে পড়বো।

—বাবা বাধা দেবেন না—বাধা দেবার কিছু নেই।

—তাই যদি হয় মিলি—মানব কী করিবে কিছু বুঝিতে পারিল না।

—তাই যদি হয়—মিলি তাহার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া কহিল—তুমি আরো দুটো দিন এখানে থাকো। ছোট খোকার মতো আমার কোলের কাছে চুপচাপ শুয়ে থাকো, আমি তোমাকে দু-দিনে ভালো করে দেবো। মিনতির সুরে মানব কহিল—কিন্তু কলকাতার ডাক আমাকে অস্থির করে তুলেছে।

মিলি আবার চুপ করিয়া গেল।

মানব তাহার পায়ের পাতাটি মুঠির মধ্যে তুলিয়া লইয়া কহিল—এই স্যাঁতসেঁতে

জায়গাটা আমাকে আর পোষাচ্ছে না। পুকুরে স্নান করে শেষকালে ম্যালেরিয়া ধরুক, তুমি এই চাও?

মিলি বলিল—আর আমাদের কিনা গণ্ডারের চামড়া! মশা কিছুতেই হুল ফোটাতে পারে না!

—কে তোমাকে থাকতে বলছে? চলো না আমার সঙ্গে। এই নির্জনতায় তুমি যে হাঁপিয়ে উঠবে।

—এই না তুমি বলতে আমরা এখানে এসে বসবাস করবো।

—কোন দুঃখে?

—তবে কোথায়?

—ইউরোপে। কাজ করতে হবে তো!

- কী কাজ?

– সে পরে ভেবে নেব। ভীমকে একবার বলে রাখো না গাড়িওলাকে বলে আসবে।

—তুমি যেন এখুনি বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচো।

—যাবার একবার নাম করলে আমি আর বসে থাকতে পারি না।

—তুমি আমার কাছে একটা ধাঁধা। কখন কী যে তুমি চাও, কী যে তুমি চাও না, বোঝা দায়।

—তবে এটা ঠিক মিলি, এই গ্রাম্য নির্জনতা আমি চাই না। এ তো শান্তি নয়, স্থবিরতা। এখনো এতো শ্রান্ত হইনি যে পাখা গুটিয়ে বসে থাকবো।

মিলি ঠোঁটের প্রান্তটা একটু কুঁচকাইল। কহিল—ছাড়ো, উঠি, বাবার জন্যে রাতের খাবার তৈরি করতে হবে। আমাকে হয়তো খুঁজছেন।

—হ্যাঁ, আমিও ভীমচন্দ্রের শরণাপন্ন হই।

মানবের এই বেগের ক্ষুধাই মিলিকে সম্প্রতি সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা, সেই প্রখরভাষিণী বিলাসিনী নর্তকী—মানব যাহাকে লইয়া মুগ্ধ দিন-রাত্রি ভরিয়া আপনাকে বিকীর্ণ করিতে চায়, মিলিকেও সে হয়তো এই একটি বিশেষ বেশেই সাজাইতে চলিয়াছে। কিন্তু তাহার জীবনে যে এই দূরবিস্তৃত মাঠের একটি গভীর প্রশান্তি আছে তাহা হয়তো তাহার চোখে পড়ে নাই।

তাই মানবকে মিলির মনে হয় অস্থিরচিত্ত, দুর্বার:

আর মিলিকে মানবের মনে হয় লঘু, ভীরু ও সংশয়ী।

কেনই বা আসা, দুই রাত্রি না পোহাইতেই দৌড়! এই, 'চমৎকার বাড়ি', এই আবার দম বন্ধ হইয়া উঠে! এই, 'মন্থরতম মুহূর্ত', তক্ষুনি আবার ঝড়ের

সন্ধ্যার দুই পাখা বিস্তার করিয়া ছোটা! মানব চায় বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, বেগের আবর্ত, প্রকাশের প্রখরতা। মিলি শিহরিয়া উঠে! প্রাচুর্যে ও প্রগলভতায় কেহ ফের মানবকে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেই তাহার অতল শয়ন! ইউরোপে গেলে—ইউরোপে একদিন সে যাইবেই—মিলি কোথায় পড়িয়া থাকিবে! কী তাহার আছে! দুইটি মাত্র কালো চোখ ও দুইটি মাত্র ভীরু করতল!

এইখানে আসিয়া বসিয়া-বসিয়া তাহার তরকারি কোটা ও খাটের উপর হামাগুড়ি দিতে-দিতে বিছানা পাতা। কাল সে আবার ময়লা ন্যাকড়া দিয়া কালি-পড়া লণ্ঠন সাফ করিয়াছে। মানব ভাবে মাছের ঝোলে তাহার নুনের পরিমাণ ঠিক হইয়াছে কিনা দেখিবার জন্যই কি সে এখানে আসিয়াছিল নাকি? মিলি যেন কোমল লতা, নিকটের আশ্রয়প্রার্থিনী নিদারুণ সর্বনাশের আনন্দে দগ্ধ হইবার তাহার প্রাণ নাই। সে বড় বেশি পরিমিত, তাহার শরীরে অধিকমাত্রায় মাটির কমনীয়তা!

তবুও বিদায় নিবার আগে দরজার কাছে নিভৃতে যখন দুইজনে শেষবার দেখা হইল, মনে হইল এত সুন্দর করিয়া কেহ কাহাকেও ইহার আগে কোনোদিন যেন দেখে নাই। দুইজনের মাঝখানে করুণ ও ক্ষীণ একটি বিচ্ছেদের নদী বহিতে শুরু করিয়াছে—সমস্ত পরিচয় অতিক্রম করিয়া একটি অজানা ইশারা!

মানব কহিল—যাই। তোমার এস্রাজ আমি গিয়েই পাঠিয়ে দেবো।

মিলির চোখে বেদনার নম্র সুষমা: আমি দেওঘরে গেলে একবার এসো। ছোটমামা হয়তো কুমিল্লা থেকে শিগগির আসবেন।

—কবে যাবে জানিয়ো।

—তার আগে জানিয়ো তুমি কেমন আছো। গিয়েই চিঠি লিখো কিন্তু। বুঝলে?

—হ্যাঁ গো।

—কী বুঝলে?

—গিয়েই যেন দেখি তোমার চিঠি আগে থেকে হাজির!

—সত্যি, না, চিঠি লিখো। আমাকে ভাবিয়ো না। তোমার প্রথম চিঠি পেতে আমি উৎসুক হয়ে থাকবো।

—বানান ভুল ধোরো না যেন। আমি কিন্তু কাঠখোট্টা—

—নিতান্তই। তাই তো যাবার আগে—

মিলির চোখের পাতা লজ্জায় কাঁপিয়া-কাঁপিয়া বুজিয়া আসিল।

মানব কহিল—তুমিই বা কোন যাবার আগে—

—আচ্ছা।

মিলি তাড়াতাড়ি নিচু হইয়া মানবের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে যাইতেই মানব তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া বুকের কাছে সাপটিয়া ধরিল। মুখের কাছে মুখ আনিয়া কহিল—তুমি বড্ড বেশি পবিত্র, মিলি। ম্যাডোনার চেয়ে সুন্দর তোমার মুখ।

—এ-মুখ তুমি আরো সুন্দর করো।

এমন সময় হীরালালবাবু বাহিরের বারান্দা হইতে এ-দিকে আসিতে-আসিতে কহিলেন—গাড়োয়ানটা ডাকাডাকি লাগিয়েছে।

তারপর ঘরে ঢুকিয়া : তোমার শরীর কেমন বুঝছ ?

—ভালোই। বিবর্ণমুখে মানব বাহির হইয়া গেল।

গাড়িতে উঠিয়া খোলা দরজা দিয়া বাড়ির সামনেকার প্রাঙ্গণ ও বাগান তারপর বারান্দা ও জানালা তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল—মিলির সেই প্রার্থনাকাতর ভর-ভর চক্ষু দুইটি আর দেখা গেল না।

মূর্তিমান বিভীষিকার মতো বাড়িটা দাঁড়াইয়া আছে।

১৭

স্টেশনে এতো আগে না আসিলেও চলিত। গাড়োনটার এতো তাড়া দিবার কী ছিলো! সেই দোদুল্যমান মুহূর্তটিতেই বা হীরালালবাবুর আবির্ভাব হয় কেন— ভাগ্যের কোন বিধানানুসারে! মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড রাজ্যপতন হইয়া গেল।

তাহার গায়ে এখনো মিলির গায়ের গন্ধটি লাগিয়া আছে। চোখ দুইটিতে সলজ্জ ও সাগ্রহ একটি প্রতীক্ষা কুয়াশার মতো দুলিতেছিল। তাহার প্রণাম করিবার ভঙ্গিটিতে কী সুন্দর ছন্দ! আকস্মিক ছন্দপতনের মধ্যেও কবিত্ব কম ছিল না।

তাহাকে একটুও আদর করা হইল না। কতো কথা অনর্গল বলিবার ছিল! এঞ্জিনটা খালি তখন হইতে ফুঁসিতেছে—ছাড়িবার নাম নাই। নামিয়া পড়িলে কেমন হয়? মিলি হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই, এতোক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একলা শুইতে তাহার ভয়-ভয় করিতেছে কিনা কে জানে! মালপত্র স্টেশন-মাস্টারের জিম্মায় রাখিয়া এই পথটুকু সে অনায়াসে হাঁটিয়াই পার হইতে পারিবে। গাড়ি না পাইলে তো তাহার বহিয়া গেল। বরং এই ফাঁকে রাতই আরো একটু গভীর হইবে। চুপি-চুপি সে মিলির দরজায় গিয়া টোকা মারিবে। মিলি জানে যে রাত করিয়া আসার তাহার অভ্যাস আছে। দরজা খুলিয়া দিতে সে দ্বিধা করিবে না। তারপর—

মানব সর্বাঙ্গে ঘুমের মতো গাঢ় একটি সুখাবেশ অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু সত্যিই নামিয়া পড়িবে কিনা—বা নামিয়া পড়িবার আগে কুলি একটা ডাকিতে হইবে কিনা ঠিক করিবার আগেই গাড়িতে টান দিয়াছে।

'মিলির ঘরে এখনো আলো জ্বলিতেছে। পিসিমা ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন— ঘুমুতে যাসনি এখনো?

তাড়াতাড়ি বালিশের তলা হইতে একটা বই বাহির করিয়া হাঁটুর উপরে উলটা পাতিয়া তক্ষুনি ফের সোজা করিয়া ধরিয়া সে কহিল— বইটা শেষ করে এই যাচ্ছি।

অথচ বিছানার উপরেই দেয়ালে পিঠ দিয়া সে বসিয়াছিল। কোমর অবধি একটা চাদর দিয়া ঢাকা। চুল বাঁধিতে সময় পায় নাই বলিয়া বুকের উপর এলোমেলো হইয়া আছে।

পিসিমা কহিলেন—চুলও বাঁধিসনি দেখছি। ফিতে-কাঁটা নিয়ে আয় শিগগির।

—রক্ষে করো। আমি এই শুলাম। বলিয়া বইটা খাটের এক প্রান্তে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আলোটা হাতের থাবড়ায় ফস করিয়া নিভাইয়া দিল। তাহার পর চাদরটা মাথা অবধি টানিয়া দিয়া সটান। মুখ বার না করিয়াই কহিল—বাইরের দিকে দরজাটা এঁটে দিয়ে তুমিও গিয়ে শুয়ে পড়ো, পিসিমা।

পিসিমা অন্ধকারে সেইখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার এই নীরব উপস্থিতির অর্থ হইতেছে এই যে তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়াছেন। মিলি তবুও চাদরটা মুখ হইতে সরাইল না দেখিয়া তিনি দরজাটা টানিয়া দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। এই নিঃশব্দে যাওয়ার অর্থ হইতেছে এই যে মিলির প্রতি সহানুভূতির তাঁহার সীমা নাই।

এতোক্ষণ মোমের আলোয় চোখ চাহিয়া মিলি কী যে ঠিক ভাবিতেছিল বলা কঠিন। এই বাড়িটা সম্বন্ধে কেনই যে তাহার এ অহৈতুক কৌতুহল, এই বাড়িটার চারদিকে দেয়াল নাকি তাহার গায়ে সমস্তক্ষণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; অথচ এই বাড়িতে আসিতে ও আসিয়া থাকিতে গোড়ায় তাহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। সামান্য একটা বাড়ি সম্বন্ধেই সে অকারণে ঘন-ঘন মত বদলায়। এখন তাহার কাছে এই শহরটা স্যাঁতসেঁতে ও মাঠের হাওয়া অত্যন্ত জোলো—এমন-কি তাহার জর হইয়া গেল, অথচ গাঁয়ের পথ ধরিয়া শ্মশানে ও শহরের পথ ধরিয়া স্টেশনে তাহার আনাগোনা লাগিয়াই ছিল। ঘরে যে কেউ নিরুপায় হইয়া অবশেষে তরকারি কুটিতে মন দিয়াছে, সে কথা কে বোঝে?

কিন্তু অন্ধকারে এখন চোখ বুজিতেই ট্রেনের শব্দ আসিয়া মিলির কানে লাগিল। এইমাত্র গাড়ি ছাড়িল বলিয়া এখনো পর্যন্ত মানব কামরায় জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া আছে। অন্ধকারে খালি ঝিঁঝিঁর ডাক; কোনো একটা স্টেশনে আসিয়া থামিলো; এদিকে-ওদিকে দুয়েকটা ভাঙা-চোরা শব্দ। গাড়িটা নিঝুম হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ট্রেনটা যে কখনো আবার ছাড়িবে এমন মনে হয় না। যাই হোক, গদির বেঞ্চিতে নরম বিছানায় শুইয়া সে পরম আরামে ঘুমাইতেছে। গার্ডকে বলা আছে, লাকসাম আসিলে যেন জাগাইয়া দেয়।

মিলিকে কাহারও জাগাইতে হইবে না।

রাত্রিটা একেবারে শাদা—এক বিন্দু ঘুম নাই।

লাকসাম হইতে গাড়ি ছাড়িয়াছে। প্রায় শেষ রাত্রি। তন্দ্রার মতো আবেশ আসে, কিন্তু মিলির সেই উৎকণ্ঠ মুখখানির কথা মনে করিয়া চোখ তাহার

জালা করিতে থাকে। সে কিনা এই ক'টা দিন তুচ্ছ একটা বাড়ি লইয়া মনে-মনে মাতামাতি করিল। মা একদিন সেখানে ছিলেন এই যদি তাহার মূল্য হয়, মিলিও তেমনি সেখানে আছে। একদিন সেই বাড়ি ছাড়িতে হইয়াছিল যেমন সত্য, তেমনি তো সে আবার নূতন করিয়া সেখানে গৃহপ্রবেশ করিবে। অনুক্রমে আর বিচ্যুতি ঘটিবে না। এবং সে কিনা এই কদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফিরিয়াছে। সেই কথা ভাবিয়া হাসিতে গিয়া মানব টের পাইল চোখে তাহার জল জমিতেছে। মিলিকে সে উপেক্ষা করিয়াছে বুঝি।

কিন্তু ছুইতে গেলেই বুঝি মিলির ব্যথা করিয়া উঠিবে। সে-রূঢ়তা তাহার সহিবে না, তাই গাঢ় ও নিবিড় একটি অনুভূতিময় সান্নিধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে, কৌটস যেমন সমস্ত রাত জাগিয়া বর্ষা-রাতে ফুল-ফোটা দেখিত, তেমনি এই সান্নিধ্যের উত্তাপে মিলির দেহে সে কামনার ফুল ফুটিতে দেখিবে। দেহেরই লীলায়িত বৃন্তে, আপনারই অনুভবের রঙে, আপনাকে বিকীর্ণ করিবার সৌরভে। নদীর তরঙ্গের মতো সে উছলিয়া পড়িবে—আপনারই প্রাচুর্যের দুঃসাহসে। মানব জোর করিয়া তাহাকে জাগাইতে চায় না। তাহার এই আধ-ঘুম আধ-জাগরণটিতে গোধূলি-আকাশের স্নিগ্ধতা। একটি করিয়া তারা জাগিতেছে।

চাঁদপুর আসিয়া গেল বুঝি।

মিলির যখন ঘুম ভাঙিল তখন এক-গা বেলা।

বাহিরের টাটকা আলোর দিকে চাহিয়া মনে হইল নদীর জল। মনে হইল কচুরি-পানা তুলাইয়া ষ্টিমার চলিয়াছে।

কিন্তু আজ কাছে থাকিলে নিশ্চয় একটা গরুর গাড়ি যোগাড় করিয়া কোন ভোরে তুইজনে বাহির হইয়া পড়িত। রাত্রে পিসিমা দক্ষিণের জানলাটা বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন বটে, স্পষ্ট সে মাঠ দেখিতেছে। তাহাদের গাড়ি এতোক্ষণে সেইখানে গিয়া পৌছিয়াছে যাহা এখান হইতে দিগন্ত বলিয়া মনে হয়। কী যে তাহারা কহিতেছে মিলি ভাবিয়া পায় না— কথা না কহিলেই বা কী!

কত টুকরো জিনিসই সে ফেলিয়া গিয়াছে। টাইম টেবল—টাইম টেবল ছাড়া চলিবেই বা কি করিয়া; রেইন কোট— এটি ভূতের মতো তার স্কন্ধে চাপিয়াই আছে; ও-মা, দাড়িতে সাবান মাখাইবার ব্রাশটা পর্যন্ত। ষ্টিমারে বসিয়া আর কামানো চলিবে না। কী মজা! স্যাণ্ডেল-এর স্ট্র্যাপ একটা খুলিয়া গিয়াছে বলিয়া সেটাকেও ফেলিয়া গিয়াছে। বড়লোক!

গোরাকে গিয়া শুধায় : তোকে কী দিয়ে গেলো ?

মিউজিয়মে জিনিসপত্র রোজ একবার করিয়া তাহার ওলোট-পালোট করা চাই। কাল যে-দুইটা জিনিস পাশাপাশি কাটাইয়াছে আজ তাহাদের স্থান-পরিবর্তন করিতে হইবে।

গোরা বলে : এক জোড়া ডাম্বেল। বুরুস-সাহেবের দীঘির পারে যে নতুন দোকান হয়েছে একটা। হাত মুঠো করে ধরলে আমি ওঁর আঙুলগুলো টেনে-টেনে কিছুতেই খুলতে পারিনে : কিন্তু শেষে লাগাই এক চিমটি—তিন-রকম চিমটি আছে—রাম, সীতা আর হনুমান। মুঠোর সঙ্গে সঙ্গে মুখখানাও হাঁ হয়ে যায়—

মিলি চলিয়া যাইতে পা বাড়ায়, গোরা বলে : তোমাকে কী দিল ? সাজি করবার জন্যে সিগারেটের ছবি ? না—কী দিল বলো না ?

—আমাকে আবার কী দেবে ? কিছুই না।

—না, কিছুই না। বললেই হলো। ওঁকে আবার কিছুই দেননি।

দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে।

সেই ফার্স্ট-ক্লাশের ডেক, বেতের চেয়ার, হাওয়ায়-ওড়া খবরের কাগজ। নদীর জল ছুরির ফলার মতো ধারালো—দৃষ্টিকে বেঁধে। মিলির নিজেরই চোখ তাতিয়ে উঠে, নিজেই চোখ বোজে।

তারপর সন্ধ্যা। এইবার আরেকটু ঘনাইয়া আসিলেই হয়।

মিলি দুই হাতে মিনিট-সেকেণ্ডের ভিড় সরাইতে থাকে।

আর কথা নাই। শেয়ালদা আসিয়া গিয়াছে।

মিলিরই সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ শুরু হয়।

এখন আর তাহাকে পায় কে।

এই ! ট্যাক্সি !

জিনিসপত্র উঠিল কি না উঠিল, খেয়াল নাই—চালাও, ভবানীপুর, জলদি। মুখে তিনটি মাত্র কথা। শব্দ তিনটা মিলি যেন মানবের পাশে বসিয়া শুনিল।

এতোক্ষণে বাড়ি পৌঁছিয়া গিয়াছে। নিতাইকে একশো গণ্ডা হুকুম আর সাতশো গণ্ডা ধমক। তাহার পড়ার ঘরের নীল পর্দাটা তেমনি ঝুলিতেছে। বারান্দা দিয়া যাইবার সময়—পর্দাটা তখন বাঁয়ে পড়িবে—বাঁ হাতে সেটা সরাইয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিল। শূন্য চেয়ার আর অগোছাল টেবিল। তারপর দিল পর্দাটা ছাড়িয়া। পর্দাটা হাওয়ায় মৃদু-মৃদু দুলিতেছে।

তারপর স্নান।

তারপর—মিলিকে আর অনুমান করিতে হইবে না—স্পষ্ট সে মোটর-সাইক্লের ঝকঝকানি শুনিতেছে।

কিন্তু এ কী! তাহাদেরই বাড়ির উঠানে নাকি?

না, পিসিমা স্টোভ ধরাইয়াছেন।

১৮

কলিকাতায় পৌঁছিয়া মানব যেন ছাড়া পাইল।

রাস্তায় ট্যাক্সিটা দাঁড়াইতেই মানব চেঁচাইয়া উঠিল: নিতাই, নিতাই। কাহারো সাড়া-শব্দ নাই। নিচেটা অন্ধকার। অগত্যা নিজেই মোটঘাট নামাইয়া ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া চুকাইয়া দিল।

ভিতরে ঢুকিয়া সামনে পড়িল কালু— খোদ কর্তার পোশাকি চাকর।

গড়গড়ার জল বদলাইতে নিচে নামিয়াছে।

—তোদের ডাকলে যে সাড়া দিস না, ব্যাপারখানা কী?

উত্তর না পাইতেই নিতাই-মহাপ্রভুর আবির্ভাব। হস্ত-দস্ত হইয়া কোথায় চলিয়াছে।

—এতোক্ষণ গাঁজায় দম দিচ্ছিলি নাকি ব্যাটা?

—মা'র জন্যে দোকানে সন্দেশ আনতে যাচ্ছি।

—মা? এসেছেন নাকি? কবে?

নিমেষে রাগ জল হইয়া গেল। নহিলে নিতাইর ঐ রকম নির্বিকার ও নিরপেক্ষ উক্তির উত্তরে সে হয়তো তাহার গাল বাড়াইয়া এক চড় মারিয়া বসিত।

—মা এসেছেন নাকি?

সিঁড়িতে জুতার প্রচুর শব্দ করিতে-করিতে মানব উপরে উঠিয়া গেল। উপরে উঠিয়াই বাঁ-দিকের বারান্দা ঘেঁষিয়া প্রথমেই মিলির ঘর—তাহার পর তার মায়ের এবং তাহারই গায়ে-গায়ে পর-পর দুইখানি তাহার। ডান-দিকের ঘরগুলি কখন যে কে ব্যবহার করে মানব কোনোদিন খোঁজ রাখে নাই। কর্তা থাকেন তেতলার ঘরে—নিরিবিলিতে। উপরে উঠিয়াই বাঁয়ের বারন্দায় দেখা গেল একটি য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। মানব থমকিয়া গেল। চেহারা দেখিয়া মনে হয়, নার্স। কাহারো অসুখ করিয়াছে বুঝি।

—মা, মা।

য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটি বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে চাহিল। অনুপমা বাহির হইয়া আসিলেন - পাটনায় সাত মাস কাটাইয়া আসিয়া তাঁহার চেহারা ফিরিবার নাম নাই, আরো কাহিল হইয়া গিয়াছে। কেমন যেন ধসকা চেহারা, হাত-পা হইতে গুঁড়া-গুঁড়া চামড়া উঠিতেছে।

মানব তাহাকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইল।

—তোমার অসুখ নাকি মা, বড্ড শুকিয়ে গেছো দেখছি।

—না, ভালোই আছি বেশ। তুমি ওঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করো।

—করবোখন। আগে স্নান-টান সারি। উনি ভালো আছেন তো? না হয়েছে একরত্তি ঘুম, না খেয়েছি একটুকরো ফল। খিদেয় গেলাম। ঠাকুরটাকে বলো না, শিগগির করে কিছু দিক।

বলিয়া মানব তাহার শুইবার ঘরে উদ্দেশে পা বাড়াইল।

অনুপমা বাধা দিয়া কহিলেন—ওখানে নয়। তোমার ঘর হয়েছে ও-দিকে।

—তার মানে?

অনুপমা শান্ত হইয়া কহিলেন—এ-ঘরে উনি থাকবেন। বলিয়া সেই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটি গটগট করিতে-করিতে ঘরে ঢুকিয়া দরজার পর্দাটা টানিয়া দিল। মানব চটিয়া উঠিল: কে উনি? ওঁকে ওদিকের ঘরে চালান করলেই হতো।

—হতো না। অনুপমার কণ্ঠস্বর কঠিন, উদ্বেগশূন্য: যাও, এই কালু বাবুকে তাঁর ঘর দেখিয়ে দে তো।

মানব ধাঁধায় পড়িল। তাহার ঘরের ঝুলানো পর্দাটার দিকে রুক্ষ চোখে তাকাইয়া সে কহিল—আমার ঘরটার জাত যে মারা গেল, মা। ওঁকে তোমার এমন-কী দরকার পড়লো? ওঁকে আমি না তাড়িয়েছি তো কী! আমার খাট-ফাট সব সরিয়ে ফেলেছ নাকি? আলমারিটাও?

—না, আলমারিটা ওঁর লাগবে।

ওঁর লাগবে মানে? আবদার যে উপচে পড়ছে! দাঁড়াও—পর্দাকে লক্ষ্য করিয়া—দাঁড়াও, দুটি দিন মাত্র।

—কার দুটি দিন বলছ। ভদ্রলোকের মতো কথা বলতে শেখো। উনি ভাসা-ভাসা বাংলা জানেন।—অনুপমা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিলেন।

—এবার চোস্ত করেই শিখতে হবে।

মানব তাহার বসিবার ঘরের দিকে পা বাড়াইল।

—ও দিকে কোথায় যাচ্ছ।—অনুপমা বাধা দিলেন।

—আমার বসবার ঘরে। কেন, সেটাও লোপাট হয়ে গেছে নাকি?

—ও-ঘরটা আমার কাজে লাগবে।

—এতোদিন তো লাগতো না।

—দুহাতে টাকা উড়ানো ছাড়া তুমিই বা এতোদিন আমাদের কোন কাজে লাগতে?

মানব থামিয়া গেল। ম্লান হাসিয়া কহিল—ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না, মা।

অনুপমা কহিলেন—বোঝবার কিছু নেই এতে।

তিনিও ঘরের মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। মানব বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। কালু তামাকের জল বদলাইয়া এক ফাঁকে তেতলায় রাখিয়া আসিয়াছে। এ-দিক পানে চাহিতেই কালু কহিল—আসুন এ-দিকে।

এ-দিকের ঘরগুলির অবস্থান মানবের ঠিক মুখস্থ ছিলো না; একেবারে কোণে এমনি যে একটা সঙ্কীর্ণ ঘর তাহার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিলো, ইহা সে স্বপ্নেও কোনো দিন ভাবে নাই। দরজাটা ঠেলা মারিয়া খুলিয়া ফেলিয়া কালু বলিল—এই ঘর।

—এই ঘর: মানব যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ভূত দেখিতেছে: বলিস কিরে? আমার সঙ্গে সবাইর ঠাট্টা? বলিয়া সুইচ টানিল, কিন্তু আলো জ্বলিল না। বালবটা কোথায় খারাপ হইয়াছে। এই ঘরে আগে হয়তো চাকররা শুইত—কিম্বা এতোদিন হয়তো চামচিকে আর ইঁদুরেরা এই ঘরে নিয়মিত দৌড়-ঝাঁপ করিয়া বংশানুক্রমে স্বাস্থ্যবর্ধন করিয়া আসিয়াছে। মানব রীতিমতো চেঁচামেচি শুরু করিল—এই ঘরে কোনো ভদ্রলোক মাথা গুঁজতে পারে? আমার জিনিসপত্র সব টাল করে ফেলা হয়েছে। কী-সব ভেঙ্গে-চুরে খান-খান হয়ে গেল সে দিকে কারুর নজর নেই। ডাক নিতাই হারামজাদাকে। বসে-বসে ব্যাটা এর জন্যে মাইনে গুনবে? কালু মানবের এলাকায় চাকর নয় বলিয়া কোনো গালাগালই তাহাকে লাগিতে পারে না।

মানব একবার ঘরের ভিতরে ঢোকে, আবার বাহিরে আসিয়া চেঁচামেচি আরম্ভ করে: এমন ঘরে দুদিন থাকলেই যে আমার থাইসিস। পশ্চিম পুব একেবারে বন্ধ। জিনিস দিয়ে জাঁতা। ও-গুলো বুঝি আর অন্য ঘরে রাখা যেতো না? কেন, কেন আমার ঘরে এসে অন্য লোক থাকবে? ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারি না?

মানব আবার অনুপমার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

—ঐ ঘরে কী করে থাকা যায় ? ঐ ঘর গুছিয়ে রাখা হয়নি কেন ? চাকর-বাকর সবাই যেন মাথায় উঠেছে। কাল সারা রাত আমার ঘুম হয়নি--অমন নোংরা চাপা ঘরে কোনো ভদ্রলোকের ঘুম আসে ?

অনুপমা বাহির হইয়া আসিলেন। কহিলেন—কী চেঁচামেচি লাগিয়েছ শুনি।

—চেঁচামেচি করবো না ? তোমার অতিথিকে ঐ ঘরের খাঁচায় পুরতে পারতে না ? কালকেই আমার ঘর ছেড়ে দিতে হবে বলে রাখছি।

মুখ বাঁকাইয়া অনুপমা কহিলেন—কথাটা কে বলছে শুনি ?

—আমি বলছি। ওকে পোরবার মতো আর বাড়িতে ঘর ছিলো না নাকি ?

—অসভ্যের মতো গলা ফাটিয়ে চীৎকার কোরো না। ঘর পছন্দ না হয়, বাইরে চলে যাও। রাস্তা আছে।

বলিতে-না-বলিতেই অনুপমার তিরোধান! দরজাটা তাহার মুখের উপর সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

কী করিবে মানব ঠিক কিছু বুঝিতে পারিল না। বাইক নিয়া রাস্তায় রাস্তায় খানিকক্ষণ টহল দেওয়া ছাড়া আর পথ দেখিল না। কিন্তু বারান্দাটা পার হইবার আগে মিলির ঘরের দরজাটায় ঠেলা মারিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল।

ঠেলা মারিতেই ভেজানো দরজাটা খুলিয়া গেল। উঁকি মারিয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই—সমস্ত ঘর জুড়িয়া শুধু মিলির অনুপস্থিতিটুকু বিরাজ করিতেছে। মানব ঘরের মধ্যে চলিয়া আসিল; সুইচ টিপিয়া আলো করিয়া তক্ষুনি আবার নিবাইয়া দিল। মিলির ব্যগ্র দুই বাহুর মতো অন্ধকার সহসা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

এ কয়দিন আর ঝাঁট পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই-খাতাগুলি ছড়াইয়া আছে। মানব তাই নিয়া কতোক্ষণ নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। শ্রান্তিতে শরীর তাহার ভাঙিয়া পড়িতেছে। মিলির খাটের উপর শুকনা গদিটা খালি পড়িয়া আছে। মানব তাহারই উপর বসিয়া পড়িল।

মিলি তাহার মাথার এত কাছে আসিয়া বসিয়া আছে, তবু সে তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না!

কী যে ব্যাপার ঘটিয়াছে মানব ভাবিয়া-ভাবিয়া কিছুরই কূল-কিনারা পাইল না। তেতলায় উঠিয়া সতীশবাবুর শরণাপন্ন হইলে ইহার একটা বিহিত হইতে পারে বটে, কিন্তু নিজের প্রভুত্ব সঙ্কুচিত করিতে হইবে ভাবিয়া তাহার আত্মসম্মানে ঘা লাগিল। ঘরে মেম-সাহেব আনিয়া মা'র মেজাজও সহসা ফিরিঙ্গি হইয়া উঠিল কেন ? তাহাকে কিনা বলা— সোজা রাস্তা পড়িয়া আছে!

অন্ধকারে মানব চুপ করিয়া শূন্যমনে বসিয়া রহিল।

সহসা কোথা হইতে একটা শিশু ট্যাঁ করিয়া উঠিয়াছে। পাশের ঘরেই। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটা বিকৃত সুর-ভঙ্গীতে তাহাকে প্রবোধ দিতেছে। মজা মন্দ নয়! একা নয়, বোঝার উপর শাকের আঁটিটি পর্যন্ত নিয়া আসিয়াছে। কেন যে এই উপদ্রব আসিয়া জুটিল, কি করিয়া এখুনি ইহার প্রতিবিধান করা যায় সম্প্রতি তাহাতে একটুও মন না দিয়া মানব তেমনি বসিয়াই রহিল।

বাহির হইতে নিতাই কহিল— আপনাকে কর্তাবাবু ডাকছেন।

—কর্তাবাবু ডাকছেন! মানব খেঁকাইয়া উঠিল: নন্দের চাঁদ এতোক্ষণ কোথায় ছিলে? আমার ঘর-দোর গুছিয়ে রাখতে পারিসনি, হারামজাদা? যা ব্যাটা, যাবো না আমি।

—আপনি যে আজ আসবেন জানবো কী করে?

—তাই ঘর-দোর অমনি একহাঁটু করে রাখবি? দাঁড়া—

—এখুনি সব গুছিয়ে ফেলছি আমি। আপনি একবারটি তেতলায় যান। মানবের কোনো ব্যস্ততা দেখা গেল না। শরীরটা যেন থামিয়া আছে, ম্যাজ-ম্যাজ করিতেছে—স্নান না করিলে কিছুতেই তাহার রাগ পড়িবে না। তেতলায় উঠিলে এখনই সব-কিছুর সমাধান হয়, তবু এ-জায়গাটি ছাড়িয়া উঠিতে তাহার ইচ্ছা করে না।

১৯

নিতাই আবার তাড়া দিয়া গেল।

সতীশবাবুর অস্তিত্বের কথা মানব একরকম ভুলিয়াই ছিল; তেতলা থেকে তিনি বড় একটা নামিতেন না, শামুকের খোলার মতো ঐ ঘরটিই তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিত। মানবের অবাধ ও উদ্দাম ধাওয়ার মুখে পড়িয়া তাহার সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন ঠোকাঠুকি হয় নাই। মানবের মনি-ব্যাগটা শূন্য হইলে তিনি তাহা আবার ভরিয়া দিয়াছেন। তখনই হাসিয়া একবার বলিতেন: ছমাসে আর মুখ দেখিয়ো না। কিন্তু ছমাস পার হইবার আগে নিজেই তাহার ঘরে উঁকি মারিয়া মৃদু হাসিয়া বলিয়াছেন: তোমার মনি-ব্যাগের স্বাস্থ্য ভালো আছে তো? মানব হাসিয়া বলিয়াছে: হাওয়ায় বেড়িয়ে সম্প্রতি কিছু কাহিল হয়ে পড়েছে।

তা ছাড়া কোনো কাজেই সতীশবাবুর দরবারে তাহার ডাক পড়ে নাই। আজই তাহাকে নিয়া তাঁহার কী দরকার পড়িল ভাবিয়া সে দিশা পাইল না।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে-উঠিতে তাহার ভয় করিতে লাগিল। দরজাটা বিস্তৃত করিয়া খোলা —প্রকাণ্ড টেবিলের উপর একরাশ কাগজ-পত্র লইয়া সতীশবাবু ভীষণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। টেবল-ল্যাম্পের তীক্ষ্ণ আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়িল তাঁহার মুখে চিন্তার কুটিল রেখা পড়িয়াছে। অনেক দিনের অনিদ্রায় চোখ দুইটা কাঁচের মতো কঠিন দেখায়।

মুখ তুলিয়া স্মিতহাস্যে কহিলেন—এসো, মানু। তুমি এখনো জামা-কাপড় ছাড়োনি? কী নিয়ে গোলমাল হচ্ছিল?

মানব কহিল—আমার দু-দুটো ঘর হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। কে-একটা মেম এসে সেখানে আস্তানা গেড়েছে।

—হুঁ! কাগজ-পত্রে চোখ ডুবাইয়া সতীশবাবু মাত্র এই সংক্ষিপ্ত শব্দ করিলেন।

মানব কহিল—ওকে কেন আমার ঘর দেওয়া হলো? আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে কিনা ঐ কোণের আঁস্তাকুড়ে। না আছে জানালা, না বা আলো। গা ছড়ানো যায় না।

—আচ্ছা, সে আমি দেখছি। তুমি ততোক্ষণে স্নান করে নাও। নিচে যাবার দরকার নেই, আমারই বাথরুমে জল আছে। এখন আর কোথাও বেরিয়ো না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

শুধু কথা আছে! মানব সহসা এই সংসারের চোখে এত অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল! স্নান করাটা হয়তো ঠিক হইল না। তবু না করিয়াই বা কী করা যায়! নিতাই কাপড়-তোয়ালে আয়না ব্রাশ লইয়া হাজির। কহিল—এই জুতো এনে রেখেছি। দেখুন এসে আপনার নতুন ঘর-দোরের কেমন ভোল ফিরে গেছে।

—তুই থাকিস ও ঘরে। আমার কাজ নেই।

ঘরে ঢুকিতে সতীশবাবু কহিলেন—বোসো। তোমার খাবারটা এখেনেই দিয়ে যাবেখন। যা তো নিতাই, ঠাকুরকে বলে আয়।

—না, না সে পরে হবে। মানব আপত্তি করিল: এখনো আমার খিদে পায়নি। কথাটা আগে সেরে নিন।

—কথাটা আগে সেরে নেব? সতীশবাবু স্মিতহাস্যে কহিলেন—চেয়ারে বেশ টাইট হয়ে বসেছ তো?

—এ চেয়ার থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে যেতেও আমার আপত্তি নেই। বলুন। মা তো আমাকে সোজা রাস্তা দেখতেই উপদেশ দিয়েছেন।

—বটে ? সতীশবাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল : আমি বলি কি জানো, মানু ?

—কি ? টেবিলের উপর দুই কনুয়ের ভর রাখিয়া মানব জানিতে চাহিল।

—তোমাকে আমি টাকা দিচ্ছি তুমি কোথাও দিন কয়েক বেড়িয়ে এসো।

কথাটা মানব আয়ত্ত করিতে পারিল না। সতীশবাবুর মুখের দিকে হতভম্বের মতো চাহিয়া থাকিয়া বলিল—বেড়াতে যাবো কী! আমাদের কলেজ খুলতে আর কতো দিন!

—এই পচা ইউনিভার্সিটিতে আর পড়ে না। সোজা বিলেত চলে যাও। ব্যারিস্টার হয়ে এসো। কিম্বা অন্য কোনো টেকনিক্যাল বিদ্যা। রঙের কাজ, ব্লকের কাজ, এঞ্জিনিয়ারিং—যাতে তোমার হাত খোলে। যতো দিন তোমার খুশি।

মানব ব্যঙ্গসূচক হাসি হাসিয়া কহিল—আমাকে তাড়াবার জন্যে হঠাৎ আপনারা সবাই ক্ষেপে উঠলেন কেন ?

পীড়িত মুখে সতীশবাবু কহিলেন—তোমাকে তাড়াব কী, মানু ? সত্যিকারের মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে তোমাকে ইউরোপ পাঠাচ্ছি। তুমি যদি উত্তর মেরু জয় করবার জন্যেও আকাশে বেরোতে চাও, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

—কিন্তু বি. এ. পাশ করে যাবো বলেই তো ঠিক ছিলো।

—দুত্তোর বি. এ. পাশ। সতীশবাবু টেবিলে এক কিল মারিলেন : খামোখা দেরি করে লাভ কি! তুমি তো চলতে পারলে থামো না। মুহূর্তের মধ্যে মানব হাঁপাইয়া উঠিল ; কহিল—কিন্তু ব্যাপারটা কী স্পষ্ট করে আমাকে বলুন।

গলা খাঁখরাইয়া সতীশবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, স্পষ্ট করেই বলছি। তুমি এর মাঝে খেয়ে নিলে পারতে।

—সে হবেখন। আপনি বলুন।

একটুখানি চুপচাপ। মাঝে-মাঝে নিচে হইতে সেই শিশুর তারস্বর কানে আসিতেছে।

সতীশবাবু শুরু করিলেন : ঐ আওয়াজটা কানে আসছে মানু।

—কিসের ?

—কে যেন কাঁদছে না ?

—সেই ফিরিঙ্গি-মেয়েটার বাচ্চা হয়তো।

সতীশবাবুর গোঁফ জোড়া ঈষৎ স্ফুরিত হইল। চেয়ার হেলান দিয়া তিনি কহিলেন—খবরটা এখনো তাহলে পাওনি ? ও তোমারি ভাই। অর্থাৎ—

মানব বসিয়া পড়িল। ষড়যন্ত্রের সমস্ত জটিলতা এখন তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে।

—অর্থাৎ—সতীশবাবু প্রসন্নমুখে কহিতে লাগিলেন—বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেছি। এর পরিণাম কী ভাবতে পারো?

মানবের স্বর ফুটিতেছিল না, কঠিন দুইটা হাতে তাহার গলাটা কে নির্মম জোরে চাপিয়া ধরিয়াছে। স্বর যাহা ফুটিল, শুনাইল ঠিক কান্নার মতো: আমার পক্ষে পরিণাম কী, তাই ভাবতে বলছেন? মা তো সে-কথা আগেই বলে দিয়েছেন —রাস্তা।

—নিশ্চয়ই নয়। সতীশবাবু মানবের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—তোমাকে আমি বঞ্চিত করবো এতো বড় নিষ্ঠুর আমি কখনোই হতে পারবো না। এই দেখ, আমি কী উইল করে রেখেছি। সতীশবাবু ড্রয়ার টানিয়া কি একটা কাগজ বাহির করিলেন।

শুকনো গলায় মানব কহিল—শুনে আমার দরকার নেই। দয়া করে ওটা ছিঁড়ে ফেলুন।

সতীশবাবু কহিলেন—একটা মোটা টাকাই তোমার জন্যে রেখেছি। ইচ্ছে করলে তুমি অনায়াসে বিলেত চলে যেতে পারো।

—ধন্যবাদ।

মানব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সতীশবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন—উঠছ কি এখুনি?

—এ বাড়িতে থাকবার আর আমার কী দরকার থাকতে পারে?

—সে কী কথা! সতীশবাবুও উঠিয়া দাঁড়াইলেন: এ-বাড়ি ছেড়ে তুমি চলে যাচ্ছ নাকি? কোথায়?

—দেখি আপনার কথামতো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হতে পারি কিনা।

—না, না, ছেলেমানুষি কোরো না. বোসো। বলিয়া সতীশবাবু তাহাকে হাতে ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। তাহার পাশে আরেকখানা চেয়ারে বসিয়া কহিলেন—অভিমান করবার কিছুই নেই। আমি তোমাকে বঞ্চিত করলে এই অভিমান হয়তো সাজিত। ভেতরে-ভেতরে যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে এ-কথা আমি বাইরে থেকে বুঝতেই দেব না।

—তাই তো কোণের ঘরে আমার জায়গা হয়েছে; মা সটান আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন!

প্রবোধ দিবার সুরে সতীশবা কহিলেন—তাতে কি। তুমি অন্য কোথাও

রুমস নিয়ে থাক, কিম্বা বি. এ. পাশের মোহ যদি কাটিয়ে উঠতে পারো তো টমাস কুক কিম্বা আমেরিকান এক্সপ্রেসএ গিয়ে বুক করে এসো।

—সবই সম্ভব হতো যদি আমার কোনো অধিকার আছে বলে অনুভব করতাম। ফাঁকা স্নেহের উপর আমার আর বিশ্বাস নেই।

—বলো কি, মানু? এতোগুলি বৎসর ধরে কি তুমি এই শিখলে?

—আর এতোগুলি বৎসর পরে ছোট একটা শিশুর স্থান করে দিতে আমাকেই পথে বেরুতে হবে—এ-ই কি আমি ভেবেছিলাম কোনোদিন?

—কিন্তু তুমি তো জানো—আইনে তুমি আমার উত্তরাধিকারী নও। তবুও তোমাকে যে আমি অর্থের অভাব কোনোদিন বোধ করতে দেব না বলে প্রতিজ্ঞা করছি—

—তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

মানব আবার উঠিল।

—তুমি যাচ্ছ কোথায়?

মানব বিমর্ষমুখে হাসি আনিয়া কহিল—যেখান থেকে এ-বাড়িতে এসেছিলাম।

খুব বড়ো রকম ব্যর্থতা আসিয়া মানুষের জীবনকে যখন গ্রাস করে, তখন সে হাসিমুখে মনে-মনে বলে: এ যে ঘটবে তা আমি বহু আগে থেকেই জানতাম—মানবের মুখে সেই অসহায় হাসি।

সতীশবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন: না, না, আমার এ-ঘর তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমিই না-হয় কোণের ঘরে গিয়ে থাকবো! তুমি যাবে কী? ছি! যাবার জায়গা কোথায়?

ম্লান হাসিয়া মানব কহিল—আমার বাবাও একদিন এমনি নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। সেই সুর আমার রক্তে বাজছে।

—তা বাজুক। তুমি বোসো। কালু! ঠাকুরকে শিগগির বল গে—দাদাবাবুর খাবার এখানে পাঠিয়ে দেবে।

—আমার মা-ও কোথায় কোন দিকে চলে গেছেন কেউ বলতে পারে না।

সতীশবাবু হঠাৎ কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন: তোমার মা চলে যাবার দিনে তোমাকে আমার হাতে দিয়ে বলে যান তোমাকে যেন মানুষ করে তুলি। তোমার মা'র সেই কথা আমি চিরদিন মনে রেখেছি।

—বহু ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকেও মা'র সঙ্গে পথে বার করে দিলেন না কেন?

—তোমার মা-ই তোমাকে নিতে চাইলেন না।

—এ-সংসারে আমার যদি জায়গা হলো, মা'রও কি হতো না?

—তোমার মা জোর করেই চলে গেলেন। কিন্তু সে-কথা থাক।

সতীশবাবু অন্যমনস্কের মতো পাইচারি করিতে লাগিলেন।

—আমিও তেমনি জোর করেই চলে যাই।

—কিন্তু আজই যেতে হবে এমন কোনো প্রতিজ্ঞা আছে? আজ রাতটা জিরোও, কাল ভেবে ঠিক করা যাবে—দেখি কী করতে পারি।

—ভেবে ঠিক করবার কিছুই আর নেই এতে।

মানব দরজার দিকে মুখ করিয়া ঘুরিয়া গেল।

সতীশবাবু বাধা দিয়া কহিলেন—এ তুমি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছ।

—এতে আমার-আপনার কোনোই হাত নেই। এ একদিন হতোই। এ না হয়ে যায় না। সত্যিকারের বাঁচবার পক্ষে এই ক্ষতির মূল্য অনেকখানি।

সিঁড়িতে কাহার জুতার শব্দ হইতেছে।

সশরীরে অনুপমাই হাজির হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সতীশবাবুর মুখ চুন হইয়া গেল।

অনুপমা মাতৃত্বের স্বাদ পাইয়া যেন বাঘিনী হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি যে বেশ শুকাইয়াছেন তাহা তাঁহার গলাটা দেখিলেই ধরা পড়ে। তিনি গলাটা কিঞ্চিৎ দুলাইয়া কহিলেন—কী এমন ঘর খারাপ হয়েছে শুনি?

—না, না—সতীশবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন—মানু আজ আমার বিছানায় শোবে। কাল একটা বন্দোবস্ত করা যাবে যা-হোক।

আবার কী বন্দোবস্ত!

—হ্যাঁ। সে একটা হবে ঠিক। এখনো ওর খাওয়া হয়নি। ঠাকুর খাবার দিয়ে যাচ্ছে না কেন? যতো কুড়ের ধাড়ি।

—কেন, উনি নিচে নেমে খেতে আসতে পারেন না, ওঁর সম্মানে বাধে?

মানব হাসিয়া কহিল—খেতেই আমার সম্মানে বাধছে, মা।

অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গলার স্বরটাকে ঈষৎ চাপিয়া অনুপমা কহিলেন—সে হিসেবে এতোদিনে তো তবে কম সম্মান খোয়ানো হয়নি দেখছি। তারপর মুখ ঘুরাইয়া স্পষ্ট স্বরে কহিলেন - সোজা কথা বাপু, তোমার পিছনে আর রাশি-রাশি টাকা উড়ানো চলবে না।

মানব নির্লিপ্তের মতো কহিল—সোজা কথাটা আমি আরো সোজা করে দিয়ে যাচ্ছি। তোমার ভাবনা নেই।

মানবকে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াইতে দেখিয়া অনুপমা কহিলেন—কিন্তু চারটি না খেয়ে এখুনিই বেরিয়ে যেতে হবে এমন কথা তো তোমাকে কেউ বলেনি।

—সোজা করে এমন কথা কেউ বলবার আগেই তো চলে যাওয়া উচিত। সতীশবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন—তোমার স্বভাবের এ দোষ আমি চিরদিনই লক্ষ্য করছি মানু, একবার যা তোমার মাথায় আসে কিছুতেই তুমি তা ছাড়তে পারো না।

মানব তবুও বশ না মানিয়া সোজা নামিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া অনুপমা মুখভঙ্গি করিয়া কহিলেন—তুমিই তো নাই দিয়ে-দিয়ে মেজাজখানা ওঁর এমনি নবাবী করে তুলেছো।

মানব কয়েক ধাপ নামিয়া আসিয়াছে।

সতীশবাবু প্রায় ছুটিয়া আসিয়া মাঝপথে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার একখানি হাত মুঠার মাঝে তুলিয়া লইয়া কহিলেন—তোমার গোঁ যখন ছাড়বে না, তখন কী আর আমি করতে পারি? কোথায় যাচ্ছ জানি না, তবু কিছু তোমাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। বলিয়া তাহার বুক-পকেটে এক তাড়া নোটই গুঁজিয়া দিলেন হয়তো: ছেলেমানুষি কোরো না। এ তোমাকে রাখতেই হবে। তা ছাড়া—সতীশবাবু অনুপমাকে একটু লক্ষ্য করিয়া গলা নামাইয়া কহিলেন—বিলেত যাবার প্রস্তাব কিন্তু ওপন্ রইলো। বুদ্ধিমানের মতো তাই ভেসে পড়ো। টাকার দরকার হলে আমার কাছে আসতে আপত্তি করো না। সতীশবাবু মানবের সঙ্গে-সঙ্গে আরো দুই ধাপ নিচে নামিলেন: খুব একটা অসুবিধেয় পড়ো এ আমি চাইনে। যাও, দিন কয়েক কোথাও ঘুরে এসো। আবার এসো একদিন—

মানব ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সতীশবাবুকে নিঃশব্দে প্রণাম করিয়াই তরতর করিয়া নামিয়া গেল। সতীশবাবু কাঠের রেলিঙ ধরিয়া টাল সামলাইলেন। তাঁহার সঙ্গে আরো দুইটা জরুরি কথা কহিবার জন্য অনুপমা রহিয়া গেলেন।

দোতলার বারান্দায় পড়িয়াই প্রথমে মিলির ঘর। এই ঘরে গিয়া দাঁড়াতেই মিলি অন্ধকারের গভীর সান্ত্বনার মতো চারদিক হইতে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল।

সে জীবনে এতো বেশি লাভ করিয়াছে যে এই সামান্য ক্ষতিতে তাহার কী এমন আসে যায়! মেঘনার পাড়ে সেই কলা গাছের বেড়া-দেওয়া পাতার কুঁড়ে-ঘরটি তাহার চোখে আঁকা আছে! সেই ধু-ধু মাঠের সমুদ্রে পাল-তোলা জাহাজের মতো নোয়াখালির সেই বাড়িটা—যে-বাড়িতে আগে মা থাকিতেন, যে-বাড়িতে এখন মিলি আছে।

ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিতেই পাশের ঘরের দরজার কাছে সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটির সঙ্গে দেখা। দুই বাহুর মধ্যে এক প্যাকেট ফ্ল্যানেলের

তলায় হৃষ্টপুষ্ট একটি শিশু - সোডার বোতলের মুখের মতো বোজানো মুঠি তুলিয়া আলো দেখিয়া খেলা করিতেছে। এই মাত্র কাঁদিতেছিল, নার্সের বাহুর আশ্রয় পাইয়া খুশির তাহার শেষ নাই। ময়দার পাকানো ড্যালার মতো ফুলো-ফুলো গাল, গালের চাপে নাকটা কোথায় ডুবিয়া আছে, আঙুলের ছোট-ছোট নখগুলি নতুন আলপিনের মাথার মতো ঝকঝক করিতেছে।

সিঁড়িতে আবার কাহার জুতার শব্দ।

ফিরিঙ্গি মেয়েটির দিকে বন্ধুর মতো চাহিয়া মানব কহিল—গুড-বাই। মেয়েটি কিছু উত্তর না-দিয়া বুকের ছেলেটাকে নিচু হইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

ছেলেটা যেন পিটালির পুতুল। ডুমো-ডুমো গাল দুইটা টিপিয়া ছেলেটাকে একটু আদর করিবার জন্য সে হাত বাড়াইল, অমনি হাত তুলিয়া হাঁ-হাঁ করিতে-করিতে অনুপমা ছুটিয়া আসিলেন। মুখে তাহার হিন্দী-মেশানো বাঙালি বুলি : কেন তুমি ঠাণ্ডায় ওকে নিয়ে এসেছ? শিগগির নিয়ে যাও ভেতরে।

মানব স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনুপমা ছেলেকে নার্সের কোল হইতে তাড়াতাড়ি ছিনাইয়া লইয়া মানবের নাগালের বাহিরে ঘরের মধ্যে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। চোখে তাঁহার সেই বাঘিনীর দৃষ্টি। মানব যেন হাত বাড়াইয়া আরেকটু হইলেই শিশুটার গলা টিপিয়া ধরিয়া শেষ করিয়া দিয়াছিল! চলানি মেয়ে আলাপ জমাইতে ঢং করিয়া একেবারে ছেলে কোলে করিয়া আসিয়াছে। ভাগ্যিস সে ঠিক সময়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। আর এক মিনিট পরে হইলেই—ভাবিতে অনুপমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। মানব সামান্য একটু হাসিয়া সিঁড়ি দিয়া আস্তে-আস্তে নামিতে লাগিল। অনুপমা কী করিয়া এমন কুৎসিত ভাবে বদলাইয়া গেলেন মানব ভাবিয়া থৈ পায় না। নারী-চরিত্রের এই উৎকট স্বার্থপরতার চেহারা সে ইহার আগে কোনোদিন দেখে নাই, বোধকরি ভাবিতেও পারে না। ইহারই পাশে অপরাজিতা ফুলের মতো মিলির মুখখানি মনে করিয়া সে নিজেকে একটু পবিত্র বোধ করিল।

অনুপমা তখনো কী-সব অনর্গল বকিয়া চলিয়াছেন। গলানো সিসে। মানব নিচে নামিয়া আসিল। নিচের তলায় অনেক সব অনাহূত অতিথি শিকড় গাড়িয়া বসিয়া দিনে-রাত্রে রস শোষণ করিতেছে। তাহাদের বেশির ভাগই অনুপমার বাপের বাড়ির সম্পর্কিত। কোনোদিন তাহাদের দিকে মানব মুখ তুলিয়া তাকায় নাই; আজ যাইবার আগে তাহাদের দেখিতে ইচ্ছা করিল। শিগগিরই যে

তাহাদেরও উপর গৃহত্যাগের নোটিশ জারি হইবে এ-খবর হয়তো এখনো তাহারা পায় নাই। হয়তো তাহা নয়; তাহারা তো আর মানবের মতো অংশের টুকরা লইয়া কামড়া-কামড়ি করিতে আসিত না তবু কোথায় যেন মানবের সঙ্গে তাহাদের মিল ধরা পড়িয়াছে। সে-ও তো নিচেই নামিয়া আসিল।

একটা ঘরে সে ঢুকিয়া পড়িল। দাঁড়ির একটা খাটিয়ার উপর কম্বল পাতিয়া হরিহর একপেট খাইয়া চিৎ হইয়া পরম আরামে পান চিবাইতেছে আর পা দুলাইতেছে। মানবকে ঢুকিতে দেখিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। মানব একটা কিছু হুকুম করিলেই সে পরম আপ্যায়িত হইবে এমনি ভঙ্গিতে সকাতরে সে কহিল—আমাকে কিছু বলবেন?

মানব ফিরিয়া যাইতে-যাইতে কহিল—না, তোমরা কী করছ এমনি দেখতে এসেছিলাম।

ভাগ্যিস হরিহর এখন তামাক সাজাইতে বসে নাই।

মানবের স্পষ্ট মনে পড়ে এই হরিহরকে একদিন সে মোটর-বাইকের কাদা ধুইতে বলিয়াছিল—হরিহর দুই-পাটি দাঁত বাহির করিয়া তখুনি কোমরে কাপড় কাছিয়া বালতি করিয়া জল তুলিয়া আনিয়াছিল। আজ হরিহরের বিছানা ভাগ করিয়া অনায়াসে সে তাহার পাশে বসিতে পারিত।

কিন্তু সহানুভূতি কুড়াইবার এই উঞ্ছবৃত্তি তাহাকে শোভা পায় না।

নিচে মোটর-বাইকটার সঙ্গে তাহার দেখা হইল—তাহার 'ট্রায়ম্ফ্'। হ্যাণ্ডলটা ধরিয়া বন্ধুর হাতের মতো এক সবল ঝাঁকানি দিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

গ্যারাজটা তালা-দেওয়া। কাল সকালে আসিয়া মির্জা দরজা খুলিবে। সেই গাড়ি করিয়া ফিরিঙ্গি-মেয়েটা হয়তো ছেলে কোলে নিয়া রোজ হাওয়া খাইয়া আসিতেছে।

পিছন থেকে নিতাই ডাক দিল: বাবু চলে যাচ্ছেন নাকি? ঠাকুর যে আপনার খাবার নিয়ে ঘুরছে। এখন বেরুলে সব জুড়িয়ে যাবে যে।

মানব ডাক শুনিয়া ফিরিল। পকেট হইতে খুচরা একটা টাকা বাহির করিয়া নিতাইয়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল—এই নে।

এখনো নবাবি তাহার ষোলো আনা। ফুটপাতে খানিকক্ষণ দাঁড়াইতেই একটা ট্যাক্সি মিলিয়া গেল। বুক-পকেটটা ফাঁক করিয়া তাহার স্ফীতির একটা পরিমাপ করিয়া সে ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিল।

কোথায় যাইবে জানিবার জন্য ড্রাইভার ঘাড় ফিরাইল।

সিটটাতে নিজেকে আরো ছড়াইয়া দিয়া মানব কহিল—জানি না।

এমন যাত্রীকে অবশেষে কোথায় লইয়া যাইতে হয় ড্রাইভার জানিত।

মনে-মনে তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও মানব কোনো জায়গার হদিস পাইল না। সেজন্য তাহার ব্যস্ততা নাই। যেখানে হয়, সেখানেই সে থাকিবে। যদি পুলিশ আপত্তি না করে সারা-রাত্রি ট্যাক্সিতেই, যদি আপত্তি করে, সুখকম্বলশয়নে। ফুটপাতে, নর্দমায়—যেখানে খুশি। এই অনিশ্চয়তার সঙ্গে নিজেকে সে এক মুহূর্তেই চমৎকার খাপ খাওয়াইয়াছে।

শ্রান্তিতেই গা ছাড়িয়া দিয়াছে—মূর্চ্ছিত চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটার মতো হাওয়া আসিয়া বিঁধিতেছে। ধু-ধু মাঠের উপরে সেই বাড়ি, মেঘনার নীলচে জল, মিলির মুখ—সব চোখের সমুখ দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

অনেক পথ ঘুরিয়া ট্যাক্সিটা যেখানে থামিল তাহারি গায়ে ইম্পিরিয়্যাল রেস্টোরাণ্ট। হোটেলটা দেখিয়া মানবের কি-একটা কথা চট করিয়া মনে পড়িয়া গেল। ক্ষুধাও তাহার পাইয়াছে—কিছু খাইয়া লইতে-লইতে বরং কিছু একটা ঠিক করা যাইবে। ট্যাক্সিটাকে ভাড়া চুকাইয়া বিদায় করিয়া দিল।

বয়কে 'এক পেগ জনি-ওয়াকার অউর এক প্লেট ফাউল-কাটলেট' আনিতে বলিয়া মানব ঘাড়ের ঘাম মুছিল। এই ঠাণ্ডায়ও গায়ে ঘাম দিয়াছে। নিরুৎসাহ হইবার কী আছে? এখুনি চাঙ্গা হইয়া উঠিল বলিয়া। বয় মদের সঙ্গে সোডা মিশাইল। সেই রঙিন মদের দিকে চাহিয়া মানবের ঠোঁটের প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। তাহার চোখের সামনে মিলির হাসিটি যেন টলটল করিতেছে। জীবনে এই দ্রব্য সে কোনো দিন ছোঁয় নাই; ইহারই জন্য বাবা মা-কে পথের ধারে ফেলিয়া গিয়াছেন, সেই স্মৃতি সর্বদা তাহার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিত। আজও ভরতি গ্লাশটার দিকে চাহিয়া তাহার ভয় করিতে লাগিল—ইহাতে চুমুক দিলেই যেন মিলি মা'র মতো অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি গ্লাশটাকে সে দূরে সরাইয়া রাখিল। কাটলেট সাবাড় করিয়া হোটেলের বাহিরে আসিয়া দেখিল রাস্তায় লোক-চলাচল কমিয়া আসিয়াছে। সাড়ে-নটার 'শো' এই ভাঙিবে।

চৌরঙ্গির দিকে সে হাঁটিতে শুরু করিল। কী তাহার দুঃখ যাহা ভুলিবার জন্য অবশেষে সে মদের শরণ নিতে গিয়াছিল! পৃথিবীতে সেই তো পূর্ণতম—সে ভালোবাসিয়াছে ও ভালোবাসা পাইয়াছে। মদের উগ্রতায় মিলির স্নিগ্ধ স্মৃতিটিকে সে বিবর্ণ করিয়া তোলে নাই—ঈশ্বরকে প্রণাম! তিনি যে ঘরের বদলে পথের সাথী দিলেন—মানব ইহার বদলে স্বয়ং ঈশ্বরকেও চায় না।

আমহার্স্ট স্ট্রীটে বিজনদের মেসএ যাইবার জন্য সে একটা বাস হইল। মেস-এর দরজা বন্ধ। অনেক ধাক্কাধাক্কির পরেও কেহ দরজা খোলে না। ডাকা-ডাকিতেও সাড়া নাই। বাকি রাত্রিটা কোথায় কাটানো যায় ইহাই ভাবিয়া মানব হাঁপাইয়া উঠিল। এমন সময় মেসএর দরজায় সশরীরে বিজনই আসিয়া হাজির—বন্ধু-বান্ধব লইয়া পাস-এ থিয়েটার দেখিয়া ফিরিতেছে।

মানবের চেহারা ও পোশাক দেখিয়া বিজন অবাক হইয়া গেলো: তুমি এতো রাতে—এইখানে?

বিজনের হাত ধরিয়া মানব কহিল—তোমার সঙ্গে আমার ভীষণ দরকার আছে। না পেয়ে আরেকটু হলে আমি তো চলে যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেলো।

তাহার সঙ্গে মানবের কী দরকার, বিজন সাত-পাঁচ কিছু ভাবিয়া পাইল না। মানব অন্যের কাছে সাহায্য-প্রার্থী, এই অপমান সে সহিল কী করিয়া? ভিড় হইতে একটু সরাইয়া নিয়া বিজন কহিল—কী দরকার?

—বিশেষ কিছু নয়, আজ রাত্রে তোমার এখানে একটু শুতে পাবো?

—স্বচ্ছন্দে। কিন্তু বাড়ি না গিয়ে আমার মেসএ—নোংরা বিছানায়!

—বাড়িতে আর জাগা নেই।

কথা শুনিয়া বিজন বিস্ময়ে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিতেই মানব হাসিয়া উঠিল। কহিল—একটি শিশু এসে আমাকে স্থানচ্যুত করেছে। বুঝতে পারছ না হাঁদারাম? মিসেস অনুপমা চাটুজ্জে কায়ক্লেশে একটি পুত্র প্রসব করেছেন। অতএব—

বিজন তাহার হাতটা আঁকড়িয়া ধরিয়া কহিল—বলো কি?

মানব স্মিতহাস্যে কহিল—এর চেয়ে বেশি নির্বিকার হয়ে কী করে বলা যায়? আমার চেহারা দেখে কি সত্যিই মনে হয় যে আমার কিছু একটা হয়েছে? জীবনে অনেক যে বেশি লাভ করবে তাকেই অনেক বেশি ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

ইহার মধ্যে অন্যান্য বন্ধুরা কৌশলে মেসএর দরজা খোলাইয়াছে। বাড়িটার

ঐ পাশ দিয়া গিয়া জানলাতে হাত বাড়াইয়া অনুকূলবাবুর মশারির দড়িটা বার-কতক নাড়িলেই এই অসাধ্য-সাধন ঘটে। তিনি তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠেন। জানলা বন্ধ করিলেও নিস্তার নাই। রাস্তায় ঢিল আছে। মেসএর রামেন্দু থিয়েটারের টিকিট-চেক করে বলিয়া অনায়াসেই অনেককে ঢুকাইয়া দিতে পারে—সেই খাতিরেই অনুকূলবাবু এই অত্যাচার সহ্য করেন।

রামেন্দু ডাকিল : আসুন, বিজনবাবু। খুলেছে।

বিজন কহিল—থাক খোলা আমরা এইখানেই আছি। আমি বন্ধ করবো। তারপর মানবের দিকে চাহিয়া : তারপর কী হবে?

মানব সহজ স্বরে কহিল কী আবার হবে! একটু অসুবিধেয় পড়বো। তেমন অসুবিধে পৃথিবীতে কার নেই? কিন্তু সেই কথা আমি ভাবছি না।

—তবে কী?

—আমার বোধকরি জ্বর এসে গেলো।

—তাই নাকি? মানবের কপালে হাত রাখিয়া : সত্যিই তো। চলে এসো ভেতরে।

—তোমার বিছানায় জায়গা হবে তো?

—আগে হতো না বটে, আজ হবে। বাইরে আর দাঁড়ায় না।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া দুইজনে উপরের ঘরে উঠিয়া আসিল। চার কোণে চারটে খাট পাতা—চারজনের একটা করিয়া কেরাসিন-কাঠের টেবিল। ঘরটা জাঁতিয়া আছে। দুই দিকে লম্বা দুইটা দড়ি খাটানো—তাহাতে কাপড়-জামা গাদি করা। চৌকি চারটার মধ্যে গুটি-গুটি হাঁটিবার মতো একটুখানি জায়গা—দরজার কাছে সামান্য যে একটুখানি জায়গা আছে তাহাতে খবরের কাগজ পাতিয়া থিয়েটার-ফেরত লোকগুলি খাইতে বসিয়া গিয়াছে। উপরের ঘরে তাহাদের জন্য ভাত চাপা ছিলো।

রামেন্দু বলিল—বসে পড়ুন, বিজনবাবু।

এঁটো-কাঁটার পাশ কাটাইয়া দুইজনে কোনোরকমে ভিতরে ঢুকিল। সিটটা দেখাইয়া দিয়া বিজন কহিল—শুয়ে পড়ো। আর কথা নেই। শুতে তোমার কষ্ট হবে—এমন কথা আজ আর নাই বললাম।

মানব তখুনি শুইয়া পড়িল। কহিল—একটা কম্বল টম্বল থাকে, গায়ে চাপিয়ে দাও শিগগির।

তিন জনের গায়ে দিবার যাহা কিছু ছিলো মানবের গায়ের উপর স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। কাঁপুনিটা কিছু থামিয়াছে।

তক্তপোশের উপর একপাশে বসিয়া স্বগতোক্তির মতো বিজন কহিল—কী হবে?

মানব চোখ চাহিল: কিসের কি হবে? আমার অসুখের? এর আগে বিছানায় শুয়ে কোনোদিন রোগ ভোগ করেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু তার জন্যে তোমার চিন্তা করতে হবে না।

—সে-জন্যে চিন্তা করছি নাকি?

—তবে কী জন্যে? এর পর আমার কী হবে তাই ভাবছ? তার চেয়ে খেয়ে নিলে কাজ দেবে।

বিজন কহিল—তুমি কি ও-বাড়ি আর ফিরে যাবে না?

ম্লান হাসিয়া মানব কহিল তোমার কী মনে হয়?

—তবে কী করবে?

—তবু তো এবার কিছু একটা করবার কথা মনে হচ্ছে। এতোদিন সবই যেন তৈরী ছিলো—এবার আমার তৈরী করবার পালা। কিন্তু এখন আর নয়, আরেক সময় সব তোমাকে বলবো।

জ্বরের ঘোরে চোখ বুজিয়া মানব দেখিতে পাইল সে যেন মেঘনার উপরে নৌকা করিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ মেঘনা অরব্যসাগর ও নৌকাটা প্রকাণ্ড একটা জাহাজ হইয়া উঠিল। নৌকায় মিলি এতোক্ষণ তার পাশে ছিলো, জাহাজের ভিড়ে তাহাকে আর এখন খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সে তলাইয়া গেল নাকি? মানব কি তবে মিলিকে ফেলিয়া একাই চলিয়াছে?

২১

মানব ভারি হাতেই পড়িল। সকাল বেলার দিকে ছাড়িয়া এগারোটা বাজিতেই জ্বর ফের উঠিতে থাকে। আজ এগারোদিন।

কলাই-করা বাটিতে ঠাকুর কতকগুলি চাকা-চাকা বার্লি দিয়া গিয়াছে। একচুমুকে পরম তৃপ্তিতে মানব তাহা খাইয়া ফেলিল।

বিজন কহিল—কিসের তোমার আপত্তি? একটা খবর পাঠাই?

—না, না—মানব ব্যস্ত হইয়া উঠিল: শুধু শুধু তাকে ব্যস্ত করা। ভাবনা ছাড়া কিছুই সে করতে পারবে না, আর করতে পারবে না ভেবে ভাবনাও তার বাড়তে থাকবে। তাছাড়া এখন হয়তো সে দেওঘরে। কিন্তু আমার একখানাও চিঠি না পেয়ে সে কী ভাবছে!

—আমি তার কথা বলছি নে। বিজন কহিল—সতীশবাবুকে খবর দিতে বলছি।

—কোনো দরকার নেই। কিছুরই তো অভাব দেখছি না। এমন সেবা—টাকাও এখনো সব শেষ হয়নি।

—কিন্তু অসুখটা আর কয়েক দিন চললে তো আর এ দিয়ে চলবে না।

—যার কিছুই নেই অসুখ হলে তার যা ব্যবস্থা, আমারও তাই হবে। না চললে কোনো হাসপাতালে দিয়ে এসো।

সে-কথা কে বলছে? কিন্তু যিনি বিপদে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁকে খবর দিতে দোষ কি?

—তুমি যদি কোনো বড়লোকের বাড়ি গিয়ে হাত পাতো, সে যতোটা দোষ, এ তাই। ভিক্ষা আর আমি করতে পারবো না। মরে গেলেও না।

—এ তোমার বাড়াবাড়ি।

—সব-তাতেই আমার একটা বাড়াবাড়ি চাই। আতিশয্য না হলে আমি বাঁচতে পারি না।

—কিন্তু একটু যদি চালাক হতে তাহলে এই দুর্দশায় পড়তে না।

—অর্থাৎ না উড়িয়ে যদি কিছু হাতাতাম। সে-সঙ্কীর্ণতা আমার ছিলো না। নিজের বিজ্ঞাপন দিতে আজো আমার ভালো লাগে, বিজু।

—কিন্তু এই যুগে আতিশয্য বা আদর্শ—যাই বলো—বিড়ম্বনা। ভাবের চেয়ে বুদ্ধি বড়ো! ভালো হয়ে উঠে টোল-খাওয়া বুদ্ধিটা পিটিয়ে সোজা করে নাও। এখনো সময় আছে!

—যথা?

—বুড়োকে জপিয়ে মোটা একটা টাকা নিজের অ্যাকাউণ্টে ট্রান্সফার করে সোজা বিলেত চলে যাও। বুড়ো যখন রাজীই, তখন তুমি পিছয়ে থাকছ কেন?

—যেতে হলে আমি নিজেই পথ করতে পারবো। এই পথ করবার স্বাধীনতা পেয়েছি এইটেই আমার সব চেয়ে বড়ো লাভ।

—এইটেই তোমার রুগ্ন মনের চরম বিকার। বিয়েতে পণ, আর বিলেত যাবার সুবিধে পেলে বিলেত—প্রত্যেক ইয়ং-ম্যানএর এই কাম্য হওয়া উচিত—যদি সে মানুষ হতে চায়। তারপর বিলেত থেকে ঘুরে আসতে পারলে কনেরাও পিলপিল করে আসতে থাকবে—নইলে তোমার মিলিও দেখবে কোন দিন মিলিয়ে গেছেন।

মানব ম্লান একটু হাসিল। মি আর লি—এই দুইটি পাখায় ভর করিয়া একটি

অনুভূতি সমস্ত আকাশ দেখিতে-দেখিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিজন মিলিকে দেখে নাই, তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই—তাই সে তাহাকে সমস্ত নারীজাতির সঙ্গে এক পঙক্তিতে মিলাইয়া অনুদার মন্তব্য করিল। সে তো জানে না—মানব যাহাকে ভালোবাসিয়াছে সে আলাদা, সে একান্ত বিশেষ, সে একাকী। সে মানবের নিজের সৃষ্টি—কবির কবিতার মতো!

দুই সপ্তাহ্ পরে জ্বরটা ছাড়িয়া গেলো।

পরদিন কোনোরকমে সে রাস্তার দিকের বারান্দায় আসিয়া হাজির হইল। বিজন তাড়াতাড়ি একটা লোহার চেয়ার আগাইয়া দিল। কহিল—কি পথ্য করবে জেনে আসতে যাচ্ছি।

—এ আবার জানতে যাবে কি? দু-মুঠো ভাত খাবো।

—তাই বইকি। তারপর আবার চিৎ হয়ে পড়ো।

মানবের সঙ্গে নূতন করিয়া আজ পৃথিবীর পরিচয় ঘটিল। সে এতোদিন সকলের থেকে দূরে সরিয়া ছিলো, আজ জনতার মাঝে তাহার স্থান—নিপীড়িতের সঙ্গে তাহার বন্ধুতা, দুঃখের সে পতাকাবাহী। নিজের চারদিকে সে যেন একটা অবাধ বিস্তার অনুভব করিতেছে—নিজেকে প্রসারিত করিবার প্রেরণা। এমন দিন তাহার জীবনে যে আসিবে ইহা সে জানিত; তাই আঘাতও যেমন অপ্রত্যাশিত নয়, রোমাঞ্চও তেমনি ক্ষণস্থায়ী। তবে তাহার মিলি আছে, অন্যের যাহা নাই—জীবনে এইটুকু তার আভিজাত্য।

মেঘনার পাড়ে কলাগাছের বেড়া-ঘেরা সেই ঘর তাহার দিকে নির্নিমেষ চোখে চাহিয়া থাকে। সে চাষ করিবে আর মিলি নিড়াইবে মাটি।

বিজন ফিরিয়া আসিয়া কহিল—পথ্যগুলো আজকে একটু প্রমোশান পেয়েছে। পাউরুটির শাঁস আর দুধ—

—যথেষ্ট; সবাই মিলে অত্যাচারী হয়ে উঠলে আমি পারবো কী করে? কই আমায় এক দিনে চাঙ্গা করে দেবে—আমি হাওয়া বদলাতে দেওঘর যাবো—তা না, আমাকে খালি বিছানায় শুইয়ে রাখবার ষড়যন্ত্র!

—দেওঘর যাবে নাকি? গিয়ে তাকে বলবে—দাও ঘর!

বিজন হাসিয়া উঠিল। তারপর টিপ্পনি কাটিয়া কহিল—প্রবল জ্বরের সময় পুরুষের প্রবল হাতের সেবা পেলে চলে যায়, কিন্তু কনভ্যালাসেন্ট অবস্থায় কোমল হস্তের পরশ চাই। এই তো দিব্যি তুমি চালাক হয়ে উঠছ।

—উঠছি না কি?

—তবে বেশি চালাক হতে গিয়ে যেন বিয়ে করে বোসো না।

না, মিলির কথামতো উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ সে দীর্ঘতর করিয়া তুলিবে। মিলির জন্য নূতন করিয়া সে নিজেকে উদঘাটিত করিবে। আগে সে ছিলো নিতান্ত পরাধীন, এই দৈন্যের মহিমায় এখন সে বেশি উজ্জ্বল!

মানব কহিল—কিন্তু টাকা-পয়সা সব ফুরিয়ে গেলো, বিজু।

মানবের মুখে কথাটা কেমন অদ্ভুত শোনায়।

—সতীশবাবুর কাছ থেকে ভরতি করে আনলেই হয়।

সেই কথা কানে না তুলিয়া মানব বলিল—দেওঘরে নিশ্চয়ই এখন শীত পড়ে গেছে। কিছু জামা-কাপড়ও কিনতে হবে। শেষকালে থার্ড-ক্লাশের ভাড়া কুলুলে হয়। কতো ভাড়া জানো? এতদিন তো তোমার জিনিসপত্র দিয়ে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দিলাম। কিন্তু নিজে তো একটা পথ দেখতে হবে।

—এখন দয়া করে বিছানায় শুয়ে-শুয়েই পথ দেখ।

মানব বিছানায় আসিয়া শুইল।

পথ বাহিয়া অগণিত মানুষের মিছিল চলিয়াছে। তাহাদের পায়ের সঙ্গে মানবও মনে-মনে পা মিলাইয়া চলিতে লাগিল।

২২

দিল্লী-এক্স্‌প্রেস্‌এ দেওঘর সে যাইতেছে বটে, কিন্তু মানবের কেবলই মনে হইতেছে, সে—কি না সেই নাম—নোয়াখালি চলিয়াছে। সেখানকার জীবনের প্রশান্ত নিস্তব্ধতার সঙ্গে মিলির কোথায় একটি মিল আছে, ছবিতে বিশেষ একটি রঙের সঙ্গে বিশেষ রঙের অপূর্ব মিলের মতো। সেইখানেই সে থাকিবে—পশ্চিমে ধানের ক্ষেত, দক্ষিণে নরম চর, পূবে শহরের দিকে রাস্তার একটি ক্ষীণ সূচনা। সেইখানে সে ঠিক যে কী করিবে এখুনি তাহা ভাবিয়া পায় না—ভাবিবার দরকারও নাই। নিজের ভিটে ছাড়িয়া সে কোথায় কোন পরের বাড়িতে গিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল; সেই বাড়িতেও তাহার স্থান হইল না—তাহারই নিজের বাড়ি আবার চারিদিকের সবগুলি জানালা মেলিয়া দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটায় সে এখন অত্যন্ত মজা পাইতেছে।

চলিয়াছে থার্ড-ক্লাশে। সঙ্গে সতরঞ্চি ও কম্বলে জড়ানো দুইটা বালিশ ও একটা টাইম-টেবল। চলিবার সময় সঙ্গে টাইম-টেবল রাখাটা তার একটা

ফ্যাশান ছিলো—লিলুয়া যাইতে হইলেও তাহা হাতছাড়া হইত না। পুরানো দিনের সেই অভ্যাসটি এখনো রহিয়া গিয়াছে।

দেওঘরে এই সে প্রথম চলিয়াছে। কোথায় গিয়া উঠিবে ঠিক নাই। মিলিদের বাড়ি খুঁজিয়া না পাইলে ধর্মশালায় রাতটা কোনোরকমে কাটানো যাইবে হয়তো। 'রোহিণী'র দিকে সোজা দক্ষিণে যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে তাহারই গায়ে তাহার ছোট-কাকার বাড়ি—মিলি তাহাকে এই কথাটুকু শুধু বলিয়া দিয়াছিল। এই সম্পর্কে ভাঙা-ভাঙা আরো দুয়েকটা কী কথা বলিয়াছিল মানব তাহাতে কান দেয় নাই। কিন্তু তাহার ছোট-কাকা কী করেন, কী বা তাঁহার নাম, 'রোহিণী'ই বা কোথায়—কে খবর রাখে।

বৈদ্যনাথধামে গাড়ি পৌঁছিল প্রায় সন্ধ্যায়।

হয়তো মিলি সঙ্গীর অভাবে একা-একা স্টেশনেই বেড়াইতে আসিয়াছে। নূতন কোন কোন যাত্রী আসিল বা পরিচিত কেহ আসিল কিনা স্টেশনে আসিয়া তাহার খোঁজ নিতে মিলির ভালো লাগা উচিত। তাহা ছাড়া তাহার যে-কোনো দিনই আসিবার কথা।

ব্যাপারটা খুব সহজ হইল না। স্টেশনেরই কাছে ধর্মশালা একটা আছে বটে, কিন্তু তাহার ভিতরের চেহারা দেখিয়া মানবের সমস্ত কবিত্ব শুকাইয়া গেল। কিন্তু তাহা ছাড়া গতিই বা কোথায়? ফিরতি ট্রেণ? তারপর?

উপরের তলাটা বোঝাই—নিচের তলায় রাস্তার উল্টা দিকে একখানা ঘর জুটিল। এই সব খেলো বিলাসিতা লইয়া মানবের আর স্পৃহা নাই; মিলির দেখা পাইলেই সে বাঁচে। ঘরটা খোলা রাখিয়াই সে বাহির হইয়া যাইতেছিল; দারোয়ান বলিল—একটা তালা লাগিয়ে যান।

মানব কহিল—একখানা কম্বল মাত্র আছে। কেউ নেবে না।

—না, না, ঘরটাও বেহাত হয়ে যেতে পারে। এ সময় ভারি ভিড়।

—আচ্ছা, একটা কিনে নিয়ে আসছি। ততোক্ষণ তুমি একটু চোখ রাখো—

রাস্তায় পড়িয়াই একজন ভদ্রলোককে মানব জিজ্ঞাসা করিল—'রোহিণী' কোথায় বলতে পারেন।

প্রশ্ন শুনিয়া ভদ্রলোক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন—রোহিণী? সে তো বঙ্কিমবাবুর বইয়ে।

যাহাকে জিজ্ঞাসা করে কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। যিনি মন্দিরের চূড়ার দিকে হাত দেখান, তাঁহারই সঙ্গী হাত দেখান উল্টা দিকে। দেখিতে-দেখিতে রাত হইয়া আসিবে। মনে পড়িল কাল কলকাতায় সে চাঁদ দেখিয়াছে।

কথাটা মনে করিয়া সে একটু খুশি হইল। আরো খানিকটা খোঁজা যাইবে। জ্যোৎস্না পাইয়া সবাই হয়তো এখুনি ঘর নিবে না। চাই কি, চোখের সামনে পথেরই উপর তাহার সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে।

আবোল-তাবোল হাঁটিতে লাগিল। বাঁ-দিকের রাস্তাটায় শাদা পাথরের কুচো ছড়ানো আছে—অতএব ঐপথে রোহিণী, কিংবা ঐ উঁচু বাঁধটার পারে নির্জন মাঠের মধ্যে ঐ যে একখানি বাড়ি দেখা যায় কে জানে তাহারই এক কোঠায় মিলি এখন হাতির দাঁতের চিরুনি দিয়া চুল আঁচড়াইতেছে না।

সোজা চলিতে-চলিতে মানব হঠাৎ থামিয়া পড়িল। তিন দিকে তিনটা রাস্তা। কোনটা সুন্দর বা মিলির পক্ষে বেড়াইবার উপযুক্ত মনে-মনে তাহাই সে বাছিতে লাগিল। হঠাৎ চোখে পড়িল রাস্তার ধারে একটা পোস্টে লেখা আছে—টু রোহিণী।

বাঁয়ের রাস্তা।

রাস্তা যেমন ফুরায় না—বাড়িও তেমনি মাত্র একখানা নয়। কোনো বাড়িই মানবের মনের মতো হয় না। এইবার সোজা সে রাস্তাটায় টহল দিয়া আসুক, ফিরিবার সময় একটা-একটা করিয়া বাড়িগুলিতে ঢুকিয়া-ঢুকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিবে—হ্যাঁ, কী-ই বা জিজ্ঞাসা করিবে? গৃহস্বামীর নাম পর্যন্ত জানে না। জিজ্ঞাসা করিবে মিলির ছোট-কাকা এখানে থাকেন? রোগা শরীরে মার সে সহ্য করিতে পারিবে না।

নিজের মনে হাসিয়া সে আস্তে-আস্তে হাঁটিতে লাগিল। এখানে দস্তুর-মতো শীত। কম্বলটা গায়ে দিয়া বাহির হইলেই হইত! সন্ন্যাসী সাজিবার আর বাকী কী! যাই হোক, ফিরিবার পথে স্বয়ং মিলিরই সঙ্গে দেখা হইবে—ততোক্ষণ তাহার বেড়ানো শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই সামনে আগাইবার সময় বারে-বারে সে পিছনে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল সত্যসত্যই মিলি কোনো বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল কি না।

এটা কার বাড়ি? মানব থামিয়া পড়িল। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? কী-ই বা দরকার—সামনে গিয়া সোজা মিলি বলিয়া ডাকিলেই—ব্যস্। তাহার পর হাত ধরাধরি করিয়া—রাস্তাটা তো নির্জনই আছে—দুইজনে দক্ষিণে আরো বেড়াইয়া আসিবে—কিম্বা ঐ যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া পাহাড় একটা স্তূপ হইয়া পড়িয়া আছে—সেখানে। আজই অবশ্য তাহার দুঃখের কথা বলা হইবে না। তাহার দুঃখের কথা। মানব নিজের মনেই হাসিল।

সে স্পষ্ট মিলির গলা শুনিল—কি-একটা কথায় সে আর কাহার সঙ্গে

একত্রে হাসিয়া উঠিল। হ্যাঁ, ঐ বাড়িটাতেই। কিন্তু কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহস্বামীর নামটা জানিতে পারিলেই সে আর কিছু চায় না। যাক, একটা লোক হাতে একটা টর্চ লইয়া সাইকেলে করিয়া এই দিকে আসিতেছে। লোকটা কাছে আসিয়া পড়িতেই মানব জিজ্ঞাসা করিল—ওটা কার বাড়ি বলতে পারেন? এই যে সামনে বড় বাড়িটা।

—ডাক-বাংলো! হ্যাঁ, এইবার মানবের মনে পড়িয়াছে! মিলি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছিল ডাক-বাংলোর পাশেই তাহার ছোট-কাকার বাসা। তবে— ঐ বাড়িটা। মানব বিশেষ খুশি হইতে পারিল না। ছোট একতলা বাড়ি—সামনে বাগান নাই একটুও, ছাতে বাঁশ খাটাইয়া দড়িতে কখন কাপড় শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে — রাত্রেও ঘরে নিবার নাম নাই। চারিদিকে কেমন যেন অপরিচ্ছন্নতা। মিলিকে এই বাড়িতে মানাইবে না।

তবুও সে সেই দিকেই পা চালাইল। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসিয়া ওয়াল-ল্যাম্পের আলোতে একজন ভদ্রলোক মুখ ঢাকিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। মানব সিঁড়ির কাছে আসিতেই ভদ্রলোক জুতার শব্দে মুখ তুলিয়া কহিলেন—কে?

মানব থমকিয়া গেল। মুখ দিয়া বাহির হইল—আমি।

চেয়ারে সোজা হইয়া ভদ্রলোক কহিলেন—কী চান?

এক পা সিঁড়িতে এক পা মাটিতে—মানব বলিল—মিলি এখানে আছে?

—মিলি? কে মিলি? ভালো নাম কী?

ভদ্রলোক তাহার মুখে উত্তর না পাইয়া আবার কহিলেন—ভালো নাম জানেন না? কয় বছরের খুকি?

—ঠিক খুকি কি?

—আপনিই বলতে পারবেন। মেয়ে কার? কোথায় আছে?

—মেয়ে নোয়াখালির হীরালালবাবুর। এখানে আছে কিনা—তাই তো জিগগেস করছি।

—এমনি জিগগেস করতে-করতে কদ্দুর যাবেন?

মানবও ঠেস দিয়া উত্তর দিল: এখেনে ওর দেখা পেয়ে গেলে আর যাবো কেন? এখানেই থেকে যাবো।

—বটে? ভদ্রলোক চেয়ার নড়িয়া বসিলেন: আপনি আছেন কোথায়?

—ধরুন না, আপাততো এখেনে এসেই উঠছি।

— আপনার নাম?

—তাতে আপনার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। মিলি যদি এখানে থাকে ও এখন বাড়িতে থাকে, দয়া করে তাকে একটিবার ডেকে দিন। মানবের আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করিয়া একটি শ্লেষের সুরে ভদ্রলোক কহিলেন—আপনার সঙ্গে মিলি না ফিলির কোনো আত্মীয়তা আছে?

—আছে বৈ কি।

—কী আত্মীয়তা?

—সে-কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। বললেই বা আপনি বুঝবেন কেন?

—ও একই কথা। ভদ্রলোক কহিলেন—কদ্দিনের আলাপ?

—অতো কথা জানবার আপনার কী দরকার? মানব এইবার দস্তুরমতো চটিতেছে: মিলি যদি এইখেনে থাকে তো ডেকে দিন। আমার কাজ আছে। আপনার সঙ্গে অনর্থক বকবার সময় নেই।

—নেই নাকি? সরি, আমি তা জানতাম না। নমস্কার। ভদ্রলোক হাত তুলিলেন।

—মিলি তবে এইখেনে নেই?

—আমি তা বলেছি? আপনার সময় না থাকলে কী করা যেতে পারে বলুন। সময় যদি থাকে তো রাস্তায় পাইচারি করতে থাকুন, দেখা হয়ে যেতে পারে। এখনো বেড়িয়ে সে ফেরেনি।

—তাহলে এই বাড়িতেই সে আছে? কবে এসেছে? কোথায় গেছে বেড়াতে?

—অতো কথা জানবার আপনার কী দরকার? আপনার সঙ্গে অনর্থক বকবার আমার সময় নেই। বলিয়া ভদ্রলোক কাগজ তুলিয়া ফের মুখ ঢাকিলেন।

২৩

ত্রিকূট হইতে মিলিরা সন্ধ্যার খানিক পরেই বাড়ি ফিরিয়াছে। বাড়ি আসিয়াই হাত-পা ছড়াইয়া সটান বিছানায়। কাকিমা আবার চা খাইতে ডাকিতেছেন—মিলির এ তৃতীয় কাপ।

সুবিনয় ঘরে ঢুকিয়া কহিল—আমার বোধ করি সপ্ততিতম।

মিলি আড়মোড়া ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল। আড়মোড়া ভাঙিতে-ভাঙিতে: আমার যা ব্যথা করছে, কাকিমা। জ্বরে না পড়ি। পা দুটোয় তো ফ্ল্যানেল

জড়াতে হবে। হাতের তালু দুটো ছড়ে গিয়ে কিছু আর নেই। ঈষৎ কান্নার স্বরে: আমার কী হবে?

কাকিমা গম্ভীর হইয়া কহিলেন—কী আবার! ঘুম।

চায়ে চুমুক দিয়া সুবিনয় কহিল—আমাদের সঙ্গে বাঁধা সিঁড়ি ধরে সোজা নেমে এলেই পারতেন। মিছিমিছি ঘুর-পথে বাহাদুরি করতে গিয়ে কী লাভ হলো?

—যে-পথই নিজে বেছে নিই না কেন, অন্যের চোখে তো তা ঘুর-পথ বলেই মনে হবে।

—কিন্তু লাভ হলো কী? জখম হয়ে আইডিন লাগানো।

—অন্যের চোখে তো জখমটাই বড়ো বলে মনে হবে। কিন্তু বিপদের মুখে একা যাওয়াটা তো আর দেখবেন না।

সুবিনয় হাসিয়া কহিল—মেয়েরা একা যখন এমনি-একটা কিছু অসমসাহসিক কাজ করবার জন্য এগোয় তখন শেষও হয় এমনি প্রহসনে।

কাকিমা বাধা দিয়া কহিলেন—খবরদার, আর তর্ক নয়। শুনে-শুনে কান দুটো আমার ঝালাপালা হয়ে গেলো।

সুবিনয় কহিল—আর মাত্র দু-চুমুক, দিদি। চা ফুরিয়ে গেলে তর্কও জুড়িয়ে যাবে। মেয়েদের সঙ্গে তর্ক আবার কতোক্ষণ করতে হয়? মিলি ভুরু কুঁচকাইয়া কহিল—মেয়েদের নিন্দে করাটা বুঝি আজকালকার ছেলেদের ফ্যাশান?

—এবং—সুবিনয় বিনীত হইয়াই কহিল—নিন্দেটাও আজকালকার মেয়েদেরই। এবং নিন্দে শুনে দুঃখিত হওয়াটাও মেয়েলি।

মিলির কাকিমা অর্থাৎ সুবিনয়ের দিদি সুরমা কহিলেন—আমি কিন্তু চা আর করে দিতে পারবো না তোর দু-চুমুক—

—এই শেষ হলো। কিন্তু উনি যখন সত্যিই অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন তখন আমারও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা উচিত। অর্থাৎ—

—অর্থাৎ তোরও পিঠটা ছড়ে গেছে।

—কী করে বুঝলে বলো তো? আশ্চর্য।

—গেছে তো? দিদি হাসিয়া উঠিলেন।

মিলিও হাসিল।

—তবে ভালো করেই হাসুন। বলিয়া সুবিনয় গা থেকে র‍্যাপারটা খুলিয়া ফেলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সিল্কের জামাটা মেরুদণ্ডের কাছে সোজা ছিঁড়িয়া দুই দিকে আলাদা হইয়া গেছে।

ঠিক এমনি সময় এদিকে ছোটকাকার পায়ের শব্দ আসিতেছে। সুবিনয় ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি গায়ে টানিয়া কহিল—আমি পালাই। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলেই জামাইবাবুর গোঁফজোড়া ঘনিয়ে ওঠে। সুরমা হাসিতেই সুবিনয় কহিল—গৌরবে 'মেয়েদের'।

ছোটকাকা ভিতরে আসিয়াই মিলিকে কহিলেন—তোকে কে যেন ডাকতে এসেছিল—

মিলি লাফাইয়া উঠিল: বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? ভেতরে আসতে বলো।

—ভেতরে আসতে বলবো কী! ছোটকাকা একটা চোখকে ঈষৎ ট্যারা করিয়া কহিলেন। তার পর রুক্ষস্বরে: তাকে আমি ভাগিয়ে দিয়েছি।

সুরমা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন—ভদ্রলোককে তুমি ভাগিয়ে দিলে? বলো কী?

—ভদ্রলোক না আর কিছু! একমাথা চুল, গায়ে করে রাস্তার সমস্ত ধুলো তুলে এনেছে। জেলের ছাড়া-পাওয়া কয়েদীর মতো চেহারা। নাম জিগগেস করলুম, নাম বলবেন না; মিলির সঙ্গে কোথায় তার পরিচয় কোনো-কিছুর হিসেব নেই। আর কী সব ত্যাড়া কথা! মুখের ওপর যেন জোরে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলো: মিলি এখানে আছে? আমি বলে সিম্‌পলি চলে যেতে বললাম, অন্য লোক হলে ঘাড় ধরে বিদেয় করতো। —ইঃ? সুরমা ঘাড় বাঁকাইয়া কহিলেন—ঘাড় ধরতেন! উল্‌টে তোমাকেই মারতো ঘুঁষি।

—এই রোগা জিরজিরে চেহারা। নরেশবাবু আঙুলটা বার কয়েক নাড়িলেন: কতোদিন যেন খেতে পায়নি। গা থেকে খোট্টাই একটা গন্ধ বেরুচ্ছে।

মিলি এতোক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল। এইবার নিশ্বাস ফেলিয়া সে বাঁচিল। এমন বর্ণনার সঙ্গে সে কাহাকেও মিলাইতে পারিল না—আর কেই বা আছে। রোগা জিরজিরে—সারা গায়ে ধুলা—মানব যে আসিয়া ফিরিয়া যায় নাই ইহাতেই সে বাঁচিয়াছে।

সুরমা কহিলেন—চিনিস নাকি এমন কাউকে?

আরেকবার নিজের মনের মধ্যে দৃষ্টি ডুবাইয়া মিলি কহিল—ককখনো না। নরেশবাবু বলিলেন—যার তার সঙ্গেই বন্ধুতা পাতিয়ে বসিস নাকি?

—বা, কার আবার বন্ধু হলাম?

সুবিনয় টিপ্পনি না কাটিয়া পারিল না: কলেজের বাসএ যেতে দেখে থাকবে। এইখেনে একটু য্যাডভেঞ্চার করতে এসেছিল। আপনার শরীরে কুলুবে না বুঝলে আমাকেও তো ডাকতে পারতেন।

সুবিনয়ের কথায় বিরক্ত হইলেও মিলিকে সায় দিতে হইল : কে না কে, কোত্থেকে এসেছে। অমন লোকের সঙ্গে আলাপ করতে যাবো কেন?

—কোন দুঃখে? সুবিনয়ই কথা কহিল—আমার সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিলে পারতেন।

সুরমা কহিলেন—তা হলে আমরা একটা ডুয়েল দেখতে পেতাম।

—যাও, যাও। বাজে বোকো না। নরেশবাবু সুবিনয়ের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাহিলেন : তোমার ডুমকায় যাওয়া কী হলো? ছুটি আর কদ্দিন?

—এই রে? মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে সুবিনয় কহিল—কোর্ট খুলতে এখনো দু-চার দিন বাকি আছে। ডুমকা কাল যাবো ভাবছি।

—ভাবছি নয়। কালই চলে যাও।

সুরমা হাসিয়া কহিলেন—তুমি হাকিমকে হুকুম করছ কী?

—না, না, এখনো হুজুর হতে পারিনি দিদি, মাত্র ট্রেজারিতে বসে দুটো দস্তখৎ করে খালাস।

নরেশবাবু কহিলেন—রাত্রে ডুমকার বাস পাওয়া যায়?

—ওকে আজই তাড়াচ্ছ কী! সুরমা কহিলেন—দেখছ না ও যাচ্ছে শুনে আরেকজন আগেই অদৃশ্য হয়েছে।

—কী বলো যা তা। মিলি কোথায় গেলো? মিলি!

বারান্দা থেকে জবাব আসিল : এই যে।

রাস্তায় কাহাকেও দেখা গেলো না! কে আসিয়াছিল? কে আসিতে পারে? কলিকাতায় গিয়ে অবধি একখানিও চিঠি লেখে নাই। একখানি চিঠি পাইবার আশায় মনে-মনে সে অবহেলিতা পল্লী-স্ত্রীর মতো গুমরিয়া মরিতেছিল। রাজধানীর বিপুল অরণ্য-মর্মরের মাঝে তাহার এই ক্ষীণ নিশ্বাসটি আর শোনা যায় নাই।

অণিমাদের সেই সতর্ক-বাণীই তাহাকে বারে-বারে শাসাইতেছিল।

কিন্তু তাহাকে মিলি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে! তাহার নাম মিলি—এ আর কে জানে, কার কাছ থেকে শুনিয়াছে—

রোগা জিরজিরে চেহারা। এক গা ধুলো। চেহারা ঠিক জেলফেরত কয়েদীর মতো।

হয়তো নিজে না আসিয়া তাহার খোঁজ নিতে আর-কাহাকেও পাঠাইয়া দিয়া থাকিবে। অসীম দয়া। বেশ হইয়াছে, ফিরিয়া গিয়াছে। নিজে যখন আসিতেই পারিল না, তখন দূত পাঠাইবার কী হইয়াছিল!

দেওঘরে আসিয়াও মিলির শান্তি নাই। যে তাহাকে ভুলিয়াছে, সেও তাহাকে স্বচ্ছন্দে ভুলিয়া যাইতে দিবে—তাহারই চিঠি লিখিবার এমন কী দায় পড়িয়াছে! তাহাকে যদি সে না চায়, তাহারই বা গলায় ভাতের গ্রাস ঠেকিয়া থাকিবে নাকি? এই মনে করিয়াই সে শোভাদিকে তাহাদের হসটেলে একটা সিট রাখিতে লিখিয়া দিয়াছে! এতোদিন অনর্থক সময় কাটাইয়াছে ভাবিয়া অতি দুঃখে সে দেওঘরে আসিয়াই তাহার পাঠ্যপুস্তক খুলিয়া বসিয়াছিল।

কিন্তু উৎপাত জুটিল সুবিনয়। ব্যাগি প্যান্টালুন আর ফেল্ট হ্যাটের জ্বালায় অস্থির! জামাটা কখনোই অতোখানি ছিঁড়ে নাই, বাকিটা সে হাত দিয়া ছিঁড়িয়াছে! সস্তা একটু বাহাদুরি করিতে মাত্র। তাহার বড়োলোকির মাঝে কোথায় একটা উৎকট নির্লজ্জতা আছে, ঐশ্বর্য নাই। সুবিনয়কে সে দু-চক্ষে দেখিতে পারে না। কাকিমার ভাই ও নেহাত বি. সি. এসএ ফার্স্ট হইয়া নূতন ডেপুটি হইয়াছে বলিয়া যা-একটু সমীহ করিতে হয়।

কে যে আসিয়াছিল শুইয়া-শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। ঘুমের মধ্যে তাহার কোনো কূল-কিনারা পাওয়া গেল না!

কাকিমা ভোরে উঠিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলেন: কালী-মন্দির দেখে আসি চলো।

এতো সকালেই কাকিমার ভক্তি উথলিয়া উঠিতে দেখিয়া মিলি বিশেষ ভরসা পাইল না। তবু চোখে-মুখে জল দিয়া শাড়িটা তাড়াতাড়ি বদলাইয়া লইল।

যা কথা—সঙ্গে সেই সুবিনয় জুটিয়াছে।

নরেশবাবু মশারি থেকে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—তোমরা একেবারে ধর্ম দেখালে। খুঁটি-ছাড়া পেয়ে খুব ল্যাজ তুলেছ দেখছি।

সবাই ভয়ে নিঃশব্দে একটু হাসিয়া গুটি-গুটি বাহির হইয়া গেল।

সুবিনয় কহিল—তোমরা স্বাধীন হতে গিয়ে একেবারে টেক্কা দিলে যা-হোক। এমন জলজ্যান্ত বাবা বৈদ্যনাথ থাকতে কোথাকার কে না-কোন কালী দেখতে ছুটেছে।

সুরমা মিলির কনুইয়ে একটা ঠেলা দিয়া কহিলেন লেগে যাবি নাকি তর্ক করতে?

সুবিনয় হাসিয়া কহিল—এক পেয়ালা চা-ও উদরস্থ হয়নি যে।

একটিও কথা না কহিয়া মিলি হাঁটিতে থাকে। ছড়ি দিয়া সুবিনয় অগত্যা ধানের শীষগুলিকে মারিতে-মারিতে অগ্রসর হয়।

ফিরিবার সময় মিলি সবাইর আগে-আগে। পিঠের আঁচলটা নৌকার পালের মতো ফুলিয়া উঠিয়াছে।

সুরমা ডাকিলেন—আস্তে মিলি।

সুবিনয় টিপ্পনি কাটিবেই : গিয়েই একেবারে গরম জল চাপিয়ে দিন।

রাস্তার উপর মিলি যেন কাহাকে দেখিয়াছে। সেও তাহাকে দেখিবার জন্য থামিয়া আছে। না, মানব নয়। পিছনটা দেখিয়া তাহাই মনে হইতেছিল বটে।

কিন্তু লোকটা যে তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

মানবই তো। এ কী চেহারা!

কাকিমা ও তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতা তখনো কিছু পিছে।

মিলি আঁক করিয়া হটিয়া গেল : এ তোমার কী চেহারা হয়ে গেছে?

অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ স্বরে মানব কহিল—খুব অসুখ করেছিল।

মানবের দিকে ভালো করিয়া তাকানো যায় না : কিন্তু এ কী পোশাক? মানবের ঠোঁটে একটুখানি শুকনো হাসি ভাসিয়া উঠিল : সে প্রকাণ্ড ইতিহাস। তুমি আমার সঙ্গে এই দিকে একটু আসবে?

মিলি যেন অপ্রস্তুত হইয়াছে এমনি করিয়া কহিল—কিন্তু আমার সঙ্গে যে কাকিমা আছেন। শুধু কাকিমা নয়—মানব চাহিয়া দেখিল—আরেকজন।

মিলির কথা তখনো শেষ হয় নাই : তুমি আছো কোথায়? এখেনে ভালো হোটেল আছে তো?

—জানি না। আছি ধর্মশালায়।

—ধর্মশালায় কেন?

—সেই কথাই তো বলবো। চলো না একটু।

—তুমিই বুঝি কাল আমাকে খুঁজতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। রাত্রে তুমি কতোক্ষণ পর্যন্ত বেড়াও?

—না, কাল তো আমি বাড়িতেই ছিলাম। কাকা ভীষণ কড়া—আচ্ছা, তুমি এক কাজ করো। কাল দুপুরে এসো, এই একটায়—ঐ জসিডির রাস্তার মোড়ে। চেনো তো? কালকেই সব কথা হবে। কাকিমারা এসে পড়লেন। এখন বেশ ভালো আছো তো?

'কাকিমারা এসে পড়লেন'—ইঙ্গিতটা মানব বুঝিয়াছে। তবু কালও একবার সে আসিবে।

মানব মাঠ দিয়া নামিয়া গেল।

সুবিনয় টিপ্পনি কাটিবেই : আপনার বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায়ই দেখা হয়ে গেলো যা হোক। বন্ধুর অধ্যবসায় আছে।

মিলি তাহার কথায় জলিয়া উঠিল : আমার আবার বন্ধু কে। নন্দন পাহাড়ের রাস্তা জানতে চাইলে, দেখিয়ে দিলাম।

সুবিনয় হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, ঐ মাঠ দিয়েও যাওয়া যায় বটে।

২৪

মিলি পা টিপিয়া-টিপিয়া নরেশবাবুর ঘর পার হইল। রাস্তায় নামিয়া কোনো দিকে আর দিক্‌পাত নাই।

কাকিমাকে সে বলিয়া আসিয়াছে বটে যে বীণাপাণিদের বাড়ি সে বেড়াইতে চলিল। বীণা তাহার কলেজের চেনা—এই পাড়াতেই থাকে, দুই পা আগে। এও সে বলিয়াছিল যে বীণাদের সঙ্গে সে তপোবন দেখিয়া আসিবে, ফিরিতে রাত হইলে যেন চাকরদের হাতে লণ্ঠন দিয়া এখানে-সেখানে খুঁজিতে না পাঠায়। কাকিমা বলিলেন : না, না, চারটের আগেই ফিরে আসিস যেন। বিকেলে উনি সবাইকে নিয়ে রিখিয়া বেড়াতে যাবেন বলেছেন, তখন তোকে না পেলে চটে-মটে কাঁই হয়ে যাবেন। দেখিস।

এখন না-জানি কটা? সুবিনয় যে হুইসট খেলিতে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে ইহাতে সে ভারি আরাম পাইল।

কাল তাহার সঙ্গে ভালো করিয়া কথা বলা পর্যন্ত হয় নাই। ধর্মশালায় আসিয়া উঠিয়াছে। চুলগুলি না-হয় অসুখের জন্য ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু তাই বলিয়া জামা-কাপড়ে অসম্ভব ময়লা লাগিয়া থাকিবে! এই বোধহয় একরকম ফ্যাশান। কে জানে?

রোহিণীর রাস্তা যেখানে ট্রেনের লাইন কাটিয়া গিয়াছে—তাহারই ধারে মানব মিলির প্রতীক্ষা করিতেছিল। মানব লাইনের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—মিলি আসিতেছে পিছনে। কাছাকাছি আসিতেই পদক্ষেপগুলি মিলি ছোট ও মন্থর করিয়া ফেলিল। একেবারে মানবের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিল —কালকে আমার ওপর চটোনি তো?

সেই মিলি! আজও কিনা তাহার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়।

মানবের যেন কিছুই হয় নাই, সেই আগের মতোই হাসিয়া বলে : চটেছি আজকে। কতোক্ষণ আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ জানো?

—কিন্তু কী করে আসি বলো? যে কড়া পাহারা। আমাকে আবার চারটের আগেই ফিরতে হবে। এখন কটা? আন্দাজ?

—ছুটো হবে।

—কী রোদ! কোথাও যাই চলো।

মানব কহিল—চলো দারোয়া নদীর কাছে। জসিডি যাবার ব্রিজ-এর ওপর।

উৎকট কবিত্ব। ধুলো উড়িয়ে মোটর ছুটেছে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে; তার চেয়ে একটা ট্যাক্সি নাও। মন্দিরের দিকে খানিকটা এগোলেই মিলে যাবেখন। চলো, রিখিয়া ঘুরে আসি।

—কিন্তু পয়সা কই?

অবাক হইয়া মিলি মানবের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মানব হাসিয়া কহিল—ফিরে যাবার মাত্র ট্রেন-ভাড়া আছে। বিশ্বাস করবার কথা নয়, কিন্তু পয়সা কোত্থেকে পাবো বলো।

—জানি না। ট্যাক্সি একটা যোগাড় করো শিগগির।

তাহলে পা চালিয়ে একটু হাঁটো। ঐ চূড়ো দেখা যাচ্ছে মন্দিরের; অতোদূর অবিশ্যি হাঁটতে হবে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী দেখছ?

মিলি নিঃশব্দে হাঁটিতে লাগিল।

মানব কহিল—কথা কইছ না কেন?

—একটা খবর পর্যন্ত দিলে না! অসুখ করলো বলেই তো বেশি করে খবর দেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু এ তোমার কী দুর্দশা হয়েছে?

—বলছি।

কতোদূর আসিতেই খালি একটা ট্যাক্সি মিলিল।

মিলি পা-দানিতে পা রাখিয়া কুঁজো হইয়া গাড়িতে উঠিতে-উঠিতে কহিল—রিখিয়া চলো। চারটের আগেই রোহিণীর রাস্তায় নামিয়ে দেবে আমাদের।

অর্থাৎ মিলিই ভাড়া দিবে সে-ই কর্ত্রী।

আঁকা-বাঁকা রাস্তা - খানিকটা সমতল হইয়াই উৎরাই : তারপর রাস্তা আবার খাড়া হইয়া গিয়াছে। ধূ-ধূ করে মাঠ—ঘাসের রঙ প্রায় হলদে, মাটির রঙ প্রায় লাল। গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে ত্রিকূটও সমানে চলিয়াছে।

মানবের হাঁটুর উপর আলগোছে বাঁ-হাতখানি তুলিয়া দিয়া মিলি কহিল—তারপর?

সেই হাতের উপর হাত রাখিয়া মানব শুকনো গলায় কহিল- তারপর যা হবার তাই হয়েছে-- হুবহু। তোমাকে একদিন বলেছিলাম না যে আমি পৃথিবীতে

কিছু একটা করতে এসেছি, প্রাণভরে অহংকার করবার মতো? মনে আছে?

মিলি কিছু বুঝিতে পারিল না!

—এতোদিন পরে সেই সুযোগ বুঝি এলো। আমার দুই হাতে আজ অজস্র স্বাধীনতা।

মিলি সামান্য একটু সরিয়া বসিয়া কহিল—ঘটা না করে যদি বলো তো বুঝতে পারি।

হাতের উপর চাপ দিয়া মানব কহিল—না, ফেনিয়ে বলবার কথাও তেমন নয়। জলের মতো সোজা। তোমার মাসিমা এতোদিন বাদে অকারণে—ঠিক অকারণে নয়—পুত্রবতী হয়েছেন। এবং কাজে কাজেই—

মিলির মুখ হইতে খসিয়া পড়িল: কাজে কাজেই—

—আমি বিতাড়িত হয়েছি।

মিলি পাথর হইয়া গেল। এবং মিলি কী বলে তাহাই শুনিবার জন্য মানব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! সে-মুখ দেখিতে-দেখিতে নিবিয়া যাইতেছে।

—বলো কি? মেসোমশায় তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

—না, দয়া বা কর্তব্য—যাই হোক, তিনি আমাকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আর আমি ধরা দেব কেন? ছাড়া যদি পেলাম-ই—

—আর মাসিমা?

—তাঁকে আমি দোষ দিতে পারি না, মিলি। তিনি আমাকে রাস্তা দেখতে বললেন। মিথ্যে অভিমান করছি না, কিন্তু এর পর কে কবে মখমলের বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকতে পারতো?

মিলির মুখ এখনো শুকাইয়া আছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখন কী হবে?

—কী আবার হবে। মানব দুই হাত বাড়াইয়া মিলিকে গায়ের উপর টানিয়া আনিল: তুমিই তো আমার আছো।

হাওয়ার মুখে শীতের পাতার মতো মিলি নিজেকে ছাড়িয়া দিল। তাহার স্পর্শের অতলস্পর্শ সমুদ্রে মানব স্নান করিতেছে।

তাহার আবার দুঃখ! সে কিনা এই দুঃখ ভুলিতে সেইদিন টেবিলের উপর মদের গ্লাস সাজাইয়া বসিয়াছিল! সেই কথা মনে করিয়া এখন তাহার হাসিতে ইচ্ছা করিতেছে।

মানবের কাঁধের উপর মাথাটা ভালো করিয়া বসাইয়া মিলি কহিল—আমি হলে কিছুতেই চলে আসতাম না। জোর করে ছিনিয়ে নিতাম।

—কী তার পেতাম বলো—কতোটুকু? তার চেয়ে এ কতো বেশি পেয়েছি।

—ছাই পেয়েছ! একহাঁটু ধুলো আর একগাল—দাড়ি। বলিয়া মিলি পরম স্নেহে মানবের গালে একটু হাত বুলাইয়া কহিল—দাড়ি কামাবার তোমার পয়সা জোটে না নাকি? ট্যাক্সিটাও দেখছি তোমারই মতো উড়ে চলেছে। এই, আস্তে চলো।

মিলি আবহাওয়াকে তরল করিতে চায়।

—এই সুর আমার উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া, মিলি। মানব মিলির মুখের উপর নুইয়া পড়িয়া কহিল—পৃথিবী আমার করতলে।

মিলির চোখের মণি দুইটি যে কতো কালো মানব আবার—আরেক বার দেখিল। চোখ দুইটি তুলিয়া মিলি কহিল—আমি কি তোমার পৃথিবী নাকি?

—তুমি তার চেয়েও বড়ো—তুমি আমার উঠোন। মেঘনার পাড়ে সেই যে ঘর দেখেছিলে মনে পড়ে?

মিলি নিজেকে একটু আলগা করিয়া নিয়া কহিল—সত্যি, তোমার আর ইউরোপ যাওয়া হলো না তা হলে।

—কেন হবে না? যাবো বৈ কি।

—মনে মনে?

—না। পয়সা হলে। সে পয়সা আমি নিজেই রোজগার করবো। চিবুকটা গলার দিকে সামান্য ঝুলাইয়া দিয়া মিলি কহিল—পয়সা হলে! কথাটা পাছে তাচ্ছিল্যের মতো শোনায় মিলি আবার মানবের স্পর্শের মাঝে ডুবিয়া গিয়া কহিল—কোথায় এখন থাকবে?

মানব কহিল—এতোদিন তো এক বন্ধুর মেসএই ছিলাম। আমার অসুখে তার বেশ খরচ হয়ে গেলো। এবার গিয়ে অন্য মেস দেখতে হবে।

—আমার আর ও-বাড়িতে থাকা চলবে না। শোভাদিদের হসটেলে একটা সিট রাখতে লিখে দিয়েছি।

মানব তাহাকে আরো কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল—তুমি ও বাড়িতে থাকবে না কেন?

অস্ফুট স্বরে মিলি কহিল—তুমি নেই বলে।

কিন্তু হসটেলেও তো মানব থাকিবে না—তাহা ছাড়া মানবের থাকা-না-থাকার

খবর পাইবার আগেই তো সে শোভাদিদের হসটেলে সিট রাখিতে লিখিয়া দিয়াছে। কিন্তু, এ তর্ক বা জেরা করিবার সময় ?

মানব তাহাকে আগের চেয়েও আরো কাছে টানিয়া লইল। আর একটি মাত্র সুতারও ব্যবধান নাই। তবু আরো কাছে। অজস্র বর্ষার মতো মিলি নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে। মিলি সম্পর্কে তাহার অবারিত মুক্তি—আবার ইচ্ছা করিলেই অবারিত বিরহ।

মিলির মুখ সে আস্তে তুলিয়া ধরিল। ওড়া-পাখির বাঁকানো দুই ডানার মতো ভুরুর নিচে কালো দুইটি তারা—ভোর বেলায় তারা—কাঁপিতে কাঁপিতে নিবিয়া গেল। নিমীলিত-চক্ষু মুখখানিতে বিষাদের গোধূলি নামিয়াছে। অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে, কুণ্ঠিত-ওষ্ঠে মন্দিরের দেবতা ছুঁইবার মতো নিঃশব্দে—মানব মুখ নামাইয়া আনিল। সেই নিমীলিত-চক্ষু মুখে কোথাও এতটুকু প্রশ্ন নাই, বাধা নাই—মমতায় ঠাণ্ডা, মসৃণ মুখ, প্রতীক্ষায় গলিয়া পড়িতেছে।

মুখ আরো নামাইয়া আনিল।

মিলির দুই পাটি দাঁত হঠাৎ ঝিলিক দিয়া উঠিল। কোণের দিকের সেই উদ্ধত দাঁতটি উত্তীর্ণ হইয়া ঠোঁট প্রসারিত হইল। তারপরেই সমর্পণের সেই কোমল ভঙ্গিটি তাহার রহিল না। চিবুকে ছোট একটি টোল ফেলিয়া মিলি কহিল—এমন তোমার কী দৈন্যদশা হয়েছে যে দাড়ি পর্যন্ত কামাতে পারোনি। তারপরে পিঠ টান করিয়া বসিয়া : ও! এই বুঝি রিখিয়ার বাড়ি শুরু হল ? বা, বেশ জায়গা তো !

কেহ খানিকক্ষণ আর কোনো কথা কহিল না। ড্রাইভারের কথায় হুঁস হইল। ড্রাইভার কহিল—আর রাস্তা নেই।

—তবে ফেরো। মিলি মানবের বাঁ-মণিবন্ধটা উল্টাইয়া ধরিয়া কহিল—তোমার ঘড়ি কোথায় ?

—অসুখের সময় ঘড়িটা বেচতে হয়েছে।

চুলটা হাত-প্যাঁচ করিয়া বাঁধিতে-বাঁধিতে মিলি বলিল—কটা এখন হলো ? আমাকে চারটের আগে ফিরতেই হবে কিন্তু। বলিয়া সে আবার মানবের বুকের ডান-পাশে হেলান দিয়া বসিল।

গাড়ি এইবার আরো ছুটিল। কাদের আরেকটা ট্যাক্সি ধুলা উড়াইয়া সামনে চলিয়াছে। ধুলায় চোখ-মুখ বন্ধ হইয়া আসে। মিলি মানবের বুকের মধ্যে নিজের শাড়ির আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বলিয়া উঠিল : কী ধুলো !

কিন্তু আগের গাড়িটাকে কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না।

নম্বর দেখিয়া এই ড্রাইভার আগের গাড়ির ড্রাইভারকে নিশ্চয় চিনিয়াছে। সে পিছন হইতে বলিয়া উঠিল : এই তেওয়ারি, বিকেলে তোর গাড়ির দরকার হবে। পুরান্দা থেকে কিরায়া চেয়েছে তিন গাড়ি। সেই যমুনাঝোর পেরিয়ে—

খবরটা শুনিবার জন্য আগের গাড়ির ড্রাইভার ব্রেক টিপিল। তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া পাশাপাশি যাইতে-যাইতে এই ড্রাইভার কহিল—সেই যে পুরান্দায় নতুন ডাক্তারবাবু—

তার পরেই : দুত্তোর তোর পুরান্দা! বলিয়া মিলিদের গাড়ি নক্ষত্রবেগে বাহির হইয়া গেল। তেওয়ারি এখন প্রাণ ভরিয়া ধুলা খাক।

মিলি খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দুই হাতে তালি দিয়া বলিল—চালাও। এবং পেছনের গাড়ির কী দুর্দশা হইল দেখিবার জন্য—হুডের ও-পাশের ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া আবার তাহার হাসি।

ধুলা যখন আর নাই, তখন বুকে মুখ গুঁজিবার কারণও কিছু থাকিতে পারে না।

পথ-ও ফুরাইয়া আসিতেছে। মানব কহিল—এই, আস্তে।

মিলি কহিল—তুমি না খুব স্পীডের ভক্ত?

—আর না। অন্তত এখন না। পথটুকু ভোগ করতে চাই।

—গতির মাঝেই তো পথকে ভোগ করা। কখন যে তুমি কী বলো তার ঠিক নেই। তোমার মোটর-বাইকটাও রেখে এসেছ?

—সব।

কথাটা মিলির লাগিল। আবার মানবের গা ঘেঁষিয়া আসিল। কহিল—তোমার এখন তবে কী করে চলবে?

মানব দীপ্ত হইয়া উঠিল : খুব চলবে। সে-জন্যে কিচ্ছু ভাবি নে।

—পয়সা পাবে কোথায়?

—মাটি খুঁড়ে পয়সা আনবো।

—কিন্তু তোমার পড়াশুনো এইখেনে খতম!

—না, না, পড়া ছাড়বো কী! যে করে হোক বি. এ.-টা পাশ করতেই হবে।

—কিন্তু খরচ চালাবে কোত্থেকে? বাসা-ভাড়া, কলেজের মাইনে—

—তা ঠিক চলে যাবে। কিচ্ছু ভাবনা নেই।

—ঠিক চলে যাবে না। তবু তুমি কী ভাবছ শুনি? আমাকে না বললে আর কে আছে?

—একটা টিউশানি জুটিয়ে নিতে পারবো হয়তো। কিম্বা অন্য কোনো কাজ।

—শেষকালে ছেলে পড়াবে তুমি ?

মানব হাসিয়া কহিল—এমন কোনো কথা নেই। মেয়েও পড়াতে পারি।

—বেশ তো আমাকেই পড়াও না।

মিলিকে দুই হাতে ঘন করিয়া কাছে আনিয়া মানব বলিল—তোমাকে পড়াবো ? মাসে কতো করে দেবে ?

মিলি আবার মানবের বুকে মুখ উপুড় করিয়া রাখিল।

নিশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে-সঙ্গে পথ ফুরাইয়া আসিতেছে। তাহার চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে মানব কহিল—এখুনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে, মিলি ? বাড়ি গিয়ে কী করবে ?

মুখ না তুলিয়াই মিলি কহিল—সত্যি বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

ঘনতা কমাইয়া আনিয়া মানব বলিল—এক কাজ করি এসো।

মুখ তুলিয়া মিলি বলিল—কি ?

—চলো, এখন হয়তো একটা ট্রেন আছে। আমরা কলকাতায় চলে যাই।

মিলি চোখ বড়ো করিয়া কহিল—ওরে বাবা, ছোট-কাকা তাহলে আর আস্ত রাখবে না।

অবশ্য মিলিকে মানব কলিকাতায় কোথায়ই বা লইয়া যাইত! সেই কথা হইতেছে না। দুইজনে এক সঙ্গে কোথায়ই বা উঠিবে! তবু—

আবার চুপচাপ।

গাড়ি 'বেলা'র রাস্তা ধরিয়াছে।

মিলি কহিল—আর দেরি নেই। এসে পড়লাম।

—এখুনি না-ই বা গেলে।

—বিশেষ কাজ ছিলো। আচ্ছা চলো জসিডি। মিলি গম্ভীর হইয়া কহিল—অতি-উৎসাহে পড়াশুনো যেন ছেড়ে দিয়ো না। পরীক্ষাটা দিয়ো—না পড়লেও পাস তুমি করবেই—আমাদের নোয়াখালির বাড়িতে গিয়ে থেকো। যতোদিন না অন্য কিছু সুবিধে হয়।

মানব অন্যমনে কহিল—আমাদেরই বাড়ি বটে।

—নিশ্চয়। ঐ জায়গাটা আমার কিন্তু ভারি ভালো লাগে। অবিশ্যি তুমি যতোদিন ছিলে ততোদিন—টিকাটুলিতেও আমাদের একটা বাড়ি আছে বটে, কিন্তু ওর মতো নয়। থাকতে পারবে তো সেখানে ?

মানব হাসিয়া কহিল—অতি-উৎসাহে। ঐখানেই তোমাকে নিয়ে 'সেটল' করে যাবো।

—কিন্তু ও-বাড়িতে তো তুমি ভূত দেখ।

—আর দেখবো না।

—কিন্তু চেহারা যদি তুমি না বদলাও, আমিই হয়তো ভূত দেখবো। তোমার কিছুতেই বিশ্বাস নেই, দুদিন থেকেই হয়তো জ্বর-জারি করে পালাবে।

—এবার তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

—বিলেত অবধি?

মানবের মুখে কথা জুগাইল না।

আবার যে তাহারা শহরে আসিয়া পড়িয়াছে কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, কারণ মিলি বলিল—ছাড়ো। ঐ আমাদের বাড়ির রাস্তা। এবার ডাইনে বেঁকে জসিডি।

কতো দূর যাইতেই মিলি বলিল—ঐ তোমার সাধের দারোয়া নদী। রোদ্দুরে ব্রিজ-এর ওপর খানিকক্ষণ বসলেই হয়েছিল আর-কি।

ক্ষীণ নিশ্বাসের মতো নদীটি বালির উপর দিয়া তির-তির করিয়া বহিতেছে। রোদে জরির সরু পাড়ের মতো ঝিলমিল করিতেছে।

পথ-ঘাট আবার নির্জন।

মানব মিলির হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল—আমার সঙ্গে তুমি গরিব হয়ে যেতে পারবে?

মিলি চক্ষু তুলিয়া কহিল—তোমার সঙ্গে না থাকতে পারলেই তো গরিব হয়ে যাবো। পরে আবার কাছে সরিয়া আসিয়া: শরীরটাকে নষ্ট কোরো না। কলকাতায় আমার সঙ্গে—রোজ না পারো হপ্তায় এক দিন অন্তত দেখা কোরো। শোভাদিদের হসটেলেই খোঁজ কোরো আগে। মানব কহিল—বাড়ি ফিরতে এখনো দেরি আছে—ও-সব জরুরি কথা পরে বললেও চলবে।

মিলি হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, বাজে কথাই বলো না হয়।

—এতোক্ষণ ধরে বাজে কথাই বলছিলাম না কি?

মিলি চুপ করিয়া রহিল।

দেখিতে-দেখিতে জসিডি আসিয়া গেল। ট্যাক্সিতেই আবার ফিরিতে হইবে।

মানব কহিল ট্যাক্সিটা এখানে ছেড়ে দাও। ট্রেন একটা তৈরি দেখা যাচ্ছে।

মিলি টান হইয়া বসিয়া কহিল—ওরে বাবা। ওটা ছাড়তে ছাড়তে বাড়ি গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিতে পারবো। চারটে বেজে কখন ভূত হয়ে গেছে।

মানব কহিল: তুমি কবে কলকাতা ফিরবে?

—চার-পাচ দিনের মধ্যেই হয়তো। এখনো ঠিক করিনি। জানতে পাবে নিশ্চয়ই। তুমি তো আজই যাচ্ছ।

—হ্যাঁ।

কোথায় গিয়ে থাকো আমাকে জানিয়ো কিন্তু।

—নিশ্চয়ই।

—গরিব করে রেখো না যেন। বলিয়া তরলকণ্ঠে মিলি হাসিয়া উঠিল।

—কিন্তু সত্যিই বড়লোক হবো কবে?

—উপন্যাসের প্রথম চ্যাপটারটা আরো একটু দীর্ঘ হবে দেখছি।

মানব কহিল—তা হোক।

রোহিণীর রাস্তা আসিয়া গেল। এবারও ভাইনে। না, এখানেই নামিয়া পড়া ভালো। বাকি রাস্তাটুকু পায়ে হাঁটিয়া গেলে বীণাপাণিদের বাড়ি থেকে ফেরা হইবে।

দুজনেই নামিল। ব্লাউজের ভিতর থেকে মিলি নরম তুকতুকে সাদা চামড়ায় ছোট একটি মনি-ব্যাগ বাহির করিল। হাতের ঘামে সামান্য একটু ময়লা হইয়াছে। ভাড়া চুকাইয়া দিবার আগে মিলি কহিল—তোমাকে ধর্মশালায় পৌঁছে দেবে নাকি?

—দরকার নেই। আমাকে তুমি কী পেলে।

—তোমার শরীর খারাপ বলে বলছি। তারপর ট্যাক্সিটা উধাও হইলে: আচ্ছা, এইবার যাই। না, না, তোমাকে কষ্ট করে আর আসতে হবে না। একাই যেতে পারবো এটুকু, যেমন একাই এসেছিলাম। আমার ছোট-কাকা বিশেষ ভালো লোক নয়। কাল তো দেখতেই পেলে। আচ্ছা।

২৫

শোভনাদের হসটেলে মানব খোঁজ নিতে গিয়াছিল, কিন্তু মিলি সতীশবাবুদের বাড়িতেই উঠিয়াছে। মাসিমার কাছে কথাটা সে পাড়িতেই পারে নাই—য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটির সঙ্গে তার বেশ ভাব। নিতাই তার ভাকে তটস্থ।

পড়িতে-পড়িতে হঠাৎ উঠিয়া দোলনায় খোকাটার সঙ্গে খানিক আলাপ করিয়া আসে।

এই-বাড়ি থেকে মানব একেবারে মুছিয়া গিয়াছে, সেই নাম মিলিও মুখে আনিতে ভয় পায়। সেই নাম শুনিলে সমস্ত দেয়ালগুলি পর্যন্ত প্রতিবাদ

করিয়া উঠিবে। মোটর সাইকেলটার দামে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটির দু-একটা সস্তা শখ মিটিয়াছে—আজকাল ক্রাইজলার করিয়া সে-ই বেড়ায়, রিপন ষ্ট্রীটের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে হল্লা করিয়া একটু কিছু খাইয়া আসে—মাঝে-মাঝে মিলিকেও সঙ্গে ডাকে—যেদিন তার বন্ধুদের সঙ্গে 'য়্যাপয়েন্টমেন্ট' থাকে না! মিলি বলে : থ্যাঙ্কস।

কিন্তু কোন ঠিকানায় আছে একটু খবর দিতে কি হইয়াছিল!

ওদিকে সুবিনয় সর্দারি করিয়া কৃষ্ণনগর হইতে—ছুটির পর সেখানেই সে বদলি হইয়াছে—চিঠি লিখিয়াছে যে এই উইক-এণ্ড-এ সে কলিকাতা আসিবে। পারিলে প্রত্যহই সে আসুক না; কিন্তু চিঠি লিখিয়া জানাইবার যে কি কারণ মিলির আর অজানা নাই। মিলি সেই দুই দিন কোথায় পলাইয়া বাঁচিবে ভাবিয়া পায় না।

অথচ চিঠি না লিখিয়া অনায়াসে সে চলিয়া আসিতে পারিত। রাস্তা তো আর সতীশবাবুর সম্পত্তি নয়; আর সিঁড়ি দিয়া সোজা নামিয়া আসিবার স্বাধীনতাও মিলি কাহারও কাছে বন্ধক রাখে নাই।

এই বাজে ছেলেমানুষি করিয়া কি-এমন লাভ হইল! হয়তো সামান্য একটা চাকুরির চেষ্টায় একহাঁটু ধুলা লইয়া রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করিতেছে। নিশ্চিত হইয়া আয়নায় সে নিজের মুখ দেখিলে পারে! ডান-পাশের ঐ কোণের ঘরটায় থাকিলে জাত যাইত নাকি? বেশ তো, মিলিই না-হয় তাহার সঙ্গে ঘর বদল করিয়া নিত। তাহাতে কাহার কি রাজ্যপতন হইত! মানুষে রাগিলে মুখে অমন অনেক কথাই আসিয়া পড়ে, তাহার জন্য এতোটুকু ক্ষমা নাই! মালকোঁচা মারিয়া তখুনি বাহির হইয়া পড়িতে হইবে! অথচ টাই বাঁধিয়া সোজা সে বিলেতে চলিয়া যাইতে পারিত! সতীশবাবু তাহার জন্য বাক্স খোলা রাখিয়াছিলেন। এখনো, চাবি তাহার হাতেই আছে। অথচ সে এই পাড়া মাড়াইবে না, একগাল দাড়ি নিয়া রাস্তায়-রাস্তায় টো-টো করিবে। একখানা চিঠি লিখিবার পর্যন্ত নাম নাই। চিঠি লিখিল কি না সুবিনয়। না, মানবকে লইয়া মিলি আর পারে না।

যা পাওয়া যায়, তা-ই সই। এতো মুগুর ভাঁজিয়াও এই বুদ্ধিটুকু তার খুলিল না! পরে বুঝিবে। একদিন যদি ফের সতীশবাবুর কাছে আসিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে হাত না পাতে, তো কি বলিয়াছি।

মিলি অগত্যা বই নিয়া পড়িতে বসে।

তারপর একদিন চিঠি আসিল :

থাকে হোগলকুঁড়ের এক মেসএ, বড়বাজারের এক কাটরায় একটি মাড়োয়ারি-ছেলেকে রোজ সকালে দুই ঘণ্টা করিয়া পড়ায়। পায় পনেরো। সন্ধ্যায় আর একটিকে জোগাড় করিতে পারিলেই তাহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে।

আরো লিখিয়াছে: বেশ আছি, মিলি—অপূর্ব সুখে। এবার মনে হচ্ছে সত্যি আমি মানুষ হতে পারবো। মানুষ হওয়া কাকে যে বলে বোধহয় এতোদিনে বুঝলাম। বাধা কাকে বলে তা-ও বুঝলাম এতোদিনে। তোমার অনিচ্ছা বা অনাদরের বাধা নয়, উত্তাল জীবন-সমুদ্রের বাধা। চোখ দিয়ে কান্না আসছে, তবু যুদ্ধ করতে যে কী সুখ পাচ্ছি কি করে তোমাকে বোঝাব?

তারপরে কানে-কানে বলার মতোই লিখিয়াছে: কবে তোমাকে দেখব বলো?

মিলির কলমের মুখটা ভোঁতা—অতো-শত কবিত্ব আসে না। ভালো আছে শুনিয়া সে খুশি হইল। এখন ক্রমে-ক্রমে মানুষ হইতেছে—এটা একটা সুখবর। দেওঘরে যে-অবস্থায় তাহাকে দেখিয়াছিল সেটা মানুষের পূর্বপুরুষের চেহারা।

পরে মুখোমুখি বসিয়া বলার মতোই লিখিয়াছে: যে-কোনদিন সোজা এ-বাড়ির দোতলায় উঠে এলেই আমার দেখা পাবে। কলেজ থেকে এসে কোথাও আর বেরুই না।

মানব আবার চিঠি লিখিল:

বিকালেও টিউশানি একটা জোগাড় করিয়াছে বটে, কিন্তু মাহিনা দিতে চায় নগদ দশটাকা মাত্র। তাহাই সে চোখ বুজিয়া লইয়া ফেলিবে। আরো একটার ফিকিরে সে আছে। পরীক্ষাও আসিয়া পড়িল। মিলি যদি তাহাকে কয়েকখানা রুমাল সেলাই করিয়া দিতে পারে তো ভালো হয়।

তার পরে:

ও-বাড়ির ছায়াও আমি মাড়াতে চাই না। যা ছেড়েছি, তা ছেড়েছি। এমন করে নিজেকে না-ঠকাতেও পারতাম, তা বুঝি, কিন্তু এই ফাল্গুনে আমার মাত্র কুড়ি বছর পূর্ণ হবে। নিজেকে এখনো আমি দিগ্বিজয়ী ও দুর্ধর্ষ বলে অনুভব করি—আমার হয়ে তুমিও এ-তেজ অনুভব কোরো।

পরের প্যারায়:

একদিন কার্জন-পার্কে বা টালিগঞ্জের পুলের ধারে—যেখানে তোমার খুশি—বেড়াতে-বেড়াতে চলে এসো না। কতোদিন দেখিনি।

দেখে নাই—এখানে আসিলেই তো হয়। এই সব গোঁয়ারতুমির কোনো

ভদ্র অর্থ থাকিতে পারে না। ঐ-সব লম্বা-চওড়া কথা শুনিতেই খুব ভালো, দেখিতে অত্যন্ত কদাকার।

রুমাল উপহার দিলে নাকি বন্ধুতার অবসান হয়—এমন একটা কুসংস্কার ছাত্রী-মহলে প্রচলিত আছে। থাকুক, মিলি তা বিশ্বাস করে না। রুমাল না-হয় সে তাকেই পাঠাইয়া দিবে।

তার পরে দূরে সরিয়া বসিয়া:

বলেছি তো কলেজ থেকে এসে কোথাও আর বেরুই না। কার সঙ্গেই বা তোমার সাধের কার্জন-পার্কে যাবো? কে নিয়ে যাবে? সেটা মনে রাখো? শেষকালে স্বর নামাইয়া:

একজামিন কাছে এসে পড়েছে—ভালো করে পোড়ো। একলাফেই পেরিয়ে যাবে বলে খুব বেশি আলসেমি কোরো না। কলেজ বদলে তো টেস্ট-এর হাত থেকে ছাড়া পেয়েছ—এখন আর একটু চালাকি করে মেসোমশায়ের কাছ থেকে 'ফি'-র টাকাটা আদায় করে নিলেই তো হয়। কুড়ি বছর বলে কুড়ি বছর!

মানব কয়েক দিন আর চিঠি লিখিল না।

মিলিও রাগ করিতে জানে। দুপুরবেলা কলেজ হইতে আসিয়া লংক্লথ-এর রুমালে সুঁচ-সুতা দিয়া সে চিঠি লিখিতে বসে।

পরীক্ষার দিন তিনেক আগে একটা সাবানের বাক্সের মধ্যে প্যাক-করা রুমাল-গুলি পাইয়া মানব অঙ্কটা আর কিছুতেই মিলাইতে পারিল না!

পরীক্ষা দিয়া ফিরিতে-ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। আজ শেষ হইল।

রামপদ তাহার একতলা বাড়ির সিমেন্ট-করা রোয়াকটুকুতে দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল, মানবকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল: কেমন হলো আজ?

মানব হাসিয়া কহিল—মন্দ নয়।

—পাস তো নিশ্চয়ই করবেন, কি বলুন।

—তার জন্যে ভাবনা নেই। ভাবনা হচ্ছে পরে।

—যা বলেছেন। রামপদ রোয়াক থেকে নামিয়া আসিল: চাকরির যে বাজার। চাকরি করবো না বলে শ্যামপুকুরে এক দোকান খুললাম—কিন্তু যে দিন-কাল, খদ্দেরই জুটলো না। গেলো উঠে। পরে বাঙালীর সেই চাকরি—অভয়পদে দে মা স্থান!

মানব তাহার সঙ্গে দুই পা চলিতে-চলিতে কহিল—তবু ভাগ্যি যে পেয়ে গেছেন।

—বেঁচে গেছি। তা আর বলতে। নইলে সপরিবারে উপোস করে মরতে হতো।

—যদি পারেন, আপনাদের আপিসেই কোথাও আমাকে ঢুকিয়ে দেবেন।

কাঁধে হাত রাখিয়া রামপদ কহিল—আমার সাধ্য কী ভাই, র‍্যাং-ব্যাংই তলিয়ে যান, এতো নেহাত থলসে। আপনার তো একটা মাত্র পেট—কিসের কী। মা-বাপ তো কবেই সাফ হয়েছেন শুনলাম—ভাই-বোনও কাঁধে নেই। বেঁচে গেছেন মশাই। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে থাকুন। আপনার আবার ভাবনা কী।

একটু থামিয়া রামপদ আবার বলিতে লাগিল: খবরদার, বিয়ে করবেন না যেন। ওর মতো ঝঞ্ঝাট আর কিছু হতে পারে না। পদে-পদে গেরো—মরবার পর্যন্ত স্বাধীনতা নেই। এই দিব্যি আছেন।

—দিব্যি আছি, না?

—দিব্যি নয়? আপনিই বলুন না। কার কী তোয়াক্কা রাখেন! যার কেউ নেই, তার এমন সস্তা শহুরে ভদ্রতারও দরকার হয় না। রামপদ হঠাৎ ফিরিয়া কহিল—চলুন আমার বাড়ি, একজামিন দিয়ে রোজ-রোজ শুকনো মুখে মেসএ ফেরেন এ আর আমি দেখতে পারি না। কী-বা এখন দিতে পারবে জানি না, তবু আসুন আপনি।

মানব আপত্তি করিতে লাগিল: শুকনো মুখ মানে পরীক্ষা ভীষণ খারাপ দিয়েছি।

—এবং পরীক্ষা খারাপ দিলেই তো বেশি করে খিদে পায়। আসুন, আসুন—কথাটা যখন একবার স্ট্রাইক করেছে, আর আমি ছাড়ছিনে!

রোয়াকটুকু পার হইয়া ভিতরে চলিয়া আসিতে হইল। রামপদ কিছুতেই হাত ছাড়িবে না। এইটিই তার শুইবার ঘর—পায়ার তলায় ইঁট দিয়া তক্তাপোশটাকে প্রায় খাটে প্রমোশন দিয়াছে—ঘর-ঝাঁট বিছানা-পাতা সব কখন চুকিয়া গিয়াছে—মেঝে দেয়াল নিখুঁত পরিষ্কার। সমস্ত ঘর জুড়িয়া কাহার দুইটি কুশলী ও কল্যাণময় হাতের স্পর্শ যেন স্পর্শেরই মতো অনুভব করা যায়।

বিছানাটা দেখাইয়া দিয়া রামপদ কহিল—বসুন।

মানব একটু দ্বিধা করিয়া কহিল—বরং বাক্সটা নামিয়ে ঐ টুলটা টেনে নিচ্ছি।

—না, না, আরাম করে বসুন। টায়ার্ড হয়ে এসেছেন।

ভিতরের দিকে জাপানি কাপড়ের পর্দা ঝুলিতেছে; তাহা সরাইয়া রামপদ

ভিতরে অদৃশ্য হইল। সে এখুনি হয়তো আর-কাহাকে অযথা বিড়ম্বিত করিয়া তুলিবে।

পর্দাটা সঙ্কুচিত হইতেই মানবের চোখও ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল; কাছেই নিচের উঠানটুকুর এক কোণে একটি মেয়ে কি একটা শক্ত জিনিসের সাহায্যে বসিয়া-বসিয়া কয়লা ভাঙিতেছে। রামপদ তাহারই কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে মেয়েটি যে কে, বুঝিতে দেরি হইল না। পর্দাটা দুলিয়া এদিকে সরিয়া না আসিলে মেয়েটির মুখ সে স্পষ্ট দেখিতে পাইত। কিন্তু না দেখিলেও দেখার আর কিছু বাকি নাই।

কুলুঙ্গিতে ছোট একটি সিঁদুরের কৌটা, দু-চারিটি চুলের কাঁটা, একটুখানি কালো তেল-কুচকুচে ফিতা কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে—উনুনে আগুন দিয়া এইবার তাহার চুল বাঁধিবার কথা। দেয়ালে কাঠের একটি ব্র্যাকেট, তাহাতে রামপদরও কি-কি সব টাঙানো আছে, আর আছে তাহার গা ধুইয়া পরিবার শাড়িটি—কুঁচাইয়া, পাকাইয়া অনর্থক তাহাকে একটি অশোভন মর্যাদা দিবার চেষ্টা। পেরেকে বিদ্ধ হইয়া মাটির দুইটি পরী ফুলের মালা হাতে লইয়া দেওয়ালে উড়িয়া চলিয়াছে—এবং উহাদের মধ্যস্থানে কালীর একখানি পট ও তাহারই নিচে মাটির একটি চিংড়ি মাছ হাওয়ায় শুঁড় নাড়িতেছে।

রামপদ আরেকটু গল্প করিয়া গেল। বাড়ি-ভাড়া শুনিয়া কিছু আর থাকেনা, মাঝে পার্টিশান দিয়া অন্য ভাড়াটে যারা আছে তারা সব সময়েই একটা-না-একটা কিছু নিয়া মারামারি হৈ-চৈ করিতেছে—ভালো ও সস্তায় বাড়ি পাওয়াই দুষ্কর।

মেয়েটি মৌমাছির মতো ব্যস্ত, হাওয়ার মতো ছুটোছুটি করিয়া রান্নাঘর আর উঠান, উঠান আর বারান্দা করিতেছে।

নির্ভুল সঙ্কেত পাইয়া রামপদ উঠিয়া গেল।

পর্দার বাহিরে সামান্য একটু দূরে স্বামী-স্ত্রীতে বচসা হইতেছে। কথাগুলি কানে না গেলেও মানব স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে রামপদর ইচ্ছা তাহার স্ত্রী-ই খাবারের থালা নিয়া অতিথির সম্মুখে উপস্থিত হয়—রামপদ ও-বাড়ি হইতে টুল একটা আনিয়া দিতেছে—ঘরের ওটা বড়ো নিচু। মেয়েটি কিছুতেই রাজী হয় না, সে যতো আপত্তি করে, তার চেয়ে বেশি হাসে, এবং অলক্ষিতেই আবার কখন বড়ো করিয়া ঘোমটা টানিয়া দেয়।

রামপদ আগেই টুল পৌছাইয়া দিয়াছে।

ভিতরে গিয়া দেখিল খাবারের থালাটা মাটিতে রাখিয়া তিনি দস্তুরমতো একটি বোঁচকা হইতেছেন।

গরিব কেরানির এতোখানি বদান্যতা দেখিয়া মানব অবাক হইয়া গেল। বাঁ-হাতে জলের গ্লাস ও ডান-হাতে খাবারের থালা নজরে পড়িবার আর কিছুই ছিল না। সেই দুই হাত টুলের সমীপবর্তী হইতেই চোখে পড়িল একগাছি করিয়া শাঁখার চুড়ি, আর দুইগাছি করিয়া সোনার। কানে লাল পাথরের দুইটি দুল—বেশি দূর ঝুলিয়া পড়ে নাই—চুলের আড়ালে টিক-টিক করিতেছে।

থালা-গ্লাস রাখিয়াই পলাইয়া যাইতেছিল, মানবের মুখ থেকে খসিয়া পড়িল: তুমি আশা, না?

দেখিতে-দেখিতে ভোজবাজি। বোঁচকা থেকে বাহির হইল পদ্ম। কোথায় বা ঘোমটা, কোথায় বা কী! আশা হাসিয়া ফেলিল। ঘর-দোর দেয়াল-মেঝে নূতন তাসের মতো ঝকঝক করিতেছে!

—ও! আপনি নাকি? আশা নুইয়া পড়িয়া মানবকে প্রণাম করিয়া ফেলিল। তক্তাপোশের তলায় পা দুইটা চালান করিয়া দিয়াও মানবের পরিত্রাণ নাই।

বেচারা রামপদ তো প্রায় পথে বসিয়াছে। আহত হরিণের দৃষ্টির মতো অসহায় চোখে সে তাকাইয়া রহিল।

আশা কহিতেছে: এতো সামনে থাকেন, অথচ একটিবার এসে খোঁজ নেন না।

মানব বলিল: কী করে জানবো তুমি এতো কাছে আছো। অদৃষ্ট নিতান্ত ভালো বলে তোমার দেখা পেলাম।

আরো তাহারা কতো-কি বলিয়া যাইত নিশ্চয়। রামপদ মাঝে পড়িয়া প্রশ্ন করিল—আপনারা দুজনে দুজনকে অনেক আগে থেকেই চিনতেন বুঝি?

—ও হ্যাঁ। অনেক আগে থেকে। সেই ছেলেবেলায়। মানব চাহিয়া দেখিল রামপদর মুখ ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিতেছে: আপনি জানতেন না বুঝি? ও সুধীরের বোন—আমারও ছোট বোন সেই সুবাদে। অনেক দিন থেকে জানি! ওর মা তো আমারও মা। মা ভালো আছেন?

আশা কহিল—আছেন এক-রকম। সেই ভিটেটুকু না বেচলে এমন সোনার চাঁদ ভগ্নীপতি কি করে পেতেন বলুন। বলিয়া আশা স্বামীর দিকে চাহিয়া চোখে এক ঝিলিক মারিল।

রামপদর মন দিনের আলোর মতো হাল্কা হইয়া উঠিল যা-হোক। হাসিয়া কহিল—নতুন অতিথিকে শালা বলে পরিচিত করে কি খুব বেশি সম্মান দেখালে।

মানব জিজ্ঞাসা করিল: সুধীর? সুধীর এখন কোথায়?

—চাটগাঁয় পটিয়া বলে এক গ্রাম আছে, সেই গ্রামে মাস্টারি করছেন। মা-ও

সেইখানে। আপনার জানাশুনো ভালো মেয়ে আছে তো বলুন, মা দাদার বিয়ে দেবেন।

রামপদ কহিল—ওঁর ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নেই, তোমার দাদার জন্যে ওঁর ঘুম হচ্ছে না।

—ওঁর আবার ভাবনা কি। ভাত না ছড়াতেই কাকের ভিড়।

মানব কহিল—পৃথিবীতে একটিমাত্র ভালো মেয়ের খোঁজ জানতাম।

—কি হলো?

—তাকে রামপদবাবুই নিয়ে নিলেন। কিন্তু এতো সব আমি খেতে পারবো না, আশা।

—খেতে পারবেন না মানে? এ তো খেতে হবেই, রাত্রেও এখানে খাবেন। উনুন ধরাতে হবে। তুমি আলোগুলো জ্বালাও না।

খানিকক্ষণের জন্য মানব অন্ধকারে একা বসিয়া রহিল। এবং অন্ধকারে মিলি ছাড়া আর কোনো কিছুই তাহার মনে আসিল না। মিলির আঁচল ধরিয়া আসিল সবুজ মেঘনা নদী, আর নদী যেখানে আসিয়া শেষ হইল সেখানে ছিটে-বেড়া দিয়ে ঘেরা খড়ের একটি ছোট ঘর—স্নিগ্ধ করতলের মতো ছোট উঠান; বেশ তো, হইলই বা না-হয় এমনি পার্টিশান-দেওয়া ভাড়াটে বাড়ি। কালীর পট না টাঙাইয়া মিলি না-হয় বিলিতি মেমসাহেবের চেহারাওলা ক্যালেণ্ডার ঝুলাইবে।

আশার মতো সে কি একটি দুঃখের সঙ্গিনী পায় না?

তবু কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল মিলিকে হয়তো এইখানে মানাইবে না।

আচ্ছা, তাহাকেও কি এইখানে মানায়?

না, খুন্তি-বেলুন ছাড়িয়া স্টিয়ারিঙ-হুইল ধরিলেই কি আশার পক্ষে নিতান্ত বেমানান হইত?

মিলির চোখেও দুঃখ-দহনের স্ফুলিঙ্গ সে দেখিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে দুঃখটাই কি বড়ো? সেই কি জীবনের শেষ আশ্রয়? সে এমন কি অসীম বিস্তীর্ণ জলধি যাহাকে অতিক্রম করা যাইবে না?

লণ্ঠন লইয়া আসিয়া রামপদ সমস্ত স্বপ্ন নষ্ট করিয়া দিল। কহিল—চলুন, দেশবন্ধু-পার্কে একটু ঘুরে আসি। আর কিসের তোয়াক্কা?

শশব্যস্তে আশার প্রবেশ: হ্যাঁ, ওঁকে আবার টানা হচ্ছে কেন? তুমি বাজারটা একবার ঘুরে এসো। অতিথির কাছে শুধু থালাটা ধরে দি আর-কি।

কিছু মাংস, ডিম, বিস্কুট—আপনার কল্যাণে কিছু চপ আজ রেঁধে ফেলি। দেখি পারি কিনা।

মানব কহিল—আমিও যাই ওঁর সঙ্গে।

রামপদ আশাকে যে কতো ভালোবাসে মানবের বুঝিতে আর বাকি রহিল না। আপত্তি করিল রামপদই: না, না, আপনি বসুন। বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে খানিক রেস্ট নিন। আশা, এঁর সঙ্গে খানিক গল্প করো। ঘোমটা টেনে দাদার সামনে কনে বউটি হয়ে ঘুপটি মেরে বসে থেকো না!

মাংসের জায়গা লইয়া রামপদ বিড়ি ফুঁকিতে-ফুঁকিতে বাহির হইয়া গেল।

আশা বলিল—ভালো হয়ে উঠে বসুন। তার চেয়ে আসুন আমার সঙ্গে কলতলায়—হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। পরে জলখাবারটা খেয়ে নেবেন। কিম্বা, জল এখেনেই এনে দেব?

—আমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে আছি। আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। কিন্তু এতো-সব খেয়ে রাত্রে যে আর কিছুই খেতে পারবো না।

আশা মানবের সমস্ত কথা-ই জানে—জানিতে কাহারই বা এখনো বাকি আছে? তবু সে তার কাছ দিয়াও ঘেঁষে না। খুঁটিনাটি এটা ওটা কথা পাড়ে। অথচ মানবকে কতো সহজে তাহার অপমান করা উচিত ছিলো।

রামপদকে সে এতো ভালোবাসে যে সে-কথা সে একদম ভুলিয়া গিয়াছে। স্বামীকে যে পাইয়াছে তাহাতেই সে পরিপূর্ণ। আর কিছুই সে চাহিতে জানে না, জানিতে চাহে না।

তাই তাহার যতো কথা:

এই এখানে দুটো পুঁইর চারা লাগিয়েছি। আপিস থেকে এসে যে একটু মাটি কুপিয়ে দুটো ফুল-গাছ লাগাবে তার নাম নেই। কুড়েমিতে লাটসাহেব। বিড়ির পেছনে মাসে দু-ডজন দেশলাই লাগাবে। ভালো-ভালো জামা কাপড় সব বিড়ির আগুনে ছ্যাদা হয়ে গেলো। না, না, ঝি রাখবার কী হয়েছে? দুটি মাত্র তো থালা-বাটি—আমি ও-পাতেই বসে পড়ি। কোনো-কোনো দিন সাহেবিয়ানা করে বসি—একটেবিলে নয়, একপাতে। আমার মাছ-টাছ সব কেড়ে-কুড়ে খেয়ে ফেলে। আসুন না আমার সঙ্গে রান্নাঘরে। ভাত এতোক্ষণে টগবগ করছে। বেজায় ধোঁয়া কিন্তু। দেখবেন। পিঁড়েটা টেনে দিচ্ছি। জামাটা—যাক, পারি না আপনাদের নিয়ে।

মিলির সঙ্গে তারপর আরো দুই দিন না তিন দিন দেখা হইয়াছিল।

মেসএর বিছানায় শুইয়া-শুইয়া ঘুমাইবার আগে মানব তাহাই ভাবিতে বসে।

একদিন দুই-নম্বর বাসএ: মিলি বলিল, ধরিত্রীর জন্মদিনে সে হরীতকী-বাগানে হসটেলে চলিয়াছে। মেঝেতে সে আলপনা দিবে। পরীক্ষা মানব ভালোই দিয়াছে নিশ্চয়, শরীরও বেশ ভালোই মনে হইতেছে। সতীশবাবু—তাহার মেসোমশায়ের ব্লাড-প্রেসার বাড়িয়াছে। মাসখানেক হইল নিতাই নাই—বাড়ি যাইবার নাম করিয়া উধাও।

—আচ্ছা। এইখানে নামবো। তুমি বুঝি আরো দূরে। বাঁধকে।

আরেক দিন মার্কেটের পথে:

ফুলের দোকানের কাছে দোকানদার বন্ধুর সঙ্গে মানব দাঁড়াইয়া কী গল্প করিতেছিল। এখন আর সে ঝুড়ি ভরিয়া দূরে থাক, বাটন-হোলএর জন্য পর্যন্ত একটা ফুল কেনে না কেন, দোকানদারের এই ছিল অভিযোগ। ফুলের চেয়ে অন্য-কিছুর প্রয়োজন যে কতো প্রত্যক্ষ ও পরিচিত তাহা কথায় বুঝাইয়া দিবার আগে চোখের সামনে মিলির আবির্ভাব। থামিতে-না-থামিতেই এক ঝাপটা জলো হাওয়ার মতো সে উড়িয়া গেলো।

মানব ডাকিল: মিলি।

মিলি দাঁড়াইবে কি দাঁড়াইবে না ভাবিবার আগেই মানব পাশে আসিয়া পড়িয়াছে। দোকানদার কৌতূহলী হইয়া চাহিয়া রহিল। এই ফুলে তাহাকে কেমন দেখাইবে?

মিলি এখন ভারি ব্যস্ত। হসটেলের মেয়েরা মিলিয়া 'রক্তকরবী' করিতেছে। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে প্লে হইবে। দস্তুরমতো টিকিট করিয়া। পুরুষদের দেখানো হইবে—দস্তুরমতো দেখানো হইবে। মিলিরা তেমনি ছিঁচকাঁদুনে নয়, পুতু-পুতু করিয়া তাহারা অভিনয় করে না। যার খুশি সে আসিয়া দেখিয়া যাক, পয়সা খরচ করিয়া। মনে যা আসে তাই লিখিয়া সাপ্তাহিকে মাসিকে সমালোচনা করুক। একটাকা লোয়েস্ট। মানব সেই আগের ঠিকানায়ই আছে তো? খামে পুরিয়া মিলি তাহাকে না-হয় ড্রেস্-সার্কেলের একখানা পাশ পাঠাইয়া দিবে। সে যেন আসে।

—নাকে-মুখে পথ পাচ্ছি না। রিহার্সেলই দেব, না মেলা-ই জিনিস-পত্তর কিনবো—তা কে দেখে? আর এ সব মেয়ে—যতো সব ইলশে গুঁড়ি, ছুঁতে না

ছুঁতে মিলিয়ে যায়। তুমি আমার সঙ্গে কোথায় আসছ? পেছনে আমার এক দঙ্গল সেনানী, না কেউ। এই উষা, এই মাসি হাঁটতে পারিস না?

পিছনে বাহিনী আসিতেছে। তাহারা এতো পিছে পড়িয়া আছে কেন? অর্থাৎ মিলি তাহাদের ফেলিয়া বোঁ করিয়া ওতোটা আগাইয়া আসিল কেন? ফুলের দোকানের কাছে তবে কি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল? তাহাকে এড়াইয়া যাইতে, না, আগাইয়া আসিয়া তাহার সঙ্গে নিভৃতে একটু কথা কহিতে?

—কাজ সব ভাগ করে দিলাম, তবু কারুর গা দেখি না। কাজেও ওদের নবাবি। আমি শুধু খেটে মরি। তুমি চাকরি-বাকরি কিছু পেলে? এই বুলা, হসটেলে তোরা দু'বেলা সাবু খাস নাকি? না, এখনো টিউশানিই করছ? রটু। তুমি যেয়ো কিন্তু—তারিখ পরে কাগজে দেওয়া হবে। আচ্ছা। চিয়্যারিয়ো!

এই দুই দিন হইল। আরেক দিন গেলো কোথায়? মানব চোখ বুজিয়া স্মৃতির গহন অন্ধকারের সমুদ্রে তলাইয়া-তলাইয়া তাহা তুলিতে পারে না।

বা রে, সেই দিন—এতোক্ষণে তাহার মনে পড়িয়াছে—সেই দিন তাহার কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া সে ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছিল। সেই স্পর্শের গন্ধ তাহার সারা গায়ে এখনো লাগিয়া আছে। সে না-জানি তখন কি করিতেছিল, কি ভাবিতেছিল, কি-কথা বলিতে গিয়াও বলিতে পারিতেছিল না।

যাঃ, সে তো দেওঘরে—রিখিয়া যাইবার পথে। এখানে কোথায়?

না, তিন দিন নয়।

আজ মনে পড়ে রিখিয়া যাইবার পথে স্পর্শের সেই উদ্দাম ঝড়ে দৃষ্টি ছিল কুণ্ঠিত, ব্যবহার কৃত্রিম। মিলির সেই অজস্র সমর্পণের অন্তরালে প্রকাশের কী দীনতা! তাহার চেয়ে মেঘনার উপরে চাঁদপুরের স্টিমারে মানব যখন তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল মিলির তখনকার মৃদু-মৃদু বাধার মধ্যে গাঢ় একটি আন্তরিকতা ছিল। সেই কৃপণতার মধ্যে কতো বড়ো ঐশ্বর্য!

দলছাড়া একাকী একটা গাঙশালিকের মতো মানব মেঘনার উপরে সেই স্টিমারটা খুঁজিয়া বেড়ায়।

না, মাত্র একটি দিন।

তারপর আসিল সময়ের স্রোত।

সূচের মতো তীক্ষ্ণ ও সোজা, রাত্রির মতো ক্লান্ত ও কঠিন।

ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু যে-ঘোড়া তুমি ধরিয়াছ সে আর আসিয়া পৌঁছায় না।

মেঘনা কবে শুকাইয়া গেল, স্টিমার উঠিয়া গিয়াছে, নোয়াখালির সেই বাড়িটা নদীর তলায় ভাঙিয়া-চুরিয়া ছত্রখান।

খালি মাটি আর মাটি।

মাটি খুঁড়িয়া সে পয়সা আনিবে বলিয়াছিল। বলিতে ভালো লাগিয়াছিল বলিয়াই বলিয়াছিল। তেমনি কতো কথা মিলিরও বলিতে ভালো লাগিয়াছে।

সময় সমুদ্রে কোটি-কোটি তরণী। পাশাপাশি আসিতে-আসিতে কোথায় কে পিছাইয়া পড়িল। কে কাহার জন্য দাঁড়ায়—সময়ের সমুদ্রে সময় কোথায়?

মার্চেন্ট আফিসে সামান্য এক কেরানিগিরি পাইয়া মানব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল। কাল তাহাকে গিয়া জয়েন করিতে হইবে।

এই উপলক্ষে বেনেপুকুরের মেসএর বাসিন্দারা আজ বিকেলে একটা বায়স্কোপ দেখিয়া হৈ-চৈ করিবার জন্য মাতামাতি করিতেছে। মানবের গলা সবাইর উপরে। গিরিজা টাকা লইয়া কখন টিকিট কিনিতে চলিয়া গিয়াছে, সে আসিলেই সকলে মিলিয়া বাস ধরিবে। ফিস্টেরও একটা ছোটো-খাটো ফিরিস্তি তৈরি হইয়াছে—বৈদ্যনাথবাবুর উপরেই সব জোগাড় করিবার ভার।

মাথা ধুইয়া বাঁ-হাতে প্রজাপতি-তোলা ছোট আয়না লইয়া মানব চুল আঁচড়াইতেছিল।

লোক্যাল ডাক এমন সময়েই আসে। নিচে হইতে বিকাশ একটা খাম হাতে করিয়া হাজির।

বিক্ষুব্ধ জনতাকে সম্বোধন করিয়া বিকাশ বলিল—কারো সর্বনাশ কারো বা পৌষ মাস। কেউ খায় পিঠে, কেউ খায় পি-ঠে! আমাদের ভাগ্যে জুতোর একটা সুখতলাও জোটে না, আর (মানবের দিকে খাম-সুদ্ধ হাত বাড়াইয়া) ওর ভাগ্যে কি না দিস্তাখানেক লুচি। মানুষের ভাগ্য যখন আসে, কপাল ফুঁড়ে আসে। চাকরি পেতে না-পেতেই বিয়ের নেমন্তন্ন।

খবরটা বিশদ করিয়া জানিবার জন্য সবাই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।

মানব সমানে চুল আঁচড়াইয়া চলিয়াছে।

চিঠিটা আসিয়াছে বুক-পোস্টে—মোড়কটা খোলা। বিকাশ চিঠিটা খুলিয়া বলিল—নেমন্তন্ন কন্যাপক্ষের! অতএব সুবিধের নয়। বরপক্ষ থেকে হলে বরং দু-দুবার মারতে পারতিস।

—তাই সই। বলিয়া সত্যেন চিঠিটা বিকাশের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া নিয়া পড়িতে লাগিল :

—আগামী ২৭শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার আমার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মঞ্জরী দেবীর সহিত—

মানব এতোক্ষণ এই খবরটারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাজ্যাতিক তাহার উইল-ফোর্স। সে দস্তুরমতো থট-রিডিং করিয়া পয়সা রোজগার করিতে পারে।

—শ্রীমান ব্রজবল্লভ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাজীবনের সহিত…

—বাবাজীবন! প্রথম একেবারে হাসিয়া খুন।

বিকাশ বলিল—যাই বলো, চমৎকার ইনিশিয়াল নামটার। বি. বি. বি। আয়নায় মুখ দেখিয়া মানব দিব্যি টেরি বাগাইতেছে। মুখে তাহার কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই তো? হাতটা কাঁপিতেছে নাকি? পাগল! নিজের মনে নিজেই সে একটু হাসিল। 'যাই বলো' কথাটা মিলি প্রায়ই বলিত বোধহয়।

কিছুই হয় নাই এমনি পরিষ্কার নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে মানব বলিল—তারিখটা কবে বললে?

—এই তো সামনের বেস্পতিবার।

মানব মনে-মনে হিসাব করিয়া বলিল—তাহলে মোটে চারদিন আছে। এখন থেকেই জোলাপ নিতে শুরু করি, কি বলিস বিকাশ?

বিকাশ হাসিয়া বলিল—এখন থেকেই নয় বাপু। কাল তোমার নতুন আপিস।

ভালো কথা মনে করাইয়া দিয়াছে। তবু মানব আমতা-আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—নিচে কার নাম? হীরালাল মুখুজ্জের?

চিঠিতে চোখ বুলাইয়া সত্যেন কহিল—হ্যাঁ. শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়। বাড়ির ঠিকানা রসা রোড সাউথ। দেখিস ঠিকানাটা হারিয়ে যায় না যেন। বলিয়া চিঠিটা খামে মুড়িয়া তাকের উপর রাখিয়া সে একটা বই চাপা দিল।

সন্দেহের আর কিছু বাকি ছিলো নাকি? কাঁটায়-কাঁটায় ঘড়ি মিলিয়াছে। দেওঘর থেকে আসিয়া মিলির ভালো নাম কবে সে মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

মানবের চুল আচড়ানো শেষ হয় না।

কতোগুলি কথা তাহার চট করিয়া মনে পড়িয়া গেলো—হীরালালবাবু আসিয়াছেন পিসিমা আসিয়াছেন, এস্রার-গানটা সঙ্গে লইয়া গোরাও নিশ্চয় আসিয়াছে। তাহার কাঠের বাক্সের তাহার সেই মিউজিয়মটা পিসিমা কিছুতেই আনিতে দেন নাই। আর কে-কে আসিয়াছে মানব তাহাদের কাহাকেও চিনে না। খুব ভিড়—দারুণ গোলমাল। হরিহর ফুড়ুকফুড়ুক করিয়া তামাক

টানিতেছে। সেই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটি এখন আর নাই, কবে চলিয়া গিয়াছে না-জানি। সতীশবাবু তেতলা হইতে নিশ্চয় এতো দিনে নিচে নামিয়াছেন। তাঁহার ব্লাড-প্রেসার এখন অনেকটা ভালো। কিন্তু সুবিনয় কি আসে নাই? কি জানি তাহার নাম? ব্রজবল্লভ! ব্রজবল্লভ দীর্ঘজীবী হোন।

হুড়মুড় করিয়া গিরিজা আসিয়া হাজির।

তাহাকে দেখিয়া বিকাশ জোর-গলায় সম্বর্ধনা করিল: এই যে গিরিজাগোবিন্দ গুহ। জি. জি. জি। শিবাস্তে আসন্ পন্থানঃ?

গিরিজা ব্যস্ত হইয়া বলিল—চলো, চলো, সাড়ে-পাঁচটা বেজে গেছে। প্রথম ব্রাকেট হইতে সার্টটা কাঁধে ফেলিয়া বলিল—আমরা তো কখন থেকে রেডি হয়ে আছি। মানববাবুরই হয়নি।

বিকাশ বলিল—ওরে, আজকেই নেমন্তন্ন নয়। চারদিন বাদে। এখন থেকেই চুলের কসরৎ করতে হবে না।

তাকের উপর আয়না-চিরুনি রাখিয়া মানব কহিল—বা, আমারো তো কখন হয়ে গেছে, চলো।

দল বাঁধিয়া সবাই একটা চলন্ত বাস আক্রমণ করিল।

দুইধারে বাড়ি আর দোকান—কেনা, বেচা, দরদস্তুর, কোলাহল।

তবু কোন নদীর জলে এখন সূর্যাস্ত হইতেছে। কোথায় কোন কুটিরে মাটির একটি বাতি জ্বলিল।

বাড়ি-ঘর-দোর লোকে গিসগিস করিতেছে। ব্যাপারীরা নানারকম হিসাবের ফর্দ আনিতেছে—হীরালালবাবুর ঐ সব দিকে পাকা নজর। তারপর সেই গুঁফো কাকাটি আছেন। বিবাহ করিয়া মিলি খারাপ হইয়া যাইবে বলিয়া দুইটা ধমক দিয়া না বসিলেই ভালো। সে যে ঘরে শুইত সেইখানে খোকা দোলনায় দুলিতেছে—তাহাকে ঘিরিয়া মাতৃত্বলোভিনীদের ভিড় লাগিয়াছে। পাছে কেহ আদর করিয়া গাল টিপিয়া দেয়—সেই ভয়ে মিসেস অনুপমা চাটুজ্জে সতর্ক চোখে কাছে-কাছে ফিরিতেছেন। মিলি যে-ঘরে শুইত সেইখানে পাটি বিছাইয়া ফরাশ পড়িবে—সেই ঘরেই হয়তো—ইস্, লোকটা আরেকটু হইলে চাপা পড়িয়াছিল! ড্রাইভারটা ওস্তাদ।

বায়স্কোপের প্রথম ঘণ্টা দিয়াছে। মানব হঠাৎ উঠিয়া পড়িল। বলিল—বাইরে থেকে আসি একটু।

—কিছু পান নিয়ে আসিস অমনি।

মানবের আর দেখা নাই। ছবি শুরু হইয়া গেল।

ফাঁকায় আসিয়া সে বাঁচিয়াছে। আর তার ভয় করিতেছে না।

কি করিবে—এমন দিনে মানুষে কী করে—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সে গাড়ি-মোটর বাঁচাইয়া আস্তে-আস্তে ইম্পিরিয়াল্ রেস্টোর‍্যাণ্টে আসিয়া ঢুকিল।

খালি একটা টেবিলের কাছে চেয়ার আগাইয়া বসিয়া সে অর্ডার দিল: এক পেগ হুইস্কি অউর এক প্লেট ফাউল-কাটলেট।

আরো অনেকে মদ খাইতেছে। অকারণে। অভ্যাসে পরিশ্রান্ত হইয়া। হয়তো আর কোনো কাজ নাই বলিয়া।

মদ খাইবে মনে করিয়া হঠাৎ সে গম্ভীর হইয়া পড়িল। ভাবিল: এই দুঃখ মিলি ভাগ্যিস পায় নাই। সে কখনোই ইহার মর্যাদা রাখিতে পারিত না। সে যে নারী। নারী বলিয়াই বিধাতা তাহাকে মায়া করিয়া এই দুঃখ দেন নাই। এই দুঃখকে প্রসন্নচিত্তে জীবনে স্বীকার করিয়া লইবার মতো চরিত্রের উদারতা ও বলিষ্ঠতা তাহার ছিল না।

আচার্যের ঢঙে এই কথা কয়টি মনে-মনে আওড়াইয়া সে হাসিল।

এবং বয় যখন মদ আনিয়া রাখিল তখন আরেকটু হইলে জোরেই সে হাসিয়া উঠিয়াছিল!

মিলির ভালোবাসার মতোই সোডার চঞ্চলতা ধীরে-ধীরে মিলাইয়া গেলে মানব গ্লাসটা দূরে সরাইয়া রাখিল। তাহার এমন কী দুঃখ যাহা ভুলিতে সে এতো কষ্টের পয়সা দিয়া মদ কিনিয়া বসিয়াছে। সে মদ খাইয়া তাহার এই চমৎকার অস্তিত্ববোধকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিবে নাকি?

ফাউল-কাটলেটটা চিবাইতে-চিবাইতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেলো, কাল তাহার নূতন চাকরিতে জয়েন করিতে হইবে।

অমনি তড়াক করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া সে লাফাইয়া উঠিল। পকেটে পয়সা এখনো কিছু আছে বটে—ফিটন একটা অনায়াসে নেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু চৌরঙ্গিতে কিছুক্ষণ না বেড়াইলে—অনেকটা না হাঁটিলে সে স্পষ্ট বুঝিবে না জীবনে সে আজ কতো বড়ো মুক্তি লাভ করিয়াছে। মুক্তি—পঙ্গপালবিধ্বস্ত মাঠের নিঃশব্দতা নয়।

মুক্তি—তাহার জীবনের শেষ আভিজাত্যটুকুও মিলাইয়া গেল।

যাক, আজ রাত্রে তাহার গভীর ঘুম হইবে। পরীক্ষা দিবার পর এতো শান্তিতে কোনোদিন সে আর ঘুমায় নাই।

মানবকে আমরা এইখানে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।

তবে এইটুকু মাত্র খবর রাখি যে সে এখনো বেনেপুকুরের মেস হইতে ডবলিউ. ডবলিউ. রিচার্ডসের অফিসে নিয়মিত দশটা-পাঁচটা করে। গত সনে তাহার তিন টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে।

আর এইটুকু জানি যে সময়-সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ—ফেনিল লেলিহান তার ক্ষুধা।

আরো এইটুকু জানি—কানে-কানে বলিয়া রাখি—হিসাবের খসড়া করিতে-করিতে রাজ্যের চিঠি-পত্র লিখিতে-লিখিতে আঙুলগুলি যখন বাকিয়া-চুরিয়া ভাঙিয়া আসে, তখন মাঝে মাঝে তাহার মনে হয় হাত পাতিলেই তো সে অনায়াসে সতীশবাবুর কাছ থেকে কিছু পাইতে পারিত।

আজ রাত্রে কখনো-কখনো যখন তাহার সহজে ঘুম আসে না, তখন ভাবে—রিথিয়া যাইবার পথে, ট্যাক্সিতে—এমন নিরালায়—এতো কাছে পাইয়াও মিলিকে সে সসম্মানে ফিরিতে দিয়াছিল কেন?

দিগন্ত

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচি

সুহৃদ্বরেষু

"নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যা খেলিতে বলি সে খেলা খেলাও হে।"

ব্যাপারটা মাত্র এইটুকু :

দুপুরবেলা মণিকা দোতলার ভাড়াটেদের ওখানে বেড়াইতে গিয়াছিল। ও-বাড়ির নতুন-বৌয়ের বর তাহার ছয়মাসের ছেলের জন্য সুন্দর একটি ফ্রক কিনিয়া আনিয়াছে। দুই হাতে মণিকা ফ্রকটা অনুভব করিতে লাগিল, নাকের কাছে তুলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসে তাহার ঘ্রাণ নিল, রঙের প্রাথর্যে চোখে তাহার নেশা ধরিয়াছে।

দোষের মধ্যে এই, মণিকা সেই ফ্রকটা হাতে করিয়া নিচে নামিয়াছিল ও স্বামীকে বলিয়াছিল, ছোট খোকার জন্য এমনি একটি জামা চাই। কতই বা আর দাম! পোশাকি বলিতে বেচারির একটাও তেমন জামা নাই, ভোলানাথ সাজিয়া কত কাল সে আর ভদ্রতা বাঁচাইয়া চলিবে?

কথাটা মণিকা যথাসম্ভব নরম গলায়ই বলিয়াছিল। এবং স্বামীর কাছে আবদার করিবার সময় শরীরকে যে ঈষৎ বাঁকাইয়া-চুরাইয়া রেখাসঙ্কুল করিয়া তুলিতে হয় তাহাও মণিকার জানা আছে।

দোষের মধ্যে এই, নন্দ এইমাত্র আফিস হইতে ফিরিয়া জামা-জুতা খুলিয়া পাখা হাতে নিয়া তক্তপোশে একটু বসিয়াছে। এখন এক গ্লাস নেবুর সরবৎ পাইলে গা-টা কিছু ঠাণ্ডা হইত! তাহার হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া নিয়া কেহ যদি সামনে দাঁড়াইয়া এখন একটু হাওয়া করে, নন্দ তবে ভয়ানক খুশি হয়!

নন্দও গলার স্বর যথাসম্ভব নরম করিয়া আনিল। দাম যতই কম হোক্ না কেন, চোদ্দ আনায় ছাপ্পান্নটি পয়সা—তাহার সঙ্গে আর আটটি পয়সা যোগ করিলেই নিরেট একটি টাকা হয়। সামান্য এক টাকার জন্য হরি কবিরাজ কয় দিন হইতে সমানে দুই বেলা তাগাদা দিতেছে।

খুঁটিয়া-খুঁটিয়া অমন হিসাব করিয়া কথা কহিলে শরীরের তরল রেখাগুলি সহসা কঠিন হইয়া উঠে। তাহার পর মণিকা যাহা বলিল অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের দিক হইতে কোথাও তাহাতে এতটুকু ত্রুটি ঘটিল না। সন্তানকে উপযুক্ত গাত্রবস্ত্র ও গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে যে অক্ষম, তাহার পিতৃত্বের ন্যায্য অধিকার আছে কিনা সেই সম্বন্ধে মণিকা হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল।

উত্তরে নন্দ যাহা বলিল মিথ্যা বলিয়া তাহাও উড়াইয়া দিবার যো নাই। বিবাহের আট বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই মণিকা যে এতগুলি সন্তানের জননী হইয়া বসিবে এটাও তাহার পক্ষে কৃতিত্বের কথা নয়।

তর্ক যখন একবার সুরু হইয়াছে তখন মণিকা স্বরে ও যুক্তিতে নিশ্চয়ই নন্দর সমান হইয়া উঠিবে। কেননা সমতল ভূমিতে মুখোমুখি হইয়া না দাঁড়াইলে তর্কের মর্যাদা রক্ষিত হয় না।

কিন্তু তর্কের ক্ষেত্রেও স্বামী-হিসাবে নন্দর স্থান যে মণিকার চেয়ে অনেক ধাপ উঁচুতে, পুলিশের সাক্ষীর মত স্বামী-হিসাবে তাহার কতগুলি সুবিধা যে অপরিহার্য, সেই কথাটা সাব্যস্ত করিবার জন্য নন্দ অতিমাত্রায় অস্থির হইয়া উঠিল।

মণিকা তাহা সহ্য করিবে না। অভিযোগ যে করে, সেই যদি আবার বিচারক হইয়া উঠে, তবে সংসার চলে না।

বটেই তো! নন্দও যেন গা পাতিয়া তাহা সহ্য করিবে!

সাড়ম্বরে সে-তর্কের সমাধা হইল!

হাতের পাখাটা দিয়া নন্দ ঠাস্ করিয়া মণিকার মাথায় এক বাড়ি মারিয়া বসিল। বাড়ি খাইয়া মণিকার বুদ্ধিও যে হঠাৎ খুলিয়া যাইবে তাহা আর বিচিত্র কী! ভাঙা একটা এনামেলের বাটি লইয়া কোলের ছোট ছেলেটা মেঝেময় হামাগুড়ি দিয়া ফিরিতেছিল; তাহার হাত হইতে বাটিটা কাড়িয়া লইয়া মণিকা নন্দর মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

অন্ধকার হইলে কী হইবে, সে-নিক্ষেপ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না!

বহুব্যবহৃত পুরোনো পাৎলা এনামেলের বাটি, আঘাতটা হয়তো ফুরফুরে একটা পালকের চেয়ে বেশি হইবে না। মণিকার তাহা মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু শারীরিক আঘাতটাই তো এখানে বিবেচ্য নয়। স্বামিত্বের প্রতি এই নৈতিক অবমাননা নন্দ চুপ করিয়া হজম করিতে পারিল না। একলাফে তক্তপোশ হইতে নামিয়া পড়িল।

মণিকা যে তাহার কত ধাপ নিচে আছে, তাহাই সাব্যস্ত করিবার জন্য নন্দ প্রথমে ডান হাতে তাহার চুলের ঝুঁটি চাপিয়া ধরিল ও সমমাত্রিক ছন্দে তাহার পিঠে ও কোমরে গোটা কয় লাথি বসাইয়া তাহাকে একেবারে মাটিতে শোয়াইয়া দিল।

মণিকার দলে অনেক লোক—তাহার তিন-তিনটি অসহায় সন্তান—কিন্তু রসনা ছাড়া তাহাদের দ্বিতীয় অস্ত্র নাই। সমতারস্বরে তাহারা চীৎকার জুড়িয়া দিল।

তফাৎ শুধু এই যে, তাহাদের ভাষা দুর্বোধ হইলেও প্রতিবাদের একটা স্বাভাবিক অর্থ আছে। কিন্তু মণিকা ছুরির ফলার মত জিহ্বা শানাইয়া

যাহা বলিয়া বসিল তাহা প্রচণ্ড মূর্খতা। বলিল—এমন যে পাষণ্ড, সে মরে না কেন? মরিলে তাহার হাড় জুড়ায়, নিশ্চিন্ত হইয়া হাই তুলিতে পারে।

যাহা মুখে আসে তাহা বলিলেই যদি ফলিত, তাহা হইলে পৃথিবীতে অন্য কাহার কী হইত কে জানে, মণিকার দুর্গতির অন্ত থাকিত না। নন্দ এমন-কি একটা ইন্‌সিয়োর পর্যন্ত করে নাই যাহা তাহার তিরোধানের সঙ্গে-সঙ্গে মণিকার হাতে আসিয়া পড়িবে। তাহা ছাড়া নন্দর মৃত্যুর পর মণিকা তিন-তিনটি অসহায় ছেলে-মেয়ে লইয়া একেবারে গভীর জলে তলাইয়া যাইবে, মণিকা এখন তাহা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিতেছে না—দুই কূলের কোথাও তাহার জন্য এতটুকু আশ্রয় থাকিবে না।

কড়া কথা নন্দরও মুখে আসে না এমন নয়, কিন্তু মণিকার মৃত্যুতে তাহার তেমন কিছুই লাভ হইবে না। বরং, অপোগণ্ড শিশুগুলি লইয়া কী যে সে বিপন্ন হইয়া পড়িবে তাহা ভাবিতেও তাহার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। রাগ করিয়া এখনো বরং বাড়ির বাহির হইয়া যাইবার স্বাধীনতা আছে, তখন রাগ করিবার লোকও যেমন থাকিবে না, বাহিরে যাইবার পথও তেমনি বন্ধ হইয়া যাইবে। উহাদের রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাতে আরেকটা বিবাহ সে অনায়াসে করিতে পারে না এমন নয়। কতই বা তাহার বয়স হইয়াছে? নিয়মিত দাড়ি কামাইতে পারে না, ও দুশ্চিন্তায় মুখের রেখাগুলি একান্ত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বয়সের অতিরিক্ত বৃদ্ধ তাহাকে একটু দেখায় বটে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এই বয়সে লোকে প্রথম প্রেমে পড়িলে বিশেষ বেমানান হয় না, বিলেতে তো সেইটাকেই বিশেষ স্বাস্থ্যস্ফূর্তির সুলক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

নন্দ জুতাজোড়ার মধ্যে পা ঢুকাইয়া জামাটা গায়ে দিল। থাক্, অত বাবুগিরিতে তাহার কাজ নাই, সুযোগও অল্প, বাঙালি হইয়া যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছে তখন চক্ষু মুদিয়া প্রাণপণে তাহার নিজের স্ত্রীকেই ভালোবাসিতে হইবে। জামার বোতাম লাগাইবার সময় হইল না। দরজার দিকে আগাইয়া আবার সে একটু ফিরিল। মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া মণিকা তেমনি চেঁচাইতেছে, পা দিয়া ঠেলিয়া-ঠেলিয়া জিনিসপত্র কাপড় জামা বাক্স বিছানা সব তছনছ করিয়া দিতেছে—ভয় বা লজ্জা বলিয়া চরিত্রে তাহার বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখা গেল না। ছেলে মেয়েগুলিকে দুই হাতে চড় লাথি মারিয়া, পরণের জীর্ণ শাড়ি ফর্‌ ফর্‌ করিয়া টানিয়া আড়াআড়ি হাত দুই ছিঁড়িয়া দিয়া, কালির দোয়াতটা দেয়ালের উপর আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া মণিকা ভাবিতে লাগিল নন্দর উপর চমৎকার প্রতিশোধ নেওয়া হইতেছে। বাছিয়া-বাছিয়া নিজের কাপড়টাই ছিঁড়িল ও

কাঁচের গ্লাস বা টাইম্-পিস্‌এ হাত না দিয়া নিতান্তই চিনে-মাটির দোয়াতটা ভাঙিল বলিয়া নন্দ বিশেষ বিচলিত হইল না, তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

মণিকাকে সেও অনায়াসে মরিতে বলিতে পারিত, কিন্তু পুনরায় বিবাহ করিবার কথা ভাবিতে গেলেই তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। তাহা ছাড়া তাহাকে মরিতে বলা-টা নন্দর মুখে কেমন যেন স্নিগ্ধ আশীর্বাদের মত শোনাইবে। মণিকা আছে বলিয়া যা-হোক্ তাহার বিনা-মাহিনায় ঝি ও ঠাকুরের কাজগুলি চলিয়া যাইতেছে, ছেলেমেয়েগুলিকে কোলে-কাঁখে করিয়া ঘরময় টহল দিয়া ফিরিতে হইতেছে না, মরিলে তাহার চলিবে কেন?

অন্যমনস্ক হইয়া রাস্তা পার হইতে যাইবে বিপুলকায় একটা মোটর-বাস্ ঠিক কানের কাছে ভোঁ করিয়া উঠিল। এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হইলেই হইয়াছিল আর-কি; কিন্তু তাহার শোকে মণিকা কেমন করিয়া হাঁক পাড়িত সেইটাই শুধু দেখা হইত না। নন্দ রাস্তা পার হইয়া একটা চায়ের দোকানে ঢুকিয়া পড়িল। ঝগড়াটা আজ হঠাৎ এমন বেটাইমে হইল বলিয়া চায়ের পেয়ালায় নিতান্তই নগদ দুইপয়সা খরচ হইয়া যাইবে, নচেৎ ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও এতটুকু অতিরঞ্জনের মোহ ছিল না। নিশ্বাস নেওয়ার মতই সহজ, আপিসে গিয়া কলম-পেষার মতই অনায়াস। বছর আষ্টেক তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, এবং বিবাহের কাজ-কর্ম উৎসব-আয়োজন চুকিতে পাঁচ দিন যা গিয়াছিল, সেই পাঁচটি দিনই তাহারা কোনো রকমে চুপ করিয়া ছিল। তাহার পর হইতেই গ্রামোফোনের ভাঙা রেকর্ডের ফাঁকে সেই যে পিন্ আটকাইয়া গিয়াছে, গান আর কিছুতেই বাহির হইতেছে না। তাই বলিয়া গ্রামাফোনের দম বন্ধ হয় নাই, রেকর্ড সমানেই ঘুরিয়া চলিয়াছে।

হেঁট হইয়া বসিয়া নন্দ চায়ের বাটি শেষ করিল। এখন সে কোথায় যায়! কাছে হরিশ পার্ক ছাড়া এ-সময় যাইবারই বা তাহার জায়গা কোথায়! অথচ কোথাও এখন চলিয়া যাইতে পারিলে কী যে তাহার ভালো লাগিত! বিবাহের পর প্রথম বৎসরটাই মণিকা দুয়েকবার তাহার মামার বাড়িতে আনাগোনা করিয়াছিল—মামার বাড়িতেই সে মানুষ হইয়াছে—কিন্তু এক বৎসরেই সে সম্পর্ক চুকিয়া গেছে। দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই তো মেয়েকে পরের হাতে পার করিয়া দেওয়া—কালে-ভদ্রে দু'একখানা পোস্টকার্ড লিখিলেই যথেষ্ট, তা পোস্ট-কার্ডের দামও ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে। ইচ্ছা করিলেই শিলচরে মামা-বাড়িতে যাওয়া যায় না—ধারধোর করিয়া কোনো রকমে সেখানে উহাদের ঠেলিয়া দিলেও নন্দ বিশ্রাম পাইবে না। ছেলেপিলেদের দুধের খরচ জোগাইতে হইবে,

সেবার আছাড় পড়িয়া বড় মেয়ে পুঁটুর হাঁটুটা ছড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া দস্তুরমত টিঙ্কচার আইয়োডিন্ এর দাম দিতে হইয়াছিল— ভারি হাতে সেখানে কাহারো একখানা অসুখ হইয়া পড়িলেই হইয়াছে। এই সব ভাবিয়া মণিকা নিজেই আর বায়না ধরে নাই। কিন্তু কোথাও তাহাকে পাঠাইয়া দিতে পারিলে মন্দ হইত না। দিন দুই ফাঁকা হইয়া হাত-পা ছড়াইয়া নন্দ তাহা হইলে বুক ভরিয়া নিশ্বাস নিতে পারিত। চিঠিটা পর্যন্ত লিখিত না।

হরিশ-পার্কে ছোট-ছোট ছেলের দল একটা টেনিস্ বল্ লইয়া প্রাণপণে ফুটবল খেলিতেছে। নন্দ তাহারই একধারে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। দিব্যি অন্ধকার করিয়া আসিয়াছে, বল দেখা যায় না—তবু যেখানেই দুই তিন জন মিলিয়া ভিড় পাকাইতেছে, সেখানেই বল আছে ভাবিয়া অন্য ছেলেরা ভিড়ের মধ্যে হুড়মুড় করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। বল সেখানে না থাকিলে তো তাহাদের ভারি বহিয়া গেল! সারা গায়ে ধুলা-মাটি মাখিয়া খানিকক্ষণ ঝটাপটি করিতে পারিলেই তাহারা খুশি।

নন্দর কেন-জানি ইচ্ছা হইল ঐরকম ইস্কুলের নিচু ক্লাসের ছেলে হইয়া আবার সে নতুন করিয়া জীবন আরম্ভ করে! এত বেশি অভিজ্ঞতার পুঁজি লইয়া জীবনে কিছু সে অগ্রসর হইয়াছে এমন মনে হইল না। সামান্য একটা বল্ লইয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া প্রবল আগ্রহে মাতামাতি করিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যাইত - জীবনে ইহার চেয়ে বৃহত্তর অভিলাষের কথা সে ভাবিতেও পারিত না।

পার্কের গ্যাস্ জ্বলিয়া উঠিয়াছে—বরফওয়ালার ডাকে নন্দর তন্দ্রা ভাঙিল। স্বপ্নের পাখায় চড়িয়া মাটি হইতে বেশি উপরে সে উঠিতে পারে না, সহজেই সে নামিয়া আসে। আজই বরং বিকেলের দিকে ঝগড়া হইয়া গেল বলিয়া তাহাকে এক পেয়ালা চায়ের জন্য রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতে হইয়াছিল নতুবা ঘরে বসিয়া-বসিয়াই সে দৃশ্যান্তরের মজা দেখিত—খানিকক্ষণ কান্নাকাটি করিয়াই মণিকা আবার ঘরের আবশ্যক কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, ছেলেপিলেগুলিকে অকারণে বেশিক্ষণ কাঁদাইতে তাহার মায়া করে। এবং রাত গভীর হইয়া আসিলেই মণিকা আবার কখন নন্দর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে! কোথাও এতটুকু বাধে না।

আজ এখন ঘরে ফিরিয়া আবার সেই কৃত্রিম মিলনের অভিনয় সুরু হইবে ভাবিতে নন্দর দেহ-মন সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু ইহা ছাড়া উপায়ই বা কী আছে! দুইটি প্রাণী সারাক্ষণ মুখোমুখি বসিয়া একনাগাড়ে বৎসা করিতে পারে না, জিহ্বার সঙ্গে-সঙ্গে মন-ও ক্লান্ত, বিমর্ষ হইয়া উঠে। এবং একসঙ্গে দুই

জনেরই শারীরিক উপশমের প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু নন্দ সেই অন্তরঙ্গতার আনন্দহীন চেহারার কথা মনে করিয়া মনে-মনে অত্যন্ত মলিন হইয়া উঠিল।

অথচ বাড়ি ছাড়া এ-সময় যাইবার জায়গাই বা তাহার আছে কোথায়?

সুস্থ, সুন্দর কতগুলি ছেলে পরম নির্ভাবনায় রাবার্-এর একটা বল লইয়া মাতামাতি করিতেছে। তাহাদের বাবা মা'র জীবনে গোপনতম কোনো বেদনার ইতিহাস আছে কি না জানিবার তাহাদের বিন্দুমাত্র কৌতুহল নাই। আরো কিছু বড়ো হইলে ছটু-ও তো এমনি খেলিয়া বেড়াইবে।

ঠিক—নন্দ যাহা ভাবিয়াছিল, কোথাও এতটুকু ভুলচুক হয় নাই। মেঝেয়ই তেমনি ঢালা বিছানা পাতা হইয়াছে, তক্তপোশে নন্দর সেই ছেঁড়া তুলো-ওঠা এবড়ো-খেবড়ো তোশক। ছটু বালিশের সঙ্গে বিছানাময় কুস্তি করিয়া এতক্ষণে কাবু হইয়াছে—না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া পুঁটু পাশের রান্নাঘরে বসিয়া মা'র হাতের কিল খাইতেছে। ঘরের এক কোণে লণ্ঠনটি মিটিমিটি করিতেছে,—স্বদেশী চিমনি প্রতিযোগিতার লজ্জায় ইহারই মধ্যে কালি হইয়া গিয়াছে। দড়ির উপর কাপড়-জামাগুলি তেমনি ঝুলিতেছে—দেয়ালে তাহাদের দীর্ঘ ছায়া পড়িয়া সমস্ত ঘরখানিকে কেমন করুণ দেখাইতেছিল।

জুতার শব্দ পাইয়া পাশের ঘর হইতে মণিকা খেঁকাইয়া উঠিল: এই সঙ্গে গিলে নিলেই তো হতো—

পরীক্ষায় জানা প্রশ্ন পাইয়া আগাগোড়া মুখস্ত লিখিয়া দিবার মত নিশ্চিন্ত আরামে নন্দ রান্নাঘরে আসনে আসিয়া বসিল। সেই শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড় পরিয়া মণিকা গ্লাস বাটি ডেকচি-কড়া নিয়া পার্কের ছেলেদের মতই মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঘুমো চোখে পুঁটু সমস্ত থালাটা সাবাড় করিতে পারিতেছে না বলিয়া কী তাহার ধমক: ফেলবি তো, চড় মেরে চোয়াল বেঁকিয়ে দেব বলছি। এতো সব আসে কোত্থেকে?

থালায় মুখ গুঁজিয়া নন্দ নিঃশব্দে খাইতে লাগিল। এই সামান্য ক্ষণ কথা না কহিয়া স্তব্ধ হইয়া কাছে বসিয়া থাকিবার মধ্যে বিরহ-রাত্রির ক্ষীণ একটু স্বাদ আছে। তাই আজ রাত্রে হঠাৎ অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে—এই অজুহাতে নন্দ খোলা বারান্দায় শুইতে আসিল। শুনিলে বিশ্বাস হয় না যে মণিকাও তাহাকে ঘরে আসিয়া শুইবার জন্য অনুরোধ করিল না।

এমনি করিয়াই দিন হয়তো কাটিত—

এমনি করিয়াই তো এত দিন কাটিয়াছে। উদয়াস্তের মত অবিচিত্র সেই দিন-রাত্রির পৃষ্ঠা উল্টাইয়া আট বৎসরের মধ্যে মাত্র ঐ একটি দিনের সন্ধান পাওয়া যায় যেদিন রাত্রে নন্দ বাহিরের বারান্দায় শুইয়া ভাবপ্রবণ প্রথম প্রেমিকের মত আকাশের তারা দেখিয়া ভাবিয়াছিল—সত্যিই সে সুখী হয় নাই; আর যেদিন মণিকা মনে-মনে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একত্র করিয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল : আমার হাতের শাঁখাকে তোমাদের সম্মিলিত শক্তির মত দুর্ধর্ষ কর। সেই মাত্র একটি দিন, যে-দিন ব্যবধানটি সঙ্কীর্ণতর হইয়া অশুচি হয় নাই, যে-দিন অ-পূর্ব নিঃসঙ্গতার মধ্যে অবারিত একটি সান্নিধ্যের স্পর্শ পাইয়া দুইজনে চুপি-চুপি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু গল্প তাহা লইয়া নয়।

সেইবার বড়োদিনের ছুটিতে কার্জন-পার্কে প্রফুল্লর সঙ্গে নন্দর হঠাৎ দেখা হইয়া গিয়াছিল। বঙ্গবাসী কলেজে তাহারা একসঙ্গে পড়িত—সেইকথা প্রফুল্ল এখনো ভোলে নাই। নগদে কিছু টাকা ও পৌত্রের মুখ দেখিবার জন্য নন্দর বাবা কলেজে পুরা চার বৎসর কাটিতে না কাটিতেই ছেলের বিবাহ দিলেন, সেই হইতেই দুই জনে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। প্রফুল্ল ময়মনসিঙে ওকালতি করে ও জুনিয়ার উকিলদের মধ্যে এই অল্প কয়দিনেই বেশ নাম করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার প্রতিপত্তি ও ব্যক্তিত্ব এমন প্রবল যে সে ইহারই মধ্যে লোক্যাল-বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান্ হইবার জন্য ভোট কুড়াইতেছে, স্থানীয় মেয়ে-ইস্কুলের সে সেক্রেটারি, লোন্-আফিসের সে একজন সদস্য—আরো কত কী তাহার গুণাবলী! নন্দ তাহার বলদৃপ্ত উৎসাহ-উদ্দীপ্ত মুখের দিকে ভীরুর মত চাহিয়া রহিল।

প্রফুল্ল তাহার হাতে প্রবল এক ঝাঁকানি দিয়া কহিল,—কী খবর?

নন্দর আবার খবর কী! ভালো দেখিয়া চাকরি একটা জোগাড় করিয়া দিতে পারিলে সে বাঁচে।

সে এমন একটা বেশি কথা নয়। প্রফুল্ল চেষ্টা করিলে কিছুই অসম্ভব হইবে না। তবে কলিকাতার লোক—দূর পূর্ববঙ্গে গিয়া মন তাহার টিকিবে তো?

নন্দ হাসিয়া বলিয়াছিল—মন-নামক কোনো ব্যাধি দ্বারাই সে আক্রান্ত নয়, সম্প্রতি উদরের সমস্যাই ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রফুল্ল আবার অভয় দিল—সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

প্রফুল্ল চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ফিরিয়া কহিল,—নন্দ, আমার সঙ্গে একটু কালিঘাট যাবে—এই হাজরা-রোড?

নন্দ তাহার বেশ-বাসের দিকে চাহিয়া দমিয়া গেল : কেন?

—আর বলো না। কে না কে এক এন্‌-মিত্তির ব্যারিস্টার আছেন—তাঁর মেয়েকে দেখে যেতে হবে।

—তোমার ছোট ভাইয়ের জন্যে?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল,—কেন, বড়ো ভাই কী দোষ করল?

নন্দ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। কহিল,—তুমি এখনো বিয়ে করো নি?

—সময় পেলাম কবে? চলো, চলো, তোমরা হলে ভাই অভিজ্ঞ লোক, মেকি কি খাঁটি সহজেই ধরে ফেলতে পারবে। কুমারী মেয়ের আঁচলের হাওয়া লেগে আমি হয় তো আলগোছে মূর্ছা যাবো। চলো, মন্দ কি, অন্তত টি-কেইক তো হবে।

নন্দর হঠাৎ কী হইল কে জানে, সে ফট করিয়া বলিয়া বসিল: খাসা অভিজ্ঞ লোকই পাকড়েছ ভাই। মেয়েছেলে পায়ে হাঁটে, না, পাখায় ওড়ে, সেই খবরটাই এখন পর্যন্ত পাইনি। সারা জীবন লক্ষ্মণের মতোই মাথা হেঁট করে রইলাম।

—বলো কী নন্দ, বিয়ে করো নি এখনো?

একটুও আম্‌তা-আম্‌তা না করিয়া পরিষ্কার গলায় নন্দ কহিল,—সময় যথেষ্ট ছিলো বটে, কিন্তু পেট ভরাবার পয়সা কই? বলে, একা নিজেই খেতে পাই না, তাই সাধ করে শঙ্করীকে ডাকতে যাই আর-কি। আর জানোই তো সব, স্ত্রী-ছাড়া আমাদের জীবনে অন্য রিক্রিয়েশান্‌ নেই—বিয়ে করলেই—কী যেন সেই কাপ্‌লেট্‌টা? বলিয়া নন্দ স্মিতমুখে এটা-ওটা বলিতে-বলিতে আস্তে-আস্তে কাটিয়া পড়িল।

নিরবগুণ্ঠা স্থিরযৌবনা কুমারী মেয়ের দিকে স্বপ্ন-পরিপূর্ণ গাঢ় চোখে চাহিয়া থাকিতে তাহার ভয় করে।

দূর পূর্ববঙ্গে চাকরি করিতে যাইবার জন্য তাহার যেন আর ঘুম হইতেছে না! মুখের কথা একটা বলিলেই হইল আর-কি। কিছু একটা বলিতে হয় বলিয়া অমন দুয়েকটা বেফাঁস কথা সকলেই কহিয়া থাকে। নহিলে ছেলেপিলে লইয়া ঐ সৃষ্টি-ছাড়া দেশে কে মরিতে যাইবে?

আজ—প্রায় দেড় বছর পরে প্রফুল্ল হঠাৎ তাহাকে চিঠি লিখিয়া বসিল। আশ্চর্য, এত দিনেও সে সেই কার্জন-পার্কের অতর্কিত সাক্ষাতের একটি কথাও ভোলে নাই,—নন্দর ঠিকানা পর্যন্ত সে মনে করিয়া রাখিয়াছে। চিঠিটা আদ্যোপান্ত পড়িয়া নন্দর প্রথমে কিছুই অর্থবোধ হইল না; এত দিন পরে নিজের প্রতিজ্ঞা-

পূরণ করিবার জন্য কেহ যে ব্যগ্রতা দেখাইতে পারে সেই বিস্ময়টাই তাহার কাছে অসহ্য লাগিতেছে।

প্রফুল্ল লিখিয়াছে এই বছরের ইলেক্‌শানে সে লোক্যাল বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান্ হইল--একটি কেরানির পদ খালি আছে, নন্দ ইচ্ছা করিলে তাহা পাইতে পারে। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাহিনা,--টাকাটা দেখিতে অবশ্য মোটা নয়, তবে সম্প্রতি এখানে বাড়ি ভাড়া লাগিবে না,--প্রফুল্লরই একখানি বাড়ি খালি পড়িয়া আছে, ইতিমধ্যে বিবাহ করিয়া থাকিলে সপরিবারে তাহা সে ব্যবহার করিতে পারে। তা ছাড়া জিনিস-পত্র এখানে নিদারুণ সস্তা, এক পয়সায় তিন সের করিয়া বেগুন, তাহার উপরও গোটা দুই-তিন ফাউ মিলে। নন্দ ওখানে কত মাহিনা পায় তাহা প্রফুল্ল জানে না - তবে তাহার পোষাইলে সে অনায়াসে চলিয়া আসিতে পারে। না আসিলে যেন তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিয়া জানায়--অন্য লোক জোগাড় করিতে হইবে। প্রার্থীর অন্ত নাই।

নন্দ স্তব্ধ হইয়া বারকতক চিঠিটা পড়িয়া, শব্দের অর্থ ধরিয়া-ধরিয়া অনেক কষ্টে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিল। সোজা--একেবারে জলের মত সোজা, চিঠির অক্ষরগুলি প্রফুল্লর আনন্দদীপ্ত দৃষ্টির মত পরিষ্কার--নন্দ ছেলেমানুষের মত চিঠি হাতে লইয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। রান্নাঘরে ঢুকিয়া মণিকার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া কহিল,--নতুন একটা চাকরি পেয়ে গেলাম--ময়মনসিংে। এখানকার থেকে পনেরো টাকা বেশি মাইনে। প্রফুল্ল যখন আছে, কিছু দিন বাদে কোন্ না দু'চার টাকা বাড়িয়ে নিতে পারবো?

মণিকা সহসা কিছু বুঝিতে পারিল না; কহিল,--কী চাকরি?

--যথা পূর্বং তথা পরং। সেই কেরানি। তা হোক্, আজই চল্‌লাম আমি।

মণিকা চিঠিটা নন্দর হাত হইতে কাড়িয়া নিল। আগাগোড়া পড়িয়া মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল,--ও-সব বাজে কথায় নেচো না বলছি; কে না কে মিছিমিছি একটা লোভ দেখাচ্ছে--সেই আশায় এ চাকরিটাও যাক্। তবু দু'বেলা দু'টি খেতে পাচ্ছিলাম।

নন্দ হাসিয়া কহিল,--খেপেছ? প্রফুল্ল আমার সঙ্গে জীবন-মরণ নিয়ে এমন একটা মারাত্মক রসিকতা করবে? তা ছাড়া এখানকার চাকরিতে আমি ইস্তফা দিচ্ছি না--সোমবারের জন্যে একদিন সিক্-লিভ্ নিলেই যথেষ্ট। আজ শুক্রবার--রাত্রে বেরুলে কাল বিকেলের দিকে সেখানে পৌছুব। হাল্-চাল্ সুবিধের না দেখলে সোমবার আমি আমার পীঠস্থানে ফিরে আসবো

দেখো। যদি সুবিধে তেমন-কিছু সত্যি না দেখি,—প্রফুল্লর থেকে আমার খরচ আমি আদায় না করে ছাড়ছি না। একেবারে ইণ্টার-ক্লাশ!

মণিকার মুখের চেহারা তবুও ফর্‌সা হইল না; কহিল,—আমাদের তবে কী হবে?

—তোমরা ক'টা দিন ধৈর্য ধরে থাকবে—বাড়ি তো মাগনাই পাওয়া যাচ্ছে শুনছি– গিয়ে পাকাপাকি বন্দোবস্ত একটা করে ফেলতে পারলেই তোমাদের নিয়ে যাবো। নিজে না পারি নগেনকে লিখে দিলেই চল্‌বে– শালা তো বেকার বসে আছে– দিদিকে পৌঁছে দিতে পারবে না?

মণিকা ঠোঁট কুঁচকাইয়া কহিল,– তার বয়ে গেছে।

—বা, আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। বিনি-পয়সায় ট্রেন চড়তে পাবে—তার তো সৌভাগ্য। আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে—পরের কথা পরে। তোমার রান্নার কদ্দুর? চান্‌টা আমি সেরে আসছি—ক'টা বাজলো?

মণিকা কর্কশ গলায় কহিল,—কিন্তু এ ক'দিন কী করে আমাদের চলবে শুনি? হাতে আমার এখন চারটি মাত্র টাকা আছে—

—অন্তত দশদিন তো চলবে। তার জন্য ভাবছ কেন? ওর মধ্যেই সব ঠিকঠাক্ করে ফেল্‌বো।

—কিন্তু এই শীত এসে পড়লো, বাচ্চুটার গায়ে আস্ত একটা জামা নেই। আর দেখ দিকি আমার এই কাপড়-চোপড়ের চেহারা! হায়া বলে কোনো জিনিস তোমার আছে? আমাদের এখানে মরতে ফেলে রেখে হাওয়া খেতে বেরিয়ে পড়তে তোমার লজ্জা করে না?

কথা শুনিয়া নন্দ স্তম্ভিত হইয়া গেল। যথাসাধ্য গলা খাটো করিয়া কহিল,—অবস্থা একটু ফিরবে আশা করেই তো বিদেশে যাচ্ছি। আর কাদের জন্যে এতো মেহনৎ বলো! আমার একার জন্যে তো ভারি দায় পড়েছিলো!

- তাই বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে দেশ বেড়াতে চল্‌লে? এখানে আমি একা মেয়েমানুষ—ছেলেপিলেগুলি নিয়ে কোন দিক সামলাই তার ঠিক নেই, না আছে একটা ঝি বা ঠাকুর—আর উনি চল্‌লেন বন্ধুর সঙ্গে সোহাগ করতে!

—দোতলার প্রদোষবাবু ও তাঁর মাকে বলে যাবো, এ ক'দিন তাঁরাই দেখবেন-শুনবেন। তাঁদের সঙ্গেই বাজারটা সেরে নিয়ো।

—আহা-হা, কাঁচকলার বাজার—এক-পয়সার তেল আর আধ-পয়সার নুন—ওঁদের সঙ্গে বাজার সেরে নেবে। যেমন বিদ্যে তেমনিই তো বুদ্ধি

হবে। যাবার আগে আমাদের সবাইকে বিষ খাইয়ে যেতে পারো না? তবেই তো নিশ্চিন্ত!

নন্দ রান্নাঘরের তাকে তেলের বাটি খুঁজিতে লাগিল।

—আর এ-দিকে ছেলেদের কারো একটা অসুখ করুক, পাওনাদারের দল মেয়েছেলে পেয়ে আমাকে পাঁচ কথা শুনিয়ে যাক্,—প্রদোষবাবু আসবেন মাথা পাততে! বলতে জিভটা খসে পড়লো না? বৌকে ধরে যে মারে তার জন্যে লোকের আবার মায়া হবে!

নন্দ বুকে-পিঠে তেল মাখিতে মাখিতে ভিতরের রাগটা ঠাণ্ডা করিতে লাগিল।

কলতলায় আসিয়া বালতিতে করিয়া মাথায় জল ঢালিবে, নন্দ শুনিতে পাইল রান্নাঘরে মণিকা দুই হাতে বাসন-পত্র ঝন্‌ঝন্ করিয়া মেঝের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া চীৎকার করিতেছে: কার—কার জন্যে এই সব আমি রাঁধতে যাবো? কিসের এতো মাথা-ব্যথা? যাক্, যাক্ সব ভেঙে-চুরে খান্‌খান্ হয়ে। আসুক একবার খেতে—বলিয়া এক ঘটি জল লইয়া মণিকা উনুনের মধ্যে ঢালিয়া দিল।

মায়ের এই উগ্র মূর্তি দেখিয়া কোলের ছেলেটা তারস্বরে চেঁচাইতে সুরু করিয়াছে।

ছেলেটার গাল দুইটা দুই আঙুলে খিম্‌চাইয়া ধরিয়া মণিকা তাহার পিঠে এক কিল বসাইয়া দিল। কহিল,—মরতে পারিস না? কেন এসেছিস জ্বালাতে? কেন দু'বেলা দুধ খেয়ে তার পয়সা নষ্ট করিস?

ছোট ভাইয়ের কান্না শুনিয়া পুঁটু বউ-বাটি খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। গায়ে সামান্য একটা ফ্রক—নাকে একটি নোলক ঝুলিতেছে। মেঝে হইতে ছোট ভাইকে কোলে তুলিয়া লইবে, মণিকা তাহার চুলের ঝুঁটি শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। দেওয়ালে তাহার মাথা ঠুকিয়া দিতে-দিতে কহিল,—পাড়া-বেড়ানি এসেছেন এতোক্ষণে! খালি গিলতেই পারে সব, মরবার আর কারু নাম নেই। গায়ের জামাটা এ কী করেছিস হারামজাদি—বলি, বছরে ক'টা জামা তোর আসে?

ছটু দোতলার ট্যাঙ্ক হইতে একতাল নরম মাটি আনিয়া নিচে বসিয়া ইচ্ছা-মত বাঘ-ভাল্লুক গড়িতেছিল। রোদে শুকাইয়া তাহাদের গায়ে সে রঙ চাপাইবে—সামনে যে পৌষ-সংক্রান্তির মেলা আসিতেছে তাহাতে সে ফুটপাতের ধারে বসিয়া দোকান দিবে—দুই-একটা বিক্রি নিশ্চয় হইবেই। কাগজের ফুল বিক্রি হয়—আর এ তো জলজ্যান্ত একটা বাঘ, দাঁত খিঁচাইয়া জিভ বাহির করিয়া আছে। বিক্রি করিয়া দুইটা পয়সা হাতে আসিলেই ছটু অম্লানমুখে তাহা ব্যয় করিয়া

নাগর-দোলা চাপিয়া বসিবে। বাঘের মুখে কাঠি গুঁজিয়া জিভ তৈরী করিতে-করিতে সর্বাঙ্গে ছটু ঘূর্ণ্যমান নাগর-দোলার শিহরণ অনুভব করিতে লাগিল।

দিদির কান্না শুনিয়া গায়ে-মুখে মাটি লইয়া ভূত সাজিয়া ছটু-ও আসিয়া হাজির। মণিকা পুটুকে ফেলিয়া মেঝে হইতে দুধের হাতাটা তুলিয়া লইয়া তাহারই দিকে তাড়িয়া আসিল। ব্যাপারটা বুঝিতে ছটুর দেরি হইল না—অনায়াসে মায়ের লক্ষ্য পার হইয়া ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মণিকা হাতাটা ছুঁড়িয়া মারিল বটে, কিন্তু লাগিল আসিয়া মাটির কলসিটার উপর।

নেপথ্যে দাঁড়াইয়া নন্দ সমস্ত শুনিল, কিন্তু উত্তেজিত হইয়া একটুও প্রতিবাদ করিল না। স্নান সারিয়া আঙুলে চুলগুলি একটু আঁচড়াইয়া জামা গায়ে দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ময়মনসিঙ যাইবার খরচটা কাহার কাছে সে ধার করিতে পারে এই ভাবনাই এখন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

বাড়ি ফিরিল সন্ধ্যার কিছু আগে—মণিকা ইহারই মধ্যে রান্না করিয়া রাখিয়াছে। টিনের ছোট ট্রাঙ্কটিতে নন্দর জামাকাপড়, দাড়ি কামাইবার পুরানো সরঞ্জামগুলি, চিঠি লিখিবার কিছু কাগজ, দুয়েক খানা পুরানো মাসিক-পত্র এইবার সে গুছাইতে বসিল। আবশ্যকীয় কি-কি জিনিস আর দেওয়া যাইতে পারে—দিবার আর কি-ই বা আছে—মণিকা কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না। জিনিস-পত্র গোছানোও তাহার ঠিক মনমত হইতেছে না—কবিতায় মনের ঠিক ভাবটি প্রকাশ করিবার জন্য যেমন বিশেষ একটি ছন্দ চাই—তেমনি কী করিয়া কোথায় কী সাজাইয়া বাক্সটি গুছাইয়া দিলে মনের ব্যাকুলতাটি ঠিক-ঠিক ধরা পড়িবে তাহাই মণিকার কাছে এখন প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ স্বামীকে কাছে আসিতে দেখিয়া লজ্জায় সে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কহিল—আমার তোয়ালেখানা ফর্সা ছিল, তাই দিয়ে দিলাম আর এই দেখ, এইখানে এই জোয়ানের আরকটা রইলো—এই কৌটোটার মধ্যে মশলা ভেজে দিলাম। এই এটার মধ্যে ছুঁচ-সুতো, কিছু ঝিনুকের বোতাম—কখন কী দরকার লাগে কে জানে। হাতের কাছে সব সময়ে তো আমি থাকবো না।

নন্দ অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। ব্যাপারটা সে সহসা বুঝিতে পারিল না।

মণিকা ট্রাঙ্কটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিনিসগুলি ফের ঘাঁটিতে লাগিল; কহিল—কাপড়ই মোটে তিনখানা রইলো—এক জোড়া কিনে নিলে পারতে জামা যা ছিলো সব দুপুরে কেচে, ঘটি গরম করে ইস্ত্রি করে দিয়েছি। আর হ্যাঁ, আমার বাক্সে কোন্ কালের এক্‌খানা সাবান পড়ে ছিলো—আজ তোমার বাক্স

গুছোতে গিয়ে মনে পড়লো। মাঝেমাঝে গায়ে একটু মেখো, বুঝলে? আর এই কয়েকখানা চিঠির কাগজ দিলাম—

বলিতে মণিকার চোখের পাতা দুইটি ভারি হইয়া আসিল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া নিয়া সহজ সুরে কহিল,—পৌঁছেই কিন্তু চিঠি দিয়ো, এক মুহূর্ত দেরি করো না। হাসছ কী? চিঠি না পেলে কী-রকম ভাবনা হবে বলো দিকি। ও-সব ছেলেমানুসি করো না যেন। ক'টায় তোমার ট্রেন?

জামা-জুতা ছাড়িয়া নন্দ তক্তপোশে বসিল। কহিল—দশটা চব্বিশ মিনিট। ঢের দেরি।

—আমার রান্নাবান্না সব তৈরি। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বোস এবার—দুপুরে খেলে কোথায়? ধরো, খোকাকে একটু ধরো, লুচি ক'খানা ভেজে ফেলি গে। বলিয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিয়া মণিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—এই নাও চাবি। যত্ন করে রেখে দাও পকেটে। এই জামাটা পরেই যাবে তো?

মণিকা পাঞ্জাবির ঘড়ির পকেটে চাবির ছোট রিঙটি ঢুকাইয়া দিল। বাচ্চুকে নন্দর কোলে নামাইয়া দিয়া বলিল,—কী জ্বালাতেই যে পারে! সারা দিন কোনো কাজ আমাকে করতে দেয় নি।

বাচ্চু কিছুতেই মায়ের কোল ছাড়িবে না। তাহাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া নিয়া নন্দ কহিল,—লুচি? লুচি কী?

আঁচলটা গায়ের উপর গুছাইতে-গুছাইতে মণিকা কহিল,—বা, সকালে স্টিমারে উঠে তোমার খিদে পাবে না? সেই বিকেলে গিয়ে তো পৌঁছুবে। সারা রাস্তা উপোস করে থাকবে নাকি? হ্যাঁ, টাকা জোগাড় করতে পারলে তো?

নন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। পাঞ্জাবির পকেট হাতড়াইতে-হাতড়াইতে কহিল,—হ্যাঁ, পনেরো টাকা ধার করলাম। দশ টাকাতেই আমার চলে যাবে—পাঁচটা টাকা তুমি রাখো। বলিয়া পাঁচ টাকার নোটখানা সে স্ত্রীর দিকে বাড়াইয়া দিল।

মণিকা দুই পা পিছাইয়া গিয়া কহিল,—কী যে তুমি বলো। যাচ্ছ বিদেশে, এখন তোমার কতো টাকার দরকার!

—না, না, তোমার হাত একদম খালি—ছেলেপিলে নিয়ে কখন কী অসুবিধেয় পড়ো ঠিক কী! আমার দু'-পাচ টাকা কম পড়লে কিছু এসে যাবে না, প্রফুল্লর থেকে চালিয়ে নিতে পারবো।

—আর আমিই যেন পারবো না! প্রদোষবাবুর বৌয়ের কাছে হাত পাতলেই পেয়ে যাবো দেখো। তবু আমি যাহোক একটা স্থানে-স্থিতিতে আছি, তোমাকে নিয়েই তো ভাবনা। বলিয়া মণিকা দ্রুতপায়ে সরিয়া গেল।

ছটুর বয়স এই পাঁচ পার হইয়াছে—তাহার পর পর-পর দুইটি মেয়ে মারা গিয়া কোলের এই খোকা। তাহাকে কাঁধের উপর ফেলিয়া নন্দ ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতে লাগিল। পাশের রান্নাঘর হইতে তপ্ত ঘিয়ে কাঁচা লুচি ছাড়িবার শব্দ আসিতেছে।

এই এক মুহূর্ত তাহার ময়মনসিঙ যাইতে আর ইচ্ছা হইল না। সকলের জন্য হঠাৎ মন তাহার কেমন করিতেছে। কিন্তু আর কতক্ষণ থাকিলেই কোথা দিয়া কী যে কাণ্ড ঘটিয়া যাইবে ভাবিতে নন্দ চমকাইয়া উঠিল। তখন বাড়ি ছাড়িয়া পলাইবার হয় তো নাকে-মুখে পথ পাইবে না।

ছটু পাড়ায় কাহাদের সঙ্গে দুষ্টুমি করিয়া সারা গায়ে ধুলা-বালি মাখিয়া এইমাত্র বাড়ি ফিরিল। ঘরের কোণে পুটু কখন লণ্ঠন রাখিয়া গিয়াছে। বাবাকে লুকাইয়া কলতলায় গিয়া তাড়াতাড়িতে সে গায়ের ধুলা ধুইল কি না ধুইল, তাড়া-তাড়ি ছুটিয়া আসিয়া মেঝের উপর তক্ষুনি বর্ণমালা পাড়িয়া বসিয়া গেল। বাড়ি ফিরিতে দেরি হইল বলিয়া বাবা পাছে তাহাকে মারে সেই ভয়ে তীব্রতর মনোযোগে সে কণ্ঠ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

এই রে, বাবা মাথায় হাত রাখিয়াছেন। ছটুর সমস্ত শরীর জ্বালা করিয়া প্রায় জ্বর আসিয়া গেল। তাড়াতাড়ি কাঁদিয়া ফেলিয়া দুই হাতে নন্দর পা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—আমি আর কক্‌খনো করবো না, বাবা।

—কী করবি না? নন্দ তো অবাক।

—রোজ সন্ধ্যা না হতেই বাড়ি ফিরবো। একটুও দুষ্টুমি করবো না। খুব ভালো হবো, ঠিক হবো, সত্যি।

নন্দ তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। এক হাতে তাহার চোখের জল মুছাইয়া কহিল,—হ্যাঁ, বাবা, সকাল-সকাল বাড়ি ফিরো, ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নেমো না যেন। কাছে-কাছেই থেকো, মা ডাকলেই যেন তক্ষুনি চলে আসতে পারো। আমি আজ চলে যাচ্ছি কি না।

বাবার হাতের অপ্রত্যাশিত আদর পাইয়া ছটু একেবারে গলিয়া গেল। গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—আমিও যাবো, বাবা।

—যাবে বৈ কি। নন্দ ছটুর মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল,—যখন আমার মতো এত্-ত বড়ো হবে তখন তুমি যাবে। তখন আমি আবার তোমার মতন ছোট হয়ে যাবো কি না।

সে যে কী-রকম হিসাব, স্পষ্ট করিয়া কিছু বুঝিবার আগে নন্দই আবার বলিল, —তোমার জন্যে কী নিয়ে আসবো বলো তো?

অপর্যাপ্ত উৎসাহে ছটু ছোট-ছোট দুই হাত প্রসারিত করিয়া লাফাইয়া উঠিল : এই এত্‌—ত বড়ো একটা হাতি।

নন্দ হাসিয়া উঠিল : দূর বোকা!

ছটু বুঝিল যে সে তাহাদের অবস্থায় অতিরিক্ত কিছু চাহিয়া বসিয়াছে। লজ্জায় মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বিমর্ষ হইয়া কহিল,—তবে আমার জন্যে কিছু গুলি নিয়ে এসো। 'গাই-পার' খেলতে গিয়ে সব আমার ফুরিয়ে গেছে, বাবা। নিয়ে এসো, কেমন? সোডার বোতলের মধ্যে যে নীল-নীল গুলি থাকে, তাই আনবে বাবা? তা আমি বাক্সে রেখে দেবো দেখো। তা দিয়ে কক্‌খনো আমি খেলবো না।

এমন সময় মণিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল,—খেতে চল, ছটু। ওদের আগে খাইয়ে দি—পরে জায়গা করে তোমাকে ডাকবো। তুমি ওটাকে একটু ঘুম পাড়াতে পারো কি না দেখ তো। অবেলায় ঘুমিয়ে কিছুতেই আর ঘাড় কাৎ করতে চায় না। চল্‌, আমাকে আবার ওঁর বিছানাটা বেঁধে দিতে হবে।

মার খাইল না, পড়িবার তাড়া সহিতে হইল না, উপরন্তু বাবার কাছ থেকে রাজ্যের গুলি পাওয়া যাইবে—ছটুকে আর পায় কে! আর, পেট পুরিয়া খাওয়া যখন একবার হইলই, তখন তাহার চোখ হইতে ঘুম-ও কেহ কাড়িয়া নিতে পারিবে না। ঢালা বিছানায় ছটু লুটাইয়া পড়িল। পুঁটুর এখন ঘুমাইলে চলিবে না, এখনো মায়ের অনেক ফুট-ফরমাশ তাহার খাটিতে হইবে!

ভিজা হাত দুইটা আঁচলে মুছিতে-মুছিতে মণিকা কহিল,—ওঠো, ও ঘুমোল নাকি? তোমার বিছানাটা এবার বেঁধে ফেলি। ছাই ঘুমিয়েছে, কুৎকুৎ করে কেমন চাইছে দেখ না।

মা'র কোলে যাইবার জন্য বাচ্চু ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল—সঙ্গে সেই বিকট আর্তনাদ। মণিকা অন্য সময় হইলে ছেলেটার গালে সরাসরি এক চড় বসাইয়া দিত, কিন্তু আজ সে তাহাতে একেবারেই কান পাতিল না। কহিল,—কম্বলখানা তুমিই নাও!

—না, না। নন্দ বাধা দিয়া উঠিল: কম্বল আমার কী হবে? শেষ রাত্রে দিব্যি শীত পড়ছে আজকাল—ছেলেপিলে নিয়ে গায়ে দেবে কি?

—বা, কী যে বলো, কেন কাঁথাই তো আছে। ছেলেপিলে নিয়ে কাঁথার নিচে কোনোরকমে জড়োসড়ো হয়ে বেশ কাটিয়ে দিতে পারবো। তোমারই বরং বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে একা শুতে হবে—সেখানে কী-রকম শীত কে জানে। নাও, ওঠো এবার।

নন্দ আপত্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মণিকা বিছানা বাঁধিতে-বাঁধিতে কহিল,—তোমার ছাতাটাও বিছানার সঙ্গেই বেঁধে দিলাম। দেখো, খালি-মাথায় যেয়ো না যেন আফিসে।

বাঁধা-ছাঁদা শেষ করিয়া মণিকা ফের কহিল,—এবার চলো, খেয়ে নাও চট্ করে। ও পুঁটু, তুইও ঢুলছিস যে। ওঠ্, প্রণাম করে রাখ।

নন্দ ব্যস্ত হইয়া কহিল,—না, না, ঘুমোক। চলো, আগেই একটু বেরোতে হবে। ক'টা না জানি বাজলো?

স্বামীর কোল হইতে বাচ্চুকে তুলিয়া নিয়া মণিকা বলিল,—আর এই পাজিটার তো কিছুতেই ঘুম আসছে না। সারা রাত আমাকে জ্বালাবে দেখছি, ঘুমুতে দেবে না। ট্রেনে—তোমার ঘুম না এলে কিন্তু বেজায় কষ্ট পাবে। গাড়িতে উঠেই বিছানাটা পেতে ফেলো। হ্যাঁ, আগেই একটু যাওয়া ভালো।

রান্নাঘরে খাইতে বসিয়া নন্দ কহিল,—তুমিও এই সঙ্গে বসে গেলে পারতে।

মুচকিয়া হাসিয়া মণিকা বলিল, —কী যে তুমি বলো! তোমাকে ঠিকমতো রওনা করে না দিয়ে আমার কি স্বস্তি আছে নাকি? আর রওনা করে দিয়েই বা মুখে ভাত তুলবো কী করে?

নন্দ হাত তুলিয়া বসিয়া রহিল। মণিকা কহিল,—ও কি, হাত গুটিয়ে বসে রইলে যে! এতো রাঁধলাম কষ্ট করে।

না খাইয়াই বা উপায় কি! তবু নন্দ কহিল,—কোনোখানে যাবার মন করলে মুখে আমার সত্যিই ভাত ওঠে না।

এ-কথার এতদিন অবশ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবু কেন-জানি কথাটা মণিকা মানিয়া লইল। ঠিক রাগ করিয়াই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল কি না বোঝা গেল না।

আঁচাইয়া ঘরে আসিয়া মণিকার মুখের চেহারা দেখিয়া নন্দ স্তব্ধ হইয়া গেল। লণ্ঠনের আলোতে স্পষ্ট ধরা না পড়িলেও তাহার চোখ দুইটা কেমন ফোলা-ফোলা ও মুখখানা কেমন ম্রিয়মান মনে হইল। ভালো করিয়া খাইলনা বলিয়াই বুঝি অভিমান করিয়াছে।

দোতলায় প্রদোষবাবুদের ঘরে গিয়া খবর নিল, সাড়ে আটটা প্রায় বাজে। ব্যস্ত হইয়া নন্দ কহিল,—মোড় থেকে একটা মুটে ধরে নিয়ে আসি। বাস্ যেমন থেকে-থেকে চলে--একটু আগেই বেরুনো ভালো— টিকিট-ফিকিট সব কাটতে হবে।

মুখ ঘুরাইয়া মণিকা কহিল,—আমার থেকে যতো শিগগির পারো বেরুতে পারলেই তো তুমি বাঁচো।

কথাটার একটা সুন্দর উত্তর দিতে নন্দর ভারি ইচ্ছা হইল, কিন্তু কী বলিলে যে কথাটা আন্তরিকতায় পূর্ণ হইয়া উঠে সে ভাবিয়া পাইল না।

নন্দ মুটে লইয়া আসিল। এইবার বিদায়ের পালা।

অতিশয় নিম্ন গাঢ় কণ্ঠে নন্দ ডাকিল : শোনো।

ডাকে নতুনতার উত্তেজনার স্বাদ পাইয়া মণিকার বুক চকিত লজ্জায় ও আনন্দে দুর্-দুর্ করিয়া উঠিল। আস্তে-আস্তে স্বামীর বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া কিসের অসহ্য প্রত্যাশায় চোখ বন্ধ করিয়া মুখটা ঈষৎ বাড়াইয়া দিল হয় তো। কিন্তু নন্দ সেইজন্য তাহাকে ডাকে নাই—তাহা সে কবে ভুলিয়া গিয়াছে।

মণিকা কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই নন্দ তাড়াতাড়ি তাহার সেমিজের মধ্যে হাতটা ঢুকাইয়া দিয়া কহিল,—পাঁচটা টাকা তুমি রাখো। যা রইলো, তাতেই আমার খুব চলে যাবে।

মণিকা সর্পাহতের মত ভয় পাইয়া পিছাইয়া আসিল। তীক্ষ্ণস্বরে কহিল,—খবরদার। আর তোমার আদিখ্যেতা করতে হবে না। ওটা দেবে তো, তোমারই সামনে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দেবো।

বিমূঢ়ের মত নন্দ স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কী করিবে কিছুই মাথায় আসিল না; অগত্যা নোটটা ভাঁজ করিয়া ঘড়ির পকেটে তেমনি রাখিয়া দিল।

ছেলের পিঠে এক চড় মারিয়া মণিকা কহিল,—তোর কি কিছুতেই আজ ঘুম আসবে না? এদিকে এঁটোকাঁটায় ঘরদোর এক হাঁটু হয়ে আছে—পরিষ্কার করতে হবে না আমায়? এখন কে তোকে রাখবে শুনি? কে আর আছে?

মায়ের হাতে মার খাইয়া বাচ্চু এখন বাপের উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইয়া দিয়াছে।

কিন্তু নন্দ একটুও নড়িল না। ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইল—পুঁটু আর ছটু অঘোরে ঘুমাইতেছে। কালি-পড়া লণ্ঠনের শিখাটুকুর মতো ঘরের আবহাওয়াটি ভারি ম্লান; কেন জানি তাহার তখন এই পরিচিত গৃহকোণটি ছাড়িয়া যাইতে ভারি কষ্ট হইতে লাগিল।

তবু, ঢোক গিলিয়া পা বাড়াইতে গিয়া চৌকাঠের কাছে থামিয়া পড়িয়া নন্দ কহিল,—তবে এবার যাই। সাবধানে থেকো।

নির্লিপ্তের মত মণিকা কহিল,—তা আর তোমাকে বলতে হবে না।

—চিঠি আমি পৌঁছেই লিখবো ঠিক, তুমি ভেবো না।

—তুমি না ভাবলেই হলো। চিঠির কাগজই খালি দিয়েছি, স্ট্যাম্প তো আর সঙ্গে নেই।

—তা কিনে নিতে কতোক্ষণ! তারপর আর কিছু বলিবার থাকিতে পারে কি না তাহাই নন্দ ভাবিতে লাগিল। এবং বলিবার কিছু না পাইয়া অবশেষে মুটের পিছে-পিছে দরজার বাহিরে চলিয়া আসিল।

পিছন হইতে মণিকা হঠাৎ বাধা দিয়া উঠিল : দাঁড়াও।

নতুন কী উৎপাত হইল কে জানে, নন্দ দাঁড়াইয়া পড়িল। মণিকা কাছে আসিয়া কহিল,—একটা প্রণাম পর্যন্ত করতে দেবে না? বলিয়া বাচ্চুকে কোলে লইয়াই সে নন্দর পায়ের উপর উবু হইয়া পড়িল। নন্দর পা দুইটা পাথর হইয়া রহিল।

প্রণাম করিয়া মণিকা তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল না, মাথার উপর কাপড়টা গুছাইতে লাগিল।

সেই একটুখানি স্পর্শে নন্দর শরীর যেন বাজিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু কী করিবে ঠিক কিছু বুঝিতে না পারিয়া মণিকার কোলে বাচ্চুর গাল দুইটা আদর করিয়া টিপিয়া কহিল,—এবার তবে আমি চলি। খুব সাবধান হয়ে থেকো, কেমন? অসুখ-বিসুখ করে বসো না।

বলিয়া সে রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

কত দূর আসিয়া পিছনে না তাকাইয়া কিছুতেই সে থাকিতে পারিল না। দেখিল জানালায় মণিকা ছেলে কোলে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাবাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বাচ্চু হাত-পা ছুঁড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। মণিকা যে কী করিতেছে ঠিক চোখে পড়ে না।

এইবার রাস্তাটা বাঁক নিবে। নন্দর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে আবার হঠাৎ ইচ্ছা হইল। একটু দ্বিধা করিল কি না কে জানে, উঁকি মারিয়া চাহিয়া দেখিল রাস্তার দিকের জানালাটা মণিকা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

৩

গাড়িতে বিশেষ ভিড় নাই, ছোট একটি থার্ড-ক্লাশ কামরায় সে আর কিশোরগঞ্জ-যাত্রী একজন প্যাসেঞ্জার। কামরার গায়ে লেখা 'আট জন বসিবেক'—অতএব মুখোমুখি দুইটা বেঞ্চিতে দুই জনেই লম্বা করিয়া বিছানা পাতিয়া লইয়াছে। গাড়ি ছাড়িবার আগেই মুন্সিগঞ্জ-যাত্রী শয্যা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু নৈহাটি পার হইয়া গেলেও নন্দর চোখে এক ফোঁটা ঘুম আসিল না।

মন তাহার কেবলই এই ট্রেনের চেয়েও উদ্দামতর গতিতে বাড়ির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। গাড়িটা এত ভীষণ শব্দ করিতেছে যে প্রাণপণে চোখ বুজিয়া এই কামরাটাকে সে তাহাদের সেই সঙ্কীর্ণ ঘর বলিয়া কিছুতেই ভাবিতে পারিতেছে না। তবু অন্ধকার হইয়া গেলেও সব যেন সে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার তক্তপোশটি এখন শূন্য, হয়তো ছেলে বুকে লইয়া মণিকা সেই শুকনা কাঠের উপরই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নন্দ চুপিচুপি তাহার শিয়রে গিয়া বসিল, ক্লান্ত কপালের উপর যে দুয়েকটি চুল আসিয়া পড়িয়াছে তাহাই সে আঙুল কয়টি দিয়া মাথার উপর গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। চিবুক ধরিয়া নাড়িয়া তাহাকে জাগাইয়া দিবে নাকি ? না, দরকার নাই, তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সে ভয় পাইবে, ভাবিবে—হয় তো চাকরিটা আর মিলিল না।

নন্দ চোখ মেলিয়া গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। হ্যাঁ, জিনিসগুলি সব ঠিকঠাক উঠিয়াছে তো ? ট্রাঙ্ক, বিছানা—আর লুচির সেই হাঁড়িটা বহন করিবার জন্য তাহার গলায় গোল করিয়া মণিকা কাপড়ের পাড় বাঁধিয়া দিয়াছে ; চওড়া লাল পাড়—আর বছর ষষ্ঠীতে তাহাকে যে শাড়িখানি কিনিয়া দিয়াছিল! ছাতাটা কোথায় রাখিল ? শিকের কোণগুলি খুলিয়া গিয়াছিল, সাদা সুতায় মণিকা তাহাদের সেলাই করিয়া দিয়াছে।

বাড়ি ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে কী হইবে, মণিকার এই মুখোস খুলিয়া যাইতে কতক্ষণ ! সামনে এই আট বছর ধরিয়াই তো সে বাড়ি কামড়াইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু মাত্র আজ যাইবার মুহূর্তটিতেই সে মণিকার এই অভাবনীয় পরিবর্তনটুকু লক্ষ্য করিল। এখন আবার ফিরিয়া গেলে হয় তো মণিকা সেই স্বমূর্তি ধরিয়া বসিবে। অবশ্য মনে-মনে ফিরিয়া যাইতে কোনো বাধা নাই,—জানালা ধরিয়া মণিকার সেই আচ্ছন্ন গভীর দৃষ্টির আলোতে পথ সে অনায়াসে চিনিতে পারে বটে। কিন্তু তাহারো বিশেষ দরকার আছে বলিয়া নন্দর মনে হইল না। ঘরের বন্ধন হইতে ছাড়া পাইয়া এই যে ট্রেনে করিয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে এত দীর্ঘ বৎসরের কারাবাসের পর এই যে প্রথম তাহার ছুটি মিলিল—তাহারই উদ্দাম নেশায় সমস্ত শরীর অস্থির হইয়া উঠিল। শীত করিলেও জানালা হইতে মুখ সে সরাইয়া আনিল না, ট্রেনের লাইন ছাড়াইয়া মাটিতে যেখানে গাড়ির আলো গিয়া পড়িয়াছে—ধাবমান আলো—তাহাই সে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, অন্য যাত্রীটির জিনিস পত্র গোছগাছ করিবার শব্দে নন্দ জাগিয়া উঠিল সিরাজগঞ্জ আসিয়া পড়িয়াছে। নদীর অত্যাচারে

সাবেক স্টেশন কাছে সরিয়া আসিয়াছে—এইখানেই নামিতে হইবে। প্লাটফর্ম নাই, মাটি থেকে দুই ধাপ উঁচু সিঁড়ি, কুলিগুলি এখানে-ওখানে ছুটাছুটি করিতেছে—সব কিছু নন্দর কেমন যেন উপন্যাসের মত ভালো লাগিল। নদী আচ্ছন্ন করিয়া ঘন কুয়াশা জমিয়াছে—শীতে সঙ্কুচিত ঘুমন্ত নদীর জল দেখিয়া নন্দর আবার হঠাৎ মণিকাকে মনে পড়িল—সে এখনো নিশ্চয় উঠে নাই, এই ভোরের আলোটি তাহারও জানালা দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে নিশ্চয়!

কুলির সঙ্গে-সঙ্গে নন্দও ষ্টিমারে আসিয়া উঠিল। দোতলার ডেক্‌এ বিছানাটা বিছাইয়া জায়গা করিয়া লইল। ষ্টিমার এইবার ছাড়িবে। নদী ও খেত, দূরে চাষার বাড়ি ও গাধাবোটের উপর বসিয়া ছিপ ফেলিয়া একটা খালাশি-ছেলের মাছ-ধরা, রেল-লাইনের উপরে কতকালের ভাঙা মালগাড়িগুলি ও স্টেশন-মাস্টারের ছোট্ট খড়ো ঘরখানি—সমস্ত কিছু সে শিশুর মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছে—কিছুরই সে কোনো রহস্য খুঁজিয়া পাইতেছে না।

নিচে নামিয়া নন্দ মুখ ধুইল ও ছোট শিশুরই মত বিস্ময়ে ও আনন্দে চোখ বিস্ফারিত করিয়া ষ্টিমারের এঞ্জিনটা দেখতে লাগিল। ছটু দেখিলে কতই না-জানি খুশি হইত, কত বিজাতীয় প্রশ্ন করিয়া তাহাকে যে কী পরিমাণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত তাহার ঠিক নাই—সব সে ঠিকমত উত্তর দিতে পারিত না। ষ্টিমার এইবার ছাড়িয়াছে—দেখিতে-দেখিতে নতুনতর দৃশ্য নন্দর চোখের সমুখে উপস্থিত হইল—স্টেশন-মাস্টারের সেই খড়ো ঘরটি আর চোখে পড়িল না।

কিন্তু নদীর পারে ঐ ঘন গাছ-পাতার আড়ালে চাষারা কেমন সুন্দর বাসা বাঁধিয়াছে! পিঠের উপর বা হাতখানি তুলিয়া দিয়া চাষার বৌটি উঠান ঝাঁট দিতেছে, ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া চাষার বড়ো মেয়েটি জলের একেবারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—পড়িয়া না গেলে হয়! মণিকা সঙ্গে থাকিলে নন্দ তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিত সব ছাড়িয়া-ছুটিয়া নদীর পারে এমনি ছোট একখানি পাতার ঘরে উঠিয়া আসিতে তাহার আপত্তি আছে কি না। মণিকা নিশ্চয়ই আপত্তি করিত, তাহা নন্দর অজানা নাই, তবু ধারে-কাছে খানিকটা জমি নিয়া এখানে চাষ-বাস করিলেই বা মন্দ কি।

নন্দ এ-দিক ও-দিক একটু ঘোরাঘুরি করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। অপরিচিত কণ্ঠে রাশি-রাশি কোলাহল হইতেছে—তাহারই মাঝে সে কম্বলখানির উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এখন তাহার ক্ষুধাবোধ হইতেছে—হাঁড়ির

মুখের কলাপাতাগুলি সে সরাইতে আরম্ভ করিল। থাকে-থাকে লুচি সাজানো, কিছু বেগুন-ভাজা ও কাগজে পুঁটুলি করিয়া একটু চিনি—একপাশে একটু মোহনভোগ, তাহাতে মণিকার কয়টি আঙুলের চিহ্ন শক্ত হইয়া ফুটিয়া আছে। দেখিয়া নন্দর মন হঠাৎ বিমর্ষ হইয়া উঠিল। কতদিন বাদে মণিকা এই লুচি ও মোহনভোগ তৈরী করিল না-জানি,—কিন্তু সে নিজে বা ছেলেপিলেরা কেহই হয়তো কিছু ভাগ নেয় নাই, তাহার জন্যই সমস্ত দিয়া দিয়াছে। কী করিয়া নন্দ তাহা খাইতে পারে? আস্তে-আস্তে হাঁড়ির মুখটা সে বন্ধ করিয়া রাখিল। ট্রাঙ্ক খুলিয়া পুরানো একটা মাসিক-পত্র খুলিয়া পড়িলে হয়তো বেশ সময় কাটে,—মণিকা তাহাকে সেই কথা অনেকবার বলিয়াও দিয়াছে—কিন্তু মাসিক-পত্রিকা বাহির করিতে গেলেই মণিকার এত যত্ন-করিয়া-গোছানো কাপড়-চোপড়ের ভাঁজ সব নষ্ট হইয়া যাইবে—সব এলোমেলো হইয়া পড়িবে—সেই পাট ভাঙিতে নন্দর কেমন যেন ইচ্ছা হইল না। ষ্টিমারের ডেক্-এ ঐ দোকানের বেঞ্চিতে বসিয়া এক কাপ চা খাইলেই তাহার দিন চলিবে—তাহার পর জলের পর জল—সময় কাটাইবার এমন জিনিস আর আছে কোথায়?

ময়মনসিঙ্-স্টেশনে নামিয়া নন্দ এ-দিক ও-দিক চাহিতে লাগিল। একখানা মাত্র চিঠি ভরসা করিয়া এ সে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? প্রফুল্লকে যদি এখন না-ই পায়, তবে সে ফিরিয়া যাইবারই বা ভাড়া জোগাড করিবে কোথা হইতে? সামনে একজনকে পাইয়া সে প্রফুল্লর কথা জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু সে কিছুই খবর দিতে পারিল না। যাত্রীর জন্য গাড়োয়ান একটা ঘোরাঘুরি করিতেছিল, সেও যখন অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করিতে চলিল, তখন নন্দ একেবারে বসিয়া পড়িল।

কিন্তু ভয় পাইবার কিছু নাই—প্রফুল্ল লোক পাঠাইয়া দিয়াছে। আসিবার আগে যদিও সে চিঠি দেয় নাই—একমাত্র টেলি করিতে পারিত বটে—তবুও প্রফুল্লর মনে হইতেছিল নন্দ আসিলেও আসিতে পারে। চাপরাশ-পরা কোমরে দড়ির বেল্ট-বাঁধা এক বেয়ারা আসিয়া আন্দাজে নন্দকে সেলাম ঠুকিল: আপনিই কি কল্‌কাতা থেকে আসছেন—প্রফুল্লবাবুর কুঠি যাবেন?

নন্দ লাফাইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে ম্লান কুণ্ঠিত মুখে প্রায় বাড়ি ফিরিয়া চলিয়াছিল, প্রফুল্লর নাম শুনিয়া সেই বন্ধ বিমর্ষ বাড়ির দরজা হইতে আবার সে খোলা মাঠে নামিয়া আসিয়াছে।

তারপর কুলি ও গাড়োয়ান কিছুই নন্দকে আর তদারক করিতে হইল না।

প্রফুল্ল তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া সংবর্ধনা করিল। কহিল,—এ কী, পরিবার নিয়ে আসো নি?

নন্দর বুক দুর্-দুর্ করিয়া উঠিল, মুখ-চোখ শুকাইয়া গেল। তবু ঢোঁক গিলিয়া নিদারুণ দুঃসাহসে সে কহিল,— পরিবার কোথায় যে নিয়ে আসবো? এই একলা আছি বলেই তো এখানে আসতে পারলাম।

প্রফুল্ল কহিল,— এখনো বিয়ে করোনি কী হে। আমার কিন্তু গেলো-বোশেখে হয়ে গেলো—সেই যে গেছলাম কল্‌কাতায়—তারই সঙ্গে। দাঁড়াও,— তুমি হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হও—আমি মায়াকে ডেকে নিয়ে আসি। বলিয়া হাঁকডাক দিতেই দুইটা চাকর বালতি করিয়া গরম জল, তোয়ালে, সাবান, টিনের কৌটায় টুথ-পাউডার প্রভৃতি হাজির করিল।

হাত-মুখ ধুইয়া গরম হইয়া নন্দ গায়ের উপর আলোয়ানখানা ভালো করিয়া টানিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। সুন্দর ঘরখানা—জিনিসে-আস্‌বাবে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। খুঁটিয়া খুঁটিয়া মুগ্ধের মত তাহাই নন্দ দেখিতেছিল—কখন পাশের দরজার পরদা ঠেলিয়া প্রথমে প্রফুল্ল ও তাহার পিছনে একটি মেয়ে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। মেয়েটির হাতে প্রকাণ্ড একটা খাবারের থালা—এবং তাহার পিছনে চাকরের হাতে একটা কাঠের বারকোশে চায়ের সরঞ্জাম সাজানো।

নন্দ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে পর্যন্ত পারিল না—অভিভূতের মত বসিয়া রহিল। প্রফুল্ল কহিল,—ইনি আমার স্ত্রী, আর এ আমার কলেজের বন্ধু—যার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম।

সামনের ছোট টেবিলের উপর খাবারের থালাটা রাখিয়া মায়া দুর্বল ভঙ্গিতে একটু হাসিল ও কৃশ শরীরে নতুন লজ্জার একটি অনির্বচনীয় মাধুরী আনিয়া দুই হাত জোড় করিয়া নন্দকে নমস্কার করিল। নন্দ তবুও নড়িল না, চেয়ারের হাতলটা খুব জোরে মুঠিতে চাপিয়া ধরিল। প্রফুল্লকে কহিল,—তোমার বাড়িখানি খুব সুন্দর।

প্রফুল্ল আরেকখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—তুমি খালি বাড়িই দেখলে, কী রত্ন চুরি করে নিয়ে এলাম তা দেখলে না! কতো ব্যূহ ভেদ করে, কী অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করে— কী বলো, মায়া?

চাকরের হাত হইতে বারকোশটা টেবিলের উপর নামাইয়া মায়া পট্-এ চামচ দিয়া লিকার ঘাঁটিতেছিল, ঠোঁট বাঁকাইয়া নীরবে একটু হাসিল।

প্রফুল্ল কহিল,— এও ঠিক তেমনি হলো, নন্দ। একবার আর্টিস্ট এক 'সমজদার'কে তার ছবি দেখাতে নিয়ে এসেছিলো। জিগগেস করলে: কেমন দেখছেন ছবিখানা? 'সমজদার' উত্তর দিলে: ফ্রেমটি ভারি সুন্দর, কোন দোকানে ছবি বাঁধাও?

কথা শুনিয়াই মায়া খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাত হইতে খানিকটা চা চল্‌কাইয়া পড়িল। কহিল,—সমালোচনাটা কারোই মিথ্যে হয় নি।

প্রফুল্ল কহিল,—তবে বলতে চাও নন্দ একজন 'সমজদার'? কিছুতেই নয়—আমি কিছুতেই তা মানবো না। এমন জীবন্ত রূপ সে এপ্রিশিয়েট করতে পারবে না? নাও নন্দ, এগুলি মুখে তুলতে থাকো। বলিয়া খাবারের থালাটা সে নন্দর দিকে আগাইয়া দিল।

নিতান্ত কিছু একটা না করিলে কেমন বিশ্রী দেখায়—নন্দ তাই খাবার ভাঙিয়া মুখে তুলিল।

মায়া এক কাপ চা নন্দর হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল,—দেখুন তো খেয়ে, আর চিনি লাগবে?

নন্দ চুমুক দিয়া কহিল,—না। প্রফুল্লর দিকে চাহিয়া সহজ ও অন্তরঙ্গ হইবার আশায় জিজ্ঞাসা করিল: তোমার?

প্রফুল্ল চায়ের কাপে চুমুক না দিয়াই কহিল,—চায়ে চিনি আমি একরকম খাইই না।

—চিনি ছাড়া লোকে কী করে যে চায়ে স্বাদ পায় আমি ভাবতেই পারি না। বলিয়া মায়াও একটা চেয়ার টানিয়া বসিল ও কাহারো কিছু অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া নিজে হইতেই খাবার তুলিয়া লইল।

এইবার সহজ দৃষ্টিতে নন্দ মায়াকে দেখিতে পারিতেছে। বয়স প্রায় উনিশের কোঠায় গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু দেখিতে একেবারে কিশোরী। সমস্ত গায়ে চাপা হাসির ঢেউ, চঞ্চল চোখ দুইটিতে বুদ্ধি ও বিনয়ের আভা, মুখখানি ভারি সুকুমার—বয়সের কোথাও এতটুকু আঁচড় পড়ে নাই। ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য একটু সর্দি হইয়াছে বলিয়া গলাটা একটু ভারি, নাকের ডগাটা লালচে, চোখ দুইটি ঈষৎ ছল্‌ছলে,—গলা ঘেরিয়া শিথিল একটা মাফ্‌লার্‌ বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পায়ে দড়ির একটা চটি, পদক্ষেপগুলি পাপড়ির মতো কোমল ও পাৎলা—হাতের আঙুলে সেবার একটি অনায়াস ক্ষিপ্রতা। অপরিচিত লোকের সামনে বাহির হইবে বলিয়া বেশ-বাস উগ্র করিয়া আসে নাই- যেমনটি ছিল তেমনি আটপৌরে শাড়িখানিতেই চলিয়া আসিয়াছে। মাথার কাপড়ের নিচে রুক্ষ বেণীটা যে ঝুলিতেছে তাহাও পরিপাটি করিয়া খোপা করিয়া জড়ানো হয় নাই, লাল রিবন্‌টা বাহিরে দেখা যাইতেছে। লেখা-পড়া শেখা অভিজাত-বংশের মেয়ে—অথচ কৃত্রিম কথাবার্তায় চতুর হইবার এতটুকু চেষ্টা নাই, ব্যবহারে অতিরিক্ত বিনয় বা আন্তরিকতা নাই—এই সন্ধ্যার স্তিমিত আলোটুকুর মতনই কেমন স্বাভাবিক।

কতো গভীর ও পরিপূর্ণ করিয়া ভালোবাসিলে স্ত্রীলোক এমন সহজ ও সাধারণ হইতে পারে তাহাই ভাবিয়া নন্দ অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু প্রফুল্লর ছেলেমানুষির অন্ত নাই। মায়াকে ভালোবাসিয়া সে দিন-কে-দিন শিশুর মত ভোলানাথ সাজিতেছে। কত খুনসুটি, কত দুষ্টুমি, কত সব আজে বাজে রসিকতা—কিন্তু সব-কিছুই তাহার হৃদয়-পরিপূর্ণ আবেগের টুকরা—খণ্ড-খণ্ড হইয়া ছিটাইয়া পড়িতেছে। এমন দৃশ্য দেখিয়া নন্দর যে আবার একবার মণিকার কথা মনে পড়িয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য কী! কিন্তু স্মৃতির অন্ধকার ঘাঁটিতে তাহার ইচ্ছা করে না। সে যে বিবাহ করে নাই—এমনি একটা সান্ত্বনায় নিজেকে সে শান্ত করিয়া রাখুক। একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার স্বপ্নে তাহার মুহূর্তগুলি কয়েক মুহূর্তের জন্যই রঞ্জিত হোক।

প্রফুল্ল চায়ের কাপটা সসার্-এর উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিল—এখনো যখন একলা আছ, তখন অত বড়ো বাড়ি নিয়ে কী করবে?

নন্দ কথা কাড়িয়া কহিল,—না, না, বাড়ি নেব কী। একটা মেস্এ যাবো। ভালো মেস্ আছে এখানে?

—আছে বৈ কি। সামনেই—কাচারি রোডে। সেখানে আমাদের গগন আছে। গগনকে মনে পড়ে?

—গগন? সে এখানে করে কী?

—তাকেও ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের আফিসে একটা চাকরি করে দিয়েছি।

—বা, তবে আর কথা কী! সেখানেই উঠবো তবে।

প্রফুল্ল বাধা দিয়া কহিল,—দাঁড়াও, এখুনি তোমাকে উঠতে হবে না গিয়ে। আজ রাতটা এখানেই থাকো, কাল সব বন্দোবস্ত করা যাবে। কালকেই য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট্-লেটার পেয়ে যাবে—পরশু সোমবার থেকেই তোমার চাকরি। গত সপ্তাহের মিটিংএ পাশ হয়ে গেছে—ভাবনা নেই। ভাবনা হচ্ছে—

নন্দ আর মায়া একসঙ্গে প্রফুল্লর দিকে তাকাইল।

মুখ গম্ভীর করিয়া প্রফুল্ল বলিল,—ভাবনা হচ্ছে, তোমাকে একটি পাত্রী জুটিয়ে দিতে হবে। এ-বয়েস পর্যন্ত আইবুড়ো হয়ে আছ, চোখ চেয়ে এ আর দেখা যায় না।

কথা শুনিয়া মায়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কিন্তু নন্দর মুখে অটল, স্থূল গাম্ভীর্য।

রাতটা তাহার প্রফুল্লর বাড়িতেই কাটিল—মায়ার হাতের তৈরি নতুন বিছানায়। প্রথমে অনেকক্ষণ তাহার ঘুম আসিল না—কী-সব অসম্ভব কথা যে

ভাবিতে লাগিল, দিনের বেলা হইলে নিজেই সে মনে-মনে হাসিয়া উঠিত। তবে এখন আর তাহার হরিশ-পার্কের সেই ছোট-ছোট শিশু হইতে ইচ্ছা হইল না—এখন সে মনে-মনে কলেজে আবার নতুন করিয়া পড়িতে আসিয়াছে। শরীরে স্বাস্থ্য ও উৎসাহ মনে তেজ ও কল্পনা, চোখে নতুন অভ্যুদয়ের স্বপ্ন নিয়া জীবনের চৌকাঠের পারে সে এইমাত্র দাঁড়াইল। যেন দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া সে কত চিত্ত, কত আশ্রয়, কত আশা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে—আজই যেন তাহার প্রথম একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা হইতেছে এই নরম নতুন বিছানায়! যৌবনকে এই প্রথম যেন সে চিনিতে পারিল।

নন্দকে দেখিয়া গগনের মহাস্ফূর্তি--এতদিনে তাহার মনের মত সঙ্গী মিলিয়াছে। তাহারই ঘরে সিট্ একটা খালি পড়িয়াছিল, সেইটাতে নন্দ জায়গা করিয়া লইল। মণিকা বুদ্ধি করিয়া আয়নাখানাও ট্রাঙ্কে দিয়াছে, তাহাই সে শিয়রের দেয়ালে টাঙাইল—সমস্ত ঘরের এইটুকু মাত্র বিলাস-প্রসাধন। কিন্তু আয়নায় মুখ দেখিয়াই বা লাভ কী—বয়স তো আর কমিয়া যাইবে না! তবু এই আয়নাটি মণিকা সঙ্গে দিয়া দিয়াছে—এই আয়নাটির সামনে দাঁড়াইয়া সে চুল বাঁধিত, সিঁথিতে সিঁদুর আঁকিত—এই আয়নায় তাহার কলহ-কুটিল কুৎসিত মুখের এতটুকু ছায়া পড়ে নাই; যখনই সে এই আয়নার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, মুখখানি কোমল, স্নিগ্ধ করিয়া আসিয়াছে। এই আয়নায় চাহিলেই হয় তো মণিকার সেই স্নেহসজল চক্ষু দুইটি সে দেখিতে পাইবে—তাহার চলিয়া যাইবার সময় জানালায় সে যেমন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল!

গগন একটা বিড়ি ধরাইয়া কহিল,—তোকে পেয়ে বেঁচে গেলাম, বাবা! প্রাণ খুলে একটা কথা বলতে পারছিলাম না। দেখিস, দু'দিন যেতে না যেতেই বউ নিয়ে আসবি না তো?

ততক্ষণ নন্দ বিছানাটা পাতিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে বসিয়া নন্দ কহিল,—বউ কোথায়! পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে—অমন আমিরি ব্যাধি পোষাবে কেন?

গগন ধোঁয়া ছাড়িতে সেই যে হাঁ করিল অনেকক্ষণ মুখ বন্ধ করিল না। কহিল,—বিয়ে করিসনি তো? বেঁচে গেছিস। কিন্তু য্যাদ্দিন ঐ ব্যারামের থেকে কী করে আত্মরক্ষা করলি শুনি?

—একমাত্র মনের জোরে। খেতে পাই না, তাই আবার উৎপাত। মরো বাঁচো, কারো ধার ধারি না।

—যা বলেছিস। আমার যা দুর্দশা। ছোট বউ—কোলে একটা মেয়ে—এখানে আসবার জন্যে কেঁদে আকুল। কিন্তু এখানে বাসা করে থাকতে গেলেই তো খরচ—তা ছাড়া বাবা বুড়ো হয়েছেন, ছোট ভাই দুটো ইস্কুলে পড়ছে, মা নেই—এ-সব কেই বা দেখে-শোনে? তবুও অবুঝ মেয়ে আমাকে ছেড়ে দু'দণ্ড থাকতে পারবেন না—এ কী রকম বিলিতি আবদার একবার দেখ দিকি। ওদের ফেলে কী করেই বা আসে। এই এক মহা মুস্কিল হয়েছে।

কথা শুনিয়া নন্দ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিল,—কিন্তু তোর বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না?

—আহা, যেন রাজ্যের ছুটি পড়ে আছে, গেলেই হলো! আর যেতে তো পয়সা লাগে না, ডানা মেলে উড়ে যাওয়া যায়! কাঁহাতক আর ভালো লাগে বল্,—আমরা তো আর মেয়েমানুষ নই যে সারাজীবন একজনের কাঁধে ভর করে থাকবো! এই বাবা, বেশ-আছি—মাসান্তে খরচের টাকা পাঠিয়ে দাও, ব্যস্, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। কিন্তু তোর কথা বল শুনি।

—আমার আবার কী কথা।

—এই য়্যাদ্দিন বিয়ে করিস নি কেন? কাউকে ভালোবেসেছিস বুঝি?

কথাটার এমন যে একটা আশ্চর্য অর্থ হইতে পারে নন্দ কোনো কালে ভাবিয়া দেখে নাই। গগনের কথা শুনিয়া সে হঠাৎ উৎসাহিত হইয়া উঠিল। অথচ ভালোবাসা বলিতে ঠিক কি যে বুঝায় স্পষ্ট তাহার কিছু ধারণা না থাকিলেও এটুকু সে অনায়াসে বুঝিল যে বিবাহ একবার হইয়া গেলে আর বুঝি ভালোবাসা যায় না। স্ত্রীকে ভয় করা যায়, স্নেহ বা সমিহ করা যায়, দরকার হইলে দুয়েক ঘা বসাইয়া দিতেও বাধা নাই,—কিন্তু তাহার সঙ্গে ভালোবাসা যে চলিতে পারে না সেই সম্বন্ধে নন্দ নিঃসংশয়। তাই সে মুচকিয়া হাসিয়া অথচ মুখের গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া কহিল,—তা, এত বয়েস হলো, একটু প্রেম না করলে চলবে কেন?

—কাকে? কাকে ভাই? গগন লাফাইয়া উঠিল: আমায় বলবি নে?

—নাম শুনে লাভ কী।

—তবে তাকেই বিয়ে করবি তো?

একটু কি চিন্তা করিয়া নন্দ কহিল,—সেইটেই সমস্যা।

—যা বলেছিস—বিয়ে করলেই আবার সব ফুরিয়ে গেলো।

নন্দ মনে-মনে যাহাই কেন না বিশ্বাস করুক, গগনের অমন রূঢ় কথাটা তাহার কেন-জানি মনঃপূত হইল না। কথাটা খণ্ডন করিবার জন্য সে জোর দিয়া কহিল,

—আমাদের এমন পচা ভালোবাসা নয় যে বিয়ে করলেই তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। সমস্যাটা হচ্ছে এই যে সহজে তাকে পাবার নয়।

গগন চেয়ারটা নন্দর তক্তপোশের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল,—বা, এ যে দেখছি আগাগোড়া নভেল। তারপর আমায় বলবি নে?

তাহার পর কী যে বলা যায় চট্ করিয়া নন্দর মাথায় আসিল না। 'তাহাকে পাওয়া যায় না'—এই পর্যন্ত বলাই তাহার পক্ষে সহজ ও সত্য; কিন্তু কেন পাওয়া যায় না, পাইতে হইলেই বা কী মূল্য দিতে হইবে- এ সব বড়ো বড়ো কথার তাৎপর্য সে বোঝে কি ছাই। সে সরাসরি বলিল,—আজ নয়, আর একদিন শুনবি'খন। সেই আদ্যিকালের পুরোনো বাধা –সংস্কার, সমাজ—যতো কিছু রাবিশ।

সেই দিকে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না দেখিয়া গগন এইবার বিচক্ষণের মত দরকারি খাঁটি কথা পাড়িয়া বসিল: মেয়েটির কতো বয়েস? দেখতে কেমন?

এই প্রশ্নটা এড়াইয়া যাওয়া মুস্কিল, কিন্তু বর্ণনা দেওয়াও সহজ নয়। প্রশ্নটা গগন আবার প্রয়োগ করিল। যখন সত্যিই নন্দ তাহাকে ভালোবাসে তখন তাচ্ছিল্য করিয়া বর্ণনাটা সারিয়া দিলেও কিছু ক্ষতি নাই। তবে আশ্চর্য এই, মায়াকে ভাবিয়া যাহার রূপ সে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল তাহা অগোচরে কখন মণিকারই মূর্তি নিয়া বসিয়াছে।

—আর বলিস নে, যেমনি ঢ্যাঙা, তেমনি কালো—বয়েসে প্রায় বুড়ি। কিন্তু চমৎকার রান্না করে, একবার অসুখ করলে সেও তার বাড়ি বসে সমানে উপোস করবে, যদ্দিন না ভালো হয়ে ফের দেখা করতে পারি ততোদিন সে চিঠির পর চিঠি পাঠাবে—

গগন তাহা বিশ্বাস করিল না; বলিল,—তুই মিথ্যে বলছিস।

নন্দ একটু হাসিল, কহিল,—তবে যদি বলতাম ননীর মতো নরম ও চাঁপা-কলার মত নধর শরীর, পায়ে দড়ির চটি, মাথায় রুখু চুলের বেণী—তাতে লাল রিবন্ বাঁধা, চোখ দুটি একত্র করে প্রকাণ্ড একটা তারা, চিবুকটি নিটোল, ভালো গান গাইতে পারে বলে গলায় কালো একটি তিল—কী যে, বলে চল না তারপর —তাই বললেই বুঝি তুই বিশ্বাস করতিস? কুৎসিত মেয়েকে বুঝি কোনোদিন ভালোবাসা যায় না? তোদের যেমন-সব নভেলি রুচি! আর যৌবনে এমন যে সুন্দর থাকে তার বুঝি কোনোকালে আর বুড়ো হতে নেই?

গগন পকেট হইতে আরেকটা বিড়ি বাহির করিয়া বলিল,—তা কেন! কুৎসিতও কি আর প্রেমিকের চোখে কুৎসিত থাকে?

—তবে? রূপের বর্ণনা শুনে অন্য লোকের লাভ কি! তারা তো খালি রূপই দেখবে, সে-রূপের অর্থ তো আর বুঝবে না।

—তা ঠিক। গগন ঈষৎ ঘাড় দুলাইয়া কহিল,—আর যে ভালোবাসে সত্যিই সে তার প্রেয়সীর রূপের বর্ণনা দিতে পারে না। যাই হোক, তোর ভাগ্যে ঈর্ষা হচ্ছে, নন্দ। নে, একটা বিড়ি ধরা।

নন্দ এমন একটা ভঙ্গি করিল যে তাহার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হওয়াই উচিত। যে ভালোবাসে, বিড়ি খাওয়াটা তাহার পক্ষে নন্দর কেমন সঙ্গত মনে হইল না।

সন্ধ্যায় হঠাৎ বৃষ্টি নামিয়া আসিল বলিয়া কেহ বাহির হইল না। সেই বৃষ্টি মধ্যরাত্রেও সমানে ঝরিতে লাগিল। স্থান ও সময় সমস্তই নন্দর অপরিচিত লাগিতেছে—ট্রাঙ্ক হইতে চিঠির কাগজ বাহির করিয়া, গগনের টেবিল হইতে কালি আনিয়া সে বিছানায় উপুড় হইয়া মণিকাকে চিঠি লিখিতে বসিল।

সজ্ঞানে মণিকাকে এই তাহার প্রথম চিঠি। তাহার পর তাহাকে ঘিরিয়া টিপি-টিপি বৃষ্টি হইতেছে। চিঠির কথা কয়টিতে কেমন একটা কান্নার সুর বাজিতেছে।

গগন বিছানায় পাশ ফিরিয়া ঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কী করছিস রে, নন্দ?

নন্দ চিঠিটার উপর দ্বিগুণতর আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল,—চিঠি লিখছি।

—চিঠি লিখছিস? গগন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল: তাকে? আমায় দেখাবি না ভাই? বলিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া তো সে আসিলই, একেবারে নন্দর মুঠি চাপিয়া ধরিল।

চিঠিটা তাড়াতাড়ি মুঠির মধ্যে গুটাইয়া লইয়া নন্দ বিরক্ত হইয়া কহিল,—কেন তুই চিঠি দেখবি? আমাদের গোপনীয় কথা কেন তোকে জানতে হবে?

মুঠি ছাড়িয়া দিয়া গগন সরিয়া আসিয়া কহিল,—নে বাবা, নে। তোর গোপনীয় কথা জানতে চাই না। অমন চিঠি তো জীবনে কখনো লিখিনি, তাই দেখবার একটু শখ হয়েছিলো।

নন্দ রাগিয়া ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল: কেন, তোর বউকে কোনো দিন চিঠি লিখিস নি?

গগন কহিল,—সে তো নিতান্তই ডাল-ভাতের কাহিনী। 'কেমন আছ' আর 'ভালো আছি।' অমন চিঠি লিখে-লিখে আঙুলে কড়া পড়ে গেলো। তাতে

লেখবারই বা কী আছে, পড়বারই বা কার মাথা-ব্যথা? নে বাবা,—লেখ্,—যতো তোর প্রাণ চায়। বলিয়া গগন তাহার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

নন্দরও আর লেখা হইল না। গগনের কথায় তাহার স্পষ্ট মনে পড়িয়া গেল যে সে একান্ত করিয়া তাহার স্ত্রীকেই এতক্ষণ চিঠি লিখিতেছিল—সমস্ত সুর হঠাৎ কাটিয়া গিয়াছে। অথচ চিঠিটা গগনকে দেখাইবারও কোনো উপায় ছিল না—তাহার সঙ্গে-সঙ্গে নন্দরও হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গ হইত। চিঠিতে ছটুর খবর ছিল—আসিবার সময় তাহাকে একটি কথাও বলিয়া আসিতে পারে নাই বলিয়া নন্দর দুঃখের সীমা নাই। প্রফুল্ল কাল তাহাকে একমাসের মাহিনা অগ্রিম দিয়া দিবে—কালই এই চিঠির সঙ্গে অর্ধেক টাকা মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিবে। তাহা হইতে দুই আনা পয়সা যেন সে ছটুকে দেয়, ইচ্ছামত সে যেন গুলি কেনে। শীত পড়িয়া গেল বলিয়া মণিকা যেন ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন তুলার একখানি লেপ করিয়া নেয়, খুব অসুবিধা হইলে যেন একটা ঝি রাখে, বাচ্চুকে রাখিতে পারিবে।

এমনি সব কত কথা। ছেলেপিলেদের কথা, তুচ্ছ দারিদ্র্যের কথা—এই সব না থাকিলে গগনকে দেখানো যাইত বটে। কেননা উহা ছাড়া আর কোথাও কিছু ভয় ছিল না—আগাগোড়া কবিত্ব করিয়াছে,—এমন সুন্দর বৃষ্টিতে মণিকাকে খুব কাছে পাইতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে কাছে না পাইলে এইখানে এক রাত্রিও সে কাটাইতে পারিবে না। চিঠিটা গগনের পড়িবার মত করিয়া কেন যে সে লিখিল না তাহা ভাবিয়া এখন তাহার দুঃখ হইতে লাগিল। আলো নিভাইয়া নন্দ কম্বলের তলায় শুইয়া পড়িল। কাল সকালে উঠিয়া লুকাইয়া চিঠিটা শেষ করিতে হইবে। কিন্তু গগনের হাত হইতে বাঁচাইতে গিয়া চিঠিটা জায়গায়-জায়গায় কুঁচকাইয়া, কাঁচা কালি লেপটাইয়া গিয়াছে—ঐ চিঠি পাইয়া মণিকা খুব খুশি হইবে না। স্বামীর কাছ হইতে এই তাহার প্রথম চিঠি পাওয়া। না, আবার নতুন করিয়া লিখিতে হইবে—পরিষ্কার, নিটোল অক্ষরে। আজ রাত্রে লিখিলে যা, কাল সকালে লিখিলেও তাই—যাইবে তো সেই কালকের ডাকে। নতুন চিঠিটা তবে সে গগনকে দেখাইবার মত করিয়া লিখিতে পারে। কিন্তু তাহাতে ছটুর কথা থাকিবে না, বাচ্চুর গালে চুমু খাওয়া হইবে না, মণিকাকে নতুন তুলার লেপ করিবার জন্য অনুরোধ থাকিবে না ভাবিতে নন্দর মন বিমর্ষ হইয়া উঠিল।

সবচেয়ে তাহার দুঃখ হইতে লাগিল এই ভাবিয়া যে মণিকাকে মনে করিতে গেলেই তার সন্তানভারক্লিষ্ট রোগজীর্ণ কুৎসিত চেহারাটার কথাই চোখে ভাসে। সে যে কারণে-অকারণে কেবল ঝগড়া ও চেঁচামিচি করে, জিহ্বায় যে তার ক্ষুরের ধার, রাগিলেই যে সে জিনিস-পত্র তছনছ করিয়া ছেলেপিলেগুলিকে মারিয়া ধরিয়া

তুমুল একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসে—সব নন্দ ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু মণিকার চেহারাটায় সে শত চেষ্টা করিয়াও রঙ চাপাইতে পারে না। মনে-মনে গায়ে তাহার সে যতই গয়না চাপাক বা শিল্ক জড়াক—মণিকা তেমনিই থাকে; সেই তাহার উপর-পাটির কয়টা দাঁত তেমনি পড়ি-পড়ি করিতেছে, চুল উঠিতে-উঠিতে কপালটা ক্রমশ চওড়া হইতে লাগিল, কোটরের মধ্যে চক্ষু দুইটা বসিয়া গিয়াছে—সেই থস্‌থসে বিবর্ণ চামড়া, মুখের ভাবে সেই ক্লান্ত নিরানন্দ পাণ্ডুরতা! কিন্তু একদিন—পুঁটুর জন্ম হইবার আগে সে নিশ্চয়ই এমন ছিল না, এবং সেই দিনও মণিকা তাহার এমনিই একলার ছিল। সেইদিন যে মণিকা কেমন ছিল তাহা নন্দ কিছুতেই মনে করিতে পারে না, আট বৎসর আগে বিবাহের রাত্রির কথা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। মনে করিতে গেলে বারে-বারে শুধু মণিকার এই বর্তমান রুক্ষতার কথাই মনে পড়ে, অকালবৃদ্ধতার অন্তরালেও যে একদিন দীপ্ত যৌবনশ্রী পুঞ্জিত ছিল তাহা তাহার কল্পনার বাহিরে।

কিন্তু আশ্চর্য এই, নন্দ এই বর্তমান মণিকার জন্যই মনে-মনে গুমরিয়া মরিতেছে। আবার কবে না জানি তাহাকে দেখিতে পাইবে!

দেখিতে দেখিতে মেস্‌ময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে নন্দ কলিকাতায় কোন একটি তরুণীর সঙ্গে প্রেমে পড়িয়াছে এবং তাহাকেই পাইবার সাধনায় সে আজো পর্যন্ত বিবাহ করে নাই। মুখে-মুখে কথাটা আরো অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিল,—প্রেম যাহাই হোক, বিবাহটা অসামাজিক; কিন্তু নন্দ যখন পুরুষ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে তখন প্রেমের জন্য প্রথার অত্যাচার সে সহ্য করিবে না। সুযোগ পাইলে মেয়েটিকে সে কৃত্রিম বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া এইখানেই নিয়া আসিবে।

বিখ্যাত লেখক, খেলোয়াড় বা অভিনেতার দিকে জনসাধারণ যেমন সশ্রদ্ধ চোখে তাকায়, নন্দর দিকেও সকলের সেই সসম্মান মুগ্ধ দৃষ্টি। নন্দ কাহারো সঙ্গে বিশেষ কথা কয় না,—কী এক আনন্দময় গভীর-তীব্র চেতনায় সে স্পন্দমান তাহা তাহার ঐ স্তব্ধতায় যেন প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হইতেছে। বিখ্যাত লেখকের পাণ্ডুলিপি হাতে পাইলে অক্ষম ভক্ত যেমন সযত্নে তাহা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া দেখে, হাতের লেখা ভালো বা অপরিষ্কার হোক সব অবস্থাতেই যেমন তাহা প্রশংসা পায়—মেস্‌এর অন্যান্য সহবাসীদের কাছে নন্দর সিট্‌টারও সেই দশা হইল। সবাই লুকাইয়া-লুকাইয়া তাহার তোশক ঘাটে, চিঠির লোভে পকেট হাতড়ায়—যাহা সে করে বা বলে সব কিছুর মধ্যেই দুঃসহ প্রেমের নির্ভুল একটি ইঙ্গিত আবিষ্কার

করে। লেখকের হাতের লেখা ভালো হইলে ভক্তদের কাছে লেখার অর্থ যেমন গম্ভীর হইয়া উঠে, অপরিষ্কার হইলে মনে হয় লেখার স্টাইল অত্যন্ত দ্রুত, তীক্ষ্ণ ও লেখকের অনুভূতি তীব্র ও বেগময়—তেমনি নন্দ যদি একদিন ফর্সা কাপড় পরিয়া টেরি বাগায়, অমনি সবাই মনে করে কী পরিপূর্ণ গভীর আনন্দে সে তন্ময় হইয়া আছে; আর যদি সে চুল উস্কখুস্ক রাখিয়া ময়লা কাপড়ে জানালায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অমনি তখন আবার সবাই বলাবলি করে জীবনের নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পাইয়া নন্দ বিভোর, উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে! আশ্চর্য এই, নন্দও দিনে-দিনে এই বিচিত্র উত্তেজনার মধ্যে নিজেকে অনায়াসে খাপ খাওয়াইয়া লইল। কাহারো সঙ্গে সে অনর্থক আলাপ করে না, মুখে অনাবশ্যক হাসি নাই, আড্ডা দিয়া বিড়ি ফুঁকিয়া সে তাহার অবসর সময় ব্যয় না করিয়া সকালে-বিকেলে একা-একা মাঠে বেড়ায়, ডাকে না দিতে হইলেও বসিয়া-বসিয়া মণিকাকে চিঠি লেখে—সেই সেদিনের মণিকাকে সে চিঠি লেখে যেদিন প্রথম লজ্জানম্র পায়ে বহুবসনকুণ্ঠিত দেহে তাহার কাছে সে আসিয়াছিল পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া, গৃহরচনার নবীন স্বপ্ন লইয়া, জননী হইবার সশঙ্ক একটি কামনা লালন করিয়া। আট বছরেও সেই মণিকাকে একখানা চিঠি লেখা হয় নাই—যদি সুযোগ হইত তবে এমনি করিয়াই সে লিখিত, তাহাতে আর সন্দেহ কী!

এতদিনে নন্দর চিঠির উত্তর আসিল। চিঠিটা পড়িল ভূপেনবাবুর হাতে। বয়স তাঁহার পঞ্চাশ পার হইয়াছে, বাড়ি বরিশাল—কি-একটা মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে আসিয়া এই মেস্‌এ উঠিয়াছেন। কথাটা তাঁহার কানেও পৌঁছিয়াছিল। চিঠিখানি হাতে করিয়া নাচাইতে-নাচাইতে তিনি নন্দকে কহিলেন,—আপনার চিঠি, পড়ে লুকিয়ে কোথাও রেখে দিন। নইলে ওঁরা সব কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দেবেন।

হ্যাঁ, মণিকাই চিঠি লিখিয়াছে বটে,—তাহার হস্তাক্ষর দেখিয়া নন্দর শরীর সুখে মৃদু-মৃদু কাঁপিয়া উঠিল। ভূপেনবাবুর হাত হইতে চিঠিটা তুলিয়া নিয়া তখুনি সে তাহার ঘরে গেল—ঘর ফাঁকা, তৎক্ষণাৎ চিঠিটা খুলিয়া ফেলিল, আর এক মুহূর্ত দেরি তাহার সহিতেছিল না। কে আসিয়া পড়ে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি চিঠির নিচের দিকে চোখ বুলাইয়া দেখিল—ভয়ের কিছু নাই, ছেলেপিলে লইয়া মণিকা বেশ ভালোই আছে। আরো উপরে উঠিল—টাকা পাইয়াছে, গুলি কিনিয়া ছটুর স্ফূর্তি আর ধরে না, পুঁটুকে সে কাপড়ওয়ালির কাছ হইতে সস্তা দেখিয়া একখানা গোদাবরি শাড়ি কিনিয়া দিয়াছে। নিজের জন্য কিছুই সে কিনিল না কেন? নন্দ আরো দু'লাইন উপরে উঠিল। নতুন জায়গায় গিয়া

নন্দর শরীর কেমন থাকে সেই ভাবনায় মণিকা দিন-রাত অস্থির হইয়া আছে। একখানি মশারি সে নিয়া যাইতে পারে নাই বলিয়া তাহার বড়ো ভয়, মশা খুব বেশি হইলে যেন সে দুই পায়ে বেশ করিয়া তেল মাখিয়া শোয়—পায়ের তলায় বসিয়া কেই বা তাহাকে তেল মাখাইয়া দিবে? আরো এক জায়গা চোখে পড়িল, তাহাতে লেখা আছে—টাকা পাইয়াই সে শ্মশানেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিয়াছে—এই সঙ্গে প্রসাদী বেলপাতা সে পাঠাইল, যেন কপালে ঠেকাইয়া বালিশের তলায় রাখিয়া দেয়।

খামের মধ্যে নন্দ সেই বেলপাতা খুঁজিতেছিল, বারান্দায় একসঙ্গে অনেকগুলি জুতার শব্দ হইল। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া খবরগুলি পড়িয়া নন্দর তৃপ্তি হয় নাই, কিন্তু নিভৃতে বসিয়া চিঠিটা আমূল পড়িবার আগেই উৎপাৎ জুটিয়া গেল দেখিয়া নন্দ তাড়াতাড়ি সেটাকে শার্টের তলায় ফতুয়ার পকেটে লুকাইয়া ফেলিল। ভূপেনবাবুই কথাটা নিশ্চয় রটাইয়া দিয়াছেন। গগন দলের নেতা—হাসিতে হাসিতে কহিল,—এলো চিঠি? আমাকে দেখাবিনে?

নন্দ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল,—কেন, পরের চিঠি দেখবার জন্যে কেন এত লোভ?

—বা, একটু দেখলামই না। প্রেমপত্র দেখবার সৌভাগ্য তো জীবনে কোনদিন হয় নি! চিঠি দেখলেই তো আর তোর প্রেমিকার গায়ে আঁচড় পড়বে না!

ভূপেনবাবু পিছনে ছিলেন, অপরাধীর মত কহিলেন,—আমার কিছু দোষ নেই ভায়া। আমি বললাম, নন্দবাবুর চিঠি এসেছে, তায় কলকাতার ছাপ—বোধহয় আফিসের চিঠি হবে।

নন্দ চটিয়া কহিল,—বুড়ো বয়সে আপনারো দেখছি মাথা খারাপ হয়েছে। যারই চিঠি হোক না কেন, দেখাবো না আমি। আমার বুঝি গোপনীয় কিছু থাকতে নেই?

ভূপেনবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—নিশ্চয়, নিশ্চয়—আমিও তো তাই ওদের বলছিলাম।

গগন নন্দর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল,—এতে চটবার কী হয়েছে! গোপনীয় বলেই তো তার ওপর আমাদের এতো শ্রদ্ধা! দেখাবিনে তো দেখাবি নে। তোর সুখে সুখী হতে খালি চেয়েছিলাম—ভাগ না দিবি তো কী করা যাবে? বলিয়া গগন দলবল লইয়া প্রস্থান করিল।

চিঠিটা দেখানো গেল না বলিয়া সব চেয়ে নন্দরই বেশি কষ্ট হইতেছিল।

এই চিঠি কৌতূহলী চোখের তলায় তুলিয়া ধরিলেই সমস্ত স্বপ্ন নিমেষে ভাঙিয়া যাইবে। সেই স্বপ্ন ভাঙিয়া দিতেও সে চাহে না। সত্যিই তো জীবনে সে এই প্রথম ভালোবাসিল, সত্যিই তো প্রেমের কাছে রূপ বা বয়সের বিচার একেবারে অবান্তর—তাহার স্পর্শে লোহাও সোনা হইয়া উঠে। বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই স্ত্রী প্রেমিকা হইতে পারিবে না এমন কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম আছে নাকি? মাঝে আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—এ একটা সামান্য ঘটনা মাত্র - আসলে নন্দ এই প্রথম, একেবারে এই নতুন করিয়া ভালোবাসিতে শিখিল। কিন্তু এই কথা তাহার বুঝিবে কে?

প্রথম চিঠিটা নন্দ যেই সুরে লিখিয়াছিল ঠিক সেই সুরেই জবাব আসিয়াছে। এইবার সে চিঠিতে নতুন সুর যোজনা করিল। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, গাঢ় চিঠি—সংক্ষিপ্ততাই যে গাঢ়তার প্রমাণ আজ নন্দ বুঝিল। বেশি কিছু লিখিল না, ছেলেদের খবর জানিবার জন্য সম্প্রতি তাহার ব্যাকুলতা নাই, সংসার যেমন চলিতেছে চলুক, এখানে তাহার খাটুনি বেশি, বা মশার উপদ্রব তত মারাত্মক নয় এসব খবর দৈনিক কাগজে বাহির হইলেই চলিবে, নতুন তুলার লেপ আগামী মাসে করিলেও কিছু ক্ষতি হইবে না—নন্দ তাই দরকারি সমস্ত কথা চাপিয়া গিয়া যাহা লিখিল তাহা একান্ত মণিকাকেই উদ্দেশ করিয়া। এবং একমাত্র মণিকার কথা ভাবিতে-ভাবিতেই ভাষা তাহার বিরহ-রাত্রির অনিদ্রার মতই বিধুর হইয়া উঠিল—বহু কথার আড়ম্বরে তাহাকে বিলাপ করিয়া তুলিল না। মণিকাকে মণি-তে সংক্ষিপ্ত করিয়া সম্বোধন করিল ও প্রায় দুই ঘণ্টা ভাবিয়া মাত্র আটটি লাইন লিখিয়া যেখানে চিঠি শেষ করিল, ঠিক তাহারই আগে চুপি চুপি, নিজেরই অলক্ষিতে, মণিকাকে সে একটি চুমা খাইয়াছে।

ঠিক প্রতিধ্বনি মিলিল। তেমনি ছোট এক টুক্‌রা চিঠি—কথার ফাঁকে-ফাঁকে সেই ভাবনিবিড় নিঃশব্দতা যেন পুঞ্জিত হইয়া আছে। ভাঙা-চোরা লাইনে গোটা-গোটা অক্ষর—আবেগপরিপূর্ণ বিহ্বল চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। ছেলেপিলেদের কোনো কথা নাই, দারিদ্র্যের অভিযোগ নাই—নন্দ লণ্ঠনের শিখাটা আরো উস্কাইয়া দিয়া বারে-বারে চিঠিটা পড়িতে লাগিল। মাত্র কয়েক লাইনেই তাহা ফুরাইয়া গেছে, কিন্তু নন্দ তাহার অর্থের সীমা খুঁজিয়া পাইতেছে না।

তক্তপোশে গগন চিৎ হইয়া দেওয়ালগিরির আলোয় খুঁটিয়া-খুঁটিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল, নন্দর হাতে আজ তাহার প্রেমিকার চিঠি আসিয়া পৌছিলেও তাহার সামান্য উৎসাহ নাই। দৃশ্যটা নন্দর ভালো লাগিল না—এমন আনন্দ সে

একটি বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করিয়া লইতে চায়। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সে কহিল,—এই গগন, আজ আবার তার চিঠি এসেছে। দেখবি?

গগন কাহার উপর অভিমান করিবে—অভিমান করিবার অর্থই বা তাহার কী হইতে পারে! মুখ হইতে খবরের কাগজটা সরাইয়া সে মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

নন্দ নিজেই গগনের তক্তপোশে উঠিয়া গেল। চিঠিটা তাহার হাতে দিয়া সে এই পাশে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পড়িতে-পড়িতে তাহার মুখ-চোখের চেহারা কেমন বদলায় সেইটুকু দেখিলেই নন্দ কৃতার্থ হইবে—অন্যের চোখের দৃষ্টিতে নিজের সৌভাগ্য পরিমাপ করিবার অদম্য ইচ্ছা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

চিঠিটা পড়িয়া মুগ্ধ চোখে গগন খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। চিঠিটা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল, একটি লাইনও আর কোথাও নাই। কত গভীর করিয়া ভালোবাসিলে প্রকাশে এমন একটি নিবিড় সংযম আসিতে পারে তাহা ভাবিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া গেল। জলকণার মাঝে আকাশের অসীম প্রতিবিম্বের মত দু' চারিটি ভাষায় সে অনির্বচনীয় ব্যাকুলতার স্বাদ পাইল— মনে হইল ভালো-বাসাটা জীবনের পক্ষে যত বড়ই কৃতিত্বের কথা হোক না কেন, যথার্থ ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারাটাও উঁচু দরের চারুবিদ্যা।

সব চেয়ে গগনকে বেশি মুগ্ধ করিয়াছে—নন্দর প্রেয়সী চিঠি সাঙ্গ করিয়া নিচের দিকে কালি দিয়া একটি বৃত্ত আঁকিয়া দিয়াছে। এক পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট লাজুক অক্ষরে সে লিখিয়াছে: এইখানে একটি চুমু খাইয়ো। সোজাসুজি সরল ভাষায় চুম্বন-নিবেদনের মাঝে বোধকরি রূঢ় নির্লজ্জতা আছে— তাই এত অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও এই পরোক্ষ সঙ্কেতটি গগনের ভারি ভালো লাগিল। তাড়াতাড়ি আঙুলটা সে একেবারে চিঠির এক প্রান্তে সরাইয়া আনিল, পাছে তাহার স্পর্শে অপরিচিতা মেয়েটির সেই বৃহত্তম অস্ফুট চুম্বনের স্মৃতিটি আবিল হইয়া উঠে।

চিঠিটা সন্তর্পণে নন্দর হাতে দিয়া গগন ভারি গলায় কহিল, চমৎকার চিঠি। বেশ লেখা-পড়া-জানা মেয়ে।

নন্দ চিঠিটা ভাঁজ করিয়া খামে পুরিতে পুরিতে কহিল,— ভালোবাসতে হলে আর লেখা-পড়া শিখতে হয় না। ও এমনি বিদ্যে যে এক নিমেষে পৃথিবীর সব কিছু শিখিয়ে দেয়।

গগন গোপনে বোধকরি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল; কহিল,—অমন এক-আধখানা চিঠি পড়লে কতো ভালো লাগে। আর আমাদের বউএর সব চিঠি—বাঙলা খবরের কাগজের মতোই বাঙলা—চাল-ডাল নুন-তেলের হিসেব। কী নেই, তারই এক লম্বা ফর্দ! বউরা কখনো চিঠি লিখতে পারে?

নন্দ গম্ভীর হইয়া কহিল,—যেমন লিখবি তেমনিই তো উত্তর পাবি।

—আহা, বউকে আবার কী এমন গীতাঞ্জলি লিখে পাঠাতে হবে! মনি-অর্ডারের একখানা কুপন লিখে পাঠালেই যথেষ্ট। এই ভাখ্‌ না—এখন এতো সব চিঠি, কিন্তু বিয়ে কর, দেখবি কী-রকম সব চিঠি আসে। হ্যানো পাঠাও, ত্যানো দাও—কোথায় কী শাড়ি উঠ্‌লো, পাড়ার কোন্‌ মেয়ে কী গয়না গড়ালে,—খুকির কানে পুঁজ হয়েছে, আজ জ্বর, কাল আমাশা—একেবারে ঝালাপালা করে ছাড়লো।

একটু থামিয়া গগন আবার কহিল,—কী সুন্দর নাম! মণি। এই নাম সেদিন আমাকে বলতে চাস্‌নি?

নন্দ কহিল,—নামেতে কী হয়!

—না, নামে আবার হয় না! আমার বউর নাম কী জানিস?

—কী?

—সুনীলবালা। চিঠিতে লেখে: ইতি তোমার চরণের দাসী সুনীলবালা। চিরকাল চরণের দাসী হয়েই থাকলো, কোনোদিন আর মাথার মণি হতে পারলো না।

নন্দ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিল,—কেন, নীলা বলে ডাকলেই পারিস?

গগন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল,—আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই! আমি কেন মিছিমিছি পরিশ্রম করতে যাবো? একেবারে বাপের বাড়ি থেকে নাম ঠিক করে আসতে পারেনি?

চিঠিটা নন্দ বালিশের তলায় নিয়া শুইল। রাত অনেক হইলে, বাড়ি-ঘর-দোর নিঃশব্দ হইলে চিঠিটা সে বাহির করিয়া আনিল। গগন অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছে। নন্দ আস্তে-আস্তে চিঠিটার ভাঁজ খুলিতে লাগিল। অন্ধকারে সেই বৃত্তটা সে স্পষ্ট ঠাহর করিতে পারিল না—সমস্ত চিঠি ভরিয়া সে চুমা খাইতে লাগিল।

ধীরে-ধীরে মাস ফুরাইয়া আসিতেছে। একদিন গগনকে নন্দ বলিল,—সে এখানে আসছে, ভাই।

গগন অবাক হইয়া কহিল,—কে?

নামটা মনে করিতেও নন্দর রোমাঞ্চ হয়, তবু সে স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করিল: মণি।

—তিনি এখানে আসছেন নাকি? কেন?

—আর কতো দিন দূরে-দূরে থাকা যায় বল্। নিজেই সে চলে আসছে।

—চমৎকার! গগন লাফাইয়া উঠিল। কহিল,—কোন্ বাড়িতে উঠবেন? কবে?

—কোন্ বাড়িতে আবার! আমি ছাড়া এখানে আর তার আছে কে! তার জন্যে আমার এখানে একটা বাড়ি নিতে হবে দেখছি।

—বলিস কী! এখানে তোদের বিয়ে-টিয়ে হবে নাকি?

মুচকিয়া হাসিয়া নন্দ কহিল,—বিয়ের আর বাকি কী আছে শুনি?

মাথা দুলাইয়া গগন কহিল,—তা ঠিক বটে! শুকনো দুটো মন্তর পড়ে দিলেই কি বিয়ে হলো? তা, কবে আসছেন?

—অনেক দিন ধরেই তো আসবো-আসবো বলে লিখছে। বড় জোর মাস-কাবারের এই তারিখটা। আর তাকে ঠেকানো যাবে না।

গগন এই শেষের কথাটা বুঝিল না। কহিল,—কেন? তুই না গিয়ে তিনি আসছেন যে!

—বা, আমারই বা যেতে হবে কেন? একা আমি তো খালি ভালোবাসছি না, দায়িত্ব আমাদের সমান। পরস্পরের সঙ্গে এই সমান হওয়াই তো ভালোবাসার গোড়ার কথা।

কিন্তু শেষের কথাটাই গগন ভালো করিয়া বুঝিতেছে না। সবিস্ময়ে কহিল,—সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে একা তোর আশ্রয়ে চলে আসছেন? এ কী দুঃসাহস তাঁর!

—তা আর বলতে।

—কী করবি এলে পর?

—যতো দিন চায় যত্ন করে কাছে রাখবো।

অস্থির হইয়া গগন কহিল,—তার চেয়ে বিয়েই করে ফ্যাল্ না বাপু।

নন্দ হাসিয়া কহিল,—বিয়ের আর বাকি কী।

গগনের কাছে কুয়াশা তবুও কাটিল না। একটি মেয়ে সমস্ত বাধা-বন্ধন অতিক্রম করিয়া মিলনের প্রবল প্রেরণায় তাহার দয়িতের কাছে চলিয়া আসিতেছে এই খবরটা যতই চমৎকার হোক্ না কেন, বিশ্বাস করিতে তাহার একটু বাধিতেছিল। কিন্তু জীবনে সে কোনো দিন প্রেমে পড়ে নাই, এই দুঃসাহসিক অভিযানের মর্যাদা সে বুঝিবে কী করিয়া। প্রেমের জগতে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য বলিয়া কিছু আছে নাকি? অসাধ্যসাধনই যদি না করিবে, তবে পৃথিবীতে প্রেমের জন্ম হইয়াছে কেন?

গগন কহিল,—ওঁকে কোথায় তবে তুলবি ?

—প্রফুল্লর বাড়িটা এখনো খালি পড়ে আছে—ওটাই চেয়ে নিতে হবে। দরকার হলে আমাকে একদিন ছেড়ে দেবে বলেছিলো।

গগন অল্প একটু হাসিয়া কহিল,—তা, এর চেয়ে দরকার আর কী হতে পারে ? তবে ওঁকে নিয়ে দিব্যি তুই সংসার পাতবি ভাবছিস ?

নন্দ চিন্তিত মুখে কহিল,—দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ! আর তাকে সত্যি-সত্যিই দূরে-দূরে রাখতে পারছি না ভাই। একবার কাছে যদি তাকে পাই-ই আর তাকে ছেড়ে দেব না।

—অতো বড়ো বাড়িতে তোরা দুটিতে মিলে থাকবি ?

—হ্যাঁ, আর লোক পাবো কোথায় ? কেন, এ-বাড়িতে ভয়ের কিছু আছে নাকি ?

—না, তা বলছিনে। উনি তবে শোবেন কোথায় ?

—কেন, আমার ঘরে !

গগন অস্থির হইয়া কহিল, তার চেয়ে বিয়ে করে ফেললেই তো পারিস।

নন্দ তেমনি হাসিয়া কহিল,—বিয়ের আর কিছু বাকি আছে নাকি ?

প্রফুল্লর কাছে কাল সকালেই যাইতে হইবে—বাড়িটা যেন এত দিন তাহারই জন্য খালি পড়িয়া ছিল। চাকরিটা যখন এইখানেই কায়েমি হইতে চলিল, তখন মণিকা ও ছেলেপিলেদের কত কাল বিনা তত্ত্বাবধানে দূরে সরাইয়া রাখা যায়। মণিকা এখানে আসিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে—তাহার হাতে রান্না না খাইয়া খাইয়া এত দিনে শরীর তাহার নিশ্চয় কালি হইয়া গেছে. বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড়গুলা বুঝি আর ফর্সা হয় না, বোতাম একবার ছিঁড়িয়া গেলে জামাটা বুঝি তেমনি ফাঁক হইয়া থাকে, জুতায় কালি পড়িবার নাম নাই, সুতা তুলিয়া চিহ্ন দিবার আর লোক নাই বলিয়া ধোপা-বাড়িতে প্রায় ক্ষেপেই নিশ্চয় বদল হইয়া যাইতেছে। স্বামীকে ছাড়িয়া আর সে থাকিতে পারিতেছে না ; বাচ্চুটা দোর-গোড়ায় বসিয়া 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া কাঁদে, পুঁটু ও ছটুর পড়া বলিয়া দিবার লোক নাই, তাহা ছাড়া দিনে-দিনে ছটুর দুষ্টামি কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। আগের টাকাটা শোধ করিতে এই মাসের মাহিনা যদি সে না-ও পায়, তবু যেন ধার-কর্জ করিয়া হিসাবমত প্রয়োজনীয় টাকা সে তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দেয়—নগেনকে বলিয়া-কহিয়া মণিকা অনেক কষ্টে রাজি করাইয়াছে, সে-ই নিয়া যাইবে —ছুটির জন্য নন্দকে ভাবিতে হইবে না। বিনে-পয়সায় বাড়ি যখন পাওয়াই যাইবে, চাকরিতেও যখন বাহাল হইল, তা ছাড়া এমন ভালো চলনদারও যখন

পাওয়া যাইতেছে—তখন মণিকা ও সন্তানগুলিকে আর কত কাল সে ভুলিয়া থাকিবে?

মণিকাকে দেখিবার জন্য নন্দও মনে-মনে উচাটন হইয়া উঠিল। এখন না-জানি সে কেমন হইয়াছে, তাহাকে না-জানি সে কেমন করিয়া দেখিবে! যেন কত যুগ-যুগ ধরিয়া তাহাকে সে দেখে নাই। মণিকা আর যাহাই হোক, তাহার সন্তানের জননী। তাহাকেই অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে সে অবিনশ্বর হইতে আসিয়াছে—তাহার জীবনে অপরিমিত তার মূল্য, অবিচল তার আসন। বহুদিনের অভ্যাসে সে-মূল্য সে মলিন করিয়া ফেলিয়াছিল, আজ নতুন করিয়া তাহার অর্থবোধ হইবে। যে নিভৃতে বসিয়া একদিন সামান্য একটি রেখাবৃত্তের মধ্যে তাহার হৃদয়ের সমস্ত মধু ঢালিয়া দিয়াছিল তাহার অধরস্পর্শের নতুন স্বাদের আশায় নন্দ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল।

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল: কেন, কেউ আসবে বুঝি?

নন্দ আমৃতা-আমৃতা করিয়া কহিল,—আত্মীয়-স্বজন কেউ-কেউ তো আছে—তারা আসতে চাচ্ছে।

—বাড়ি তোমাকে অনায়াসেই ছেড়ে দিতে পারি—একরকম পড়েই তো আছে ওটা। কিন্তু বলি কি, এবার একটি বিয়ে করো।

নন্দ গলিয়া গিয়া কহিল,—হ্যাঁ, এইবার করবো। বেশি দেরি নেই।

—মায়া বলছিলো এই কেওরখালিতে তার একটি জানা মেয়ে আছে—দূর-সম্পর্কে তার নাকি বোন হয়। দেখতে তার চেয়েও সুন্দরী। যদি বলো তো ওটি তোমার জন্য জোগাড় করি।

নন্দ বলিল—পাগল হলে নাকি? কী যে বলো। অমন সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আমি কী করবো?

—না, না, তোমাকে একদিন দেখানোও যাবে না হয়। মায়াকে বলে মেয়ে দেখবার তারিখ একটা ঠিক করে ফেলি শিগগির। তোমার বিয়ের কর্তা তুমিই তো?

—তবে আবার কে?

—তবে আর কথা নয়। বাড়ি আমি লোকজন লাগিয়ে আজই ঠিক করে ফেলছি। কবে চাই তোমার? কবে তাঁরা আসছেন?

এই দিন তিন-চার বাদে।

—ব্যস, ভাবনা নেই—আজই উঠোনের আগাছাগুলো তুলে ফেলবার ব্যবস্থা করছি। এসো, ভেতরে এসো, চা খেয়ে যাও।

নন্দ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল,—তার চেয়েও একটা জরুরি কথা ছিলো।

—কি ?

ততোধিক কুণ্ঠিত হইয়া নন্দ কহিল,—এই মাসের মাইনেটা পেলে ভারি সুবিধে হত।

প্রফুল্ল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, বা, মাইনে পাবে বৈ কি। মাইনে পাবে না কেন ?

—তোমার সেই অগ্রিম টাকাটার বাবদ কাটা না গেলে—

—দূর পাগল! ও-টাকা তো আমি তোমাকে আমার পকেট থেকে দিয়েছি। ও-টাকার সঙ্গে তোমার মাইনের সম্বন্ধ কী। যখন পায়ো দিয়ে দেবে —তার জন্য তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। এসো, এক পেয়ালা চা খেয়ে যাও। বলিয়া ভিতরের দরজার পরদা লক্ষ্য করিয়া প্রফুল্ল ডাকিয়া উঠিল : মায়া!

পাশের ঘরে শাড়ি খস্‌খস্‌ করিয়া উঠিল। নন্দ বিব্রত হইয়া কহিল,—না, এখন আর চা খাবো না, আমাকে এখন একবার পোস্টাপিসে যেতে হবে। আরেক সময় এসে খাবো'খন। বলিয়া শাড়িটা প্রত্যক্ষ হইবার আগেই নন্দ রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

পোস্টাপিসে এত সকালে স্ট্যাম্প হয় তো পাওয়া যাইবে না, না যাক,—তবু এখুনি আবার চা খাইবার কী হইয়াছে! মায়া বা তাহার দূরসম্পর্কের বোন যতই সুন্দরী হোক—তাহার মণিকাও তাহাদের চেয়ে কম সুন্দরী নয়। একমাত্র চর্মচক্ষুর দৃষ্টিতেই যে-সৌন্দর্য নিঃশেষ হইয়া যায়, নন্দর কাছে, তাহার মূল্য কিছু আছে বলিয়া মনে হইল না। মণিকাকে সে মুগ্ধদৃষ্টি বন্ধুর কাছে না-ই বা বাহির করিতে ভরসা পাইল—হয় তো এই বলিয়া বাহির করিবে না যে তাহাদের গুণগ্রাহিতায় গভীরতা নাই—শতকরা নিরানব্বুই জনই বাহিরের খোলস দেখিয়া তন্ময় হইয়া থাকে। কিন্তু নন্দ জানে সৌন্দর্য রূপে নয়, যৌবনে নয়, স্বাস্থ্যে নয়—এমন-কি বাহ্যিক আচরণে পর্যন্ত নয়, তাহা দৃষ্টির অতীত, স্পর্শের অতীত, ভোগের অতীত—তাহা একমাত্র অনুভূতির অধিগম্য। এমন করিয়া মণিকাকে তাহার কে বুঝিবে ?

লোকজন লাগাইয়া একদিনেই বাড়িটাকে বাসের উপযোগী করিয়া তোলা হইল। বেশ সুন্দর, বড় বাড়িখানা—নানা জাতের গাছ দিয়া ঘেরা—চওড়া উঠোন, ইহার একপাশে নিশ্চয়ই আনাজের খেত করা যাইবে। গগন সঙ্গে আসিয়াছিল, সেও শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিল : বাড়িটা বেশ নিভৃত, পাড়ার একটু বাইরে—তাহাদের দুইজনের প্রেমালাপ বেশ ভালো জমিবে—কোথাও

তাহাদের এতটুকু বাধা নাই। এই ঘরটাতে যেন তাহারা শোয়, ওটা তাহাদের বসিবার ঘর হইবে—বাকিটা বাথ্‌রুম। বসিবার ঘরে কয়েকখানা চেয়ার পাতিয়া রাখিলেই চলিবে, তাহারা দুয়েক জন কালে-ভদ্রে গল্পগুজব করিতে আসিতে পারে।

নন্দ সেই সব কথা ভাবিতেছে না। কোন ঘরটাতে কী হইবে—তাহার ব্যবস্থার মালিক সে নিজে নয়; মণিকা তাহার নিজের সুবিধা বা খেয়ালের এতটুকু নড়চড় করিবে না। নন্দ তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছে না যা-হোক। সে ভাবিতেছে এত বড় ফাঁকা উঠান পাইয়া বাচ্চুটা কেমন ফুর্তিতে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইবে, ছটুকে হয়তো আর ঘরের দেয়াল দিয়া আটকাইয়া রাখা যাইবে না, পুটুকে সামনের ইস্কুলটায় ভর্তি করিয়া দিবে—যদি একটা চাকর রাখা যায়, মণিকার আপত্তি করিবার কী থাকিতে পারে। সব চেয়ে আশার কথা এই যে এখানে প্রচুর আলো ও প্রচুর উন্মুক্ততা হয় তো নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মণিকা নতুন রূপ নিয়া বসিবে।

সেটা নিতান্তই বাইরের রূপ – নন্দ তাহাতে বিশেষ বিশ্বাস করে না। তাহার অন্তরেই মণিকার নতুন জন্মলাভ ঘটিল।

*

আজ মণিকা আসিবে। সকাল হইতেই নন্দর মন উড়ু-উড়ু করিতেছে। রবিবারে পৌঁছিবার কথাই সে মণিকাকে লিখিয়া দিয়াছিল, তাহা হইলে সে স্টেশনে থাকিতে পারিবে। সেই মতই তাহারা আসিতেছে। এখন তাহারা নিশ্চয় ষ্টিমারে—নদীর উপর; রেলিঙ ধরিয়া ছটু ও পুটু জল আর নৌকা দেখিতেছে—মণিকার দৃষ্টি আসিয়া পড়িয়াছে একেবারে তাহার চোখের উপরে। ঘর-দুয়ার সে সব গোছ-গাছ করিয়া রাখিয়াছে, এখন মণিকাকে সেইখানে লইয়া যাইতে পারিলেই হয়।

এত দিন সে অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছিল, আজ হঠাৎ তাহার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। গগন কহিল,—কি রে, আজ তোর উনি আসছেন নাকি?

নন্দ উদাসীন হইবার ভান করিয়া কহিল,— কি জানি, চিঠি ফিঠি তো আর লেখেনি।

কিন্তু চিঠি-ফিঠি যদি না-ই লিখিল, তবে তাহার সম্বন্ধে একটুও উদ্বেগ না দেখাইয়া নন্দ নিশ্চিন্ত হইয়া টেরি বাগাইতে বসিল কী বলিয়া? সযত্নে কাপড়ে চুনোট দিতেছে, হৃষীকেশবাবুর শালখানা চাহিয়া আনিয়া গায়ে কায়দা করিয়া ভাঁজ করিয়া লইল কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া আস্তে-আস্তে কখন বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

বড়-বড় পা ফেলিয়া একেবারে ইষ্টিশানে। দূর হইতে কাহাকে দেখিয়া নন্দ চমকাইয়া উঠিল—প্রফুল্ল আর মায়া রেল-রাস্তার ধারে বেড়াইতে আসিয়াছে। একটা থামের পিছনে সে লুকাইল; না, তাহাকে দেখিবার জন্য যেন তাহাদের ঘুম আসিতেছে না,—আর দেখিলেই বা এত তাহার ভয় কিসের? সত্যিই তো, তাহার আত্মীয়-স্বজনরাই তো আসিতেছে। স্ত্রীর মত আত্মীয় প্রফুল্লরই বা কয়টা আছে শুনি? কেওরথালির তাহার দূরসম্পর্কের শালির সে একটা গতি করিতে পারিল না বলিয়া প্রফুল্ল যদি অসন্তুষ্টই হয় তবে মাসে-মাসে তাহার হাতে বাড়ি-ভাড়া তুলিয়া দিলেই চলিবে।

কিন্তু গাড়ি আজ কিছু লেইট্ বুঝি? কতক্ষণে না জানি আসিবে! অস্থির হইয়া নন্দ প্ল্যাটফর্মে পাইচারি করিতে লাগিল। সিগ্ন্যাল এই ডাউন হইল,—ঐ বুঝি এঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যাইতেছে। নন্দ শালটা কাঁধ হইতে নামাইয়া কোমরে জড়াইয়া নিল—আগে হইতেই দুইটা কুলি ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। ঘোড়ার গাড়ি সে আগেই ভাড়া করিয়া রাখিয়াছে—গাড়োয়ান তাহার চেনা, কোথায় যাইতে হইবে তাহাও সে জানে। মাল-পত্র বিশেষ কী বেশি হইবে,—বাসন-কোসনের একটা ছালা, দুইটা হয় তো ট্রাঙ্ক, বিছানা একটা—আর—বড় জোর খাবারের একটা ঝুড়ি। অন্য টুক্-টাক্ জিনিস—শিশি-বোতল, শিল-নোড়া, কৌটা-কাপ প্রদোষবাবুর স্ত্রীর জিম্মাতেই রাখিয়া আসিবার কথা, খুচরো খদ্দের যদি পাওয়া যায় ভালো, না গেলে অদানে অব্রাহ্মণেই যাইবে না-হয়।

হ্যাঁ, আর সন্দেহ নাই, স্পষ্ট শব্দ শোনা যাইতেছে। নন্দর বুক চাকার তলায় ট্রেনের লাইনের মত স্পন্দিত হইতে লাগিল।

এমন সময় কে তাহার কাঁধে হাত রাখিল। নন্দ চমকাইয়া পিছনে চাহিয়া দেখে গগন—বোকার মত এক গাল হাসিতেছে। গগন গদগদ হইয়া বলিল,—আজকে উনি আসছেন বুঝি?

কাঁধ হইতে হাতটা ঠেলিয়া দিয়া নন্দ স্পষ্ট করিয়া কহিল,—হ্যাঁ।

—আমাকে না বলে পালিয়ে এলি যে বড়ো! আমি তো আর তাঁকে কেড়ে নিতাম না।

কথা শুনিয়া নন্দ হাসিল। গগন কহিল,—আমাদের সঙ্গে ভাব করে দিলেও কি তাঁর জাত যাবে?

নন্দ প্ল্যাটফর্ম ধরিয়া হাঁটিতে-হাঁটিতে কহিল,—আজকেই কি সুবিধে হবে? একদিন বাড়ি যাস না-হয়।

—আজকে অন্তত একটু দেখে যাই না। আমার চোখ দুটো তো কারো কাছে বাঁধা রাখিনি,—কী বলিস্ ?

নন্দ গগনকে কিছুতেই এড়াইতে পারে না ; যত এগোয়, সেও ততই জোঁকের মত লাগিয়া থাকে।

থাকুক, কিন্তু মণিকাই তাহার প্রেয়সী, তাহার অন্তরের মণি, তাহার প্রথম কবিতা-সৃষ্টি—এ-কথা গগনের কাছে গোপন করিয়া আর কী লাভ হইবে ? বরং সে শিখুক,—সে তাহাকে এক বর্ণও মিথ্যা কথা বলে নাই।

গাড়ি হুস্‌হুস্ করিয়া প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চোখের সমুখ দিয়া আস্তে-আস্তে একটা-একটা করিয়া কামরাগুলি চলিয়া গেল, কিন্তু কোথাও গগন একটি সুবেশা মার্জিততনু তরুণীকে দেখিতে পাইল না। তবে গাড়ির পিছন দিকে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু নন্দ এঞ্জিনের দিকেই রওনা দিয়াছে।

তাহার গায়ের শালটা টানিয়া ধরিয়া গগন কহিল,—ওদিকে নেই, আমি ঠিক দেখেছি। পেছনে চল্, ও-দিকটা দেখে আসি।

কিন্তু নন্দ স্পষ্ট দেখিয়াছে একটি থার্ড-ক্লাশ কামরার জানলা দিয়া ছোট হাত বাড়াইয়া ছটু খুশিতে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে : বাবা, ঐ যে বাবা। গাড়ি থামবে না এখানে ? কামরাটা খানিকদূর আগাইয়া গেছে- নন্দ তাহারই উদ্দেশ্যে চলিতে-চলিতে কহিল,—হ্যাঁ, ঐ সমুখের দিকেই আছে।

গগন জিজ্ঞাসা করিল,—তুই দেখেছিস ঠিক ?

—আমার দেখা ভুল হবে কেন ? আমি কি আর চিনি না ?

নন্দ ভিড় ঠেলিতে-ঠেলিতে কুলি লইয়া সেই থার্ড-ক্লাশ কামরার দিকে অগ্রসর হইল। গগনও সামান্য একটু দূরত্ব রাখিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতেছে।

গাড়িটা সবে হাল্‌কা হইতে সুরু করিয়াছে—মাল-পত্র নিয়া নামিতে উহাদের কিছু সময় লাগিবে। নগেন চালাকি করিয়া সব মাল জেনানা-গাড়িতেই চালান করিয়াছে। মেয়েদের ভিড় একটু পাৎলা না হইলে কুলিরা উঠিতে পারিবে না। দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া তাহারা মাথার বিড়ে পাকাইতে লাগিল, এবং বকসিস্‌টা যে তাহাদের পুরাই পাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে একসঙ্গে বিস্তারিত যুক্তি দেখাইতে লাগিল।

এ-দিকে পাশের কামরা হইতে প্ল্যাটফর্মে নামিবার পথ পাইয়া নগেন প্রাণপণে চীৎকার সুরু করিয়াছে : কুলি ! কুলি !

নন্দ হাত তুলিয়া নিঃশব্দে তাহাকে সঙ্কেত করিল।

তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া নগেন কহিল,—ও ! আপনি এসেছেন ? উঁকি-ঝুঁকি

মেয়ে আপনাকে এতোক্ষণ দেখতে পাইনি বলে ভারি ভাবনা হচ্ছিলো। সেজদিয়া পাশের মেয়েদের গাড়িতেই আছে।

নন্দ শুধু কহিল,—দেখেছি।

সত্যিই সে দেখিতেছে—খুশিতে ছটুর চক্ষু দুইটা জলজল্ করিতেছে মুখের প্রতিটি রেখায় খুশির চাঞ্চল্য উপচিয়া পড়িতেছে। বাচ্চু পর্যন্ত জানলা ধরিয়া বেঞ্চির উপর থিরথির করিয়া দাঁড়াইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। ছটু তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল, জানলার বাহিরে জনতার মধ্যে নন্দর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল,—ঐ বাবা।

আশ্চর্য, বাচ্চু নন্দকে ঠিক চিনিতে পারিয়াছে। শরীর দুলাইয়া, শব্দ করিয়া, হাত তুলিয়া গোল-গোল মুঠি ঘুরাইয়া সে তাহার পিতৃ-সন্দর্শনের প্রবল আনন্দ ঘোষণা করিতে লাগিল।

মেয়ে-কামরার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কে ডাকাডাকি করিতেছে : নগেন, নগেন।

শেষরাত্রের দিকে সুখস্বপ্ন দেখিয়া ভোরের আলোয় ঘুম ভাঙিলে, পাছে সেই স্বপ্ন অদৃশ্য হইয়া যায় ভাবিয়া লোকে যেমন সন্তর্পণে অতিকুণ্ঠিত ভাবে চোখ মেলে, নন্দ তেমনি ভয়ে ভয়ে, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, জানালা দিয়া প্রসারিত মুখখানির দিকে তাকাইল।

গগন তাহাকে দেখিতেছে কি না তাহা জানিবার জন্য বিন্দুমাত্র তাহার কৌতূহল নাই, ভয় নাই, অনুশোচনা নাই।

মণিকাকে আরো শীর্ণ দেখাইতেছে,—ট্রেনের ধকলে হয় তো,—পরনের শাড়িটা ময়লা, বোধহয় রাঁধিবার শাড়িখানা পরিয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, কয়লায় চুল আচ্ছন্ন ও মুখের ভাব অত্যন্ত রুক্ষ—কোথাও এতটুকু পরিবর্তন হয় নাই। পরিবর্তন নন্দও বিশেষ কিছু আশা করে নাই, তবু এই প্রায় এক মাস অদর্শনের পর ভাবিয়াছিল তাহাকে না-জানি কেমন করিয়া সে দেখিবে! বিশেষত যে তাহাকে এত সুন্দর ও সংক্ষেপ করিয়া চিঠি লিখিত, তাহাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারে না বলিয়া চিঠি ভরিয়া কেবল যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে, একটি রেখাবৃত্তের মাঝে যে তাহার একটি সম্পূর্ণ চুম্বন পাঠাইয়া দিয়াছিল! নন্দ আবার ভালো করিয়া মণিকার দিকে তাকাইল। নতুন কী আর সে দেখিতে চায়! এই মণিকার জন্যই সে অক্ষরের অঞ্জলিতে ততদিন প্রথম উৎস উত্থিত নির্ঝরজলের মত নির্মল, বেগপরিপূর্ণ, উত্তপ্ত প্রেম নিবেদন করিয়াছে, এই মণিকারই বিরহ বেষ্টন

করিয়া সে এতদিন একটি স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছিল,—হ্যাঁ, এই মণিকাকেই সে ভালোবাসে—চোখ ভরিয়া গগন তাহাই দেখিয়া যাক।

সৌন্দর্য খালি রূপে নয়, কান্তিতে নয়, বয়সে নয়—সে যে কোথায়, একচক্ষু গগন তাহা বুঝিবে না।

নগেনকে সঙ্গে লইয়া নন্দ কামরার দরজার দিকে আগাইল। নন্দর উপস্থিতি উপেক্ষা করিয়া মণিকা ভাইকে লক্ষ্য করিয়া কাহল,—কী, মাল-পত্তর নামাতে হবে না নাকি? না, আবার ট্যাঙস-ট্যাঙস করতে-করতে ফিরে যেতে হবে!

নগেন কুলি ডাকিতে যাইতেছিল, মণিকা একেবারে খেপিয়া উঠিল: সব সময়ে তোর এই বাবুয়ানা ভালো লাগে না বলছি। কী কেবল উঠতে-বসতে কুলি-কুলি! ভারি ফুল-বাবু হয়েছিস, নিজের হাতে একটা মোট তুই বইতে পারিস না —এ-পর্যন্ত কুলির পিছে কত গেছে তার কিছু খেয়াল আছে? বেশ পরের পয়সায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিস কি না, গায়ে আর লাগে না। নে, ধর্ নিচে থেকে, আমি দিচ্ছি নামিয়ে।

মণিকার এই কথাগুলি নন্দর ভালো লাগিল না; ইচ্ছা হইল বলে যে-লোক কষ্ট করিয়া এত দীর্ঘ পথ তাহাদের বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে তাহার প্রতি এই কর্কশ ব্যবহার করা কী ভালো দেখায়? কিন্তু প্রতিবাদে কিছু একটা বলিতে গেলেই হয় তো এইখানেই তুমুল একটা লড়াই সুরু হইয়া যাইবে। আর নন্দ একবার রাগিলে কী যে করিয়া বসিতে পারে তাহার ঠিক নাই। কাছাকাছিই কোথাও গগন লুকাইয়া-লুকাইয়া হয় তো তাহাদের দেখিতেছে। সে না জানি কী ভাবিবে! নগেনও কী মনে করিবে না-জানি!

অতএব কিছু না বলিয়া নন্দ কুলি দুইটাকে আদেশ করিল।

পুঁটু বেঞ্চিটার একধারে শুইয়া ঘুমাইতেছিল, এত হাঁকডাকেও তাহার ঘুম ভাঙে নাই। মাণকা হঠাৎ তাহার শুক্‌না চুলগুলি ধরিয়া সজোরে এক টান মারিয়া কহিল.—কী লো ছুঁড়ি, নামবি নে গাড়ি থেকে? সেই সকাল থেকে ঘুমুচ্ছে, এক চড়ে ঘুমের নাম ঘুচিয়ে দেব। ধর্ বাচ্চুকে—

বলিয়া বাচ্চুকে বেঞ্চি হইতে তুলিয়া লইতে-লইতে কহিল,—সারা রাস্তা ট্যাঁ-ট্যাঁ, এখন তো দেখছি হাত-পা ছুঁড়ে খুব ফূর্তি হচ্ছে। যাকে দেখে এতো ফূর্তি, সে তো এগিয়ে এসে একটুও কোলে নেয় না দেখি।

বাচ্চুকে পুঁটুর কোলে দিয়া ছটুর কানটা মলিয়া দিয়া কহিল,—কী, নামতে হবে না গাড়ি থেকে? সোহাগ করতে হয়, নেমে গিয়ে কর্ না—এ-গাড়ি কি তোর বাপের জায়গা নাকি?

মণিকা এইবার নিজের শাড়িটা গায়ের উপর ভালো করিয়া গোছাইতে লাগিল। একটা চাদর জড়াইয়াও সে আসে নাই, গায়ের প্রত্যেকখানা হাড় শাড়ির আবরণ অমান্য করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নামিয়া পড়িয়া সে কহিল— কী রদ্দি দেশ বাবা, পাঁচ শো বার নামো, পাঁচ শো বার ওঠো—আসতে-আসতে সাত-জন্ম কেটে যায়। চাকরি করবার আর জায়গা মিললো না ভূ-ভারতে এখানে ভদ্দরলোক থাকে নাকি?

ঘোড়ার গাড়ি আগে হইতেই বলা ছিল, গাড়োয়ান আসিয়া কুলিদের সাহায্যে মাল-পত্র গাড়ির আষ্টে-পৃষ্ঠে তুলিয়া নিল।

সকলেই উঠিয়াছে। নগেন কোচ্-বাক্সে উঠিতে যাইতেছিল, নন্দ তাহাকে ভিতরে টানিয়া বহুকষ্টে একটুখানি জায়গা করিয়া দিল। নগেন কাছে থাকিলে মণিকার সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠা সম্ভব হইবে না—এই যা ভরসা।

গাড়ি ছাড়িবার আগে নন্দ কহিল,—মালগুলো সব ঠিক-ঠাক উঠলো কি না, গুনে দেখ, নগেন।

মণিকা কহিল—কুঁজোটা নিয়ে সতেরোটা কিন্তু।

মণিকা কিছুই ফেলিয়া আসে নাই, দুই হাত ভরিয়া সমস্তই কুড়াইয়া আনিয়াছে। নগেন দরজা দিয়া মাথা উঁচু করিয়া সব গুনিয়া নিতে লাগিল। সব ঠিকই উঠিয়াছে।

মণিকা মুখ-ঝামটা দিয়া কহিল,—এ কী রাজ্যছাড়া দেশ,—মরতে এখানে কেন আমাদের নিয়ে এলে? এ যে দেখছি খালি মাঠ আর গাছ। সাপ-খোপ, চোর-ডাকাতের বাসা। চাকরি তোমার আর কোথাও জুটতো না? বাঙলা-দেশের ব্যাটাছেলে সবাই কি এই ভুতুড়ে দেশেই চাকরি করতে আসে? কী, কথা কও না যে, বদলি-ফদলি নেই চাকরির?

বদলি থাকিলে নন্দ যখন আবার মণিকাকে কয়েকদিনের জন্যে এইখানে রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত, তখন আবার তেমনই হয়ত মণিকা জানলায় আসিয়া দাঁড়াইত, যতক্ষণ তাহাকে দেখা যায় ততক্ষণ চোখ ফিরাইত না।

মণিকা আবার দাঁত খিচাইয়া উঠিল: কী, বাড়িতে রান্না-বান্না সব তৈরি করে রেখেছ তো, না গিয়ে আবার আমায় হাঁড়ি ঠেলতে হবে? এতোদিনেও আক্কেল হলো না তোমার? চোখের চামড়া বলে কিছু কি নেই? আমার তো বুঝলাম মরে গেলেও খিদে পেতে নেই, কিন্তু সারাদিন উপোসের পর এই ছেলে-পিলেগুলো কী খায়! আর আমি তো একটা পেত্নির সামিল— খিদে-তেষ্টা তো কোনোদিন পেতে দেখলাম না।

নন্দ অপরাধীর মত মুখ করিয়া রহিল। পৌঁছানমাত্রই যে এমন একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপারের তাগিদ পড়িয়া যাইবে তাহা তাহার খেয়াল ছিল না। মুখ চুন করিয়া কহিল,—তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। মেস্ থেকে ভাত আনবো'খন।

—সর্বাঙ্গ একেবারে জুড়িয়ে গেল! মুখ বিকৃত করিয়া মণিকা বলিয়া উঠিল: মেস্ থেকে ভাত আনাবেন। ও ছোঁবে কে? তুমি একা খেয়ো। তুমি একা গিল্লেই আমাদের সাত গুষ্টির উদ্ধার হয়ে যাবে।

এমনি সময় আবছা অন্ধকারে জানলা দিয়া কে-একজন বাহির হইতে গাড়ির মধ্যে মুখ বাড়াইয়া দিল। তাহাকে ভালো করিয়া চিনিবার আগেই সে আবার সরিয়া গেছে।

একেবারে মণিকার মুখের কাছেই সে-মুখ ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভয়ে মণিকা আঁতকাইয়া উঠিল—কে ও লোকটা? দস্তুরমত ভদ্রলোকের মত দেখিতে, ফিট্‌ফাট্ চেহারা—নন্দর মতনই প্রায় সাজিয়াছে—কী ব্যাপার মণিকা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিল না। স্বামীকে কহিল,—কী, এখানে গুণ্ডার অত্যাচারও আছে নাকি? কে ও লোক?

নন্দ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,—কী করে বল্‌বো?

—দেখতে তো ভদ্রলোক, তবে মেয়েছেলের গাড়ির মধ্যে মুখ বাড়ায় কেন? বিয়ে করেনি?

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নন্দ কহিল,—তা কোন না করেছে।

—বিয়ে করেছে তো পরের বউয়ের দিকে উঁকি মারে কোন লজ্জায়?

নন্দ হাসিয়া কহিল,—সুন্দরী বউ দেখেছে কি না, তাই একটু উঁকি মেরেছিলো হয় তো—যদি প্রেমে পড়ে যায়।

মুখ বাঁকাইয়া মণিকা কহিল,—কথার ছিরি দেখে মরে যেতে ইচ্ছে করে। ঘরে বউ আছে যখন, তার সঙ্গেই পঁচিশ লক্ষবার প্রেমে পড়ুক না—কে ধরে রাখছে। যতো সব পাজি, হাড়-হাবাতের দল। বাড়িতে তবে বউ আছে কী করতে?

নন্দ চুপ করিয়া রহিল। এতোদিন ধরিয়া গগনকে সে বারে-বারে এই কথাই তো শিখাইতে চাহিয়াছে।

———

উদ্বৃত্ত

এক দমকে হীরালালের পঁচিশটা টাকা রোজগার হইয়া গেল। এক লাইফ-ইন্‌সিয়োরেন্‌স্‌এর এজেন্টের কাছে তাহাদের আপিসের মাদ্রাজি কেরানিকে ধরাইয়া দিয়াছিল—চোখ কান বুঁজিয়া পাঁচটি হাজার টাকার বীমা সে করিয়া বসিল। হাজারে পাঁচ টাকা—এমনি একটা দালালির মুনাফা সে পাইবে—এজেন্ট তাহাকে অভয় দিয়াছে। কোনরকমে এখন ফার্স্ট প্রিমিয়ামটা পাঠালেই হয়। ফার্স্ট প্রিমিয়ামটা পৌঁছানো মাত্রই হীরালাল এজেন্টের নিকট হইতে বলা কহা নাই করকরে পঁচিশ টাকা আদায় করিয়া নিবে।

খবরটার মধ্যে ঝাঁজালো একটা নেশা ছিল। মদের গন্ধের মত কথাটা আর সে সুহাসিনীর কাছ থেকে লুকাইতে পারে নাই। যখনই অভাবের মেঘে সংসারের আকাশ ঘোরালো করিয়া আসে, তখন প্রতিপদের শশিলেখার মতো টাকার ঐ ক্ষীণ সম্ভাবনাটাই যা-একটু উহাদের আলো দেয়! কিন্তু কয়েক দিন হইতেই টুনুর অসুখটার বড় বাড়াবাড়ি যাইতেছে। মাসও এই দিকে ফুরাইয়া আসিল। ভালো দেখিয়া যে একটা ডাক্তার ডাকিবে তাহা কিছুতেই হইয়া উঠিতেছে না। তাই আজ আপিসে যাইবার সময় সুহাসিনী কাঁদিয়া-ককাইয়া হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়া বারে-বারে বলিয়া দিয়াছে, যেমন করিয়া পারে কিছু টাকা লইয়া যেন বাড়ি ফিরে, আজ পর্যন্ত এক দাগ ওষুধও টুনুর পেটে পড়িল না।

শনিবার সকাল-সকাল আপিস ছুটি হইয়া গেল। পা টিপিয়া-টিপিয়া, ঈশ্বরের নাম করিতে-করিতে হীরালাল সেই জীবন-বীমার আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইত। তেতলায় উপরে আপিস—লিফ্‌ট-বয় তাহাকে গ্রাহ্য করিল না। পাহাড়-প্রমাণ সিঁড়ি ভাঙিতে-ভাঙিতে হীরালালের কেবলই মনে হইতে লাগিল এজেন্টের সে আজ নিশ্চয়ই দেখা পাইবে না। দেখা যদি পাইলই, তবে ঈশ্বর আছেন কী করিতে? একে-একে সিঁড়িগুলি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতেই—আশ্চর্য,—উপরে উঠা মাত্রই সেই এজেন্টের সঙ্গে দেখা হইল। হীরালালের বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল, নিমেষে হাত-পা ঠাণ্ডা করিয়া জিভ-মুখ শুকাইয়া চুপসাইয়া গেল। তাহার পর নিজের মনেই একটুখানি হাসিয়া এই অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের মোহটা সে ফিকে করিয়া তুলিল—এজেন্টের দেখা পাইলে কী হইবে, মাদ্রাজি-কেরানি এখনো নিশ্চয়ই ফার্স্ট প্রিমিয়াম পাঠাইয়া দেয় নাই। লোকটা

এই সময় যদি ছুটি না নিত, পাকাপাকি খবর লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বড়-বড় পা ফেলিয়া আসা যাইত তা হইলে!

তাহাকে দেখিয়া এজেন্ট খুশি হইয়া করমর্দন করিল, কিন্তু মুনাফার কথাটা পাড়িবার আর নাম নাই। হীরালাল ভাবিল, মাদ্রাজি কেরানি যদি প্রেমিয়াম দিয়াও থাকে, তাহা হইলেই যে কড়ায়-ক্রান্তিতে এজেন্ট তাহার চুক্তি পালন করিবে এতটা আশাই বা সে করিতে গেল কোন সাহসে? গড়িমসি করিয়া দিন পিছাইতে-পিছাইতে অবশেষে এজেন্টও যদি একদিন অন্যত্র সরিয়া পড়ে, তবে হীরালাল কোথায় গিয়া পঁচিশ টাকার জন্য মাথা খুঁড়িবে?

বাজে কথার ভিড় সরাইয়া, ঈশ্বরের নাম করিতে-করিতে, রুদ্ধনিশ্বাসে হীরালাল কথাটা পাড়িয়া বসিল: মাদ্রাজি ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত তার প্রিমিয়ামটা দিলেন?

ত্বরিত ভঙ্গিতে এজেন্ট খাড়া হইয়া উঠিল; কহিল,—দাঁড়াও, দেখে আসি।

স্টেনোগ্রাফার্‌এর স্পিড্‌এর মত মিনিটে কয়বার ঈশ্বরের নাম আওড়ানো যায় দেয়ালে পিঠ করিয়া নিঝুম হইয়া দাঁড়াইয়া হীরালাল তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল।

বেশিক্ষণ ভাবিবার সময় না দিয়াই দ্রুতপায়ে এজেন্ট আসিয়া হাজির,—পত্ত´ পাওয়া গেছে।

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় হীরালালের ঘাড়ের চুলগুলি কাঁটা দিয়া উঠিল। জিভ দিয়া ঠোঁট দুইটা বার কয়েক চাটিয়া, পাঞ্জাবির কাছে হাতের ঘাম মুছিতে-মুছিতে আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল,—আমার টাকাটা কি আজ পাওয়া যাবে?

—Sure. এক্ষুনি। পত্ত´ এলেই পেয়ে যেতে। বলিয়া এজেন্ট কাগজ-পত্রে-বোঝাই পকেট হইতে অতিকায় একটা মানিব্যাগ বাহির করিয়া দুইখানা দশ টাকার নোট ও পাঁচটা খুচরা টাকা হীরালালের হাতে গুঁজিয়া দিল। হীরালাল সমস্ত টাকাটা এত সহজে এত অমনোযোগে গ্রহণ করিল যে, যেন সে বন্ধুর হাতের ঠোঙা হইতে আঙুল দিয়া কয়েকটা চিনে-বাদামের টুকরা তুলিয়া লইতেছে মাত্র।

এজেন্ট-বন্ধু চা খাইয়া যাইবার জন্য তাহাকে অনেক পিড়াপিড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু হীরালাল সর্বভোগবিরত সন্ন্যাসীর মত করিয়া কহিল, চা সে কবে ছাড়িয়া দিয়াছে; গল্প করিবার সময় থাকিলে আরো কিছুক্ষণ সে বসিয়া যাইতে পারিত বটে, কিন্তু বউকে লইয়া আজ সন্ধ্যায় তাহার সিনেমা যাইবার কথা—এখুনি বাড়ি পৌঁছিয়া তাড়া দিতে না থাকিলে তাহার সাজ-গোজ কিছুতেই সমাধা হইবে না—বাঙালি মেয়েদের তো তুমি জানো!

কথা কয়টা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া র‍্যাপারের তলায় টাকাশুদ্ধ পকেটটা চাপিয়া

ধরিয়া হীরালাল গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে-সঙ্গে নিচে নামিয়া আসিল। রাস্তায় তখনো রোদ—কিন্তু ভুরি-ভোজনের পর প্রথম সিগারেটটির মতো ভারি মিষ্টি। পকেটে হাত ঢুকাইয়া ব্যাপারটা সে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিল। প্রবল জ্বরে সর্বাঙ্গ ব্যথা করিয়া মাথা তাহার ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে। আকাশ ফুঁড়িয়া এতগুলি টাকা কী করিয়া যে তাহার পকেটে আসিয়া পড়িল মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া সহজে সে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। অলক্ষিতে সে কোনো পুণ্য কাজ করিয়াছিল বোধ হয়—হয় তো আগের জন্মে, স্পষ্ট করিয়া মনে পড়িবার জো নাই। অথচ, রোজ সমানে সাত ঘণ্টা করিয়া খাটিয়া মোটে সে পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনা পায়। অলৌকিক কোনো সাধনা না করিলে এই পুরস্কার সে পায় কী করিয়া? বরং পাঁজির মাস-ফলে পৌষে বৃশ্চিক-রাশির অর্থনাশ বলিয়াই লেখা ছিল,—জ্যোতিষীরা আজকাল হিসাবের অঙ্ক ভুলিয়া গিয়া যা-তা কতগুলি গোঁজামিল দিয়া রাখে!

পকেটে আবার হাত ঢুকাইয়া সে লক্ষ্য করিল টাকা কয়টি বাহাল-তবিয়তেই আছে—র‍্যাপারে ঢাকা পড়িয়াছে বলিয়াই আর উড়িয়া যায় নাই। হীরালাল খুচরা টাকা কয়টি হাতে লইল,—একটা ব্যাঙ্কের সিঁড়ির কাছে উবু হইয়া—মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল সাংহাই ব্যাঙ্ক কর্‌পোরেশান্—টাকা পাঁচটা সে সিমেন্টের উপর আছড়াইয়া-আছড়াইয়া বাজাইতে লাগিল। লোকে ভাবিবে কত টাকার চেকই না সে ভাঙাইয়া নিয়াছে! একটা টাকার আওয়াজ যেন কিছুতেই ফুটিতে চায় না—যত আছড়ায়, আওয়াজটা ততই যেন কানে কেমন চ্যাপটা, খন্‌খনে লাগে। যাক,—টাকাটা হীরালাল অন্য পকেটে আলাদা করিয়া রাখিল,—একটা টাকা অচল হইলে আর মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে না। লণ্ঠনের মাথায় বসাইয়া একটু গরম করিয়া নিলেই দিব্যি আওয়াজ বাহির হইবে। বাস-এর দোতালায় অনায়াসে চলিয়া যাইবে হয় তো। তা ছাড়া—কথাটা হীরালালের বুকে তীরের মতো আসিয়া বিঁধিল—টাকাটা ডাক্তারের হাতে গুঁজিয়া দিতে আর বাধা নাই; অনেক টাকার মধ্যে এই টাকাটা কে চালাইয়া দিল তাহা খুঁজিয়া পাওয়া তাহার সাধ্য হইবে না।

মন্দ শীত পড়ে নাই—র‍্যাপার দিয়া জামাটা ভালো করিয়া মুড়িয়া হীরালাল হাঁটিতে সুরু করিল। অনেকের কাছে অনেক গল্প সে শুনিয়াছে এমনি অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির আনন্দে লোকে এমন নাকি অবশ, অভিভূত হইয়া পড়ে যে, পকেটমার স্বচ্ছন্দে টাকাটা উঠাইয়া লইয়া গেলেও বিন্দুবিসর্গ টের পায় না। হীরালাল সেই কথা ভাবিয়া মনে-মনে হাসিল। যাই হোক, কথাটা মনে পড়িয়া ভালোই

হইয়াছে—সাবধান হইতে দোষ কী ! এই টাকা খোয়া গেলে তো চলিবে না—এই টাকা ঘুষ দিয়া টুনুকে দস্তুরমতো রক্ষা করিতে হইবে। দশ মাসের হইয়া প্রথম মনু যখন মারা গেল, তখন পাশের বাড়ির এ পাড়ার লোকদের শুনাইয়া সুহাসিনী এই বলিয়াই কাঁদিয়াছে যে বাপ হইয়া হীরালাল ছেলের মুখে এক কৌটা ওষুধও জোগায় নাই। হীরালাল নীরবে চোখের জল মুছিয়াছে,—অবস্থায় কুলায় নাই বলিয়াই পারে নাই—নহিলে কি সাধ করিয়া তাহার অমন রাজপুত্রের মত ছেলে যমের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল ? সেই মনুই আবার বছর ঘুরিয়া সুহাসিনীর কোলে ফিরিয়া আসিয়াছে। বাপ হইয়া হীরালাল এইবার এত সহজে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না। টাকাটা অমনি খোয়া গেলেই হইল আর কি !

বাগবাজারের বাস একটা সামনেই দাঁড়াইয়া আছে। সোজা উঠিয়া পড়িলেই পারে। এখন সটান বাড়ি চলিয়া যাওয়াই তো উচিত। সংসারের জন্য দুয়েকটা জিনিস-পত্র এখনই কিনিয়া নিলে হয়, কিন্তু, সমস্ত টাকাটা আগে সুহাসিনীর হাতে তুলিয়া দিলে সে না-জানি আজ কেমন করিয়া মুখের দিকে চাহিবে ! তাহার পর খুচরা কয়েকটা টাকা চাহিয়া লইয়া দোকান করিতে ফের বাহির হইয়া পড়িলেই চলিবে। তাহাদের বাগবাজারেই তো সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। আর কী-ই বা এমন জিনিস ! সম্প্রতি টুনুর জন্য এক প্যাক্ বার্লি, কিছু নেবু ও বেদানা, পোয়াটাক মিছরি ও সাবু—আর যা-যা সুহাসিনী বলে, কিছু এখন তার মনেও পড়িতেছে না—আর, সুহাসিনীর জন্য এক জোড়া শাড়ি ! শ্যামবাজারের ট্র্যামের ফার্স্ট ক্লাশে ঐ মেয়েটির পরনে সাদাসিধে পাড়ের ফিন্‌ফিনে শাড়িখানি যেমন সুন্দর মানাইয়াছিল, তেমনি না মানাইলেও ঐ জাতের এক জোড়া শাড়ি সে সুহাসিনীর জন্য কিনিয়া আনিবে। বাড়ি যাইবার আগেই কিনিয়া নেওয়া ভালো, কেননা টাকাটা একবার সুহাসিনীর হাতে পৌঁছিলে শাড়ি কিনিয়া বাজে খরচ করিবার জন্য তাহার শক্ত মুঠি আর শিথিল হইবে না। আলটপ্‌কা এতগুলি টাকা যখন হাতে আসিয়া পড়িল তখন এই সামান্য অপব্যয়টা অনায়াসে সহিবে। খরচ না করাটা তো মাত্র কৃপণতা নয়, দস্তুরমতো হৃদয়হীনতা। মাত্র দুইখানি শাড়ি পাল্‌টাইয়া সুহাসিনী দিনরাত্রির পৃষ্ঠা উল্‌টাইতেছে। জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া, কাচিয়া লইবার শ্রমটুকু সহ্য করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত সুতাগুলির আর নাই। সুহাসিনীর সেই লক্ষ্মীছাড়া বেশবাসের চেহারার কথা ভাবিয়া হীরালালের মনটা অত্যন্ত নরম হইয়া আসিল। কিন্তু নিজের জন্য কিছু না কিনিয়া খালি সুহাসিনীর শাড়ি লইয়া গেলে সুহাসিনী স্বচ্ছন্দ-মনে কিছুতেই তা হাত পাতিয়া লইবে না।

নিজের জন্ম কী-ই বা নেওয়া যায়! স্যাণ্ডেল্‌এর স্ট্র্যাপ্‌ একটা খুলিয়া গিয়াছে বটে, শস্তা দেখিয়া এক জোড়া নাগরা কিনিয়া নিলে মন্দ হয় না—কলেজ ছাড়িবার পর বহুদিন সে নাগরা পরে নাই।

অন্যমনস্কের মত এই সব ভাবিতে-ভাবিতে কখন সে এস্‌প্ল্যানেড-এর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে কিছু খেয়াল ছিল না। সামনেই আবার একটা বাগবাজারের বাস। কিন্তু গাড়িটা নিতান্ত ছোট, তা ছাড়া তেমনি নোংরা ভিড়। দুই নম্বর রুট্‌-এ কলেজ স্ট্রীট্‌ হইয়া বাড়ি যাইবে—পছন্দসই শাড়ি ও জুতা সেখান থেকেই কিনিয়া নিবে। কী ভাবিয়া হীরালাল রাস্তা পার হইয়া পুব-দিকের ফুটপাতে উঠিয়া আসিল। সামনেই একটা 'গ্রিল্‌'। ভিতরে ছুরি-কাঁটার মৃদু-মৃদু আওয়াজ হইতেছে। জোরে নিশ্বাস টানিয়া হীরালাল মাংসের না কিসের একটা টাট্‌কা গন্ধ পাইল।

নিমেষে কী নিদারুণ যে তার ক্ষুধা পাইয়া গেল, হীরালাল যেন এখুনিই ফুটপাতের উপর ভাঙিয়া পড়িবে! বাড়ি ফিরিয়া এই সময়ে বা তাহারো কিছু পরে এক পেয়ালা চা সে খায় বটে, কিন্তু তাতে না থাকে বর্ণ, না বা স্বাদ। অথচ তাহা লইয়া বিন্দুমাত্র অভিযোগ করিবারো কারণ সে কোনোদিন খুঁজিয়া পায় নাই। আজ পকেটে টাকা আছে বলিয়াই অসময়ে তাহার এমন বিজাতীয় ক্ষুধা পাইয়া বসিয়াছে। দুই পা আগাইয়া গিয়াও ক্ষুধাকে সে দমন করিতে পারিল না, আবার ফিরিয়া আসিল। এক পেয়ালা চা খাইয়া গেলে পকেটটা এমন কি আর হাল্কা হইবে! কয়টি তো মোটে পয়সা।

হীরালাল 'গ্রিল্‌'-এর সুইঙ্‌-দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। শীতের বিকেল—ইহারি মধ্যে দোকানে এত ভিড় জমিয়াছে যে সহসা সে কোনো টেবিলেই জায়গা খুঁজিয়া পাইল না। এই যাত্রা সে রক্ষা পাইল বুঝি। বাহির হইয়া পড়িয়া কোনোদিকে না তাকাইয়াই এবার সে সোজা বাস-এ চাপিয়া বসিবে—ভিড় থাকুক বা নাই থাকুক। কিন্তু বাহির হইয়া যাইবার আগেই দোকানের ম্যানেজার তাহাকে ধরিয়া ফেলিল; কহিল,—আসুন, জায়গা করে দিচ্ছি।

হীরালালের আর যাওয়া হইল না। ম্যানেজার তাহার নিজের টেবিলের কাছে চেয়ার টানিয়া তাহার জন্ম জায়গা করিয়া দিল। ঐখানে বসিয়া সবাই-এর চোখে হীরালাল এত সবিশেষ হইয়া উঠিল যে মাত্র এক পেয়ালা চা অর্ডার করিবার কথা সে আর ভাবিতেও পারিল না। তা ছাড়া একেবারে কাছে

—মাত্র হাত দুই দূরে শ্বেতপাথরের টেবিলের দুই পাশে একটি পার্শি যুবক ও অল্প বয়সী একটি পার্শি মেয়ে মুখোমুখি বসিয়া চা, পেইসট্রি ও টোম্যাটোর স্যাণ্ডউইচ্ খাইতেছে। ম্যানেজারের এই আপ্যায়নে তাহারাও কৌতূহলী হইয়া হীরালালের মুখের দিকে খানিক না তাকাইয়া থাকিতে পারিল না।

হীরালালের কাছে ম্যানেজার স্বয়ং মাথা নোয়াইয়া অর্ডার নিতে আসিল। 'মেন্যু'টায় একবার চোখ বুলাইয়া যাহা যাহা মুখে আসিল হীরালাল টপাটপ বলিয়া চলিল। বয় ছুরি-কাঁটা রাখিয়া গেছে, খাবারগুলি সভ্য-সভ্য ভাজিয়া আসিবে বলিয়া একটুখানি তাহার বসিয়া থাকিতে হইবে। দুই হাত দিয়া ছুরি-কাঁটা দুইটা নাড়িতে-নাড়িতে হীরালাল চারিদিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু তাহার সৌভাগ্যে বিস্মিত বা ঈর্ষান্বিত হইবার একটিও কোথাও লোক না পাইয়া অগত্যা তার দুই চোখ পার্শি মেয়েটির মুখের উপরই আসিয়া বসিল। ক্ষীণাঙ্গী ছিপ্‌ছিপে মেয়েটি, বয়স সতেরো-আঠারোর কম হইবে না—সুহাসিনীরো তো এই বয়সই হইবে—পরনে ক্রিম-রঙের ঢিলে একটা ফ্রক্, পায়ে হাঁটু-পর্যন্ত-তোলা সাদা মোজা। মোজার ভিতর দিয়া পায়ের গাঢ় রং যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। নধর কাঁধ ছাপাইয়া শিল্কের মতো নরম চুল, তাতে বদামির ফিকে আভাস, অনাবৃত শীর্ণ হাতে এক গাছি করিয়া সোনার প্লেন বালা, গলার অনেক-খানি খোলা—ফ্রকের গলাটা চৌকো করিয়া কাটা। বুকের আভাস পাওয়া যায় কি না যায়! মুখখানিতে সরলতার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, চোখ দু'টি কালো —রাতে দিঘির জলের মতো টল্‌মল্ করিতেছে। তাহার সমুখে হীরালালের দিকে পিঠ করিয়া যে বসিয়া আছে সে হয়তো তাহার দাদা হইবে, কিংবা কোনো নিকট আত্মীয়—খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে ও হাত হইতে খাবার কাড়িয়া নিতে একটু মেয়েটির বাধিতেছে না। কথা বলিবার সময় সুর ও হাসিবার সময় ছন্দ মিলিয়া তাহার দেহটিকে হীরালালের কাছে একটি লিরিক্‌এর মূর্তি দান করিল। কখন যে টেবিলের উপর প্লেটগুলি সাজান হইয়াছে সেদিকে আর তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

এক রাজ্যের খাবার। ছুরি-কাঁটা দিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া খাইবার তাহার ধৈর্য নাই। গ্লাশের কয়েক ছিটা জলে হাত ধুইয়া হীরালাল প্লেটে হাত দিল। মেয়েটির খাওয়া শেষ হইয়াছে—বয় বিল্ আনিয়াছে, প্লেটের থেকে রেজ্‌কি আর সে তুলিয়া নিল না—বয়ই ওটা বক্‌শিস্ পাইবে। প্রায় ছ'-সাত আনা পয়সা। দুইজনে মিলিয়া খাইয়াছেই বা কত। এইবার উহারা উঠিল—যাইবার সময় এ-দিকে ফিরিয়া তাকাইবার তাহাদের কী এমন দরকার

পড়িয়াছে ! কিন্তু মেয়েটির দেহভার বহন করিবার কী সুন্দর লীলা—এত শীত পড়িয়া গেলেও এত পাৎলা জামা সে কী করিয়া পরিয়া আছে।

খাইতে-খাইতে হীরালালের কেবল সুহাসিনীর কথা মনে পড়িতে লাগিল। গত ভাদ্রে তাহার সতেরো পূর্ণ হইয়াছে, একমাত্র চেহারা দেখিয়া ত্রিকালজ্ঞ ঋষিও তাহা বুকে হাত দিয়া বলিতে সাহস পাইবে না। সংসারের ক্লেশ সহিয়া-সহিয়া শরীর দড়ি হইয়া গেছে, স্নায়ুতে তাহার এতটুকুও হয়তো জোর নাই যে এমন শব্দ করিয়া হাসে। আর হাসিবার কারণও এখানে কত তুচ্ছ—ক্রিম্-রোল্‌টা দাঁতে কামড়াতেই খানিকটা চল্‌কাইয়া বাহির হইয়া আসিল—অমনি হাসি ; কনুই লাগিয়া সসারটা নড়িয়া উঠিতেই নিচের খানিকটা চা টেবিলের উপর ছিটাইয়া পড়িল—অমনি আবার হাসিয়া উঠিয়াছে। সুহাসিনীর এখন হাসিবারই দিন বটে ! সারা দিন-রাত্রি টুনুকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে—ঝির হাতে সংসার, যতটা সে গুছায় তার চেয়ে বেশি সে আঁচলের তলায় গুছাইয়া লয়—কোন দিক যে সে দেখিবে তাহাই ভাবিয়া পায় না। মুখে তাহার হাসি লাগিয়া থাকিবারই তো কথা ! কিন্তু তাহারো তো ঐ-ই বয়স—এমন করিয়া কোনো দিনই কি সে হাসিয়াছে ? শরীরে এমন একটি প্রফুল্ল লঘুতা কি তার কোনো কালে ছিল—কোনো কালেই বা কি আসিবে ?

উপবাসী সুহাসিনীর কথা মনে করিয়া মনটা তাহার মুসড়াইয়া পড়িল বটে, কিন্তু মুখের কাছে উত্তপ্ত ও সুস্বাদু খাদ্য পাইয়া এক কণাও সে ফেলিয়া রাখিল না। চা আসিল—আ, এমন আরাম করিয়া কোনো দিন সে চা খায় নাই। শরীরে যেন নতুন উৎসাহ আসিয়াছে। রাত্রে আর খাইবে না—পেট ব্যথা করিতেছে বা মাথা ধরিয়াছে বলিলেই চলিবে। সে না খাইলে সুহাসিনী হয় তো রাত্রে আর রান্নাই চাপাইবে না—এক পয়সার মুড়ি ও একটা পেঁয়াজ হইলেই তাহার যথেষ্ট। হীরালালের মন আবার ভারি হইয়া উঠিল।

কিন্তু উপায় কি, খাইয়া যখন একবার ফেলিয়াছেই, তখন দাম দিতেই হইবে। বিল্‌এ তত বেশি হয় নাই—মাত্র এক টাকা সাড়ে চার আনা ! হীরালাল ভাবিয়াছিল অনেক বেশি হইবে। মাত্র এক টাকা সাড়ে চার আনাই বটে ! তাহা দিয়া রোবিনসনের বার্লি এক কৌটা তো হইতই, তা না হইলে জুতা এক জোড়া অনায়াসে সে কিনিতে পারিত। খাইবার পর ঢেঁকুর তুলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই অনুতাপ করিবার কোনো অর্থ হয় না। হীরালাল পকেটে হাত দিল। আলাদা করিয়া রাখা খুচরো টাকাটা চালাইবার কথা যে একেবার মনে হইল না তাহা নয়, কিন্তু দশ টাকার নোট একটা ভাঙাইয়া নিলেই কেমন যেন হোটেলে খাইতে

আসার আভিজাত্যটা সম্পূর্ণ বজায় থাকে। পকেটে নোট যখন আছেই, তখন সামান্ত এই চাল্ দেখাইতে ক্ষতি কি। নোট দিলেও মাত্র এক টাকা সাড়ে চার আনা-ই তো উহারা কাটিয়া নিবে—তাহার বেশি তো আর নয়! হীরালাল নোট বাহির করিল। চেঞ্জটা এখন ঠিক মত আসিলে হয়। বা, চৌরঙ্গির উপর বসিয়া এমন ডাকাতি কেউ করতে পারে নাকি? চেঞ্জ ঠিক মতই আসিয়াছে—একখানি পাঁচ টাকার নোট, তিনটি টাকা, একটি আধুলি, একটি দুয়ানি, একটি আনি আর দুইটি পয়সা। প্রথম পাঁচ টাকার নোটটা সে হাতে মুড়িয়া পরে টেবিলের উপর টাকা তিনটা সজোরে বাজাইয়া লইল—হ্যাঁ, ম্যানেজারের নাকের নিচেই টাকাগুলি বাজাইয়া লওয়া ভালো—বাহিরে গিয়া বেসুর বাহির হইলে আর কি ফিরাইয়া দিবে? না, টাকাগুলির ধার ও ওজন, শব্দ ও চেহারা সবই ঠিক আছে। বয়টা টিপ্‌স্ নিবার জন্ত এখনো প্লেটটা ধরিয়া আছে—হীরালাল তো পার্শিদের মত বোকা বা বড়লোক নয় যে খুচরো সাড়ে এগারো আনা পয়সাই সে বয়টার জন্ত রাখিয়া যাইবে। আঙুল বাড়াইয়া আধুলিটা সে অনায়াসে তুলিয়া লইল। চারপাশে একবার চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কি না—পার্শি মেয়েটি যে এখন আর কাছে বসিয়া নাই তাহাতে তাহার অত্যন্ত আরাম বোধ হইল—দুয়ানিটির দিকেও সে আস্তে-আস্তে আঙুল বাড়াইতেছে। বয়-এর হাতে প্লেটটা একটু কাঁপিয়া উঠিল বুঝি—সত্যি সে তাহাকে কী ভাবিবে? ভাবিলে তো ভারি বহিয়া গেল—আর সে কোনোদিন এখানে আসিতেছে নাকি? হীরালাল আবার আঙুল বাড়াইল—কিন্তু সেই দোদুল্যমান মুহূর্তে ক্ষীণতম দ্বিধার সময়ে বয় কখন প্লেটটা আলগোছে সরাইয়া নিয়াছে। যাক, চোদ্দ পয়সায় স্বচ্ছন্দে একদিন বাজার হইতে পারিত বটে, কিন্তু তাহার জন্ত শোক করিয়া লাভ কী!

চেয়ার হইতে হীরালাল উঠিল। ম্যানেজার বিনীত হাস্তমুখে নমস্কার করিল ও তাহাকে নতুন বৎসরের একটা ক্যালেণ্ডার উপহার দিল। চমৎকার ক্যালেণ্ডার। কি-একটা উত্তেজনার মোহে একটি শ্বেতাঙ্গী যুবতী চিবুকটি তুলিয়া দীর্ঘপক্ষ্মসমাবৃত দুই চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত করিয়া রহিয়াছে, বুকের আধখানি খোলা, তাহার পরেই ছবিটা ফুরাইয়া গিয়াছে। মুখখানি হীরালালের ভারি ভালো লাগিল—একটু এগোয় আবার খুলিয়া ছবিতে একটুখানি চোখ বুলায়। মুখখানিতে আত্ম-সমর্পণের কেমন সুন্দর একটা ভাব আছে—যেন গভীর করিয়া কি-একটা রোমাঞ্চ সে অনুভব করিতেছে। মেয়েটি বেশ—শুইবার ঘরে হীরালাল তাহাকে টাঙাইয়া রাখিবে। ছবি দেখিলেই খুশি হইয়া টুনু হাত বাড়ায়—আর পৃথিবীতে যাবতীয়

মেয়ের ছবিই যে তাহার মা, টুনুর তাহাতে এতটুকু সন্দেহ নাই। আজ রাত্রে জরটা যদি তার কম থাকে, তবে ছবিটা নিয়া খানিকক্ষণ সে খেলা করিতে পারিবে! তাহার মা'র সঙ্গে ছবির মেয়েটির তুলনা করিলে হীরালাল একটুও কিন্তু কুণ্ঠিত হইবে না। তবু যদি সেই কথা শুনিয়া সুহাসিনী একটু হাসে!

ক্যালেণ্ডারটা দেখিতে-দেখিতে হীরালাল ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড় ঘুরিয়া পূর্বে রওনা হইল। আর সে হাঁটিতেছে কেন—এবার শ্যামবাজারের বাস নিলেই তো পারে। কিন্তু সেই অচল টাকাটা এখনো চালানো হয় নাই। এক প্যাকেট সিগারেট কিনিলে মন্দ হয় না, দেখা যাক চলে কি না, বিড়ি ফুঁকিয়া-ফুঁকিয়া গলাটা জুতোর চামড়ার মত শক্ত হইয়া গিয়াছে। আরো কিছু খরচ হইবে – তা হোক; সুহাসিনীকে বলিলেই চলিবে যে মুনাফা বাবদ মোট কুড়িটি টাকা সে পাইয়াছে। কুড়ি টাকাই বা কম কিসে—সখ করিয়া কে কাহাকে যাচিয়া দেয়! পাঁচ টাকা কমাইয়া বলিবে বলিয়া হীরালালের মন সহসা হালকা হইয়া উঠিল—তাহা হইলে প্যাকেটের বদলে গোটা একটা টিনই কিনিয়া নিলে পারে! বাড়িতে বসিয়া না খাইলে সুহাসিনী তা টেরও পাইবে না। কত দূর আগাইয়া ও-পারে সে একটা টোব্যাকোনিস্ট্-এর দোকান দেখিতে পাইল। টিনটার দাম নিল মোটে সাড়ে চোদ্দ আনা—টাকাটা দস্তুরমত চলিয়াছে। হীরালাল টিন লইয়া তাড়াতাড়ি দোকান হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিল, তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল, পাছে দোকানি আর তাহাকে ডাকিতে না পারে! ঠিক অচল টাকাটাই দিয়াছে তো! হ্যাঁ, এই ডান পকেটেই তো আলাদা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। যাক্, সিগারেটের কৌটা কেনার জন্য আর তাহার আপশোষের কারণ নাই—ঐ টাকাটা তো অমনিই যাইতে বসিয়াছিল! কিন্তু এত টাকা বাজাইয়াও দোকানি কি না এই জুয়াচুরিটা ধরিতে পারিল না। সেও হয়তো এমনি কখন আবার চালাইয়া দিবে—তাহার বিপদে সহানুভূতি দেখাইবার দরকার নাই।

এক পয়সায় একটা দিয়াশলাই কিনিতে হইল। সিগারেটের ধোঁয়ায় গলাটা যেন জুড়াইয়াছে। কত খরচ হইয়াছে মনে-মনে হিসাব করিয়া কুড়িটা টাকা আস্ত রাখিয়া বাকি দুই টাকা নয় আনা এক পয়সা সে নিচের পকেটে আলাদা করিয়া রাখিল। ঐ টাকায় জুতা ও শাড়ি হইবে না বটে, না হোক, ঐ টাকা সে সুহাসিনীর কাছ থেকে লুকাইয়া রাখিবে – টুনু ভাল হইলে একদিন তাহাকে লইয়া সিনেমাও সে দেখিয়া আসিতে পারে। এজেন্টবন্ধু বলিয়া দিয়াছিল যে অমনি আরো মক্কেল বাগাইয়া দিলে মুনাফা দিতে সে পিছপা হইবে না—এইবার হইতে তাহাই সে একটু-একটু চেষ্টা করুক না হয়। সকালে সন্ধ্যায় তো বিস্তর সময়

পড়িয়া আছে—হ্যাঁ, খবরের কাগজও তাহার পড়িতে হয় না। আরেকটা মক্কেল জোগাড় করিতে পারিলে সেই টাকায় সে সুহাসিনীকে একদিন হোটেলেই লইয়া আসিবে – তাহার বাপের জন্মে এত খাবার সে কখনো দেখে নাই। ততদিনে টুনু নিশ্চয় সারিয়া উঠিবে, সেও একটা রোল বা কেক খাইয়া যাইবে না-হয়। সুহাসিনীর জন্য এখন তাহার ভারি মায়া করিতে লাগিল।

শ্যামবাজারের বাস আর আসিতেছে না—ততক্ষণ আরো একটু হাঁটা যাক। দুই টাকা ছয় আনা তিন পয়সা তাহার খরচ হইয়া গেল—অনেক কিছুই তাহা দিয়া হইতে পারিত বটে, কিন্তু মাত্র কুড়ি টাকা পাইয়াছে ভাবিলেই তো সমস্ত অনুশোচনা ক্ষান্ত হইয়া যায়। কুড়ি হোক, পঁচিশ হোক, সুহাসিনী সমানই খুশি হইবে। কিছু পায় নাই বলিয়া শূন্য হাতে বাড়ি ফিরিয়া গেলেও বা সুহাসিনীর কী বলিবার আছে। টাকাটা আজই পাই তো কোন কথা ছিল না।

যাই হোক, আর খরচ না করিলেই হইবে। না-হয় নিজের পকেটের উদ্বৃত্ত তহবিলটাও সে সুহাসিনীর হাতে উঠাইয়া দিবে—ভাঙা পয়সার হিসাব না চাহিয়া যাহা অযাচিতে পাইয়াছে তাহা নিয়াই তো তাহার খুশি হওয়া উচিত। এমন সময় একটা ফিরিওয়ালা রুমাল হাঁকিতে-হাঁকিতে হীরালালের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়-বড় রুমাল—মাত্র দুই আনা করিয়া দাম। একখানা রুমালও হীরালালের নাই। কাপড়ের কোঁচায়ই সে রুমালের কাজ সারে—রেস্টোর‍্যান্ট থেকে উঠিবার আগে ভিজা হাত ও মুখ সে কোঁচায়ই মুছিয়াছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে। কী লজ্জা—ম্যানেজার তাহাকে কী না-জানি ভাবিয়াছিল! ভাগ্যিস সেই পার্শি মেয়েটি ততক্ষণ পর্যন্ত কাছে বসিয়া ছিল না। না, দুইখানা রুমালই সে কিনিবে। মাত্র চার আনা তো পয়সা! উদ্বৃত্ত টাকাটা সুহাসিনীকে দিবার আর দরকার নাই –তাহার সহজেই সন্দেহ হইবে টাকার অঙ্কের ঘরে গোপনে কিছু রাহাজানি হইয়া গেছে। সেই হিসাব মিলাইতে অনেক সব মিথ্যার অবতারণা করিতে হইবে- অনেক ব্যাখ্যা, অনেক বিলাপ—দরকার নাই ও-সব হাঙ্গামে! ঐ টাকাটা তাহারই রহিয়া গেল। পকেট হাতড়াইয়া রুমালের খবরও সুহাসিনী জানিতে আসিবে না।

রুমাল দুইখানা কিনিয়া হীরালাল আরো পুবে আগাইয়া চলিল। বেলা ডুবিয়া পথ-ঘাট অন্ধকার হইয়াছে অনেকক্ষণ—আলোর টুকরা এখানে-ওখানে ছিটাইয়া পড়িতেছে। অনেক গাড়ি, অনেক মোটর, অনেক লোক, অনেক দোকান—এ-সবে হীরালালের আর রুচি নাই, বাস একটা আসিলেই এখন হয়! বাড়ি গিয়া ঘুমাইতে না পারিলে এই অপব্যয়ের নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে সে রেহাই

পাইবে না। জোরে সে হাঁটিতে লাগিল—পাকস্থলীর খাদ্যগুলিই বরং হজম হইতে থাকুক।

সোঁ করিয়া খোলা একটা ট্যাক্সি রাস্তার কার্ব ঘেঁসিয়া নক্ষত্রবেগে বাহির হইয়া গেল। প্রবল গতির উজ্জ্বলতায় হীরালালের দুই চক্ষু ঝলসাইয়া গেল। ট্যাক্সিতে বসিয়া একটা গোরা সৈন্য একটি স্বল্পবাসা শ্বেতাঙ্গীকে লইয়া চলিয়াছে—ভালো করিয়া কিছু সে বিশেষ দেখিতেও পাইল না। তবু শরীরের সমস্ত রক্ত কেমন যেন চঞ্চল, কৌতূহলী হইয়া উঠিল। বাস একটা আসিলেই হয় ছাই! হীরালাল গ্যাসের তলায় দাঁড়াইয়া অগত্যা ক্যালেণ্ডারের ছবিটা আবার দেখিতে লাগিল।

স্মিথ্ স্ট্যানিস্ট্রিট-এর দোকানের ওপারে রাস্তায় আলোর তেজ একটু কম মনে হইল—ধারে-কাছে বেশি দোকান-পাতি নাই। হীরালাল ততদূর আগাইয়াছে, কিন্তু বাস-ভাড়া তাহার একটি পয়সাও তাহাতে কমিবে না। আর আগাইয়া লাভ কী, পুরা ভাড়াই যখন দিবে তখন এখানেই এই গাছের নিচে দাঁড়ানো যাক। কিন্তু ঐ ফিটনটা তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই যে এদিকে আসিতেছে। হীরালাল মনে-মনে হাসিল—তাহার এখন ফিটন চড়িবারই সময় বটে। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছিয়া টুনু আজ একটু ভাল আছে—খবরটা পাইলে সে বাঁচে। টাকা পকেটে মজুত আছে বলিয়া তাহার গায়ে কেমন জোর লাগিতেছে—অসুখটা খারাপের দিকে গেলেও যেন আর তত ভয় নাই, অনায়াসে সে ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে পারিবে।

খট্-খট্ করিতে-করিতে ফিটনটা তাহারই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াক, কে উহাকে লক্ষ্য করিতেছে। হু-হু শব্দে ঐ একটা বাস আসিতেছে এতক্ষণে—হীরালাল হাত তুলিল। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া ফিটনটা রাস্তা জুড়িয়া তাহাকে এমন আড়াল করিয়া রহিয়াছে যে ড্রাইভারটা হীরালালের সঙ্কেত দেখিয়াও দেখিল না, সোজা বাহির হইয়া গেল। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হীরালাল ঘুরিয়া দাঁড়াইতে হুড-তোলা ফিটনের মধ্যে চোখ পড়িল। হাতে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরিয়া মাথা ঘুরিয়া এখুনি সে বসিয়া পড়িবে বোধ হয়—গন্ধের ও বর্ণের ঝাঁজে এত সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। ফিটনের পিছনের সিটে একটি শ্বেতাঙ্গী মেয়ে—মাথায় টুপি নাই, লাল ভেলভেটের ফ্রকে সুন্দর বুক ঢাকিয়া, পায়ের উপর পা তুলিয়া বসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মুচকি-মুচকি হাসিতেছে। তাহার দিকে চাহিয়াই তো—হীরালাল একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল। সে ছাড়া গাড়ির এত সামনে আর কেহ আছে নাকি? গাড়ির মধ্যে আবার ফিরিয়া চাহিতেই মেয়েটি হাতের ছোট্ট রুমালটি তুলিয়া তাহাকে হ্যাঁ, হীরালালকেই, মৃদু-মৃদু ডাকিতে লাগিল। রক্তে

যেন ঝড় লাগিয়াছে—ব্যাপারটা হীরালাল আয়ত্ত করিতে পারিল না। অমন প্রখরশুভ্র চামড়া, অমন উত্তপ্ত কোমল বুক ও পোশাক - হীরালালের চেতনা হঠাৎ আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ক্যালেণ্ডারের মেয়েটি যেন ইহারই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি, তবে তফাৎ এই, এই মেয়েটির অবয়ববিন্যাস ক্যালেণ্ডার-বাসিনীর মত অসম্পূর্ণ নয়। হীরালাল কী করিবে ভাবিয়া পাইল না; অন্ধের মত আরো কয়েক পা আগাইয়া গেল—করুণ মিনতির মত ফিটনটাও গা ঘেঁসিয়া সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে। মেয়েটি এইবার মুখ বাড়াইয়া স্পষ্ট তাহাকে ডাকিল, অভয় দিল যে মোটেই তাহার বেশি খরচ হইবে না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সময়ের সে পুরা দাম পাইবে। হীরালাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, কেহ তাহাকে দেখিতেছে কি না সেই বিষয়ে দৃষ্টি দিবারও তাহার সময় ছিল না, ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কত?

মেয়েটি কথা না কহিয়া ডান হাতের পাঁচটি আঙুল প্রসারিত করিয়া ধরিল। আস্তে কহিল,—গাড়ি-ভাড়ার জন্যও একস্ট্রা কিছু লাগিবে না।

মোটে পাঁচ টাকা! হীরালাল ভাবিয়াছিল বিজাতীয় দাম একটা কিছু হাঁকিয়া বসিলেই সোজা সে পিঠ দেখাইয়া সরিয়া পড়িতে পারিবে। কিন্তু পাঁচ টাকা মাত্র! তাহার বিনিময়ে ঐ নরম মাংসস্তূপ,—ভাবিতে গায়ের প্রতি রোমকূপে তাহার পিন্ ফুটিতে লাগিল। কী অদম্য আকর্ষণে সে ফিটনের কাছে আগাইয়া আসিল, একবার মনে হইল টুনু সুহাসিনীর কোলে শুইয়া জ্বরের তাড়সে ককাইতেছে—একবার মনে হইল কাপড়-জামাগুলি কী ভীষণ নোংরা, কাছে বসিতে গেলেই মেয়েটি নাক সিঁটকাইবে—কিন্তু কিছু একটা ঠিক করিবার আগেই মেয়েটি হাত বাড়াইয়া তাহার বাঁ হাতটা খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। হীরালালের শরীরে বাধা দিবার মত সামান্য শক্তিটিও কোথাও রহিল না। সোজা উঠিয়া সামনের সিটটায় মুখোমুখি বসিতে যাইতেছিল, মেয়েটি তাহাকে জোর করিয়া তাহার পাশে বসাইয়া দিল। নামিয়া পড়িবার আর সময় নাই, ইচ্ছাও নাই—গাড়িটা চলিতে সুরু করিয়াছে। একসঙ্গে অনেক কথা হীরালালের মনে পড়িয়া গেল—কিন্তু তাহা নিয়া মনে-মনে তোলপাড় করিয়া মুখ ভার করিবার সময় পরে বিস্তর পাওয়া যাইবে—এখন মেয়েটি যখন গায়ে গা ঘেঁষিয়া বসিয়াছে তখন সেই স্পর্শের স্বাদ না লইয়া আর উপায় কী—কুড়ি না বলিয়া মাত্র পনেরো টাকা পাইয়াছে সুহাসিনীকে এই কথা বলিলেই তো চুকিয়া গেল! পাঁচ টাকা কম হইয়াছে বলিয়া তাহার সুখের ব্যারোমিটার পাঁচ ডিগ্রি নামিয়া যাইবে না—আর পাঁচ টাকা যে সত্যই কম হইল তাহাই বা সে কী করিয়া জানিতে আসিবে?

মনকে এইটুকু প্রবোধ দিয়া হীরালাল মেয়েটির দিকে তাকাইল। হুডটা তোলা থাকায় রাস্তার আলো ভাল করিয়া তাহার মুখে পড়িতেছে না, কিন্তু সে যে যুবতী তাহা তাহার স্বরে ও স্পর্শে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। এত ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়াছে যে তাহার পাশের খালি জায়গাটায় আরো দুইজন লোক অনায়াসে বসিতে পারে। মেয়েটি হীরালালের পকেটে কী-একটা শক্ত জিনিসের খোঁচা খাইয়া হাত দিয়া সেটা অনুভব করিয়া কহিল,—কী এটা?

হীরালাল কহিল,—সিগারেট।

—সিগারেট! আমাকে দাও না একটা।

ভাগ্যিস এক টিন সিগারেট তখন সে কিনিয়াছিল। সগর্বে টিনটা বাহির করিয়া মেয়েটির হাতে দিয়া হীরালাল কহিল,—তোমার নাম কী?

লাইট চাহিয়া নিয়া সিগারেট ধরাইতে-ধরাইতে মেয়েটি কহিল,—মেইজি।

দেশলাইয়ের আলোয় মেয়েটির মুখ স্পষ্ট রঙিন হইয়া উঠিল; চমৎকার মুখ, নিটোল নিভাঁজ ভরাট মুখ,—তাহার নিশ্বাসের সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া আসিয়া হীরালালের গালে লাগিতেছে। হীরালাল যেন নিশি-পাওয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত স্বপ্ন দেখিতেছে।

মেইজি কোচোয়ানকে কী যেন একটা হুকুম করিল—হীরালাল ঠিক বুঝিল না —আর অমনি ফিটনের চারদিকে মোটা-মোটা চামড়ার পর্দা পড়িয়া গেল। হীরালাল থতমত হইয়া গেল—বৃষ্টি নামিল নাকি? কিন্তু ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দই তাহার কানে গেল না। এখানে রাস্তা তো অত্যন্ত পাতলা হইয়া আসিয়াছে, বাঁক ঘুরিয়া গাড়ি এই একটা গলির মধ্যে ঢুকিল বুঝি—বৃষ্টি কোথায়? এত শীতেও গাড়ির ভিতরটা কেমন গুমোট করিয়া আসিল—মেইজির মুখ আর দেখা যাইতেছে না।

মুখ দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু স্পর্শের বৃষ্টিতে মেইজি হঠাৎ অজস্র, অফুরন্ত হইয়া উঠিল। হীরালালের কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। মনে হইল গাড়িটা যেন তাহাকে কোথায় নিয়া চলিয়াছে, কোন আশ্চর্য মৃত্যুর মধ্যে, সেখান হইতে আর সে বাড়ি ফিরিতে পাইবে না,—মেইজি আবেগের প্রাবল্যে কণ্ঠলগ্ন হইয়া কখন তাহার ভারি বুক-পকেটটা আলগোছে হাল্‌কা করিয়া ফেলিবে! একটা চীৎকার করিবারো জো নাই, কোচোয়ান ও তাহার পাশের ছোকরাটার কোমরে ছুরি-ছোরা যে লুকানো নাই তাহা কে বলিতে পারে!

পর্দা-ঢাকা বন্ধ গাড়ির মধ্যে বসিয়া হীরালাল এত শীতেও ঘামিতে লাগিল। এ বিশ্রী আবহাওয়া—এইখানে হীরালাল মুক্তি পাইতেছে না, পাশে যে তাহার

লাল ভেল্‌ভেটের ফ্রকপরা মেইজি বসিয়া, অন্ধকারে তাহার পরিচয় অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে- গাড়িটা খুট্-খুট্ করিয়া এত আস্তে চলিয়াছে যে প্রাণধারণের আনন্দও কেমন স্তিমিত হইয়া আসিল। তাহা ছাড়া চারিদিকে এই পর্দা ফেলিয়া গাড়িটা ঢাকিয়া দিবার লজ্জা হীরালালকে বিঁধিতে লাগিল। কেহ পর্দা তুলিয়া অনধিকার দৃষ্টিপাত করিতে আসিবে না হয়তো, কিন্তু লোককেই বা এত ভয় কেন? গোরা সৈন্যের সেই মোটরের চাকায় গতির উদ্দাম ঝড়ের ছবি হীরালালের চোখে পড়িল—কী অবারণ মুক্তি!

হীরালাল মেইজির চুলের গুচ্ছে আঙুলগুলি ডুবাইয়া দিয়া মাত্র ঘ্রাণে বুঝিল যে এ সুহাসিনী নয়। ভাবিতে ভারি আরাম লাগিল। গভীরতম আনন্দে অনুপ্রেরিত হইয়া জীবনে সে একমাত্র সুহাসিনীকেই স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু আনন্দের তীব্রতার সীমা যে কোথায়, হীরালাল এত দিন তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। এই নির্লজ্জতায় সুহাসিনী ভাঙিয়া পড়িত, তাহার স্নায়ুমণ্ডলী সঙ্কুচিত হইয়া আসিত—হীরালাল নিজেকে কখনো এতটা বিকীর্ণ করিতে পারিত না! কিন্তু এ তো সেই ম্লানপাণ্ডুর সুহাসিনী নয়—হীরালাল ডাকিল,—মেইজি!

মেইজি কহিল,—ডিয়ার!

—এই গাড়িটা ছেড়ে চলো একটা ট্যাক্সি নি?

—ইট্‌ল্ বি গ্রেট। এই, রোকো! মেইজি পর্দা তুলিয়া মুখ বাড়াইয়া কোচোয়ানকে নিরস্ত করিল।

গাড়িটা গলির মধ্যে জায়গা বুঝিয়া থামিয়া পড়িল। কোচবক্সের ছোকরাটা ট্যাক্সি লইয়া হাজির। না, না, হুড তুলিতে হইবে না, শীত লাগে লাগুক, কিন্তু অনেক জায়গা চাই, অনেক হাওয়া অনেক আলো, অনেক সাহস, পথিকের অনেক কৌতূহল! গাড়ি যখন ছাড়িতেই হইল, তখন একটা ভাড়া গাড়োয়ানকে দিতেই হইবে। এক টাকাতে সে সন্তুষ্ট নয়। হীরালাল স্থান-কাল ভুলিয়া যথারীতি তাহার সঙ্গে দরাদরি সুরু করিয়া দিল। এইটুকু মাত্র তো পথ—এমনি অস্ত্রীক প্যাসেঞ্জার হইলে আট-দশ আনায়ই সে খুশি হইয়া যাইত—সেই জায়গায় আস্ত একটা টাকা!

মেইজি বিরক্ত হইয়া কহিল,—দিয়ে দাও আরো কিছু!

—আচ্ছা, এই নে আরো আট আনা। গাড়ির ল্যাম্পের দিকে চাহিয়া হীরালাল কহিল,—নম্বরটা আমি টুকে রাখছি—এই সব জোচ্চুরি আমি বার করবো।

ভাগ্যিস পকেটে আধুলিটা ছিল, নইলে একটা আস্ত টাকাই আরো দিতে হইত হয় তো। ভাঙাইবার সময়টুকু পর্যন্ত মেইজি নিশ্চয় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত না। পকেটে এখন কত রহিল না জানি? মেইজিকেও তো অন্তত পাঁচ টাকা দিতে হইবে। নোটটা বুদ্ধি করিয়া তখন ভাঙাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া রক্ষা, নইলে চেঞ্জ মেইজি পাইত কোথায়—ছল-ছুতা করিয়া গোটা নোটটাই সে কাড়িয়া রাখিত। সুহাসিনীকে দিবার জন্য তবে থাকিত কী!

এই গলিটা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া ওয়েলেসলির রাস্তায় চলন্ত ট্র্যাম ধরিয়া সে খসিয়া পড়িবে নাকি? পাঁচ টাকা সে আরো বাঁচাইতে পারে—মুদির হিসাবটা এককথায় পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু একসঙ্গে এতগুলি টাকা সুহাসিনীর হাতে তুলিয়া দিয়া কী লাভ! এত টাকার বিনিময়ে তাহার কাছ হইতে সে কী পাইবে? টুনুর অসুখ হইবার পর হইতে বহুদিন সে হীরালালের শয্যা ত্যাগ করিয়াছে,—অন্তত গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমুও একটা সে খাইবে না। ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়াছে—এখুনি সমস্ত শূন্য আলোড়িত করিয়া গতির ঝড় বহিতে সুরু করিবে—এই উদ্দামতা ছাড়িয়া কী করিয়া যে সেই শোকাচ্ছায়াময় অপরিচ্ছন্ন বিমর্ষ ঘরে গিয়া একা-একা বিছানায় শুইয়া পড়িবে তাহা মনে আনিতেও তাহার নিদারুণ শারীরিক কষ্ট হইতে লাগিল।

বা. ফিটনটা যে টাকা লইয়া দিব্যি চলিতে সুরু করিয়াছে। তাহার ক্যালেণ্ডার! তাড়াতাড়ি দুই পা ছুটিয়া ফিটনটাকে সে ধরিয়া ফেলিল। গাড়ির নিচে ময়লা পাপোষের উপর ক্যালেণ্ডারটা পড়িয়া আছে। অবশ্য মূর্তির চেয়ে ছায়াকে সে বেশি প্রাধান্য দেয় না বটে, কিন্তু ক্যালেণ্ডারটা পাইলে কাল দিনের আলোয় টুনু কত খুশি হইবে—ছবি দেখিলেই সে খুশি হয়, সমস্ত মেয়ের ছবিকেই সে তাহার মা বলিয়া ভাবে।

না, ট্যাক্সিটা তেমনি দাঁড়াইয়া আছে বৈ কি। তাহারই জন্য দাঁড়াইয়া আছে। মেইজির পাশে আসিয়া বসিতে মেইজি কহিল,—আমাকে কিছু ড্রিঙ্ক দেবে না, ডিয়ার? ড্রিঙ্ক না পেলে এই শীত আমি সইবো কী করে?

শীতের হাওয়ায় গা কেমন নিস্তেজ, নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে। একটু ড্রিঙ্ক হইলে মন্দ কি! যাহারা আরম্ভ করে জীবনের এমনি কোনো এক জায়গায় আসিয়াই তো আরম্ভ করে! আরম্ভেরও তো একটা মজা আছে। এখনো তবু শীত বা পথের কৌতূহলী নির্লজ্জ দৃষ্টির কথা মনে হইতেছে—পকেটটা আস্তে-আস্তে হালকা হইতেছে বলিয়া টুনুর কথা ভাবিয়া এখনো তবু মনে সামান্য দ্বিধা আসে—কিন্তু মদ একটু পেটে পড়িলেই এত বড় পৃথিবীতে একমাত্র মেইজি ছাড়া আর

কিছুই হয় তো সত্য থাকিবে না—সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত শৃঙ্খলা, সমস্ত কর্তব্য নিমেষে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সে কী প্রগাঢ় উন্মাদনা! কী পরিণামচিন্তাহীন প্রখর মুক্তি! অন্তত সেই মুহূর্তটি হীরালাল বাঁচিতে পারিবে বলিয়া তাহার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। নানা রঙের কতগুলি রোমাঞ্চের সমষ্টি লইয়াই তো বাঁচিয়া থাকা।

তবু, বহুদিনের অভ্যাসবশতই সে কহিল,—কিন্তু বেশি পয়সা যে নেই, মেইজি।

মেইজি সহানুভূতি করিয়া বলিল,—মাত্র দু'টি বিয়ার কতো আর লাগবে? দু' টাকা।

দু'টাকা! না হয় এবার নাগরা জুতা সে নাই কিনিল। স্ট্র্যাপটা সিলাইয়া নিলেই তো চলবে!

ট্যাক্সিটা সামনের একটা সস্তা 'বার'-এ আসিয়া দাঁড়াইল। ঝল্‌মলে-পোশাক-পরা বাদামী-চুল-ওড়ানো তুষারশুভ্র ফেনপুঞ্জ-কোমল এই মেয়েটি তো একান্ত করিয়া তাহারই সঙ্গিনী—তাহারই বাহুতে বাহু দিয়া হোটেলে নির্ভয়ে আসিয়া ঢুকিতেছে। হীরালালকে কেহ অবশ্য চিনে না – তবু তাহার সৌভাগ্যে অন্য কেহ সামান্য ঈর্ষান্বিত হইতেছে—এমনি একটা অবাস্তব বিশ্বাসে তাহার ভারি গর্ববোধ হইল। খোলা হলটায় এক দিকের টেবিলে আরেকটি কে রঙ চুপসানো ফ্যাকাসে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ মেয়ে ঢিলেঢালা পোশাক পরা এক প্রৌঢ় সাহেবের সঙ্গে বসিয়া মদ খাইতেছিল। হীরালাল মেইজিকে লইয়া পর্দা-ফেলা একটা কুঠরিতে ঢুকিতে যাইবে, হঠাৎ সেই মেয়েটি মেইজিকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া উঠিল।

—হ্যালো! য়্যালিস!

তাহার পরে ছিপি-খোলা বিয়ারের বোতলের মত উচ্ছ্বসিত হাসি, করমর্দন, কলকণ্ঠের বর্ষণ সুরু হইয়া গেল। অগত্যা দারিদ্র্য গোপন করিতে কুঠরিতে পালানো গেল না। প্রৌঢ় সাহেবটি অত্যন্ত রসিক, হীরালালের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি-সুরু করিল, কিন্তু সে-সবের মর্যাদা সে রাখিতে জানে না—হীরালাল কেবলই ভাবিতে লাগিল ইহারা যেমন করিয়া টেবিল সাজাইয়া বসিয়াছে ইহাদের সামনে সামান্য দুইটা বিয়ার সে কী করিয়া অর্ডার দেয়।

কিন্তু মেইজি খুব ভালো মেয়ে। সে বয়কে দুইটা বিয়ারই আনিতে বলিল। গ্লাশে প্রথম চুমুক দিতেই হীরালালের সমস্ত শরীর ঘিন্‌ঘিন্ করিয়া উঠিল – এই বিয়ার! ইহার চেয়ে এক গ্লাশ কুইনিন গিলিয়া খাইলেও তো ভালো ছিল! মেইজি কিন্তু—বন্ধুর খরচ বাঁচাইবার জন্যই হয় তো – গভীর পরিতৃপ্তিতে চোখ বুঁজিয়া এক দীর্ঘ চুমুকে সমস্তটা শেষ করিয়া ফেলিল।

প্রৌঢ় সাহেব বলিল,—কী ও-সব তেতো গিলছ? কিছু মদ নাও।

বয় হুইস্কি আনিয়া দিল—এক পেগই প্রথম নেওয়া যাক। মেইজি বলিল,—সোডা নয়, বিয়ারের সঙ্গেই মিশিয়ে নাও। না, আমার চাই না।

সাড়ে তিন টাকার বিল হইল। তা হোক। বয়কে টিপস্ কিছু দিতে হইবে। চার আনাই যথেষ্ট। এইবার আর হীরালাল আঙুল বাড়াইবে না।

কিন্তু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে পা যে আর চলিতেছে না। মনে হইতেছে সমস্ত কিছু লৌকিকতার সীমা সে ছাড়িয়া আসিয়াছে—ব্যবহারে সৌজন্যের স্বাভাবিক অনুপাত আর নাই। যেন, যেমন দরকার, তাহার বেশি সে হাত পা নাড়িতেছে, অনাবশ্যক জোরে কথা কহিতেছে, হাসিবার দরকার না হইলেও না হাসিয়া সে থাকিতে পারিতেছে না। উঠিবার সময় টেবিলটা আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়া গ্লাশ একটা সে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল—কিন্তু তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত ভাব নাই, বাকি সিকিটা ম্যানেজারের টেবিল লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল,—এই নাও তোমার পয়সা।

ম্যানেজার হাসিয়া উঠিল।

মেইজি তাহার হাত চাপিয়া ধরিল ও এক রকম টানিতে-টানিতে রাস্তায় আনিয়া ট্যাক্সির মধ্যে সজোরে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। ট্যাক্সি আর দাঁড়াইল না।

কোথায় শীত—সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছে। হীরালাল ক্ষিপ্র হাতে পাঞ্জাবির বোতাম খুলিতে গিয়া জামার বুকের দিকের খানিকটা ছিঁড়িয়াই ফেলিল—গায়ে হাওয়া লাগুক। মুখের চামড়া যেন সিশের মত ভারি হইয়া উঠিয়াছে। হাত দিয়া শত ঘসিয়াও সেই ভারটা সে দূর করিতে পারিল না। হাতে এমন সামান্য জোর নাই যে মেইজিকে কাছে টানিয়া আনে, সে যে একান্ত করিয়া তাহার, সর্বাঙ্গ দিয়া সেই অধিকারের তন্ময়তা সে অনুভব করে।

কিন্তু মেইজি খুব ভালো মেয়ে,—নিজেই সে সাধিয়া আগাইয়া আসিয়াছে। ট্যাক্সিটা যে কোথায় নিয়া আসিল হীরালাল কিছুই ধারণা করিতে পারে না—সমস্ত রাস্তা কেমন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে—আলোর পোস্টগুলি ছাড়া কেহই এখানে প্রতীক্ষা করিতেছে না। কী দীর্ঘ নির্জন পথ, কী উদ্দাম নির্বন্ধন পলায়ন! মেইজি আর স্নায়ুময় দেহ নয়, কল্লোল-কুটিল উত্তরঙ্গ সমুদ্র! কিন্তু হীরালাল কি-রকম তন্দ্রাচ্ছন্নের মত অভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিল।

মেইজি কঠিন হইয়া কহিল,—আমার টাকা আগে দিয়ে দাও।

আবার টাকা! হীরালালের তন্দ্রা যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল, কহিল,—কত?

—অন্তত দশ।

—কিন্তু এ-কথা তো ছিল না। পাঁচ বলেছিলে—

—ডোণ্ট বি এ সিলি ফুল! ট্যাক্সি করে বেড়ানোরই বা কথা ছিল নাকি? তোমাকে আমার কতোটা সময় দিলাম কিছু খেয়াল আছে? দাও আগে।

হীরালালের শরীর সহসা তীব্র বেদনায় মুচড়াইয়া উঠিল—পেটটা জ্বালা করিতেছে। সঙ্গে কিছু খাবার না লইয়া এতগুলি মদ সে খাইল কী বলিয়া! এখন সব একেবারে ঠেলিয়া উঠিতেছে। হীরালাল দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধরিয়াও সেই বেগ দমন করিতে পারিল না, মোটরের মধ্যেই বমি করিয়া ফেলিল।

মেইজি এক লাফে দূরে সরিয়া গিয়া হাত দিয়া হীরালালের মাথাটা জোরে মোটরের দরজার দিকে ঠেলিয়া দিল বটে, তবু তখন বুদ্ধি করিয়া যে দুইখানা রুমাল কিনিয়াছিল তাহাতেই তাহার একটু স্বস্তি বোধ হইতেছে।

মেইজি কর্কশকণ্ঠে কহিল,—শিগগির টাকা দাও আমার।

হ্যাঁ, দিবে বৈ কি, দশ টাকাই সে দিবে। এত বড় একটা অপরাধের পর সে টাকা কম দিয়া মেইজির বিরাগভাজন হইবে না। পকেট হইতে নোটখানা বাহির করিয়া সে মেইজির হাতে গুঁজিয়া দিল। ট্যাক্সির মিটারের দিকে চাহিয়া হীরালাল কহিল,—এবার আমি নামবো। রোখো।

মেইজি কোমল করিয়া কহিল,—নামবে কী? আমার ওপর রাগ করলে নাকি?

—না, ছাড়ো, আবার আমার বমি আসছে।

মেইজি ফের সরিয়া বসিল। ট্যাক্সিটা তখনই দাঁড়াইয়াছে।

মেইজি কহিল,—না, তুমি হাওয়ায় একটু সুস্থ হয়ে নাও। এখুনিই যাবে কি?

—হাওয়া আর ভালো লাগছে না, আমার ঘুম পাচ্ছে। ট্যাক্সি আর চললে পয়সায় কুলুবে না। আমার কতো পয়সা বেরিয়ে গেলো।

—বেশি ওঠে নি তো? টাকা আড়াই হবে। আর আমার ঘর তো এই কাছেই। ঘরে চলো না আমার।

—না।

—কেন?

—শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে। তোমার ঘরে তো আর ঘুমুতে দেবে না?

—তা কী করে হয়। রাত একটার পর ঘর বন্ধ হয়ে যায়—আমাকে আমার ফ্ল্যাট্‌এ ফিরতে হবে।

কিছু না বলিয়া ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া টলিতে-টলিতে হীরালাল নামিয়া

আসিল। দাঁড়াইবার ক্ষমতা ছিল না,—পায়ে কাপড় আটকাইয়া ফুটপাতের উপর হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল।

ট্যাক্সি ফের স্টার্ট দিলে মেইজির মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল,—পুওর চ্যাপ।

কিন্তু হীরালাল এখন কোথায় যায়! রাস্তাটা তো ফাঁকা—ট্রাম বন্ধ হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়। দাঁড়াইলে হয়তো বাস পাওয়া যাইবে, কিন্তু কোথাকার কী বাস, কোথায় তাহাকে লইয়া যাইবে ঠিকানাই সে খুঁজিয়া পাইবে না। একবার উঠিয়া পড়িলে নামাও তো ভীষণ মুস্কিল। যাক, ঘণ্টা বাজাইয়া ঐ একটা রিকসা আসিতেছে। হীরালাল দরাদরি না করিয়া কোথায় যাইবে কিছু হদিস না দিয়া রিকসায় সোজা উঠিয়া বসিল।

কোথায় সত্যি সে যাইবে! রিকসায়ালাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল রাস্তাটা লোয়ার সার্কুলার রোড ও রাত এখন প্রায় এগারোটা। এই অবস্থায় বাড়িই বা কী করিয়া যাওয়া যাইতে পারে? সমস্ত শরীরে অস্বাস্থ্যকর অতৃপ্তির গ্লানি লইয়া কোথায় বা যাইবে তা হইলে? কে তাহাকে বিশ্রাম দিবে? কে আছে!

হীরালালের এতক্ষণে খানিক হুঁস হইয়াছে; রিকসায়ালাকে কহিল,—

—শেয়ালদার দিকে নিয়ে চল, একা না পারিস মাঝপথে আর একটা রিকসায় চাপিয়ে দিলেই হবে।

ঘণ্টা বাজাইয়া রিকসা চলিয়াছে। পকেটে এখনো কয়েকটা টাকা পড়িয়া আছে মনে হয়। বেশি না হোক, তাহা দিয়া অনায়াসে টুনুর এক কৌটা বার্লি হইত! কিন্তু এতই যখন গেল, তখন ঐ সামান্য টাকা কয়টারই মায়া করিয়া কী হইবে!

অথচ হাজার দশেক টাকার মোটা একটা ইন্‌সিওরেন্স করিয়া মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে প্রথম প্রিমিয়ামটা অন্তত সে দিতে পারিত। তারপর দ্বিতীয় প্রিমিয়াম দিবার সময় আসিলে একদিন চুপি-চুপি সে দ্রুতগামী এক বাসএর তলায় হুমড়ি খাইয়া পড়িত না হয়! এমন নিপুণ ভাবে দুর্ঘটনা ঘটাইত যে, সে যে আত্মহত্যা করিল এ-কথা কেহ ঘুণাক্ষরেও টের পাইত না। হ্যাঁ, নিশ্চয়—নিশ্চয় সে আত্মহত্যা করিতে পারে। তাহার মৃত্যুর পরে হাজার দশেক টাকা যদি সে সুহাসিনীর হাতে আসিবে বলিয়া ভরসা পাইত, মরিতে তাহার একটুও বাধিত না। সেই মৃত্যু যতই কেন না ভয়াবহ হোক, যতই কেন না যন্ত্রণাদায়ক হোক; আর তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুই তো সে এখন চাহিতেছে।

কিন্তু এখন মরিলে সুহাসিনীর হাতে সেই মোটা টাকাটা আসিয়া পৌঁছিবে

না—এই যা দুঃখ! রিকসায়ালা একাই শেয়ালদা পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে—বউবাজার দিয়া এবার আরো একটু ভিতরে ঢুকিতে হইবে। তাহার পর আর কিছু তাহার মনে পড়িতেছে না।

গলিটা নিঝুম হইয়া গেছে। রিকসায়ালা এক টাকা ভাড়া পাইয়া খুশি হইয়া গেল। কিন্তু গলিময় টলিয়া-টলিয়া বাড়ি বাছিবার ধৈর্য আর হীরালালের ছিল না। যাহাকে কাছে পাইল তাহাকে ডাকিয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

হীরালাল যে কী করিতেছে তাহার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিল না। মেঝের উপর বিস্তৃত ফরাস পাইয়া তাহার উপর গড়াইয়া পড়িল। কহিল,—আলোটা নিবিয়ে দাও, আমি চুপ করে রাতটা শুধু ঘুমিয়ে নেব একটু।

গৃহস্বামিনী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল,—টাকা আছে তো?

—এই নাও। বলিয়া পকেটে বাকি যাহা কিছু ছিল হীরালাল সমস্ত মেয়েটির দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। মেয়েটি আর দূরে সরিয়া থাকিতে পারিল না, তাহাকে হু-হু করিয়া কাঁপিতে দেখিয়া লেপ একটা খাট হইতে পাড়িয়া আনিয়া তাহার গায়ে চাপাইয়া দিল। কহিল,—শরীর খুব খারাপ লাগছে তোমার? মাথাটা একটু টিপে দেব?

এত দুঃখেও হীরালালের হাসি পাইল। কহিল,—দয়া করে ওপরে তোমার বিছানায় গিয়ে শোও, আমাকে নিরিবিলি ঘুমুতে দাও। বলিয়া লেপটা নাক পর্যন্ত টানিয়া সে মুড়িসুড়ি হইয়া শুইল। কিন্তু মেয়েটির উঠিবার নাম নাই! যেন ভীষণ একটা অসুবিধায় পড়িয়াছে অমনি দুর্ভাবনায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিন্তু ঘুম ছাই আসিতেছে কৈ? মন খালি ঘুরিয়া-ফিরিয়া বাড়ি চলিয়াছে। শিয়রে কেহ যে এখনো বসিয়া আছে—স্পষ্ট অনুভব হইতেছে। চোখ চাহিয়া না দেখিলেও কেমন যেন সুহাসিনী বলিয়া মধুর একটি মোহ আসে। কেমন মজা! খালি ছেলে কোলে লইয়া দিনের পর দিন তাহার প্রতি এই যে তাহার নির্মম অবহেলা—আজ কেমন তার চমৎকার শাস্তি মিলিল। আজ এখন তো সে একান্ত হীরালালের আশায়ই জানালা দিয়া পথ চাহিয়া বসিয়া আছে—ভালোয় ভালোয় যেন ফিরিয়া আসে, তাই বলিয়া দেবতার কাছে সাধ্যমত মানত করিতেছে—কবে কোন দিন তাহাকে কটু কথা বলিয়াছিল, তাহার জন্য এখন আর তাহার অনুতাপের সীমা নাই! খুব হইয়াছে! স্বামীর মূল্য সে একটু বুঝিতে শিখুক।

তবু এইখানে সে কোনোকালে আসিতে চাহে নাই—এখানকার পথ-ঘাটও সে জানিত না! তাহার নিষ্ঠুর জীবন-দেবতা তাহাকে এমন অশক্ত ও ভঙ্গুর,

এমন দুর্বল ও অসহায় পাইয়া তাহাকে লইয়া এই কুৎসিত পরিহাস করিলেন। সে দুর্বল, সে দরিদ্র—শরীরের শৃঙ্খলে সে বন্দী। মানুষের অসমকক্ষতার এই হীন সুবিধা লইয়া বিধাতা এই হৃদয়হীন আচরণ না করিলে সে একবার যুদ্ধ করিয়া দেখিত। পাঁচ টাকা তখন কম দিলেই বিধাতা কী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন।

ভোরবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া সব-প্রথমে তাহার সেই ক্যালেণ্ডারটির কথা মনে পড়িয়া গেল। আহা, সেটি তো আনা হয় নাই—সেই ট্যাক্সিতেই এক কোণে পড়িয়া আছে। টুনুর জন্য সামান্য একটা ক্যালেণ্ডারও সে লইয়া যাইতে পারিল না! ক্যালেণ্ডারের ছবি দেখিয়া টুনু এত অসুখে পড়িয়াও কত না-জানি খুশি হইত! মাকে দেখাইত—আর এ যে তাহার মা-ই, এ-কথা সে বারে বারে হীরালালকে বুঝাইয়া দিত।

কানে-মাথায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়া হীরালাল বাহির হইয়া যাইতেছিল, মেয়েটি ডাকিয়া কহিল,—এই হিমের মধ্যে এখুনি বেরুবে কি? চা করছি, চা খেয়ে যাও।

– না, বাড়িতে গিয়েই চা খাবো।

কথাটা বলিতে হীরালালের কত ভালো লাগিল।

পকেট হাতড়াইয়া দেখা বৃথা—সমস্ত পয়সাই সে ফরাসে ছিটাইয়া দিয়া আসিয়াছে। একটা বিড়িও নাই। ও হরি! সিগারেটের ভরতি টিন্‌টাও সে লইয়া আসে নাই। রুমাল দুইটা তো তখনই কাজে লাগিয়াছিল—আর পকেটে পুরিবার অবস্থা ছিল না।

হাঁটিয়াই যাইতে হইবে—অনেকটা পথ, তা হোক। একটু জোরেই পা চালাও, হীরালাল। টুনু এখনো বাঁচিয়া আছে কি না কে জানে। ছি, বাঁচিয়া আছে বৈ কি—জ্বর হয়তো নর্ম্যালে নামিয়া গেছে। তবু জোরেই পা চালানো উচিত। শীতের বেলা—দেখিতে-দেখিতে আপিসের সময় হইয়া যাইবে। তারপর বাজার করিয়া না আনিয়া দিলে খাইবে কী! টুনুর জ্বর না নামিলে উনুন ধরাইয়া কোনো রকমে একটা কিছু তোমাকেই তো নামাইয়া নিতে হইবে। তার খেয়াল আছে?

হীরালাল শীতে কাঁপিতে-কাঁপিতে দ্রুত পায়ে চলিতে শুরু করিল।

গল্প ও কাহিনী

অধিবাস

শ্রীমনোজ বসু

প্রিয়বরেষু

১.৫.৩২ শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অনেক হাঁটাহাঁটি ও কাঁদাকাটির পালা শেষ হ'য়ে গেল। শেষে নিরুপায় হ'য়ে প্রতাপ বিধাতাকেই গোটা দশেক টাকা ঘুষ দেবে মনে করলে। সঙ্গে সঙ্গেই একটা চাকরি জুটে' গেল।

ষাট টাকা মাইনে ;—দশটা-পাঁচটা। ফর্দ্দ ঠিক হ'য়ে গেল,—বাড়ি ভাড়া আঠারো, রুগ্ন বেতো বাপের চিকিৎসা বাবদ কব্‌রেজি বড়ি,—বারো ; বাজার খরচ রোজ পাঁচ আনা করে' ন' টাকা' ছ'আনা, তৃতীয়, চতুর্থ ও অনাগত বোন-গুলির বিয়ের জন্য কুড়ি টাকা করে' জমাতে হবে,—আর বাকি দশ আনার ওপরই ওর প্রভুত্ব,—সে বিড়িই খাক্ আর গাড়িই চড়ুক।

বিধাতাকে এ পর্যন্ত ঘুষ দেওয়া হ'য়ে ওঠে নি। ও খালি ছেঁদো কথা কয়ে' কয়ে' ভুলোয়, বলে—আরো গোটা কুড়ি বাড়িয়ে দাও—ছোট-ভাইটাকে একটা ভালো ইস্কুলে ঢোকাই, মেজভাইটার চিকিৎসা করি, মার সুবিধের জন্য একটা ঝি রাখি। তারপর।

অগত্যা বিয়ে করবার জন্যই ঝোঁকে,—নগদ চার হাজার টাকাই হেঁকে বসে। যে রাজি হয় তার মেয়ে অমাবস্যা,—তা হোক্। ও চায় কতগুলি রূপোর চাকতি।

দিদি থাকেন বাঙলার সীমানা পেরিয়ে মধ্য-প্রদেশের এক বুনো গাঁয়ে,—তাঁকে বিয়ের নায়রী করে' নিয়ে আসতে প্রতাপ রওনা হ'ল। আগের পক্ষের দিদি,—চব্বিশ বছর বিয়ে হয়েছে, সেই থেকেই দেশছাড়া, স্বামী সামান্য মাইনে নিয়ে একটা ইস্কুলমাষ্টারি করেন। ঐ জংলা ঝুনো খোট্টা দেশেও সদলে মা-ষষ্ঠীর পথ চিনে আসতে বেগ পেতে হয় নি। বাবা বারণ করেছিলেন বটে, শুধু-শুধু টাকার শ্রাদ্ধ,—শ খানেকের ওপর এতেই বেরিয়ে যাবে, হাফ-টিকিটই লাগবে হয় ত' খান ছয়েক। প্রতাপ বলেছে—দিদি না এলে উৎসবের সমস্ত বাজনা বন্ধ হয়ে যাবে।

দিদি তক্ষুনিই তোরঙ্গপত্র বাঁধতে লেগে গেলেন। বললেন—কালকে বিকেলের গাড়িতেই তো? তা' হ'লে মোটে আর উনত্রিশ ঘণ্টা আছে,—উঃ, কতক্ষণে কাটবে!

দীর্ঘ চব্বিশ বছরের নির্বাসিতা নারী বাঙলার সবুজ সান্ত্বনাসিক্তিত নীড়ের জন্য বাহুর দুই ব্যাকুল ডানা যেন বিস্তার করে দিয়েছে। বললে—সবুজ মাঠ কতদিন দেখিনি প্রতাপ,—নুয়ে'-পড়া নীল আকাশ। এখনো নদীতে বকের ডানার মতো শাদা পাল তুলে' ঘোমটা-দেওয়া বৌর মতো নৌকা নাচে, পানকৌটি ডুব দেয় জলে? মাছরাঙা,—গাঙ-শালিক? ছেলেরা উঠোনে তেমনি কানামাছি খেলে? মেয়েরা মাঘমণ্ডলের ব্রত করে? হ্যারে, আর তেমনি কাঠগোলাপ ফোটে,—সজনে

ফুল ? হাওয়ায় তেমনি পাটের থোপা দোলে আর ? শালি ধানের চিড়া পাওয়া যায় ? কাউনের চা'ল ?

রুক্ষ তামাটে মাটির নিরানন্দতা সমস্ত দেহে ;—হঠাৎ যেন বাঙলার শ্যামল মাটির সুষমায় স্নান করে' ওঠে। বলে,—আমিই সব নিতকাম করব তোর বিয়ের যাত্রাকলস আঁকব, পিঁড়িচিত্র করব, উলু দেব, কুলোতে পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে বরণ করব, দোরে মঙ্গলঘট দেব—

বারো বছরের মেয়ে মিনি এসে বলে,—ট্রেনে চড়লে কেমন লাগে মামাবাবু ? খুব ভয় করে ? গাড়ি কাৎ হ'য়ে পড়ে' যায় না, ধাক্কা লাগে না কারো সঙ্গে ? কতক্ষণ লাগে যেতে বল না ? সতেরো ঘণ্টা ? আমি জেগেই থাকব দেখো,— ককখনো ঘুম পাবে না।

ছ' বছরের ছোট ভাই রতন এসে বললে,—ছাই জাগবি তুই। এই দেখ, একটা খাতা সেলাই করে' নিয়েছি, আর বাবার এই কপিং পেন্সিলটা। জেগে জেগে খাতায় ইষ্টিশানগুলির নাম লিখব।

মিনি বলে,—কে কে আছে আমাদের কলকাতায় ? কলকাতায় এরকম কালীপুজো হয়,—সেখানে এ রকম যাত্রাপার্টি আছে ? ছাই আছে। রাত্রে থামের ওপর এমন বাতি জ্বলে সেখানে ? বগলা পাখী আছে ?

রতন বলে,—এই দেখুন আমার হকি-ষ্টিক্। নিয়ে যাব এটা। কলকাতার লোক জানে খেলতে হকি ? ছাই জানে। হাত দিয়ে বল ধরলে হ্যাণ্ডবল হয় না, জানে ?

প্রতাপ বললে,—ট্রাঙ্ক ইত্যাদি আজই গুছিয়ে রাখ দিদি, কাল ঘুম থেকে উঠে বিছানা বাঁধা যাবে। জামাইবাবুর কি ব্যবস্থা হ'বে ?

দিদি জাদরেল ট্রাঙ্কটা বন্ধ করতে করতে বললেন,—চব্বিশ বছর বাদে দিন চব্বিশের জন্য হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন,—আমিও। মুখ বদ্‌লানো যাবে। শুধু ভৌগোলিক হাওয়া বদলই নয়, মানসিকও। চব্বিশ বছরের কয়েদগিরির পর, ঘানি-ঘোরানোর পর একটু যদি নীল আকাশের হাতছানি পেলাম! জেরবার, নাকাল ক'রে ছেড়েছে। যখন এই বাসি দেশটায় আসি তখন রেল-লাইনের দু' ধারে সবুজ মাঠে সোঁদাল দেখেছিলাম,—আর কি ওদের দেখব, ভাবতে কান্না পাচ্ছিল। পোয়ালখড়ে ছাওয়া ঘরগুলি,—চোরখড়কে, সেই গুলঞ্চলতা।—হ্যাঁ রে রতনা, বইগুলি সঙ্গে নিচ্ছিস্ কেন ? বিয়ে বাড়িতে বিদ্যে না ফলালেও চলবে!

রতন ঘাড় বেঁকিয়ে বললে,—কলকাতার ছেলেরা এ সব বই দেখেছে ? পারবে পড়তে এ সব ?

প্রতাপ দিদির হাতের সযত্নরচিত লোভনীয় খাবারগুলি টায়-টায় সাবাড় ক'রে বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

প্রথম দেখা ট্রেনেই,—পরে এই মরা চিপা খাঁড়িটার পারে।

চক্রধরপুর ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই কি আহ্লাদেই আটখানা হ'য়ে ফাজিল মেয়ের মতো বৃষ্টি নেমে এলো। ব্যস্ত পদশব্দ ও চঞ্চল জলধ্বনি ছাঁপিয়ে কার একটি সলজ্জ অথচ সহাস্য, আনন্দসূচক চীৎকার,—প্রতাপের মন বল্‌ছিল ওরা এই গাড়িতেই উঠবে। মেয়েটিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যই যেন অন্ধকার আকাশের এই নয়নাশ্রুধারা।

মানে, মেয়েটি যখন গাড়িতে উঠে চুল এলো ক'রে চিপতে লাগল,—শাড়ির আঁচলটা ফেরতা দিয়ে বুকে জড়ালে,—পরে ফের খোঁপা তৈরি ক'রে চুলের কাঁটা গু'জে দিলে একটির পর একটি।

বৃষ্টি না ঝরলেই ভালো ছিল! ট্রেনে লোকই বা এত কম কেন? প্রতাপের চোখে ঘুম না আসবার কি কারণ?

সঙ্গের ছেলেটি ভারি মজাড়ে, আমুদে। যেমন চোকাল-মুখাল, তেমনি জোরালো জোয়ান। গায়ে সাহেবি পোষাক।

ঝুনু গাড়ির চারিদিক একবার চেয়ে নিয়ে বিছানো কম্বলটার ওপর পা তু'লে বসল। কোণের ঐ ছেলেটির দিকে চেয়ে কেমন যেন ওর একটু ভালো লাগল,—এমনিই। ঐ ছেলেটির শুধু মুখে নয়, কৃশ কাহিল কালো দেহটি ঘিরে এমন একটি মলিন বিষণ্ণতা যে, ঝুনু মুগ্ধ হয়ে চার সেকেণ্ড বেশিই তাকিয়ে ফেলল হয় ত' ইচ্ছে করে দু'টি কথা কয়,—এই কোথায় যাচ্ছেন, কেন, কবে ফিরে' যাবেন, বাড়িতে কে কে আছে?

ঝুনু চঞ্চল হ'য়ে বললে—দাদা, খাবারের ঝুড়িটা কোথায়? গাড়িতে উঠেই খিদে পেয়ে গেল। এখুনি না খেলে সব লুচিগুলি জুড়িয়ে সুখতলা হ'য়ে যাবে। এস হেল্‌প কর আমাকে।

প্রতাপ এই ব'লেই নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিল,—এরা মোমবাতি, এদের কাছে কেবল ঠাট-ঠমক, এদের মেজাজ অত্যন্ত টেড়া, এদের মন দেমাকে ছাপাছাপি,—এরা ঠোঁটে-কলা। তার চেয়ে তমালশ্যামলা সব্রীড়কটাক্ষা গৃহকোণের সান্ত্বনালক্ষ্মী ঢের ভালো। এরা ত' রংদার, ভেজাল, রোখো,—এর চেয়ে গেঁয়ো ছুটুলে বৌও ভালো।

জলের মধ্যে জীয়ল মাছের মতো প্রতাপের মন আইটাই করে।

খাওয়া শেষ করে ঝুনু ব'লে উঠল—জল! তুমি কি হতভাগা দাদা, জলের কুঁজোটাই ফেলে এসেছ?—পরে স্বর নী হ'য়ে বললে—ওঁর কাছ থেকে একটু জল চেয়ে নাও না।

সঙ্গের ছেলেটি প্রতাপের কাছে জল চাইলে। এতে যেন ব্যস্ত হ'বার কিছুমাত্র কারণ নেই,—এম্‌নি—অতি আস্তে আস্তে প্রতাপ জল গড়িয়ে দিলে। ঝুনুই নিতে চাইল হাত বাড়িয়ে। প্রতাপ মেয়েটির দাদার হাতেই গ্লাশটা এগিয়ে দিলে।

প্রতাপ ভাবে - খালি বেশভূষার চটক, দুই চোখে ঠেকার ঠিক্‌রে পড়ছে—এর চেয়ে হোক্ না সে কালো কুৎসিত, নাই বা জানল কানড়াছাঁদে বেণী বাঁধা,—না হোলই বা লেখাপড়ায় তুখোড়,—ঢে লা। পাত্তাবাহারের চেয়ে ঢের ভালো বনতুলসী।

ঝুনু ওর দাদাকে বলে—ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ কর না,—মুখ বুঁজে ব'সে থাকতে ভালো লাগে তোমার?

প্রতাপের সঙ্গে দাদা মামুলি ভাবে কথা পাড়ে, প্রতাপ খালি কাটাকাটা উত্তর দেয়, তাই আলাপ আর গড়ায় না। গায়ে প'ড়ে আর কত কথা পাড়া যায়?

কিন্তু ঐ মেয়েটির চোখে এমন নিবিড় ঔদাস্য কেন,—নিবিড় নিস্তব্ধতা! দু'টি চোখ থেকে যেন শীতল অন্ধকারের মতো সহানুভূতি গ'লে পড়ছে। প্রতাপ জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিজা অন্ধকার দেখে আর ভাবে—

থুথ্‌ড়ো পচা ঘর, দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে তুফান একটা তুড়ি দিলেই সাবাড়; মৃত্যুশয্যায় বাপ, মা'র আয়ুতেও ফুঁ লেগেছে,—সব ক'টি অপোগণ্ড শিশুই রোগা ভিগভিগে, কিন্তু সবাই পেটজন্দর। এ জীবনটা একটা অনাবাদি জমি! চার হাজার টাকা কতদিনই বা,—একটা পিলেওলা ভুষিমাখানো মেয়ে-ব্যাঙাচি,—তা'র সঙ্গেই নট্‌খটি ক'রে জীবন কাবু ও কাবার ক'রে দিতে হ'বে। পান্তাভাত ও পাকালমাছ খাবে, দশটা পাঁচটা করবে.—একটা সন্তান চিতায় আরেকটা আঁতুড়ে,—এমনি হ'তে হ'তেও যে ক'টা হাতের পাঁচ থেকে যাবে,—কি করবে তারা? কোথায় তাদের ঘর, তাদের ভাত, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধর?

দম বন্ধ হ'য়ে আসে,—প্রতাপ কামরার মধ্যে মুখ টেনে এনে আবার চেয়ে দেখে মেয়েটির মুখখানিতে মলিন ও সুকোমল মমতার অনির্ব্বাণ স্নিগ্ধতা! কল্কা-কাটা খদ্দরের চাদরটা যে গায়ে টেনে দিচ্ছে,—তাও যেন ওকে স্নেহ ক'রে,—জানলার কাচটা তু'লে দিচ্ছে; যেন বলছে, গায়ে একটা কাপড় জড়াও, ভারি ঠাণ্ডা আজ,—জানলাটা খুলে রেখো না।

দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে,—ঝুমু হেলান দিয়ে আধ শুয়ে ট্রেনের আলো দেখছে, আলোর পোকা, বাইরের বিশাল অন্ধকার, আর কোণের ঐ ছেলেটির বিষণ্ণ মুখ,—অথচ পুরুষালির কি সহজ ও সাবলীল তেজ চোখে, চাপা ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের কি সূঁচলো হাসি! উনি কেন ওর সঙ্গে কথা কইছেন না? বললেই ত' পারেন—এবার ঘুমুন,—আরো জল লাগবে? ছাই, একটা কিছু বললেই ত' হয়।

সঙ্গে মালপত্র কিছুই ছিল না,—খবরের কাগজে জড়ানো একখানা কাপড়ের পুঁটলি একটা,—ডুরুগ্-এ গাড়ি দাঁড়াতেই প্রতাপ তক্ষুণি লাফিয়ে নেমে গেল। যেন, যত তাড়াতাড়ি ভোলা যায়! টাঙায় উঠে ও ভাবছিল, দু'টি মুহূর্তের সুধাপাত্র ব'য়ে যে বেড়ায়, সে নেহাৎই মূর্খ, সে-মদের রং ফ্যাকাসে হ'য়ে আসবেই, স্বাদও হ'বে পান্‌সে। শুধু শুধু—

কিন্তু বিকালের মুমূর্ষু আলো মেয়েটির চোখের পাতায় প'ড়ে ওকে আরও করুণ, আরো সুমধুর ক'রে তুলেছে। প্রতাপ একেবারে অবাক হ'য়ে গেল।—পরনে আটপৌরে শাদা একখানি শাড়ি,—নিবিড় মমতায় পেলব সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন ক'রে ধরেছে,—দু'খানি পা'র খানিকটা শঙ্খের মত সাদা,—বুকের খানিকটা খোলা, তা'তে বিকেলের রোদ পড়েছে।

ঝুমুর হৃৎপিণ্ড পূজার ঘণ্টার মতো বেজে উঠল।—দাদা, ঐ যে উনি, উনি এখানেই এসেছেন দেখছি বেড়াতে। ডাক ওঁকে।

ধূলায় একবার সোনার সেফটিপিন্ হারিয়ে ফেলে পরে ফের সেটাকে পেয়ে ঝুমুর যতখানি আহ্লাদ হয়েছিল তা'র একচুলও কম নয়। শুধু আহ্লাদ নয়, দেখা পেয়ে ও যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে,—এম্‌নি। হৃদয়ের মধ্যে কোন্ জায়গাটা যেন বেজুত লাগছিল,- ঠিক হ'য়ে গেল।

ঝুমুর দাদা নীরেন গায়ে প'ড়ে খুব আলাপ করলে এবার, ঝুমুও লজ্জালুলতার মতো মুখ ঝেঁপে রইল না,—ঝুমু এবার মৌটুস্‌কি।

বললে,—কবে যাচ্ছেন কলকাতায় ফি'রে?

—কাল।

—কাল? দাদা, উনিও কালই যাচ্ছেন। চমৎকার হ'বে কিন্তু, একসঙ্গে সব হল্লা ক'রে যাওয়া যাবে। আপনি ত' রাস্তায় একটিবারো চোখের পাতা পাতেন না, দেখলাম। কেন এসেছেন এখানে শুনতে পারি?

প্রতাপ ঢোক গি'লে বললে—দিদির সঙ্গে দেখা করতে। আর আপনারা?

—দাদাটা শিগ্‌গিরই কালাপানি পেরবেন কিনা, তাই যাবার আগে সমস্ত

আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ঘু'রে ঘু'রে দেখা করা হচ্ছে। আমি ওঁর খানাদার হ'য়ে বেরিয়েছি।

নীরেন বললে,—বোকা মেয়েটাকে কত বল্লুম, বি, এ পাশ করলি,—এবার চল আমার সঙ্গে বিলেত। ভয়েই ঘাব্‌ড়ে গেছে,—কিন্তু এখানে পুন্‌কে হ'য়ে থেকে কি সুরাহাটা হ'বে শুনি?

ঝুনু ঠোঁটের কোণ ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে বললে—ভয় না আরো কিছু? এখেনেই আমার কত কাজ প'ড়ে আছে,—তোমরা এক একটা দিগ্বিজয়ী হও গে,—আমাদের ছোটখাটো স্নিগ্ধ সংসার-শান্তিনিকেতনই ভালো। কি বলেন?

প্রতাপ বলে,—আমি কি বলব?

ঝুনু চক্ষু উন্মীলিত ক'রে ওর দিকে তাকায়, সে-দৃষ্টি ওর মর্ম্মে এসে গ'লে গ'লে পড়ে,—ওর কথাগুলি যেন মদের ফোঁটার মতো!

ঝুনু হঠাৎ ব'লে ওঠে,—চলুন আমাদের বাড়ি, মামিমার সঙ্গে আলাপ হ'বে। আর একটু পরে, আসুন এই নদীটার পারে একটু বেড়াই! থাক্. রাত হ'য়ে যাবে—একটা টাঙা ডাক, দাদা।

টাঙায় ওঠা নিয়ে গোলমাল লাগছিল,—একজনকে গাড়োয়ানের পাশে বস্‌তেই হ'বে,—অগত্যা শুধু শুধু ভাড়া দিয়েই টাঙা তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। হেঁটেই চলল তিনজন — মাঝখানে ঝুনু, পরে প্রতাপের ডান পাশে।

অন্ধকারে পথ হারিয়ে তিনজনে অনেক পরে মামিমার বাড়ি এসে পৌঁছুল। সারা পথ ঝুনুর কথাই পাঁচকাহন,—ওর যেন কি হয়েছে আজ। মামিমা অভ্যাগতকে দেখে ঘোম্‌টা টেনে দিলেন। ঝুনু বললে—বসুন। ও রকম পরের মতো জবুথবু হ'য়ে কেন? বেশ হাত ছড়িয়ে বসুন,—কম ত' আর ঘোরা হয় নি,—আমার পায়ের বুড়ো আঙুল দু'টো থেঁৎলে গেছে হোঁচট্ খেয়ে খেয়ে।

দিদি যেমন যত্নে পরিপাটি ক'রে খাবার গুছিয়ে দিয়েছিল ঠিক ততখানি যত্নে ঝুনুও খাবার এনে দিলে। প্রতাপ বললে,—পারব না।

ঝুনু ওর ঠোঁট দু'টি তাড়াতাড়ি নেড়ে বলছিল—খুব পারবেন। যদি অসুখ করে, সেবা করবার জন্য আমি গ্যারিন্টি রইলাম।

অন্ধকারে ঝুনুই খানিকটা পথ এগিয়ে দিলে। বললে—কাল খুব সকালবেলাই, ঘুম থেকে উ'ঠেই, চা না খেয়েই, একরকম ছু'টেই, মুখচোখ না ধুয়েই চ'লে আসবেন এ বাড়ি। খুব খানিকটা বেড়ানো যাবে। চাকর ডাকিয়ে একটা লণ্ঠন দেব? হ্যাঁ, শেষকালে হোঁচট্ খেয়ে পড়ুন, সে-সেবার ভার কিন্তু আমার ওপর নেই। আচ্ছা, আচ্ছা, তাও নেওয়া যাবে,—তবুও একটা আলো নিলে—

প্রতাপ বিমনা হ'য়ে একা একা পথ ধরে। পেছন থেকে তবুও কার ডাক এসে পৌঁছোয়—কাল আসবেন কিন্তু মনে ক'রে। কেমন থাকেন আমার জানা চাই কিন্তু।

প্রতাপ ভাবলে, কাল কক্‌খনো ওদের বাড়ি যাবে না,—খেয়ে দেয়ে এমন ঘুম দেবে যে নটার আগে আর উঠবে না। বিধাতা, আর কেন?

কিন্তু নটার আগেই ওকে উঠতে হ'ল। দিদিকে বললে—এখেনে এসেই এক বন্ধু জুটে গেল। একটু দেখা ক'রে আসি। শিগগিরই ফিরছি,—তোমরা সব 'রেডি' হ'য়ে থাক।

ঝুনু বললে,—এসেছেন যা হোক্। এই আপনার ঘুম ভেঙেই আসা? কেমন আছেন? জ্বর হয় নি ত'? ব'লে প্রতাপের কপালে একটু হাত রাখে। তারপর হাতের ওপর একটু।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ,—হঠাৎ যেন জ্যোৎস্নার মতো মিঠে লাগে, প্রতাপের মন উন্মাদ হ'য়ে উঠেছে। দোর গোড়ায় দিদি দাঁড়িয়ে, প্রতাপকে পথে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন—তোর আক্কেলটা কি রকম শুনি? সেই কখন খাওয়া দাওয়া সেরে বেঁধে ছেঁদে কাপড় চোপড় প'রে দাঁড়িয়ে আছি সবাই,—তুই আসছিস না ব'লে গাড়ি ডাকা হচ্ছে না। বন্ধুর বাড়ি এতক্ষণ না থাকলেই নয়? মোটে আর এক ঘণ্টা বাকি গাড়ি ছাড়বার—

রতনের একহাতে হকি ষ্টিক, অন্যহাতে ছেঁড়া খাতা একটা,—মিনি মুখ প্রফুল্ল ক'রে খালি ওর জামদানি শাড়িটা মানানসই ক'রে বারে বারে পরছে। দিদি পর্য্যন্ত সুন্দর ক'রে সেজেছেন, অব্যবহৃত পুরানো গয়না ক'খানি গায়ে দিয়েছেন, কপালের মধ্যখানে ডগডগে সিন্দুর,—কাপড়ের পাড়টা চওড়া লাল।

প্রতাপ মুখ চুন ক'রে মিথ্যা কথা বললে,—এইমাত্র বাবার টেলি পেলাম, তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন,—আমাকে এক্ষুনি একাই যেতে হবে। খাবার পর্য্যন্ত সময় নেই,—আমি চললাম। বিয়ের দিন পিছিয়ে গেছে।

দিদি কেঁদে বললেন,—আমাকেও নিয়ে চল্—

রতন তেমনি তার হকি-ষ্টিক নিয়ে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, মিনির শাড়ি গুছোনো তখনো ফুরোয় না। প্রতাপ মাতালের মতো বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে—দিন ঠিক হ'লে আবার আসব দিদি, ঠিক থেকো।

দিদি দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদেন,—ভাবেন, সেই পচা ভাদ্দরের থইথই পুকুর, সেই ললিতাসপ্তমীর ব্রত, প্রথম বয়সের প্রথম সুখোৎসব রাত্তি সেই বাঙলায়ই।

প্রতাপ ষ্টেশনে গিয়ে বাবার কাছে তার পাঠায়—বিয়ের দিন পিছিয়ে দিন, আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ।

মধ্যপ্রদেশের ওপর মধ্যরাত্রি,—অত ভাড়া দিয়ে গাড়িতে আর চতুর্থ লোক ওঠে নি।

সন্ধ্যা হতেই নীরেন শুয়েছে—খানিকক্ষণ বক্‌বকির পর ঝুনুও ঢু'লে পড়েছে বেঞ্চির ওপর। বলেছে—আপনিও আমার মাথার তলায় মাথা দিয়ে গা টান ক'রে শুয়ে পড়ুন।

কি অপার অকূল ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা। প্রতাপ একমনে ঘুমন্ত ঝুনুকে দেখতে লাগল। সমস্ত মুখে লাবণ্যময় অপার প্রশান্তি! মুদ্রিত দু'টি ঠোঁটে যেন স্তব্ধতার সঙ্গীত,—ললাট যেন শ্বেতপদ্মের পাপড়ি, ব্রততীর মতো লীলায়িত দু'টি বাহু,—কানে এককালে দুল্ পরবে ব'লে যে-জায়গার ফুঁড়েছিল, সেটিও ও খানিকক্ষণ দেখলে। সুতনু, সুমধ্যমা—ওর নব-যৌবনের সৌরভে প্রতাপের সমস্ত দেহ উন্মুখ উল্লসিত হ'য়ে উঠল। ধীরে ধীরে কপালে ওর হাতখানি রাখলে।

ঝুনু ধীরে ধীরে ওর চোখ দু'টি মেলে বললে,—আমাকে ডাকছেন? এখনো ঘুমুতে যান নি?

ঝুনু উ'ঠে বসল, বললে—আপিসের খাটনি আপনাকে একেবারে কাবু ক'রে ফেলেছে। খুব খাটনি, না?

প্রতাপ ওর মমতাময় দু'টি অপরূপ চোখের পানে চেয়ে বলে,—কিন্তু কাবু ও কাবার হ'য়ে যাবার জন্যই ত' আমরা,—কেরানি। এঁদো পচা ঘরে সঙ্কীর্ণ মন ও বোবা আশা নিয়ে ব'সে আছি।

ঝুনু বলে—সব জানতে ইচ্ছা করে আপনার। কখন যান আপিসে? আপিস থেকে এসে কি খান, বিকেলে কি করেন,—সব। বলবেন?

ঝুনু আরো একটু স'রে আসে, উধাও-ধাওয়া হাওয়ায় ওর আঁচল অগোছাল হ'য়ে ওড়ে,—ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। প্রতাপ বলে,—ঘুম থেকে উঠে বাজার ক'রে আসতে আসতেই আপিসের বেলা হ'য়ে যায়। হেঁটেই যেতে হয় কিনা। পাঁচটা পর্য্যন্ত কলম পি'ষে যখন হেঁটে বাড়ি ফিরি তখন সন্ধ্যা হয়ে যায়,—একটা পাথরের বাটিতে ঠাণ্ডা জল নিয়ে তা'তে ঘণ্টা খানেক বাঁকানো আঙুলগুলি ডুবিয়ে রেখে সোজা, কর্মঠ করি। পরে বাবার পা টিপতে বসি। গান নেই, কবিতা নেই, খেলাধুলা নেই, সঙ্গী নেই, কোন আমোদ প্রমোদ নেই,—আমোদের মধ্যে রাত

জেগে জেগে ছারপোকা মারা, সঙ্গীর মধ্যে চিররুগ্ন ছোট ভাইটা, রাত্রে ওর কাছে শুই কি না। পরে হঠাৎ যখন আপনাকে দেখলাম—

মুহূর্তের মধ্যে প্রতাপ যেন কি হ'য়ে যায়,—ঝুনুর উৎসুক হাতের ওপরে ওর হাতখানি উপহার দিতে একটুও কুণ্ঠা করে না, ব'লে চলে—হঠাৎ আপনাকে দেখলাম, আপনি আমার সঙ্গে প্রতিবেশী আত্মীয়ের মতো হেসে কথা কইলেন, স্নেহ ক'রে খেতে দিলেন, এই তপ্ত সান্নিধ্যটুকু দিলেন,—ভাবতে আমার মন চৈত্রের মৌমাছির মতো গুঞ্জন ক'রে ফিরছে। অযোগ্য হতভাগ্য—একটা অক্ষম গরীব কেরানি—

ঝুনুর চোখ বেদনায় টল্‌টল্ ক'রে উঠেছে। প্রতাপের হাত আরো একটু শক্ত ক'রে আপনার ক'রে ধ'রে বললে—আপনাকে দেখেই যে আমার মন নিজের কাছে কত ভালো লাগছে সে কথা আপনাকে কে বল্‌বে? আমি হঠাৎ যেন নিজেকে আজ চিনে ফেলেছি। কিন্তু মানুষকে এত দুঃখ কেন সইতে হ'বে? ভালোবাসা না পাওয়ার দুঃখের চেয়ে না খেতে পাওয়ার দুঃখ, রোগে ভু'গে পঙ্গু হওয়ার দুঃখ কী প্রচণ্ড! আপনি কেন এত দুঃখ পাবেন? না, আপনাকে পেতে দেব না।

প্রতাপ বলে—থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলকাতায় ষ্টেশন থেকে গাড়ি ক'রে বাড়ি আসবার সময় পথে একটা অতিকায় দালান দেখে ভেবেছিলাম, আকাশকে মুখ-ভ্যাঙানো দাঁত-উঁচানো এমনি একটা জাদরেল বাড়িরই বাসিন্দা হ'ব, মা আসবে, বাবা বাতের চিকিৎসা করতে এসে ভালো হবেন, ছোট ভাই বোনগুলি মনের সুখে পেট পু'রে খেয়ে কুঁদে বেড়াবে,—কিন্তু বি, এ ফেল ক'রে দেখলাম তেমনি একটা বিপুল বপু লম্বোদর দালানেই আমাদের আপিস,—একটা বিরাট অন্ধকূপ! মানুষের দুঃখ সব চেয়ে কখন প্রচুর ও প্রতিকারহীন জানেন? —যখন তা'র আর কোন আশা নেই! ষাট বছর বয়েস হ'লেও ষাট টাকার এক আধলাও বাড়বে না, বাবা শেষ পর্য্যন্ত বিছানায়ই থাকবেন।

তারপর সমস্ত রাত্রি আর কেউ কথা কয় না, জানলার কাছে মাথা দিয়ে প'ড়ে থাকে,—দু'জনের হাত তেমনি একটি মুঠির মধ্যে। ঘামে ভেজে, কাপড়ে মু'ছে নিয়ে ফের তেমনি ধ'রে থাকে,—যেন চেতনা নেই। যেন ওরা ঘুমিয়ে আছে।

ভোরবেলা রূপনারায়ণের ওপর দিয়ে যখন ট্রেন যাচ্ছিল, ওরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে,—দু'জনেরই মুখ বেদনায় আর্দ্র,—চার চোখের জল তখনো শিশিরের মতো শিহরিত হচ্ছে।

ষ্টেশনে গাড়ি যখন থামল, তখনই ঝুনু বলতে পারল—আপিস সেরেই কিন্তু

আমাদের বাড়ি যাবেন। যাবেন অবিশ্যি। আমি পাথরের বাটিতে বরফ গলিয়ে রাখব। সেই জাঁদরেল আপিসে গিয়েই আমাকে ভুলে যাবেন না দেখবেন—

পরে হাত নেড়ে বললে,—আমি না ভুললে কি ক'রেই বা ভুলবেন দেখব। আসা চাই কিন্তু, আমি পথ চেয়ে থাকব। বুঝলেন, পথ চেয়ে থাকব।

এখানে ওখানে করে, বন্ধুদের মেসে খেয়ে শুয়ে, আপিসে কলম পি'ষে প্রতাপ দিন চারি কাটিয়ে দিলে যা হোক। দুনো উৎসাহে ও খাটে,- খেটে এত তৃপ্তি ও আর কোনোদিন পায় নি,—চেহারা খারাপ হচ্ছে ব'লে ঝুনু অনুযোগ দেয় ব'লেই নিজের ওপর মায়া পড়ে। আপিসে হিসাব মেলায়,—আর মনে মনে কান পেতে শোনে, ট্রেনের চাকার সেই সুসম্বন্ধ অথচ কর্কশ ঘর্ঘর-ধ্বনি, সেই হাতের মধ্যে হাত ঢেকে রাখা,—সেই—

বাড়ি যখন ফেরে ওর চেহারার হাল দেখে মা হাল ছেড়ে দেন, কেঁদে ওঠেন—কি হয়েছিল তোর? ঐ এক টেলি ক'রেই আর কোনো খবর নেই। তুই কি কসাই?

প্রতাপের যেন বাড়ির কথাই মনে ছিল না। প্রতাপ মাকে প্রণাম করে, ছোট ভাই বোনগুলিকে একটু অকারণ আদর ক'রে— ভালই আছি এখন।

তিন চার বার বলে।

রোগশয্যা থেকে বাবা চেঁচিয়ে ওঠেন—গুয়োটা যেতে না যেতেই ব্যামোয় পড়ল। তখনই বলেছিলাম ঐ অজাত দেশে গিয়ে কাজ নেই। আর, এমন কি ব্যামোই হ'ল যে একেবারে বিছানা গাড়তে হ'ল! অলুক্ষুনে কোথাকার। এদিকে এত বড় দাঁওটা তো গেল ফস্‌কে,—ওরা অন্য জায়গায় ভিড়েছে। এবারে কলা চো'ষ—

প্রতাপ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু সংসার কি ক'রে চলবে?

বিধাতাই এর বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন,—একান্ত মামুলি ভাবে। আধুনিক কথাশিল্পীর মতো বিধাতারও আর মৌলিকতা নেই কোনো—

তিন দিনের আড়াআড়িতে তৃতীয় ও চতুর্থ বোন কলেরাতে মারা গেল হঠাৎ, —এক থালায় ব'সে দুই বোন একই বাসি খাবার খেয়েছিল।

কুড়ি টাকা করে আর জমাতে হয় না,—দুইটি গ্রাস বুজল, আয়ও বেড়ে গেল হঠাৎ। এ ক'দিন যতগুলি জমেছিল সেগুলিও বাবা একদিন তুলিয়ে আনলেন।

আপিস থেকে ফেরবার সময় মাঠে প্রতাপ অনেকক্ষণ জিরিয়ে নেয়,—এক দমকে অনেকগুলি কদম আর ফেলতে পারে না! শোকাচ্ছন্ন প্রদোষে ওর কালো, অর্দ্ধভুক্ত, অপরিচ্ছন্ন বোন দু'টির মুখ মনে পড়ে,—সংসারের সমস্ত উৎপীড়ন ও অপমান নির্ব্বিবাদে একান্ত অপরাধীর মতো বহন করতো ওরা,—একখানা ভালো কাপড় পরে নি কোনোদিন, মুখ ফুটে কোনো আবদার করে নি, মা'র সঙ্গে সঙ্গে রেঁধেছে, বাসন মেজেছে, কাপড় কেচেছে,—আর ওদের বিয়ে দিতে পরিবার সর্বস্বান্ত হ'বে এই ভয়ে বালিশে মুখ গুঁজে খালি কেঁদেছে। যদি ওরা বাঁচত,—প্রতাপ ভাবছিল—ওরা শত কুৎসিত হ'লেও ওদের হৃদয় কি আর কারু হৃদয় ছুঁয়ে বাজিয়ে ধন্য করতে পারত না?

ঝুনু ওকে একেবারে ওর তেতলার ঘরে নিয়ে এল, বিছানা পেতে দিলে,—বললে —শোও লক্ষ্মীটি, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি—

ঝুনুর মাথার ওপর একটা ভিজা লাল গামছা চাপানো,—চুলগুলি বোষ্টমিদের মতো ঝুঁটি ক'রে বাঁধা, একখানি সাদাসিধে আধ ময়লা পাৎলা শাড়ি পরনে—কুচকুচে কালো চওড়া পাড়, গায়ে শুধু একটা সেমিজ,—শাদা নয়, গোলাপী!

প্রতাপ ঝুনুর ফিটফাট নরম বিছানার ওপর গা এলিয়ে শোয়,—ঝুনু শিয়রে ব'সে অতি ধীরে ধীরে কাঁঠালচাঁপার কলির মতো কোমল ও শুভ্র ওর আঙুলগুলি বুলায় ভালোবেসে, আদর ক'রে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সমস্তটি হৃদয় যেন জলের মতো ঢেলে দিতে চায়।

গুঞ্জনক্লান্ত নিস্তব্ধ দুপহর—

প্রতাপ ওর মরা দু'টি বোনের কথা আস্তে আস্তে বলে,—মা শোকশয্যায় একান্ত শ্রান্ত,—এ ক'দিন ওকেই দু'বেলা রাঁধতে হচ্ছে, কিছু ভালো লাগে না আর,—কত দীর্ঘ দিনের মেয়াদ কবে ফুরোবে, কে বলতে পারে?

ঝুনু এক হাতে নিজের অশ্রু মোছে, অন্য হাতে ওর চোখ মুছে দেয়। প্রতাপ বলে—এ চোখে জল নেই—অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ তাই। এমনি তোমার হাত রাখ।

ঝুনুর ইচ্ছা হয় বলতে,—আমাকে নিয়ে চল তোমার বাড়ি, তোমাদের জন্য দুটো ভাত ফুটিয়ে দিয়ে আসি। মা'র সেবা করি,—তোমার।

বলতে পারে না।

প্রতাপের বলতে ইচ্ছা হয়,—আমাদের ঘর পচা নোংরা এঁদো—তবু, তুমি সেখানে যাবে ঝুনু? কেনই বা যাবে? কিন্তু যদি যাও—তোমার এই কল্যাণ-দৃষ্টি, এই স্নেহসুখস্পর্শ, এই নিকলুষ সেবা পেয়ে আমি হয়ত না খাওয়ার দুঃখও

ভুগতে পারব। কিন্তু তুমি?—ছিঃ, আমি একটা কি? বি, এ-টা পর্য্যন্ত পাশ করতে পারিনি। যে ঘাস কাটে, সে পর্য্যন্ত পারে।

পারে না বলতে!

শুধু, ঝুনু প্রতাপের ঘাড়ের তলা থেকে বালিশ দুটো সরিয়ে ওর মাথা নিজের প্রসারিত কোলের ওপর টেনে নেয়। পাখীর পালকের মতো কোমল ও উত্তপ্ত ঝুনুর বুকের ওপর মুখ রেখে প্রতাপ কাঁপে। ঝুনুর ঘুমন্ত যৌবন যেন ময়ূরের মতো সর্বাঙ্গে পেখম মেলে ধরে।

ঝুনু ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—একটা বাইক কি'নে নিলে তোমার খুব সুবিধে হবে। আমি টাকা দেব, মনোমত দেখে একটা কি'নে নিও। মোটর-বাইক্ কিন্‌বে?—সঙ্গে সাইড-কার?

দুই চোখে রহস্যময় ইঙ্গিত,—অথচ স্নেহে কি নমনীয়!

ঝুনু নিজে ওর মুখটা বুকের ওপর চেপে ধ'রে বলে তারপর—আর এবার থেকে একদিনও হেঁটে আপিস্ যেতে পাবে না যদ্দিন না বাইক্ হয়। ট্রামে করে' যেতে হবে। বাড়িতে একটা ঠাকুর রাখ সম্প্রতি, সেই রাঁধুক,—ঝি কি চাকর যা সুবিধা হয়, একটা রাখ বুঝলে? সব আমি দেব।

প্রতাপ চোখ তু'লে বলে—তুমি পাগল হ'য়ে গেছ নাকি? পাগলি!

—পাগলি মানে? আমার বাক্সে যে কতগুলি টাকা আছে পড়ে, তা কিসের জন্য শুনি? আর শোন, এবার থেকে আপিসেই টিফিনের বন্দোবস্ত ক'রো একটা—পেট ভরে যেন,—শরীর নিয়ে গাফিলি ক'রো না। আমি না হয় পাগলি, কিন্তু তুমি লক্ষীটি হ'য়ে আমার কথা শুনো কেমন?

বুকের থেকে ধীরে ধীরে প্রতাপের মুখ তুলে' একটু কি ভেবে বালিশের ওপর রেখে ও উঠে দাঁড়ায়। একটা আলমারি খু'লে কতকগুলি জামা বের করে বলে—তোমার জন্য এই কয়েকটা পাঞ্জাবি করেছি,—সেদিন ভিজে এসে যে জামাটা ছেড়ে গেছলে সেটার মাপে। আর এই কয়েকখানা রুমাল। খবরদার, তুমি কিন্তু একটুও আপত্তি করতে পারবে না,—ধোপাবাড়ি থেকে কাচিয়ে এনে গায়ে দিয়ে একদিন আসতে হবে কিন্তু—তোমার নেমন্তন্ন রইল।

সমস্তগুলি জামা ও রুমাল পরিপাটি ক'রে ভাঁজ ক'রে একটা খবরের কাগজ দিয়ে জড়ায়, পরে একটা লাল সুতো দিয়ে বাঁধে, বাড়তি সুতোটা দাঁত দিয়ে কাটে, থুতিয়ে মেঝের ওপর ফেলে দেয়।

এগুলি ঝুনু ব'সে ব'সে ওর জন্যেই তৈরি করেছে ওকে স্মরণ ক'রে,—মুগ্ধ হ'য়ে প্রতাপ তাই ভাবে,—ওর ছোট বোন দু'টির কথা আবার মনে হয়।

প্রত্যেকটি জামা ও রুমালের কোণে কোণে প্রতাপ ও ঝুনুর আদ্যাক্ষর দু'টি একত্রে গাঁথা আছে,—প্রতাপের চোখে তা এখনো পড়ে নি। তবু মুখ ফুটে বলতে পারে না ঝুনু।

তুমি বলতে পারবে না,—ভাষার বদলে বিধাতা মানুষকে এ অভিশাপ দিয়েছেন। বিধাতাও বলতে পারে নি।

ঝুনু ষ্টোভ্ ধরায়। নিম্‌কি ভাজে। বলে—আমার পাশে এসে বোস।

প্রতাপ ওর কাছে ব'সে বলে—তুমি রাঁধছ, আর আমি তোমার এত কাছে ব'সে আছি, এ কথা আমি ভাবতে পারছি না।

—আর, কা'র জন্যই বা রাঁধছি?

—আমার জন্য।

অস্ফুট দু'টি কথা,—কিন্তু যেন সম্পূর্ণ নয়।

দু' জনে খায় একসঙ্গে—খাইয়েও দেয়। আঙুলগুলি তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে ঝুনু একটু হাসে।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসে।

যাবার বেলায় ঝুনু বললে—দয়া ক'রে এই দশটা টাকা নিয়ে যাও,—

প্রতাপ দু'হাত স'রে গিয়ে বললে—তুমি কি বুদ্ধিশুদ্ধি খুইয়ে ফেললে নাকি?

ঝুনু তেমনি সহজ সুরেই বললে—মোটেই না। তোমার কষ্টের সময় বন্ধুর থেকে নিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করা উচিত নয়। আমি যে তোমায় বন্ধু—সখী।

—আমার যে কষ্ট, তা কি করে বুঝলে?

—সে বোঝবার অন্তর্দৃষ্টি আমার আছে,—তোমার নেই ব'লে? নাও এস এগিয়ে, পকেটে ফেলে দিচ্ছি। যে ক'দিন যায়। এস—

—ধার দিচ্ছ? ধার ত' আমি চাই নি।

—আমি কোনো জিনিসই ধার দিতে শিখিনি। আমার ব্যবসাদারি বুদ্ধি তত ধারালো নয়!

—তবে ভিক্ষা?

—ছিঃ, কি যে বল যা তা। এস, গুড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, তোমার মাথায় রুমাল বেঁধে দিই একটা। নাও, দুষ্টুমি ক'রো না। আপিসে টিফিনের একটা বন্দোবস্ত ক'রে ফেলো। পরে আর দু'চার দিনের মধ্যে—যাচ্ছ যে!

প্রতাপ বললে—তোমার কাছে অর্থ ভিক্ষা করতে আসি নি।

ঝুনুর দুই চোখ কান্নায় করুণ হ'য়ে এল—তোমাকে অপমান করলাম বুঝি? বা রে, আমি বুঝি তোমার পর? আমার কাছ থেকে বুঝি—

প্রতাপ চ'লে যায়।

কতদূর গিয়েই ফের ফিরে আসে। পা চলতে চায় না।

ঝুনু সেই বিছানায় উবু হ'য়ে শুয়ে আছে,—বালিশের উপর চুলগুলি এলো ক'রে দেওয়া,—সেমিজের ধার দিয়ে খোলা খানিকটা পিঠ—সারা মেঝেয় নোটটা টুকরো ক'রে ছেঁড়া।

খোলা পিঠের ওপর হাত রেখে প্রতাপ বললে—ওঠ, এবার যে তুমি দুষ্টুমি করছ! সত্যি সত্যিই পকেটে একটাও পয়সা নেই,—কি করে' যাব তবে? হেঁটে? সে যে অনেক দূর। ওঠ।

তারপর ঝুনুর ঘামে-ভিজা হাতখানি ধরে। আরো কিছু বলতে চায় হয়ত। হয়ত,—তোমার কাছে এইই চাই, তোমার হাত।—বলা যায় না।

ঝুনু কথা কয় না।

মেঝের থেকে নোটের কয়েকটা ছেঁড়া টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে প্রতাপ চলে যায়। পায়ে হেঁটেই।

*

ঝুনুর বাবার সঙ্গে প্রতাপের আলাপ সেই প্রথম,—যেদিন সবাই নীরেনকে জাহাজে তু'লে দিতে ঘাটে জড়ো হয়েছিল। তেজী টগবগে ঘোড়ার মতো নীরেন, প্রতাপের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—চললাম ভাই, তোমার চেনাগুনো সবাইকে আমার কথা ব'লো—গুরুজনদের প্রণাম দিও, চিঠি লিখলে জবাব দিতে ভুলো না।

সামান্য বি. এ. পাশ করতে পারে নি,—একেবারে বয়াটে; সামান্য একটা আপিসে রোখো চাকরি করে—প্রতাপকে দেখে ঝুনুর বাবা দস্তুরমতো বিরক্তই হ'লেন। প্রথমদর্শনে লোকের প্রতি ঘৃণাও হয়।

গাড়িতে উঠে ঝুনু বলছিল—তুমিও আমাদের সঙ্গে এস না প্রতাপবাবু, তোমাকে একেবারে নামিয়ে দিয়ে যাব।

বাবা বললেন—তা হ'লে আমার দেরি হ'য়ে যাবে।—বেশ বিরক্ত হ'য়েই বললেন।

রবিবারের দুপুরটা ঘুমে-ভরা, মোহময়। একটা সোফায় একটি কোণে দু'জনে ঘেঁষাঘেঁষি ব'সে আছে,—একটা কিছু করা ভালো বলেই ঝুনু সেলাই করছে,—আর প্রতাপ বিভোর হ'য়ে তাকে দেখছে, যেমন বিভোর হ'য়ে এক-একদিন ও অমাবস্যা রাত্রির আকাশ দেখে, নিবিড়শ্যাম অরণ্য দেখে।

ঝুনুর দেহের দুয়ারে ওর দেহ যেন বৈরাগী বাউলের মতো একতারা বাজিয়ে ফেরে।

ঘরের দোর ঠেলে যিনি এলেন, তিনি ঝুনুর জেঠতুতো বড়দা,—প্রথম পত্নী-বিয়োগের পর থেকে ব্রহ্মচারী আছেন ব'লে গর্ব করেন! তিনি হঠাৎ যেন কেউটে দেখেছেন,—মুখ চোখের ভাব এমনি।

সমস্ত রোদের গায়ে কে যেন কাদা ছিটিয়ে দিল,—কালি।

তারপর আর একদিন প্রতাপ যখন ঢুকছিল, ঝুনুর বাবা ওকে বেশ একটু রোখা কথায়ই জানিয়ে দিলেন,—কি দরকার আপনার বলুন,—আমরা ত' এখেনেই আছি।

জেঠতুতো দাদা ঝুনুকে শাসালেন, বললেন—আমার ঘর থেকে বাঁধানো গীতাখানা নিয়ে আয়, রোজ আমার কাছে পড়া দিতে হবে।

ঝুনু চোখ মুখ রাঙা ক'রে বললে—সে বইখানা ভুল ক'রে খোকার দুধ গরম করবার সময় পুড়িয়ে ফেলেছি।

বাবা যখন বিদেশে যান, তখন জেঠতুতো দাদাই ঝুনুর অভিভাবক,—সেই সূত্রেই তম্বি। বলেন—খবরদার যদি মিশিস্ যার তার সঙ্গে। একটা চুনোপুঁটিও না। তারপর লুকিয়ে দেখাশোনা? ইত্যাদি।

খাঁচার পাখী ঝুনু,—বাঙালী গৃহস্থের মেয়ে যেমন হ'তে হয়। সোনালি লতার মতো বাড়তে পেয়েছে,—এই যা, নইলে না আছে বিদ্রোহ, না বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা। কাচের বাসনের মতো ঠুনকো,—শুধু গরম চা খাবার জন্য! চুপ ক'রে ব'সে খালি জামা সেলাই করে নানান্ রকমের ছিটের, তসরের, কত কি, কবে দেবে এবং দেবেই বা কি না ভাবে; আর বিয়ের যে সম্বন্ধগুলি আসে, মনে মনে ওর সঙ্গে মিলায়।

শোবার আগে ঈশ্বরকে ডাকে—উনি যেন ভালো থাকেন, ওঁকে আর কষ্ট দিয়ো না, যদি পারেন আমাকে যেন ভু'লে যান একেবারে।

জানলায় বসে দূর পথের দিকে চেয়ে থাকে,—বহুদূরে পর্য্যন্ত ওর অম্লান শুভেচ্ছাটি পাঠিয়ে দেয়। রাতে শুয়ে ভাবে পাশে এসে উনি শুয়েছেন, আপন মনে আদর করে, মাথাটা তেমনি বুকের মধ্যে চেপে ধরে, কপালের ঘাম মুছে দেয়।

হঠাৎ ব্রহ্মচারী বড়দা একদিন বিয়ের জন্য খেপে ওঠেন। যেন খেপে ওঠাই স্বাভাবিক। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে,—জোয়ারের উল্টো টানে একা আর গুণ টানা হ'য়ে উঠবে না।

টাট্টু ঘোড়ার মতো বৌ,—টগবগ ক'রে ফেরে। মঠবাসিনীর বিলিতি সংস্করণ বুঝি!

চিঠি লিখে একটি ছেলেকে দিয়ে ঝুনু প্রতাপের কাছে পাঠাল।—তাতে লেখা, —তুমি একটিবার এস লক্ষ্মীটি, কতদিন তোমাকে দেখিনি। ভালো আছ ত? আমাকে বুঝি ভুলে গেছ,—একটিবারো দেখতে ইচ্ছা করে না? এসো, অনেক কথা আছে। বড়দা তো নিজে গিয়েই তোমাকে নেমন্তন্ন করে এসেছেন। এস,—

প্রতাপ গেল—অনেক রাত ক'রেই। দু'চারজন চেনা লোকের সঙ্গে মামুলি দু'একটি কথাবার্তা কইল, খেল, বাজে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও করতে হ'ল।

ঝুনু চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে,—কত কাজ ওর, সবখানেই ওর দরকার। কি সুন্দর সেজেছে,—বহুদিনকার আগের ঝুনুর সেই চেনা দেহলতা প্রতাপের কাছে অপূর্ব রহস্যময় লাগছিল। নতুন ক'রে ফের যেন চিনতে চায়। মুখে স্থির ঔদাসীন্যের ভাব,—প্রতাপকে দেখেও একটু কৌতুহল নেই, জিজ্ঞাসা নেই,—দুই মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে চাইবারো যেন ওর সময় নেই। ওকে যেন ঝুনু চেনে না।

একটা আলোতে প্রতাপ আবার সেই চিঠিখানা পড়ল।—এসো, অনেক কথা আছে।

ও কখন ওর অনেক কথা কইবে? সবই কি ধাপ্পা? প্রতাপ ভাবলে,— চ'লে যাই, প্রহসন তো পুরাই হ'ল এবার,—এবার পাল গুটোই।

অনেক কথা আছে—তারায় ভরা কালো আকাশও যেন ওকে তাই বলে।

একটা নির্জন ঘর বেছে নীচের তলায় প্রতাপ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গা এলিয়ে ব'সে ঘুমিয়ে পড়ে হয়ত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই যেন ওর অনেক কথা শুনবে। বাড়ি যাবার নামও মনে আসে না আর,—ওর বাড়ি ব'লে যেন কিছু নেই।

বরবধূর শুভরাত্রি আজ,—মুখর উৎসব সমাপ্ত হ'য়ে গেছে শুধু একটি গৃহ ছাড়া,—সে গৃহও নিশ্চয়ই আর ব্রহ্মচারীর নয়।

প্রকাণ্ড বাড়িটা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে ঝুনু সেই নীচের ঘরে এল। এসেই মুগ্ধ হ'য়ে গেল,—দুই চোখে জল ডেকে এল,—কি সুন্দর ঐ ঘুমটুকু! ওর ইচ্ছা করছিল একচুমুকে ঐ ঘুমটুকু ও পান ক'রে ফেলে,—এক চুমুকে এবারের এ জীবন!

ঝুনু ধীরে ধীরে প্রতাপের কাছে এসে দাঁড়াল,—অন্ধকারে মনে হল ও-ও যেন আর জেগে নেই। ও ধীরে প্রতাপের কপালে ওর হাতখানি রাখলে, জামার বোতামগুলি খুলে বুকের ওপর হাত রাখতেই সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে সেতারের

মতো ঝঙ্কার ক'রে উঠল,—বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অন্ধকারে ও যেন ওর আলাদা অস্তিত্বই ভু'লে গেছে।

প্রতাপের হাতখানি নিজের গালের ওপর রাখল, পরে জামার বোতাম খুলে নিজেরো বুকের ওপর। পরে প্রতাপের দু'টি পা স্পর্শ ক'রে অনেকক্ষণ প্রণাম করলে।

অথচ জাগাতে পারল না।

বিছানা পেতে ওকে শুতে বলবে ভেবে বিছানা আনতে চ'লে যায় ওপরে। ফিরে এসে দেখে প্রতাপ ঘরে নেই, উ'ঠে চ'লে গেছে।

দোরের পাশে মেয়েটিকে দেখে প্রতাপ নিশ্চয়ই তা'কে ঝুনু ব'লে ভুল করে নি। যদিও সেই সুচারুতা পেলব সর্বাঙ্গে,—যদিও ব'সে থাকবার ভঙ্গিটি দুঃখী বিরহিনীরই মতো।

পরিশ্রান্ত জীর্ণ শরীর বিছানার ওপর ঢেলে দিয়ে প্রতাপ খানিকক্ষণ জিরোয়,—মেয়েটি পায়ের কাছে বসে। কত দীর্ঘ দিন আর রাত্রি ও ঝুনুর দু'টি পা দেখে নি, দু'টি কথা শোনে নি,—নারীর নৈকট্যের জন্য ওর সমস্ত দেহ ভুখা, ভিখারী হ'য়ে উঠেছে।

মেয়েটির খস্‌খসে শুকনো বিবর্ণ হাতখানি টেনে এনে ওর কপালে রাখে, পরে জামার বোতাম খু'লে বুকের ওপর।

মেয়েটি এক ফাঁকে উঠে আলোটা কমিয়ে দিয়ে এসে ফের বসে। প্রতাপের সমস্ত দেহ পিচ্ছিল সরীসৃপের মতো ঘৃণায় কিল্‌বিল ক'রে ওঠে। জোর ক'রে বলে—আলোটা বাড়িয়ে দাও, ঐ আলোই তোমার অবগুণ্ঠন।

মেয়েটির সময়ের দাম আছে, তাই বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।

প্রতাপ ওর হাত টেনে নিয়ে অবুঝের মতো বলে—বন্ধু সখি—

উঠে চ'লে যায়। অন্য দোরে দোরে ফেরে,—ঝুনুকে পায় না।

বাড়িতে এসে শোনে,—একটি ছেলে ওর জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে আছে,—সেই কখন থেকে। ফুট্‌ফুটে ছেলেটি শুধোয়—আপনিই প্রতাপবাবু? আপনার একটি চিঠি আছে।

আলোর সামনে ধ'রে এক নিশ্বাসে ছোট্ট চিঠিটা প'ড়ে ফেলে।

—বাইরে তোমাকে খুঁজে না বেরিয়ে নিজের মধ্যে তোমাকে দেখছি। তোমার শরীর ভালো নেই, এই কেবল আমার মনে ডাক দিচ্ছে। এই ছেলেটির সঙ্গে দুটো লাইন লিখে পাঠিও। আশা করি,—এত তাড়াতাড়ি আমাকে ভুলে যাও নি। এই সঙ্গে তোমাকে একশোটা টাকা পাঠাচ্ছি,—তুমি নিয়ো, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি,—একটুও সঙ্কোচ ক'রো না লক্ষীটি। কেন নেবে না? আমি যে তোমার বন্ধু, পরমাত্মীয়,—তোমার বিপদ অভাব, সমস্ত আমারও। আমার টাকার ত' তা না হ'লে কোনো দামই নেই। নিয়ো,—এমনি ক'রেই তো আমাকে নেওয়া। প্রণাম নিয়ো।

মুখে যা আসে নি, কলমে তা এসেছে। আশায় যা আসে নি তা এসেছে ভালোবাসায়।

ছেলেটি পকেটের থেকে নোটের তাড়া বের করে, প্রতাপের হাতে তুলে দিতে চাইল।

প্রতাপ বললে—ও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ব'লো আমি বেশ ভালোই আছি।

ছেলেটি বললে—কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে গেলে পকেট কাটা যাবে, ঝুনু-দি ভয় দেখিয়ে দিয়েছেন।

—এত বড় পকেটমার থেকে যখন রেহাই পেলে, আর ভয় নেই!

—না, আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছেন, যদি ফিরিয়ে আনিস্, তবে তুই একটা আস্ত বোকা। আমি অত বড় অপবাদ সইব না। আমি বলেছিলাম—হ্যাঁ, টাকা দিলে কেউ আর নেয় না! নিন্।

—ব'লো, আমার ওসবের দরকার নেই কিছু। বেশ সুখেই ত' আছি।

—কিন্তু আপনার শরীর ত' খুব খারাপ দেখাচ্ছে; আপনার মা বল্‌ছিলেন প্রায়ই জ্বর হয় আপনার।

ঝুনুর সমস্ত স্নেহ ও করুণা যেন এই সুকুমার ছেলেটির চোখে এসে বাসা বেঁধেছে।

প্রতাপ ছেলেটিকে রাস্তায় অনেকদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দেয়,—নানান্ খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে,—সমস্ত দুপুর ঝুনু-দি কি করেন? নতুন বৌদির সঙ্গে খুব ফুর্তিতেই আছেন নিশ্চয়, দুপুরে আর কেউ বিরক্ত করতে যায় না ঘুম থেকে কখন ওঠেন, কখন শুতে যান্—কবে বিয়ে হবে?

পরে বলে—টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে ওঁকে ব'লো, প্রতাপ-দা তোমাকে ঢের ঢের

ধন্যবাদ জানিয়েছেন, ঐ টাকাটা যেন রেখে দেন, প্রতাপ-দা ম'রে গেলে যেন চিতায় ঐ দিয়ে ছোট্ট একটা স্মৃতিচিহ্ন রাখেন,—কিম্বা যেন আর কোনো সুযোগ্য বন্ধুকে যৌতুক দেন। বলতে পারবে? পারবে না?

ছেলেটি উত্তর দেয়—না। ওসব বুঝি কেউ কাউকে বলে?

বছর ঘুরে যায়,—দিনের পর রাত পোহায়। যতদিন না পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড বার্দ্ধক্যে ও জরায় অসাড় হ'য়ে যাবে।

আরো বছর ঘোরে।

কেউ কারো বিশেষ কোনো খবর পায় না, চেষ্টাও করে না রাখতে। খালি বেঁচে আছে, এইটুকুই বিশ্বাস করে। বেঁচেই যেন থাকে, যেন অনেক দুঃখভোগ করে,—প্রতাপ মনে মনে এই পার্থনা করে; আর ঝুনু মাঝে মাঝে ভাবে—সুখেই থাকে যেন, আমাকে যেন ভু'লে যায়,—আর ওঁকে কষ্ট দিও না। ভাগ্যের কাছে মূক মিনতি করে।

ঝুনু নিজেকে বোঝাচ্ছে,—কেন বিয়ে করব না? জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, দেদার মাইনে ও প্রতিপত্তি,—জীবনে কত স্বচ্ছন্দতা, কত আরাম, কি সুখশান্তিপূর্ণ বিশ্রাম, গর্ব, ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য,—কি অভূতপূর্ব তৃপ্তি! ওর মনের এই একান্ত মঙ্গলকামনাই কি যথেষ্ট নয়? দুপুরের খররৌদ্রে ফল পাকে বটে, কিন্তু বিকালের অন্তিম মুমূর্ষু মুগ্ধ আলোটির কি কিছু দাম নেই?—ওর বুক টন্‌টন্ ক'রে ওঠে,—ও ভাবে, প্রথম সন্তান জন্ম হওয়ার পরই বুক শীতল হ'য়ে যাবে। কামনার ধূপে আর ধূম থাকবে না।

দেহটা শুধু একটা দাম, মাশুল;—কিন্তু হৃদয় তোমাকে দিলাম,—মাগ্‌না। তোমাকে আমি পূজা করি, তুমি আমার শ্রদ্ধাশ্রুঅঞ্জলি নাও। আমার সুখের রাতে তোমার দুঃখের দ্বিপ্রহর বেশি যেন মনে হয়।

এম্‌নি করে'ই বোঝায়। চোখ ঠারে। এমনি করে'ই নদীর বুকে বালুচর জাগে।

অনেকগুলি সম্বন্ধ বাতিল ক'রে দেবার পর এবার ঝুনু আপনা থেকে মত দেয় হঠাৎ। বাবা ও জেঠতুতো দাদা অভাবনীয়রূপে বিস্মিত হ'য়ে সমস্বরে সুখসূচক শব্দ ক'রে ওঠেন।

বাড়িতে তুমুল তোলপাড় লাগে।

তুমুল তোলপাড় লাগে প্রতাপের হৃদয়েও।

কাঙাল গলিটার পারে এক হিন্দুস্থানি ছেলের বিয়ে হচ্ছে আজ,—দারুণ হল্লা বেধেছে। সব কি অকারণ, শ্রাবণের ঐ বোদা বোবা আকাশ থেকে মাটির এই অর্থহীন নিঃশব্দ বিস্তার!

বাপের বাক্স ভেঙে নিজেরই শেষ মাইনের টাকা দিয়ে কি একটা সাঙ্ঘাতিক জিনিস কিন্‌তে গিয়ে মদের বোতল নিয়ে এসেছিল। আজ রাতে আর তো কোন কাজ নেই,—ভাল ঘুমুনো যাবে।

খেতে পারে না, গলা জ্বলে যায়। ব'সে ব'সে ভাবে,—ওর দু'টি বোন্‌ একসঙ্গে ব'সে একথালায় খাচ্ছিল, সে ভাতে রোগের বীজাণু ঢুকল,—পরশু ওর চাক্‌রিটি গেছে। আপিসে নাকি এত বাড়তি কেরানির দরকার নেই। কেউ কেউ কলম ছেড়ে যেন কুড়ুল হাতে নেয়!

ঘরের এককোণে একটা ভাঙা তক্তপোষের ওপর পা মেলে দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে প্রতাপ ঘুমিয়েই পড়েছে হয়ত,—ভিজা হাওয়ায় দুর্বল দীপশিখাটি হারিয়ে গেছে। মধ্যরাত্রির অতন্দ্র নিস্তব্ধতা।

খোলা দরজা ঠেলে ঘরে কে যেন এল।

তারার অস্পষ্ট আলোতে খানিকক্ষণ সমস্ত ঠাহর ক'রে নিয়ে ঝুনু ধীরে বাতি জ্বালালে। প্রতাপের কাছে এসে সহজ সুরে বললে—ঘুমুচ্ছ? ওঠ, বিছানা পেতে দি, তারপর ভালো ক'রে শোও।

প্রতাপ চোখ কচ্‌লে জেগে ওঠে—

ঝুনু বলে ওরকম হাঁ হয়ে গেছ কেন? ভালো ক'রে শোও তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

সর্বাঙ্গে নববধূর অপূর্ব্ব অনিন্দ্য বিলাসসজ্জা,—মুকুলিত যৌবন রসসিঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

প্রতাপ বলে—আজ তোমার বিয়ে না?

লজ্জায় চোখ নামিয়ে বলে—হ্যাঁ—

—হয়ে গেছে?—হয় নি এখনো?

—এই ত' হ'চ্ছে। নাও, ওঠ,—তোমার গায়ে বেশ জ্বর আছে কিন্তু। কি খেয়েছ? শোন, তোমার কাছে এমনি কোন কাপড় আছে পরবার? দাও না, এগুলি ছাড়ি।

হাওয়ায় আবার বাতি নিবে যায়। জ্বালানো হয় না আর। মেঘের আড়াল থেকে ক্ষীণ ও ক্ষণিক তারার আলো ঝিকিমিকি করে।

ঝুনু বললে—ছোট জেঠতুতো ভাই,—পানু যে একদিন তোমার খবর নিতে এসেছিল, তারই সঙ্গে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

—আবার কখন যাবে?

—এইখেনেই থাকব। এই কথা ঝুনু বলতে পারলে না। আবার যাবার কথা কেনেই বা প্রতাপ জিজ্ঞাসা করল? ওর দুই ব্যাকুল বাহু দিয়ে ওকে বন্দী ক'রে রেখে দিতে পারে না?

পারে না।

ঝুনু বলে—পানু ভোর বেলা দাদাকে বলবে চুপি চুপি, দাদা আমাকে নিয়ে যাবেন। দাদা দিন তিনেক হ'ল ফি'রে এসেছেন জান না বুঝি? দাদা ছাড়া আমাকে অপমান থেকে বাঁচাবার কেউ নেই।

—আমি আছি। জোর ক'রে বুক ফুলিয়ে প্রতাপ বলতে পারলে না।

খালি বললে—দাদার সঙ্গে কোথায় যাবে?

—ইস্কুলের একটা টিচারি পেয়েছি। বা রে, ওঠ, বিছানা পেতে দিই। আমারো ঘুম পাচ্ছে খুব।

—কি হবে বিছানা পেতে? ঘুম যদি পেয়েই থাকে নেহাৎ, এখানে এলে কেন তবে? এখানে কেউই ঘুমায় না, এই নিয়ম। কত মাইনে পাবে?

—আপাতত তোমার সমান!

প্রতাপ বলতে চায়—আমার চাকরি গেছে। ভাবে, কি হবে ব'লে? হয় ত বা টাকা পাঠিয়ে দেবে।

ঝুনু বললে—তোমার কাপড় দিলে না?

—না। এই তুমি,—যদিও ইস্কুল-টিচারের মতো দেখাচ্ছে না। আচ্ছা, আজ রাতে একটা উৎসব করলে হয় না?

ঝুনু উৎফুল্ল হ'য়ে বললে—খুব চমৎকার হয়। কিন্তু তা'র আগে তোমাকে কিছু খাইয়ে নিলে ভাল হ'ত। রান্নাঘর কোথায়, আমাকে দেখিয়ে দাও,—দুধ আছে? উনুন ধরিয়ে একটু দুধ জ্বাল দিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু কি উৎসব করব?

—আমি তোমার বুকের কাছে শুয়ে ম'রে যাব—আর তুমি উলু দেবে।

ম্লানমুখী ঝুনু প্রতাপের হাতখানি নিজের কোলের ওপর টেনে নেয়, বলে—তুমিই দিয়ো।

আর কেউ কোনো কথা কয় না, হাতের মধ্যে হাত রেখে চুপ ক'রে ব'সে থাকে।

সেই ট্রেনের রাত্রির কথা মনে পড়ে,—এই ঘূর্ণ্যমানা পৃথিবী হঠাৎ কক্ষচ্যুত হ'য়ে গেছে, চোখের জলবিন্দুর মতো তারারা খ'সে পড়ছে, সূর্য্য ফাটা তুবড়ির মতো নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে, মৃত্যু উলঙ্গ হ'য়ে গেছে.—শুধু ওদের হাতের ওপর হাত,—যেন সৃষ্টির আদিকাল ও সমাপ্তিকাল পরস্পরকে আকর্ষণ করছে।

তিথি পূর্ণিমা বটে, কিন্তু মেঘাবগুণ্ঠিত।

প্রতাপের ইচ্ছা করে ঝুনুর ঐ মুখ, উত্তপ্ত বক্ষঃস্থল, বসনান্তরালের সমগ্র দেহের প্রতি রোমকূপ অজস্র মদির চুম্বনে পাণ্ডু ক'রে দেয়,—ঝুনুর ইচ্ছা করে রথের চাকার তলে মাটির ঢেলার মতো নিজের অস্তিত্বটা প্রতাপের বুকের তলায় গুঁড়া ক'রে ফেলে।

কেউই নড়ে না, শুধু তেমনি হাতের ওপর হাত মেলে রাখে। যেন সৃষ্টির আগের ও পরের দুই অপরিমেয় নিঃশব্দতার মহাসমুদ্র!

তারপর ভোর হয়। ঝুনু হঠাৎ বলে ঐ দাদা এসেছেন, আমি যাই।

প্রতাপ কোন কথা কয় না। দোর খু'লে ঝুনু ধীরে ধীরে চ'লে যায়।

পুনর্মূষিক

ক

একদিন অণু আসিয়া সব গোলমাল করিয়া দিল। শীতের বেলা; দেরি করিয়া ঘুম হইতে উঠিয়া কুমুদ শব্দ করিয়া চা খাইতেছিল, হঠাৎ অণু কোথা হইতে সোজা উপরে উঠিয়া আসিল।

কবি কীট্‌সের প্রণয়িণী ফ্যানি যখন ঘরে ঢুকিত তখন তাহাকে নাকি কবির চোখে ব্যাঘ্রীর মতই ভয়ঙ্কর সুন্দর মনে হইত; কুমুদ কবি নয়, তবুও একেবারেই আশা না করিয়া সহসা চোখের সামনে এতদিন বাদে অণুকে সশরীরে আবির্ভূত দেখিয়া সে পলক ফেলিতে পর্য্যন্ত সাহস পাইল না। কুজ্ঝটিকার মত প্রচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট ত' নয়ই, মনে হইল অণু যেন স্থির চাঞ্চল্যহীন একটা ঝটিকা—এখুনিই সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে।

হইলও তাহাই। হাত হইতে বাইশ-ইঞ্চির স্যুটকেশটা মেঝের উপর ফেলিয়া অণু কহিয়া কহিল,—চ'লে এলাম কুমুদ-দা, আসচি গৌহাটি থেকে। শান্তাহারে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ষ্টেশন-মাষ্টার জাগিয়ে দিলেন শেষে। শিলঙ-মেল ধরতে পারলুম না। সে ভারি মজাই হ'ল। বৌদি কোথায়? তুমি বিয়ে করলে শেষ কালটায়?

চায়ের বাটিটা নামাইয়া রাখিতে গিয়া খানিকটা চা টেবিলের সবুজ বনাতের উপর চলকাইয়া পড়িল; ডলিকে ডাকিয়া নেবু কাটাইয়া তাহার উপর ঘষিয়া-ঘষিয়া রঙটা ফিকা করিয়া তোলা যাইবে কি না কুমুদ সেই মুহূর্তে তাহাই ভাবিয়া লইতেছিল, অণু আরো একটু কাছে সরিয়া আসিয়া হাঁকিল,—চিনতে পাচ্ছ ত' আমাকে? বৌদিকে ডাক। তোমাদের বাড়িতে আজ আমি অতিথি।

কুমুদ কথা কহিতে পারিল,—গরিবের ঘরে তোমার পদার্পণ! কী মনে ক'রে হঠাৎ?

অণু কহিল, মাষ্টারি ছেড়ে দিলুম; যাচ্ছি দিল্লি। রেলোয়ে-বোর্ডে একটা মেয়ে-অফিসারের পোষ্ট খালি হয়েছে। দরখাস্ত করতেই কপালে লেগে গেল। মাইনে ত' বেশি-ই, তা ছাড়া ফ্রি ট্রাভলিঙ। কোথায় পেশোয়ার, কোথায় বা ডিব্রুগড়! বাবার তত মত ছিল না বটে, শেষকালে রাজি না হয়ে পারলেন না কিন্তু।

কুমুদ শুধু আস্তে কহিল,—কন্‌গ্রেচুলেশান্‌স্।

—ভাবলুম দিল্লির মুখে কলকাতায় দিন কতক থেকে যাব। হোটেল ছিল বটে, কিন্তু তোমার কথা ভারি মনে পড়ছিল। কতদিন পরে দেখা বল ত'? প্রায় সাড়ে তিন বছর? বি-এতে আমরা দু'জন ব্র্যাকেটে নাইন্‌টিন্‌থ্‌ হয়েছিলুম—এমন সচরাচর হয় না। ডাক না বৌদিকে। আমার সামনে বৌকে নাম ধ'রে ডাকতে লজ্জা করছে বুঝি!

পাশের একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া কুমুদ কহিল—বোস। ডলি এখুনি আসবে। নীচে তরকারি কুটছে হয় ত'।

চেয়ারে বসিবার আগে অণু তাহার গা হইতে পাৎলা ছাই-রঙের শালখানা নামাইয়া রাখিল—যেন কুয়াসার আবরণ সরাইয়া আকাশ নির্মল, উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বসিয়া কহিল,—আমার কিন্তু ভারি খিদে পেয়েছে, কুমুদ-দা। ট্রেন মিস করেছি শুনে পাশ বদলে ভালো ক'রে ঘুমিয়ে নিলুম শুধু। তারপর খাওয়ার আর সময় হ'ল না। বৌদিকে ব'লে এস আমারো জন্যে তরকারি চাই। চা'ল দেড় বাটি নিতে ব'লো।—আমি কিন্তু বেশ খেতে পারি।

সামান্য কৌতুক বোধ করিয়া কুমুদ কহিল,—ন'টার সময়েই রোজ আমার আপিসের বেলা হয় কি না—তাই এই সকাল থেকেই রান্নার সরঞ্জাম হচ্ছে। তোমাকে দেখে ভারি খুসি লাগছে, অণিমা। নাম ধ'রে ডাকলুম—

হাসিতে ঈষৎ একটু ইঙ্গিত করিয়া অণু বলিল,—অণু ব'লে ডাকা উচিত ছিল। তা হ'লে আরো খুসি হ'তুম।

কথোপকথনটা হঠাৎ থামিয়া গেল দেখিয়া এই ক্ষণস্থায়ী স্তব্ধতাটা অতিমাত্রায় অবাঞ্ছনীয় মনে হইতে লাগিল। তাই অণুই পুনরায় প্রশ্ন করিল,—বিয়ে করেছ কত দিন?

বুঝিল, প্রশ্নটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটাকে নষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই।

অল্প একটু হাসিয়া কুমুদ কহিল,—প্রায় সাত মাস পুরো হ'য়ে এল।

এইবার কথার মোড় ফিরিয়াছে। আর অসাবধান হইবে না ভাবিয়া এইবার অণু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। কহিল,—আছ বেশ?

এই প্রশ্নটাও এমন হইল যে, যেন ইহার উত্তরে একটা শ্লেষাত্মক বা অসন্তোষ-জনক কোনো কথা পাইলে অণু খুসি হয়। সে প্রত্যাশাও করিয়াছিল তাহাই। বিবাহের অন্তরালে যে একটি অনাবিষ্করণীয় রহস্য থাকে তাহার মোহভঙ্গ ঘটিতে সত্য মানুষের পক্ষে এক মাসের অবারিত সান্নিধ্যই যথেষ্ট। তাহার পর যাহা থাকে তাহা সাংসারিক সুবিধার জন্য দৈহিক একটা নৈকট্যমাত্র। এই চেতনা হইতে মনে স্বভাবতই যে একটা হতাশা বা অতৃপ্তির ছায়া পড়ে তাহারই একটা

আভাস কুমুদের কথায় পাইবে বলিয়া অণু ধরিয়া লইয়াছিল। কিন্তু কুমুদ যাহা বলিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

কুমুদ কহিল,—সত্যিই খুব ভালো আছি।

পরিপূর্ণ, সুস্পষ্ট উত্তর—অণুর আশঙ্কাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই যেন কুমুদ ঐ ছোট্ট কথাটুকুর মধ্যে এতখানি আবেগ ঢালিয়া দিয়াছে। অতএব বাধ্য হইয়াই তাহাকে সায় দিতে হইল—সুন্দর বাড়িটি কিন্তু। দু'জনের পক্ষে আইডিয়েল্। কত ভাড়া?

—বিয়াল্লিশ।

—মাইনে কত পাও? জিজ্ঞাসা করাটা ঠিক হ'ল না মনে করো না। তোমার সব কথা আমার এত জান্‌তে ইচ্ছে করে।

—না, না। মাইনে যদিও বেশি নয়, বলতে আমার লজ্জা নেই। একশো টাকা। আমার ভাগ্য বলতে হ'বে। সুবোধকে চিনতে ত'? সেই যে হিস্‌ট্রিতে সেকেণ্ড হয়েছিলো—বেহারের এক সাব্‌ডিভিসনে মাষ্টারি ক'রে মোটেই পঁয়ত্রিশ টাকা পায়! পাশ ক'রে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছিল। তিন বছরে পণের নগদ টাকা বা দান-সামগ্রীর চিহ্নও নেই—অথচ দু'টি শিশু আছে। কী কষ্টে যে আছে। কিন্তু বউটি ওর সত্যিই সোনার টুকরো মেয়ে—সেই ওর সান্ত্বনা। আমি যে গিয়েছিলুম ওর কাছে একবার।

এত সব দারিদ্র্য ও অভাবের বর্ণনা এমন তৃপ্তিসহকারে দেওয়া যায় ইহা অণু কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। নিদারুণ নিরানন্দতার মাঝে কতগুলি নির্দোষ শিশু আহ্বান করিয়া তাহাদের ভয়াবহ লাঞ্ছনাকে কুমুদ পরোক্ষে সমর্থন করিতেছে ভাবিয়া তাহার উপর অণুর রাগ হইল। কহিল,—দারিদ্র্য একটা নিদারুণ অপরাধ, যখন সে দারিদ্র্য আমরা জোর ক'রে অন্যের উপর আরোপিত করতে চাই।

ইঙ্গিতের প্রাখর্য্যটুকু ধরিতে কুমুদের দেরি হইল না। কহিল,—জানি সুবোধকে সহানুভূতি করবার অধিকার নেই, কেননা আমিও একদিন হয়ত তার চেয়েও নীচে ডুবে যাব। তবুও এই ভরসা রাখতে এখনো বল পাই যে ডলি আমার চিরকালের আশ্রয়স্থল হ'য়ে থাকবে।

একটু থামিয়াই তাড়াতাড়ি কুমুদ কথাটাকে পাল্‌টাইল—ডলিকে ডাকি। ওকে নেপথ্যে রেখে তোমার প্রতি আতিথ্য দেখানোয় কোনো মানে নেই!

ডলিকে ডাকিতে যাইবে অণু বাধা দিল, বলিল,—তুমি আজ আপিস যেতে পাবে না।

কুমুদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—কেন বল ত?

—আমার সঙ্গে দুপুরে তোমার বেরুতে হ'বে। অনেক কেনাকাটা করতে হ'বে—তা ছাড়া বিকেলে একবার বেলুড় যেতে হ'বে সেখানে আমেরিকা থেকে একটি টুরিষ্ট এসেছেন—মিষ্টার হেইলি—তাঁর সঙ্গে আমার দিল্লি যাবার আগে দেখা করা চাই। কালকে সময় হ'বে না, কালকে সন্ধ্যায় নিউ-এম্পায়ারে উদয়-শঙ্করের নাচ দেখতে যাব।

কুমুদ ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া অণু অসহিষ্ণু হইয়া কহিল,—একদিন আপিস কামাই করলে তোমার একশোর এক-টা মিলিয়ে যাবে না নিশ্চয়। (মোহমাখা সুরে) কত দিন পরে দেখা বল ত? পুরোনো বন্ধুর জন্যে এতটুকু স্বার্থত্যাগ করলে তোমার জাত যাবে না।

কুমুদ স্বচ্ছন্দে কহিল—বেশ, যাব না আজ আপিস। কিন্তু ডলিকে তা হ'লে বলা দরকার।

দরকার ছিল না, ডলি নিজে আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমত ঘুম হইতে উঠিতেই প্রচুর আলস্য, তাহার পর স্নানাহার সারিয়া তাড়াতাড়ি যে আফিসে যাইতে হইবে সে-কথা পর্য্যন্ত বেমালুম ভুলিয়া গিয়া হয়ত আরেক কিস্তি ঝিমাইতেন—সেই বিষয়ে স্বামীকে সচেতন করিতে ডলি তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে নিমেষে তাহার সকল বুদ্ধি ঘুলাইয়া উঠিল। পাশাপাশি দুইটি চেয়ারে বসিয়া স্বামী ও আরেকটি যুবতী বেশ অন্তরঙ্গ হইয়া কথা কহিতেছেন। ডলি চোখের দৃষ্টিকে তীক্ষ্নতর করিয়া অণুর ললাট, সীমন্ত ও পদপ্রান্ত দেখিয়া লইল—তাহাতে কোথাও একটু অনুরঞ্জনের চিহ্ন নাই। ব্যাপারটা তাহার কাছে সুবিধার মনে হইল না; হঠাৎ সে যেন একটা মূক-লোকে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে, কেন না তাহার আসার আভাস পাইয়াই তাহারা সচকিত হইয়া থামিয়া পড়িয়াছেন? যেই কথাটা বলা হইতেছিল ডলির নিকটবর্ত্তিতায় তাহা অসমাপ্ত রাখা যেন সমীচীন হইবে।

অণুকে অবশ্য বলিয়া দিতে হইল না, তবু এই একরত্তি মেয়েটিকে বৌদি বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতে তাহার হাত উঠিল না। ছয়ছোট্ট মানুষটি, মুখে চোখে গৃহপালিত পশুর মত একটা নিরীহ ভাব,—অণুকে দেখিয়া নিমেষে সঙ্কুচিত ব্রীড়ামন্থর হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া অণু কুমুদের রুচিকে সর্বান্তঃকরণে প্রশংসা করিতে পারিল কৈ? এত অল্প বয়সের খুকিকে লইয়া সে কী করিবে? মেয়েটি বোধহয় ম্যাট্রিকটাও পাশ করে নাই—বিলেতে যে এই বৎসর আবার গোল-

টেবিলের বৈঠক বসিবে তাহার খবরটুকুও হয়ত রাখে না, কিং আর্থার-এর কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম—তবু এমন একটি সাদাসিধে আটপৌরে বউ নিয়া কুমুদ দিব্যি গদ্‌গদ হইয়া বলিয়া ফেলিল যে সে তোফা আছে! ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে স্পেন্সারের এ মত খণ্ডন করিবার পক্ষে এই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

এই অশোভন অবস্থাটা কুমুদ বেশিক্ষণ স্থায়ী হইতে দিল না। চেয়ার হইতে উঠিয়া অণুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—চিন্‌তেই ত' পাচ্ছ। আর (ডলির প্রতি) ইনি আমার কলেজের বন্ধু-এক সঙ্গে বি. এ পাশ করেছি। হঠাৎ আজ আমাদের এখানে অতিথি হয়েছেন।

ডলির মুখের বিস্মিত ভাবটা দেখিয়া অণু বিরক্ত হইল; বুঝাইয়া দিল—আমরা স্কটিশ-এ পড়তুম। পুরো চার বছর। তার পর ছাড়াছাড়ি। তিন বছরের ওপর। তুমি বুঝতে পারলে না? স্কটিশ চার্চ কলেজে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। তুমি চমকে উঠছ যে। হি হি হি। (কুমুদের প্রতি) জান, কল্যাণী সিটিতে পড়ত, সেখানে ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুতা করায় অসুবিধে ছিল ব'লে তার আপশোষের শেষ ছিল না। সরস্বতী পুজো নিয়ে যে গোলমাল চলছিল সেই অজুহাতে কল্যাণী স্কটিশ-এ এসে ভর্তি হ'ল। বন্ধু জুটল প্রোফেসার। এমন ছ্যাবলা প্রোফেসার তুমি আর দেখেছ?

এই সব তুচ্ছ কথাবার্তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ডলি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া স্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি আজ আফিস যাবে না? ঘড়িটা যে রোজ স্লো যায় তা তুমি রোজই ভুলে যাবে নাকি?

অণু বুঝিয়াছিল তাহার আসাতে এই নবপদস্থা গৃহিণীটি অতিমাত্রায় আপ্যায়িত হয় নাই, তাহা ছাড়া অতিথি-সমাগমের উপলক্ষ্যে কতটুকু শিষ্টাচারিণী হইতে হয় তাহাও সে শিখিয়া রাখিতে ভুলিয়াছে,—কিন্তু এই খুকির ব্যবহারে সে অপমানিত হইবে, অণু এতটা অভিমানিনী নয়। তাহার রসনা প্রখর, মেরুদণ্ড শক্তিশালী। তাই কথায় অবজ্ঞা মিশাইয়া সে কহিল,—কুমুদ আজ আমাকে নিয়ে একটু ঘুরবেন। আজকে আফিস কামাই করতেই হ'বে। তাড়াহুড়ো ক'রে লাভ নেই।

ঐ ভাষাটাকেই স্নিগ্ধ করিয়া কুমুদ বলিল—উনি দিল্লি যাবেন—পথে এখানে একদিন জিরোবেন। তুমি ওঁর জন্যেও রান্নার জোগাড় কোরো। কানাইকে বাজারে পাঠাও।

ডলি কহিল,—কানাই পোষ্টাপিসে গেছে। তুমিই বরং বাজারটা ঘুরে এস।

কুমুদ খুসি হইয়া বলিল,—আচ্ছা, তাই বেশ। তোমরা ততক্ষণ গল্প কর। ঘরে খুব সম্ভ্রান্ত অতিথি এসেছেন, তাঁর যেন অযত্ন না হয়, ডলি।

কুমুদকে নিরস্ত করিতে গিয়া অণু তাহার হাতটাই একটু ছুঁইয়া ফেলিল,—তাহা ডলির দৃষ্টি এড়াইল না। কুমুদ চলিয়া গেলে এই গ্রাম্য মেয়েটাকে লইয়া সে কী করিবে—মনের মত করিয়া একটাও কথা বলা যাইবে না! সে কি এই মেয়েটার সঙ্গে বাজার-দর বা ব্লাউজের প্যাটার্ণ লইয়া তর্ক করিতে টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়াছে নাকি! একটা শাড়ি পরিয়াছে—মশলা আর ময়লায় মাখামাখি। বাড়িতে কেহ অভ্যাগত আসিলে তাহার সম্মুখে আসিবার সময় যে শাড়িটা বদলাইয়া লইতে হয় এই সামান্য সুরুচিটুকু পর্য্যন্ত তাহার নাই। অঙ্গ-সৌষ্ঠবেও যদি মেয়েটা সমৃদ্ধিশালিনী হইত তবুও না হয় কুমুদের পৌরুষ-গর্বকে ক্ষমা করা যাইত। সময়ের মূল্যজ্ঞান সম্বন্ধে কতদূর অবিবেচনা থাকিলে এই জাতীয় মেয়েকে লইয়া রাত্রির পর রাত্রির অমূল্য মুহূর্তগুলি অকাতরে অপব্যয় করা যায় তাহা বুঝিয়া কুমুদের প্রতি তাহার করুণার অন্ত রহিল না। এ মেয়েই নাকি কুমুদের চিরকালের আশ্রয়স্থল হইয়া থাকিবে! এমন দ্রুত নৈতিক অধঃ-পতনের কথা কোথাও পড়িয়াছে বলিয়া অণুর মনে হইল না।

—একটা দিন, বাজার যেতে হবে না তোমাকে। কত দিন পরে দেখা। কত গল্প বাকি প'ড়ে আছে। (ডলির প্রতি) তুমি যাও, কানাই এলে তাকেই পাঠিয়ো। তাড়া ত' নেই কিছু।

ডলি স্বামীর চেয়ারটার আরো সমীপবর্ত্তী হইল—স্বামীর বন্ধুনীর কথায় সে ঘর ছাড়িয়া যাইবে? কিন্তু স্বামীও যখন কহিলেন—অণুর জন্যে চা ক'রে নিয়ে এস, তখন স্বামীও তাহাকে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিতেছেন ভাবিয়া সহসা ডলির পায়ের নীচে সমস্ত মেঝেটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। গভীর অভিমানে মুখখানা ম্লানতর করিয়া টেবিলের উপর হইতে চায়ের বাটিটা কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চৌবাচ্চার সঙ্কীর্ণ জায়গাটুকু লইয়া যে একটি ছোট বাথরুম বানানো হইয়াছে তাহারই দুয়ারে, স্নান করিতে যাইবার সময় অণুর সঙ্গে ডলির একান্তে দেখা হইয়া গেল। পরম শত্রুতা না থাকিলে সেইখানে একটাও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকা মানুষের সাধ্য নয়; তাই অণু একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল,—তুমি কদ্দূর পড়েছ?

নিতান্তই ডলির শিক্ষাভিমান ছিল না বলিয়া এমন একটা প্রশ্নের উত্তরে কিছুই শ্লেষ বাক্য না বলিয়া সোজা উত্তর দিল—বানান না ক'রে কিছু-কিছু পড়তে পারি। ও-সব বিষয়ে মা'র একেবারেই ঝোঁক ছিল না, নিজ হাতে রাঁধতে শিখিয়েছেন খালি। বলতেন, রান্নার চেয়ে উঁচুদরের কারুবিদ্যা মেয়েদের আর কিছু শেখবার নেই।

অণু যে নেহাৎই শিক্ষয়িত্রী তাহা তাহার নীচের কথাগুলি হইতে বুঝা গেল। বলিবার সময় বাম ভ্রূটিও সে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু একটা বাসন মাজিতে ব্যাপৃত ছিল বলিয়া তাহা ডলির চোখে পড়িল না।

—বল কি? খালি রান্না! লেখাপড়া না শিখে একটুও না বেড়ে জড়পুটলি হ'য়ে ব'সে থাকলে স্বামীর কাছে যে দু'দিনে ফুরিয়ে যাবে। যার বুদ্ধি নেই, তার প্রাণও নেই!

বক্তৃতাটা আরও দীর্ঘকায় হইত, কিন্তু ডলি তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া সোজা উপরে আসিয়া কুমুদের হাত হইতে শেইভিং ব্রাশটা কাড়িয়া লইল। বলিল,—তোমার আজ বেরুনো চলবে না।

কুমুদ চমকিয়া কহিল—তার মানে?

—মানে একটুও অস্পষ্ট নয়। মিথ্যেমিথ্যি আপিস কামাই করলে। বরং দুপুরে আজ ঘুমোও।

কুমুদের উদ্বেগ বাড়িল। ঢোঁক গিলিয়া কহিল—কি হয়েছে বল ত?

ডলি একটুও লুকোছাপা করিল না—স্বামীর সঙ্গে মোটেই তাহার সেই সম্পর্ক নয়। স্বামীর চুলের মধ্যে হাত ডুবাইয়া সে কহিল—ওঁর কথাবার্তা আমার একটুও পছন্দ হচ্ছে না, চালচলন ত দস্তুরমতো চোখে ঠেকে। কে উনি তোমার যে এক কথায় আপিস কামাই করলে?

কুমুদের বুঝিতে দেরি হইল না, কিন্তু ডলির এই সন্দিগ্ধ কথাগুলিতে তাহার সঙ্কীর্ণচিত্ততার আভাস পাইয়া সে মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কহিল—তুমি তাকে অপমান করেছ বুঝি? খবরদার ডলি।

ডলি একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। স্বামী তাহাকে তিরস্কার করিলেন তাহাতে তাহার দুঃখ ছিল না, কিন্তু সেই তিরস্কার করিবার প্রচ্ছন্ন হেতুটা তাহার চোখে এমন বিসদৃশ হইয়া দেখা দিল যে, সে নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না; চোখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কুমুদ তাড়াতাড়ি তাহাকে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া বহু কষ্টে মুখ হইতে বস্ত্রাঞ্চল সরাইয়া তাহার গালে অনেকগুলি চুমা খাইয়া ফেলিল। সামনেই

আয়নাটা খোলা ছিল—তাহাতে নিজের মুখের চেহারা দেখিয়া ডলি না হাসিয়া আর থাকিতে পারিল না।

খ

কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়।

স্বামী তাহাকেও তাঁহাদের সঙ্গে খাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু খাইবার পর তাঁহার অনুচারিণী হইয়া বাহির হইবার অধিকার ত তাহার নাই! অন্যদিন স্বামীর সঙ্গেই সে স্নান সারিয়া লইত, তিনি আপিসের জামা-কাপড় পরিতে উপরে গেলে তাঁহার পরিত্যক্ত থালাতেই সে ভাত বাড়িয়া খাইতে সুরু করিত—কতদিন সেই এঁটো মুখেই তিনি নীচু হইয়া চুমা খাইয়া পরে আবার জলের গ্লাশটায় এক চুমুক দিয়া বারে বারে পিছন তাকাইতে তাকাইতে বারান্দা-টুকু পার হইয়া যাইতেন। আজ তাহার কিছুই হইল না। একটা দিনও পুরা নয়—অথচ সব যেন কেমন অন্যরকম হইয়া গেছে। দশটা বাজে— অথচ এখনো তাহার স্নান হয় নাই; ইহা বিশ্বাস করিতে তাহার নিজেরই যেন সহিতেছিল না।

রান্নাঘরে ডলি দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া হেঁট হইয়া যেন নিজের লজ্জা লুকাইতেছে। উনুনটা তখনো জ্বলিতেছিল—জ্বলুক। কয়লা বাঁচাইতে তাহার ইচ্ছা নাই। বেরালটা যে বাটি হইতে একটা মাছ লইয়া উধাও হইল, তাহা জলজ্যান্ত দুইটা চক্ষু দিয়া দেখিয়াও তাহার হাত উঠিল না। কানাই আসিয়া যে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া তাহার চুল ছাঁটিবার জন্য পয়সা চাহিতেছে, সে-কথায় কান পরে দিলেও চলিবে।

ডলির দুঃখের আজ আর পার নাই। স্বামীর কাছে সত্যই সে ফুরাইয়া গিয়াছে বুঝি। সে না চটুল, না বা প্রগল্‌ভ। তাহার না আছে বিভ্রম, না বা লীলা! সে নেহাৎই ব্যক্ত, সীমাবদ্ধ—একেবারেই নিজেকে সে ধরা দিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে তাঁহার আর নিশ্চয়ই ভাল লাগে না। সামান্য শাড়ি পরিবার বা খোঁপা বাঁধিবার সুচারু কৌশলটুকু পর্য্যন্ত তাহার জানা নাই— সে বোকার মত কপালের উপর প্রকাণ্ড একটা গোল করিয়া সিন্দুর পরে বলিয়াই স্বামীই কতদিন ঠাট্টা করিয়াছেন। তাই আজ বিধিদত্ত বন্ধু পাইয়া তিনি হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন আর কি! আপিস করিবার কথা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে রহিল না।

সেইবার পূজার আগে ডলির ডেঙ্গু হইয়াছিল—সে কী জ্বর, সমস্ত গায়ে অসহ্য ব্যথা। ডলির ভারি ইচ্ছা হইতেছিল স্বামী সমস্তদিন কাছে বসিয়া থাকেন। যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকিবে ততক্ষণ আদর করিবেন, ঘুমইয়া পড়িলে

গায়ের খুব কাছে ঘেঁসিয়া চুপ করিয়া না-হয় বই পড়িবেন। মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস হয় নাই—তিনি সেদিন রোগী সেবার খাতিরে তাঁহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া তাহাকে হয় ত' আজিকার তুলনায় সুখী-ই করিয়াছিলেন। আজ কত অনায়াসে দিব্যি পান চিবাইতে-চিবাইতে বাহির হইয়া পড়িলেন,—আপিস আজ সহসা বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা ভলি কবে ভাবিতে পারিয়াছিল। একবার তাহার ছোটকাকা চিকিৎসা করাইতে কলিকাতা আসিলে স্বামী তাঁহার সঙ্গে দেখা করাইবার জন্য তাহাকে বাগবাজারে নিয়া গিয়াছিলেন। বাস-এ উঠিয়া অভ্যাসবশত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল বলিয়া চাপা গলায় স্বামীর সেই তিরস্কার সে ভোলে নাই। নতুবা, কোথায় বা বেলুড়, কোথায় বা মার্কেট, কোথায় বা ষ্টার থিয়েটার—কিছুই সে খবর রাখে না। স্বামী আপিস হইতে বাড়ি ফিরিয়া চা খাইয়া দাবা খেলিতে বাহির হইতেন, ভলি ঘরে বসিয়া পরের দিনের জন্য স্বামীর জুতায় কালি লাগাইত, জানালার পর্দা সেলাই করিত, কখনো বা স্বামী গায়ে ঠেলা দিয়া জাগাইবেন আশা করিয়া মিছামিছি বিছানার উপর চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিত।

রান্নাঘরে এঁটো বাসন-পত্রের মধ্যখানে ভলি চিত্রার্পিতের মত নির্বাক, স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কোনো কাজেই তাহার হাত উঠিতেছে না। চাকরটা পয়সার জন্য তাড়া দিয়া কখন অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহার খেয়াল নাই। এগারোটা বাজিলেই যে সকালবেলার টিউশানিগুলো সারিয়া ঠাকুরপো আসিয়া ভাত চাহিবেন, সে-বিষয়েও তাহার মনোযোগ ক্ষুন্ন হইয়াছে। চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে ইহা একবার অনুভব করিয়া সে আর বারিধারাকে নিবারণ করিতে পারিল না।

গ

রাস্তায় নামিয়াই অণুর অনুরোধে ট্যাক্সি লইতে হইল। ঠিক হইল, মিউজিয়ামে নতুন বাঙালী শিল্পীর যে-সব ছবি প্রদর্শিত হইতেছে, প্রথমত সেগুলির রসসন্ধান করিতে হইবে, পরে দুইটার সময় বিশেষ-অভিনয় উপলক্ষে থিয়েটারে যে একটা নতুন নাচের প্রবর্ত্তন হইয়াছে সেইখানে তাহা দেখিয়া অজন্তা-গুহার চিত্রাবলীর সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করা যাইবে—বেশিক্ষণ থাকা পোষাইবে না। পিপাসা পাইলে কোথাও নামিয়া কিছু আইস্-ক্রিম খাওয়া যাইবে, তাহার পর গড়িমসি করিয়া বড়বাজার ষ্টিমার-ঘাটে গিয়া সন্ধ্যার ষ্টিমারে বেলুড়মঠে যাওয়া যাইবে'খন। ফিরবার তাড়া নাই, খানিকদূর হাঁটিয়া আসিলেই বাস পাওয়া যায়—তা ছাড়া গঙ্গায় নৌকা ত' আছেই!

রাত্রি আটটার সময় নৌকা করিয়া কুমুদ আর অণু বাড়ি ফিরিতেছিল।

নিয়মের অতিরিক্ত এই অস্বাভাবিক জীবনের মাদকতায় কুমুদ বিভোর হইয়া পড়িয়াছে—এই দিনটি সে বাঁচিতে পারিল ভাবিয়া সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছে না। অণু যেন আবার তাহার পুরাতন যৌবনের পরিপূর্ণতার স্বাদ বহন করিয়া আনিয়াছে তপ্ত উজ্জ্বল দেহে, মদিরায়ত মোহময় চক্ষু দুইটিতে! সমস্ত সংসারে সে অণুর জন্য একটুও স্থান করিয়া রাখে নাই!

যে-সন্দেহটা সমস্ত দিন ধরিয়া সঙ্গোপনে অণুকে পীড়া দিতেছিল তাহা গঙ্গার উপরে এই নীরব মুহূর্ত্তে আবার উচ্চারিত হইল। যেন কাতরকণ্ঠে সে আবার প্রশ্ন করিল,—বিয়ে করে' সত্যিই ভাল আছ, কুমুদ?

আগের কথার সঙ্গে এই প্রশ্নটা পারম্পর্য্য রক্ষা করে নাই বলিয়া ইহার অন্তরালের প্রচ্ছন্ন বিষাদটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এইবার কুমুদকে আমতা-আমতা করিয়া বলিতে হইল—তেমন কি আর ভাল আছি? কোনোরকমে নিঃশ্বাস নিচ্ছি মাত্র।

এইবার এই বিশ্বাস করিতে কুমুদ তাহার বিবেকের সম্পূর্ণ সায় পাইল যে, সত্যিই সে ভাল নাই। সে এতদিন একটা কঠোর ও কৃত্রিম নিয়মের দাসত্ব করিয়াছে, স্ত্রীকে ভাল না বাসিলে সংসারে যাবতীয় অসুবিধা ঘটে—তাহার জন্যই সে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে অকৃপণ ছিল—এবং এখন তাহার মনে হইতে লাগিল স্ত্রীর সাহচর্য্যে সত্যই সে দিনে-দিনে দরিদ্রতর হইতেছে। তাহার যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল সব এখন নিঃশেষিত, নিজেকে নূতন করিয়া দান করিবার তার তাগিদ নাই বলিয়া নূতন করিয়া নিজেকে অর্জন করিবার অণুপ্রেরণাও আর নাই। বস্ত্র দিয়া যেমন দৈহিক নগ্নতা নিবারিত হয়, যেন তেমনি করিয়াই স্ত্রীর প্রেমে, সে তাহার চরিত্র রক্ষা করিতেছে। এই খুঁতখুঁতে চরিত্রের মূল্য কিছু আছে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

তাই সকালে যাহা বলিয়াছিল সন্ধ্যায় কুমুদ তাহার উল্টা কথা বলিয়া বসিল। কহিল,—একলা থাকার মত জীবনের বড়ো ঐশ্বর্য্য সত্যই কিছু আর নেই, অণু। আমরা বড়ো সহজে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ি—তার পর বিয়ে নামক নেশা না করলে আমরা আর টিকতে পারি না। দিন কয়েকের জন্য স্নায়ুগুলো খুব সতেজ এবং রক্ত খুব গাঢ় তপ্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু প্রত্যেক নেশার অবসানে যে অবসাদ আসে তার মতো অস্বাস্থ্য আর কি আছে?

অণু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—এই ত' দেখলে হেইলিকে। তেতাল্লিশ বছর

বয়েস, এখনো বিয়ে করেনি—কিন্তু কী মজবুত, কেমন ফুর্তিবাজ। আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে এসেছে ধর্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে। কত ওদের উৎসাহ।

কথাটা কুমুদ বুঝিল। কলেজে পড়িবার সময় তাহার কল্পনাও ত' তাহাকে পৃথিবীর কত পথ ঘুরাইয়া আনিয়াছে। শেষে এমন একটা জায়গায় আসিয়া সে থামিয়া পড়িল যে তাহার চলিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত ফিরিয়া পাইল না। বিবাহ না করিলে সে হয় ত' এমন করিয়া তাহার পৃথিবীকে ছোট করিয়া আনিত না, হয় ত' কিছু-কিছু করিয়া টাকা জমাইয়া একদিন ভারত-সমুদ্রের উপর ভাসিয়া পড়াও তাহার সম্ভব হইত। সেই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সে চিরকালের জন্য দুয়ার দিয়া রাখিয়াছে। এই আরামময় নিশ্চিন্ততা—সে যে তাহার কী সাঙ্ঘাতিক নৈতিক অপমৃত্যু, আজ তাহা সে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া বুঝিয়া লইল। গোত্র ও গণ মিলাইয়া বিবাহ করিতে গিয়া সে যাহাকে সঙ্গে লইয়াছে, সে কখনই পায়ের সঙ্গে পা মিলাইতে পারিতেছে না, অনবরত পশ্চাতে রহিয়া তাহাকে টানিয়া রাখিতেছে। যতটুকু শক্তি তাহার অবশিষ্ট ছিল, তাহা এই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়াই অপব্যয়িত হইয়া গেল!

মনের মধ্যে কে যেন বলিয়া উঠিল—অভ্যাস বন্ধু, অভ্যাস। পরিষ্কার করিয়াই কথাটা বুঝাইয়া বলি। ধর, অণুকে—হ্যাঁ, এই অণুকেই যদি বিবাহ করিতে, দেখিতে সেও ছয়মাস পরে তাহার সমস্ত সঙ্কেত হারাইয়া স্থূল ও স্থাণু হইয়া পড়িয়াছে। যাহা আজ অনির্বচনীয় তাহাই ক্রমশ সাধারণ ও তুচ্ছ হইয়া উঠিত। এই অপরিচয়ের স্বল্প অবগুণ্ঠনটুকু আছে বলিয়াই অণুকে আজ এমন রহস্যমণ্ডিত মনে হইতেছে। অণুই হোক আর ডলিই হোক—সবাই বইয়ের মলাট, অপরিচ্ছন্ন হইতেই হইবে। খোলসটা লোকসান যাইবেই। তবে এমন বই অনেক আছে বটে, যাহা শতবার পড়িলেও বহুদিন পরে আরও একবার পড়িতে ইচ্ছা করে - সে মানুষের প্রথম প্রেম,—মনে হয় পুরাকালের, তবু তাহা কোনোদিন পুরাতন হয় না। অতএব অনুতাপ করিয়া লাভ নাই।

কুমুদ এই প্রবোধবাক্যে বিশ্বাস করিল না। অণুর বেলায় নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম হইত! প্রতিটি মুহূর্তেই যেন তাহার জীবনের পট-পরিবর্তন চলিতেছে। সে নিশ্চয়ই এমন করিয়া নিজেকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া ফতুর হইয়া যাইত না, হাতের পাঁচ সে হাতেই রাখিত। কুমুদ কি করিতেছে ভাবিয়া দেখিল না, অণুর একখানি হাত নিজের হাতের মুঠার মধ্যে তুলিয়া লইল।

অণুও কাজে কাজেই ভাবাকুল কণ্ঠে স্বগতোক্তি সুরু করিয়া দিল - সে চিরকুমারী থাকিবে; কিছু টাকা তাহার জমিয়াছে, দিল্লিতে একটা হিল্লে হইলেই

সে সময়, তরঙ্গ ও সমাজের রুচির সঙ্গে পাল্লা দিয়া জীবনে নব-নব পরিবর্তন সাধন করিবে। প্রথমে যাইবে সে জার্মানি, সেখানে সে নার্সিং শিখবে; সেইখান হইতে একবার রুশিয়ায় যাওয়া তার চাই, বলশেভিকদের সঙ্গে সে মিশিবে এবং আফগানিস্থান হইয়া একদিন ভারতবর্ষে সে আসিলেও আসিতে পারে।

কিন্তু নৌকা করিয়া আহিরিটোলার ঘাটে আসিতেই হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া গেল। অণুর স্ফূর্তি যেন আর ধরে না, -ডলি হইলে নিশ্চয়ই বসিয়া-বসিয়া খালি হাঁচিত। অণু কহিল,—চল ভিজি, রাস্তায় ট্যাক্সি পেলেই উঠে পড়ব।

কুমুদ কহিল,—না পেলে?

—তখন দেখা যাবে। এস না চ'লে। শরৎকালের বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকবে না। এই আনন্দটুকু-মাঠে মারা যায় কেন?

ভাড়া চুকাইয়া দিয়া দুইজনে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখনিই ট্যাক্সি পাওয়া গেল না, মাঝখান হইতে এক নিশ্বাসে বৃষ্টিটুকুই শুধু ফুরাইয়া গেল।

ঘ

ঢাকুরিয়ার লেইক হইয়া বাড়ি ফিরিতে-ফিরিতে দশটা বাজিয়া গেল। বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া দেখিল একতলার বারান্দায় বসিয়া কানাই দেয়ালে পিঠ রাখিয়া একমনে ঝিমাইতেছে—রান্নাঘর অন্ধকার। উপরে চাহিয়া দেখিল সেখানেও বাতি জ্বলিতেছে না। কুমুদের মনটা ছাৎ করিয়া উঠিল। সিঁড়ির আলোর সুইচটা টানিয়া দিয়া অণুকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। অণু অবশ্য শুইবার ঘরে প্রবেশ করিল না—দোতলার ছোট বারান্দার রেলিঙ ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘরে 'ঢুকিয়া আলো জ্বালাইয়া কুমুদ যাহা দেখিল তাহাতে তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার জোগাড় হইল। মেঝের উপর ডলি লুটাইয়া রহিয়াছে, সারা ঘরে কাপড়-চোপড় বই-পত্র ছত্রখান। আলনাটা কাৎ, দোয়াতদানিটা উল্টানো। খাটের উপর বিছানার বদলে একটা ঝাঁটা। ঘরের এই লক্ষ্মীছাড়া চেহারা ও ডলির এই অবসন্ন শয়নাবস্থাটা দেখিয়া সে আরেকটু হইলে একটা আর্তনাদ করিয়া উঠিত হয় ত', কিন্তু সহসা চোখ চাহিয়া ডলি তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এইবার কুমুদের বিরক্তির আর সীমা রহিল না। অণু যাহাতে স্পষ্ট করিয়া শুনিতে না পায় কণ্ঠস্বরটাকে ততদূর সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া সে ধমক দিয়া

উঠিল—ঘরদোরের এ কী ক'রে রেখেছ? কী হ'ল তোমার? হঠাৎ এত কান্না উথলে উঠল কোথা থেকে!

এই সব কথার উত্তর নাই, ডলি অনর্গল কাঁদিয়া চলিয়াছে। এই কান্না যেন দুঃখসঞ্জাত নয়, পুঞ্জীভূত অপমানের অসহায় প্রত্যুত্তর। কুমুদ নীচু হইয়া বসিয়া তাহার গায়ে হাত রাখিয়া একটু স্নিগ্ধস্বরে কহিল,—কী হয়েছে বল না লক্ষীটি!

যেন চোখের সমুখে সাপ ফণা তুলিয়াছে তেমনি ভয়ে ও ঘৃণায় ডলি নিজের শরীরটাকে গুটাইয়া সরিয়া গেল, অতিশয় রূঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—খবরদার, ছুঁয়ো না আমাকে।

—ছোঁব না?

কুমুদের কণ্ঠস্বরে ভীষণ ঝাঁজ।

—না, না, কক্‌খনো না, কোনদিন না।—বলিয়া ডলি আরো একটু সরিয়া গেল।

কুমুদ কঠিন হইয়া বলিল,—রান্না ক'রে রেখেছ?

এইবার ডলি উঠিয়া বসিল। মুখ ঝামটাইয়া বলিল,—কেন রান্না ক'রে রাখবো? কা'র জন্যে? উনি রাত্রি বারোটার সময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়ে আসবেন, আর আমি তাঁর জন্যে ভাতের থালা বেড়ে রাখব! কেন? আমি কি তোমার দাসী? আমি তোমার কেউ নই।

বলিয়া আবার কান্না।

কুমুদ স্বরকে চড়িতে দিল না—ঘরে অতিথি উপস্থিত, তাঁকে তুমি অপমান করবে?

মুখ হইতে আঁচল সরাইয়া ডলি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—কে তোমার অতিথি? থাক না তাকে নিয়ে? আমার কাছে এসেছ কেন তা হ'লে। যাও না, ঐ ঘরে তোমাদের বিছানা ক'রে রেখেছি। লজ্জা করে না বলতে! অতিথি এসেছেন! সারাদিন আপিস কামাই ক'রে হন্যে কুকুরের মত পিছু পিছু ছুটলে, ক'টুকরো মাংস মিলল শুনি?

ছি ছি ছি! কী বর্বর, কী অশিক্ষিত! এইটুকুন মেয়ের মধ্যে এত বিষ। স্নিগ্ধতার আবরণ দিয়া এতদিন ডলি তাহার মনের এই জঘন্য ঘা-টা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শেষকালে তাহার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত। এই সব সঙ্কীর্ণমন হীন বুদ্ধি মেয়ে লইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার স্বপ্ন দেখে! একটি সমাজসম্পর্ক-হীন মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে জীবনের দুইটি মুহূর্ত অতিবাহিত করিবার বিরুদ্ধে এত সন্দেহ, এত চিত্ত-দারিদ্র্য! অলক্ষ্যে কুমুদের মুঠা দুইটা দৃঢ়, পেশীগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল।

অদূরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অণু যে নিবিষ্ট হইয়া আকাশ দেখিতেছে পাছে তাহার কাছে নিজে খেলো হইয়া যায় সেই ভাবিয়াই দিগ্বিদিক না চাহিয়া কুমুদ তাড়াতাড়ি ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। এবং তৎক্ষণাৎ সবলে ডলির হাত ধরিয়া তাহাকে মেঝে হইতে তুলিয়া চাপা অথচ কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—মুখ সামলে কথা বল। আমাকে তুমি চেন না।

ডলিও খেঁকাইয়া উঠিতে জানে—মারবে নাকি? মারো না, ফেল না আমাকে মেরে।

হাতটা ছাড়িয়া দিতেই ডলি মেঝের উপর ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কুমুদ কহিল,—আমার বন্ধুকে অমান্য করা আমি ককৃখনো সইব না। ছোট-লোকোমি করতে হয় চাকর-বাকরের সঙ্গে করো, কিম্বা বাপের বাড়িতে গিয়ে। এখানে এ-সব চলবে না ব'লে রাখছি।

—একশো বার চলবে। হাজার হাজার বার। কে ছোটলোক শুনি? কে নিজের বউকে ফেলে পরের মেয়ে নিয়ে এমন হন্যে হয় শুনি? বন্ধু! যাও না, যাও না, থাক না ঐ বন্ধুকে নিয়ে। এখানে কেন এসেছ মরতে?

কুমুদের একেবারে কিছুই করিবার উপায় নাই, আকাশে চাঁদ ও তাহার দ্রষ্টা-হিসাবে বারান্দায় অণু না থাকিলে সে হয় ত' ইহার উচিত প্রতিবিধান করিত। কিন্তু তবুও তাহার কণ্ঠস্বরে জ্বালা কম ছিল না। কহিল,—যাবই ত' বন্ধুর কাছে। তোমার কাছে মরতে আসতে কা'র এমন মাথাব্যথা?

বলিয়া দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

অণু তখনো তেমনি রেলিঙ ধরিয়া তন্ময় হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। কুমুদের পায়ের শব্দে তাহার ধ্যান ভাঙিল না। মেঘ খানিকটা সরিয়া যাওয়াতে আকাশের একটা প্রান্ত জ্যোৎস্নায় একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে; দৃষ্টিটাকে একটু নামাইয়া আনিলে সুষুপ্ত অট্টালিকার চূড়াগুলি যেখানে ভিড় করিয়া আছে তাহার উপর চোখ পড়িয়া বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। মুহূর্তে কুমুদের মনের বিরক্তি ও ক্লান্তি যেন ধুইয়া গেল।

অণু অমন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত দৃশ্যটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এমন দৃশ্য যে পৃথিবীতে কত আছে তাহার হিসাব করিতে গিয়া কুমুদ হাঁপাইয়া উঠিল,—যে-সব দৃশ্য দেখিলে মনে আপনা হইতেই ভালবাসিবার সাধ জাগে, বাঁচিয়া থাকাটা একটা মোহময় অনুভূতিতে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়া সমস্ত আকাশে-

ভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে,—সেই সব দৃশ্য তাহার জীবন হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। সে যেন এতদিন একটা স্বল্প-পরিমিত অস্তিত্বের কারাগারে বন্দী হইয়া দিন কাটাইতেছিল।

কিন্তু অণু যে কত সুন্দর তাহা সে বুঝিতে পারিল এতক্ষণে—আধো-অন্ধকারে। পিছন হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া দেখিল বলিয়া অণুকে ঠিক একটা মানুষ না ভাবিয়া একটা কায়াহীন কল্পনা বলিয়া ভাবিতে ইচ্ছা হইল—যে-কল্পনায় না আছে জরা, না বা পরিণাম! একেবারে কাছে আসিতেই অণু হাসিয়া কহিল,—একটুখানি কবিত্ব করছিলুম মনে মনে।

যাক, বাঁচিয়াছে—ঘরের মধ্যে খানিক আগে যে একটা কদর্য্য ঝগড়া হইয়া গেল তাহা অণুর কানে আসে নাই। চোখের সম্মুখে এমন দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিলে বোধ করি সমস্ত গ্লানি ও নিরানন্দতাকে অস্বীকার করা যায়। তাই স্বাভাবিক হাসি হাসিয়া কুমুদ কহিল,—তুমি ত' কবিত্ব করছ, কিন্তু এদিকে গিন্নির জোরসে জ্বর এসে গেছে।

—জ্বর? হঠাৎ হ'ল? অণুর চোখে উদ্বেগ।—কই, দেখি।

কুমুদ তাহাকে বাধা দিয়া কহিল,—শুয়ে আছে। ম্যালেরিয়া, সেরে যাবে'খন। এদিকে রান্নার কি জোগাড় হ'বে? তুমি রাঁধতে পারবে, অণু?

অণু স্বচ্ছন্দে রাজি হইয়া গেল,—খুব পারব, আমাকে তুমি ভাব কি?

—অতিথিকে বিড়ম্বিত করছি।

—হস্‌পিটেবল্ হ'তে গিয়ে ত' বাড়িতে হস্‌পিটেল্ বানিয়েছ। চল, দেরি ক'রে লাভ নেই—রাত হয়েছে। একটু পরেই বেজায় ঘুম পাবে আমার। উনুন ধরানো আছে?

—উনুন লাগবে না, নীচে ষ্টোভ আছে। ডালে-চালে দু'টো বসিয়ে দাও দুজনের আন্দাজ। চাকরটাকে পাঠিয়ে বাজার থেকে ডিম আনাচ্ছি। ওকে পয়সা দেব—বাজার থেকে খাবার কিনে খাবে'খন।

দুইজনে নীচে নামিল। কুমুদ নিজ হাতে সব জোগাড় করিয়া দিল,—নিজ হাতে ষ্টোভ ধরাইল, আলমারি হইতে রুটি করিয়া ঘি বাহির করিয়া দিল।

অণুকে রান্নায় বসাইয়া এক ফাঁকে উপরে আসিয়া দেখিল তাহাদের শুইবার পাশের ঘরে সত্যই দুই জনের মত বিছানা করা হইয়াছে। জলিটা যে নির্লজ্জতার কোন্ ধাপে নামিয়াছে কুমুদ তাহা ভাবিয়া পাইল না। দুইটা বালিশ তাড়াতাড়ি সে সরাইয়া ফেলিল এবং সরাইয়া ফেলার দরুণ যে-যে জায়গায় কুঁচকাইয়া গেল তাহা সযত্নে টান করিয়া সে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে দেখিতে পাইল ডলি কখন অণুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় এই মাত্রই আসিয়াছে। অণুর হাত হইতে বড় চামচটা কাড়িয়া নিয়া ডলি বলিয়া উঠিল,—যান, যান, আপনার আর কষ্ট ক'রে রাঁধতে হ'বে না।

অণু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—তোমার জ্বর, নেমে এলে কেন?

হ্যাঁ জ্বর, একশোবার জ্বর। দেখুন না এই হাতটা! উনুনের চেলা-কাঠের মত পুঁড়ে যাচ্ছে! দেখুন না!

অণু হতভম্ব হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ যে কোন-দেশী আচরণ সে সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ডেক্‌চিতে হাতাটা নাড়িতে-নাড়িতে ডলি খোঁটা দিয়া কহিল,—চা'ল নিয়েছেন ত' দু'জনের মাত্র। আমাকে সারা রাত উপোস করিয়ে রাখবেন আর কি! যান, এখেনে দাঁড়িয়ে কী আর দেখছেন? আমি নেমে এলাম, আপনি ওপরে উঠুন। উনি যে আপনাকে ডেকে-ডেকে হায়রান হ'য়ে গেলেন।

অণু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, জ্বরের ঘোরে মেয়েটা প্রলাপ বকিতেছে নাকি? কিন্তু পাছে পিছন ফিরিয়া উপরে উঠিবার সময় চোখাচোখি হইয়া যায় সেই ভয়ে কুমুদ সিঁড়ির উপর আর দাঁড়াইয়া রহিল না।

ডলি ডেক্‌চিতে আরো ক'টি চা'ল ছাড়িয়া দিল—নিজের জন্ত নয়, ঠাকুরপো বিনোদের জন্ত। স্বামী না হয় তাহাকে উপবাসী রাখিতে চান, সে থাকিবেও তাই—কিন্তু নিজের ভাই-এর কথা তিনি ভুলিলেন কেমন করিয়া? বিনোদ সাড়ে-ন' টার বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছে, ফিরিতে তাহার রাত হইবে।

চ

'খাওয়া দাওয়ার পর কুমুদ ও অণু দোতলার বারান্দায় দুইখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়াছে। ডলি বিনোদকে খাওয়াইয়া ও নীচে তাহার বিছানা করিয়া শোয়াইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। এমন আশ্চর্য্য যে বারান্দাটুকু পার হইবার সময় হঠাৎ মাথার উপর লম্বা একটা ঘোমটা টানিয়া দিল—যেন পরপুরুষ দেখিয়াছে। অণু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

অণু উপরে উঠিয়াই নতুন করিয়া কুমুদকে ডলির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিতেছিল, বহু কষ্টে বহু প্রশ্ন এড়াইয়া কুমুদ সেই কথার মোড় ঘুরাইয়া ভারত-বর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কাছে নিয়া আসিয়াছে। ডলির এই বিস্ময়কর আচরণে কথার স্রোত আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। অণু কহিল,—তোমার

বউর বাপের বাড়ি কোথায়? মাষ্টার-টাষ্টার রেখে একটু লেখা-পড়া শেখালে পায়।

এই সব কথা যাহাতে আর না উঠিতে পারে কুমুদ তাহার উপায় এক মুহূর্তে উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল। কহিল,—এক কাজ করলে মন্দ হয় না, অণু। আমিও তোমার সঙ্গে দিল্লি যাব।

—যাবে? উৎফুল্ল হইয়া অণু কুমুদের হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিল।—চমৎকার হয় তা হ'লে।

—যাব। কিন্তু পরশু নয়, কালকেই—পাঞ্জাব মেলে। উদয়শঙ্করের নাচ না হয় এইবার না-ই দেখা হ'ল! য়ুরোপে গিয়েই দেখো।

—কেন? একটা দিন থেকে গেলে কী হয়?

—না। সমস্ত মহাভারত এক দিনেই অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। যে-দিনটা তুমি কলকাতায় কাটিয়ে দিতে চাও, সেটা আমরা দিব্যি টুণ্ডলায় নেমে আগ্রায় তাজমহল দেখেই কাটিয়ে দেব'খন।

—সত্যি? অণু খুসিতে হাততালি দিয়া উঠিল।—তবে তাই চল, কিন্তু তোমার বউকে কোথায় রেখে যাবে?

কথাটা অণু এমন ভাবে বলিল যেন বউ একটা স্যুটকেশ বা হোল্ড-অল্ জাতীয় সামান্য জিনিস মাত্র। অন্য সময় হইলে কুমুদ অত্যন্ত পীড়া বোধ করিত, দরকার হইলে বক্তাকে উল্টা পীড়ন করিতেও ছাড়িত না। কিন্তু আজ সে স্বচ্ছন্দে ঠোঁট কুঁচকাইয়া বলিল,—ও কথা ছেড়ে দাও। সে-ব্যবস্থা একটা হবেই।

ইহার পর দুইজনে দেশভ্রমণের কথা লইয়া মাতিয়া উঠিল। কুমুদ হিসাব করিয়া দেখিয়াছে কিছু ছুটি তাহার পাওনা আছে, সে কাল সকালেই কঠিন একটা অসুখের আছিলা করিয়া জরুরি দরখাস্ত করিবে। বিপত্নীক হইয়াছেন পর বড়বাবুর মেজাজ ভাল হইয়াছে—দরখাস্ত নাকচ করিবেন না। ভাল লাগিলে আবার টুণ্ডলা হইয়া সে না হয় দিল্লিতেই যাইবে,—কাহারও মোটর পাইলে একেবারে ফাঁকা রাস্তা দিয়াই গড়াইয়া পড়িতে পারে। এই সব জল্পনা কল্পনা নিয়া দুইজনে এত ব্যস্ত হইয়া উঠিল যে, এ রাত্রি যে কোনোকালে অপসৃত হইবে এমন কথা তাহাদের মনে হইল না।

কথার পিঠে কথা বলিতে-বলিতে কুমুদ এমন মত্ত হইয়াছে যে, এক সময় ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল,—আজকের রাতটা ভারি চমৎকার লাগছে। চোখে চোখে চেয়ে থাকার রাত, জেগে কাটিয়ে দেওয়ার রাত।

অণুর কবিত্বের চেয়ে ঘুম বেশি। সে অবজ্ঞার সুরে কহিল—পাগল হয়েছ?

ঘরে বৌ তোমার একলা শুয়ে আছে আর তুমি এখানে দিব্যি রাত জাগবে? সি-এস্‌-পি-সি-এ ধ'রে নিয়ে যাবে যে।

এই কথাটাও ডলির পক্ষে মর্য্যাদাকর হইল না। কুমুদ কহিল,—রোজই ত বউ আছে, কিন্তু এমন আকাশ ভ'রে মেঘ ক'রে গোপন চন্দ্রোদয়ের রাত মানুষের জীবনে হয় তো একবারেই এসে থাকে। এ-রাত বৃথায় চ'লে যেতে দিতে নেই। তোমার কি সত্যই ঘুম পাচ্ছে, অণু!

বলিয়া কুমুদ অণুর দুইখানি হাত নিবিড় করিয়া ধরিয়া ফেলিল। দুই হাতে দুই গাছি করিয়া সোনার চুড়ি।

অণু ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া নিল। কহিল,—ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমি কোথায় শোব? বারান্দায়? সত্যিই আর বসতে পাচ্ছি না।

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—বেশিক্ষণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেক না, পাগল হবে, সাবধান। বউকে ডাক না, শোবার বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই একটা করেছে।

অগত্যা কুমুদকেই ঘর দেখাইয়া দিতে হইল। অণু আর একটুও আলস্য করিল না—বেড়াইয়া আসিয়াই সে কাপড় চোপড় ছাড়িয়াছে, দরজাটা তাড়াতাড়ি ভেজাইয়া দিয়া সে বিছানায় টান হইয়া শুইয়া পড়িল।

কুমুদের কাছে অণুর এই ব্যবহারটা আশাপ্রদ মনে হইল না। হাত ধরাটা বোধ হয় অন্যায় হইয়াছে—কিম্বা হাতের যেটুকু ধরিলে অপরাধ হয় না সে তাহার অতিরিক্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল হয় ত', বা সময়ের কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটিয়াছে হয় ত' বা আরো বেশিক্ষণ ধরিয়া থাকা উচিত ছিল। কে জানে, হয় ত' এই আচরণটিতেই অণুর অনুরাগ বেশি করিয়া সূচিত হইতেছে। যাহা হউক, দিল্লি যাইবার কথা শুনিয়া এত উৎফুল্ল হইয়া সহসা আবার এমন করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইবার কারণটা কুমুদ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিল না।

অথচ বেলুড় মঠে মিষ্টার হেইনির সঙ্গে দেখা করিবার সময় কতবার যে অণু বলিয়াছে এমন রাত না ঘুমাবার রাত। এমন দৃশ্য তোমাদের আমেরিকায় আছে?

কুমুদের বাড়ির কাছে অবশ্য গঙ্গা প্রবাহিত নয়, কিন্তু এমন দক্ষিণ খোলা বারান্দা কয়টা বাড়ির আছে শুনি? এখানেও সেই আকাশ, সেই প্রচুর অবসর, সেই বিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা!

বাধ্য হইয়া কুমুদ নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল। দেখিল না খাইয়াই ডলি তেমনি মেঝের উপর পড়িয়া আছে—বিছানাটায় এক তিলও সংস্কার হয় নাই।

গুলিকে ডাকিতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল। খাট হইতে ঝাঁটাটা লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া সে শুধু-জাজিমটার উপরেই শুইয়া পড়িল।

শুইয়া পড়িল, কিন্তু সহজে কি আর ঘুম আসে! ভাবিতে লাগিল এমন সঙ্কীর্ণ চিত্ত অশিক্ষিত বন্য স্ত্রী লইয়া তাহার সমস্ত জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে—সে বাঁচিবে কেমন করিয়া? ডলির মত মৃদুস্বভাবা মেয়েও যখন অকাতরে এত বিষ উদ্গীরণ করিতে পারিল, তখন সংসারে আর তাহার আপন জন বলিবার কে রহিল! ঘরের মধ্যে টিকিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল,—তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া পড়িয়া দরজা খুলিতে গেল।

ডলি ঘুমায় নাই স্বামীকে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতে দেখিয়া সে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তবে অত ঘটা ক'রে এখানে শুতে এসেছিলে কেন? যাও না, তোমার জন্যে এ-পাশ ও-পাশ করছে। ও ঘরের দরজায় খিল নেই, ঠেলা দিলেই খুলে যায়।

বহু কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কুমুদ বাহির হইয়া আসিল। ইচ্ছা হইল সত্যই অণুর ঘরের দরজাটা ঠেলা মারিয়া খুলিয়া দেয়—বাকি রাত্ত ভরিয়া কত গল্প করিবার কথাই যে বাকি রহিয়াছে। কিন্তু ঘরে ঢুকিলে অণু নিশ্চয়ই ভুল বুঝিবে, —উহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া লাভ নাই, ও ঘুমাক্।

ছ

পরদিন দুপুর বেলা কুমুদ নিজেই তাহার সুটকেশ গুছাইতে বসিল। এ সব দিকে ডলির লক্ষ্য নাই, সে আপন মনে ব্লাউজের হাতায় ফুল তুলিতেছে। সে আর কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেছে না—তাহার সমস্ত ভঙ্গীটাতে একটা তীব্র উপেক্ষা অমানুষিক দৃঢ়তা!

কুমুদ কহিল,—আমি দিল্লি চল্লুম।

কথাটা ডলির কানেই ঢুকিল না। কুমুদ আবার বলিল,—দিল্লি, বুঝলে?

ব্লাউজ হইতে চোখ না তুলিয়াই ডলি উদাসীন স্বরে কহিল,—যাও না, কে তোমাকে ধ'রে রেখেছে?

—ধ'রে রাখবার মত কেউ নেই-ও। ফিরতে দেরি হ'তে পারে।

ডলি কহিল,—দেওয়ালের সঙ্গে কথা বল।

—বিনোদকে বোলো সে যেন এ ক'দিন বায়োস্কোপ যাওয়াটা বন্ধ রাখে। বিকেল বেলাটা তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দে দেখা-বিন্তি খেলে কাটিয়ে দিতে পারবে। আমার নাম ক'রে তাকে বোলো।

—সে কি তোমার খায় নাকি যে তোমার হুকুম তামিল করবে? সে দস্তুর-মতো রোজকার করে। আমি বলতে পারব না।

—সে না খায়, তুমি ত' খাও—তোমার সুবিধের জন্যেই বলছি। বেশ আমিই বলব।

—সে আমার কথা বেশি শুনবে, বলব বায়স্কোপ না গেলে আমার মাথা খাও, ঠাকুরপো। বায়স্কোপে না গেলে রাত্রে আমি তাকে কক্‌খনো রেঁধে দেবো না।

—সারাদিন বাড়িতে ব'সে তা হ'লে তুমি কী করবে?

—বাড়িতে থাক্‌বোই না।

—কোথায় যাবে শুনি?

—তোমার কাছ থেকে পথের খবর জেনে যেতে হবে নাকি? আমার দুটো পা নেই?

—বেশ, বিনোদকে ব'লে যাচ্ছি সে তোমাকে বাপের বাড়ি রেখে আসবে।

—বিনোদ আমার সঙ্গে গেলে আমি তাকে যা-তা ব'লে পুলিশে ধরিয়ে দেব।

—তোমার যা ইচ্ছা হয় করো।

—মহাশয়কে ধন্যবাদ।

—কানাই কোথায়? আমার বিছানা বাঁধবে।

—বাজারে পাঠিয়েছি। বাড়িতে একটা শাঁখ নেই—উৎসব যে কাণা হ'য়ে থাকবে।

—শাঁখ কেন?

—যখন জোড়ে যাবে, ফুঁ দিতে হবে না?

মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া কুমুদ কহিল,—জান, আমি আর ফিরে না-ও আসতে পারি।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ডলি কহিল,—আর আমিই বা কোন্ ফিরে আসব?

সারা দিন ডলি দূরে-দূরে রহিল, বিনোদের সঙ্গে পর্য্যন্ত কথা কহিল না। কুমুদ তাহাকে জলখাবার করিয়া দিতে বলিয়াছে কান পাতে নাই; গেঞ্জিতে বোতাম লাগাইতে বলিলে, কাঁচি দিয়া গেঞ্জিটাকে দু' ফাঁক করিয়া দিল; কানাইর হাত হইতে তাঁহার ব্রাউন রঙের সু-টা ছিনাইয়া নিয়া তাহাতে কতগুলি কালো কালি মাখাইতে বসিল। স্নান করিল না, একটুও কাঁদিল না পর্য্যন্ত।

আটটায় সময় কানাই ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিল। স্বর্ণায় ডলি নীচে নামিল না, শাঁখটা হাতে লইয়া দোতলায় বারান্দায় আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কানাইর বুদ্ধি-দুইখানেই সমান খুলিয়াছে—একটা ঝর্ঝরে ট্যাক্সি ধরিয়া আনিয়াছে, চলিতে গেলে ভীষণ শব্দ করে, আর বাছিয়া বাছিয়া একটা শাঁখ আনিয়াছে, তাহাতে আওয়াজ বাহির হয় না। তবু ট্যাক্সিটা সমুখ দিয়া যাইবার সময় ডলি শঙ্খের মুখে প্রাণপণে ফুঁ দিল, কিন্তু তাহা শুনিল কেবল ঈশ্বর।

শঙ্খটা সজোরে রাস্তার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ডলি কাটা-ছাগলের মত ছটফট করিতে লাগিল।

৬

কানাইরামকে একগাছি সোনার চুড়ি ঘুস দিয়া দুপুরেই ডলি এক টাকার আফিং আনিতে পাঠাইয়াছে। কানাই সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি কহিয়াছিল,—এক টাকার একসঙ্গে কিনতে গেনু ব'লে সবাই আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে বললে। তোমার কথা মত বনু, মা-ঠাকরুণের পায়ে ব্যামো, মালিশ করবে। সবাই মারতে আসে—আফিং আবার মালিশ করে না কি? বলে— কোন বাবুর বাড়িতে কাজ করিস? ঠিকানা দে। ছুটে পালিয়ে এনু, মা।

ভীত, উদ্বিগ্ন হইয়া ডলি প্রশ্ন করিয়াছিল—আনিসনি?

এক গাল হাসিয়া কানাই বলিল,—কানাইরাম কি তেমনি বোকা? চার পাঁচ দোকান ঘুরে ঘুরে আট আনার আনতে পেরেছি, মা। কালীঘাট থেকে হেই বউবাজার। শেষকালে দোকান সব বন্ধ ক'রে দিলে। এতে তোমার গাঁটের ব্যথা সারবে ত'?

—সারবে।

বলিয়া তাড়াতাড়ি ঠোঙাটা ডলি লুকাইয়া ফেলিয়াছিল।

এখন এই নির্জন শূন্য পুরীতে ডলি ভাবিতে বসিল। আফিং খাইলে লোকে মরে—জানিত বটে, কিন্তু কতটুকু খাইলে খতম হয় তাহা সে ভাবিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিল না। এক টাকার আফিং দেখিতে বেশি মনে হইল না, শেষকালে কি সে আধা-পথে থামিয়া পড়িয়া নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিবে? সে যে মরণের চেয়েও বেশি লজ্জা, বড় পরাজয়। গলায় দড়ি দেওয়া যায়, কিন্তু ঝুলিয়া পড়িবার মত একটা অবলম্বনও তাহার চোখে পড়িল না। কেরাসিন তেল সর্বাঙ্গে ঢালিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু সাত দিন আগে কেন গালিতে গিয়া পায়ের

খানিকটা পুড়াইয়া ফেলিয়া আগুনে জ্বলিবার সুখ সে বুঝিয়াছে। সেই ঘা-টা এখনো শুকায় নাই।

এই আফিংটুকু খাইবার জন্যই সে সমস্ত দিন উপোস করিয়া রহিয়াছে— ইহাতেই তাহার কুলাইবে নিশ্চয়।

যদি বাঁচিয়াও উঠে—মন্দ কি! জাগিয়া হয় ত' দেখিবে স্বামীর কোলেই মাথা রাখিয়া শুইয়া আছে, আগের দিনের মত স্বামী তাহার কোঁকড়ানো চুল-গুলিতে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। তবু ত' স্বামীর একটা শিক্ষা হইবে, লোকে জানিবে স্ত্রীর প্রতি তিনি কী পৈশাচিক দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। স্বামীর মুখে চুণকালি পড়িবে, তাহা হইলে সেই কলঙ্ক মুছাইয়া দিতে স্বামীর মুখে চুমা খাইতে সে একটুও দ্বিরুক্তি করিবে না।

তাহারই স্বামী, তাহারই ঘর-দোর—সব একজন আসিয়া এমন অনায়াসে, এমন অপ্রতিবাদে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে, আর তাহারই প্রতিকার করিতে সে বিষ খাইতে বসিয়াছে! সেও পুঁটুলি বাঁধিয়া স্বামীর সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল না কেন? পুরুষের না হয় নিষ্ঠা নাই, কিন্তু পৃথিবীর যিনি চালক তিনিও কি ধর্ম বর্জন করিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন নাকি? ডলি দুই হাত জোড় করিয়া নত-জানু হইয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে বসিল।

সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল—বিনোদ আসিয়াছে। বিনোদকে না খাইতে দিয়া সে যে কী করিয়া মরিতে বসিয়াছিল তাহা ভাবিয়া নিজের উপর তাহার রাগের আর সীমা রহিল না। কানাইটা অঘোরে ঘুমাইতেছে, উনি একবার ফিরুন, উহার মাইনে পাওয়া দেখাইয়া দিবে। ডলিই নিজে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বিনোদ কাঁধে করিয়া একটা ক্যারম্-বোর্ড লইয়া আসিয়াছে। ডলির খুসি আর ধরে না। সমস্তরাত জাগিয়া সে আজ ক্যারম্ খেলিবে।

মাঝরাতে হঠাৎ অনেকগুলি কাক এক সঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। ভীত হইয়া ডলি জিজ্ঞাসা করিল,—এখন রাত কয়টা ঠাকুরপো?

পকেট থেকে একটা ফাইন্ তুলিতে তুলিতে বিনোদ কহিল,—দুটো বাজে। তোমার ঘুম পাচ্ছে? ঘুমাও তা'হলে।

—না। ওদের ট্রেনটা এখন কদ্দুর গেছে বলতে পার?

ঝ

ভিড় ছিল না ; সেকেণ্ড ক্লাশ কামরাটা একরকম খালিই ছিল বলিতে হইবে ; উপরের বার্থে একটি মাত্র মুসলমান ভদ্রলোক বর্ধমান পার হইতেই শুইয়া পড়িয়াছেন। আসানসোল পর্য্যন্ত অণু আর কুমুদ কত বিষয় নিয়া যে কথা কহিল তাহার দিশা নাই। প্রতিটি মুহূর্তে কুমুদের মনে হইতেছিল সে যেন তাহার পরজন্ম আবিষ্কার করিতে নূতন একটা নক্ষত্রলোকের পানে যাত্রা করিয়াছে।

আসানসোল পার হইতেই কুমুদ অণুকে শোয়াইয়া দিল। নিজের বার্থে ফিরিয়া আসিয়া এঞ্জিনের উন্টা মুখে মুখ বাড়াইয়া দিয়া সে মাটির উপর ধাবমান ট্রেনের ছায়া দেখিতে লাগিল। এই ট্রেন যদি কোনকালে আর না থামে, কোনোকালে আর যদি ক্ষুধা বোধ না হয়—তবে সমস্ত সমস্যাটা এক নিমেষেই জল হইয়া যায়। কুমুদ আর ফিরিবে না। ঘরে যাহার এমন রণ-চামুণ্ডা বিরাজ করিতেছে সে কোন সুখে সেখানে আর গলা বাড়াইয়া দিবে!

পুরুষের স্ত্রী ত্যাগ করাটা কু প্রথা নয়—রামচন্দ্র হইতে বুদ্ধদেব পর্য্যন্ত তাহার নজির আছে। যাহাই বল, নিজের সুখ শান্তির চেয়ে বড় পরমার্থ আর কি আছে? সীতাকে ত্যাগ না করিলে রাম গুমখুন হইতেন—আর স্ত্রী-ত্যাগের ফলে পরম নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন স্বার্থসন্ধিৎসু বুদ্ধদেবই। স্বার্থ স্বার্থই, তাহার মধ্যে বড় ছোটর তারতম্য করিতে যাওয়াই বোকামি।

কিন্তু ভলি যদি গলায় দড়ি দিয়া মরে! বাঁচা যায়! আন্দামান হইতে হঠাৎ ছাড়া পাইয়াও বন্দীরা হয়ত' এমন মুক্তির আস্বাদ পায় না। আবার সে জ্যা-মুক্ত তীরের মত স্বাধীন হইয়া উঠিবে—অবাধ ও বেগবান। কোনো দায়িত্ব নাই, না কোনো বন্ধন। সময়ের মত নিয়তচলমান, ঢেউয়ের মত ফেনিল, উদ্বেল, মুখর। নিঃসঙ্গতার মধ্যে যে কী বিস্তীর্ণ সুখ রহিয়াছে তাহা সে বিবাহের আগে বোঝে নাই কেন? কিন্তু অণুকে যদি আজ কেহ নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া লইয়া যায়, তবে আজিকার এই নিঃসঙ্গতা কি আবার ক্লান্তিকর হইয়া উঠিবে না?

গাড়ি মধুপুর ছাড়িয়াছে। কুমুদ অণুর দিকে চাহিয়া দেখিল। ঘুমাইয়া পড়িলে নারীকে রাত্রির চেয়েও রহস্যময়ী মনে হয়। চারিদিকে কী অপরিমেয় স্তব্ধতা এবং তাহারি সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া কুমুদের বুকে প্রচুর প্রচণ্ড আবেগ। সে কী করিবে বুঝিতে পারিল না। তবু ধীরে ধীরে অণুর শিয়রে আসিয়া চোরের মত বসিল। সে এই রহস্যকে উন্মোচন করিবে! অণুকে তাহার চাই। পরিপূর্ণ করিয়া চাই।

এইখানে যবনিকা ফেলিয়া দিতে পারিতাম ; কিন্তু অণু হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আর্তস্বরে কহিল,—তুমি না বিবাহিত ?

শিকল টানিয়া দিবার দরকার হইল না, খুব ভোরে মোকামায় আসিয়া গাড়ি পৌঁছিতেই কুমুদ একটিও কথা না কহিয়া তাহার সুটকেশ ও বেডিং লইয়া নামিয়া পড়িল। অণু একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

শীর্ণ শুষ্ক যমুনার কূলে পাষাণ তাজমহল নীরবে অশ্রু-বিসর্জন করিতেছে।

অচিরদ্যুতি

ক

ঘরে তালা-বন্ধ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছি, অন্তঃপুর হইতে ফুনু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—চাবিটা দাও।

ফুনু আমার ছোট বোন। পকেটে হাত দিয়া কহিলাম,—কেন ?

অল্প একটু হাসিয়া ফুনু বলিল,—তোমার ঘরে বন্ধুদের একটু বসাবো। বাবার কোর্ট থেকে ফেরবার সময় হয়ে এসেছে, বৈঠকখানায় আর থাকা চলবে না।

চাবিটা তাহার হাতে ফেলিয়া দিলাম, কহিলাম,—তোদের পরামর্শ এখনো শেষ হয় নি ?

মাতব্বরের মত মুখ গম্ভীর করিয়া ফুনু বলিল,—কাল্‌কেও মিটিং বসবে। তোমার ঘরটা বেশ নিরিবিলি আছে। এই ফাঁকে সবাই মিলে তা'র শ্রী-ও ফিরিয়ে দেবো'খন। সবাই ওরা তোমার ঘর দেখবার জন্যে ভারি বায়না ধরেছে। বলিয়া কৌতুকময় স্বচ্ছ হাসিতে ফুনুর চক্ষু দুইটি দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বলিলাম,—তা হ'লে আমার আর বেরুনো হ'বে না এ বেলা। (একটু ঠাট্টার সুরে) অতিথিদের যথারীতি সম্বর্দ্ধনা করা দরকার, কি বল ?

চৌকাঠে পা রাখিতে যাইব ফুনু আমাকে বাধা দিল। কহিল,—আমি একাই সম্বর্দ্ধনা করতে পারব, মশাই। মেয়েদের ভিড়ে তোমার আর মাথা না

গলালেও চল্‌বে। যে কাজে যাচ্ছিলে যাও। ছ'টার মধ্যে ওদের ফের বিডন ষ্ট্রীটে যেতে হবে।

প্রশ্ন করিলাম,—এই তোরা গান্ধি-যুগের মেয়ে? সামান্য একটা পুরুষের সান্নিধ্যকে এত ভয়?

তালা খুলিতে-খুলিতে ফুনু ঠোঁট কুঁচকাইয়া কহিল—ভয় না হাতী! তোমার সঙ্গে তর্ক করবার মতো আমার অঢেল্ সময় নেই। বিকেল বেলা দোতলা বাস্-এ ক'রে হাওয়া খেয়ে এসো গে যাও।

দরজাটা খুলিতেই বিশৃঙ্খল ঘরের চেহারা দেখিয়া মনে-মনে আঁৎকাইয়া উঠিলাম। বাহির হইয়া গেলে মা অবসরমত এই ঘরে পদার্পণ করেন, তাঁহার সেবা-স্নিগ্ধ কর্ম্মকুশল হস্তস্পর্শে ঘরের সমস্ত নিরানন্দতা দূর হইয়া যায়,—শৃঙ্খলায় ও পরিচ্ছন্নতায় ঘরখানি নির্মল সুন্দর হইয়া উঠে,—খুঁটিয়া খুঁজিয়া একটি ধূলি-কণাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাকে ছাড়া আর কাহাকেও বড় একটা ঢুকিতে দিই না, বন্ধু-বান্ধব আসিলে সাধারণ গৃহস্থের মত রোয়াকে দাঁড় করাইয়াই ভদ্রালাপ সারিয়া লই। তাই এতাদৃশ নোংরা অপরিষ্কার ঘরের ওলোট-পালোট অবস্থা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলাম,—সব জিনিস ভারি অগোছাল বিশ্রী হ'য়ে আছে। এ-ঘরে কিছুতেই তোর বন্ধুদের আসা হ'তে পারে না।

ফুনু ফিরিয়া দাঁড়াইল; কহিল,—সাহিত্যিকের ঘর যে বিচ্ছিরি ছত্রাকার হয়ে থাকে—তা ওরা খুব জানে। এ-ঘরের চেহারা দেখে ওরা কক্ষনো নাক সিঁটকোবে না; তবে মেঝের উপর এই যে কতকগুলো ময়লা জামা কাপড় টাল্ ক'রে রেখেছ, এগুলো ধোপার দোকানে দিয়ে এসো দয়া ক'রে। বলিয়া সে একটা পুরানো খবরের কাগজের উপর সেগুলো ভাজ করিয়া রাখিতে লাগিল।

বলিলাম,—ঘর-দোর আমি ইচ্ছে ক'রে লোক দেখবার জন্যে অমন নোংরা করে' রাখি না। বোহিমিয়ান্‌দের মতো অপরিচ্ছন্নতা আমার কাছে আর্ট নয়। পেছনে মা আছেন বলে'ই ঘর-গুছানো বিষয়ে কিঞ্চিৎ উদাসীন থাকি। তোর বন্ধুরা আবার ভুল না বোঝে!

শেষের কথাটা না বলিলেও পারিতাম; তবু যে-ঘরে, শুধু বাস করি নয়, রাত্রি জাগিয়া কাব্য রচনা করি, সে-ঘরটি কতকগুলি অপরিচিত মেয়ের চোখের সম্মুখে এমন করিয়া অনাবৃত রাখিয়া যাইব ভাবিতে কুণ্ঠা হইতেছিল। সামান্য পোষাকেও মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, সম্বিৎসু চক্ষু নিয়া এই ঘরটির চারিদিকে তাকাইলেই আমি আর গোপন থাকিব না, ধরা পড়িয়া যাইব!

ফুনু কিন্তু কথাটার অর্থ ভুল বুঝিল; কহিল,—না মশাই, তারা জানে

আধুনিক কালের লেখকরা আভিজাত্যকে বরদাস্ত করে না। বড়-বড় চুল, বড়-বড় নোথ আর বড়-বড় কথা। নাও, ধরো—এবার সোজা পিট্‌টান দাও দিকি।

কাপড়ের পুঁটলিটা ঠেলিয়া দিয়া কহিলাম,—এখন ধোবা-বাড়ি যাবার সময় নেই। তোর বন্ধুরা এ-ঘরে এসে কৃতার্থ হবে বলে' ঘরে চুণকাম করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। ঘরের জিনিস-পত্রে হাত দিস্‌নে কিন্তু, খবরদার!

বলিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

বেলেঘাটা যাইবার কথা ছিল, কলেজের এক বন্ধু কয়েকটা টাকা ধার দিবে বলিয়া কথা দিয়াছে। কোথাও টাকা পাওয়া যাইবে কিম্বা কোথাও প্রেয়সীর সঙ্গে নিভৃতে দেখা পাইবে—এই দুইটার একটা খবর পাইলেই মানুষের পায়ের বাত নিমেষে নামিয়া যায় নিশ্চয়। তবে একই সময়ে যদি দুইটার দাবী সমান হইয়া উঠে, তবে অন্তত আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি, প্রেয়সীর সামান্য স্পর্শের চেয়ে টাকাটাকেই অধিক মূল্যবান মনে করি। এই কথাটা আমার অসাহিত্যিক নেপথ্য উক্তি। ফুন্নুর বন্ধুদের কাছে এ-কথাটা বলিতে নিশ্চয়ই সঙ্কোচ বোধ করিতাম। অবশ্য ফুন্নুর বন্ধুদিগকে টাকার সঙ্গে উপমেয় করিয়া অনাবশ্যক মর্য্যাদা দিবার কোনো হেতু নাই; তবু যখন মোড়ের দোকানের ঘড়িতে ছয়টা প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া বেলেঘাটায় বন্ধুর দেখা পাওয়ায় নিরাশ হইয়া ফের বাড়ির মুখে ফিরিলাম, তখন নিজের হলফটা এত সহজে নাকচ হইয়া গেল ভাবিয়া আমার হাসি পাইল।

কিন্তু শ্রাবণের সন্ধ্যাটুকু আজ পরিষ্কার বলিয়াই যে সহসা দুর্যোগ ঘনাইয়া উঠিতে পারে না, এ অভয়টুকু দিবার জন্য হাতের কাছে কোন জ্যোতিষ নাই, তাই ছাতাটা সঙ্গে লইতে হইবে। বেলেঘাটায় বন্ধুর দেখা পাওয়া যায় নাই বলিয়া যে সন্ধ্যাকালেও ঘরে কুনো হইয়া বসিয়া থাকিব, আমি তত বড় সময়নিষ্ঠ বা রুগ্ন সাহিত্যিক নই। বাহিরে বিপ্লব হউক বা প্রলয় প্রবল হইয়া উঠুক, এই সময়টায় সাহেব-পাড়ার রাস্তায় একটু 'প্রোমিনেড্' না করিলে আমার চোখে না আসিবে ঘুম, মাথায় না গজাইবে গল্পের প্লট; তবু, ছাতা একটা সঙ্গে থাকা ভাল। মোড়ের দোকানের ঘড়িটা নির্ভুল সময় রাখে বলিয়া তাহার স্বত্বাধিকারী কানাইবাবুকে মনে মনে প্রশংসা করিতে-করিতে অগ্রসর হইলাম।

নির্ধারিত দিনে গেলাম না বলিয়া বন্ধুবর হয়তো এমন রাগ করিয়া বসিবেন যে

তাঁহাকে আর ইহজন্মে বাগ মানানো যাইবে না ; কানাইবাবুর ঘড়িটা এত নিভুর্ল হয়ে, হাতের ফাঁক দিয়া টাকা কয়টা অনায়াসে ফসকাইয়া গেল। তবু কেন যে নিজের এই গোঁতোমির জন্য গ্যাসপোসটার উপর কপালটা ঠুকিয়া দিলাম না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়! এই টাকাটার মুখ চাহিয়া দুই সপ্তাহ কাটাইয়াছি, এখন কি না কিনারে আসিয়া নৌকা বানচাল হইয়া গেল! মনে পড়িল পর্শু বন্ধুর মিরাট ফিরিয়া যাইবার কথা আছে। তবু, অনেক রাত করিয়া গেলে বন্ধুবরকে হয়তো বাসায় পাইব এবং কয়েক ঘণ্টার এদিক-ওদিকে হয়তো তাঁহার মেজাজ সাহেবি হইয়া উঠিবে না—এই আশ্বাস লইয়া ছাতা আনিতে বাসায় ফিরিলাম।

সত্য কথা বলিতে কি, বাস-ভাড়ার পয়সার পর্য্যন্ত নিদারুণ অভাব হইয়াছে। বোতলওয়ালার কাছে কতগুলি পুরোনো কাগজ-পত্র বেচিয়া সাড়ে তিন আনা রোজকার করিয়াছি—এই সম্বলটুকু লইয়াই আজ বাহির হইয়াছিলাম। বেলেঘাটা হইতে ফিরিবার সময় গল্পের প্লট ভাবিতে ভাবিতে মোটর গাড়ির ধাক্কা বাঁচাইয়া হাঁটিয়া আসিব বলিয়া আমার মনে ক্ষোভ বা পায়ে বাত ছিল না। তবু টাকাটা পাওয়া আমার উচিত ছিল। ফুস্থুর বন্ধুরা আসিয়া অকারণে এমন উৎপাত না করিলে আমি এতক্ষণে নিশ্চয়ই মৌলালির মোড় পার হইয়া যাইতাম!

বি, এ পাশ করিবার পর বাবা তাঁহার মত মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার জন্য ল পড়িতে আদেশ করিলেন ; কিন্তু আইনকে আমি নজরুল ইসলামের "ভীম ভাসমান মাইন"-এর মত একটা উৎকট উপদ্রব মনে করিয়া আঁৎকাইয়া উঠিলাম। 'না' বলিয়া আমার ঘাড়টা যে একবার বেঁকিল, আর সোজা হইল না। এখান সেখান হইতে প্রশংসাপত্র কুড়াইয়া যে একটা কেরানিগিরি জোগাড় করিব তাহাতেও আশ্চর্যরূপে নিরুৎসাহ রহিলাম। এ লইয়া বাবার সঙ্গে যে একটা বচসা হইয়া গেল, তাহার ধাক্কায় আমি দোতলা হইতে ছিটকাইয়া নীচে আসিয়া তাঁহার মহুরির প্রতিবেশী হইলাম। বাবা আঙুল দিয়া রাস্তাই দেখাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একে আমি মা'র উঠাউঠি পাঁচ মেয়ের পর প্রথম পুত্র, তায় দুইবার শূন্য পকেটে ও খালি পায়ে রেঙ্গুন ও হরিদ্বার বেড়াইয়া আসিয়াছিলাম, কাজেই আমার উপর মা'র দুর্বলতা চরম হইয়া উঠিয়াছিল। মা সত্যাগ্রহ সুরু করিলেন, তাহারই ফলে একটা রফা হইয়া গেল।

ঘর পাইব বটে কিন্তু অন্ন পাইব না ; অর্থাৎ বাবার অন্নের গ্রাস মুখে তুলিতে হইলে আমাকে দস্তুরমত পয়সা গুনিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মানদণ্ড দিয়া

বিচার করিয়া বাবার এই নিষ্ঠুর আদেশটা ঠাণ্ডা মেজাজে ক্ষমা করিলাম বটে, কিন্তু সামান্ত একটা পনেরো টাকার টিউশানি জোগাড় করিতেও হাঁপাইয়া উঠিলাম। ঘর ছাড়িয়া যে আর কোথাও বাহির হইয়া পড়িব, তাহারও উপায় ছিল না। পাকে-প্রকারে কথাটা মা'র কানে উঠিতেই মা এমন আকুলি-ব্যাকুলি আরম্ভ করিতেন যে মনটা কাদা হইয়া যাইত। অভাবের মধ্যে বসিয়া শুকাইতে শুকাইতে হঠাৎ একদিন সাহিত্যিক হইয়া উঠিলাম এবং একখানা সাপ্তাহিক কাগজ আমার একটি গল্প পাঁচ টাকা মূল্যে গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য করিল। গোড়ায় মেসেই খাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম—এখন লুকাইয়া কুমুর হাত দিয়া মা'র নিজ হাতে তৈরি-করা মিষ্টান্ন আসিয়া আমার মুখগহ্বরে পৌঁছিতে লাগিল।

এখনও কোনো কাজ জোগাড় করিতে পারিলাম না, অথচ দিনে-দিনে বর্ধমান শশিকলাটির মত পরিপুষ্ট হইতেছি দেখিয়া বাবা মা'র প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভবা যে আজকাল খুব টেরি বাগিয়ে চলে, গায়ে সিল্ক দেখলাম—ব্যাপার কি? পয়সা পাচ্ছে কোথা থেকে?

মা বলিলেন,—কেন? আজকাল ও গল্প লিখে টাকা পাচ্ছে। কে একজন ওকে ছেলেদের একটা মানে-বই লিখে দেবার জন্যে আগাম টাকা দিয়েছে। নিজেরটা ও নিজেই চালায়। খাচ্ছেও মেসে।

বাবাকে নরম করিবার জন্যই হয়তো মা কণ্ঠস্বরটাকে একটু ভিজাইয়া আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাবা একেবারে তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলেন।—গল্প লেখে? পাজিটাকে আজই আমি ঘাড় ধ'রে বা'র ক'রে দেব। কোর্টে আজ প্রকাশবাবু ওর একটা গল্পের যে কী নিন্দেই করছিলেন—ছি ছি, ও নাকি সব বস্তির লোক নিয়ে গল্প লিখেছে—লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। এই বলিয়া বাবা সাহিত্যিকদের চরিত্র লইয়া এমন সব গুহ্য কথা বাহির করিতে লাগিলেন যে ঘৃণায় ও রাগে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু হঠকারিতা করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেলেই যে খুব একটা সুরাহা হইবে, ধূক-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার কোনই ইঙ্গিত পাইলাম না। বরং আরো দু'তিন দিস্তা কাগজ ও দু-এক বাণ্ডিল মোমবাতি আনিয়া কলম শানাইয়া বসিয়া গেলাম। বস্তিতে যাহারা বাস করে তাহারা গরিব মূর্খ ও স্থূলপ্রবৃত্তি বলিয়াই যদি অপরাধ করিয়া থাকে, তবে আমার নাম যে ভবানন্দ তাহার জন্য আমিও কম অপরাধী নই। শুনিয়াছিলাম ঠাকুরদার আমলে মা যখন পুত্রবধূরূপে প্রথম এই বাড়িতে পদার্পণ করেন, তখন গান জানিতেন বলিয়া তাঁহাকে কম লাঞ্ছনা ভোগ

করিতে হয় নাই, এমন-কি তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধেও সংশয় উঠিয়াছিল। দাদা-মশায়ের দেওয়া সেতারটিকে উনুনের চেলা-কাঠ বানাইয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, মা'র কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর ছিল বলিয়া এই সংসারে তাঁহাকে প্রায় পাঁচ বৎসর মৌনী নির্বাক করিয়া রাখা হইয়াছিল। সে সব দিন কবে অতীত হইয়া গেছে, তবু আজ সাহিত্যের প্রতি বাবার এই মর্মান্তিক ক্রোধের পরিচয় পাইয়া নিজেদের বংশমর্য্যাদা সম্বন্ধে সংশয়াকুল হইয়া উঠিলাম,—নিজের উপরও সন্দেহ হইল, হয় তো পরবর্তী যুগের কাছে আমিও আবার এমনি রূঢ় ও হাস্যাস্পদ হইয়া দেখা দিব!

যাহা হউক, এত যে রাশি রাশি কাগজ ও সময় ব্যয় করিলাম, তাহা একেবারে ব্যর্থ হইল না। দেখিতে দেখিতে নাম হইল। বেশি লিখিলেই বাঙলা দেশে নাম কেনা যায়। দু'মাস অসুখ হইলেই দেখিবে পাঠকরা তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। পাঠকরা যাহাতে না ভোলে তাহার জন্য বেশি তো লিখিলামই এবং এমন কিছু লিখিলাম যাহাতে সমালোচকরা চাঁদা করিয়া এক জোট হইয়া পিছনে লাগিয়া চীৎকার সুরু করিল। শক্তির মাদকতায় মত্ত হইয়া কি করিতেছি ভাবিয়া দেখিলাম না, দেখিলাম নাম হইয়াছে, সম্পাদকরা তাঁহাদের কাগজের কাটতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন এবং বাবা আমার চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটি পূর্ণবয়স্কা পাত্রীর সন্ধান করিতেছেন।

ভালবাসিয়া বিবাহ করিব সে গর্ব আমার নাই। লেখা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া কণ্ঠে বরমাল্য দিবে, বাঙালি মেয়েরা এখনও ততটা aesthetic বা সৌন্দর্য্যরস-লিপ্সু হয় নাই। আমার ট্যাকটা যদি সৌভাগ্যক্রমে গড়ের মাঠের মত খাঁ খাঁ না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এমন মেয়ে পাইতাম যে বাসর রাত্রে স্বচ্ছন্দে আমাকে বলিতে পারিত—তোমাকে দেখবার কত আগে তোমার লেখার সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে গিয়েছি! কথাটা তখন তাহার মুখে বেমানান হইত না। এখন যদি এই লেখার দাবিতে কোনো সুরসিকার পাণিপ্রার্থনা করি, সে নিশ্চয়ই মুখ বাঁকাইয়া এমন একটা ভঙ্গী করিবে যাহা আঁকিয়া তুলিতে স্বয়ং গগন ঠাকুরও পেছপাও হইবেন! অতএব বাবার সন্ধানের ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

ছাতা লইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখি আমার ঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেলাম। ভিতরে যে একটা কিছু মিটিং হইতেছে এমন মনে হইল না, কিংবা হয়তো পরনিন্দা না করিলে মেয়েদের মিটিং পূর্ণাঙ্গ হয় না। শ্রুতিশক্তিটাকে ধারালো করিবার চেষ্টায় দুয়ারের উপর কান পাতিলাম, স্পষ্ট শুনিলাম অবলা মেয়েদের অবরোধমুক্তা স্বাধীনকর্ত্রী করিবার কথা

ভুলিয়া গিয়া মেয়েগুলি মন খুলিয়া আমারই বিষয় লইয়া স্বচ্ছন্দে আলোচনা করিতেছে।

দরজাটা উহাদের মুখের উপর ধাক্কা দিয়া খুলিয়া দিবার কথা মনে হইল, কিন্তু পরের খোলা চিঠি পড়িবার মত এ ক্ষেত্রেও লুকাইয়া সব কথা শুনিবার একটা দুষ্ট ইচ্ছা এত বলবতী হইয়া উঠিল যে, রীতিমত কোমরটা নোয়াইয়া দুয়ারের ও-পিঠে উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।

মুহূর্তে মুখ শুকাইয়া গেল। আমার টেবিলের সামনে ললিতার একটা ফোটো টাঙানো ছিল—ঐ মেয়েটি কে, আমারই সাহিত্যসাধনার অন্তরতম অনুপ্রেরণা কি না – এই সব ব্যাপার লইয়া মেয়েগুলি এমন সব ভদ্রালোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছে যে, লজ্জায় আমার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল।

আমার টেবিলের উপর যে কেপ্লার-এর একটা কড-লিভার আছে, তাহাও উহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। ছি, ছি, তাড়াতাড়িতে কড-লিভারের বোতলের কথাটা মনে হয় নাই। দাঁত মাজিবার জন্য নিমগাছের কতকগুলি ডাল যে ছুরি দিয়া কাটিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাও উহাদের চোখে পড়িয়াছে! মুখ দেখাইবার আর পথ রহিল না। এইবার ড্রয়ার টানিয়া বাঁধানো দাঁতের পুরোনো পাটিটা দেখিয়া ফেলিলেই হয়।

সত্যই, আমার রুচির তারিফ্ না করিয়া পারিতেছি না। ললিতার ফোটোটা ধরিয়া টান দিতেই তাহার পিছন হইতে পচা শুকনো কতকগুলি বকুল ফুল ও কাঁচের চুড়ির টুকরো মেঝের উপর পড়িয়া গেল। মেয়েগুলি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঐ নোংরা জিনিসগুলা ময়লা-টিনে ফেলিয়া না দিলে যেন আমার জাত যাইত! বুড়া হইয়াও ছেলেবেলার বোকামির চিহ্নগুলি এখনও লুকাইয়া রাখিয়াছি! তাহা ছাড়া লুঙ্গি পরিয়া সং সাজিয়া রাত্রে ঘুমাইবারই বা আমার কী দরকার ছিল! সেই লুঙ্গি আবার শুকাইবার জন্য ঘটা করিয়া জানালায় মেলিয়া দিয়াছি—হাত বাড়াইয়া একটা চোরেও তাহা চুরি করিয়া নিল না। চোরকে তাহা হইলে বক্শিস দিতাম। আমি যে প্রতি সপ্তাহে মার্কেটে গিয়া আনি ফেলিয়া ওজন লইয়া আসি, তাহার কার্ডগুলি টেবিলের উপর ছড়াইয়া রাখিয়া নিজের বর্দ্ধিষ্ণু ভুঁড়িটার বিজ্ঞাপন না দিলে যেন ভারতবর্ষ আর স্বাধীন হইত না! কয় ষ্টোনে এক পাউণ্ড হয়, মেয়েরা তাহার নামতা করিয়া আমার ওজন বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। কড-লিভারটাই যে আমার ওজন-বৃদ্ধির কারণ, এই অনুমান করিয়া মেয়েগুলি এমন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল যে আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, পা দিয়া ঠেলা মারিয়া দরজাটা খুলিয়া দিলাম।

একটা ক্যামেরা লইয়া আসা উচিত ছিল—মেয়েদের ভ্যাবাচাকা মুখ দেখিয়া মনে হইল এমন করিয়া ঢুকিয়া পড়াটা প্রচলিত রীতির ঠিক অনুকূল হয় নাই। কিন্তু একটা পুরুষের সামান্য শারীরিক নৈকট্যকে এমন সঙ্কোচ করিবারই বা কি হেতু আছে? তবু একটা ওজুহাত দিবার প্রয়োজন ঘটিল। ফুনুকে কহিলাম, —ছাতাটা নেব। জল আসতে পারে। বলিয়া আলমারির পিছনে হাত দিলাম।

শ্রাবণের সন্ধ্যাকালে হঠাৎ পশ্চিম আকাশে রোদের হাসি হাসিয়া বিধাতা কেন যে আমাকে ঠাট্টা করিলেন, বুঝিলাম না। একটি মেয়ে মুচকিয়া হাসিতেছে। চাহিয়া দেখি, ইঁদুরগুলির দৌরাত্ম্যে আমার ছত্রটি একেবারে ছত্রখান হইয়া গিয়াছে।—মেয়েদের প্রতি মাতা বসুন্ধরার পক্ষপাতিত্ব বেশি বলিয়াই আমাকে সেই অটুট মেঝের উপর নিরেট বোকার মত অটল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

বাঁচাইল আমাকে ফুনু। মেয়েদের উদ্দেশ করিয়া কহিল,—ইনি আমার দাদা, (নামটা বলিবার দরকার নাই) আর ইনি রমা মিত্র।

ছাতাটা তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিয়া নমস্কার করিলাম। এতগুলি মেয়ের মধ্য হইতে একটিকে বিশেষ করিয়া বাছিয়া ফুনু যখন তাহার নামোচ্চারণ করিল, তখন বিস্ময়াভিভূত হইয়া যাহার মুখের দিকে তাকাইলাম তাহাকে আগে কখনো না দেখিলেও অনেক দিনের চেনা বলিয়া মনে হইল। রমা মিত্রের নাম জানে না বাঙলা দেশের সংবাদপত্র-পাঠক এমন কেহ আছেন বলিয়া জানিতাম না। সেই রমা মিত্র গরিব সাহিত্যিকের ঘরে আসিয়া তাঁহার দাঁতন-কাঠি নিয়া সমালোচনা করিবেন জানিলে আমি পূর্বাহ্নে একটা অভিনন্দন-গাথা লিখিয়া রাখিতাম। শাদা গন্ধ এখন আমার মুখে জোগাইবে বলিয়া তো ভরসা হইল না।

রমা দেবীই কথা পাড়িলেন এবং পৃথিবীতে আলাপ করিবার এত সব বিষয় থাকিতেও আমার গল্পের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। প্রথমটা মনে করিলাম বুদ্ধি-হিসাবে একটু খাটো বলিয়াই হয়তো অতিথিসৎকারের ঋণশোধের ইচ্ছায় ভদ্রতা করিয়া আমাকে একটু তোষামোদ করিতেছেন। রীতিটা অতিমাত্রায় ভদ্র ও বহু-আচরিত বলিয়া রমা দেবীর প্রশংসাকে মনে মনে সন্দেহ করিলাম।

কিন্তু দেখিলাম, না; আমার গল্পগুলি লইয়া তিনি দস্তুরমত একটা দীর্ঘ বক্তৃতা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। অন্তঃসারশূন্যতাকে ঢাকিবার জন্য বেশি কথা বলিতে হয় জানিতাম, তবু রমা দেবীকে বিশ্বাস করিতে বড় সাধ হইল। সাহিত্যিক মাত্রেই প্রশংসার কাঙাল হইয়া থাকে এবং সে-প্রশংসা যদি দীর্ঘ বক্তৃতাকারে

রমা মিত্রের মতন ছাত্র-বন্দিতা দেবীর মুখ হইতে বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে যে একটু ঘামিয়া উঠিব তাহা আর বিচিত্র কি।

গরিবদের নিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছি—খুব ভাল করিতেছি। ইহাদের ক্ষুধা, পাপ, ও দুঃখ অনাবৃত করিয়া দেখাইতে হইবে। সুনীতি একটা ব্যাধি—এই ব্যাধি হইতে মুক্ত না হইলে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যও নিষ্প্রাণ হইয়া থাকিবে। ঘটনার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইবার ভীরুতা সাহিত্যিককে শোভা পায় না। এক কথায় রমা দেবী সমস্ত 'বুর্জোয়া' সাহিত্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমার হইয়া অনুপস্থিত সমালোচকদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইলেন। পেটে যাহাদের অন্ন নাই, নিঃশ্বাসের জন্য বাতাস যাহদের ফুরাইয়া আসিয়াছে, আমার সাহিত্য তাহাদের বাণীই বহন করুক।

নূতন অপ্রকাশিত লেখাটা উহাদের শুনাইয়া দিতে ভারি লোভ হইল, গলা খাঁখ্‌রাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে প্রস্তাবটা উত্থাপন করিয়া বসিলাম।

—আজকে আর সময় হবে না, অনেক কাজ আছে। বলিয়া রমা দেবী তাঁহার অনুচারিণীদের লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

এটা বলা-ই বাহুল্য হইবে যে, ছাতা লইয়া সেদিন আর 'প্রোমিনেড' করিবার ইচ্ছা হইল না; মেয়েদের রসগ্রাহিতা সম্বন্ধে আমার প্রতিকূল মতগুলি ঝালাইতে বসিলাম! কাজে কাজেই রমা দেবীর ললাট তেজোব্যঞ্জক, চক্ষু বুদ্ধিমণ্ডিত, দেহশ্রী বিদ্যুদ্দীপ্ত মনে হইতে লাগিল। নারীজাগরণ-প্রচেষ্টায় উহার একগুঁয়েমিকে প্রশংসা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলাম না। ফন্টুকে ডাকিয়া নানারূপ প্রশ্নাদি করিয়া বহুপরে একটা মোটা খবর লইলাল—রমা দেবী ইটলির ভুবন মিত্রের মেয়ে—যাহার সঙ্গে বাবার কয়েক বছর ধরিয়া একটা মামলা লইয়া ভীষণ মন-কষাকষি চলিতেছে। এটা সুখবর নয়।

খ

ইহার কয়েক দিন পরে দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া নিজ মনে আয়নায় মুখ ভেঙাইতেছি,—হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া ভিতরে যিনি প্রবেশ করলেন, তিনি রমা মিত্র। মুখের ভাব স্বাভাবিক করিলাম; এই ব্যাপারটায় যেন বিস্মিত হইবারও কোনো কারণ নাই, কেননা রমা যে একদিন আসিবেন, তাহা আমার জীবন-ধারণের মতই সুনিশ্চিত,—কেননা রমা দেবী আমার **Tenth Muse.**

দুপুরের রোদে মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে, চুলগুলি রুক্ষ, পায়ে জুতোভরা ধুলো, দেহকান্তি শ্রমমলিন। এত সহানুভূতি বোধ করিলাম যে কি বলিব! কিন্তু

তাঁহার মুখের দিকে বেশিক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকার চেয়ে একটা চেয়ার টানিয়া তাঁহাকে বসিতে বলাটাই শিষ্টাচার হইবে।

চেয়ারে বসিয়া রমা দেবী কহিলেন,—আপনার কাছে একটা জরুরি কাজে এসেছি। অনুরোধ আমার রাখতেই হবে।

শেষের কথাটা বলিয়াই তিনি আমার ল্যাজ মোটা করিয়া তুলিলেন। তবু প্রশ্ন করিলাম,—কি কাজ?

মাথার কাপড়টা দুইবার গুছাইয়া, গলার হারটা বার তিন নাড়িয়া, হাতের চুড়িগুলিতে বার কয়েক আওয়াজ তুলিয়া তিনি কহিলেন,—ছাত্রী-জাগরণ সম্বন্ধে আপনাকে একটা খুব গরম বিদ্রোহাত্মক কবিতা লিখে দিতে হবে।

এই বলিয়া আমার মুখের দিকে এমন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইলেন যে আমি কলম দিয়া একটু ইসারা করিলেই যেন ছাত্রীরা তাহাদের জুতার ঘুন্টি খুলিয়া কণ্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াইবে! তবু ইতস্তত করিতে লাগিলাম।

মেয়েরা না জাগিলে যে পুরুষের কর্মশক্তিও সুপ্ত থাকিবে, সমস্ত আন্দোলনে পবিত্রতা ও মাধুর্য্য সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্যে মেয়েদের যে ভীষণ প্রয়োজন এই বিষয়ে যথারীতি এক বক্তৃতা দিয়া, কি কি দিয়া কবিতাটি লিখিতে হইবে তাহার ভাষা ও ভাবের দুয়েকটি ফরমায়েস করিয়া রমা দেবী আমার মুখের দিকে আরেকবার তাকাইলেন।

বাম গুম্ফপ্রান্তটুকু একবার চুমরাইলাম। বন্ধুদের নির্বন্ধাতিশয্যে বৃষ্টির দিনে বসন্ত হাওয়া বহাইয়া ও অমাবস্যা রাত্রে চাঁদ ভাসাইয়া দুয়েকটা বিয়ের কবিতা যে না লিখিয়াছি এমন নয়। কিন্তু কাগজে গলা ফাটাইয়া একটা খেউড় ধরিব, আমার না আছে ততখানি স্নায়ুর জোর, না সে শব্দ-সম্পদ! তাই অতি-বিনয়ে ঘাড়টিকে একটু হেলাইয়া অসম্মতি জানাইলাম।

কিন্তু আমার কথা শোনে কে? আমাকে দিয়া না লিখাইলে তাঁহার স্বস্তি নাই। তিনি আরেক কিস্তি আমার প্রশংসা সুরু করিলেন। কথাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে এবার সন্দিহান হইলেও শুনিতে কিন্তু ভারি ভালো লাগিল।

—আপনি পারবেন না? নিশ্চয়ই পারবেন, একশো বার পারবেন। সারা বাঙলা দেশে এমন তেজস্বী লেখনী আর কার আছে?

বলিয়া তিনি কলমটা আমার হাতের মুঠিতে উপহার দিবার জন্য অলক্ষিতে আমার দুইটি আঙুল স্পর্শ করিয়া ফেলিলেন।

বলিলাম,—ঐ প্রকার উৎকট স্বদেশপ্রেম আমার আসে না।

কথাটার মধ্যে বোধ হয় একটু প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল, রমা দেবীর মুখ উদ্দীপ্ত

হইয়া উঠিয়াছে। ফের বলিলাম,—স্বদেশপ্রেম নিয়ে পৃথিবীতে কোন দিন বড় সাহিত্য হয় নি। আমরা যে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলি, সে আমাদের দুর্ভাগ্য।

আর যায় কোথা? রমা দেবী এমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন জানিলে বাছিয়া-বাছিয়া আরো দুয়েকটা কড়া কথা শুনাইয়া দিতাম! রমার রূপে যে এমন দৃপ্ততা ছিল জানিতাম না, দুই চোখে কুলাইয়া উঠিতেছে না। রমা চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, চূর্ণ-কুন্তলগুলি সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, শঙ্খের মত গ্রীবাটি বেষ্টন করিয়া যে বস্ত্রাঞ্চলটুকু বুকের উপর দিয়া নামিয়া আসিয়াছে, তাহার একটি প্রান্ত মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন,—স্বদেশপ্রেম নিয়ে বড় সাহিত্য হয় নি! নির্জ্জীব ভীরু বাঙালী সাহিত্যিক হ'য়ে তো তা বলবেনই! ভল্‌টেয়ার, ভিক্টর হিউগো, গ্যয়টে, ডষ্টয়ভস্কির নাম শুনেছেন কোনোদিন? আপনাদের মেরুদণ্ড ঘুণে খেয়েছে, তাই সাহিত্য করতে বসে খালি অলস ভাবুকতা, আর ন্যাকামি ক'রে চলেছেন। স্বদেশপ্রেম নিয়ে সাহিত্য হয় না! সাহিত্য হয় তা হ'লে কি বস্তি নিয়ে, ড্রেনের পচা গন্ধ নিয়ে, মরা ইঁদুর নিয়ে? এ কথা বলতে আপনার লজ্জা হ'ল না? ছি!

হাসিব না কাঁদিব বুঝিলাম না। কাঁচুমাচু হইবার ভাণ করিয়া বলিলাম,—সব গুণই কি সকল লোকের থাকে? কেউ পারে, কেউ পারে না। অন্য মেয়ে পেরেছে ব'লে আপনি ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হ'তে পারবেন? সকল লোকেরই কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে।

এত সংযম সহকারে কথা বলিয়াও কোনো সুফল পাইলাম না। বাম করতলে ডান হাতের মুষ্ট্যাঘাত করিয়া রমা দেবী কহিলেন,—কেন পারবেন না আপনি? আপনি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী না? যদি না পারেন তো কলম ছেড়ে দিয়ে লাঙল ধরুন গে। দেশের উপকার বেশি হবে।

তবুও কিছু কঠিন কথা বলিতে পারিলাম না। মুগ্ধের মত তাঁহার উজ্জল চোখ দুইটির পানে তাকাইয়া কহিলাম,—বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে-মাতরমের কথা বলছেন? ওটার মন্ত্রশক্তি যত অমোঘই হোক না কেন, সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবে ও গানটা নেহাৎ অসার্থক।

কী সাঙ্ঘাতিক কথাই বলিয়া বসিয়াছি! যেন তাঁহাকে নিদারুণ দৈহিক অপমান করিয়াছি, এমনি ভাবে সরিয়া গিয়া তিনি আর্ত্ত অথচ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—কী?

ঘৃণায় কুঞ্চিত হইলে নারীর মুখ এত সুন্দর হয়, এই প্রথম দেখিলাম।

নম্রস্বরে কহিলাম,—আপনি চটছেন, কিন্তু সমালোচনার দিক থেকে কথাটা মিথ্যে নয়। আধা-বাংলা আধা-সংস্কৃত এমন একটা রচনা কবিতার প্রাথমিক নিয়মকেই উপেক্ষা করেছে। তা ছাড়া কবিতাটা নিতান্ত 'কমুন্যাল'—মুসলমানরা পড়েছেন বাদ, ব্রাহ্মরা করছেন বিবাদ। বলিয়া হাসিব কি, রমার মুখের চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া-গেলাম। রমা দেবী টেবিল হইতে সিসের পেপার-ওয়েইট্‌টা তুলিয়া লইয়াছেন।

—আপনাদের মত ক্ষীণজীবী সাহিত্যিকরা তো এ-কথা বল্‌বেই। খালি বিরহ আর হা-হুতাশ নিয়ে শক্তি ক্ষয় করাই আপনাদের বিলাস। দেশকে বিপুলতর গ্লানির মধ্যে ঠেলে ফেলাটাকেই আপনারা মহত্ত্ব মনে করেন। আপনাদের যে ধিক্কার দেব, সে-ভাষা পর্য্যন্ত আমার নেই। বলিয়া পেপার ওয়েইট্‌টা আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া না ছুঁড়িয়াই তিনি খোলা দরজা দিয়া সিধা অন্তর্হিত হইলেন।

রমা দেবী যে আবার এমনি করিয়া অন্তর্হিত হইবেন তাহাও যেন জানিতাম। তাই নিশ্চিন্ত হইয়া আয়নার সম্মুখে দাড়ি কামাইতে বসিলাম।

গ

এই রমা দেবী কি করিয়া ভদ্র বনিয়া গেলেন ও তাঁহার সঙ্গে কি করিয়া আমার বিবাহ হইল, তাহাই বলিতেছি।

সারা মেয়ে-মহলে রমা তখন একটা উন্মত্ত তুফান তুলিয়া দিয়াছেন! একটা বিদ্রোহাত্মক কবিতা নিজেই লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য তাঁর ছয় মাস জেল হইয়া গেল। ভক্ত মহিলাবৃন্দের' ফুলের মালা গলায় পরিয়া তিনি কয়েদির গাড়িতে উঠিয়া সকলকে বিনয়-স্নিগ্ধ নমস্কার করিলেন, এমন একটি পরিতৃপ্তিপূর্ণ পরমসুন্দর মুখ আমি আর দেখি নাই! ভিড়ের মধ্যে আমিও ছিলাম বলিলে আমার প্রেমের কবিতার বইয়ের কাট্‌তি আরো বাড়িয়া যাইবে না, তবু সেই অবাধ্য দৃপ্ত মেয়েটিকে না দেখিয়া কি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিব ভাবিয়া পাইলাম না। রমা আমাকে দেখিতে পান নাই।

জেল হইতে ফিরিয়াও রমা সায়েস্তা হইলেন না,—আইনের সঙ্গে অবার খুনসুড়ি সুরু করিয়াছেন। ফের ইহার প্রতিফল মিলিল।

বেলেঘাটায় সেই বন্ধুটির কাছে পুনরায় যাইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এখনও আমাকে ধার করিতে হইতেছে। গিয়া দেখিলাম বন্ধুটি আমার সঙ্গে ঠিকানা লইয়া অত্যন্ত খেলো রসিকতা করিয়াছেন—সদর দরজাটা বিধাতার মতই নিরুত্তর, বধির। প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে-একটা গলির সন্ধান পাইলাম, তাহার নাগাল পাইতে হইলে পূর্বে আরো মাইল খানেক হাঁটিতে হয়। চৈত্রের রৌদ্র দেখিয়া নিরস্ত হইব অর্থসম্বন্ধে আমার অধ্যবসায় তত শিথিল নয়! কতক দূর অগ্রসর হইয়া সেই শূন্য নির্জন রাজপথে একটি একাকিনী নারী-মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইয়া পা দুইটাকে মন্থর করিয়া আনিলাম। দেখি, অনুমান ঠিক, তিনি শ্রীমতী রমা মিত্র।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি এখানে?

অল্প একটু হাসিয়া রমা সংক্ষেপে যাহা বিবৃত করিলেন; তাহা এই—কোন একটা রাস্তায় তিনি কি একটা বে-আইনি আন্দোলন করিতেছিলেন; তাহার ন্যায্য শাস্তিস্বরূপ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানসহকারে এইখানে বহন করিয়া আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন একটা ট্যাক্সি লইতে হইবে।

ট্যাক্সিতে বসিয়া রমা দেবী আমার সঙ্গে জল-বায়ু ও বাজার-দর নিয়া কথা বলিতে সুরু করিলেন দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। ট্যাক্সিটা থামাইয়া তাঁহাকে একটা পানের দোকান হইতে লেমনেড খাওয়াইলাম,—তিনি অত্যন্ত শান্ত হইয়াছেন। বলিলেন,—এমন একটা জায়গায় অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে যাবে, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো বোধ হয় এত দিন ধরে' এই ষড়যন্ত্রই করছিল।

কথাটা আমারও মনে হইয়াছিল, কিন্তু বলিবার সাহস হয় নাই।

ট্যাক্সিটা ইট্‌লিতে তাহাদের বাড়ির দোরগোড়ায় থামিতেই দেখা গেল, ভুবনবাবু ব্যস্ত হইয়া গেটের বাহিরে পাড়ার অনেকগুলি লোকের সঙ্গে জটলা পাকাইতেছেন। (রমার তিরোধানের সংবাদ তাহার কানে পৌঁছিয়াছে!) আমাদের দুইজনকে দেখিয়া ভুবনবাবু ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, এমন বকাবকি আরম্ভ করিলেন যে, ট্যাক্সিড্রাইভারটা পর্য্যন্ত ভয় পাইয়া দাড়ি চুলকাইতে লাগিল।

আমি যে তাঁহার কন্যাকে একটা বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি তাহার জন্য একটি বিনয়-বচন তো শুনিলামই না, বরং আমিও দেশোদ্ধাররূপ একটা কু-মতলবে রমার সঙ্গে লিপ্ত আছি ভাবিয়া তিনি আমাকেও বাক্যপ্রহার সুরু করিলেন। বোধহয় এইটুকু সময় রমার সান্নিধ্য-সম্ভোগহেতু আমিও দেখিতে-

দেখিতে নিরুপদ্রব মহাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছি,—নহিলে ঐ অতিপ্রগল্‌ভ হীনমনা ভদ্রলোকটিকে যে কি বলিয়া ক্ষমা করা যায়, ভাবিয়া পাইলাম না। ভুবনবাবুর মতে দোষটা মুখ্যত আমারই। আমিই তাঁহার কন্যাকে ফুস্‌লাইয়া মোটরে দিবাভ্রমণ করিবার জন্যই এমন একটা কাণ্ড পাকাইয়াছি! কদর্থটুকু বাদ দিয়া কথাটা জীবনে সত্য হয়ে উঠুক, এমন-একটা প্রার্থনা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলি সেদিন কান পাতিয়া শুনিয়াছিল বোধ হয়!

ড্রাইভারটা আমার কাছে ভাড়া চাহিতেছে। ও হরি, রমা ও তাঁহার বাবা সেই যে বাড়ি ঢুকিয়াছেন আর ফিরিবার নাম নাই! ভাবিয়াছিলাম কৃতজ্ঞতার ঋণের অর্দ্ধেক শোধ করিবার জন্য ভুবনবাবু আমাকে বৈকালিক জলযোগ করিতে তাঁহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত করিবেন। এই দুর্দ্দিনে অবশেষে ট্যাক্সি চাপিয়া ভাড়া না দিবার জোচ্চুরিতে যদি জেল যাই, সেটা ভারি লজ্জাকর হইবে। তাই ড্রাইভারকে হর্ণ বাজাইবার অনুরোধ করিয়া এক ফাঁকে টুক্ করিয়া সরিয়া পড়িলাম।

পরদিন দুপুর বেলা রমা দেবী আবার আমার ঘরে আসিয়া উপস্থিত—সেই রুদ্র বিজয়িনীর মূর্ত্তিতে। তাঁহার এইবারের বিদ্রোহ শ্লথপ্রাণ দুর্বল সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে নয়, আর কাহারো বিরুদ্ধে নয়, নীচ পচা সমাজের অর্থাৎ তাহার প্রতিনিধি তাঁহার বাবার বিরুদ্ধে। পেপার-ওয়েইট্‌টা সরাইয়া ফেলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু কথা শুনিয়া গা ঝাড়িয়া একটা সুদীর্ঘ স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলাম। রমা বলিলেন, —আসুন আমার সঙ্গে, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

চুলগুলি আঁচড়াইবার পর্য্যন্ত সময় পাইলাম না। ট্যাক্সিতে উঠিয়া রমা একটু কাতর-স্বরে কহিলেন,—একজন পুরুষ-মানুষের সঙ্গে সুহৃদের সম্পর্ক, তা অবধি আমাদের সমাজ বরদাস্ত করবে না! পুরুষ আর নারীকে একটা সমতল জায়গায় সহজ হ'য়ে দাঁড়াতে দেখলে সকলে কু-অভিসন্ধি আরোপ করবে! এই চরিত্র-দৌর্বল্যকে আমি শাসন করতে চাই। আমি মান্‌বো না এই ইতর অভিভাবকত্ব। চলুন আমার বাড়ি। সত্যিকারের কাজ করতে হ'লে লোক চাই। এই মরা সমাজকে না ভাঙ্‌তে পারলে নতুন লোক পাব কোথায়? সন্দেহের এই অত্যাচার থেকেই পাপের সৃষ্টি হচ্ছে। আমি তা কক্‌খনো সইবো না ব'লে রাখছি।

রমাদের বাড়ির সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া চা খাইতেছি' এমন সময় আপিস হইতে ভুবনবাবু ফিরিলেন। রমা যেন কায়মনোবাক্যে এই

মুহূর্তটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমি যদি সাপ কিম্বা গণ্ডার হইতাম, তাহা হইলেও ভুবনবাবু এতটা চম্‌কাইতেন না। আমার দিকে তির্য্যক গতিতে এমন একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যাহাকে বাঙলা ভাষায় তর্জ্জমা করিলে দাঁড়ায় এই,—পাজি হতচ্ছাড়া রাস্কেল! তুমি আবার এসেছ? জানো, ঘাড়ে রদ্দা মেরে তোমাকে এই মুহূর্ত্তে বাড়ির বা'র ক'রে দিতে পারি?

আমিও দৃষ্টিকে মোলায়েম না করিয়াই তাঁহার দিকে চাহিলাম,—তর্জ্জমা করিলে তার অর্থ হয়—বা'র তো ক'রে দেবেন, কিন্তু আপনার মেয়ে যে ছাড়ে না।

ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে রমা দেবীর দেরি হইল না। শীতের বেলা পা-পর্য্যন্ত লম্বা কোটটা কাঁধের উপরে ফেলিয়া খোঁপাটা একটু জুৎ করিয়া বসাইয়া রমা আমাকে কহিলেন,—চলুন, আমাকে বিডন-স্ট্রীটের হোষ্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

সত্য কথা বলিতে কি, পিতার প্রতি এই অবিনীত উপেক্ষা আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু আমি কি করিতে পারি? রমার এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বলিলেও ভুবনবাবুর কাছ হইতে মরাল সার্টিফিকেট পাইতাম না; তাই অগত্যা মনে মনে একটু আমোদ অনুভব করিয়া রমার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। ভুবনবাবু স্তম্ভের মত অটল হইয়া দাঁড়াইয়া কিরূপ মুখভঙ্গী করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য ঘাড়টা ফিরাইতেও সাহস হইল না।

ট্যাক্সি সোজা হেদুয়ার পারে না গিয়া রমার আদেশ-মত এদিক-ওদিক ঘুরিতে লাগিল। বুঝিলাম, রমার মন চঞ্চল হইয়াছে। হঠাৎ এক সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন,—আপনার সঙ্গে সামান্য একটু পরিচয় রাখছি ব'লে আমাকে অযথা বাক্য-যন্ত্রণা সইতে হ'বে, অন্যায়কে এতখানি প্রশ্রয় আমি কোনকালে দিতে পারবো না। বাবা এখানে শুধু একটা ব্যক্তি নন্—একটা জলজ্যান্ত দুর্নীতির প্রতিনিধি! স্পর্দ্ধাপূর্বক আমি তাঁকে অগ্রাহ্য করতে চাই। তা ছাড়া আপনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক—আপনি আজ যতই কেননা উদাসীন থাকুন, একদিন হয়তো আপনার লেখনীই বিদ্যুৎ-লেখা হ'য়ে বহ্নির অক্ষরে সত্যবাণী প্রচার করবে। আমি তা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে' সুখ পাই। আপনি না-ই বা হ'তেন সাহিত্যিক,—তবু একজন পুরুষের সঙ্গে আমি বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারবো না, এ কি জুলুম!

তখন যদি আমি রমা দেবীর বাম করতলখানি প্রথমে ধীরে ও মিনিট দশেক পরে নিবিড়ভাবে ধরিয়া থাকি, তবে আমার সেই সৌহার্দ্দ্যকে অসৌজন্য বলিয়া কেহ মনে করিয়ো না। আর রমা যদি তাঁহার হাতখানি সরাইয়া না নিয়া পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও তোমরা ক্ষমা করিয়ো।

ঘ

ঘুম হইতে উঠিয়াই রোজ ঝাঁটা-হস্তে চাকরটার সঙ্গে দেখা হয়; সেদিন চক্ষু কচলাইয়া প্রত্যুষ বেলায় দ্বারপ্রান্তে রমাকে দেখিলাম। Aurora বাঙালী মেয়ের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আকাশ হইতে ভবানন্দ বাঁড়ুয্যের ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন একটা সঙ্গত উপমা দিতে পারিতাম বটে। কিন্তু রমার মূর্ত্তি দেখিয়া রণ-দেবী চামুণ্ডার কথা মনে পড়িল। নিম-শাখার দাঁতন-কাঠিটা মুখ হইতে খসিয়া গেল।

রমা দেবী দৃপ্ত কণ্ঠে কহিলেন,—বাবা আমাকে বাড়িতে আর স্থান দেবেন না বলেছেন। আমাদের সঙ্ঘের হষ্টেলে এসেই উঠলাম যা হোক। সমস্ত মন দিয়ে এই আমি চাইছিলাম হয়তো। এই আমার বেশ হয়েছে। সংসারে আজ আমার কেউ নেই, এ কথা ভাবতে মুক্তির সঙ্গে আমি একটা বড় রকমের গর্ব বোধ করছি। এবার আমি পরিপূর্ণ ভাবে আমার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবো। তুচ্ছ পরিবারের গণ্ডী আমি মানিনে।

'সংসারে আজ আমার কেউ নেই'—এই কথা বলিতে রমার কণ্ঠস্বর ঈষৎ গদ্‌গদ হইয়া উঠিয়াছিল এবং আমি যে 'কেউ নেই'-র তালিকার অন্তর্ভুক্ত নই, তাহা দেখিয়া খুব খুসি হইলাম। পুরুষের সাহচর্য্য বাতিল করিয়া একটি অহোরাত্র কাটাইবার সঙ্গতিও মেয়েদের নাই, (কথাটা মেয়েদের পক্ষে অসম্মানসূচক নয়।) বিশেষত যাঁহারা হষ্টেলে থাকেন। তাঁহাদের ফরমায়েস খাটিবার জন্য নানাবিধ কিঙ্করের আবশ্যক। (কথাটা পুরুষদের পক্ষে সম্মানহানিকর নয়।) তবে আমি যে ঠিক রমা দেবীর খিদমৎগারের পর্য্যায়ে পড়িলাম না সেটাকে আমার সিংহ-রাশির কপালগুণ বলিতে হইবে। দোকান হইতে দর করিয়া শাড়ি ও অর্ডার-মাফিক চটি কিনিয়া আমি রমা দেবীকে লইয়া চাঁদপালঘাটে ষ্টীমার লইতাম এবং সেই ষ্টীমারেই রায়গঞ্জ হইতে পুনরায় চাঁদপাল ঘাটে ফিরিয়া আসিতাম। সারা সময়টা দেশোদ্ধারের জল্পনা লইয়াই কাটিত না বলিলে তোমরা রাগ করিবে, কিন্তু গঙ্গার হাওয়া যে অধিকতর মধুর এবং সন্ধ্যার আকাশ অধিকতর স্নিগ্ধ হইয়া উঠিত তাহা হয়তো অস্বীকার করিবে না!

আমাকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য অন্তত মা'র স্নেহ-ব্যাকুল বাহু ছিল, রমা তাঁহার মা'র সেই ব্যগ্র বাহুকেও প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছেন। আমার চেয়ে তাঁহার তেজ দীপ্ততর, এ কথা ভাবিয়া আমিই সর্বাগ্রে বেশি গর্বানুভব করিতেছি। আমরা দুইজনে সমান উৎপীড়িত—একজন সাহিত্যের জন্য, আরেক জন স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য। পরিবারের কাছে লাঞ্ছনার একটা মিল পাইয়া রমা ভাববিহ্বল

হইয়া পড়িলেন। ব্যক্তির চেয়ে একটা ভাবময় আইডিয়াই তাঁহার মনে নেশা ধরাইয়া দিয়াছে। ঠিক করিলাম আমি করিব সাহিত্য, আর রমা করিবেন শিক্ষা-সংস্কার।

সেই সঙ্কল্প লইয়া তিনি নূতন একটা ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মাতিয়া উঠিলেন। আমাদের জন্য creature comforts নয়; দারিদ্র্য, দুঃখ ও দুরাশা। খুব বড় রকমের একটা সফল জীবনের প্রত্যাশী আমরা নই,—একটি মহান আদর্শ হৃদয়ে নিরন্তর লালন করিতেছি সেই আমাদের মহান কীর্তি। অর্থ ও সম্মান অনেকেই লাভ করে, আমাদের অকৃতকার্য্যতাই আমাদের জীবনকে একটি মর্য্যাদা দান করিবে।

ইতিমধ্যে হষ্টেলের অপরাপর মেয়েরাও আমাদের সম্পর্ক লইয়া কানাঘুষা করিতে সুরু করিয়াছে। নেপথ্য হইতে মেয়েগুলি উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদের যত চেষ্টা করে, রমা দেবী ততই প্রকাশ্যে আমাকে আঁকড়াইয়া ধরেন। ফলে, হষ্টেলে রমা দেবীকে আর স্থান দেওয়া ছাত্রীদের নীতি-শিক্ষার অনুকূল হইবে কি না এ বিষয়ে সসমারোহে প্রশ্ন উঠিল। রমা সে-লজ্জা আর সহিতে পারিলেন না।

সেই দিন ষ্টীমারে করিয়া রাজগঞ্জ ঘুরিয়া আসিবার ধৈর্য্য ছিল না, ইডেন-গার্ডেনের বেঞ্চে দুইজনে বসিলাম। কি কি কথা হইয়াছিল ঠিক মনে নাই; তবে একটু বেশ মনে করিতে পারি, প্রথমত রাগিয়া সমস্ত বাঙলা দেশটাকে রসাতলে পাঠাইয়া পরে কখন নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভুলিয়া গিয়া পত্রান্তরালে চন্দ্রোদয় দেখিয়া নির্বাক হইয়া গিয়াছি। রাত বাড়িতেছে, ভ্রমণকারীরা আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া কেহ বাড়ি ফিরিতেছে, কেহ বা আড়ালে অপেক্ষা করিতেছে। আমাদের কাহারও মুখে কথা নাই, আকাশের তারাগুলি নির্নিমেষ চোখে আমাদের দেখিতেছিল। এই প্রকাণ্ড শূন্যময় স্তব্ধতায় দুইজনে আরো কতকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ট্রাম ছিল না; ডালহৌসি স্কোয়ারের কাছাকাছি আসিয়া একটা ট্যাক্সি পাইলাম। কোথায় যাইব, কি ঠিকানা দিব ভাবিয়া পাইলাম না; ট্যাক্সিটা এখানে-ওখানে ঘুরিতে লাগিল।

রমা দেবীর এই অধঃপতন কল্পনা করিলেও আমার বুক ফাটিয়া যাইত, তবু জোয়ান অফ আর্কের মৃত্যুর পর করুণ-দৃশ্যের কথা ভাবিতে পারি নাই বলিয়া তাঁহার মাথাটা কাঁধের উপরে ধীরে ধীরে টানিয়া আনিলাম। তিনি কহিলেন,—কোথায় যাচ্ছি?

বলিলাম—কোথাও না।

যাইবার ঠিকানা নাই অথচ যাইতেছি, এমন একটা রূপক লইয়া খুব বড় সাহিত্য-রচনা কোনো দেশে হইয়াছে কি না ভাবিতে লাগিলাম।

পরিচ্ছেদগুলি ছোট হইয়া আসিতেছে।

ছিদাম মুদির লেনে ছোট একটি একতলা বাড়ির একাংশে আমি আর রমা দুইখানি ঘর লইয়াছি। আমি একটা আফিসে সাড়ে তেত্রিশ টাকার একটা চাকুরি লইয়াছি, রমা তাঁহার ইস্কুল-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সদ্য-প্রসূত মেয়েটিকে লালন করিতেছেন। রমার শরীর অসুস্থ বলিয়া যে একটা ঠাকুর রাখিব সে সঙ্গতি নাই। বাসন মাজা পোষাইবে না বলিয়া আজ প্রায় চার মাস ধরিয়া কলাপাতায় ভাত খাইতেছি। উনুন আমিই ধরাই, বাজারও আমি করি, মেথর না আসিলে আমাকেই আমাদের অংশের নর্দ্দমাটুকু পরিষ্কার করিতে হয়! দেশ কতদূর অগ্রসর হইল সংসারভারগ্রস্তা রমার তাহা জানিবারও অবকাশ হয় না! সপ্তাহান্তে এক পয়সা দিয়া যে একখানা সাহিত্য-পত্র কিনিব তাহাও আমার কাছে বাজে-খরচ মনে হয়। তিনটি পয়সা হইলে একবার দাড়ি কামানো যাইবে।

এটা আমাদের পরজন্ম বলিয়া মনে হয়। রমাকে যেন কোনোদিন পাই—কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে শ্রীভগবানের কাছে এমনি প্রার্থনা করিবার ফল মিলিয়াছে! শ্রীভগবান মানুষের প্রার্থনা রাখেন, তাহার এমন জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাইয়া বাধিত হইলাম।

কাল রাত্রে আমাদের বাড়ির অপরাংশের গৃহস্বামীটি কোন্ এক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় গলায় দড়ি দিয়াছেন,—শেষ রাত্রি হইতে তুমুল কান্না সুরু হইয়াছে। ঐ দুঃখব্যাধিজর্জ্জর মৃত ভদ্রলোকটিকে লইয়া একখানা বিরাট মহাকাব্য লেখা যায় না এমন নয়। কিন্তু আমাদের এই নিরর্থক অকৃত-কার্য্য জীবন লইয়া কোনো জীবনচরিত-কার মাথা ঘামাইবে না বলিয়া মনে হওয়াতে নিজেই গায়ে পড়িয়া লিখিয়া ফেলিলাম।

পরিবারকে বর্জ্জন করিয়া এই বাড়িতে আসিবার সময় ললিতার ফোটোটি আর আনা হয় নাই—সেই নীচের ঘরের দেওয়ালে সেটি মলিন মুখে এখনও বিরাজ করিতেছে কি না, কে জানে! ললিতা তাহার বিবাহের পরে আমার এক দিদিকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—ওঁকে আমার ফটোটা সরিয়ে ফেল্‌তে বলবেন।

যথাসময়ে ললিতার সেই ভীরু অনুরোধটি আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু ললিতার দুর্বলচিত্ততার কথা মনে করিয়াই ফোটোটি সরাই নাই। আমার চোখের উপর সেই ফোটোটি ধীরে ধীরে দিনের পর দিন ম্লান হইয়া আসিয়াছে। আমি যে তাহার দিকে কোনোদিন নিবিষ্টচক্ষে তাকাইয়াছি এমন কথাও মনে পড়ে না। তবু তাহার সেই ফোটোটি আজ একবার দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা করে।

তার পর

আকাশে মেঘ করিয়া আসিল দেখিয়া আর বাহির হইলাম না। এই আসন্ন-বৃষ্টি প্রদোষকালে আমার ঘরে আসিয়া যদি দক্ষিণের খোলা দুয়ার দিয়া ক্ষণকালের জন্য বাহিরে তাকাও, দেখিবে কে একটি মমতাময়ী বন্ধু একটি শ্যামল সঙ্কেত প্রসারিত করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছে। মুহূর্তমধ্যে অজস্র ভালোবাসার মত বৃষ্টিধারা নামিয়া পড়িবে, ধানক্ষেতগুলি প্রেয়সীর গভীর ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টির মত সুশীতল ও স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হাত পা নাড়িতে ইচ্ছা করে না, একটা যে সিগারেট ধরাইব দেহে ততটুকু চাঞ্চল্যও যেন সহিবে না, ইজি চেয়ারটায় পড়িয়া বাহিরে চাহিয়া আছি। স্তিমিত মেদুর প্রদোষালোক কৈশোরের অস্পষ্ট রহস্য-গভীর নব-অঙ্কুরিত প্রেমের মত আমাকে অতি নিঃশব্দে ঘিরিয়া ধরিতেছে।

কিন্তু না, এই আলস্যভোগ আমাকে মোটেও মানায় না। নতুন মুন্সেফ হইয়া মফঃস্বলে আসিয়াছি, রায় লিখিয়া-লিখিয়া জীবন আমাকে ঝর্ঝরে করিয়া ফেলিতে হইবে. চেয়ারে বসিয়া থাকিতে-থাকিতে আমিও একদা কঠিন কাঠ বনিয়া যাইব—আপাতত সে জন্যই আমাকে কোমর বাঁধিতে হইবে। তাহা ছাড়া, কলিকাতা হইতে বেকার সাহিত্যিক বন্ধুরা কি একটা highbrow কাগজ বাহির করিতেছে—তাহার জন্য আমার কাছে লেখা চাহিয়া পাঠাইয়াছে। হাতে মোটে একটা রবিবার আছে,—আজই রাত্রে শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলে শেষ রাত্রের দিকে নিশ্চিন্ত একটু ঘুম আসিতে পারে।

গল্প লিখিবার মতলবটা মাথায় আসিতেই চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম, একটা

সিগারেট ধরাইয়া প্লট্ ভাবিতে বসিলাম। কে একজন সাহিত্যিক নাকি বলিয়াছেন—গল্প বলিতে যাহা আমরা বুঝি তাহা একেবারেই প্লট নয়, আইডিয়া,—তাই আশ্বস্ত হইয়া তখুনিই ফাউণ্টেন্ পেনে কালি ভরিয়া লইলাম। এক পেয়ালা চা খাইয়া লইলে ভাল হইত, কিন্তু শোভাকে ডাকিয়া আবার চা করিয়া খাইতে বসিলে উহার সঙ্গে গল্প করিতে-করিতে আসল গল্প লেখা আর হইয়া উঠিবে না। অতএব—

আলোটা নিজেই জ্বালিলাম। বিধাতা সৃষ্টি করিবার পূর্বে তাহার সমাপ্তির কথা কখনোই ভাবিয়া রাখেন নাই, তাই মহৎ জনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমিও আদ্যোপ্রান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া অগ্রসর হইলাম। কিন্তু সুবিস্তীর্ণ শূন্য আকাশ হইতে তারার আবির্ভাব সম্ভব হইলেও শূন্য মস্তিষ্ক হইতে ভাব-ভ্রূণের জন্মের আশা নাই,—এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া শোভাকে ডাকিতে যাইব ভাবিতেছি, আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

ভারি মিষ্টি করিয়া একটি গল্প লিখিবার ইচ্ছা হইতেছে। শোভাকে আমি যেমন ভালবাসি, তেমনি স্নেহসুধা দিয়া গল্পের প্রত্যেকটি ছত্র লিপ্ত করিয়া দিব। মনে হয় পৃথিবী যেন ক্রমশ ছোট হইতে-হইতে আমার এই ছোট ঘরটির মধ্যে আসিয়া হারাইয়া গিয়াছে। আজিকার সন্ধ্যায় কোনো নিরাশ্রয় গৃহহীন জীবিকার্জ্জনের জন্য পথে বাহির হইয়াছে এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিব না, পৃথিবীতে কয় কোটি লোক আয়ু ও প্রেমের জন্য তিলে তিলে আত্মহত্যা করিতেছে—তাহার খোঁজে আমার প্রয়োজন কি? মাটির খুরির বদলে গল্পে সোনার বাটি চালাইলেই গল্প-লেখক হিসাবে আমার সোনার সিংহাসন মিলিবে না এ যুক্তির কোন মানে নাই।

আমার নায়ককে ধনী করিব, মোটর কিনিবার মত অনেক পয়সা তাহার সম্প্রতি না থাকিলেও লোক-বিশেষের জন্য সে কিছু টাকা অপব্যয় করিতে পারে; (সেদিন যেমন শোভার আবদার রাখিতে গিয়া অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের যতগুলি বই ছাপা হইয়াছে সবগুলিই ভি, পি-তে গ্রহণ করিলাম।) আমার নায়ক জীবনে প্রেম পাইবে, সে সুস্থ, সহজ, সামাজিক। সমাজের বিধি অনুসারে, পৃথিবীর বহু কোটি অপরিচিত কিশোরীর মধ্যে যে একাকিনী মেয়েটি বিনা-দ্বিধায় তাহার প্রসারিত করতলে আপনার স্নেহস্বেদসিক্ত করতলটি উপুড় করিয়া রাখিবে—তাহার পরিচয়ে কী অসীম বিস্ময়, তাহারই মধ্যে সে একটি রহস্যনিগূঢ় কবিতার আবিষ্কার করিবে। সে কাঙালের মত করুণাকণা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে না, বিবাহ তাহার কাছে শুধু বিশ্রাম নয়, নারীর অন্তর্নিষ্ঠ পাতিব্রত্যে সে বিশ্বাসবান।

মোট কথা, গল্পের রজতের কথা ভাবিতে গিয়া জায়গায়-জায়গায় খালি নিজেরই ফটো তুলিতেছি। শোভার কাছে গল্পটা ভালই লাগিবে। কিন্তু, যাহাই বল, নিজেকে মুছিয়া ফেলিবার মত ব্যক্তিত্ব এখনো লাভ করি নাই। শুনিয়াছি বিলিতি লেখক গল্‌সোয়ার্দি নাকি নিজের কথা মোটেই বলেন নাই; তাঁহার মত আমি যদি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া আসিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক গল্পেই তাহার বড়াই করিতাম। কিন্তু আমি?—নেহাৎই goody-goody ভালমানুষের মত মুন্সেফি করিতেছি।

বৃষ্টিটা হঠাৎ ধরিতেই ঘড়িতে নজর পড়িল! আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ইহারি মধ্যে প্রায় পাঁচ ছয় পৃষ্ঠা লিখিয়া ফেলিয়াছি দেখিয়া নিতান্তই আশ্চর্য্য হইলাম। দেখিতেছি সাহিত্য ও রায়ের মধ্যে আমি কোন তফাৎই রাখিতেছি না। মাসে-মাসে সাহিত্যিক বন্ধুদের কাগজের স্থায়িত্বের জন্য চাঁদা দিব বলিয়াই যদি গল্পটা অমনোনীত না হয়—তাহার মধ্যে কোন আত্মপ্রসাদ নাই। যাহা হউক আবার কলম ধরিলাম।

শোভা হাতে একটা কাঁসার বাটি লইয়া হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া সব গোলমাল করিয়া দিল। শোভা আজ নতুন মাংস রাঁধিতেছে—তাই আমার ধ্যান ভাঙিবার মত পর্য্যাপ্ত সময় তাহার হাতে ছিল না। একটা উত্তপ্ত মাংসখণ্ড দুইটি সুকোমল আঙুলে করিয়া তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে শোভা বলিল—দয়া করে জিভ্‌টা বার কর ত, টুপ্‌ করে' ফেলে দি, চেখে দেখ ত, পেটের ভেতর নেবার উপযুক্ত হয়েছে কি না—

মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলাম—এখন আমাকে বিরক্ত করতে এস না শোভা। রান্না-ঘরে গিয়ে নিজেই চাখ' গে।

একটু অপ্রতিভ হইয়া শোভা আমার টেবিলের কাছে এত নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল যে তাহার খোলা চুলগুলি দুই মুঠিতে ধরিয়া ফেলিলাম। শোভা চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া বলিল—গল্প লিখ্‌ছ? খুব ভাল কথা,—কিন্তু খবরদার,—কারো থেকে টুকো না যেন। এমন গল্প লেখা চাই যা পড়লে মনে হবে মুহূর্ত্তমধ্যে বড়ো হ'য়ে গেছি। বলিয়াই নির্লিপ্তের মত মাংস তুলিয়া-তুলিয়া চিবাইতে-চিবাইতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণকালের জন্য কঠিন মাটির উপর নামিয়া আসিয়াছিলাম,—আবার অমর্ত্যলোকের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। অন্ধকার রাত্রিতে আকাশ ভরিয়া যিনি তারার পর তারার স্ফুলিঙ্গ ফোটান আমি তাঁহারই সমকক্ষ,—কল্পনার প্রশস্ত

রাজপথে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইয়া গেল; দুইজনে কালসমুদ্রের কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যেন মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আর কোন বন্ধন নাই,—হৃদয়ে যাহার স্পর্শ লাভ করিয়া অন্তরে-বাহিরে সুশোভন হইলাম সেই শোভাকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি। শুধু মহাকাল আমার সঙ্গী—সুদূর বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ। আমি যে মুন্সেফি করিতে একটা জংলি জায়গায় আসিয়া রোজ সকালে কুইনিন্ খাইতেছি, কে বলিবে; মাহিয়ানার আশায় মাসের প্রথম তারিখটির সঙ্গে যে আমি প্রেমে পড়িয়াছি আমাকে দেখিয়া তাহা জানিয়া ফেলে কাহার সাধ্য? শত সূর্য্যের মহিমা-মুকুট আমার শিরোভূষণ,—লেখনী আমার নবেন্দুলেখা,—অমাবস্যার তিমিরলিপ্ত আকাশ আমার পাণ্ডুলিপি! আর কথা-বস্তু? এই সৃষ্টির হৃদয়পদ্ম—প্রেম!

রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে,—তবু লিখিয়া চলিয়াছি; এইরূপ মহৎ উত্তেজনার মধ্য দিয়া রাত্রি প্রভাত হইবে ভাবিতে শরীরটা বীণার তারের মত বাজিতেছে, বাজিতেছে। মনে হয়, আমার হৃদয়ের ভাষা শুনিবার জন্য নিশীথিনী কান পাতিয়া আছে, শোভার মত সে ঘুমাইয়া পড়ে নাই। প্রতিটি মুহূর্তের লঘু অস্ফুট পদধ্বনি শুনিতেছি, আকাশের তারাগুলি যেন প্রতিটি অক্ষরের বাতায়নে মুখ বাড়াইয়া দিতেছে,—কী অপরীমেয় সীমাশূন্যতা! আশ্চর্য্য,—আমি আকাশাচারী দেহহীন প্রাণ—যেন শেলির অস্তিত্বহীন ভাবময় স্কাইলার্ক; শোভার সুকোমল পরশ-উত্তপ্ত সুখশয্যা আমার লোভনীয় নয়—শোভা ত শুধু একটি নম্র তুলসীমঞ্জরীর মত বাঙালি মেয়ে, ক্ষীণা, সচকিতা ভীরু হরিণী!

হঠাৎ পিছন থেকে কে চোখ টিপিয়া ধরিল। চম্‌কাইলাম বটে, কিন্তু চিনিলাম। তবু প্রশ্ন করিলাম—কে?

নম্র কণ্ঠে উত্তর হইল—তোমার সাহিত্যলক্ষী,—আর্ট!

চোখের পাতার উপর শোভার নরম ক্রমক্ষীণায়মান আঙুলগুলির স্পর্শ লইতে লাগিলাম। শোভা কাঁধের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোধকরি লেখাটাই দেখিতেছিল, হঠাৎ আমার হাত হইতে কলমটা টানিয়া লইয়া চোখ ছাড়িয়া লেখার নীচে একটা সমাপ্তির রেখা টানিয়া দিতেই অসহায়ের মত বলিয়া উঠিলাম—এখনো শেষ হয়নি।

শোভা অভিভাবিকার মত মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল—রাত শেষ হ'য়ে এল, এখনো তোমার লেখা শেষ হয় নি? স্বাস্থ্যটাকেও শেষ করতে চাও নাকি?

কোনোদিন এমন কথা বলি নাই, কিন্তু আজ বলিলাম- ছাই স্বাস্থ্য, ছাই আয়ু, ছাই তোমার বৈধব্য-ভয়—একটা মহান্ সৃষ্টির কাছে—

শোভা বলিল—তা হ'লেই হয়েছে! নরোয়েজিয়ান্ সাহিত্যের মত গল্পটাকে তা হ'লে নিতান্তই সেন্টিমেণ্টাল্ ক'রে তুলেছ! পড় ত শুনি, কেমন হয়েছে। বলিয়াই শোভা ইজি-চেয়ারটায় বসিল, গা এলাইয়া দিল না।

বলিলাম—সাহিত্যলক্ষী সামনে চোখ রাঙিয়ে ব'সে থাকলে কি ক'রে চলে? আর্ট! মাথার ওপর তোমার ঘোম্‌টা টেনে দাও! অস্পষ্টতাতেই তোমার শ্রী। কিন্তু আমার আর দেরি নেই, একটা প্যারা লিখে ফেলতে পেলেই ইতি। তুমি যেখানে লাইন টেনে শেষ ক'রে দিয়েছিলে সেখানে থেমে গেলেও চলত। কিন্তু তখনো sentenceটা শেষ হয়নি,—'তারপর' লিখে শুধু একটা ড্যাস দিয়েছিলাম। ওখানেই থেমে গেলে তোমার অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের সঙ্গে গল্পের শেষটার বেশ সঙ্গতি থাকত বটে, কিন্তু আমি ঐ মুদ্রাদোষ পছন্দ করি না।

যাই হোক্, শোভার উপস্থিতি উপেক্ষা করিয়াই আরো কতদূর অগ্রসর হইয়া নিশ্বাস ছাড়িলাম। কাগজের আল্‌গা টুক্‌রাগুলি সব কুড়াইয়া লইয়া একটা পেপার-ক্লিপ লাগাইয়া ঘাড় দুইটা একটু shrug করিয়া বলিলাম—হ'ল শেষ, শুনবে? কিন্তু তার আগে ল্যাম্পটাকে জাগিয়ে রাখবার জন্য দয়া ক'রে কিছু তেল খরচ কর।

ল্যাম্পে তেল ভরিতে-ভরিতে শোভা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার গল্পটাকে কি করলে?

প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিলাম, তবু বলিলাম—তার মানে? গল্পের পরিণতির কথা বলছ? আমার গল্প একটা কমেডি হয়েছে—একটা—কি বলব?—সুরসমন্বয়—এই সৌরসৃষ্টির মতই পূর্ণাবয়ব!

কথাটাকে যতদূর সম্ভব গৌরবব্যঞ্জক করিয়াই উচ্চারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কেন যে তাহা শুনিয়া শোভা হাসিয়া-হাসিয়া কুটি-কুটি হইতে লাগিল, বুঝিলাম না। মনে হইল, কে যেন মুঠি ভরিয়া কতগুলি নক্ষত্রের গুঁড়ো লইয়া ঘরের মধ্যে ছিটাইয়া দিল। আপাতত ঘরে আলো ছিল না, কান পাতিয়া থাকিলে অন্ধকারের দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা যায়, তাহারই মধ্য হইতে শোভার কণ্ঠস্বর যেন মৃত্যুর ওপার হইতে আসিতেছে মনে হইল।

—তুই এই রাত জেগে গভীর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ব'সে কমেডি লিখেছ? —ঠুন্‌কো, পলকা! প্রেমের গল্প নিশ্চয়ই? বিধাতা আমাকে যদি শুধু দেহশোভা না ক'রে মূর্ত্তিমতী কবি-প্রতিভা করতেন ও দু' চোখ ভ'রে এত ঘুম না দিয়ে যদি আকাশের অশ্রু দিতেন, তাহ'লে এই রাত্রে আমি একটা প্রকাণ্ড ট্র্যাজেডি লিখতাম, তোমার এস্কাইলাস্ পর্য্যন্ত মাথা নোয়াতেন। হার্ডি যেমন Dynasts

লিখেছিলেন,—নেপোলিয়নের ব্যর্থতা,—আমিও তেমনি গান্ধির ব্যর্থতা নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ড্রামা লিখতাম। এই কথা শুনে নিশ্চয়ই এবার হাসবার পালা তোমার—না?

হাসা উচিত ছিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে আলো ফের জ্বালা হইয়াছে দেখিয়া উদ্গত হাসিটা রোধ করিলাম। বলিলাম,–তোমার সেই অসম্ভব ঝালওলা মাংস খাবার আগে তুমি খানিকটা শুনে গেছলে. তার পর থেকেই সুরু করছি। মনে আছে ত' গোড়াটা?

শোভা বলিল—আছে বৈ কি, তোমার গল্পের নায়ক আধ-কবি রজতচন্দ্র একবিংশ শতাব্দীর একটি unreal মেয়ের সঙ্গে প্রেমের এরোপ্লেন চালিয়েছে—এই ত? কি নাম জানি মেয়েটির? অরুন্ধতী!—খাসা নাম।

শোভার কথা উপেক্ষা করিয়াই অগ্রসর হইলাম,—শ্রোতার এখানে কোনো ব্যক্তিগত সার্থকতা নাই, শোভা একটা উপলক্ষ মাত্র,—নিজেকেই যেন শোনাইতেছি এমনি ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

"পার্টি শেষ হয়ে গেছে,—ঘর প্রায় শূন্য। পদ্মের কুঁড়ির সঙ্গে পোড়া সিগারেটের টুকরো সতরঞ্চির ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। রজত এখনো বাড়ি যায়নি,—কোথায়ই বা যাবে?—একটা কৌচের ওপর হেলান দিয়ে প'ড়ে ছিল।

অরুন্ধতী শাড়ি বদলে এল—রাতের ঘনায়মান অন্ধকারের সঙ্গে কোমল নীলাম্বরীটি কবিতার একটি ভালো মিলের মতো ভারি সুন্দর খাপ খেয়েছে। খোঁপায় আর পদ্মকলিকা গোঁজা নয়, অনাড়ম্বর একটি রজনীগন্ধা,—স্নিগ্ধ অন্ধকারে যার গুণ্ঠনোন্মোচন! অরুন্ধতী বল্লে—জানি, তুমি এখনো যাওনি, কিন্তু যেতে ত তোমাকে হবে-ই।

রজত চঞ্চল হ'ল না, ক্লান্ত সুরে বল্লে–তবু উৎসবাবসানের পরে এই নিঃশব্দতার মধ্যে একটু বিশ্রাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

অরুন্ধতী আর একটা সোফায় ব'সে প'ড়ে যেন একটু বিরক্ত হ'য়েই বললে—এইখেনেই তোমার সঙ্গে আমার মেলে না। আধুনিকতা মানে বিশ্রাম নয়, স্পীড, ভেদ ক'রে চলে যাবার মতো একটা দুর্দ্ধর্ষ বেগ। তুমি এমন ভীতু যে একটা সিগ্রেট্ পর্য্যন্ত খাও না,—তুমি একটা কী!

রজত কিছু একটা বল্‌তে যাবার আগেই অরুন্ধতী ফের বললে—জান আমি

কী? আমি একটা আকারহীন নীহারিকা, এখনো রূপ নিতে পাচ্ছি না। কেউ দিতে চায় পৌরুষ, কেউ ঐশ্বর্য্য,—আর তুমি?

অল্প একটু হেসে রজত বললে—হৃদয়।

—হৃদয়? The grand piano? যে monoplaneএ আমি ছুটেছি সেখানে হৃদয় নামক লাগেজটিরো স্থান-সঙ্কুলান হয় না। অতএব ও সবে হবে না, রজত। Be a man!

অরুন্ধতীই ফের বললে—অমনি বুঝি অভিমানে মুখ ভার করলে, অমনি বুঝি একটা ব্যর্থ প্রেমের নতুন কবিতা লেখবার জন্য মনে মনে লাইন কুড়োচ্ছ। দাঁড়াও পিয়ানোটা বাজাই। (পিয়ানোতে বসিয়া) কি বাজাচ্ছি বল ত? সেই যে—

What my lips can't say for me
My finger-tips will play for me.

আচ্ছা এখন ঘরে ত' কেউ নেই, সব নীচে খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত, তুমি ইতিমধ্যে নেহাৎ ভালো মানুষটির মতো আমাকে চুমু খেতে পারো? ধর, আমি 'কেস্' করব না,—পারো? আমি ত ইথাকার রাজপ্রাসাদে বন্দিনী পেনিলোপ, তুমি ইউলিসিসের মত আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পার শত পানিপ্রার্থীর ব্যূহভেদ ক'রে? উত্তর দাও, রজত!"

ইজি-চেয়ারের প্রান্ত হইতে শাড়িটা খস্‌খস্ করিয়া উঠিতেই বুঝিলাম কি-একটা প্রতিবাদ করিবার জন্য শোভা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম—সস্তা সমালোচনার কসরৎ দেখাতে আগে থেকেই ক্ষেপে যেও না,—পথ বা পাথেয়র চেয়ে গন্তব্য স্থানের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর।

শোভা বলিল—আর কিছু না, একটু ঝিমুচ্ছি। যদি দয়া ক'রে সংক্ষেপে সারো ত তোমার বেচারি সাহিত্যলক্ষ্মীর আর মশার কামড় সইতে হয় না। বিছানায় শুলে আমি কক্ষনো তোমায় ঐ অরুন্ধতীর মতো বেয়াড়া প্রশ্ন করব না। রজতের মতো তোমার ন্যর্ভাস্ হবার কারণ নেই।

শোভার সকল টিপ্পনিই উপেক্ষণীয়, স্বামীর চাকুরি হইয়াছে দেখিয়া ও বেশ একটু ফাজিল হইয়া উঠিয়াছে, তাই আর একটা সিগারেট ধরাইয়া পাতা উল্টাইলাম।

"বাড়ি এসে রজতের ইচ্ছা হয় বই খুলে ব'সে রুপার্ট ব্রুকের সনেটগুলি ফের

পড়ে ফেলে,—হাতে কোনো কাজ নেই ; কিম্বা ডাউসনের মত একটা langorous কবিতা লিখলেও মন্দ হয় না। অরুন্ধতীকে ও কিছুতেই ধরতে পারে না, যেন প্রতিপদের চন্দ্রের ক্ষীণায়ু হাসিটি,—অরুন্ধতীই শেলির ইন্‌টেলেকচুয়েল বিউটি, ইয়েট্‌সের ছায়াময়ী প্রকৃতি,—এক কথায় psyche, যুবক কীট্‌সের। রজত বোঝে, অথচ বোঝা নামাতে পারে না ; দুই হাত পেতে মুক্তি ভিক্ষা করতে এসে সেই দুই হাত দিয়েই আঁকড়ে ধরতে চায়।”

শোভা আবার বাধা দিল, কহিল—মোটকথা, তোমার নায়কটি একটি মেরুদণ্ডহীন য়্যানিমিক— এক কথায় যাকে বলে ইডিয়েট্‌। অরুন্ধতী যে প্যাঁজের খোসা ছাড়ায়, কেরাসিন তেলে আঙুল ডুবিয়ে ল্যাম্প জ্বালে, ওর দেহটা যে একটা বীণাযন্ত্র না হ'য়ে শুধু যন্ত্র—এ বুঝি উনি বিশ্বাসই করতে চান না। তুমি এলিজাবেথান্‌ যুগে জন্মে কেন সনেট রচনা করলে না?—নাম থাক্‌ত! By the by, কমেডিটা কোথায়? অরুন্ধতীর সঙ্গে রজতের বিয়ে দিলে? বলিহারি!

বলিলাম,—তা নয় ; আচ্ছা বাদ দিয়েই পড়ছি।

—যদি দয়া ক'রে তোমার কাব্যি-করা ভাষাটা ছেড়ে মুখে মুখেই গল্পটা সারো তা হ'লে ব'সে না ঘামিয়ে আরো একটু ঘুমুনো যায়।

অসম্ভব। সুর চড়াইয়া দিলাম।

“*** কিন্তু অরুন্ধতী যদি এম্‌নিই অদৃশ্য হ'য়ে যেত, সেই অদৃশ্যতার মধ্যেই রজতের কল্পনা রহস্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠত হয় ত'। সে আশাও করেছিল তাই। যে-ফুল ফুটে থাকে, আর যে-ফুল গন্ধ দিতে ভুলে গেছে—এ দুয়ের মধ্যে শেষেরটার প্রতি-ই রজতের পক্ষপাত! তাই অরুন্ধতী যদি হারিত সোম ডি-লিট্‌কে বিয়ে করত, তা হ'লেই রজত যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাব্যালোচনায় মন দিতে পারত, কিন্তু অরুন্ধতী হাতছানি দিয়ে ডাক্‌লে রজতকেই—”

গল্প বন্ধ করিয়া বলিলাম—শুনছ শোভা? তার পর কি হল জান?

শোভা বলিল—ভাগ্যিস্‌ জানি না। তুমি যদি তোমার পিরিলি বামুনের গলাটা থামিয়ে মুখে মুখেই বল তা হ'লে তাড়াতাড়িও হয়, বাঁচাও যায়!

অগত্যা তাহাই হইল; বলিলাম—রজত ভয় পেয়ে গেল। ওর ধাতে অরুন্ধতীকে বিয়ে করা সইবে কেন? ওর কাছে অরুন্ধতী হচ্ছে ঠুনকো অথচ বহুমূল্য 'ড্রেস্‌ডেন চায়না,'—ওর হাত লাগলেই তা ভেঙে যাবে। রজত এই দায় থেকে খালাস পাবার জন্য সুদূর ডিব্রুগড় থেকে একটি গরিব ডাক্তারের মেয়ে বিয়ে ক'রে আন্‌লে। রজত বেঁচে গেল,—আমারই মত বউয়ের সৌভাগ্যে খাট-গদি না পেলেও একটি ছোট খাটো চাকরি পেয়ে গেল, বেশ সরল গ্রাম্য জীবন নিয়ে সহজ কবিতা লিখ্‌তে লাগল, দিনে-দিনে বেশ গোলগালটি হ'য়ে গেল যা হোক্‌। দুর্দ্দমনীয় প্যাঁচের প্রাবল্যে অরুন্ধতী কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে, একটি ভীরু মেয়ের সঙ্গে একটি সুখনীড় তৈরি ক'রে রজত—

শোভা বাধা দিয়া কহিল—সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করতে লাগলো। এই তোমার কমেডি? বেশ, খাসা। তোমাকে ডেকে সবাই নোবেল প্রাইজ দেয় না কেন? বিলেতে জন্মালে নিদেন পক্ষে এই গল্পের জন্যই হয় ত O. M. পেতে—

গম্ভীর হইয়া কহিলাম—তোমারো তাই মনে হবে যদি বাকিটুকুও শোন। আমি পড়ছি। আর বেশি নেই।

এখন হইতেই অন্ধকার ধীরে ধীরে বিদায়-বেলার প্রিয়া-চক্ষুর মত তরল হইয়া আসিবে, পূব আকাশে শুকতারাটি এখনো জাগিয়া রহিয়াছে। নদীর পারের ঝাউয়ের পাতা দুলাইয়া বাতাস সামান্য একটু কথা কহিল। শোভাকে যে কী অপরূপ সুন্দর দেখাইতেছে তাহা কোথায় আঁকিয়া রাখিব। বাহুর ক্ষণিক বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া উহাকে ছন্দের মধ্যে চিরবন্দিনী করিয়া রাখিবার মত যদি আমার কাব্য-প্রতিভা থাকিত, তাহা হইলে আর কথাই ছিল না। ব্রাউনিঙ-ও আমারই মত এমন স্নেহার্দ্র চক্ষু দিয়া শয়ানা ব্যারেট্‌কে দেখিয়াছিলেন কি না কে বলিবে? এস্‌ক্লিপিয়াডিস্‌ নাকি বলিয়াছেন—পিপাসার্তের জন্য নিদাঘসন্ধ্যায় তুষার অত্যন্ত মধুর, সমুদ্রযাত্রী নাবিকের পক্ষে বিষণ্ণ শীতের পর বসন্তের ফুল-উৎসব ও উষ্ণতা লোভনীয়, কিন্তু একই শয্যায় একই আচ্ছাদনের নীচে দুইটি প্রেমিক-দেহের তুলনা কোথায়? বিবাহের সম্বন্ধ আসিলে প্রথম যখন শোভাকে দেখিতে গিয়াছিলাম সেদিন-ও আজিকার মতই মনে সুমধুর ভাব-লাবণ্য ছিল, সেদিন-ও সেই অপরিচিতা মেয়েটিকে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ার মতই আত্মা দিয়া স্পর্শ করিয়াছিলাম;—সৌভাগ্য-ক্রমে বিবাহ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এই কথাটা ভাবিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি। আমি তরঙ্গ-ফেনসঙ্কুল নদী না হইয়া এই যে একটি প্রশান্ত স্বচ্ছনীর হ্রদ হইয়া আছি, এ-ই আমার কাছে ভারি ভালো লাগিতেছে। সাফল্যের জন্য ব্যস্ততা নাই, আশা-ভঙ্গের মহত্তর ব্যর্থতাও নাই,—ভারি সহজ ও স্বচ্ছন্দ; ডেভিসের মত

এই Sweet Stay At Home আমারও চোখে নেশা ধরাইয়া দিয়াছে। ছোট সংসার, শোভার ছোট দুটি করতলে আকাশভরা স্নেহ,—শোভা তাহার প্রথম সন্তানটির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কি ভীরু অথচ কি উৎসুক এই প্রতীক্ষা! একটি ভাবী শিশুর সুখকলহাস্যে গৃহাঙ্গন মুখর হইবে ভাবিতে আমার শরীরেও সুখাবেশসঞ্চার হইতেছে। বিধাতাকে নমস্কার,—আমি এই পরিমিত, সহজস্ফূর্ত জীবনযাপন ছাড়িয়া একটা আগ্নেয় পর্বতের মত বাঁচিতে চাহি না।

আমার চেয়ারটা শোভার অত্যন্ত কাছে টানিয়া নিলাম। শোভা কহিল—একটা কথা জিগ্‌গেস করি। এত যে লিখছ, রজত পয়সা পাচ্ছে কোথা থেকে, খায় কি, বিয়ে যে করল তার সঙ্গে ওর বনে কি না, ওদের সংসারে ক'বার মৃত্যু ছায়া ফেল্‌ল, ক'বার আশার পাখী উড়ে গেল, মেয়েটি রজতের কাছে খালি মার্থা, না মেরি-ও—এই সব কিছুই ত ইঙ্গিত করছ না! খালি একটানা সুখের সন্দেশ খাইয়ে খাইয়ে মুখ ফিরিয়ে আন্‌লে। ওগো কবি, তোমার রচনায় একটু দুঃখের সুধা মেশাও. যে-দুঃখ সৃষ্টিকে সুন্দর করেছে, মহান করেছে। কিম্বা সংসারের ছোটখাট দুঃখই, যা জীবনকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দেয়—যে দুঃখ স'য়ে মানুষ না পায় তৃপ্তি, না পায় অহঙ্কার!

আমার গলার স্বরটা স্বভাবতই যেন নামিয়া আসিল, যেন আমি কি একটা বেদনার খবর দিতেছি। কণ্ঠস্বরের অনুচ্চতার মধ্যেই বেদনার একটি রহস্য রহিয়াছে। বলিলাম—প্রভাতের পাখী ডেকে না উঠতেই রাতের এই পাখীর গান থামবে।

"অরুন্ধতী তার প্রেমের কনভেন্‌শ্যন্ বজায় রেখেই অবশেষে নীরদ গাঙ্গুলিকে বিয়ে করলে,—নীরদ ব্যারিষ্টার, 'বিলেতে থেকে স্ক্যাণ্ডেল ক'রে এসেছে বলে'ই যেন অর্দ্ধ-অবিশ্বাসের সঙ্গে অরুন্ধতী তার টু-সিটার মোটরে গিয়ে ব'সে পড়ল।***

কে কার খোঁজ রাখে? অতীত স্মৃতি ক্রম-বিলীয়মান ধূপসৌরভের মত,—অরুন্ধতী ও রজতের হাত-ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল। দু'জনে বন্‌তও না, অরুন্ধতী যদি হয় আকাশ, রজত নীড়—তাই কা'র কি দুঃখ হ'ল কে জানে, অরুন্ধতী হাতে মোটরের হুইল্ নিলে আর রজত নিলে একটি ভীরুকম্পিত প্রদীপ-শিখা!"

একটু থামিলাম। শোভা কহিল—ভারি শ্রান্ত উদাসীন স্বর: তার মানে নীরদকে অরু বিয়ে করলে যার প্র্যাক্‌টিস না থাকলেও টাকা বাগাবার ট্যাক্‌টিকস্ আছে, যে বিলেত থেকে ঘুরে এসেও এখনো 'টাই' বাঁধতে শেখেনি। তারপর?

"*** কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বুঝি অস্ত যাচ্ছে, পশ্চিমাকাশটা তপস্যানিরতা অপর্ণার দেহাবয়বের মত পাণ্ডুর হ'য়ে উঠেছে। তারিখটা ছিল উনিশে মাঘ, অরুন্ধতীর জন্মদিন। এই মধ্য রাত্রেই সে জন্মেছিল নিশীথ রাত্রের মর্ম্মোচ্ছ্বাসের মত—অরুন্ধতী, গ্রীক্‌দেবী জুনোর চেয়েও মহিমান্বিত, সিথেরিয়ার নিশ্বাসের চেয়েও লঘুচিত্ত। তোমরা হয় ত ভাবছ, রজতের বুঝি তাই ভেবে রাত জাগতে ইচ্ছে হয়েছিল। মোটেও নয়,—এমনিই একটু মনে প'ড়ে গেছল হয় ত'। মনে ক'রে না রাখলেও মাঝে মাঝে মনে পড়ে—এতে স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট মানুষের হাত কি? কিন্তু সেই স্মৃতি রজতকে অস্থির ক'রে ছাড়ল না, রজত নুয়ে প'ড়ে ধীরে ধীরে তার পার্শ্বশয়ানা শ্লথাবগুণ্ঠা মিনুর ক্ষুদ্র ললাটটি স্পর্শ করল। কিন্তু পরক্ষণেই—"

শোভা যেন একটু চমকাইল মনে হইল। ধীরে আমারই দুইটি কথার পুনরাবৃত্তি করিল: কিন্তু পরক্ষণেই—হ্যাঁ, তার পর?

অগ্রসর হইলাম।

"কিন্তু পরক্ষণেই দুয়ারে যেন কার করধ্বনি শোনা গেল, প্রথমে মৃদু, পরে স্পষ্টতর। রজত মিনুর ঘুম না ভাঙিয়েই খাট থেকে নেমে প'ড়ে নিঃশব্দে দুয়ার খুলে দিল। যেন সে বহুপরিচিত কোন্ প্রত্যাশিত বন্ধুর জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। মেঘের বিছানায় চাঁদ তখন প্রায় ম'রে এসেছে, সমস্ত আকাশ শোকাশ্রু সঞ্চিত চক্ষুর মত নিষ্পলক নিরানন্দ হ'য়ে আছে।"

—দুয়ার খুলে রজত কাকে দেখল, জান?

শোভার চোখ বোজা, অতি ধীরে নিশ্বাস ফেল্‌ছে, যেন অতি কষ্টে বললে—জানি; অরুকে! কিন্তু তার পর?

"অরুন্ধতীর সে কী চেহারা হয়ে গেছে, যেন আকাশ পারের ঐ মুমূর্ষু চাঁদটা,—হতশ্রী, লাবণ্যশূন্য। রজত ত দেখে অবাক, প্রায় নিশ্চেতন। অরুন্ধতী যেন একটু এগিয়ে এল; মৃত্যু যদি কথা কইতে পারত এমনি স্বরেই কইত তা হ'লে: তুমি আমাকে একদিন বিনামূল্যে যে জিনিস দিতে চেয়েছিলে, দেবে তা? তাই নিতে আমি সব ছেড়ে এসেছি, ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি ও অফ্‌স্প্রিঙ্। দেবে?

রজত ব্যাপারটা সব বুঝতে পারলে, কিন্তু এত দূরে এই গভীর রাত্রে রজতের সুখশয্যাগৃহের রুদ্ধ দ্বারে এসে যে করাঘাত করতে পারে তার যে কি অপরিসীম দুঃখ, কি ভয়াবহ ব্যর্থতা তা মেনে নিতে কি রজতের যথেষ্ট হৃদয়ানুভূতি ছিল না?

রজত বললে—না। বড় রাস্তায় পড়লেই ট্যাক্সি পাবেন, বাড়ি ফিরে যান্, নীরদবাবুর এখনো ঘুম ভাঙেনি হয়ত'—

"ব'লেই রজত দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। তার পর—"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আসিতেছিল বুঝি, অর্ধ পথেই টুঁটি টিপিয়া ধরিলাম। বলিলাম—এই 'তারপরে'র পরেই তুমি শেষ করতে চেয়েছিলে। তুমি যাদেরকে চ্যাম্পিয়ান কর সেই অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের হাতে এই গল্পটা পড়লে তাঁরা কি করতেন? রজতকে দিয়ে রুপার্ট ব্রুকের মত সেই কবিতা লেখাতেন,—কি জানি সে কবিতাটি—ঘরে ফিরে এসে তাকে দেখলাম, ব'সে আছে চেয়ারে, সেই চুল, সেই নোয়ানো ঘাড়, সেই তার দেহবঙ্কিমা,—তার পর?—না, সব ছায়া, মৃগতৃষ্ণিকা।—'বল কেমন ক'রে আর রাত জাগি, আর কি আমার আসে ঘুম?' ...হোপলেস্।

শোভা কহিল—তোমার রজত কি করলেন?

বাকিটুকু পড়িয়া ফেলিলাম।

"আজকাল শেষ রাত্রের দিকে বেশ একটু শীত ক'রে আসে ব'লে পায়ের নীচে একটা চাদর থাকে। দরজা বন্ধ ক'রেই রজত তাড়াতাড়ি মশারির নীচে ঢুকে চাদরটা গায়ের উপর টেনে দিলে। যেন ও একটি সুরক্ষিত মন্দিরের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে,—মিনুর দেহ স্পর্শ ক'রে ওর অত্যন্ত নিরাপদ ও অব্যাহত মনে হচ্ছিল।"

শোভা ক্লান্তস্বরে কহিল—গল্পের কি নাম রাখলে?

—ছায়া। অরুন্ধতী ত' আর সত্যিই আসেনি?

—আসে নি নাকি? খাসা গল্প ত'! আচ্ছা, তার পর?

শোভারই কাছটিতে সরিয়া আসিয়া একটু হেলান দিয়া বসিলাম। বলিলাম —এর আবার তার পর কি?

—তার পর নেই? যে-মিনুর জন্য অরুন্ধতীকে তুমি রজতকে দিয়ে তাড়িয়ে দিলে, সেই মিনুর জীবনও অরুর মতই অতৃপ্ত কি না তার ইঙ্গিত কোথায়? 'শেষের কবিতায়' বিবাহিত অমিত ও বিবাহিত লাবণ্যর বন্ধুতা না-হয় কবিতার খাতিরে মান্‌লাম, কিন্তু সেই বন্ধুতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই কেন? ঘটনার মুখোমুখি কেন দাঁড়াতে শেখনি?

বলিলাম—ভোর হ'য়ে আস্‌ছে, না শোভা? একটু বেড়াতে যাবে?

আশ্চর্য্য, নিজেই বেড়াতে যাইবার প্রস্তাব করিয়া কখন যে ঐ অবস্থায়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, খেয়াল নাই—জাগিয়া দেখি আলোতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে, ল্যাম্পটা এখনো জ্বলিয়া জ্বলিয়া যেন প্রভাতের রৌদ্রকে মুখ ভেঙ্‌চাইতেছে। ল্যাম্প ও রৌদ্র নিয়া মনে মনে একটা রূপক রচনা করিব ভাবিতেছি, মাথায় একটা কঠিন কিছুর স্পর্শ পাইতেই চমকাইয়া চাহিয়া দেখি শোভা ইজি-চেয়ারটাতেই প্রায় উবু হইয়া চিরুনি দিয়া আমার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে,—কখন যে চা হইবে, কখনই বা যে রান্না হইলে কোর্টে যাইব তাহার কিছুই হদিস্ নাই। শোভা যে এমন করিয়া আলস্যসম্ভোগ করিতে পারে ইহার আগে ধারণাই করিতে পারি নাই। উহার চক্ষু দুইটির নাগাল পাইবার জন্য মাথাটা উঁচু করিয়া ধরিলাম; মনে হইল উহার চক্ষু দুইটি যেন তৃণাঙ্কুরলগ্ন শিশিরবিন্দুর মত টল্‌টল্ করিতেছে—তাহাতেই যেন একটি প্রশ্ন দুলিতেছে: তার পর?

বটতলা

শ্বশুর মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন, দশটা না বাজতে যাবে, আর বাড়ি ফিরবে সন্ধ্যায়। অধ্যবসায় চাই। তা ছাড়া, এ রকম hours রাখলে লোকে ভাববে busy practitioner। প্রথমটা লোকের চোখে একটু ধূলো দিতে হয় বৈ কি। যোগাড়ে হওয়া চাই হে নটবর!

বিবাহের সময় স্ত্রীর বর্ণমালিন্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পণ নিতে হইয়াছিল বলিয়া শ্বশুরের উপদেশ মাথা পাতিয়া নিতে হইতেছে। 'রেস্' খেলিয়া সেই টাকাটা চোঁ করিয়া উড়িয়া গেছে,—কোর্ট কম্পাউণ্ডে বটতলায় সামান্য একটা তক্তপোষ ফেলিবার মত সামান্য টাকা রোজগার করিতে পারিতেছি না। ভাগ্য একেবারে নাজেহাল করিয়া ছাড়িল।

থাকি একটা অপরিষ্কার গলিতে খোলার ঘরে—মিউনিসিপ্যালিটির টাক্স

দিতে হইবে বলিয়া সাইন্‌বোর্ড টাঙাইবার সাহস নাই; তবু দশটা বাজিতে না বাজিতে মোটা ভাতের সঙ্গে অর্ধসিদ্ধ কতগুলি আগাছা গিলিয়া হাঁটিয়াই কোর্টে যাই ধূলা খাইতে। নতুন বাহির হইয়াছি বলিয়া পোষাকটা এখনো তেজীয়ান আছে; পোষাক ছিঁড়িতে সুরু করিলে সিভিল কোর্টে গিয়া হাই তুলিতে আরম্ভ করিব।

বসিবার জায়গা নাই, বার-লাইব্রেরিটা একটুখানি,— খান বার-চৌদ্দ চেয়ারেই ঘরটা ফুরাইয়া গেছে। চেয়ারগুলি ভাঙা, বসিবার জায়গার বেতগুলি খসিয়া গেছে, দেয়ালে নস্যলিপ্ত সিক্‌নির দাগ, পানের পিক্‌—দুর্দ্দশার আর সীমা-পরিসীমা নাই। তবু, বার-লাইব্রেরির বাৎসরিক চাঁদা না দিয়াই একদিন লুকাইয়া চেয়ারে বসিয়া এ-জন্ম ও পরবর্তী জন্মের সাধ একসঙ্গে মিটাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু বসে কাহার সাধ্য! দুপুরবেলায় রাস্তা দিয়া মহিষ-চালানো বন্ধ করিবার জন্য এত মারামারি, কিন্তু এই যে দিনের পর দিন ঘাসবিহারী হইয়া শুক্‌নো রোদে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুড়িয়া মরিতেছি তাহাতে কাহারো করুণা-সঞ্চার হইবে না।

অনেকেই গাছতলায় তক্তপোষ পাতিয়াছে—তাহার উপর একখানা ছেঁড়া মাদুর ও একটা কাঠের বাক্স,—সব মিলিয়া ইহাকে সেরেস্তা বলে। নানারকম পোষাক পরিয়া এই তক্তপোষের উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে মক্কেলের আশায়; কোন লোক খালি-পায়ে ও ময়লা কাপড়ে তক্তপোষের কাছে একটু আসিয়া পড়িলেই উকিলদের আনন্দে হৃৎস্পন্দন সুরু হয়— সারি-সারি সেরেস্তায় সাড়া পড়িয়া যায়, দালালরা আসিয়া শবলুব্ধ শকুনের মত মক্কেল লইয়া কামড়াকামড়ি করিয়া পরস্পরকে কখনো কখনো বিবস্ত্র করিয়া ফেলে। দেখি, আর 'মা জগদম্বা' বলিয়া হাই তুলি।

সকালে টিউশানি সারিয়া কোর্টে আসিয়াই টুপিটা একটা পানের দোকানে জিম্মা রাখিয়া এখানে সেখানে চষিয়া ফিরি। সেদিন দেখিলাম বাদামতলায় কে একটা সন্ন্যাসী যথারীতি পুঁথিপত্র লইয়া বসিয়াছে; পেণ্টুলান্‌টা গুটাইয়া তাহার কাছে বসিয়া পড়িয়া হাত দেখাইলাম। আমার হাতে নাকি বুধ স্থানে চক্র আছে, এ-চিহ্ন নাকি একমাত্র নিউটনের হাতে ছিল; হাইকোর্টের জজ্‌ আমাকে হইতেই হইবে, আজ এরকম ভাবে না হয় খুঁটিহীন গরুর মত ঘুরিয়া মরিতেছি, কিন্তু আমাকে না হইলে এত বড় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যটাই চলিবে না। মনে মনে একবার শেষ পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিলাম—এক সুরেন মল্লিকের সঙ্গে দেখা হইল! ইচ্ছা হইল গণকঠাকুরকে একটা পেন্নাম ঠুকিয়া দিই। যাই বল, লোকটার চেহারায়

একটা দীপ্তি আছে, কথাগুলি গম্ভীর, মোটেই ছ্যাবলা নয়—এমন প্রশস্ত কপাল খুব কম লোকেরই দেখা যায়। শেইরো ইহার পায়ের তলায় বসিয়া রেখাবিচার শিখিয়া গেলে ভালো করিত। নটবরের সঙ্গে নিউটনের নামেরও চমৎকার সাদৃশ্য রহিয়াছে। রীতিমত লাফাইয়া উঠিলাম।

থার্ডক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে গিয়া বসি। ছোটখাটো নানারকম 'কেস্' হয়, —শুনিতে শুনিতে মনটা গিস্‌গিস্ করিয়া উঠে। ইস্, আমি যদি এই ঠোঁট-কাটার মোকদ্দমাটা পাইতাম তবে ইংরেজি বুক্‌নিতে ম্যাজিস্ট্রেটকে হাঁ করিয়া দিতাম নিশ্চয়! উকিলগুলি শুদ্ধ করিয়া ইংরেজি পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেছে না, থামিয়া থামিয়া বাঙলা ঢুকাইয়া কথায় পারম্পর্য্য রাখিতেছে; ম্যাজিস্ট্রেটও তথৈবচ, সাক্ষীর জবানবন্দী অনুবাদ করিতে প্রতি পৃষ্ঠায় পাঁচটা করিয়া sequence of tense-এর ব্যাকরণ-ভুল। পয়সা চাই না, যদি একবার একটা মোকদ্দমা অন্তত হাতে পাইতাম—ঐ বি-এ ফেল্ ম্যাজিস্ট্রেটকে ঠিক হইয়া বসিতে দিতাম না।

নটবর বিশ্বাসের আয়ুই ফুরাইতে লাগিল—এখনো ওকালতি-সমুদ্রের পারে বসিয়াই নিউটনের সঙ্গে যাহোক্ করিয়া যোগসূত্র রক্ষা করিতেছি। ঘরে গৃহিণী যেমন সতীত্ব-পরীক্ষার সুযোগ পাইলেন না বলিয়াই চিরকাল পতিব্রতা রহিয়া গেলেন, তেমনি আমিও একমাত্র সুযোগের অভাবেই রাসবিহারী ঘোষের পরিত্যক্ত সিংহাসনটা অধিকার করিতে পারিলাম না বোধ হয়।

যাই হোক্, যে গণকের চেহারায় ভাস্বর দীপ্তি দেখিয়া নিজের ভবিষ্যৎও অনুরূপ উজ্জ্বল বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সেই গণকই আরেকদিন একটি লোককে দেখাইয়া দিয়া আমাকে বলিল—একে তোর বাহন কর, স্বর্গে নিয়ে যাবে।

ষাঁড় চড়িয়া শিব স্বর্গে গিয়াছিলেন জানি, কিন্তু উদ্দিষ্ট লোকটির সঙ্গে বলি-বর্দ্দের কোনই সাদৃশ্য দেখিলাম না। লোকটা যেমন ঢ্যাঙা তেমনি কাহিল,—ষাঁড় না বলিয়া সাঁড়াশি বলা যাইতে পারে। ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি প্রায় পায়ের পাতার উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছে কানের পিঠে বিড়ি গোঁজা, পেটেণ্ট লেদারের পাম্পশু পায়ে। পা দুইটা একত্র জোড় করিয়া কোমরটা নীচু করিয়া দিয়া এমন ভাবে দাঁড়াইবার একটা ভঙ্গি পেটেণ্ট করিয়া নিয়াছে যে লোকটাকে সাঁড়াশির সঙ্গে তুলনা করিতে বেগ পাইতে হয় না। আমার দিকে চাহিয়াই উহার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, নীচের পুরু ঠোঁটটা ঝুলিয়া পড়িল ও সেই অবকাশে অধরান্তরাল হইতে যে দাঁতগুলি আত্মপ্রকাশ করিল সেই দাঁতের কথা

ভাবিয়াই ছেলেবেলা রীতিমত ভয় পাইয়াছি। এখনো মনটা একটু ছাঁৎ করিয়া উঠিল, কিন্তু মক্কেলের চেহারা-বিচার করিলে চলে না।

লোকটি আমার দিকে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া আঙুল নাড়িয়া কহিল,—হবে। আপনার হবে।

নিজেই অগ্রসর হইলাম। বলিলাম—নিশ্চয়ই হবে। কি তোমার মোকদ্দমা, ম্যাজিষ্ট্রেট এসে বসেছে, টাকা দাও, ওকালত-নামা আর ডেমি কিনে আনিগে। বলিয়া সত্যসত্যই হাত মেলিয়া ধরিলাম।

লোকটা নড়িল না। তেমনি নীচের ঠোঁটটা ঝুলাইয়া রাখিয়া বলিল,—হবে, এই ত' চাই। ভয় নেই কিছু আপনার। কোথায় থাকেন আপনি?—নীচের ঠোঁটটা দাঁতের সঙ্গে ঠেকাইয়াই প, ব ও ত উচ্চারণ করিল।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম,—কোথা থাকি সে খোঁজে তোমার লাভ নেই। মামলা করতে এসেছ? তা হ'লে আর দেরি কোরো না। দেরি হ'লে পেস্কারকে ডবল দিতে হবে।

লোকটা তেমনি উদাসীন থাকিয়াই কহিল.—চলুন ঐ ট্রেজারির কাছে, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

লোকটাকে অনুসরণ করিলাম। লোকটা একটা জায়গায় হঠাৎ দাঁড়াইয়া কহিল,—আমি মশাই টাউট, দালাল—আপনাকে মোকদ্দমা এনে দেব।

উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।—এনেছ?

—ব্যস্ত হবেন না। কদ্দিন বেরুচ্ছেন?

—মাস ছয়েক।

—পেয়েছেন একটাও?

—না।

—কি করেই বা পাবেন? পাওয়ার হাউস্ না থাক্‌লে কি আর বাতি জ্বলে? কি কর্‌ছেন তা'লে য্যাদ্দিন?

—যাই আর আসি। কখনো কখনো পাঁচটা পর্য্যন্ত টিক্‌তে পারি না। মিড্‌ডে ফেয়ারে তিন পয়সা বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরি।

লোকটা তাহার পেটেণ্ট ভঙ্গিতে শরীরটাকে স্থাপন করিয়া কহিল,—ভয় নেই আপনার. আপনার খোলার বাড়ি দালান ক'রে ছাড়ব। সব 'পেটি' কেস আমার হাতে, পেটি কেস ক'রে হাত আগে মক্স ক'রে লিন, পরে সেসন্‌স্ কেস পাবেন। এভিডেন্স ম্যাক্টটা ফের ভালো ক'রে প'ড়ে লেবেন।

লোকটার উপর রাগ হইল বটে, কিন্তু প্রকাশ করিতে সাহস হইল না।

কহিলাম,—মোকদ্দমা তুমি এনে দাও, পয়সা আমি চাই না, আমি একবার দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাই। এইসব পুঁচকে উকিলদের জলো সিক্স্‌থ ক্লাশের ইংরিজি আমি একবার দেখে নেব।

—আলবৎ লেবেন। একটা সিগ্রেট্‌ খাওয়ান ত? বলিয়া, লোকটা বেমালুম আমার কাঁধের উপর হাত রাখিল।

আত্মসম্মানে বাধিল বধে, কিন্তু উহার হাতটা ঘৃণায় নামাইয়া দিলেই বা রাতারাতি কোন্‌ রাজ্য মিলিবে? উহাকে পান ও সিগারেট্‌ কিনিয়া দিলাম। লোকটা বলিল,—ঐ যে রামেন্দ্র বাবু দেখছেন লাট্টুর মত কোর্টে কোর্টে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ওর পসারটা কা'র জন্যে হ'ল? এই বাঁড়ুয্যের জন্য। বার আনা চার আনা হিসেব। চার টাকা ফি হ'লে আমি নিতাম তিন টাকা; এই ক'রে না লোকটা আজ ময়ূরপুচ্ছ গজিয়েছে! গণকঠাকুরের সুপারিশে বাঁড়ুয্যের জন্য উকিলদের মধ্যে কত বার ধ্বস্তাধ্বস্তি হ'য়ে গেছে। নস্য আছে?

আরেক জনের কাছ হইতে নস্য চাহিয়া বাঁড়ুয্যেকে দিতেই বাঁড়ুয্যে তাহা পানের সঙ্গে খাইয়া ফেলিল। বলিল,—বেশ। কিছু ভাববেন না আপনি, আমি যার ভরসা, ভাঁড়ে তার ফুটো হয় না। কিন্তু পাঁচটা টাকা যে দিতে হবে। একটা তক্তপোষ পেতে সেরেস্তা করতে না পারলে ত আর ইজ্জৎ থাক্‌বে না। মক্কেল এলে কোথায় তাদের বস্‌তে দেবেন? আপনার গদি ব'লে কোন্‌টা তারা চিনে রাখবে বলুন। ঘুরে বেড়ালেই ভাগ্যে শিকে ছেড়ে না মশাই।

বুঝিলাম এতদিন সেরেস্তা করা হয় নাই বলিয়াই এত পিছাইয়া রহিয়াছি। লোকটা ফের বলিল,—উকিলের শুধু দুটো জিনিষ চাই মশাই, ঠাট্‌ আর ঠোঁট। বেশ, দিন্‌। কালই এনে রাখব।

বলিলাম,—সঙ্গে ত এখন নেই, বাঁড়ুয্যে। কাল আমার বাড়ি যেয়ো। উহাকে ঠিকানা দিয়ে দিলাম। কোমর বাঁকাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কহিলাল,—রামেন্দ্র বাবু প্রথম প্রথম তবু চার আনা নিয়েছেন, দু' আনাতেই আমার চলবে। আমাকে গুচ্ছের মোকদ্দমা এনে দাও ভাই।

দাঁত দিয়া ঠোঁটের সঙ্গে 'ব' উচ্চারণ করিয়া বাঁড়ুয্যে ঘাড় দুলাইতে দুলাইতে বলিল,—হবে, হবে। লিশ্চয়ই রবে।

বাড়ি ফিরবার সময় পোষ্টাপিসের কাছে রামেন্দ্র বাবুকে যাইতে দেখিলাম। সনদ লইবার পরে শ্বশুর মহাশয় রামেন্দ্র বাবুর কাছে আমার এক পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন, আমি বড় আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। রামেন্দ্র বাবু আমার মুখের দিকে শ্যেন-দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা

করিলেন,—চিটিং ডিফাইন্ কর ত ছোক্রা। কথা শুনিয়া শুধু ঘাবড়াইলাম না, রীতিমত অপমানবোধ করিলাম। তখনো পয়সা-রোজগারের নিদারুণ কৃচ্ছ্র-সাধনায় আত্মসম্মানকে ভালি দিই নাই। চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিলাম,—পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে যাবেন, বুঝিয়ে দেব।

পরে মনে হইয়াছে চটিয়া ভাল করি নাই। কত জুনিয়ারই ত দিব্যি রামেন্দ্র বাবুর দৈনিক বাজার-সওদা করিতেছে, একজন মাগনা তাহার ছেলেকে কোচ করে, সেদিন কোর্টে রামেন্দ্র বাবুর মোজা খুলিয়া গেলে একজন তাঁহার গার্টার লাগাইয়া দিয়াছিল! কায়স্থের সন্তান হইয়া দুর্ব্বাসার অনুকরণ করিতে গিয়া এখন দুর্ব্বার চেয়ে আর বেশি কিছু আশা করিতে পারিতেছি না। যাই হোক, সামনে রামেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া মনে মনে রাস্তার উপর লাথি মারিলাম। কোনো মোকদ্দমায় রামেন্দ্র বাবুকে বিপক্ষে পাইবার দিন এইবার ঘনাইয়া আসিতেছে। চাঁটিং মারিয়া 'চিটিং' কাহাকে বলে বুঝাইয়া দিব।

বাড়িতে আসিয়া দেখি কমলা বিছানা পাতিতেছে। অর্ধপ্রস্তুত শয্যার উপরে কোর্টের পোষাকে বসিয়া পড়িয়াই কমলাকে আদর করিতে সুরু করিলাম। জীবনে কি নবীন সৌভাগ্যোদয় হইল, এই খোলার ঘর কি করিয়া ধীরে ধীরে পাঁচ তলায় উন্নীত হইবে তাহারই ব্যাখ্যাবর্ণনা চলিতে লাগিল। নতুন উকিলের পক্ষে টাউট পাওয়াই যে নিশ্চিত সাফল্যের সূচনা, টাউট কাহাকে বলে, কি করিয়া অন্যের মক্কেল ভাগাইয়া আনিতে হয়, খপ্পরে আসিয়া পড়িলে কি করিয়া মক্কেলদের বিবস্ত্র করিয়া ট্যাঁক্ উদ্ধার করিতে হয়, বোকাটে ধরনের দেখিলে কি করিয়া সামান্য জাজ্‌মেণ্টের নকল নিতে হইলে ফি আদায় করা যায়—আমার শ্বশুরের অর্বাচীন কন্যাটিকে বুঝাইতেই দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সারা রাত্রি শুইয়া শুইয়া কমলের গায়ে মনে-মনে গয়না গড়াইয়া দিতে লাগিলাম।

সকালবেলা বাঁড়ুয্যে আসিয়া হাজির। কমলাকে বলিলাম,—তোমার কাছে পাঁচ টাকার একটা নোট আছে, বার ক'রে দাও তো।

কমলা কহিল,—এই মাসের শেষ সম্বল তা জান?

মুসোলিনীর মত দৃপ্তকণ্ঠে কহিলাম,—উপোস করব। দাও টাকা।

টাকা হাতে দিয়া কমলা কোমল করিয়া একটু হাসিয়া কহিল,—কই আনবে, না ঘরের টাকা বার ক'রে দিচ্ছ।

ইক্‌নমিক্সের ফার্স্ট প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌ যে শিখে নাই তাহার সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা করিতে ইচ্ছা হইল না। তবু বাঁড়ুয্যের হাতে মাসের শেষ সম্বল এই পাঁচ টাকার কাগজটুকু গুঁজিয়া দিবার আগে একবার বলিতে ইচ্ছা হইল : পাঁচ টাকাই কি লাগবে? কিন্তু জিহ্বার ডগাটা বার কয়েক চুলকাইয়াই ক্ষান্ত হইলাম, বলা হইল না। এমনিই ত' কাল কোর্টে বাঁড়ুয্যের কাছে নিজের হাঁড়ির কথা বাহির করিয়া দিয়াছি, মিড্‌-ডে ফেয়ারে যে বাড়ি ফিরি বোকার মত তাহাও বলিয়া বসিয়াছি, উহারই সাম্‌নে পেণ্টালুনের পকেট হইতে আধপোড়া সিগারেট বাহির করিয়া ফুঁকিতে সঙ্কোচ করি নাই; আজ সকালে নবজীবনের মাহেন্দ্রক্ষণে এই দীনতা না দেখাইলেই চলিবে। মহসীনের মত টাকাটা এমনভাবে বাঁড়ুয্যের হাতে গুঁজিয়া দিলাম যেন আমার বাঁ হাত পর্য্যন্ত জানিতে পারিল না।

কোর্টে আসিয়া দেখি বাঁড়ুয্যে ঠিক তক্তপোষ পাতিয়া বসিয়াছে। নেহাৎই ডেমোক্রেটিক্‌ যুগে বাস করিতেছি, নইলে বাঁড়ুয্যের পদধূলি মাথায় লইতাম। এতক্ষণ মিছামিছি বাঁড়ুয্যের সাধুতায় অবিশ্বাস করিতেছিলাম; বাঁড়ুয্যের তিরোধানের পর সারা সকাল বেলাটা কমলা আমাকে বাঙাল, বোকা, অজবুক বলিয়া গালমন্দ করিয়াছে, হাইকোর্ট দেখাইয়া পাঁচটা জলজ্যান্ত টাকা খসাইয়া লইয়া গেল, আর আমি ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে তাহাই হজম করিলাম! সত্যই শোপেন-হাওয়ার যে মেয়েদের একান্তরূপে সন্দিগ্ধ, অসাধু ও চরিত্রহীন বলিয়া রায় দিয়াছেন তাহাতে আমার মন সুস্পষ্টস্বরে সায় দিয়া উঠিল।

বাঁড়ুয্যে বলিল,—বসুন।

আঃ, বহুদিন পরে বটতলায় বসিতে পাইলাম। দশাশ্বমেধঘাটে এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলাম পাঁচ বৎসর ধরিয়া সমানে দাঁড়াইয়া আছে, এমন শাখাপত্রবহুল বৃক্ষতলে একটি সতরঞ্চিসমাবৃত তক্তপোষ পাইলে সন্ন্যাসী ঠাকুরও বসিয়া পড়িয়া এমনি আরামে 'আঃ' করিতেন; পাঁচ বৎসর দাঁড়াইবার কসরৎ করিয়া এখন বসিতে তাঁহার লজ্জা করিতেছে।

বাঁড়ুয্যে ছুটিয়া কোথা হইতে একটা কাগজ আনিয়া সামনে ধরিল, কহিল,—একটা সই ক'রে দিন্‌ শিগগির।

কাগজটা মনে হইল ওকালতনামা, কায়দা করিয়া সই করিয়া দিলাম। হাতের লেখাটা ইচ্ছা করিয়াই অপরিষ্কার করিলাম, হাতের লেখা অপাঠ্য করাই বড় উকিলের চিহ্ন। নাম-সইর দাম দুই টাকা জানিতাম, বাঁড়ুয্যে সাড়ে বারো

পার্সেন্ট হিসাবে আমাকে চার আনা আনিয়া দিল। ভাবিলাম সসাগরা ধরিত্রীই যখন হস্তচ্যুত হইল তখন এই সূচ্যগ্র ভূমিটুকুই বা রাখি কেন? কিন্তু চার আনা পাইয়াছি এ কথা কেই বা জানিতে আসিবে, বরং নিশ্চিন্ত হইয়া এক বাক্স সিগারেট ফুঁকিতে পারিব! কোন কোন উকিল ত ফি বাবদ আলু বেগুনও নিয়া থাকে, আমিই বা এমন কি সেকেন্দর শা আসিলাম। গণক ঠাকুর বাঁচিয়া থাকুন, কে জানে এই দস্তখতের জোরেই হয় ত একদিন হতচ্ছাড়া ভাগ্যটাকে নাকখত দিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া দিব।

বলিলাম,—বাঁড়ুয্যে, মক্কেল? ডাক পড়বে ত!

বাঁড়ুয্যে এক গাল হাসিয়া বলিল,—মক্কেল নেই তার আবার ডাক! ঐ বুড়ো লোকটার কাছ থেকে দুটো টাকা আদায় করা গেল। লোকটা একটা বন্দুক শিল্ করিয়ে নেবে তারই অজুহাতে একটা ভাঁওতা মেরে সই ক'রে দু'টো টাকা আদায় ক'রে নিলাম। ঐ কাগজ নিয়ে দপ্তরখানায় গেলেই বন্দুক শিল্ হবে—ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি। ওটা বুঝি ওকালত-নামা, ও ত একটা দু আনা দিস্তের কাগজের একটা তা। ওকালত-নামা চেনেন না?

সত্য কথা বলিতে কি, তবু সিকিটা ঘৃণায় পথের ধূলায় ছুঁড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না, পেণ্টলানের পকেটে হাত ঢুকাইয়া বারে-বারে তাহার বক্রাকৃতি ধারগুলি অনুভব করিতে লাগিলাম। বলিলাম,—লোকটা যদি ফিরে আসে?

বাঁড়ুয্যে হো হো করিয়া আসিয়া উঠিল। বলিল—আসুক না, ফিরে এলেই ত ফের আপনায় চার আনা আসবে। ফি ছাড়া একটিও দাঁত ফোটাবেন না যেন। বলিয়া বাঁড়ুয্যে ফের উপদেশবর্ষণ করিতে সুরু করিল। কহিল,—পোষাক বদলাতে না পারেন দু'দিন অন্তর টাইটা অন্তত বদলে আসবেন মশাই। আর বেশ ক্লিন্ শেইভড্ হবেন, বুক পকেটের রঙচঙে রুমালটা বার ক'রে রাখবেন একটু, আর একটা রুমাল কোটের বাঁ হাতায় ঢুকিয়ে রাখবেন, বুঝলেন? সেটা দিয়ে মুখ মোছা চলবে।

চার আনা রোজগার করিয়াছি বলিয়া দুঃখ নাই, কিন্তু মক্কেলটা ফসকাইয়া গেল, তাহার হাত ধরিয়া এজলাসে উঠিয়া বক্তৃতা করিতে পারিলাম না, লর্ড সিংহের সিংহনাদই অবিনশ্বর রহিয়া গেল ইহার জন্যই কপাল কুটিতে ইচ্ছা হইল। জীবনের এতগুলি বৎসর বি এল-এ ব্লে করিয়া কাটাইয়া দিলাম, তাহার মধ্যে কোনদিনই প্রতীক্ষার স্বপ্ন দেখি নাই; আজ মক্কেলের একখানি মুখ দেখিতে পাইলে কৃতার্থ হইতাম। সে-মুখ রোগে মলিন, পাপে কলুষিত, বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হউক, ক্ষতি নাই, সে-মুখ কমলার মুখের চেয়ে সুন্দর!

মাসের প্রথম তারিখে বাঁড়ুয্যে সরাসরি আসিয়া আমার কাছে হাত পাতিয়া কহিল,—গেল-মাসের মাইনেটা আমার চুকিয়ে দিন।

তক্তপোষে বসিয়া প্রতিবেশী উকিলের কার্য্যকলাপ মুখস্ত করিতেছিলাম, বাঁড়ুয্যের কথা শুনিয়া সেই তক্তপোষ-শুদ্ধ মাটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। কহিলাম, তোমার আবার মাইনে কী!

—মাইনে না? বাঁড়ুয্যে দাঁত বাহির করিয়া বলিল,—তবে মিছিমিছি আপনার জন্যে এতদিন খাটলাম কেন?

রীতিমত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলাম, কহিলাম,—খাটলে আবার কোথায়? এ পর্য্যন্ত একটা মোকদ্দমাও জোটাতে পারলে না।

—মোকদ্দমা কি মাগনা আসে নাকি, মশাই? এই যে আপনাকে এতটা পথ এগিয়ে আনলাম সে কি শুধু শুধু? আপনি মোকদ্দমা পাবেন না সে-জন্যে আমাকে ভুগতে হ'বে? এ মজা মন্দ নয় দেখছি।

নরম হইয়া বলিলাম,—মামলা আনলেই ত পয়সা পাবে।

মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বাঁড়ুয্যে কহিল,—সে-মামলা কষ্ট ক'রে আপনাকেই বা দিতে যাব কেন? আপনি কি আমার বেয়াই না শ্বশুরঠাকুর? আপনার দু'টাকা ফি-এ আমার কি এমন কমিশান হ'বে? দিন, দিন, মাইনেটা চুকিয়ে দিন মশাই!

নিরুপায় হইয়া বলিলাম,—না। যেখানে খুসি তুমি যাও, যাকে ইচ্ছে মামলা এনে দাও গে। আমার কাছে কিছু হ'বে না।

আচ্ছা।—

বলিয়া বাড়ুয্যে চলিয়া গেল। মুখ-চোখের এমন একটা ভাব করিল যেন সে আমাকে দেখিয়া নিবে। কিন্তু আমি উকিল—সে-কথা হয়ত সে ভুলিয়া গেছে। নিশ্চিন্ত হইয়া একটা সিগারেট ধরাইলাম। যাহাই বলি, শূন্য হাতে আজ বাড়ি ফিরিতে বুকটা আমার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। লোয়ার সার্কুলার রোডের কাছে একটা গলিতে কাবুলিদের একটা আড্ডা আছে জানিতাম। তাহারই অভিমুখে রওনা হইলাম। একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়া দশ টাকা ধার করিয়া আনিয়া কমলার সেমিজের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া হাত দুইটা ধরিয়া বাধা দিয়া কহিলাম,—এক্ষুনি খুলো না, খানিকক্ষণ বুকে ক'রে রাখ।

কমলার মুখ সুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিল—টাকা পেলে?

বীরের মত কহিলাম,—নিশ্চয়। ওর স্পর্শ তোমার শ্রীকরপদ্মের চেয়ে মোলায়েম।

টাকা দেখিয়া কমলা একেবারে ভাল্‌গায় হইয়া উঠিল। আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অনর্গল চুমা খাইতে লাগিল। কহিল,—পাড়ার পাঁচজনকে আজ নিশ্চয়ই নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াব। দুটো টাকা ভাঙিয়ে আমার সিন্দুরের কৌটায় রেখে দেব—তোমার প্রথম রোজগারের টাকা!

পাড়ার পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া সবে বাড়ি ফিরিয়াছি, বাঁড়ুয্যে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। কহিল,—একটা মোকদ্দমা পাওয়া গেছে, শিগগির চলুন। মোটা টাকা মিলবে।

কিছু একটা সন্দেহ যে না হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু মোকদ্দমা যখন সত্যিই পাওয়া গিয়াছে তখন মিছামিছি সন্দেহ করিয়া লাভ কী!

উৎফুল্ল হইয়া কহিলাম,—কোথায়?

—চলুনই না।

বলিলাম—এ কেমন ধারা বাঁড়ুয্যে। মক্কেলরাই ত উকিলের বাড়ি আসে. উকিল কবে মক্কেল শিকারে বেরোয়!

বাঁড়ুয্যে কহিল,—সে সব নিয়ম উল্টে গেছে। চলুন, দেরি করলে অন্য লোক ছিনিয়ে নেবে। দাঁও ফসকে যাবে কিন্তু। এই টাকাটা থেকেই আমার পাওনাটা তুলে নিতে হবে—কি বলুন!

বাগবিস্তার না করিয়া জামা কাপড় পরিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। কমলা কোমরে কাপড় জড়াইয়া এক রাশ বাসন পত্র লইয়া রান্নায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম,—আরেকটা মোকদ্দমা পেলাম কমলা, তুমি এবার থেকে বুঝি সত্যিই সার্থকনামা হ'লে।

কমলা খুন্তি নাড়া বন্ধ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল—সত্যি?

—হ্যাঁ গো। আমি যাচ্ছি একটু কন্‌সালটেশান করতে। ফিরলাম ব'লে।

—বেশি দেরি কোরো না কিন্তু। আরেকটু পরেই কিন্তু ভদ্রলোকেরা এসে পড়বেন।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হইয়া গেছে, বাঁড়ুয্যের অনুবর্ত্তী হইয়া পথ চলিতে লাগিলাম। বাঁড়ুয্যে বলিল,—মক্কেল বড়লোক আছে, বত্রিশ টাকার নীচে যাবেন না কিন্তু। ফি বেশি হ'লেই দুজনের লাভ।

বত্রিশ টাকার সাড়ে বারো পার্সেণ্ট্‌ হিসাব করিতে করিতে যে-গলিটায়

আসিয়া ঢুকিলাম তাহাতে পা দিয়াই বুকটা আমার ভয়ে ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম,—বাঁড়ুয্যে, এ গলি?

বাঁড়ুয্যে বিরক্ত হইয়া কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। মক্কেলরা ত আর সবাই আপনাদের মত বড়লোক নয়, তারা মাটির ঘরেই থাকে পচা বস্তিতে। তাতে কি হয়েছে?

কিছু হয় নাই বটে; আমিও পচা গলিতে মাটির ঘরেই থাকি—তবু এই গৃহবাসিনীদের সংস্পর্শে আসিতে মনটা এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলাম না, বরং প্রাক্‌টিস জমাইবার পক্ষে এই দুর্বলচরিত্রতা যে মোটেই সহায়তা করিবে না তাহা ভাবিয়াই মনকে শাসন করিলাম।

বাঁড়ুয্যে আমাকে একটা ঘরে নিয়া আসিল। ফিট্‌ফাট্ শয্যা পাতিয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে, হাত তুলিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া কহিল—আসুন উকিল বাবু, বসুন।

ধরণী, দ্বিধা হও, বলিয়া সামনের চেয়ারটায় বসিলাম। মেয়েটি বত্রিশটা টাকা (নোট নয়) গুণিয়া গুণিয়া শব্দ করিয়া আমার পায়ের কাছে মেঝের উপর রাখিল ও পায়েরই তলায় বসিয়া অশ্রু-ভারাতুর চোখে তাহার গল্প বলিতে লাগিল। গল্পটা যেমন অশ্লীল তেমনিই ন্যক্কারজনক; তবুও পেনাল্-কোডে এই সব অপরাধের শাস্তি বর্ণিত আছে আছে বলিয়াই বাঁড়ুয্যেকে দিয়া কাগজ-কলম আনাইয়া গোটা বিবরণটা লিখিয়া লইলাম—ঠিক কোন্ section-এ পড়ে বাসায় গিয়া বই মিলাইয়া দেখিতে হইবে। সেই কুৎসিত ইতিহাসটা শেষ করিয়া মেয়েটি দুইহাতে টাকাগুলি কুড়াইয়া লইয়া আমার বুক-পকেটে ঢালিয়া দিল—আমি বিমর্ষমুখে একবার বাঁড়ুয্যের মুখের দিকে তাকাইলাম।

বাঁড়ুয্যে কহিল,—না না, লেবেন বৈ কি, কি বল্, কমলি?

এই মেয়েটি আমারই স্ত্রীর নামাঙ্কিত মনে করিয়া নিদারুণ লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হইল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম, কহিলাম—আচ্ছা, তুমি কাল এঁকে কোর্টে এগারোটার সময় নিয়ে যেয়ো বাঁড়ুয্যে, আমি রাত্রে পিটিশান্ ড্রাফট ক'রে রাখব। চলি এখন।

চৌকাঠ ডিঙাইতেছি, সহসা পিছন হইতে মেয়েটি আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিল, কহিল—এক্ষুনি যাবে কি মাইরি?

বাঁড়ুয্যে নীচের ঠোঁটটা ঝুলাইয়া দিয়া কহিল—মক্কেলদের সঙ্গে এমন ব্যবহার ক'রে বত্রিশটাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন, বেশ লোক যা হোক্।

মেয়েটি আমাকে এক রকম জোর করিয়াই চেয়ারে বসাইয়া দিল। তারপর

খাটের তলা হইতে একটা পানীয়পূর্ণ গ্লাশ লইয়া একেবারে আমার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া কহিল,—খেয়ে ফেল ত এটা। গরিবের ঘরে এলে আতিথ্য না করলে কি ভাল দেখায়?

গ্লাশশুদ্ধ কমলিকে মেঝের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিব বলিয়া গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতেছি এমন সময় বুক-পকেটের মধ্য হইতে বত্রিশটা টাকা একসঙ্গে কথা কহিয়া নিষেধ করিল। সামান্য একগ্লাশ মদ বই ত নয়, কাবলিওয়ালার লম্বা পাগড়ি ও লম্বা লাঠির কথা মনে করিয়া গ্লাশটা মুখে তুলিলাম। মেয়েটি গ্লাশের তলায় হাত রাখিয়া আমার উন্মুক্ত মুখের মধ্যে একসঙ্গে গ্লাশের সমস্ত মদটা ঢালিয়া দিল. দম লইয়া ঢোক গিলিবার পর্য্যন্ত সময় পাইলাম না। দগ্ধ ঠোঁটটা জামার হাতায় মুছিতে যাইতেছি কম্‌লি মুখ নীচু করিয়া তাহার ঠোঁটের সাহায্য নিতে বলিল।

কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, কিছুই বুঝিলাম না; লিভারের সঙ্গে সঙ্গে বিবেকও কামড় দিয়া উঠিয়াছিল কি না ঠাহর নাই, কিন্তু কম্‌লিকে সহসা সহস্র কমলার চেয়ে সুন্দর মনে হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের জামা-কাপড় ছিঁড়িয়া, গ্লাশ বাটি ভাঙিয়া, মুখখারাপ করিয়া কেলেঙ্কারির লঙ্কাকাণ্ড করিয়া বসিলাম।

'ভূত দেখবি আয়' বলিয়া কমলি অন্যান্য কতগুলি মেয়ে ডাকিয়া আনিয়া ঠাট্টার হাট জমাইয়া তুলিল। আমিও বাড়ি, ঘর, কমলা নিমন্ত্রণ, অভ্যাগত-সমাগম সব ভুলিয়া ঢোল হইয়া রহিয়াছি। ইহারই মধ্যে এক সময় টের পাইলাম বাঁড়ুয্যে আমার বুক-পকেটে হাত ঢুকাইয়া টাকাগুলি বাহির করিয়া নিতেছে, পকেটটা ধরিয়া টান দিতেই সবগুলি টাকা মেঝের উপর মাতৃহীন শিশুর মত কাঁদিয়া পড়িল। টাকার আর্ত্তনাদ শুনিয়া জ্ঞান হইল বুঝি, একটা গ্লাশ তুলিয়া লইয়া বাঁড়ুয্যের মাথায় চৌচির করিয়া দিলাম।

গ্লাশটা ভাঙিয়াই মনে পড়িল আমাকে এইবার পলাইতে হইবে। যে মুহূর্ত্ত কয়টির জন্য বাঁড়ুয্যে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রক্তপাত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারই এক ফাঁকে সমস্ত মেয়েগুলোকে দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া বানের জলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া প'ড়িলাম। বাঁড়ুয্যে তাড়া করিল বটে, কিন্তু সত্যযুগের মানুষের মতই তাহাকে দীর্ঘ হইতে হইয়াছিল বলিয়া ফের দরজায় একটা নিষ্ঠুর গুঁতা খাইয়া তাহাকে দ্বিতীয় ক্ষতস্থান চাপিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িতে হইল। গলি পার হইয়া একটা ট্যাক্সিতে আসিয়া উঠিলাম—তীরবেগে ছুটিতে হইবে। কিন্তু ট্যাক্সিতে উঠিয়াই ছিন্ন রিক্ত পকেটটার দিকে চাহিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম; ড্রাইভার হুইল ঘুরাইতেছে এমন সময় তাহাকে বাধা দিয়া নামিয়া পড়িলাম—ড্রাইভারটা অকথ্য ভাষায় গালাগাল করিয়া বসিল।

ভাবিলাম আমার উপর এই নির্লজ্জ ও নিষ্ফল প্রতিশোধ লইয়া পৃথিবীতে বাঁড়ুয্যের কী লাভ হইল ?

নর্দমায় ঘুমাইতে ঘুমাইতে বাড়িতে যখন ফিরিলাম রাত তখন দুইটা বাজিয়া গেছে। কমলা যে উদ্ভ্রান্ত হইয়া গলায় দড়ি দেয় নাই সেই আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছি সহসা সে চেঁচাইয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল। আজ কমলার চরম পরীক্ষার দিন, সে সত্যই পতিব্রতা ; মাতাল স্বামীকে সে বিছানায় শোয়াইয়া হাওয়া করিতে লাগিল। পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ভোর হইতে না হইতে ঘুম ভাঙিয়া গেল, ভীষণ ক্ষুধাবোধ হইতেছে। কমলাকে না জাগাইয়াই রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিলাম—থরে থরে কত যে রান্না হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, ঢাকনি তুলিয়া প্রায় দুই হাতেই মুখে খাদ্যদ্রব্য গুঁজিয়া দিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে চাহিয়া দেখি কমলাও আসিয়া হাজির—মুখে ভোর-বেলাকার প্রসন্ন নির্মল হাসি, যে তারাটি এখনো আকাশে বিরাজ করিতেছে সেই তারাটির মতই বেদনা-উজ্জ্বল। কমলাও আমারই পাতে বসিয়া খাদ্যদ্রব্যের অংশ লইতে লাগিল,—কাল সারারাত তাহারও খাওয়া হয় নাই।

ইহার পর দুইদিন আর কোর্টে যাই নাই, তৃতীয় দিন দেখি আমার নামে এক শমন আসিয়া হাজির, বাঁড়ুয্যেকে মারিয়াছি বলিয়া আমাকে আজ এগারোটার সময় কোর্টে হাজির হইতে হইবে। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। সমস্ত আকাশটা যেন বর্ত্তুলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে বিন্দুবৎ লীন হইয়া গেল।

কমলা দৃপ্তকণ্ঠে কহিল,—কেন তুমিই ত তোমার উকিল! নিজে নিজের পক্ষ সমর্থন করবে ? কিসের ভয় ? আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরলে শাস্তি হয় নাকি ?

হ্যাঁ, এতদিনে আদালতে দাঁড়াইয়া সওয়াল-জবাব করিবার সুযোগ আসিল বুঝি! আমি ও-পাড়ায় গিয়াছিলাম, মদ খাইয়াছিলাম, মারামারি করিয়াছিলাম—সকলের চোখের সামনে দাঁড়াইয়া এই সব অভিযোগকে আমার খণ্ডিত করিতে হইবে। হা ভগবান্!

বীরেশ্বরকে মনে পড়িল। কলেজে তাহার টার্ম ছয়মাস আগে ফুরাইলেও তাহার সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। সে আমার হইয়া বিনা-পয়সায় লড়িবে

হয় ত; সারা বটতলায় আর কাহাকেও বন্ধু বা আত্মীয় বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারিলাম না। বীরেশ্বরকে সব কথা কহিলে সে হাতের উপর হাত চাপড়াইয়া কহিল—আল্‌বৎ। কিচ্ছু হবে না তোমার। **Right of private defence** তা ছাড়া তোমাকে মিথ্যা প্ররোচনায় সেখানে নিয়ে গেছে, ওরাই মদ খাইয়েছে—উল্টে ওদেরই জেল হবে। চাই কি, কিছু খেসারতও পেয়ে যেতে পার।

কিঞ্চিৎ অভয় পাইলাম বটে, কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া খেসারতের সংখ্যা নির্ণয় করিতে বসিয়া গেলাম না। পর দিন শুধু ধুতি আর সার্ট পরিয়াই কোর্টে হাজির হইলাম, ধ্বজা আর দেখাইতে ইচ্ছা করিল না। বীরেশ্বর আগে হইতেই প্রস্তুত, একটা কাউণ্টার কেসের 'পিটিশান্'-ও তৈরি করিয়াছে দেখিলাম। দেখিলাম বাঁড়ুয্যে মাথায় এক প্রকাণ্ড ফেটি বাঁধিয়া আমারই তক্তপোষ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, উহার কাছ দিয়াও গেলাম না। ডাক পড়িলে কাঠগড়ায় গিয়া উঠিলাম, জামিন পাইলাম, আরেকটা তারিখ পড়িল। কাউণ্টার কেসটাও বীরেশ্বর বীরের মত পেশ করিয়া আসিয়া পিঠ চাপড়াইয়া দিল।

দেখি, পেছনে অনেক শুভানুধ্যায়ীর ভিড় লাগিয়াছে, রামেন্দ্র বাবুই তাহাদের নেতা। তিনি হাত ধরিয়া বলিলেন,—কেস্‌টা মিট্‌মাট ক'রে ফেল নটবর, ক্রিমিন্যাল কোর্টের কাণ্ড ত আর জান না, ভদ্রলোকের ছেলে, কেলেঙ্কারির একশেষ হবে।

এই পার্টটুকুর রিহার্সাল দিতে রামেন্দ্র বাবুকে এত প্রম্পট্ শুনিতে হইল যে মোকদ্দমার পরিণাম বিচার করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বীরেশ্বরের অভয়বাক্যে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলাম। সহসা ডেমোক্রেসির যুগ হইতে এক লাফে একেবারে ব্রাহ্মণ্যযুগে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। তক্তপোষে যেখানে বাঁড়ুয্যে মৌরসি করিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিল তাহারই সমীপবর্ত্তী হইয়া কথায় প্রায় কান্না জড়াইয়া কহিলাম, —মাম্‌লাটা তুলে নাও বাঁড়ুয্যে!

বাঁড়ুয্যে কঠিন হইয়া কহিল—বত্রিশ দুগুণে আরো চৌষট্টি টাকা দাও।

তাই সই, পরদিন কমলার হাতের চুড়ি চারগাছি বাঁধা দিয়া চৌষট্টি টাকা জোগাড় করিয়া আনিয়া বাঁড়ুয্যের পদতলে ঠেকাইয়া রাখিলাম। রামেন্দ্র বাবুর মোকাবিলায় ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনেই মামলা মিটমাট হইয়া গেল।

ব্যাপার শুনিয়া বীরেশ্বর ছুটিয়া আসিল। বেদনার্ত্ত কণ্ঠে কহিল—মামলা মিটিয়ে নিলে, নটবর?

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম,—হ্যাঁ ভাই, এ ঝকমারি পোষাবে না।

তেমনি বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠেই বীরেশ্বর কহিল—এই প্রথম একটা মোকদ্দমা পেয়েছিলাম ভাই, তাও করতে পেলাম না ?

চমকাইয়া উঠিলাম—বল কি ? এই প্রথম ?

চোখ নামাইয়া বীরেশ্বর কহিল—হ্যাঁ ভাই। আর বল কেন ?

তাহার হাত ধরিয়া কহিলাম,—কদ্দিন এখানে বসেছ ?

বীরেশ্বর অস্ফুটস্বরে উত্তর দিল,—প্রায় এক বছর।

বটতলা হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছি। বীরেশ্বরের জীবনের এমন একটা স্বর্ণ-সুযোগ নষ্ট করিয়া আসিয়াছি বলিয়া দুঃখ হয় বটে, কিন্তু আমার ঐ তক্তপোষটা গাছতলায় পড়িয়া মাঠে মারা গেল বলিয়াও দুঃখ কম হয় না। কেননা আমাদের ঘরে একটি নবীন রঙিন অতিথির আবির্ভাব হইয়াছে—একটি তক্তপোষে তিনটি প্রাণীর অকুলান হইতেছে। ছেলেকে লইয়া কমলা মেঝেতে বিছানা করিয়া শুইলে সারা রাত আমার চোখে আর ঘুম আসিতে চায় না। ইস্কুল মাষ্টারি করিয়া এমন উদ্বৃত্ত অর্থের সংস্থান হয় না যে একখানা প্রশস্ত খাট কিনি।

যাই হোক, তক্তপোষটা বাঁড়ুয্যের কপালেই ঠেকিয়া রহিল। তাই থাক্। ঐ তক্তপোষে চড়িয়াই যেন সে চিতায় যায়—বটতলা ত্যাগ করিবার সময় এই আশীর্বাদই উহাকে করিয়া আসিয়াছি।

অসম্পূর্ণ

ক

কাহার একটা রচনায় পড়িয়াছিলাম (বোধ হয় হ্যাজ্‌লিট্-এর) মানুষ মাত্রেই কবি ;—যে-কৃষক চাষ করিতে করিতে নবতৃণোদ্গম লক্ষ্য করে ও যে জ্যোতির্বিদ অন্তহীন আকাশে রহস্যান্ধকারের দুর্ভেদ্যতা অতিক্রম করিয়া নূতন তারার জন্ম দেখে—তাহাদের আনন্দ কবিরই আনন্দ। (চ্যাপম্যানের 'হোমার্' পড়িয়া কীট্‌স্-ও এমনি করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিল।) কসরৎ করিয়া কবিতা লিখিবার অভ্যাস না করিলেও আমি এক দিন কবি হইয়া উঠিলাম, যেদিন এই ধূলার জগৎকে আর কঠিন ও কদর্য মনে হইল না, প্রতি রুক্ষ নিরানন্দ দিনটি কলালক্ষ্মীর পদশায়ী শতদলের পাপড়ির মত সুকোমল ও সৌরভসিক্ত হইয়া উঠিল, —আমার অস্তিত্ব যেন অসীমবিস্তৃত,—আমার মন আকাশ-পারাবারের পার খুঁজিতে যেন দুই ব্যাকুল পাখা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে !

এই ভাবটা আমাকে কখন আক্রমণ করিল তাহা বুঝিতে তোমাদের নিশ্চয়ই দেরি হইবে না, মানে—আমি যখন ভালবাসিলাম। (ভয় নাই, বিবাহ করিয়াই ভালবাসিলাম।) সে একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি,—সেই একই হৃদয়াবেগ নিয়া বিধাতাও বোধ হয় রাত্রির অন্ধকারকে এমন সুন্দর করিয়াছেন,—বাসররাত্রে পার্শ্বশয়ানা নববধূটিকে একটি মূর্তিমতী শুভসন্ধ্যাকালীন শঙ্খধ্বনি বলিয়া মনে হইল, স্নেহ-কে আমি এক মুহূর্তেই এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি যে, পৃথিবীতে নির্জন বলিতে আমার কাছে আর কোন স্থান নাই,—স্নেহ-কে ছাড়িয়া আসিলেও আকাশের নীচেকার সমস্ত নিঃশব্দতা একটি লাবণ্য-ললিতা নারীমূর্তি গ্রহণ করিয়া আমার সঙ্গে কেবলই কথা কহিতে থাকে। Castiglione ঠিকই বলিয়াছেন, যে-বিধাতাকে আমরা কখনও দেখি নাই সেই বিধাতাকে আমরা নারীর মধ্যেই দেখিয়াছি।

শতকরা নব্বুই জন বাঙালি ছেলের মতই বি. এ. পাশ করিয়া ল' লইয়াছিলাম কিন্তু এক বৎসর না চুকিতেই মা'র এমন অসুখ হইয়া পড়িল যে, রান্নাঘরের জন্য একটি পাচিকা ও মা'র রোগশয্যাসমীপে একটি নার্সের দরকার হইল। অতএব আপত্তি আর টিঁকিল না, আমার চির-কৌমার্য্যের গৌরবময় উত্তুঙ্গ পর্বতটা নিমেষের মধ্যে গুঁড়া হইয়া গেল ; একেবারে বাস্তবতার সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিলাম। সীমাবদ্ধ কুঠুরীর জানালা দিয়া আকাশের যে স্বল্পপরিমিত অংশটুকু একটা বৃহত্তর প্রকাশের ইঙ্গিত করে, তাহারই অনুপাতে জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষা-গুলিকে বড় করিয়াছিলাম, কিন্তু স্নেহ আসিয়া সেই জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

সেই ছোট ঘরটিতে স্নেহ একটি স্নেহপ্রদীপ জ্বালিল বটে, কিন্তু আকাশের তারা আর দেখা গেল না।

সেটা আমার পক্ষে কম দুঃখের কথা নহে, কিন্তু শেলির স্বপ্ন ছাড়িয়া যে ফোর্ডের স্বপ্ন দেখিব, মস্তিষ্কে তেমন ভাবাবেগও ছিল না হয় ত। তাই বিনা মূল্যে যাহা কুড়াইয়া পাইয়াছি তাহা লইয়াই জীবনের হাটে আমাকে সওদা করিতে হইবে; কিন্তু বৎসর ফুরাইতে না ফুরাইতেই সেই পাথেয়ও ফুরাইয়া গেল। অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে বলিয়াই আকাশ আজিও মর্ত্যবাসীর কাছে একটি সুদূর ইঙ্গিতের মত অনির্বচনীয় সুন্দর রহিয়াছে, এবং এই একই কারণের বিপরীত অর্থে স্নেহ আমার কাছে নিরাবরণ ও নিষ্প্রভ হইয়া গেছে।

কথাটাকে খুব ঘনীভূত করিয়া বলিলাম বটে, কিন্তু ইহার চেয়ে ব্যক্ততর করিলেও কথাটা এমনিই সুবোধ্য থাকিত। বরং অনেক সময় উদাহরণ দিয়া ফেনাইয়া বলিলেই কথার সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ অর্থ টার উপলব্ধি হয় না। প্রথম যখন স্নেহকে পাইয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল,—যদি পরিতাম ত এই অনন্তকালের ঘড়িটা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া এই চঞ্চল আনন্দক্ষণটিকে অবিনশ্বর করিয়া রাখিতাম; এখন মনে হইতেছে যেন একটা আতসবাজির মত এই বৎসরটা একটা রঙের আর্তনাদ করিয়া শূন্যে লীন হইয়া গেল!

ব্যাপারটা আরো সঙিন হইয়া উঠিল যখন শুনিলাম ল'র পাশের লিষ্টে আমার নামের পাশে নীল পেনসিলে একটি চিকে দেওয়া হইয়াছে। ছ'মাস পরে ফের পরীক্ষা দিয়াও সেই চিকে-টা সরাইতে পারিলাম না, যীশুখৃষ্টের গলায় ক্রশের বোঝা এমনিই দুর্বহ হইয়া উঠিলেও অপমানজনক হয় নাই। সবচেয়ে খারাপ লাগিল যখন শুনিতে পাইলাম আমাদের সংসারের আনাচে কানাচে এইরূপ কানাঘুষা চলিতেছে যে স্নেহ-র স্নেহাধিক্যের জন্যই আমার এই দুর্গতি হইয়াছে। রাসবিহারী ঘোষকে মনে মনে নমস্কার করিয়া সরিয়া আসিলাম; স্নেহ জিজ্ঞাসা করিল—এখন কি করবে?

একটু রুক্ষ হইয়াই বলিলাম—তোমাকে বিয়ে না করলে এ-প্রশ্ন আমার নিজেকেও করতে হ'ত না, কিন্তু যে খোলা দরজা দিয়ে তুমি এলে তোমারই পদানুসরণ ক'রে নৈরাশ্য এল, দরিদ্রতা এল—

স্নেহও কঠিন হইতে জানে। কহিল—আমাকে বর্জন করবার মত সৎসাহস যদি তোমার থাকে এবং সেই সঙ্গে যদি দারিদ্র্যমোচন করবার প্রতিজ্ঞার অধিকারী হও, যাও না আমাকে ছেড়ে। আমি হ'লে বাড়িতে ব'সে ব'সে সিগারেট পুড়িয়ে আলসেমি করতাম না।

কৌতূহলী হইয়া কহিলাম—কি করতে ?

—ভাগ্য তৈরি করতে বেরিয়ে পড়তাম। যে দুঃসাহসে ভর ক'রে মানুষ নিজের দেহ থেকে অভিজ্ঞতা পেয়ে যন্ত্র গড়েছে সেই সাহসে আমার মন রসিয়ে নিতাম, পরিশ্রমের স্বেদের মধ্যেই যে আনন্দের মূল্য আছে তার তুলনা কোথায় ?

স্ত্রীর বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়া বাড়ির বাহির হইলাম বটে, কিন্তু একটা সামান্য ইস্কুল মাষ্টারি ছাড়া আর কিছুই জুটাইতে পারিলাম না। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে কবে ভাবিয়াছিলাম যে আমাকে তরবারির পরিবর্তে সামান্য একটা বাঁশের কঞ্চি লইয়া বসিতে হইবে, শেলির চোখ দিয়া যে এমিলিয়া ভিভিয়ানিকে দেখিয়াছিলাম সে আজ শুধু একটা ব্যাকরণের সূত্র হইয়া থাকিবে ; বন্দী প্রমিথিয়ুসের দুঃখের সঙ্গে নিজের অকিঞ্চিৎকর দুঃখের তুলনা পর্য্যন্ত চলিবে না ?

তাই সই ; এত সহজে দমিবার পাত্র আমি নই, মাষ্টারি করিতে করিতেই এম এ-টা পাশ করিয়া লইব ; (এততেও আমার পাশ করিবার মোহ কাটিল না,) চাই কি, তার পরে একটা ভাল চাকুরিও মিলিতে পারে। তাই মনে বল সঞ্চয় করিয়া কাজে নামিয়া গেলাম, স্নেহ-ও সংসারের সর্বত্র তাহার অন্তরমধু পরিবেষণ করিতে লাগিল। দাদা আজ প্রায় পনেরো বৎসর বেকার ভাবে বসিয়া বসিয়া ভাত গিলিতেছেন, বৌদিদি সন্তানের জনতার মধ্যে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া আছেন, ওয়ার্ডসোয়ার্থের কথাটা ঘুরাইয়া লইলে স্নেহ-ই যেন "the very pulse of the machine !" কিন্তু মনে হয়, তারপর ? এই একঘেয়েমির শ্রান্তি হইতে কোথাও কোনও দিন মুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

স্নেহ তাহার চোখে নিরানন্দতার ভবিষ্যতের আশঙ্কাসূচক একটি সঙ্কেত লইয়া কাছে আসে। বলি—আমাদের সমাজ থেকে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা উঠিয়ে দেওয়া উচিত।

পাছে শুনিতে খারাপ হয় এই ভয়ে স্নেহ প্রথমে কথাটার প্রতিবাদ করে এবং ঐ কথার স্বপক্ষে যত ভাবপ্রবণ যুক্তি আছে সব খাড়া করিতে থাকে, কিন্তু আমার বিদ্রূপপূর্ণ প্রচণ্ড তর্কের ঝড়ে সেই সব খুঁটিগুলি ভাঙিয়া পড়ে। বলি—অনেকগুলি আধ-মরা প্রাণ থেকে একটা তেজী সবল প্রাণ ঢের বেশি কাম্য,—এবং এতগুলি ব্যর্থ প্রাণ টিকিয়ে রাখবার জন্য আমাকে আর তোমাকে তিলে তিলে আত্মবলি দিতে হবে আমি এই যুক্তির রসগ্রাহী নই। রুশিয়ায় হ'লে—

স্নেহ হাসিয়া বলে—ভাগ্যিস্ এটা বাঙলা দেশ,—যেখানে বুড়ো বাপ-মা'র পদসেবা ক'রে বৈকুণ্ঠলাভ করবার বিধি আছে, অসমর্থ ও অসুস্থ পরিজনের সাহায্য

ক'রে আত্ম-তৃপ্তি পাবার অধিকার আছে। এই দেশই আমার ভাল, এর সংস্কার, এর প্রথা। আমাকে ঠাট্টা ক'রে লাভ নেই, তবে তোমার যদি একান্তই ইচ্ছা থাকে, তুমি যেন আস্‌চে জন্মে রুশিয়াতেই গিয়ে জন্ম গ্রহণ কোরো, আমি এই বাঙলা দেশেরই পথ চিনে আসব'খন।

বলিয়া বসিলাম - কিন্তু রুশিয়ায় ছেলের সঙ্গে বাঙালি মেয়ের বিয়ে হবে কি করে? আস্‌চে জন্মে তোমাদের বাংলা দেশের আইন কানুন বদ্‌লে যাবে না কি?

স্নেহ চুপ করিয়া রহিল। কেন জানি না মনে হইল স্নেহ আমাকে বিবাহ করিয়া সম্পূর্ণ সুখী হয় নাই,—এই ভাবটা আমার মনে উঠিতে পারে এই সন্দেহ করিয়াই তাড়াতাড়ি কহিল—কিন্তু আমি পরজন্মে বিশ্বাস করি না, আমি ইহকালে এত ভালভাবে আমার কাজ ক'রে যাব, এত নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সঙ্গে যে মৃত্যুর পরে আমার নির্বাণ পেতে একটুও দেরী হবে না।

একটা আগন্তুক বিড়ালের আবির্ভাবে রান্নাঘরে কি একটা উৎপাতের সৃষ্টি হইয়াছে, নীচে হইতে মা চেঁচাইয়া উঠিয়া স্নেহকে বাক্যবাণে জর্জ্জর করিতেছেন, (একটু কল্পনা করিলেই তোমরা তা বুঝিতে পারিবে।) স্নেহ তাড়াতাড়ি আমার জামা-সেলাই বন্ধ করিয়া ছুটিয়া গেল। উহার চোখে ইহার আগে এমন নিরুৎসাহ অসহায় চাহনি দেখি নাই। উহাকে বাঁচিতে হইবে? সব চেয়ে বেদনার কথা, উহার মধ্যে একটি তপস্যানিরতা বৈরাগিনী আছে, খাঁচার পাখীর মত খাঁচায় থাকিতে থাকিতে দুই পাখা এখনও পঙ্গু করিতে পারে নাই। পঙ্গুতাপ্রাপ্ত হইলেই স্নেহ বাঁচিয়া যাইত,— তবে ভরসার কথা স্নেহ সেই দিকেই ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। আমিই ত উহার চিকিৎসক।

খ

আমার বিবাহের সময়ই গিরীনের সঙ্গে আমার পরিচয় ও সোহার্দ্য হইয়াছিল,—গিরীন স্নেহ-র দূরসম্পর্কের কি-রকম মামা হয় বোধ হয়। সম্প্রতি সে ষ্টেট্-স্কলারশিপ পাইয়া বিলাত যাইতেছে এবং সেই বিদেশ-যাত্রারই প্রাক্কালে বিনা-খবরে আমাদের বাড়িতে আসিয়া উঠিল। আমি ও স্নেহ উভয়েই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

সমস্ত দিন কি হাসি ও খুসির মধ্য দিয়া কাটিল তাহার সবিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু বলিলেই চলিবে যে আমি আর স্নেহ দুই জনেই মানসিক স্বাস্থ্য পাইয়া সুন্দর হইয়া উঠিয়াছি—গুমটের পর যেন একটু ভিজা হাওয়া

আসিল। ঘর বেশি ছিল না বলিয়া গিরীনকে আমাদেরই ঘরের পার্শ্ববর্তী বারান্দাতে বিছানা করিয়া দেওয়া হইল,—আমাদের ঘরের দরজা ও জান্‌লাগুলি খোলাই রহিল অবশ্য। স্নেহ যে কখন্ শুইবে তাহার হিসাব নাই, সারাদিন ছেলে ঠেঙাইয়া আসিয়া এখন ঘুমে আমার চোখ ভাঙিয়া পড়িতেছে—তাহারই এক ফাঁকে দেখিলাম স্নেহ মেঝেতে মাদুর পাতিতেছে। মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙিতেই দেখি স্নেহ ঘরে নাই, বারান্দায় গিয়া গিরীনের সঙ্গে স্বাভাবিক অনুচ্চ কণ্ঠে গল্প করিতেছে। সমস্ত দৃশ্যটি মনে-মনে কল্পনা করিয়া আমার কী যে ভাল লাগিল তাহা বলিবার নয়। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা নিয়া গল্প করিয়া-করিয়া রাত্রি কাটাইতে আমি স্নেহকে ইহার আগে কোনও দিন অনুমতি দিই নাই বলিয়া আমার অনুতাপ হইতেছিল। উহারা সাহিত্য সম্বন্ধে কথা বলিতেছে:

স্নেহ

তুমি এখন ঘুমোবার চেষ্টা কর, কাল ভোর হ'তে না হ'তেই তোমার ট্রেন,—রাত অনেক হ'য়ে গেল।

গিরীন

তুমি অত্যন্ত ছোট পৃথিবীতে বাস কর, দেখছি। তোমাদের এখানে অন্ধকার হ'লেও পৃথিবীর আর এক পিঠে এখন দিনের আলো, টাট্‌কা রোদ। তোমরা বুঝি রাতের তারা দেখলেই দিনের সূর্য্যকে ভুলে যাও, একবার বর্ষা নাম্‌লেই আর গ্রীষ্মকে মনে রাখ না,—তোমাদের স্মৃতি এত ক্ষীণ, ভালবাসা এত স্বল্পায়ু! আচ্ছা, তুমি বুঝি পড়াশুনো আজকাল ছেড়ে দিয়েছ?

স্নেহ

হ্যাঁ, পড়াশুনো! সারাদিন খেটে-খেটে ঘুমোবার সময় পাই না, আবার পড়ব! ইস্কুলে যখন পড়তাম, তখন মনে আছে ঘরে আলো জেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছি, আলো নিবিয়ে দিয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে মনে হয়েছে কবিতা পড়া আমার তখনও শেষ হয় নি।

গিরীন

রাতে কবিতা পড়তে? তুমি বাঙালি-বুদ্ধির বিশেষত্ব বজায় রেখেছে দেখছি,—আমি কিন্তু রাত জেগে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ি, তার মানে এই মনে কোরো না যে মধ্যাকাশবিহারী তারা দেখে আমার কারো চোখ মনে পড়ে। আচ্ছা, বিলেত গেলে তোমাকে নতুন নতুন বই পাঠাব'খন, সময় ক'রে একটু-একটু পোড়ো,—ঐ বইগুলিকেই তোমার অচলায়তনের বাতায়ন কোরো। শুনেছ আজকাল বাঙলাদেশে নতুন সাহিত্য নিয়ে একটা গোলমাল চলেছে—

স্নেহ

শুনেছি একটু-একটু ; ভাল ক'রে পড়িনি। তবে শুনছি ঐ সাহিত্য সাময়িক উত্তেজনার সাহিত্য, ও টিঁকবে না।

গিরীন

(হাসিয়া) তুমি যে ভারি মুরুব্বির মত কথা বলছ, যেন কোনো সস্তা সমালোচকের ধার-করা কথা। টেঁকা না টেঁকাটা সাহিত্য বিচারের একটা টেক্‌নিকাল কথা,—ক্লাসিকাল্ হওয়াই সাহিত্যে অমর হওয়া নয়। ধর পোপ, তুমি বলবে হয় ত উনি বেঁচে নেই, ইতিহাসের পাতায় নাম থাকলে কি হ'বে—কিন্তু আমি বলব উনি বেঁচে আছেন, ওঁর থেকে আমি রসগ্রহণ করেছি, সেই সংযম সেই দৃঢ়তা, সেই স্পষ্টতা—

স্নেহ

সস্তা সমালোচক বলছ কি?—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। তা ছাড়া তুমি কথাটার মানেই বোঝনি।

গিরীন

জানি, তুমি বলবে সাময়িক সমস্যা নিয়ে যে সাহিত্য তার আয়ুষ্কাল সেই সমস্যার স্থায়িত্ব দিয়েই নির্ণীত হবে—স্থানীয় সমস্যা নিয়েও যে উঁচুদরের সাহিত্য হ'তে পারে গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার মত কিন্তু তাই। কিন্তু সমস্যা আছে ব'লেই গর্কি বা ওয়েলসের সাহিত্য বাতিল হ'য়ে যাবে এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা বর্তমানের কোন মানুষের মুখেই মানায় না! দেখতে হবে সমস্যার জঞ্জাল ভেদ ক'রে সেটা সত্যিকারের সাহিত্যরচনা হয়েছে কিনা। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শবাদের সমস্যা আছে বলেই 'গোরা' সাহিত্যরচনা হিসাবে অসার্থক একথা আমি বলি নে। ধর 'যোগাযোগ'—তার যে সমস্যা সে বিশেষ ক'রে বিংশশতাব্দীর,—একটি ক্ষীণা সুকুমার মেয়ে কুমু এক স্থূল মাংসপিণ্ড মধুসূদনকে ভালবাসতে বাধ্য হচ্ছে—হয় ত আমরা দেখব এক যুগ পরে সেই আধ্যাত্মিকগুণসম্পন্না কুমু নিজে যেচে স্বয়ম্বরা হচ্ছে, নিজে সানন্দে সন্তান ধারণ করছে—তখন কোথায় থাকবে যোগাযোগের সমস্যা? সেই জন্যই কি রবীন্দ্রনাথ সে-যুগে **back-number** হ'য়ে পড়বেন না? তুমি বলবে, না, কেন না সেই সঙ্কীর্ণ বিষয়বস্তু ছাড়িয়েও যোগাযোগের হয় ত একটা চিরন্তন আবেদন আছে। 'বিসর্জন' নাটকের পশুবলি সমস্যা ত আমাদের যুগেই লোপ পেতে বসেছে, তার জন্য কি ঐ নাটকের মৃত্যু ঘটবে? সমস্যা ছাড়া ওতে কি আর কোনো পদার্থ নেই? **Similarly**, গর্কি *On the Raft* ও *Mother*এর লেখক হলেও কিংবা *William Olissold* লিখেও ওয়েলস তাদের

মধ্যেই এমন কিছু সৃষ্টি করেছেন যা হয় ত কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে চলবে। অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ এই ভবিষ্যৎ, মেরিডিথ এককালে জর্জ ইলিয়টকে স্বল্পায়ু সাহিত্যিক ব'লে ঠাট্টা করেছিলেন, কিন্তু খবরের কাগজে দেখতে পাই ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মেরিডিথের শতবার্ষিকীর দিনে লোকই হয় নি *Return of the Native* বেরুলে *Athenaeum* কাগজ হার্ডিকে কি গালটাই দিয়েছিল, কিন্তু কে জানে হার্ডি সম্বন্ধে সেই অবিবেচনা-প্রসূত মতটাই ভবিষ্যতে স্থায়ী হবে কি না।

স্নেহ

পড়ি না পড়ি না ক'রেও সে দিন একটা বই কিনেছিলাম খবরের কাগজে সমালোচনা প'ড়ে,—বইটার নাম *All Quiet on the Western Front*, তুমি পড়েছ? ধর সেই বইটা,—যুদ্ধ নিয়ে লেখা, তার নিষ্ঠুর বীভৎসতা, গ্লানি আর উৎপীড়ন। টিঁকবে ও? এর আগে যুদ্ধ নিয়ে কাউকে কোন উপন্যাস লিখতে দেখেছ, এমন শ্রান্তিকর বর্ণনা পড়েছ কোথাও?

গিরীন

আগে যুদ্ধ নিয়ে সবিস্তারে এমন জোরালো ও অভিনব উপন্যাস হয়নি বলেই যে এ উপন্যাস টিঁকবে না এ যুক্তি লজিক দিয়ে সাব্যস্ত হবার নয়। তোমার লীগ অব নেশন্‌স্‌ ম্যালেরিয়া তাড়াতে পারলেও যুদ্ধ তাড়াতে পারবে না। মিলেনিয়াম ও ডিস্‌আর্মমেন্ট—দুইই স্বপ্ন। অতএব মজুর বা কুলির জীবনের সমস্যা সত্ত্বেও কোনো উপন্যাস যদি সত্যিকারের রসসমৃদ্ধি লাভ করে, কে তাকে মারবে শুনি? একমাত্র সে, যে সমস্ত না প'ড়েই তাড়াতাড়ি বিচার করতে বসবে।

স্নেহ

(বাধা দিয়া) কিন্তু গল্‌সোয়ার্দির *Forsyte Saga*,—অদ্ভুত কীর্তি! ভিক্টোরিয় যুগ অতিক্রম ক'রে এসে এই বিংশশতাব্দীতে পা দিয়েও একটি বারো যুদ্ধের নিদারুণ অসহ্য বর্ণনা করেন নি,—খালি যুদ্ধাবসানের পর তার নিরানন্দতা বা বৈফল্যের ইঙ্গিত করেছেন— তাতেই তাঁর সৃষ্টি চিরন্তন ঐশ্বর্য্য-লাভের অধিকারী হয়েছে।

গিরীন

যুগান্তরে *Forsyte Saga*র সে-মহিমারও হ্রাস হ'তে পারে, স্নেহ। জনষ্টনের শেক্‌স্‌পীয়ার ও সুইন্‌বার্ণের শেক্‌স্‌পীয়ার কি একই ব্যক্তি? সেই শেক্‌স্‌পীয়ার-ই কি ফের বার্ণাড শ'র হাতে প'ড়ে রং বদ্‌লান নি? ভিক্টোরিয় যুগে ব্রাউনিঙের কি খ্যাতি ছিল?—বায়রণের খ্যাতি কি সমস্ত ইউরোপ গ্রাস ক'রে ছিল না? এলিজাবেথান্‌ যুগের হ্যাম্‌লেট্‌-নাটকে হয়ত ভূতপ্রেত বা 'নাটকের মধ্যে নাটকের'

সার্থকতা ছিল, কিন্তু এ যুগে তার মূল্য কোথায়? সারা ইংলণ্ড ঘুরে তুমি একটি ওফিলিয়ার দেখা পাবে? কিন্তু আমাদের এই বাঙলা দেশে সমস্ত মেয়েই কি এক অর্থে ওফিলিয়া নয়?—অভিভাবকের আদেশ মাথায় ক'রে কি সবাই হেঁট-হ'য়ে বলে না, 'I shall obey my Lord?' কোনো মেয়ে কি কোনো পুরুষকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝে, সহানুভূতি করে?...কিন্তু আর না, দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এই অন্ধকারটুকু থাকতে-থাকতেই আমি বেরিয়ে পড়ব।

স্নেহ

(ব্যস্ত হইয়া) বল কি, তোমার ট্রেন ত ভোরে ছাড়বে এখনই যাবে কি? (মৃদু হাসিয়া) সাহিত্যালোচনা করতে-করতে তুমি দেখতে পাচ্ছি লোচন হারিয়েছ।

গিরীন

কিন্তু ঠিক যাবার মুহূর্তের কয়েকটি মুহূর্ত আগেই যাওয়া ভাল, কেন না বিদায়-ব্যথা ব'লে কোনো জিনিসের বালাই থাকে না। তোমার স্বামীকে জাগিয়ে লাভ নেই, ওঁকে ঘুমুতে দাও,—আমিই ব্যাগটা গুছিয়ে নিচ্ছি, হ্যাঁ, এতেই হবে। বিলেত থেকে চিঠি লিখলে সময় ক'রে জবাব দিয়ো কিন্তু। অনেক রাত বকা হয়েছে। ভোরের আলো এসে না পড়তে একটু ঘুমিয়ে নিয়ো, বুঝলে? এই সময় ঐ নির্জন মাঠের পথটা কি চমৎকার লাগে বল ত!

স্নেহ গিরীনকে সদর দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিয়া মশারি তুলিয়া আমারই বিছানায় আসিয়া শুইল। স্নেহ যদি একটা আলো জ্বালিয়া টেবিলের কাছে বসিয়া কিছু পড়িত, তাহা হইলে ছবিটা এমন অসম্পূর্ণ থাকিত না। কিন্তু একটু ঘুমাইয়া না লইলে কাল আবার সংসারের কাজ করিবে কি করিয়া? পূবের দিকে বারান্দা, সেই দিকের দরজাটা খোলাই আছে, মনে হয় স্নেহ-র চোখে সত্যিই ঘুম আসিতেছে না,—ঐ দরজার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া ভোরের আলোর প্রতীক্ষা করিতেছে!

গ

স্নেহ-র ডায়রি হইতে

"এই সত্যটাকে সর্বাঙ্গ দিয়া উপলব্ধি করিতে গিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে। ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি, তোমার এই শুভ আশীর্বাদের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ করিয়ো।

আমার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে,—আমি মাতার গৌরবময় মর্যাদা লাভ করিতে চলিয়াছি, এত দিনে আমার নিঃসঙ্গতা বুঝি দূর করিলে, ঈশ্বর! আমার ও আমার স্বামীর দৈনন্দিন জীবনে এইবার হইতে একটি সুমধুর সংযম আসিবে, একটি প্রসন্ন নির্মলতা,—আমরা পরস্পরকে নূতন আলোতে চিনিব,—সেই পরিচয়ই আমাদের সত্য পরিচয় হোক!

ভাবিতে কি অনির্বচনীয় বিস্ময়বোধ হইতেছে, আমার জঠরে যে ক্ষুদ্র মাংস-পিণ্ডটুকু নব প্রাণলাভের আশায় কম্পিত হইতেছে—সে-ই এক দিন আমারই মত এই আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আকাশকে আলিঙ্গন করিতে চাহিবে, স্তব্ধ রাতে একলা বসিয়া কবিতা পড়িবে, বোধহয় বা ভালবাসিবে! আমার এই আকারহীন অস্তিত্বহীন শিশু কোথা হইতে এই বেগময় চঞ্চল প্রাণ হইয়া আসিয়াছে! ল্যাম্ব ও মেটারলিঙ্কের Dream-Children-এরও সুদূরবর্তী রাজ্য হইতে এই অতিথি আমার দেহের অন্ধকারে আসিয়া বাসা বাঁধিল,—বিধাতা, তোমাকে কি করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব? তুমি আমাকে মুক্তি দিলে!

সংসারের সিংহাসনে এইবার আমার প্রতিষ্ঠা হইবে, এইবার আমি আমার অবিচল সতীত্বের অহঙ্কার করিতে পারিতেছি। আকাশ বিদীর্ণ করিয়া যেমন তারার বুদবুদ ফোটে, মাটি হইতে তৃণাঙ্কুর,—তেমনি আমার এই মৃণ্ময় দেহ হইতে একটি বলিষ্ঠ সন্তানের আবির্ভাব হইবে,—আমার সীমন্তের সিন্দুর আরও গর্বোজ্জ্বল হইয়া উঠুক! স্বামীকে এখনো এই শুভসংবাদটা দেওয়া হয় নাই, মধ্যরাত্রে উঠিয়া তাঁহার কানে কানে এই কথাটি কহিব—আজ রাত্রে সত্যিই ঘুমাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।”

কি একটা কাজের তাড়ায় লেখাটা সাঙ্গ না করিয়াই স্নেহকে উঠিয়া পড়িতে হইয়াছিল খাতাটা তাড়াতাড়িতে বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। ইত্যবসরে সকাল বেলার টিউশানি সমাধা করিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা খোলা খাতা পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহার লিখিতাংশ হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। খবরটা শুনিয়া দস্তুরমত ঘাবড়াইয়া গেলাম,—ইহাকে লইয়া স্নেহ নাচিয়া উঠিয়াছে—উহার মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে না কি? আয়নাতে চাহিয়া দেখিলাম আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে,—একটা নূতন প্রাণীর শুভপদার্পণের সম্মানে মাহিনা আমার

এক পয়সাও বাড়িবে না,—এত বেশি দেরি হইয়া না পড়িলে স্নেহকে সাবধান করিয়া দিতে পারিতাম। বিবাহ ত ইহার জন্যই করিতে চাহি নাই।

স্নেহ ঘরে ঢুকিল। ঠাট্টা করিয়া কহিলাম—খুব যে সাহিত্যিক হ'য়ে উঠেছ—

স্নেহ সব বুঝিল, কিন্তু একটুও হাসিল না। মধ্যরাত্রে কানে কানে শুভ-সংবাদটা বলিতে পারিল না বলিয়াই হয় ত রাগ করিয়া খাতার পাতাটা টান দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

অদূরবর্তী ভবিষ্যৎ এক চোখে স্নেহ-র দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া অন্য চোখে আমাকে যেন বিদ্রূপ করিতেছে।

ঘ

মাস দশেক পরে কলিকাতায় এক ডাক্তার-বন্ধুকে এই চিঠি লিখিতেছি :

২৯শে আশ্বিন

প্রিয়বরেষু,

আমাদের বিপদের কথা শুনিয়াছ বোধ হয়,—আমার স্ত্রী অকালে প্রসব করিতে গিয়া কয়েকদিন হইল মারা গিয়াছেন, ছেলেটাও ভূমিষ্ট হইয়া একবার পৃথিবীর নির্মমতার স্বাদ পাইয়াই চোখ বুজিয়াছে। ভারি নিশ্চিন্ত হইয়া আছি, কিন্তু এই ভাবে একা থাকিবার নিদারুণ উপহাস আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমি আবার বিবাহ করিব মনস্থ করিয়াছি। তোমাদের রাস্তার উনচল্লিশ নম্বর বাড়িতে যে ভদ্রলোকটি আছেন তাঁহারই শ্যালিকার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আসিয়াছে। মেয়েটি শুনিয়াছি ডায়সেশান স্কুলে পড়ে, গান বাজনাও কিঞ্চিৎ শিখিয়াছে, (আমাদের সংসারে ইহার চল্ নাই, তুমি তাই ইহাতে তাহার পারদর্শিতা দেখিয়া ঝুঁকিয়ো না।) কিন্তু চেহারাটি পছন্দ-সই কি না সেই বিষয়ে মত স্থির করিয়ো। মেয়ে মনোনীত হইলে আগামী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই বিবাহের দিন ঠিক করিয়ো,—তোমার উপরই সব ভার দিলাম। আমার পুনরায় বিবাহ করা সম্বন্ধে as a doctor তোমার যে সম্পূর্ণ সায় আছে ইহা আমি আন্দাজ করিয়া লইতে পারি। সব খোঁজ খবর লইয়া শীঘ্রই আমাকে চিঠি লিখিবে, আমি চিঠির আশা করিয়া রহিলাম। বিবাহ না করিয়া তুমি আশা করি ভালই আছ। কিন্তু একবার যাহারা আফিং ধরিয়াছে তাহাদের পক্ষে তাহা ছাড়া অসম্ভব। তোমার কি মনে হয়? ইতি।

ষ্ট্র্যাণ্ড্ রোড-এর পারে প্রকাণ্ড অফিস্। প্রথম দিন অমূল্যই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো :

এই যে, মিষ্টার ভাদুড়ি !

ভাদুড়ির ভুঁড়ির মাপে বাজারে বেল্ট নেই ; গ্যালিস্‌টা কাঁধ থেকে নামিয়ে খালি-শার্টে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি-সব কাগজপত্র ঘাঁট্‌ছেন ; ডাক শুনে মুখ তুলে বল্‌লেন : হ্যালো, তোমার কার্বন-পেপার্ হ'য়ে গেছে—

হ'য়ে গেছে ? অমূল্য লাফিয়ে উঠলো : কিন্তু টেইপ্ ?

সেটা সম্বন্ধে সাহেব এখনো কিছু বলে নি। ক'য়ে দেব, কিছু ভেবো না। ভীষণ ব্যস্ত, অ-ফুলি ! চিঠি কাল পরশুই পেয়ে যাবে 'খন। O. K.

ভাদুড়ি স'রে পড়ছিলেন, অমূল্য বাধা দিলো :

আপনার কাছে আরো একটু কাজ ছিলো। দু' মিনিট।

দু' মিনিটে বিলিতি ডাক দু শো মাইল এগিয়ে আস্‌ছে। বল !

এ-আফিসে একটি লোক চেয়েছিলেন আপনি—

ও, হ্যাঁ। লোক চাই বটে। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে সপ্রতিভ সৌজন্যে বল্‌লেন,—আপনি ? তা বেশ। মাইনে গোটা পঞ্চাশ টাকা, খাট্‌নিও বেশি নয়। দু' কলম ইংরিজি লিখতে পারলেই হ'ল। খালি সিকোয়েন্স্ অফ্ টেন্স্ সম্বন্ধে একটু হুঁসিয়ার।

অমূল্য হেসে বল্‌লে—বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছিলো মশাই, আই-এতে তিনটে লেটার পেয়েছে। অকালে বাপ মারা যাওয়াতেই না এই দুর্দ্দশা !

এ-কথাটা অমূল্য না বল্‌লেও পারতো। ভাদুড়ি ক্ষেপে উঠলেন : রেখে দিন্ মশাই বি-এল্-এ রে। ঢের দেখেছি। পরেশ মুখুয্যেকে চেন ত' হে। সেই তোমাদের কদমতলারই ত' লোক। এই আফিসে দরখাস্ত করলো : I am a M. A. আর বলো না।

হেসে অমূল্য বললে,—পরেশ মুখুয্যেকে চিনি না ? হাওড়ায় মল্লিকফটকের কাছে সে এখন গাঁজার দোকান খুলেছে। সে আবার এম্ এ হ'ল কবে ?

আর বোল না – যত সব অঘা আর অজবুক নিয়ে কাণ্ড। যাক্, ওঁকে দেখে ত' খুবই স্মার্ট ব'লে মনে হচ্ছে—হ'য়ে যাবে নিশ্চয়ই। কাল আসবেন, ঠিক বারোটার সময়। তখন মিনিট পাঁচেক হয় ত' ফাঁকা থাকবো। আসবেন। ভুলবেন না।

এ-ও আবার মানুষে ভোলে!– এম্‌নি একটা নির্লজ্জ দারিদ্র্য চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো।

আসবেন কিন্তু।

ভাদুড়ি আবার মনে করিয়ে দেয়।

কয়েক পা এগিয়ে এসে অনুচ্চকণ্ঠে বল্‌লাম,—লোকটি বেশ।

নিশ্চয়। ওর মেয়ের সঙ্গে যে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে। তারিখটা পিছিয়ে রেখে ওকে দিয়ে কতগুলো কাজ বাগিয়ে নিচ্ছি।

কিন্তু তারিখটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেলেই হয় ত' তোমার জোর আরো বেশি খাটতো।

পাগল! ওর মেয়েকে বিয়ে করবে কে? একটি স্কন্ধহীন হাঁড়ি! আমাকে যদি চটায় তা হ'লে খাতিরো চট্‌বে।

লাভের মধ্যে আমারই চাকরিটাই ফস্‌কাবে তা হ'লে।

তোমার চাকরিটার জন্যেই ত' এ চক্রান্ত। নিশ্চিন্ত থা'ক—স্রেফ হয়ে গেছে ওটা। মাকে গিয়ে বল সুখবরটা; বলো, আস্‌চে মাসে মাইনে পেলে আমাকে যেন নেমন্তন্ন করেন। মোচার চপ রাঁধতে বলো, বুঝলে?

সুখাবেশে গলার স্বরটা ভারি হ'য়ে উঠলো; তোমার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো অমূল্য।

অমূল্য পৈতা রাখে, মঙ্গলবারে দাড়ি কামায় না, এবং হোটেলে অক্সটাঙ খাবার আগেও পঞ্চ দেবতাকে সবিনয়ে পাঁচটি ফোঁটা জল নিবেদন করে! সে বল্‌লে,—কৃতজ্ঞতাটা আরো ওপরে পৌঁছে দাও।

ড্যালহৌসি স্কোয়ারের ধারে এসে দু'জনে ছাড়াছাড়ি হ'ল। ও ধর্‌ল শিয়ালদার ট্র্যাম, আমি যাব ভবানীপুর। ট্র্যাম থেকে মুখ বাড়িয়ে ব্যস্ত হ'য়ে অমূল্য বললে,—কাল যেয়ো কিন্তু ঠিক, বারোটার সময়। ভুলো না যেন।

জপমন্ত্রের মতো মনে মনে আওড়াতে লাগলাম: ভুলি না যেন, ভুলি না যেন—

অমূল্যর সাম্‌নে ট্র্যামের সেকেণ্ড ক্লাশে উঠতে লজ্জা কর্‌ছিলো বলেই ওকে আগে যেতে দিলাম। একা একা সেকেণ্ড ক্লাশে চড়ায় কোথায় যে অসম্মান,

বুঝি না। কিন্তু অনেকে মিলে দল বেঁধে এলে একটুও বাধে না কোথাও। দল বেঁধে এলে মনে হবে—স্ফূর্তি; একা-একা এলে দারিদ্র্য।

পকেটে দু'টি পয়সাই ছিলো। দুপুরবেলায় ভাগ্যিস্ ট্র্যাম-কোম্পানী ভাড়া কমিয়ে দিয়েছে—নইলে পিচের রাস্তা ধ'রে সশরীরে আর ভবানীপুরে ফিরতে হ'ত না। কে জানে, হয় ত' এ-ও অপব্যয় করছি। এর চেয়ে দু'টি পয়সা দিয়ে দশটি লজেন্চুষ কিনে নিলে ভালো করতাম। কিন্তু কণ্ডাক্টার এসে পয়সা চাইলো। মুখখানা পাঁচের মত ক'রে গম্ভীর অন্যমনস্ক ভাবে জান্লা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থেকেও তাকে এড়াতে পারলাম না।

সকাল বেলা ছোট বোন পদ্মিনী এক পয়সার লজেন্চুষ কিন্তে না পেয়ে পাড়ার সমবয়সিনীদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। প্রথমে হাত পেতে ও ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিলো, তাতে সুবিধে হ'ল না দেখে গেলো খাম্‌চি দিয়ে কেড়ে নিতে। তবু পারল না। উল্‌টে সবাই মিলে ওর গায়ে কাদা ছুঁড়েছে, চুল ছিঁড়ে দিয়েছে, দু'হাতে এক গাছা ক'রে যে দুটি খেলো কাঁচের চুড়ি ছিলো তা দিয়েছে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে। শুধু তাই নয়, বলে দিয়েছে—এমন মেয়েকে নিয়ে ওরা আর লুডো খেল্‌বে না। বয়কট্। এই দুঃসংবাদটাই পদ্মিনী মা'র কাছে আনুনাসিক স্বরে বল্‌তে এসেছিলো, মা সশব্দে তার পিঠে এক কিল বসিয়ে দিলেন। পদ্মিনীর সকল কান্না ভয় পেয়ে নিমেষে থেমে গেলো। বিরস মলিন মুখখানির ওপরে দু'টি করুণ চোখের সে অসহায় বিষাদটুকু দূর থেকে আমি দেখেছিলাম।

ভবানীপুরে পায়ে হেঁটে গেলেও বিশেষ ক্ষতি ছিলো না। দুটো পয়সাই বা কম কি।

তক্ষুনি বাড়ি ফিরলাম না। গেলাম কোথায় জানো? সতেরোর এক নন্দন ষ্ট্রীট। সে-বাড়িতে বিভা ব'লে একটি মেয়ে আছে। আগে ও-পাড়ায় আমাদের বাসা ছিলো। বিভার এক দাদার বিয়েতে ও-বাড়িতে খেতে গিয়ে সরু একটা বারান্দার ধারে হঠাৎ একটি মেয়ের আঁচলের চেয়ে আরো খানিকটা বেশি গায়ে লেগে গিয়েছিলো—মেয়েটি এমনি চঞ্চল! কৃশ, লীলায়িত! মেয়েটি দিলো হেসে। সে-হাসির প্রতিধ্বনি করতে একদিন ছাদে এসে দাঁড়ালাম। বিভাও ছাদে এসেছে শুক্‌নো কাপড় কুড়োতে। কাপড়গুলি গুছোল, কুঁচোল; খোঁপাটা খুলে ফেল্‌লো, ফের বাঁধলো, প্যারাপেট-এ বুকের ভর রেখে নীচে একবার ঝুঁক্‌লো, গুন্‌গুনিয়ে একটু চেনা সুরে গান গাইলো। মনে ভাবলাম আর কী! আমার হৃদয়কম্পন ওর হৃদয়ে গিয়ে লেগেছে। এখন গান জমাবার পালা।

বাড়িটা ফাঁকা; বিভার পড়ার ঘরে নীচু তক্তাপোষটার ওপর শুয়ে পড়লাম।

খানিক বাদেই বিভার প্রবেশ। গায়ে দামি সিল্ক, পিঠের ওপর বেণী। চমকে বল্লে: তুমি কখন?

এই মাত্র। এত সাজগোজের ঘটা?

ম্যাটিনিতে যাচ্ছি গ্লোবে। যাবে ত ওঠ। চটপট। ভজহরি ট্যাক্সি আনতে গেছে।

আর কে কে যাবে?

নিভা রেবা দিদি দাশু মা পিসেমশাই ছুটকুন্—

ওরা সবাই যাক্। তুমি থাক।

আব্দার! বল্‌তে মুখে বাধে না? এখানে থেকে কি করবো?

কেন, আমার সঙ্গে গল্প করবে। দু'জনে ক্যারম খেলবো। বা খেলবো না।

বটে? আর ওরা গ্লোব থেকে লিলুয়ার পিসেমশাইয়ের বাগান-বাড়িতে যাবে, সেখানে খেয়ে-দেয়ে বাগবাজার হ'য়ে—নাও, নাও, তুমি চল না বাপু। অত সাধতে পারি না।

এই শাড়িটাতে কিন্তু তোমাকে ভারি মানিয়েছে। ভারি!

দিদি জন্মদিনে উপহার দিলেন। তুমি ত' কিছুই দিলে না। একটা ফাউন্টেন-পেন দেবে বলেছিলে—মনে করিয়ে দিতে-দিতে গেলাম। দয়া ক'রে ওঠ দিকি এবার, ভজহরি এসে গেলো।

আমার জামা-কাপড় কি-রকম বিচ্ছিরি ময়লা দেখেছ? তোমার দিদি নিশ্চয়ই নাক সিঁটকোবে।

ব'য়ে গেল। বোঁচা নাক আবার সিঁটকোবে কি? তার পাশে ত' আর বসবে না। ড্রাইভারের পাশে বোস না-হয়।

তা বসলাম। কিন্তু টিকিটের টাকা?

যাবে বল, আমি এক্ষুণি দিচ্ছি। লিলুয়াতে গিয়ে আমরা দুটিতে এক ফাঁকে টুপ ক'রে স'রে পড়বো দেখো। কেউ টের পাবে না।

টের সবাই পেলোই না-বা। একদিন ত' পাবেই। ব'লে তার ক্ষীণ কটিটি বেষ্টন ক'রে কাছে আকর্ষণ করতে গেলাম।

এই নিভা দাশু, মোটর এসেছে। ব'লে বিভা ঘুরে গিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফস্ ক'রে বেরিয়ে গেলো।

হরিশ-পার্কে ব'সে অমূল্যর একটা কথা মনের মধ্যে জেগে উঠলো। আমার তখন সেই বয়েস যে-সময়ে কিশোরীর একটি স্বেচ্ছাকৃত স্নেহ-স্পর্শকে আসন্ন বিবাহের সঙ্কেত ব'লে মনে হয়, এবং এই উপন্যাসটুকু বন্ধুর কাছে খুলে না বল্‌তে

পারলে আর স্বস্তি থাকে না। উত্তরে অমূল্য বলেছিলো : মেয়েমানুষ সিগারেটের বাক্সের মধ্যে বিদেশিনী নারীর রঙিন ছবি। একটু চোখ বুলোও, তারপর ছুঁড়ে ফ্যালো। যাকে বলো প্রেম সে হচ্ছে সিগারেট, ধোঁয়া যায় উ'ড়ে, থাকে ছাই। অতএব বৎস, ও দিকে ঘেঁসো না। দশটা পাঁচটা কর, গণ-গোত্র মিলিয়ে কেরানির জন্যে একটি রাণী বাগাও ছু'বেলা রেঁধে দেবেন আর বৎসরান্তে কন্যাবতী হবেন। পাকা সড়ক। অভিজ্ঞ লোক ভাই ; মেয়েমানুষের প্রেম আর চার্লি চ্যাপ্‌লিনের গোঁফ সমান জাতীয়।

বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হ'ল। মা দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন : কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? এত রাত্রেও যে বাড়ির বাইরে থাকিস, ব্যাপারখানা কি ? পদ্মর কী ভীষণ জ্বর এসে গেছে। মেয়েটা দাদা দাদা ব'লে কেঁদে খুন, আর দাদা গেছেন হাওয়া খেতে। ওর জন্যে এনেছিস লজেনচুষ ? জোগাড়-টোগাড় কিছু হ'ল আজ ?

সুখবরটা জিভের ডগায় প্রায় এসে গিয়েছিলো, কিন্তু শরীরের সব কটা স্নায়ুকে একসঙ্গে শাসন করলাম। সুস্বপ্নের স্মৃতি নিজের মনে পর্য্যন্ত লালন করতে নেই, ও এত ক্ষীণায়ু। বললে পাছে সে-স্বপ্ন আর না ফলে সেই ভয়ে এই নিদারুণ দুরাশার অন্ধকারেও আমাকে স্তব্ধ হ'য়ে পদ্মিনীর পাশে এসে বস্‌তে হ'ল। আঁচলে মুখ ঢেকে মা কাঁদছেন। পদ্মিনী তার কোমল মুঠিটি আমার কোলের ওপর তুলে দিয়ে বললে,—এনেছ দাদা ?

কালকে নিয়ে আসবো পদ্ম। এত এত। তোমাকে যারা মেরেছে তাদের সবাইকে তুমি অমনি বিলিয়ে দিয়ো, কেমন ?

মুখ দিয়ে কথাটা আর বেরুতে দিলাম না। বল্‌লে পাছে না ফলে।

খালি নীরবে পদ্মিনীর কপালে হাত বুলোতে লাগলাম।

অমূল্য কোথা দিয়ে যে কী ক'রে নিয়ে এসেছিলো ঠাহরই করতে পারি না।

ভাদুড়ি তেমনি ব্যস্ত, দু' কলম কি লেখেন আর থেকে-থেকে গলার টাই ধ'রে ফাঁসটা আরো জোরে টেনে দেন। অতি সন্তর্পণে বল্লাম,—নমস্কার।

মর্নিং। ও, আপনি? এই দেখুন। ব'লে বাঁ হাতের মণিবন্ধটা প্রায় আমার নাকের ডগায় কাছে এনে ধরলো : দেখুন দেখুন, ভালো ক'রে চেয়ে দেখুন একবার।

হাত-পা কালিয়ে উঠলো। থমকে চেয়ে দেখলাম ভাদুড়ির রিষ্টওয়াচে বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট।

স্বর্গ থেকে বিদায়!

কিন্তু ভাদুড়িই বল্লেন,—বসুন। পাঙ্কচুয়ালিটি কবে শিখবেন আপনারা?

অত্যন্ত অপরাধীর মত, চেয়ারটা না টেনেই নিঃশব্দে বসলাম। বল্লাম—এই আফিসটা খুঁজতে সামান্য একটু দেরি হ'য়ে গেলো। নইলে এখানে পৌঁছেছিলাম বারোটার আগেই।

সামান্য দেরি? পাঁচ মিনিট কম হ'ল মশাই? তিন শো সেকেণ্ড। এক সেকেণ্ডে ফোর্ডের কত আয় হিসেব রাখেন? ফোর্ড আলু খায় না জানেন?

মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বল্লাম,—শুনেছি।

হ্যাঁ, আলুটা ছাড়ুন।

স্তিমিত কণ্ঠে বল্লাম,—ছাড়াই ত' উচিত।

ভাদুড়ি ধমকে উঠলেন: একশোবার। শাক ধরুন। শুদ্ধ ভাষায় যাকে ঘাস বলে।

ঠোঁটের ওপর ক্ষীণ একটু হাসি এনে বল্লাম,—সস্তাও।

নিশ্চয়। আলু খেয়ে আমাদের দেশের থিয়েটারের মেয়েগুলোর বহর দেখেছেন?

হ্যাঁ।

থিয়েটারে যান্ নাকি?

ভয় পেয়ে বল্লাম,—একবার ছেলেবেলায় গিয়েছিলাম; অত শত বুঝিনি তখনো।

কী বোঝেন নি?

ঐ ওদের কথাবার্ত্তা।

কিন্তু নাচউলিদের বহরটি ত' বেশ মনে আছে দেখছি। গায়ে ওটা কি? খদ্দর? এখানে ওসব চলবে না মশাই।

ভাদুড়ি ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার করছেন ব'লে আশ্বস্ত হ'লাম। বল্লাম,—ওটা খাঁটি দিশি নয়। বোধ হয় ম্যান্‌চেষ্টারের।

তাই ভালো। এই দেশটা কী? ম্যান আছে কিন্তু চেষ্ট নেই।

বলতে ইচ্ছা হ'ল: আছে ভুঁড়ি। ভাদুড়ির সেই বৃহদায়তন উদরটির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

খানিক বাদে জান্‌লা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বল্লেন,—নিশ্চয়ই জল হবে।

বোধ হয়। উত্তুরে মেঘ।

মোটেই ওটা উত্তর নয়। উত্তর-পশ্চিম।

হ্যাঁ উত্তর-পশ্চিম। উত্তুরে মেঘে ত' খালি ঝড় হয়। ধুলো ওড়ে।

মোটেই নয়। ঝড় হয় দক্ষিণ-পশ্চিমের মেঘে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। বোকার মত অস্ফুটস্বরে হেসে উঠলাম।

কী দিয়ে দাঁত মাজেন?

ভয়ে ভয়ে বল্লাম, —কয়লা দিয়ে।

তাই মলিনত্বং ন মুচ্যতি।

সংস্কৃতটা শুদ্ধ ক'রে দিতে পর্য্যন্ত সাহস হ'ল না। জিভ দিয়ে দু'পাটি দাঁত রগ্‌ড়ে নিলাম।

ভাদুড়ি বল্লেন,—কয়লা মাখলে পায়রিয়া হয় জানেন? পায়রিয়া থেকে ক্যানসার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। যতীন মুখুয্যেরো বোধ হয় দাঁতে কয়লা মেখেই ক্যান্‌সার হয়েছে।

কে যতীন মুখুয্যে?

য়্যান্ড্‌ক্লইউলের ছোট বাবু—

সে যতীন মুখুয্যে নয়, সতীন মিত্তির। য়্যান্ড্‌ক্লইউল সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে আসবেন না।

কিন্তু তাঁর গলায় যে পৈতে?

পৈতে কার গলায় নেই? বদ্দিরা হয়েছে শর্মা, কায়স্থরা বর্মা, নাপিতরা অবধি নাই-বামুন, পায়ের নোখ কাটবে না। যতীনের ক্যানসার হয়েছে স্থপুরি খেয়ে।

হ্যাঁ। ভদ্রলোক রাজ্যের পান খেতেন।

পান খেলে হয় ত পার পেয়ে যেত। চিবোত খালি স্থপুরি।

হ্যাঁ, পকেটে একটা ডিবে থাকতোই।

হঠাৎ ভাদুড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন: য়্যান্ড্‌ক্লইউলের যতীনের কি হয়েছে হে, জামাই?

জামাই ব'লে ভদ্রলোকটি পাশের টেবিল থেকে বল্লেন,—য়্যাপিন্‌ডিসাইটিস্‌।

ভাদুড়ি আমার দিকে বাঁকা চোখে চাইলেন: আমিও ত' তাই বলছি। আপনি বল্‌ছেন কি না ক্যান্‌সার!

দ'মে গিয়ে বল্লাম,—হবে।

হবে কি, হয়েছে।

হ্যাঁ। হয়েছে।

পাশের টেবিল থেকে জামাই ব'লে উঠলেন: হয়েছিলো। অপারেশান করিয়ে সেরে উঠেছে।

ভাদুড়ি টাইয়ে আরেক টান মেরে বল্লেন,—তাই। আমিও ত' তাই বলছি। আপনি দেখছি কোনো খবরই রাখেন না। জি পি ও-র গম্বুজে কটা ঘড়ি আছে বলতে পারেন?

তিনটে না?

কোনটার কি টাইম্?

কিছু বল্‌বার আগেই ভাদুড়ি বল্লেন,—হাওড়ার দিকেরটা যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্ রাখে এটুকু খবর রাখেন না? সাড়ে বারো পার্সেণ্টে পঁয়তাল্লিশ টাকায় কত ডিসকাউণ্ট দিতে হ'বে?

একেবারে ঘামিয়ে উঠলাম। ভাদুড়ি বল্লেন,—কাল বাড়ি থেকে হিসেব ক'রে নিয়ে আসবেন।

কাল আবার আসবো?

ভাদুড়ি চুপ।

কখন আসবো কাল? বারোটার সময়?

ভাদুড়ি মুখ না তুলেই বল্‌লেন,—সাড়ে পাঁচটার পর!

সাড়ে পাঁচটার পর? তখন আপনাকে পাবো?

ভাদুড়ি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন: শুনলে জামাই, এ ভদ্রলোক সাড়ে পাঁচটার পর আমার সঙ্গে কাল দেখা করতে আসবেন? আজ কী বার, মশাই?

খুব সাবধানে হিসেব ক'রে বল্লাম,—শনিবার।

তবে আসবেন কাল। সাড়ে পাঁচটায় কেন, যখন আপনার খুসি।

এমন একটা দিনে একটি নারীর সান্ত্বনা পেতে ইচ্ছা করে। জীবনে তখন তেমন মাত্র একটি নারীর পরিচয়লাভ ঘটেছে। নাম জানো ত'? মনে আছে?

সে আমাকে সান্ত্বনা দেবে বাণীহীন বেদনা-উদাস দুইটি চক্ষু দিয়ে নয়,—স্পর্শে, সুখঘন উষ্ণ সান্নিধ্যে, শরীররোমাঞ্চে। আমি তখনো ভারি সেকেলে ছিলাম। বিস্তার প্রসারিত জঙ্ঘার ওপরে মাথা রেখে একটু শোব, ও ধীরে আমার কানের কাছের চুলগুলিতে একটু আঙুল বুলোবে,—ঘর মৃত হৃৎপিণ্ডের মত স্তব্ধ, আকাশে

কৃশ শশীলেখা! একবার শুধু বলবো হয় ত': প্রেমকে দীর্ঘজীবী ক'রে রাখবার চেষ্টায় বিয়ের মত অশ্লীল একটা কাণ্ড আমরা নাই বা করলাম, বিভা! বিভার আঙুল ললাট উত্তীর্ণ হ'য়ে ঠোঁটের কাছে এসে এলিয়ে পড়বে।

পড়ার ঘরে গিয়ে দেখি বিভা ভারি ব্যস্ত।

এই যে, তুমি। এস দিকি এগিয়ে, এই সাবষ্টেন্সটার মাথা কোথায়, ল্যাজ কোথায় একটু আলগা ক'রে দাও ত' শিগগির।

দূরে চেয়ার টেনে বসলাম। বললাম,—ওসবের আমি কি জানি?

যাও, ভারি দেমাক হয়েছে, না? কেন গেলে না কাল? বায়স্কোপ থেকে ঊর্মিলা-দিকে টেনে নিয়ে গেলাম। ওঁর মত একটা ব্লাউজ-পিস কিনে দিতে পারো? দেখবে প্যাটার্ণটা? হ্যাঁ, তুমি না দিলে ত' ব'য়ে গেল—এই দেখ দিদি কিনে দিয়েছে। ভাববার আগে কলম চলে। ব'লে বিভা সবুজ একটি কলম দেখালো।

গোখেল-মেমোরিয়াল্এ কাল আমরা নাচবো, টকিতে গান দেবো, ইচ্ছে করি ফিল্মএ নামি। হারিয়ে দেবো—গ্রিটা গার্বোকে,—ঠিক, তুমি দেখো। আমার চোখের পালকগুলি অমনি লম্বা নয়? কি বল? ব'লে বিভা টেবিলের ওপর থেকে একটি ছোট আয়না আলোর দিকে তুলে ধরলো।

তার পর অনুচ্চস্বরে: বাবা মহা মুস্কিল বাধিয়ে তুলেছেন। বলছেন, শিগগির নাকি আমার বিয়ে। এত নেচে কি না এখন আমি আছাড় খেয়ে পড়ি। ছেলে হ'লে ঠিক পালিয়ে যেতাম। তোমাদের কী মজা, কেউ জোর খাটাতে পারে না। আচ্ছা, তুমি ত' একটি অকর্মার ঢেঁকি, ছাতে উঠে খালি পাশের বাড়ির মেয়েকে হাতছানি দাও—একটা কাজ কর না। আমাকে পিসিমার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারো? চাটগাঁয়? ভারি মজা হয় কিন্তু। ব'লে বিভা নিরুৎসাহ ভাবে হেসে উঠলো।

আমি কিন্তু তা ব'লে পড়া বন্ধ করতে পারবো না। বাবা ওঁদের কাছ থেকে সে গ্যারাণ্টি এনেছেন—না এনে যাবেন কোথায়? অত সহজে হাল ছেড়ে এলিয়ে পড়বার মেয়ে নই। আমার বিয়েতে তুমি একটা পিক্চার য়্যালবাম্ দিয়ো—সেই যেটাতে তোমার 'দান্তের স্বপ্ন' আছে। দাঁতের স্বপ্ন, না অজিতদা?

অনেক পরে বলতে পেরেছিলাম মনে আছে: চাট্গাঁয় যাবে?

বিভা তার 'টেষ্ট-পেপারের' পৃষ্ঠা উল্টে বললে,—কবেই বা যাই? পরশু আবার এক্জামিন্, মিস সোম একটা ছুঁচি। না বাবা, একজামিন আমি দেবই দেখো। কেন, চাটগাঁয় তোমার কেউ আছে বুঝি?

না, কে আবার থাকবে!

শোন, বন্ধুদের কি ব'লে নেমন্তন্ন-পত্র ছাপাই বল ত'। তোমার ত' ভাষা-টাসা আসে শুনেছি। একটা লিখে দিয়ে যেয়ো, কেমন? নমিনেটিভ্ পেছনে রেখে ভার্বটা আগে পাঠিয়ে কী ক'রে যে সবাই লেখে ভেবে উঠতে পারি না। বাবা, পরীক্ষায় ও-সব খাটবে না কিন্তু। চললে? এসো কিন্তু কাল—লেখা নিয়ে।

রাস্তায় অনেকটা এগিয়েছি; পেছনে থেকে বিভা ফের ডাকলো: অজিতদা, শোন।

ফিরলাম।

বিভা বললে,— মা বললেন মিষ্টি-মুখ ক'রে যেতে। খালি-পেটে অমন একটা শুভ সংবাদ শুনে যেতে নেই।

আশ্চর্য্য। সামনে টেবিল টেনে চেয়ারে বসলাম। টেবিলের ওপর একথালা মিষ্টি। সারাদিন শ্রান্তিতে ভারি খিদে পেয়েছিলো।

এখন সেই কথাই মনে হচ্ছে,—প্রেমের চেয়ে বড়ো হচ্ছে ক্ষুধা, আত্মার চেয়ে দেহ। তোমারো কি তাই এখন মনে হয় না?

অমূল্য প্রতিশোধ নিলো ভাদুড়ির ওপর। অর্থাৎ তাঁর কন্যাকে সে শয্যাসঙ্গিনী করলে না।

ওর ত' আর চাকরির ভাবনা নেই। বাপের দেদার পয়সা, অলস হ'য়ে ভোগ করতে ওর বাধে ব'লেই ও দালালি করে, লাইফ্ ইন্‌সিয়োরেন্সের মক্কেল বাগায়।

প্রেম করতে এসে আগে চায় চোখের দেখা, তারপর দু'টি মুখোমুখি কথা, একটু স্নেহাভাস, একটু ক্ষণ-সান্নিধ্য, তারপর একটু ছোঁয়া—শাড়ির, আঙুলের, অধরের। অধর ডিঙিয়ে বুক, তারপর সর্বাঙ্গ। আরো চাই তবু। সন্তান এবং বংশের ভিতর দিয়ে অবিনশ্বরতা। এই না প্রেম!

অমূল্যও তাই আরো চায়। চায় নগদ টাকা, দান-সামগ্রী, মোটর-সাইকেল—কত-কি! চায় বিভাকে।

তার পর—আরো বলবো? তার পর সব ত' তুমি জানো।

বিয়ের বাজনা ভেদ ক'রে অমূল্যর একটা কথা কেবলই আমার কানে বাজছিলো: কৃতজ্ঞতাটা আরো ওপরে পৌঁছে দাও!

কৃতজ্ঞতা আরো ওপরে পৌঁছে দিলাম।

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে যে-সঙ্গিনীটির কাছে আমি আমার জীবনের গল্প বলছি— সে সহসা আমার বক্ষলগ্ন হ'য়ে মমতাময় কণ্ঠে বললে,— এখন থাক, রাত কম হয় নি। এবার ঘুমোও।

নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বাষ্পাচ্ছন্ন স্বরে বললাম,—আজকে, সতেরোই শ্রাবণই ত' তোমার বিয়ে হয়েছিলো, তারিখটা মনে নেই বিভা? সেরাত্রে কি আমি আর ঘুমুতে পেরেছিলাম?

বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বিভা প্রায় কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বললে,— কিন্তু আজ ঘুমোও।

ঘুমোব। একটা মজার গল্প শোন। দোল্‌নায় খুকিকে দু'টি ঠেলা দিয়ে এস। বেচারাকে মশা কামড়াচ্ছে।

বিভা খুকিকে দোলা দিয়ে আমার কাছে এসে আবার শুল। হঠাৎ উঠে প'ড়ে বললে,— খুকিকে নিয়ে আসি। ওর খিদে পেয়েছে। পুরোনো কথা শুনতে এখন ভারি ভালো লাগে—

বিভার বুকে খুকি, আমার বাহুর ওপরে ওর মাথাটি এলানো। ওর শীর্ণ দেহটি যেন নিস্তরঙ্গ নদী, মাতৃত্বমণ্ডিত মুখখানিতে পবিত্র গাম্ভীর্য্য!

শোন, কী মজা—

গল্প আবার সুরু করি।

আমার আফিসে একদিন ভাদুড়ি এসে হাজির। জটাজুট দাড়ি গোঁফ তখন নির্মূল হ'য়ে গেছে। চিনতে পারলেন। ইঞ্চি দুয়েক হাঁ ক'রে বললেন,— অজিতানন্দ স্বামীজী এখানে থাকেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই। কি দরকার বলুন। ওরে কে আছিস, একটা চেয়ার দে সাহেবকে।

ভাদুড়ি আমতা আমতা ক'রে বললেন,—আপনি—আপনি—

হ্যাঁ, আমিই একদিন আপনার আফিসে বছর দশেক আগে উমেদারি করতে গিয়েছিলাম। কী চান্? আমাদের চামড়ার এজেন্সি?

ভাদুড়ি একেবারে হাঁপিয়ে উঠলেন, যেন লাক্ষ্নৌর ইমামবড়ার গোলকধাঁধায় এসে পড়েছেন, হাতে টর্চ নেই। বললেন,—আপনি না সংসার ত্যাগ করেছিলেন?

হেসে বললাম,—চিরকাল সরে ব'লেই ত' সংসার, যা সরে তাকে ত্যাগ করা যায় না। আপনি যদি সরেন, সংসারো কাছে স'রে আসে। কেনোপনিষৎ পড়েছেন?

কিন্তু সন্নেসির এ কী ঠাট? তিন আঙুলে আঙটি? গায়ে সিল্ক? ঘাড় চাঁছা? এ কী প্রবঞ্চনা?

প্রবঞ্চনা না ক'রে কোনো ব্যবসায় বড়ো হওয়া যায় না। সে-কথা থাক, কী চান শুনি? চাকরি না এজেন্সি?

সে-কথা পরে হচ্ছে। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ক'রে আবার আপনার কি দুর্মতি হ'ল?

হুঁ, এমনি মজা। কামিনী-কাঞ্চন এমনি পিছল জিনিস মশাই, ছাড়লেই আঁকড়ে থাকে। কামিনী আর কাঞ্চনের জন্যেই কামিনী-কাঞ্চন ছেড়েছিলাম। তা হ'লে পেন্টালুন্‌টা একটু তুলে চেয়ারটায় বসুন।

ভাদুড়ি বসলেন। মুখে বিরক্তি, অথচ ভয়।

বললেন,—আপনি অমূল্যর বৌকে চুরি করেছেন?

অমূল্যই বরং আমার বৌকে চুরি করেছিলো।

আপনার বৌ?

ব্যাপারটা বলছি, বসুন দয়া ক'রে।

আপনি দিলেন না চাকরি, অমূল্য বিভাকে কেড়ে নিলো। তবু কৃতজ্ঞতা আপনাদের ডিঙিয়ে আরো ওপরে পৌঁছে দিলাম। কপালে কাটলাম ফোঁটা, মাথায় রাখলাম টিকি। দাড়ি কামাতাম না, হাতের নোখগুলি স্বচ্ছন্দে বাড়তে দিলাম। কম মহড়া দিতে হয়নি মশাই, ভাতের ওপর তুলসী পাতা রেখে খেতে বসেছি, খাওয়ার শেষে পিঁপড়ে আর কাকদের জন্যে অতিথিশালা খুলেছি। তারপর যখন তিন পয়সায় দাড়ি ও ছ'পয়সায় চুল কাটাবার মতন সময় পেরিয়ে গেল, কাছা নামিয়ে ববম্-বম্ ব'লে বেরিয়ে পড়লাম।

একটি দুটি বছর নয় মশাই, নটি বচ্ছর সমানে। হরিদ্বার থেকে রামেশ্বর। কত রকম আসন, কত রকম হোম, কত নতুন উপচার! তারার দিকে, বিড়ালের চোখের দিকে চেয়ে-চেয়ে হিপনটিজম্ শিখলাম—গুরুও জুটেছিল একটি।

আপনার মতন ভুঁড়ি, যদিও আলু খাননি কোনোদিন। কাক-চরিত্র, কোকিল কথন—কত-কি!

ভাদুড়ি টেবিলের ওপর কনুয়ের ভর রেখে বললেন,—অজিতানন্দ স্বামীর নাম ত' ভারতবর্ষে হু-হু ক'রে চলছিল, কত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়েছেন—

হোমিওপ্যাথি জানতাম যে। জল ছুঁয়ে দিয়েছি, রুগী নিজের উইল্-ফোর্সে সেরে উঠেছে। শুধু কি তাই? স্ত্রী এসেছে স্বামীর বশীকরণ মন্ত্র শিখতে, বাৎসায়ন পড়িয়ে দিয়েছি; বন্ধ্যা নারী এসেছে পুত্র-কামনা ক'রে, বিফল-মনোরথ হয় নি কোনোদিন। ব'লে একটু হাস্‌লাম।

আগাগোড়া আপনি জানতেন যে জোচ্চুরি করছেন?

সন্নেসি দূরের কথা, স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত জানেন না।

কিন্তু অমূল্যর বৌকে কোথায় পেলেন?

আমার বৌকে বলুন। পেলাম চুঁচড়োয়। এক বটগাছের গোড়ায় সিঁদুর মাথিয়ে ত্রিশূল গেড়ে ভস্ম মেখে ধুনো জেলে লোহার শলার ওপর বসেছি—লোকে লোকারণ্য। কেউ টিপছে হাঁটু, কেউ কব্জি, কেউ বা জটায় আমার স্যাম্পু করছে। অসংখ্য লোক হামাগুড়ি দিয়ে জ্যান্ত বটগাছকে প্রণাম করছে। কেউ দিচ্ছে ফল, কেউ দিচ্ছে পয়সা। স্তূপাকার।

সেদিন আকাশে খুব মেঘ। উত্তর-পশ্চিমে নয়, ভাদুড়ি, পূবে। আসর বুঝি জমে না। ধুলোতে ফুঁ দিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিলাম, মেঘ গেলো ভেসে। মেঘের ফাঁকে সোনার আলো ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠলো।

সেই সোনার আলোয় বধূবেশে একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো কুণ্ঠিতকায়ে, অভিমানিত, নমিত দৃষ্টিতে। প্রথম তারাটি দেখলে তার কথা তখনো মনে পড়তো। চিন্‌তে কি আর ভুল হয়? বল্লাম,—যদি সবাইর সামনে তোমার মনের কথা বলতে ভয় হয়, তোমার মাকে নিয়ে রাত্রে এসো। ঐ আমার কুঁড়ে বেঁধে রেখেছি। ঐ যে।

মেয়েটির ভাগ্যে সবাই ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠল। ওর সঙ্গিনী ঐ প্রৌঢ়াটি যে ওর মা, আমার এই জলন্ত সত্যবাদিতায় বিভা আর তার মা বিস্ময়ে ভক্তিতে অভিভূত হ'য়ে পড়লো। দুটো পা দু'জনের মাথায় চাপিয়ে পদধূলি দিলাম।

রাত্রে আবার ওরা এলো। আমার খড়ের ঘরে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। সামনে হোমকুণ্ড, নিবন্ত। বিভার মুখে কথা বেরয় না, খালি কাঁদে। চেহারাটা

রোগা, কাহিল, মুখে বঞ্চিত আশার কালিমা মাখা। ওর মাকে বললাম—কী ব্যাপার ? অমূল্য বুঝি খুব খারাপ ব্যবহার করছে ?

আমার মুখে অমূল্যর নাম শুনে দু'জনে চমকে উঠলো। মা বললে,—সত্যি কথা বাবা, সেই বিয়ের সময় থেকে পাওয়া-থোয়া নিয়ে গোলমাল ওদের আজো চুকলো না। কর্তা সর্বস্বান্ত হলেন, তবু ওদের থাক মিটে কৈ ? মেয়েটাকে ধ'রে মারে, মেরে মেরে বাছাকে আমার চামড়া-সার ক'রে তুলেছে।

বিভাকে বললাম,—কি চাও বাছা ? স্বামীর প্রেম ?

বিভা শুধু বললে,—মুক্তি।

বললাম—তথাস্তু। কালকে তুমি একলাটি একবার এস বিভা।

ভাদুড়ি বাধা দিলেন : তথাস্তু মানে ? অমূল্যকে আপনি মারলেন ?

জিভ কেটে আমি বললাম,—ছি! আমি মারবার কে ? মারলো ওকে মদ, লিভারের ফোড়া। আরো যত রাজ্যের রাজকীয় ব্যাধি।

আপনি ভগবানের কাছে ওর মৃত্যুর জন্যে প্রার্থনা করলেন ? স্তব-স্তুতি হোম পূজো ?

তা একটু করলাম বৈ কি। এতদিনেও যদি সাংসারিক না হই, তা হলে আর কি শিক্ষা হল বলুন।

তার পরে একলা ও এলো ?

শুধু সেই রাত্রে ? রোজ। না এসে করে কী! টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন না ?

আপনাকে চিনলো ?

দরকার নেই। ততদিনে ছেলেবেলার সেই অস্বাস্থ্য কাটিয়ে উঠেছি। বললাম,—সেকেণ্ড ক্লাশে পড়বার সময় একজনের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলে, মনে আছে বিভা ? বিভা পায়ের ওপর মাথা রেখে বললে,—তখন তার সেই অনুচ্চারিত প্রেম বিশ্বাস করিনি, ঠাকুর।

আজ করবে ? ব'লে তাকে সহসা বাহুর মধ্যে টেনে আনলাম। বিভা শিবদেহলীন পার্বতীর মতো নিমীলিত চক্ষে সে স্পর্শবন্যায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লো।

টাই টেনে ভাদুড়ি বললে,—তার পর ?

তার পর যখন সে আবার ফিরলো, চেয়ে দেখলাম আমার চুম্বনে তার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে। তিন টাকা খরচ ক'রে কলকাতার সেলুন থেকে লুকিয়ে দাড়ি চুলের জঙ্গল সাফ ক'রে নিলাম। বিভা অবাক হয়ে গেল : তুমি ? অজিত ?

তাকে কাছে ডেকে এনে কানে কানে বললাম,—অজিতানন্দ।

ভাদুড়ি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল: আপনার মতন স্কাউণ্ড্রেলটার সঙ্গে ও এলো?

না এসে করে কী ভাদুড়ি? বিভা তখন মাতৃত্ব-সম্ভাবনায় মহিমাময়ী।

গল্প থামিয়ে বললাম—খুকির কি নাম রাখা যায় বল ত'?

বিভা খুকির চুলগুলিতে হাত বুলুতে বুলুতে বললে,—সীতা। বসুমতী ওকে উপহার দিয়েছেন।

বললাম,—না। নুরজাঁহা। জন্ম ওর পথে নয়, নেপথ্যে।

বিভা বললে,—হ্যাঁ, তারপর?

ভাদুড়ি তোমাকে-আমাকে গালাগালি দিয়ে বহুল পরিমাণে থুথু ছিটোতে লাগলো। বললাম,—সিদ্ধিটাই বড়ো, ভাদুড়ি, রীতি নয়। বিভাকে পাওয়া ছিলোই আমার তপস্যা। ওকে কলঙ্কিনী বলুন ক্ষতি নেই, আমার প্রেমে ওর সে কলঙ্ক মুছে দিয়েছি।

ভাদুড়ি বললে,—এত বড় চামড়ার কারখানা খুললেন কী ক'রে?

—স্রেফ হোম ক'রে। কতগুলি ভস্মই আমার মূলধন। এক মুঠো ছাই নিয়েছি আর সোনা হ'য়ে গেছে। কিন্তু আপনি কি মনে ক'রে এসেছেন? যদি পারি ত' নিশ্চয় উপকার করবো। বলুন।

ঢোঁক গিলে ভাদুড়ি বললে,—এসেছিলাম একটা ওষুধের জন্যে। তা—

ওষুধ? কিসের? ভুঁড়ি কমাতে হবে? আলু খাওয়া ছেড়ে টোমাটো ধরুন।

রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে-করতে ভাদুড়ি বেরিয়ে গেলো।

মাঠ ও বাজার

রেল-রাস্তা পেরলেই মাঠ,—সমস্ত হাওয়া একচেটে ক'রে রেখেছে। এদিকে ঘিঞ্জি সহরতলি ধোঁকে,—নজগঞ্জে পুঁয়ে-পাওয়া সহর।

আর, কা'র জন্যই বা হাওয়া? দুটো চারটে দানো অশ্বথ গাছ, মাটির বুকের দুধ খেয়েই টনকো মজবুত,—আর দুটো চারটে কাঁচা পুকুর, একটা হিংচে শাকও ভাসে না তাতে, না বা কলমি লতা। কয়লার গুঁড়োতে কালো-করা রাস্তার ধারে একটা ডাক-বাংলো,—তা থাক,—আর শেষ প্রান্তে একটি সাধাসিধে বাড়ি,—তাতে এক ফক্কড় ছেলে থাকে, এই সবার বলবার ধরন। এই মাঠটা এত দিন সুখেন্দুর কাছে ছিল বোজা পুঁথি, সুদূরের ধোপা-পটিটার মতোই তুচ্ছ, চিরদিনকার পরিচিত বলেই নিরর্থক। কিন্তু এই মাঠের দিকে চেয়েই না সুখেন্দুর তেপান্তরের কথা মনে পড়ে! পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা হাওয়ার এই উদ্দাম দুর্বিনীত বেগ দেখে। ও যেন হঠাৎ একদিন এই মাঠ ও বাতাস আবিষ্কার ক'রে ফেললে।

বাজারে তাল-পাতার পাখার দাম চার পয়সা ক'রে। দোকানি বকুনি খায়, কে শাসিয়ে শুনিয়ে যায় —পাৎলা পতপতে একটা পাখা, দু'বার হাতে ঘোরালেই মচকে যায়। চার পয়সা না হাতি—

দোকানি বলে—ওটার দাম দু' আনা, সমস্ত রাত ব'সে ব'সে ওগুলোতে লাল কালির ফুট্‌কি দিয়েছি।

হাওয়াও ত আর মাগনা খাওয়া যায় না। আকাশের রূপালি আলোটুকু পর্য্যন্ত রূপোর ঘুষ দিয়ে ঘরে আনতে হয়। না ডাকলেও যে আসতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা করে না, সে মৃত্যু—চোরের মত চুপি-চুপি আসে না, ডাকাতের মতো ধমক দিয়েই আসে, বলে: আরেক জনের রাস্তা খোঁড়বার চাকরির সুবিধে ক'রে দিয়ে গেলাম, রোদে সে পিঠ পাতুক!

নৃসিংহ ওর বউকে বলে—তেতে-তেতে গা আমসি হ'য়ে গেল,—কলসি শেষ হ'য়ে গেছে। পুকুরটা এক ঢোকে গিলে ফেলতে পারি, জানিস? তোর এই বাসন-পেটা'র চেয়ে আমার জেলে-নৌকো ঢের সুখের ছিল। ছই'র ওপর চিৎপাত হ'য়ে—দিব্যি—

বৌ বলে—বাতাস ছিল বটে, পয়সা ত ছিল না। তারপর একদিন ঝড় উঠুক,—ডিঙিটা ডিগবাজি খা'ক! আরেক ঘটি জল খেয়ে নাও, দাওয়ায় না হয় চাটাই বিছিয়ে দিচ্ছি।

দাওয়ায় নয়, কেউ কেউ আবার পথের পারে শোয়। সমস্ত সেই যে ঘুমিয়েছিল ভোর হ'তে আর দেখেনি, রোদের আদরও পায় নি আর,—ওকে কেউটে কেটেছিল। লেখরাজ মরেছিল ডিপথেরিয়ায়। ওর বৌ নাকি বলেছিল —এ সব ব্যামো শুধু বড়লোকদেরই হয়।

ব্যাধিজীর্ণ বুড়ো থুত্থুড়ো সহর ঐ তাজা সবুজ অগাধ মাঠের দিকে ভিজা চোখে চেয়ে থাকে। হুলো বাড়িয়ে ডাকে, মিনতি জানায়।

রাসন-পেটা'র আওয়াজ বজ্রের মতো প্রচণ্ড বলেই হয়ত পটিটার নাম ঠাঠারি-বাজার। বাসন পিটিয়ে ভোরাই, সাঁঝাইও বাসন পিটিয়ে,—এক নাগাড়ে রাত দশটা।

তার ওপর ত' রেল-রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়িগুলি দিন-রাত পায়চারি ক'রে বেড়ায়-ই। ওদের যেন জিরোবার কথা নয়।

পল্টনের মাঠের সঙ্গে ঠাঠারি-বাজারের কথা চলে। যখন রাত একটার পর ঘণ্টা দুয়েকের জন্য রেল-ইঞ্জিন হার্ট ফেল ক'রে চুপ ক'রে থাকে। কি কথা হয়? মাঠ বলে—আমি ভারি একা, একেবারে বাজে; বাজার বলে—আমিও।

নিশীথ রাতের ঐ স্তব্ধতাটুকুর অবগুণ্ঠনের তলায়ই যা ওদের দুয়েকটি কথা। তারপর সেই অকূল অপরিচয়।—মাঠ যেন সংসারনিকেতনের সব্রীড়কটাক্ষা লক্ষ্মী নববধূ, আর ও যেন বারবনিতা।

সারাদিনে আর ওদের বনাবন্তি নেই।

'লোকাল-বোর্ডে'র মেম্বাররা তো কেউ আর কবি নন, নইলে বাজারের নাম বদলে দেওয়া উচিত ছিল। যেদিন বলা-কওয়া নেই রুক্মা ডালিমফুলি ফিনফিনে কাপড় প'রে এই পাড়ায়ই একটা ক্ষুদে ঘর ভাড়া নিয়ে বসল—পান বেচতে।

অনেক রাতে ওঠে কৃষ্ণপক্ষের যে মলিন চাঁদ,—রুকমা যেন সেই আলোটুকুর মতোই স্নিগ্ধ। কিম্বা ও যেন বিকালের আলো,—পড়ন্ত বেলার রোদ। যৌবন যেন এই মাত্র এক্ষুনি ওর পুরন্ত দেহ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে,—এমনি মনে হয়, —ওর দুই চোখে চটুল যৌবনের কৌতুহল এখনও একটু টলটল করছে,—গান ফুরিয়েছে বটে, কিন্তু রেশ মিলায় নি। ওর দুই টুকটুকে ঠোঁটে যেন ফুলের পুটলি বাঁধা।

টাঠারি-বাজারের অদৃষ্টে এমন অসম্ভবও তা হ'লে ছিল। চিরকাল বাসন

পেটানোতে অভ্যস্ত সবাইয়ের কান হঠাৎ একদিন আকস্মিক পুলকে যদি খাড়া হ'য়ে ওঠে, যদি দু'মিনিটের জন্যও কারো হাতের হাতুড়ি চলে না—তবে? নৃসিংহই প্রথমে আলাপ করতে গেল যা হোক।

রুক্মা অল্প একটু হেসে বললে—এই, একটা দোকান খুললাম। তোমরা মেরামত কর, আমি না হয় ভাঙি।

নৃসিংহ বলে—কোথায় ছিলে আগে?

রুক্মা দোপাটির দেউটির মতো হাসে। বলে—সে জেনে লাভ নেই। এখন এখেনে।

নৃসিংহ বলে—দোকান চলবে না হেতা—

রুক্মা আবার হাসে, যেন না হাসলেই ওর নয়, বলে—চ'লে যাব।

পরে ফের শুধোয়—এই ত' সহরে যাবার চৌমাথা? ঘুরে ঘুরে দেখে নিতে হবে সব।

মাচার ওপর ব'সে পান সাজে, আর আপন মনে হাসে—ঐ হাসি দেখে খরিদ্দারেরা সবাই ভাবে পানউলি বুঝি সম্ভাষণ ক'রে গোপনে ওদের কিছু বলতে চায়, একটু সচকিত হ'য়ে ওঠে। খানিকদূর গিয়ে আবার চুণ চাইতে ফের ফিরে আসে। তেমনিই হাসে বটে রুক্মা, কিন্তু কেন হাসে, কেউ শুধোয় না।

যখন ভিড় থাকে না, হাসে তখনো। সে-হাসি যেন দিনান্তের দুর্বল দুঃখী হাসি। পান বেচবার এক ফাঁকে ও যেন ওর প্রাণও বেচে ফেলতে চায়। যেন বাঁচে তা হ'লে।

পাড়া-বেড়ানোর ওস্তাদ সুখেন্দু,—আর্মানিটোলা থেকে গ্যাণ্ডারিয়া পর্য্যন্ত,—মাঝে মাঝে দু'একবার লক্ষ্মীবাজারে একটা বেঢপ ফটক-ওয়ালা বাড়িতে জিরিয়ে নেয়। সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে সময়মাফিক দু'একটি কথা কয়,—আর উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে চা দিতে এসে তাপসী যদি ওরও খুব কাছে এসে ওকে এক পেয়ালা চা ক'রে দেয়, সবাইকে গান শোনাবার সময় যদি এমন হয় গানের একটি কথা খালি ওরই বোঝবার জন্য! ওর কৌতূহল অসীম, বেস্পতিবার তাপসী পেঁয়াজি শাড়ি পরেছিল, শুক্রবার নিশ্চয়ই ঘাসি পরবে, সেদিন পরেছিল মাদ্রাজি ঢঙে, আজ নিশ্চয়ই গুজরাতি। সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে কি ঢঙে কথা কইবে ঘাড় বেঁকিয়ে, ভবেশবাবুর 'টাই'র দিকে চেয়ে-চেয়ে কেমন হাসবে মৃদু-মৃদু, প্রসন্নবাবুর হাতের থেকে পদ্মের কুঁড়িটা নেবার সময় কেমন কাঁকন দুটো ঘুরিয়ে একটা জলো 'থ্যাঙ্কস'

দেবে—তাই দেখবার ওর অগাধ সাধ। এই সব ফতো বাবুদের বাঁদরামি দেখতে, আর তাপসীর কেতা-দুরস্তি। সুখেন্দুর মজা লাগে।

কিন্তু তাপসীর ওপর ওর কেন-যেন টান আছে একটা। সে টান কাছে আনবার জন্য টানে না কোনোদিন, শুধু মনের মধ্যে একটি অনির্বাণ মমতা জাগিয়ে রাখে। তাপসীকে ওর কৃত্রিম মনে হয় বটে, ঠুনকো কাঁচের দামি পেয়ালা, তাতে ফুল-কাটা,—কিন্তু ওর ঐ দুটি সহজ সরল কালো চোখ ইচ্ছা করলেই ওর চোখের দিকে এমন স্নেহে তাকাতে পারে যেমন ও কোনোদিন প্রসন্নবাবুর দিকে তাকায় নি। ওরা যদি সব চ'লে যায়, তবে নিশ্চয়ই তাপসী ওর পাশে এসে বসে একটু যা-তা বাজে গল্প করে খানিক,—রোজকার মত চা এনে দিতে নিশ্চয় আর মনেই থাকে না। মনে মনে সুখেন্দু তাপসীর মনের তাপ অনুভব করে।

কি-ই বা সুখেন্দু? আই, এ-তে দু'বার ফেল ক'রে কোনরকমে টায়ে-টুয়ে নম্বর রেখে উঠেছে বি, এ ক্লাশে;—প্রসন্নবাবুর মতো না আঁকিয়ে, না-বা অভিজাত লিখিয়ে সঞ্জয়বাবুর মতো। গোঁয়ারের মতো আর্মানিটোলা ক্লাবে ফুটবল খেলে,—রাইট্-আউট্,—পারে খালি বোঁ-বোঁ ক'রে বল নিয়ে ছুটতে আর সেণ্টার করতে,—স্কোর করতে শেখেনি। ইস্কুল থেকে বদ অভ্যাস নস্যি নেওয়া,—বৌদি দুটোকে ব'লে ব'লে হায়রান হয়েও জামা-কাপড়ের ফুটোগুলো আজো পর্য্যন্ত বোজাতে পারেনি,—একদিন ত' ছিটের একটা কোটের ওপর শাদা চাদর জড়িয়েই এসেছিল অজবুকের মতো। জামার হাতায় মুখ ঢেকে প্রসন্নবাবু হেসেছিলেন, আর সঞ্জয়বাবু হেসেছিলেন রুমাল মুখে পুরে। শুধু তাপসীই সেদিন ঠাট্টা করেনি, চামচ নিয়ে এগিয়ে এসে বলেছিল—আর একটু চিনি দেব সুখেন্দু বাবু?

সুখেন্দু বলেছিল—দিন।

বোকার মত ও আবার চায়ে চিনি বেশি খায়। ওদের মতো শব্দ না ক'রেও খেতে পারে না।

আসর জমা'র পর এক কোণে এসে বসে, আসর ভাঙবার আগেই জুতোর মচ্‌মচ্ শব্দ ক'রে চলে যায়। সঞ্জয় বলেন—ইডিয়ট্; প্রসন্ন বলেন—স্নব।

ও তবু চ'লে যায়। তাপসীর গানের একটা পদ ছিল—যাবার তরেই তার আসা গো, ভেসে যাওয়াই ভালবাসা। অবশ্য তার জন্যই নয়।

ক্লাশের ঘণ্টা বেজে গেছল অনেকক্ষণ, কিন্তু মাষ্টার একটা কবিতা পড়াতে

পড়াতে এমন মেতে উঠেছিল যে, হুঁসই ছিল না তার—সুখেন্দু ওর জুতোটা মেঝের ওপর ঘষল বার চারেক, বইগুলি বেঞ্চির ওপর ফেলতে লাগল শব্দ ক'রে ক'রে।

মাষ্টার তাই চ'টে একচোট বকুনি দিয়ে উঠলেন,—শেলির প্রতি যার শ্রদ্ধা নেই এতটুকুও, সে যেন কাল থেকে আমার ক্লাশে আসে না।

ভালো ছেলেরা সব সায় দিল ও বিরক্তিভরে ওর দিকে তাকাল রূঢ় চোখে।

—আজ থেকেই স্যার্। সালাম্ শেলিকে—

ব'লেই সুখেন্দু একেবারে লক্ষ্মীবাজারের মুখে পাড়ি দিল।

মোট কথা ভোর বেলা থেকেই সুখেন্দুর মন মৌমাছির মতো গুন্‌গুন্ ক'রে ঘুরছে। হঠাৎ,—অতি হঠাৎ, মনে প'ড়ে গেল দুপুর বেলা তাপসীর বাড়ি গেলে কি হয়? কেন?—বেশ হয়। কি আর হবে? হয়ত শুনব, ঘুমুচ্ছে, দেখা করবে না,—কিম্বা যদি দেখা ক'রেই বলে—কি চাই? তা হলে? সোজা বলব—আলাপ করতে চাই। ভারি বেখাপ্পা শোনাবে। শোনাক। সত্যি, ওর সঙ্গে আলাপ করতেই ত' চাই,—কিই বা আলাপ? এই কলেজের কথা, বৌদিদিদের ঝগড়ার কথা। আমাদের মাঠটার কথা,—এই লক্ষ্মীবাজার টিম্‌কেই হাফ-টাইমে পাঁচ গোল দিয়েছিলাম—সে কথা। ভারি হবে, না হয় বড় জোর বলবে—আর এসো না এ বাড়ি। তাই বলুক।

ধোপা ত' আজই কাপড় দিয়ে গেছে,—পরে আসতে পর্য্যন্ত মনে ছিল না। কি হবে ধোপ-দুরস্ত হ'য়ে? আমি শুধু দূরে ব'সে ওর সঙ্গে দুটি কথা কইব, প্রসন্নবাবুর আর্ট বা স্কার্ট সম্বন্ধে নয়,—এমনি, যা বলে সবাই, যা সচরাচর তাপসী শোনে না।

কড়া নেড়ে-নেড়ে ডাকল—মোহিত! মোহিত!

তাপসীই উঠে এসে দরজা খুলে দিলে যা হোক। বললে—মেজদা ত' কলেজে।

—ও! আমি তোমার কাছেই এসেছি।

—আমার কাছে? এস তা হলে। একেবারে ওপরে চল, একটা ভারি সুন্দর টেবল-ক্লথ তৈরি করছি।

সুখেন্দু বেমালুম ওপরে উঠে গেল। যেন ওর সমস্ত কোণ-ঘুজি পর্য্যন্ত জানা আছে। দোতলায় যে ঘরে তাপসী থাকে, সে ঘরটা যেন ওর কতকালের চেনা। একেবারে একটা ইজি-চেয়ারে কাৎ হয়ে বললে,—এক গ্লাশ জল দিতে পার?

তাপসী ওর শাড়ির আঁচলটা লুফতে লুফতে বেরিয়ে গেল। কাঁচের গ্লাশে ক'রে সরবৎ তৈরি ক'রে আনলে। বললে—একটু জিরিয়ে নাও, পরে খেয়ো।

সুখেন্দু বললে—কি দারুণ রোদ, মাথার রগ দুটো ছিঁড়ে পড়ছে।

তাপসী বললে—দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিচ্ছি। সেলাই ফেলে ঘুমুচ্ছিলাম কি না, তাই সব ভেজানো ছিল। ছাই, এক ফোঁটা বাতাস নেই। দাঁড়াও, হাওয়া ক'রে দিচ্ছি—

সুখেন্দু বারণ করল না বা করতে পারল না। চোখ বুজে রইল, পাখা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি তনু হাতের কঙ্কণ কিনিকিনি শুনতে লাগল, যে দুটি হাত ও ছোঁয়নি, যে দুটি হাত ও জীবনে কোনদিন ছোঁবে না, যে দুটি হাত—

—এই বারে খাও সরবৎটা। বরফও গ'লে গেছে!

এক চুমুকে গিলে ফেলে সুখেন্দু বললে—তোমার টেবলক্লথ দেখালে না?

তাপসীর হাতে দিতে গিয়ে যাতে পাছে তাপসীর আঙুলগুলি না ছোঁয়া যায় তাই তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে গিয়েই গ্লাশটা প'ড়ে টুকরো হয়ে গেল। তাপসী একটু হেসে টুকরোগুলি নিজের হাতের রাঙা তালুটি ভ'রে তুলতে লাগল। পরে বাঁ হাতটি ছুঁড়ে টুকরোগুলি জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। সেই দক্ষিণের জানালা দিয়েই। ওর চুলের খোঁপায় একটা ম্লান রজনীগন্ধার কুঁড়ি গোঁজা,—কে যেন দিয়েছে। শুকনো ফ্যাকাসে প্রায় মরা একটা ফুল।

তাপসী বললে—এই চশমাটা পরলে আমাকে কেমন মানায় বল ত? ফ্রেমের এই রংটা আমাকে সুট করে না, না? বল না, কেমন দেখতে হয়েছি।

—বেশ। চশমা না পরলেই বোধ হয় বেশি ভালো। জানি না।

তাপসী হঠাৎ বললে—আমি তাসের একটা নূতন ম্যাজিক শিখেছি, দেখবে? ধর দিকিন।

দুটি হাত নেড়ে নেড়ে তাস ভাঁজে, শাড়ির আঁচলের তলায় সেমিজের মধ্যে হাত সাফাই ক'রে তাস লুকিয়ে ফেলে, সুখেন্দু বেশ টের পায়,—হাঁদার মতো বললে—বাঃ, গ্র্যাণ্ড ত'! কি ক'রে শিখলে? আমাকে শেখাবে?

তাপসী দু'য়েক বার ঘাড় দোলায়, গুছি গুছি চুলগুলি দোলে সঙ্গে সঙ্গে,—পরে বললে—এ ত' নেহাৎ সোজা। এই দেখ, কেমন,—ব্যস,—হয়ে গেল।

তারপর দু'জনে পেটাপেটি খেলে।

সুখেন্দু ফতুর হয়ে গিয়ে হাসে।

তাপসী বললে—মেজদাটা এখনো আসছে না ত'? তুমি ঘুমুবে? বেশ ত' ঘুমোওনা, বিছানা পেতে দেব? এক ফাঁকে এক পেয়ালা চা ক'রে নি,—কেমন? কেন যে ঐ গুঁড়োগুলো নাকের মধ্যে ঢোকাও?—আচ্ছা আমাকে দাও ত' একটু। হ্যাঁচ্চো,—বাবাঃ।

সমস্ত মুখ রাঙা, দুই চোখ ছলছল,—যে কারণেই হোক ; সুখেন্দু দেখে বিভোর হয়।

তাপসী বললে—তোমার ক্লাশ এত সকালে রোজই শেষ হয় না কি ? রোজই ত' তা হলে আসতে পার। কি ক'রেই বা আসবে ? যে রোদ! তোমার বাড়ির সব কেমন আছে ?

সুখেন্দু বললে—এক ভাইপোর নিদারুণ অসুখ, বাঁচে কি না ঠিক নেই। সব পুনকে টুনি-পাখীর বাচ্চা। সমস্তটা বাড়ি কিচিরমিচিরে অস্থির। তার ওপর দুই বৌদির ঝগড়া,—সে এক দেখবার জিনিস। তুমি শুনবে ? হেসে গড়িয়ে পড়বে একেবারে। পুঁই-চচ্চড়িতে কতটুকু নূন দিতে হবে,—তা নিয়ে যত আখুটি, কে বড় রাঁধুনে, কার বাপের বাড়িতে কয় ঝাঁক পুঁই গজায় তা নিয়ে কোঁদল। মেজদা'র লিভারের ব্যথার জন্য দিন পনেরো আপিস-কামাই করার দরুন চাকরিটি খোয়া গেছে,—সব চমৎকার আছে কিন্তু! হ্যাঁ, আরেকটা কথা বলা হয় নি,—আমার এক জামাইবাবু কাশীতে কলেরায় মারা গেছেন মাস খানেক হোল। বোনকে সব কি ব'লে বোঝায় জান ?—বলে, তোর স্বামীকে বিশ্বেশ্বরই হাতে তুলে নিয়েছেন মা, এবার থেকে বিশ্বেশ্বরই তোর,—আর বলে না কিছু, বোধ হয় বলতে চায়—প্রাণেশ্বর।

ব'লে সুখেন্দু হাসে ও পরিপূর্ণ চোখে তাপসীর পরিপূর্ণ দেহের দিকে তাকায়।

তাপসী হঠাৎ বললে—একটা মজার জিনিস দেখবে ? খুব ইন্টারেষ্টিং। কাল আমার রাঙাদি এসেছেন।—ব'লে কোমর ঘুরিয়ে ছুটে গেল।

তক্ষুনি কোলে ক'রে একটি সদ্য-ঘুম-ভাঙা শিশু এনে বললে—দিদির ফার্ষ্ট বয়, —শো'তে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছে,—কি রকম তাগড়া জোয়ান দেখেছ ? এটার নাম হাবলুহাতি,—নেবে কোলে ?

ব'লে সেই পরিপুষ্ট শিশুটিকে বুকে ফেলে শব্দ ক'রে ক'রে ওর মুখ চুমোয় আচ্ছন্ন ক'রে একেবারে তাতিয়ে ফেললে। সুখেন্দু তাই দেখে।

শিশুকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে এসে বললে—এবার তোমাকে চা তৈরি ক'রে দিই, কি খাবে ? চা, কোকো, না ওভেলটিন ? এখেনেই সব নিয়ে আসছি। দেখবে একটা নতুন রকম কনসার্ট ? পিরিচে চামচ বাজিয়ে গান গাইব,—গুন গুন ক'রে অবশ্যি।

মেঝের ওপর পা গুটিয়ে ব'সে ঘাড়ের থেকে আঁচলটা পিঠের ধার দিয়ে নামিয়ে তাপসী ষ্টোভ ধরায়, আর গুনগুনায়।

একটা অকারণ, অর্থহীন দিন। নিস্তব্ধ গুমোটের পর দুঃখ-ভুলানো খামখেয়ালি দখিনার মতো। 'ভেসে যাওয়াই তার ভালবাসা।' একটা রঙচঙে ফুরফুরে প্রজাপতি যেন,—পথ ভুলে এসে ছুটি পলকা পাখা নাচিয়ে গেল।

মনে ক'রে রাখবার মতো দিন,—হিসাবের খাতায় এমন দিন একটিও আসে না কোনকালে,—সুখেন্দুর সমস্ত দেহ যেন স্নান ক'রে শীতল হয়ে গেছে। পারিপার্শ্বিক সমস্ত জীবনের সঙ্গে এই দুপুরের ছুটি অলস প্রহর কি বেখাপ্পা,—ভিড়ের মধ্যে যার মুখ চেনা যায় না, নিরালায় তাকে বন্ধু ব'লে ডাকা!—এমন কথা কে কবে ভেবেছে?

সুখেন্দু ভাবলে,—আর ও-বাড়ি যাবে না, আর ত' ওকে তাপসী 'তুমি' ব'লে ডাকবে না কোনোদিন, যদি আর কোনোদিন না বলে—'রোজ রোজই তা হ'লে এসো।'

বাড়ির দৈনিক নোংরা ছবি আর আজ ওকে পীড়িত করলে না। উদরাময়ে যে যে শিশুগুলি ভুগছে, তাদের একটুখানি আদর করলে। উঠানে দুই বৌদি বাসন মাজতে ব'সে তেমনি ঝগড়া করছে ও যে-বল বাইরে প্রয়োগ করতে পারছে না সেটা হাতের বাসনগুলির ওপরই পর্য্যবসিত হচ্ছে।

সুখেন্দুর ইচ্ছা হ'ল একবার চেঁচিয়ে ওঠে—তোমরা উলু দাও শিগগির।

শুধু বললে—আজ রাতে সুন্দর চাঁদ উঠবে, মাঠে বেড়াতে যাবে মেজবৌদি? যাবে বেড়াতে বড়বৌদি? খোকা ত' ভালই আছে একটু আজ।

বৌদি দু'জন তাড়াতাড়ি বাসন-পত্র ধুয়ে ট্রাঙ্ক খুলে শাড়ি বাছতে বসল। বড় বলে—চাঁদের আলোয় এটা মানাবে এই শাদা ধবধবেটা। মেজ বলে—ছাই! মানাবে এই মেঘ-রঙিটা।

সুখেন্দু এসে বললে—ওটুকু বেড়ানোয় কিচ্ছু হবে না আমার। আমি 'বাস'-এ এক্ষুণি নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছি।

ঠাঠারি-বাজার হয়ে নবাবপুরে না পড়লেই যেন নয়। পানউলির সঙ্গে দেখা,—সুখেন্দু ভাবলে—পান কেনা যাক্, আর যদি নস্যি পাওয়া যায়। পয়সা চারেকের একসঙ্গে।

রুকুমা হঠাৎ অতি যত্ন ক'রে টাটকা পান সেজে দিলে। যেন তাতে ওর অন্তরমধুও মেশানো ছিল। সুখেন্দু হঠাৎ বললে—কবে এখানে এসেছ?

যার সঙ্গে আজ ওর দেখা, তারই সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব।

রুক্মা বললে—দিন চারেক। একটা ভালো জায়গায় ঘর দিতে পারেন? এখানে তেমন বিকোয় না।

সুখেন্দু বললে—জর্দা আছে? দাও। দেখব নবাবপুরে পুলের ধারে ঘর পাওয়া যায় কি না। কেন, এখেনেই ত' বেশ নিরালা। দাঁড়াও না, একবার সহরে ঢাক পিটিয়ে দিচ্ছি, সব সুড়সুড় ক'রে পান কিনতে আসবে। কি নাম তোমার?

যেমন ক'রে তাপসী বসেছিল চা ক'রে দেবার সময়—যেমন তাপসীর দুটি হাতের চারু-কুশলতা!

রুক্মা বললে—নাম-টাম নেই।

সুখেন্দু চ'লে যাচ্ছিল, রুক্মা পেছন থেকে ডাকলে—চূণ লাগবে না? চূণ নিন একটু।

—হ্যাঁ, মুখ পুড়িয়ে ফেলি আর কি।

আবার যাচ্ছিল, রুক্মা আবার ডাকলে—একানির পয়সা নিয়ে যান।

—কেন, চার পয়সারই ত' কিনলাম। ও, এক পয়সা বাকি? ও নিয়ে কি হবে? এখান দিয়ে একটা ভিখিরি হেঁটে গেলে দিয়ে দিয়ো। নইলে অমনি ছুঁড়ে দিয়ো, যে পায়।

কোর্টের কাছ থেকে সুখেন্দু 'বাস' নিলে।

উঁচু নীচু এবড়ো পথ,—মোটর লক্ষ্যহীনের মতো ছুটেছে। পাশ দিয়ে বুড়িগঙ্গা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে চলেছে,—এ পারে নিষ্পাদপ বিস্তীর্ণ মাঠ, বুকের ওপর দিয়ে কালো কঠিন রেল-লাইন। চাষাড়া ষ্টেশনে নেমে সুখেন্দু চেনা ষ্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে খানিক বাজে গল্প করলে,—এবারে কি রকম পাট হোল, নতুন লাল রাস্তাটার ধারে জমির কাঠা কত ক'রে, ষ্টেশন-মাষ্টারের ছোট ছেলে রেলে কাটা পড়া সত্ত্বেও উনি চাকরি ছাড়লেন না কেন?

শেষ ট্রেনে ফিরে এল সটান বাড়িতে নয়,—পল্টনের মাঠে, অশ্বত্থ গাছের তলায়।

মেজবৌদি তখনো ঘুমুতে যায় নি, তারই সঙ্গে সুখেন্দু একটু কোমল ক'রে কথা কইল: মাঠে বেড়াতে যাবে? আমাদের বাড়ির এত কাছে এত বড় মাঠ, এমন উধাও-ধাওয়া হাওয়া, কি ভাবনা আমাদের। আর শাড়ি বদলাতে হবে না, এমনিই তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। আজকের ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো মেঘে মুছে গেছে,—তা যাক্। এই অন্ধকারই কি কম সুন্দর? বাইরে বেরিয়ে একবার দেখ এসে, মেজবৌদি।

মেজবৌদি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাইরে বেরিয়ে এল। এত বড় মাঠ ও এই অবারিত অন্ধকার দেখে বৌদির হৃদয়ও যেন অতি সহসা বড় হয়ে গেছে।

বললে—বড়দিকে ডেকে আনো না ঠাকুর-পো, কি চমৎকার আকাশ আজ। নিশ্চয়ই জল হবে। জলে আজ ভিজবে ঠাকুর-পো?

মোচার খোল্ দিয়ে দুজনে নৌকো তৈরি করে, মেজবৌদি তাতে মাটির একটি মৃদু বাতি বসিয়ে দেয়, গায়ে কাঠি পুঁতে সুখেন্দু পাল খাটায়,—তারপর ভাসিয়ে দেয় পুকুরে। হাত দিয়ে জল নেড়ে নেড়ে দুজনে ঢেউ তোলে।

কতদূর ভেসে গিয়ে নৌকো তলিয়ে গেল কাৎ হয়ে। তাই দেখে মেজবৌদি হাত-তালি দিয়ে উঠল,—খুকির মতোই আহ্লাদে আটখানা।

মেজবৌদি এখন ঠিক তাপসীর মতো সুন্দর।

সুখেন্দুর মন যেন বেতারে মেজবৌদিরো মন ছুঁয়েছে। মেজবৌদি বলে—আজকে মাঠে ঘুমোবার রাত কিন্তু!

সুখেন্দু বলে—তুমি ঘুমোও। আমি একটু ঠাঠারি-বাজারে ঘুরে আসছি।

মানে, এই রাতে রুক্মাকে ও একটু দেখে আসবে।

আঙুল ফু'লে কলা গাছের মতো,—ব্যাঙের গলা ফু'লে হাতি।

ছিল একটা ফাড়ি, বেচত পান,—হোলই বা না কেন কম্‌লিফুলি পাৎলা শাড়ি প'রে,—তা, দু'মাসেই কি দোকান এমনি ফেঁপে উঠবে? তাও এই পটিটায়,—যেখানে লোহা পিটিয়ে, গা-গতর দিয়ে দিন রাত খেটে খেটেলরা মুঠো ভ'রে পয়সা পায় না, সেখানে? গদিয়ান হয়ে যেই বসা, তখন থেকেই ওর চারধারে গাঁদি লগে গেছে। আদেখলে অপ্পেয়ে যত সব।—কেনই বা জাঁকবে না দোকান?

পানের দোকান,—এখন মণিহারি।

রাত্রে রুক্মা যখন নিথাটু,—দোর দেবে,—নৃসিংহ গল্প করতে আসে।

রুক্মা দরজা বন্ধ করতে করতে বলে—তোমার বৌকে ত' আমার সেই শাড়িটা দিয়ে দিয়েছি যেটা পরাতে আমাকে নাকি খুব মানিয়েছিল—

নৃসিংহ বলে—ও তো একটা বুড়ি, ঝগড়াটে, ছিঁচকে,—

—কিন্তু এছাক মিঞাকে জিজ্ঞেস কর দিকিন? সিঁদ না কাটলে হয়।

পরে বলে—আমারো পাঁচ সোয়ামী ছিল, কারুরই ভালো লাগত না আমাকে। আমারো না।

দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। নৃসিংহ ঘরে গিয়ে বৌকে পিটায়,—বৌ মারমুখো চণ্ডী হয়ে গেছে আজকাল।

নৃসিংহ ঠাঠারি-বাজার ছেড়ে দিয়ে রেকাবি বাজারে গিয়ে উঠেছে। সেখানে জাঁতা ঘোরায়।

ভাই-পো মারা গেছে কাল রাত্রে,—একটা ছ্যাকড়া গাড়ি ভাড়া ক'রে সুখেন্দু সারা সকালটা টো টো করছিল,—মনে মরচে প'ড়ে গেছে।

রুক্মা হঠাৎ গাড়ির পা-দানির কাছে এসে বলে—কোথায় যাচ্ছেন বাবু? অনেকদিন এ দিকে আসেন নি। কি হয়েছে আপনার?

গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে ফেলে। সুখেন্দু অবাক হয়ে বলে—দোকান বেড়ে বাড়িয়ে ফেলেছ ত'? শুধু পান বেচেই, না আরো কিছু?

রুক্মা সোনার অধর ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে বলে—দাঁড়ান, দরজাটায় তালা দিয়ে আসছি,—আমাকে একটু গাড়ি চড়ান। বলছি সব।

কে একজন দোকানের দরজা থেকে রুক্মাকে হাঁকলে, কি কিনবে—সুখেন্দু চেয়ে দেখে—প্রসন্নবাবু। রুকমা আস্তে বললে—যদি এক টাকার কিছু কেনে ত' এক ঘণ্টা গল্প ক'রে যাবে। এক দিন এমনি গাড়ি নিয়ে এসে আমার দরজায় থেমেছিল। আমি আজকের মতো সেধে চড়তে চাইনি কিন্তু। দাঁড়ান—

তাড়াতাড়ি ফিরে এসে দেখে গাড়ি নেই।

বিগতযৌবনা রুক্মা,—মা রুক্মা,—পঞ্চস্বামীর উপহৃত পাঁচ-পাঁচটি সন্তান পর পর মারা গেছে—তথাকথিত অসতী রুকমা,—হঠাৎ আজ বিমনা হয়ে গেল। দেহের দোকানপাটের বাইরে চ'লে এসে নিজের দেহকে আজ ও খুব সুন্দর ক'রে দেখছিল বুঝি। নিজের তেতো মন দিয়ে দেহকে হঠাৎ মিঠা ব'লে আস্বাদ করল। রুক্মা চুপ ক'রে বসে থাকে আর চোখ নীচু ক'রে নিজের পায়ের আঙুল দেখে।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা দিয়েছে,—একটা কামরা থেকে তাপসী হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—আসুন সুখেন্দুবাবু। যাবেন নারায়ণগঞ্জ? চ'লে আসুন শিগগির।

সুখেন্দু ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে চলন্ত গাড়িতে উঠে পড়ল।

তাপসী বল্লে—আমি নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছি,—একা। মেজদাকে কত বল্লাম

আসতে, এল না। কেন যাচ্ছি? আমার এক বন্ধু কল্‌কাতা থেকে আজ এসে পৌঁছুবেন, তাকে এস্করট্‌ করতে। ভুল বলছি,—বার্লিন থেকে আসছেন। আপনি প্লাটফর্মে ঘুরছিলেন যে?

—এম্‌নি। কাজ নেই কিছু। 'ষ্টলে' একটা ভাল বই দেখে এলাম, পয়সা নেই।

তাপসী ওর চুলের খোঁপাটা ফের বাঁধতে বাঁধতে বল্লে—কেমন আছেন? অনেকদিন আর আপনাকে দেখিনি। আমাদের ওখানে ত' আর যান্‌ও না।

এ ত' আর সেই গুঞ্জনকান্ত স্তব্ধতাপরিপূর্ণ রৌদ্রালোকিত দুপুর নয়,—এ সদ্যজাগ্রত ব্যস্ত মুখর প্রভাত,—সেই সান্ত্বনাসিঞ্চিত নীড় নয়, একটা কুৎসিত রেল্‌-ষ্টেশন। তা ছাড়া,—ওকে তাপসী আর কেন 'তুমি' ব'লে ডাকবে?

সুখেন্দু বল্লে—ভালো না। বি, এ-তে ফেল্‌ মেরেছি। মেজদা টাইফয়েডে ভুগছেন। একটা কাজ কোথাও জুটছে না।

তাপসী ওর শাড়ির আঁচলটা নতুন ক'রে ফের্‌তা দিয়ে প'রে বল্লে—কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ কি সুন্দর রোদ্‌ সুখেন্দু বাবু, না? এই এবড়ো মাঠগুলি একদিন বেরিয়ে এলে কেমন হয়? একটি একটি দিন ক'রে চার বছর,—তিনশ পঁয়ষট্টিকে চার দিয়ে গুণ করলে কত হয়?—ততগুলি দিন ব'সে ব'সে গুনেছি। আজকে আমার বিগ ডে। বলে, আর সমস্ত দেহ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সুখেন্দু হঠাৎ বল্লে—যদি ষ্টিমার ডুবে যায়? কোন কারণে আজ যদি না আসেন?

তাপসী ঘাড় নেড়ে বল্লে—তা ককখনো হ'তে পারে না। আজকের এই রোদ দেখে কি আপনার তাই মনে হয়? আমার সমস্ত মন এমন কি আমার এই ক'ড়ে আঙুলটা পর্য্যন্ত বলছে তিনি আসবেন। আপনার কি তাই মনে হচ্ছে না? বলুন না।

আসবেন বৈ কি।

প্যাণ্ট-কোট-পরা হ'লেও সুখেন্দুর চিনতে দেরি হ'ল না—এ যে সেই মানকে! —কলেজে ঢুকেই যে মা'র বাক্স ভেঙে জাহাজের খালাসী হয়ে পালিয়েছিল। অদ্ভুত! ছিল একটা চাম্‌চিকে—হ'ল কি না প্রজাপতি! ক্লাশে ত' সবাই ওকে খেপাত—উট কোথাকার।

তাপসী আর ওর বন্ধু দু'জনে পরস্পরের দিকে পলকহীন চোখে যেন এক যুগ চেয়ে থাকে, আনন্দে তাপসীর দুই চক্ষু ছলছল টলটল ক'রে ওঠে,—সেদিনকার

বাজে চোখের জলের সঙ্গে কি সুদূর তফাৎ—মাণিক তাপসীর শিথিল দুর্বল একখানি হাত জোরে চেপে ধরে, কিছু বল্‌তে পারে না,—জনতার এক কোণে নিশ্বাসে দুজনের বুক দোলে, সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়, অণুরণিত।

তারপর মাল-পত্র গাড়ি ঠিক-করা, বাড়ির সব কেমন আছে, সহরে দাঙ্গা এখনো আছে কি না—এই নিয়ে মামুলি দুয়েকটি কথা। হাত ধরাধরি ক'রেও হাঁটে না।

মানিক শুধোয়—কি কর আজকাল ?

সুখেন্দু ওর কান্তিমান্ প্রফুল্ল দেহের দিকে চেয়ে বলে—ঘাস কাটি।

মাণিক বলে—সে ত' খুব ভালো বিজিনেস।

সুখেন্দু ওদের গাড়িতেই উঠতে চাইছিল না, মাণিক হাত ধ'রে টেনে তুল্লে। তাপসী হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে,—কিন্তু মাণিক ওর বুকে কান পেতে শুন্‌তে পারে !

তাপসী ওর খোঁপার থেকে একটি বিবর্ণ শুকনো রজনীগন্ধার কুঁড়ি বের ক'রে বলে—চেন একে ?

মাণিক ওপর পকেট থেকে একটি ছোট্ট রুমাল বের ক'রে বলে—আমার মণিবন্ধে আবার তেমনি বেঁধে দাও।

তাপসী বলে—হলদে সুতো দিয়ে ?

সুখেন্দুর সামনেই ওরা রহস্যালাপ করে। মুখোমুখি দু' জনে বসেছে পায়ে পা ঠেকিয়ে। দু'জনের দেহ যেন মদের পেয়ালার মতো টল্‌টল্ করছে।

তাপসী ও মানিকের বিয়েতে সুখেন্দু খেটে দিলে,—প্রাণপণ। এম্‌নি। বন্ধু হিসেবে ওকে দু' জনেই নেমন্তন্ন করেছে,—সেই ওর আনন্দ ও অহঙ্কার। প্রসন্ন-বাবুর পাতে ও একেবারে গোটা বারো রসগোল্লা ঢেলে দিলে। বল্লে—খান্ আর লুফুন।

হঠাৎ কতক্ষণ বাদে ওর মনে হ'ল—বোকার মতো খেটে মরছি কেন ?—আমার কি ? আমার ত' আর পৌষমাস নয়,—জ্যৈষ্ঠই।

দইয়ের ভাঁড়টা ফেলে রেখে সুখেন্দু হঠাৎ বেরিয়ে গেল। ওর সেই মাঠে, সেই পুকুরের ধারে,—সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় !

বাসর-ঘরে তাপসী মাণিককে বল্লে—সুখেন্দুবাবু কেন হঠাৎ চ'লে গেলেন বলতে পার ? নিশ্চয়ই ওঁর মন ভালো নেই। এত খেটে একগ্লাশ জল পর্য্যন্ত

চুমুক দিলেন না। ওঁর ভারি অর্থকষ্ট হচ্ছে—তুমি ওঁকে কিছু টাকা দিয়ো,—এম্‌নি—বলো বিজিনেস করতে।

পরদিন মাণিক সুখেন্দুর সন্ধান পেলে না,—যে দিন পেলে বল্লে—তোমাকে এই টাকাগুলি তাপসী দিয়েছে বিজিনেস্‌ করতে।

সুখেন্দু অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে—বিদ্যেবুদ্ধি নেই, কি বিজিনেস্‌ করব?

মাণিক বলে—দেখ না চেষ্টা ক'রে। না চললেও বরং কিছু অভিজ্ঞতা ত' মিলবে। তাপসীর সমস্ত হৃদ্যতা তুমি গ্রহণ কর,—ও ব'লে দিয়েছে।

সুখেন্দু টাকা নেয়। এই টাকা না নিলে বিজিনেস্‌ আর সে করবে কী করে?

ঠাঠারি-বাজারেই দোকান দেয় একটা, মণিহারি;—রুক্মার দোকানের পাশে।

রুক্মার সমস্ত দেহ ফুলের মতো যেন প্রস্ফুটিত হতে থাকে—ওর দেহ যেন বর্ষাকালের সবুজ মাঠ,—আবার সজীব হয়ে উঠেছে।

যে-জিনিস রুক্মা বেচে পাঁচসিকেয়, সেই জিনিসই পাশের দোকানে ব'সে সুখেন্দু বেচে—একটাকা তিন আনায়। প্রতি জিনিসের দর কমিয়ে কমিয়ে এমনি প্রতিযোগিতা করে। অবশেষে রুক্মা হাল ছেড়ে দেয়।

প্রসন্নবাবু এসে বলেন—আমি দিচ্ছি টাকা, ফের দোকান জাঁকিয়ে ফেল। দেখি ও কেমন ক'রে তোমাকে নাস্তানাবুদ করে?

রুক্মা বলে—দোকানে আমার মন নেই বাবু। অনেক দোকান দিয়েছিলাম—

কথা ভারি করুণ, যেমন করুণ ওর আজকের এই ফিকা নীল রঙের ফিন্‌ফিনে শাড়িটা। রুক্মা ঝাঁপ বন্ধ ক'রে দেয়।

আসন্নসন্ধ্যার ভীতু অন্ধকারের মতো রুক্মা সুখেন্দুর দোকানে এসে বলে—আমার ঘরে না-বেচা অনেক জিনিস আছে,—আপনি নিন। দোকান উঠিয়ে দিলাম।

সুখেন্দু খুসি হয়ে বলে—কত নেবে?

রুক্মা হেসে বলে—পয়সা দেবেন নাকি? নাই বা দিলেন। মাগনা আরো কতও ত' দিতে পারি—

হিসেবের খাতা নিয়ে ব্যস্ত সুখেন্দু বলে—দিয়ে যেয়ো, দাম একটা ধ'রে দেব।

খানিক পরে বলে—দাঁড়িয়ে আছ যে।

রুক্মা বলে—আরো কিছু দেবার ছিল যে—

—কি ?—সুখেন্দু বিরক্ত হয়ে ওঠে।

রুক্মা বলে—আমাকে আপনার দোকানে রাখুন না—

—মেয়ে মানুষ রাখলে খদ্দের আসবে বটে, কিন্তু সুনাম যাবে। তুমি যাও।

রুক্মা এক এক ক'রে সব জিনিসগুলি দিয়ে যায়।

সুখেন্দু হঠাৎ বলে—তোমার হাতে ওগুলি কিসের দাগ ? ক'টা ?

—পাঁচটা। পাঁচ স্বামীর। আরেকটা দিতে হবে।

সুখেন্দু তেমনি হঠাৎ ব'লে বসে—তুমি থেকে যাও রুক্মা, আমারই দোকানে—

রুক্মা বলে—না। আমি রেকাবী-বাজারে যাচ্ছি—

মানে, নৃসিংহের সন্ধানে।

নৃসিংহ তখন মাঝি,—দেখা মেলে না। রুক্মা ফিরে আসে। বলে—এই দেখ হাত, ছ'টা দাগ। পরে বলে—ধ'রে দেখ না।

সুখেন্দু বলে—তুমি যাও এখান থেকে।

যেমন হয়,—আপনা আপনিই দোকান উঠে গেল সুখেন্দুর।

তা উঠুক, একদিন পল্টনের মাঠের শেষ কিনারার বাড়িতে সানাই বাজল। বড় বৌদি নিতকাম করে,—আরো দু'চার জন এয়ো এসেছে বটে, তাপসীও,—আর বিধবা মেজবৌদি উপোস ক'রে থাকে।

তাপসী বলে—আপনার বৌকে এই মণিমালা দিলাম, আপনাকে কিন্তু কিছুই না।

সুখেন্দু পাশের পুঁটলিটি দেখিয়ে বলে—আমাকে ত' এইই দিলেন। এর মধ্যেই আপনাকেও—

তাপসী লজ্জায় রাঙা হয় একটু।

আর রুক্মা মধ্যরাত্রে পল্টনের মাঠে নিশি পাওয়ার মত ঘুরে বেড়ায়। পরে বুড়িগঙ্গার পাড়ে গিয়ে বসে। একটা মাঝিকে ডাকে। বলে—নারাণগঞ্জ নিয়ে যেতে পারবে ?

—কেন পারব না ?

নৃসিংহ ওকে নিশ্চয়ই নারায়ণগঞ্জ নিয়ে যায় না।

মুখোমুখি

উপন্যাস

মুখোমুখি

এক

গৌরী আজ আসবে।

বাজার করতে গিয়ে খবরটা অতুলের কানে উঠেছে। কোনো ভুল নেই। গৌরী আসবে।

দোকানির সঙ্গে একটা ভেট্‌কি মাছের দর নিয়ে সে এতক্ষণ চুলচেরা তর্ক করছিলো। দোকানি কিছুতেই দুটো পয়সা ছাড়বে না। কিন্তু, অতুলও নাছোড়বান্দা। ঐ এক চিল্‌তে মাছের দাম চার আনা হলেই ঢের।

এমনি সময় ভবনাথবাবু অতুলের কাঁধের ওপর হাত রেখে প্রসন্ন মুখে বললেন,—খবর শুনেছ অতুল ?

অতুল ঘাড় ফিরিয়ে বললে,—কী ?

—গৌরী আজ আসবে।

—তাই বুঝি ?

—সেই রাত একটায় ট্রেন। তারপর ধরো গরুর গাড়ি। কতোখানি রাস্তা বলো দিকিন ?

—অনেক রাস্তা। সব বন্দোবস্ত করতে হয় এখুনি—

খবরটা অতুলকে এক ঝলক বসন্ত-বাতাসের মতো আচ্ছন্ন করে ধরলো। মনে হল এ বুঝি মাছের বাজার নয়, সবুজের অঢেল মাঠ। স্তব্ধ হয়ে সে ভবনাথবাবুর মুখের দিকে তাকাল। বয়সের পাণ্ডুরতার ওপর যেন নবযৌবনের অরুণাভা ফুটেছে। কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে মুখখানা এখন শিশুর মতো সুকুমার, কুঞ্চিতপক্ষ্ম বিবর্ণ চোখ দু'টি খুশিতে ঘাসের ডগার মতো চিক্‌চিক্ করছে। পরনে খাটো ধুতি, পায়ে শুঁড় তোলা বাদামি চটি, সার্টের বোতামগুলি ছিঁড়ে গেছে বলে সুতো দিয়ে বাঁধা। হাতে একটা তালি দেওয়া ছাতা, সব জায়গায় রঙের আনুকূল্য নেই। জীর্ণ, ক্লিষ্ট, অবনমিত বার্ধক্য কিন্তু যেন এক নিমেষে আনন্দে ও অহঙ্কারে দৃপ্ত, তেজস্বী হয়ে উঠেছে।

ঢোঁক গিলে কথাটাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করে অতুল বললে—আজ, আজই আসবে নাকি ?

ব্যস্ত হয়ে পকেট হাতড়াতে-হাতড়াতে ভবনাথবাবু বললেন—এই ছাখ না, খানিক্ আগে চিঠি পেলাম—আজ, আজ নয় তো কি, আজই আসবে।

চিঠিটা দেখবার জন্তে অতুল রুদ্ধনিশ্বাসে মুহূর্ত গুনতে লাগলো। কতো দিন তার হাতের লেখা সে দেখেনি। এখন নিশ্চয়ই আর সেই শিশুর চাউনির মতো গোল-গোল সরল অক্ষর নেই,—টানা, দ্রুত, বোগোচ্ছল হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি রেখা এখন সঙ্কেতময়। ব্যক্তিত্বদীপ্ত। অক্ষরসন্নিবেশের ক্ষিপ্রতার মাঝে তার নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা ঠিক ধরা পড়বে। হয়তো বা তার প্রখর ঔদাসীন্য।

চোখের দৃষ্টিকে ধারালো করে অতুল ভবনাথবাবুর জামার পকেট তিনটে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

হতাশ হয়ে ভবনাথবাবু বললেন,—না, চিঠিটা সঙ্গে করে আনিনি দেখছি। বাড়িতেই ফেলে এসেছি।

অতুল ফের ঢোঁক গিলে বললে,—কী লিখেছে গৌরী ?

—গৌরী নয় হরিশই লিখেছে। পোস্‌-কার্ডে মাত্র দু' ছত্তর খবর—আজ রাত একটায় এসে পৌঁছুচ্ছে।

—হরিশ-খুড়ো ওকে আনতে কলকাতায় গেছলেন বুঝি ?

—ও, তা বুঝি তুমি জানো না? সে তো আজ শুকুরে শুকুরে আট দিন হলো। আগে কখনো আর কলকাতা যায়নি বলে এই ক'টা দিন খুব ঠেসে থিয়েটার-বায়স্কোপ, যাদুঘর-চিড়িয়াখানা করে নিলে যাহোক। ওর ছুটির কয়েক দিন আগে গিয়েই তাই পৌঁচেছিলো। জানোই তো গেল পূজোর ছুটিতে এখানে না এসে কোন্ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে চলে গেল দার্জিলিঙ। মেয়ের আবার শ্লেষ্মার ধাত—তোমার জেঠিমা তো কেঁদেই খুন।

অতুল বললে—তার পর, বড়ো দিনের ছুটিতেও তো আসেনি।

—ক'টা দিনই বা তখন ওকে কাছে পাওয়া যেতো বলো। আসতে যেতেই তো পাকা চারটে দিন বাজে খরচ। তাই মিছে খরচপত্র করে আনালুম না। হস্টেল খোলা ছিলো, বিশেষ কোনো অসুবিধে হয় নি। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে কোথায় না কী প্লে করেছে, কে নাকি ওর নাম করে এক মেডেল্ দিয়েছে—এই সব ফুর্তিতেই মশগুল। বাড়িতে বুড়ো বাপ-মার জন্তে এতটুকু হুঁস নেই। তাই এবার গরমের ছুটি পড়তে না-পড়তেই হরিশকে পাঠিয়ে দিলুম—মেয়েটাকে ধরে নিয়ে আসুক। কতো দিন ওকে দেখি না বলো তো ? ভবনাথের চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

অতুল বললে,—এই প্রায় এক বছর।

ভবনাথবাবু হাটের জনতার দিকে শূন্য চোখে চেয়ে বললেন,—প্রায় এক যুগ। তোমার বাজার করা হলো তো? মাছটা নিলে? বলে কতো।

আমাকে এখন আবার একটা গাড়ি ঠিক করতে যেতে হবে। কার গাড়ি নিই বলো তো?

অতুল ব্যস্ত হয়ে বল্লে,—হ্যাঁ, এই হলো আমার বাজার। চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

বলে আর দ্বিরুক্তি না করে দোকানির কথায়ই সে রাজি হয়ে গেলো। দিয়ে দিল সাড়ে চার আনা! এখন আবার দু পয়সার তর্ক! মাছটা ডালায় ভরে অতুল কাছে এসে জিগগেস করলে,—স্টেশনে কে যাচ্ছে?

—আমি যাচ্ছি, রামলোচন যাচ্ছে, ননীও খুব মাতামাতি করছে, দিদিকে আনতে সেও যাবে। দুষ্টু ছেলে, ঘুমেই তখন বিভোর, কে জাগায় ওকে?

—না, ও হয়তো জেগেই থাকবে সারাক্ষণ।

—না, না,—ওকে এড়াতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

অতুলের তবু মনে হলো দলটা ঠিক আশানুরূপ বলশালী হয়নি! নির্জন মাঠের ওপর দিয়ে ধু-ধু করছে পথ, ঘনানো অন্ধকার রাত, ধারে-পারে কোথাও এতটুকু আলোর ছিটে-ফোঁটা নেই, মুখের সামনে বিপদ এসে পড়লে যুঝবে কে? আর আজকাল বিপদ তো কথায় কথায়। সঙ্কুচিত হয়ে সে বল্লে—পথ-ঘাট আজকাল সুবিধের নয়, সামান্য একটা টাকার জন্যে লোকে ছুরি বসাচ্ছে—ফিরতি-পথে খুব সাবধান কিন্তু।

ভবনাথবাবু হেসে বল্লেন,—আমি আছি, লেঠেল রামলোচন আছে, হরিশ আছে—কিসের ভয়। স্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে সার বেঁধে গরুর গাড়ির দল গাঁয়ে ঢুকবে। বেপারি, মক্কেল,—সামনে আবার পুন্নোমাসির মেলা—ভিড় নিতান্ত মন্দ হবে না।

তবু অতুলের মন ওঠে না, উদ্বেগে ভার হয়ে হয়ে থাকে। মনে হয় একজন যেন কম পড়েছে। যে সব চেয়ে বলবান, সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য তাকেই নেওয়া হচ্ছে না দলে। একমাত্র যে চোখ অন্ধ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আগুনে। ভবনাথবাবুর সঙ্গে কয়েক পা নিঃশব্দে হেঁটে এসে সহসা বললে—যদি বলেন, আমিও তো সঙ্গে যেতে পারি।

তার কাঁধ চাপড়ে ভবনাথবাবু বল্লেন,—মাঝ রাতে ঘুম ছেড়ে তুমি মিছিমিছি কষ্ট করতে যাবে কেন? হাঙ্গামা তো একটুখানি নয়। ছেলেমানুষ,—রাত্তিরে না ঘুমুলে যে তোমার অসুখ করবে।

অতুল দুর্নিবার আগ্রহে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে,—আপনি কী যে বলেন তার ঠিক নেই। আমি ছেলে মানুষ? এক রাত্রি না ঘুমুলেই আমার অসুখ করবে—

এ যে দস্তুরমতো আমার স্বাস্থ্যকে অপমান! আমি আমাদের পল্লীত্রাণসমিতির সেক্রেটারি না? কারুর অসুখ করলে রাতের পর রাত ঠায় বসে সেবা করেছি, এই তো সেদিন হরি মাইতির সাপে-কাটা ছেলেটাকে নিজে পুড়িয়ে এলাম—গায়ের ওপর দিয়ে কী ঝড়-বৃষ্টিটাই না গেলো—কোনোদিন তো এক ফোঁটা অসুখ করতে দেখলাম না। আর এ বলছেন কিনা মাঝরাত পর্যন্ত জেগে থাকা! কত মাঝরাত—

এতোগুলি কথা এক নিশ্বাসে বলে ফেলে অতুলের ভারি লজ্জা করতে লাগলো। সে যেন এই অসহিষ্ণু কথার ঝাপটায় নিজেকে নিরাবরণ করে ফেলেছে। তবু আজ রাতে বিছানায় চুপ করে নিষ্কর্মার মত ঘুমোনো যে কী নিদারুণ কষ্টকর তা কে বুঝবে? কে বুঝবে কাকে বলে অন্ধকারের অনিদ্রা!

ভবনাথবাবু তার বিস্তৃত কাঁধের ওপর সস্নেহে হাত রেখে বললেন,—কিন্তু গাড়িতে এতো লোক যে ধরবে না, অতুল। মাল-পত্র বিছানা বাক্স আছে। তা ছাড়া গৌরীকে তো গাড়িতে বিছানা করে দিতে হবে! রাস্তায় কখন ট্রেন ছেড়ে ষ্টিমার কখন আবার ষ্টিমার ছেড়ে ট্রেন—এই অসম্ভব উত্তেজনার মধ্যে তো কারুর ঘুম আসতে পারে না। যদি পারে গরুর গাড়িতেই একটু শান্তিতে গা ঢালবে। যা ওর স্বাস্থ্য—জানো তো? আর—আর, একটা অসুখ-বিসুখ করে বসলে ভূতুড়ে জায়গায় ভালো একটা ডাক্তারো পাওয়া যাবে না।

অতুল থেমে গেলো। প্রতীক্ষা প্রখর স্নায়ুগুলি নিস্তেজ, স্তিমিত হয়ে এলো। এর পরেও প্রতিবাদ করতে যাওয়াটা নিতান্ত দুর্বল ও অসহায় ভাবাভিশয্য। বলা যেতে পারতো জায়গায় না কুলুলে অনায়াসে সে গরুর গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে হেঁটে আসতে পারবে; বলা যেতে পারতো সে সঙ্গে আছে শুনলে গৌরী কিছুতেই স্বার্থপরের মতো বিছানায় একলা শুয়ে থাকতো না, কে জানে হয়তো তারই পাশে-পাশে তারই সঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে ভিজে রাতের অন্ধকার ও অনুভূতির স্তব্ধতা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলতো; আর অসুখ যদি তার একটু করেই, সেবায় ও সান্নিধ্যে তাকে ফের সুস্থ করে তুলতে কতক্ষণ? এ সব কথা বলা যেতে পারতো বটে, কিন্তু মানুষের কথোপকথনে তার সমীচীন ভাষা নেই। ভাষা তো সব সময়ের প্রকাশের বাহন নয়। কখনো কখনো বা প্রকাশের অন্তরায়।

ভবনাথবাবু বললেন,—ব্যস্ত কি, কাল সকালেই আমাদের বাড়ি যেয়ো না হয়।

লজ্জায় অতুল একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। গৌরীকেই দেখা তো আর উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে পরিবেষ্টন করে মধ্যরাত্রির অপার বিনিদ্র স্তব্ধতাটুকুকে দেখা। নারীর প্রকাশ শুধু তার শারীরিক উপস্থিতিতে নয়, বিশেষ একটি পারিপার্শ্বিকতার সে অপেক্ষা রাখে। ভোরের আলোর গৌরী রাতের অন্ধকারের গৌরীর চেয়ে ঢের বেশি অন্য রকম। ঢের বেশি স্পষ্ট, ঢের বেশী উচ্চারিত, ঢের বেশি সীমাবদ্ধ। তার মাঝে অপরিচয়ের বিস্ময় নেই, অভূত-পূর্বতার অবকাশ নেই। সেই তার ট্রেন থেকে প্রথম নামা, গুঁড়ো গুঁড়ো চুলগুলি কপালের দিকে রুক্ষ হয়ে এসেছে, শাড়িটা একটু-একটু ময়লা, একটু-একটু অগোছাল, এখানে বেশি ওখানে কম, সারা শরীরে ঘুমের তরল একটু জড়িমা, ক্লান্তির সুন্দর একটি মালিন্য—সেই গৌরীর সঙ্গে সকাল-বেলাকার স্নাত, সংস্কৃত, বিন্যস্ত গৌরীর আকাশ-পাতাল তফাৎ। রাতের গৌরী হচ্ছে কোন কবির পাণ্ডুলিপিতে গভীর উপলব্ধিময় সুন্দর হস্তলিপি, ভোরের গৌরী হচ্ছে মাসিক-পত্রিকার ছাপার অক্ষর। নিটোল, নির্ভুল, পরিচ্ছন্ন।

কতো দূর আসতেই ভবনাথবাবু কাকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন: এই যে ইদ্রিস, তোর কাছেই আমি যাচ্ছিলাম।

—আমার কাছে? আনন্দে বিহ্বল চোখে তাকাল ইদ্রিস।

—রাত্রে তোর গাড়ি চাই।

—গাড়ি? কেন?

স্টেশনে যেতে হবে—ছেলেকে তোর পাঠিয়ে দিস্ কিন্তু।

বুড়ো মুসলমান,—বাজারে দুধ বেচতে চলেছে। মেহেদি পাতার রঙে দাঁড়ি-গোঁফ লাল, হাতের নোখেরো তাই প্রসাধন। বললে,—কেউ আসবে বুঝি? কখন আসবে?

—হ্যাঁ, অতো অবাক হচ্ছিস কেন? রাত একটার সময় যে ট্রেন আসে—তাতে আজ আমার মেয়ে আসছে যে। কে চিনতে পারলি তো রে?

ইদ্রিস ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

—সেই যে গেলো বছরে যে পরীক্ষা দিয়ে পাস করলো, তোদের সবাইকে চিড়ে-দই খাওয়ালাম—ভবনাথ অবাক হবার ভাব করলেন: তোর যে দেখছি কিছুই মনে থাকে না।

—হ্যাঁ, হাঁ, মনে আছে বৈ কি। ইদ্রিস দুই চোখ বড়ো করে বলে উঠলো: তা, মেয়ে তোমার কি হয়েছে বললে?

ভবনাথবাবু জোর গলায় বললেন,—পাস্ করে কলকাতার কলেজে পড়তে

গেছলো। কলকাতার কলেজ। এক বছর বাদে ছুটিতে এখানে ফিরে আসছে। বুঝলি?

কানের পিঠে হাত রেখে ইদ্রিস ঘাড়টা সামনের দিকে একটু নুইয়ে বললে,—কী, কী বললে? তোমার মেয়ে বালিস্টার হয়ে এসেছে? বলো কি? পরে হঠাৎ সে ভবনাথবাবুর পা চেপে ধরলো: বাবু আমার সেই গরু চুরির মামলাটা। আপনার মেয়েকে বলে এ-যাত্রা আমাকে রক্ষে করুন। উনি শাম্‌লা এঁটে দাঁড়ালেই হাকিম মুচ্ছো যাবে, নির্ঘাৎ খালাস দিয়ে দেবে আমাকে, মা-ঠাক্‌রুনকে আমি পেট ভরে দুধ-ক্ষীর খাওয়াব।

তার এই আকস্মিক ব্যবহারে অতুল ও ভবনাথবাবু দু'জনেই হেসে উঠলো। ভবনাথবাবু বললেন—নে, সে-জন্যে তোর ভাবনা নেই, আমাকে রক্ষে কর আগে। ছেলেকে দিয়ে গাড়ি স্টেশনে ঠিক পাঠিয়ে দিস্ কিন্তু।

নিশ্বাস ফেলে ইদ্রিস বললে,—বাস হয়ে আমাদের গাড়ি কি আর কেউ চড়ে?

—না চড়ুক, আমার গাড়ি চাই। ঝর্ঝরে একখানা মাত্র তো বাস, হাঁটু দুমড়ে কুঁজো হয়ে বসে থাকতে হয়—সমস্তক্ষণ ত্রাহি ত্রাহি, কখন এই কাৎ হয়ে পড়লো, কখন চাকা গেলো ফেটে। মাল-পত্রে ঠাসাঠাসি, বিড়ির ধোঁয়া, যতো রাজ্যের নোংরা কথা—সেখানে আমার মেয়ে নিয়ে তো উঠতে পারি না। যাবার সময় যাব অবিশ্যি বাস-এ—ফেরবার সময় তোর গাড়ি চাই। ঠিক মতো পাঠিয়ে দিস যেন। তা ছাড়া বাস তো আর বাড়ির দোর-গোড়ায় নামিয়ে দেবে না।—সেই কাচারি পর্য্যন্ত। তারপর মেয়েকে আমি রাত করে হাঁটিয়ে আনি আর-কি। না, না, গাড়ি রাখিস, বুঝলি? মেয়ে আমার ধীরে সুস্থে আসতে পারবে ঘুমিয়ে। লম্বা পথে কত হয়রানি বল দেখি। কিরে, আগাম কিছু বায়না দিয়ে রাখবো নাকি?

ইদ্রিস বললে,—বায়না কিসের বাবু? মা-ঠাক্‌রুন আসছেন যে। আমার মামলার বালিস্টার।

—তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরতে পারি?

—কথা দিয়ে কথার কোনোদিন খেলাপ করেছি বলতে পারো? গাড়ি নিয়ে আমি নিজেই যাবো। মা-ঠাক্‌রুনকে আমার মামলার কথাটা একটু বুঝিয়ে দিতে হবে।

—আচ্ছা, সে হবে খন। বলে ভবনাথবাবু অতুলকে নিয়ে ফের বাজারের দিকে ফিরলেন। বললেন,—স্টেশন থেকে বাড়ি পৌছুতে তো তিনটে। তখন গৌরী এসে কী খায় বলো দিকি? চা তো নিশ্চয়ই—চায়ের সঙ্গে—

অতুল বললে,—কেন, ডিম।

—হ্যাঁ, চলো, কিছু ডিম কিনে নিই গে।

ছু'জনে ডিমের দোকানে ঢুকলো।

অতুল বললে,—এ কী নিচ্ছেন! হাঁসের ডিম? নাকে ওর গন্ধ লাগবে না?

ভবনাথবাবু সামান্য দ্বিধা করে হাতের ডিমগুলি ডালায় নামিয়ে রেখে বললেন, তবে তুমি ঐ ছোট ডিম নিতে বলছ? চায়ের সঙ্গে ওটা ভালো জমে? কলকাতা থেকে আসছে, গৌরী, এই ছোট ডিমের অম্‌লেট্‌ই বেশি পছন্দ করবে, না? ঠিকই বলেছ, তাই নাও। তুমিই নাও অতুল, ওটা আর আমি নাই ছুঁলাম।

অতুল ডিমগুলি রুমালে করে বেঁধে পকেটের মধ্যে আস্তে-আস্তে রাখল।

বাঁক ঘুরতেই কাকে আবার দেখতে পেয়ে ভবনাথবাবু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন: এই যে অনঙ্গবাবু, নমস্কার।

যাকে সম্বোধন করা হলো তার দিকে তাকালে খানিকক্ষণ আর চোখ ফেরানো যায় না। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের বলিষ্ঠ যুবক, সারা গা থেকে পৌরুষ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। খালি সৌন্দর্য নয়, পরাক্রম। শরীর যেন দুর্ধর্ষ পর্বতশৃঙ্গ। ব্যায়ামে দৃঢ়। সংগ্রামে দুর্দাম! ভঙ্গিটা এমন কঠিন, যেন পৃথিবীতে প্রতিকূলতা করবার ওর কিছু নেই। চাপা ঠোঁটে ব্যক্তিত্বের তেজ, চওড়া কপালে উদার অহঙ্কার। ঢালের মতো প্রশস্ত বুক, স্ফীত ঘাড়, ছুরির ধারালো ফলার মতো তীব্র চক্ষু। চেহারা দেখলেই মনে হয় পৃথিবীতে তার কিছু বলবার আছে। ঘোষণা করবার আছে। সে যে আছে, শুধু আছে—এই কথাটা দিগ্বিদিকে রাষ্ট্র হবার মতো।

ভবনাথবাবু তৃপ্তমুখে বললেন,—এই যে অনঙ্গবাবু, নমস্কার।

অনঙ্গ নির্লিপ্তের মতো বললে, —হ্যাঁ, এই যে—।

সামনে এগিয়ে এসে ভবনাথবাবু বললেন,—কী কিনলেন এতো সব?

—দু'টো কচি পাঁঠা। দাম নিলে সাড়ে-চার টাকা। কি, ঠকলাম নাকি?

—দু'টো কী করতে? লোক তো মোটে আপনি একলা।

অনঙ্গ হেসে উঠল: একলার পক্ষে একটা পাঁঠাই যথেষ্ট ছিল বুঝি? পরে বললে, না, তা নয়, কালকের ট্রেনে কলকাতা থেকে আমার কয়েক জন বন্ধু এসেছে।

—ও! গাঁ দেখতে বুঝি? তিন পয়সা দুধের সের আর এক পয়সার বেগুন—তাক লাগেনি তো? বেশ, বেশ—খুব ঠেসে খাইয়ে দিন। শুনে খুসি হলাম। ভবনাথ কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ করে তুললেন: হ্যাঁ আমার মেয়েও আজকে কলকাতা থেকে আসছে—সেই একই ট্রেনে, যেটা রাত একটায় এখানে আসে।

এ যেন কী অসম্ভব কথা. ভুরু কুঁচকে অনঙ্গ জিগগেস করলে,—আপনার মেয়ে ?

—হ্যাঁ, আপনি তাকে দেখেন নি। কী করে বা দেখবেন ? এখেনে এসেছেন তো মাত্র তিন মাস—তবু যাক, ঠাকুরদার ভিটে-মাটির চিহ্নটা যে রইলো ! সেইটেই বড়ো কথা। সহরমুখো হয়ে আপনার বাবা তো একদিনের জন্যেও দেশে ফেরেন নি। আপনাদের যে কোনো কালে এখেনে আসবার মুখ হবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না। তা, বেশ করেছেন এসে—বাপ-পিতেমোর মাটি, স্বর্গের চেয়েও তার দাম বেশি। বাংলোটিও বানিয়েছেন খাসা—একেবারে ছবির মতো। চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

অনাবশ্যক কথার ভিড় সরিয়ে অনঙ্গ বললেন,—কিন্তু আপনার মেয়ে, আপনার মেয়ে কলকাতা থাকে নাকি ? কই শুনিনি তো ! এত খবর কানে আসে—কই—

ভবনাথবাবু নীরবে হেসে বললেন—হ্যাঁ, আপনি তো সেদিন মোটে এলেন, কী করে বা জানবেন ? গেলো-বছর আমার মেয়ে ম্যাট্রিক পাস্ করেছে,—দেখেন নি গেজেটে ?

বিস্ময়ে ও কৌতুহলে অনঙ্গ একসঙ্গে স্তব্ধ ও অস্থির হয়ে উঠলো। বললে,—ম্যাট্রিক পাস করেছে—এখানে মেয়েদের ইস্কুল কোথায় ?

—সেই তো কথা ! একেবারে নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করে এতোখানি সে হতে পেরেছে। কতো বাধা, কতো বিপদ—মেয়ে আমার একটুও কোনোদিন দমে নি। ভবনাথের পিঠটা অজান্তে খাড়া হয়ে উঠল : পাস্ সে করবেই—পাস্ করে তবে অন্য কথা। করলেও তো পাস্—তাও টায়-টুয়ে টেনে হিঁচড়ে নয়, দস্তুরমতো ফার্স্ট ডিভিসনে। এ কি চাট্টিখানি কথা ?

সশ্রদ্ধ কণ্ঠে অনঙ্গ বললে,– নিশ্চয়ই নয়। প্রায় অমানুষিক কৃতিত্বের কথা। বাধা বিপদকে বশীভূত করার কৃতিত্ব।

আহ্লাদে অস্থির হয়ে ভবনাথবাবু বল্‌লেন,—শুধু কি তাই ? কলকাতার কোন স্টেজে কলেজের মেয়েদের সঙ্গে প্লে করে সোনার মেডেল পেয়েছে। বুঝলেন অনঙ্গবাবু, গাঁয়ের লোকদের চোখ টাটায়– পরের সুখ পরের সাফল্য তারা দেখতে পারে না। যত সব ছোটলোক কৃপণ—

অনঙ্গ বললে,—আপনার মেয়ের কি নাম ?

—ও ! আপনি কিছুই জানেন না দেখছি। ওর নাম গৌরী। আগে গৌরীসুন্দরী ছিল, কিন্তু নামে সুন্দরী থাকাটা মেয়ে পছন্দ করলে না। তা, বাপ

হয়ে মেয়ের প্রশংসা করতে নেই, অনঙ্গবাবু—কিন্তু সত্য কথা বলা তো আর বাড়িয়ে বলা নয়।

অতুল হঠাৎ অস্থির হয়ে বললে,—বেলা হয়ে গেলো জেঠামশাই। মাছ নিয়ে আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে।

ভবনাথবাবু বললেন,—হ্যাঁ, এই যাচ্ছি। একদিন আমাদের ওখানে যাবেন না, অনঙ্গবাবু!

অল্প হেসে অনঙ্গ বললে,—যাবো। এখন আমার বাড়িতে তো নিদারুণ আড্ডা।

—তা বটেই তো। খুব ঠেসে খাইয়ে দিন বন্ধুদের—যেন আমাদের গাঁয়ের নিন্দে না করতে পারে। গৌরীর আড়াই মাস ছুটি, খাইয়ে-দাইয়ে ওকেও একটু চাঙ্গা করে দিতে হবে। কলকাতার দুধ তো শুনেছি খড়ি-গোলা জল, আর মাংস নাকি বারো আনা সের। সেখানকার লোক বেঁচে আছে কী করে? যাবেন একদিন সময় করে—আপনার ঠাকুরদার সঙ্গে আমার বাবার কতো ভাব ছিল। যাবেন। নমস্কার। কৃতার্থের মত ভবনাথই আগে হাত তুলল।

—দেখি—

ফাঁকা জায়গায় চলে এসে অতুল অত্যন্ত মেজাজ দেখিয়ে বললে—কী আপনি যার তার সামনে গৌরীর কথা ঢাক পিটিয়ে বেড়ান?

—যার-তার সামনে হলো? ভবনাথবাবু চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়লেন: তুমি বলো কী অতুল? অনঙ্গ একটা যে সে ছেলে? আজকালকার দিনে ক'টা অমন মেলে শুনি? কন্দর্পের মতো যেমন চেহারা, কুবেরের মতন তেমনি ঐশ্বর্য্য। শুধু কি তাই? এম-এ বি-এল। এমন গুণী লোক না হলে গৌরীকে আমার বুঝবে কে? শুনলে না—ওর পাসের খবর পেয়ে কী বললে! 'অমানুষিক কৃতিত্বের কথা'। এমন একটা জমজমাট কথা তোমাদের গাঁয়ের কটা লোক বলতে পারতো শুনি? বিদ্বান না হলে বিদ্যার মর্য্যাদা কে বুঝবে বলো?

কথার তাড়নায় অতুল ম্রিয়মাণ হয়ে গেলো। এর অন্তরালে তারই প্রতি যে অবজ্ঞাপূর্ণ প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত আছে—তা না-ও হতে পারে। অকারণে তাকে দুঃখ দিয়ে ভবনাথবাবু কখনোই রূঢ় বা কটুবাক্য ব্যবহার করবেন না। তা হয়তো সত্যি, কিন্তু তবু অতুল কোথায় কি একটা অস্পষ্ট খোঁচা আবিষ্কার করে বিমর্ষ হয়ে পড়লো। মন্থর হয়ে এল পদক্ষেপ।

তবু, পৃথিবীতে বিদ্যাই হয়তো সব নয়, উপকরণের আধিক্যে-আড়ম্বরেই হয়তো সমস্ত ঐশ্বর্য্য লেখা থাকে না। দিন-রাত্রি-অতিবাহনের সসজ্জ সমারোহের

চেয়ে জীবনধারণের অমিত সংগ্রাম ও গৌরবময় পরাভবের মূল্যও হয়তো কিছু কম নয়। তা ছাড়া প্রাণ? প্রাণের মূল্য কি বস্তুতে হয়?

তাই সাহসে ভর করে অতুল বললে,—গুণের কথা আর বলবেন না। তিনটি মাস এখেনে এসেছে, কিন্তু তার কীর্তির কথা কারুর অজানা নেই!

ভবনাথবাবু ঝটকা মেরে উঠলেন, বললেন,—ও সব পরের কথায় বিশ্বাস কোরো না। আমার গৌরীকে নিয়েই বা কি লোকে কম কানাঘুষো করে নাকি —কতো মিথ্যে কথাই যে রটাতে পারে! সংসারে যে বড়ো হয় তাকে নিন্দে না করলে তার বড়ো-হওয়ার কোনো মাহাত্ম্য থাকে না।

অতুল জ্বলে উঠলো: পরের কথা মানে? আমি স্বচক্ষে তাকে মাতলামি করতে দেখেছি। আরো যা-সব আমি দেখেছি জেঠামশাই, তা আমি মুখ ফুটে আপনাকে বলতে পারবো না!

—বলো কী! স্বভাব-চরিত্র ভালো নয় তা হলে? ভবনাথবাবু চোখ কপালে তুললেন।

—এ আপনি আজ নতুন শুনছেন নাকি? যাকে খুশি আপনি জিগগেস করে দেখুন না। অমন লোককে বাড়িতে ঢুকতে দিলেই হয়েছে!

চিন্তিত মুখে ভবনাথবাবু কী ভাবতে লাগলেন। এমনি সময় দেখা গেলো শূন্যে একটা গামছা উড়োতে উড়োতে ননী ছুটে আসছে। যখনি সে ছোটে তখনই নিজেকে সে একটা এঞ্জিন ভেবে নেয়, দাঁতের তলায় জিভ ঠেকিয়ে ঘূর্ণ্যমান চাকার শব্দ করতে থাকে। এবার গামছাটা সে মাথার উপর দিয়েছে—যেন এঞ্জিনের ধোঁয়া।

কাছে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে ননী বললে,—রামলোচন বাজার করে ফিরেছে, কিন্তু কাঁটাল নেয় নি। মা তাই কাঁটাল আনতে বলে দিলেন। দিদি খুব কাঁটাল খেতে ভালোবাসে।

—চল আবার যাই বাজারের দিকে। ভবনাথবাবু ফিরলেন, অতুলকে বললেন,—তুমিও যাবে নাকি?

অতুল বললে—আমার আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে! দাঁড়া ননী, তোর গামছা দে, তোদের ডিমগুলি দিয়ে দি! বলে রুমাল খুলে একটির পর একটি করে সাজিয়ে গামছা দিয়ে ডিমগুলি সে বেঁধে দিলো।

ননী বললে,—জানো অতুল-দা, দিদিকে আনতে আমি আজ স্টেশন যাচ্ছি।

অতুল তার চোখের দিকে চেয়ে হেসে বললে,—তুই তো তখন ঘুমিয়ে থাকবি।

সমস্ত শরীরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ননী বললে,—কক্‌খনো না। চোখে খুব খানিকটা সর্ষের তেল ঢুকিয়ে দেব—দেখি ঘুম কী করে আসে। তারপর গলা খাটো করে জনান্তিকে বললে,—এক পয়সার নস্যি কিনে রাখছি, ঘুম আসতে গেলেই হ্যাঁচ্চো! বলে আপন মনে সে খিলখিল করে হেসে উঠলো। পরে গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলে—এখন দিদি কোথায় বলুন দিকি অতুল-দা? ট্রেনে না স্টিমারে?

হিসেব করে কিছু বলবার আগেই ভবনাথবাবু আবার কাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন—এই যে দীনবন্ধু। জানো আজকের রাত্রের ট্রেনে আমার মেয়ে আসছে।

দীনবন্ধু ভবনাথবাবুরই সমবয়সী। কথাটা ধাঁ করে তাঁর কানে লাগলো। ঘাড় উঁচিয়ে সুতোয়-বাঁধা ঘোলাটে চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললেন,—কে আসছে বললে?

—আমার মেয়ে—বড়ো মেয়ে। গৌরী। আর-বছরে যে পাস করলো।

—ও! তোমার মেয়ে আসছে বুঝি? কোত্থেকে?

—কলকাতা থেকে। ভবনাথবাবুর আওয়াজ বেশ গম্ভীর।

—তা বেশ। কলকাতাতেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছ বুঝি। কবে বিয়ে হলো কিছু জানতে পেলাম না তো? জামাইটি কী করে?

ভবনাথবাবু হেসে বললেন,—বিয়ে কোথায়, দীনবন্ধু। কলকাতাতে মেয়ে আমার কলেজে পড়ছে—বেথুন-সাহেবের কলেজ। নাম শোননি কোনো দিন?

বিস্ময়ে চোখ বড়ো করে কপালে তুলতে যেতে নড়বড়ে চশমার নাকি-টা নাকের ডগায় ঝুলে পড়লো। দীনবন্ধু দম নিয়ে বললেন, অতো বড়ো মেয়ের এখনো বিয়ে দাও নি?

ভবনাথবাবু বললেন,—মেয়ে তো আমার কেবল বয়েসেই বড়ো হয় নি—বিদ্যায়ো তো বড়ো হয়েছে; বিয়ে বললেই তো আর মুখের কথায় পাত্র জুটে যায় না—তার উপযুক্ত পাত্র পেতে হলে একটু দেরি করতে হবে বৈ কি। এ তো আর যার তার হাতে গছিয়ে দেবার মতো মেয়ে নয়।

দীনবন্ধু রেগে বললেন,—তাই বলে তুমি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে? চেষ্টা করবে না?

—আমি একলা চেষ্টা করলেই তো আর হবে না—মেয়ের এখন একটা নিজের মত হয়েছে যে। তার বক্তব্যও তো মান্য করতে হবে। বিয়ে সে এখন কিছুতেই করতে চায় না। সে আরো পড়তে চায়। উপযুক্ত হতে চায়।

—বলো কী সর্বনেশে কথা! মেয়েকে একেবারে খৃস্টান বানিয়ে ছেড়েছ? নিজের মত! তোমার মেয়ে একেবারে বিলেত থেকে আসছে যে। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল দীনবন্ধু: বাপ হয়ে মেয়েকে অমন উচ্ছন্নে যেতে দিতে তোমার বাধলো না! বুড়ো বয়সে এই অনাচারটা তোমার সইছে! ছি-ছি!

সন্ধি করবার চেষ্টায় ভবনাথবাবু হাসিমুখে বললেন,—দিন-কালের হাওয়া যে বদলে যাচ্ছে দীনবন্ধু।

—তাই মেয়ে তোমার বিয়ে না বসে ধিঙ্গি হয়ে ধেই ধেই করে বেড়াবে। জাত-ধর্ম না মানো, স্বভাব-চরিত্রটাও তো দেখতে হয়! ছি ছি! পাত্র কী করেই বা জোটাবে। অমন নাচুনি মেয়েকে কোন বেআক্কেল পুরুষ ঘরে নেবে শুনি। কপালে দুঃখ আছে ভবনাথ, অসীম দুঃখ। বলে দীনবন্ধু প্রস্থান করলেন।

দুই

মা পই-পই করে বলে দিয়েছিলেন যেন মাছের পেছনে চার আনার এক আধলাও বেশি সে না লাগায়। সে যেমন খরুচে, তাকে বাজারে পাঠিয়ে মা'র স্বস্তি নেই, পয়সা কড়ি চোখে যেন সে দেখতে পায় না। সত্যি কেমন অকারণে দুটো পয়সা সে ছেড়ে এল। যাক্, তা নিয়ে আর মা'র সঙ্গে ঝগড়া করতে যাচ্ছে না। অন্তত আজকে নয়। মাকে খুশি করার জন্যে দরটা আরো অনেক সে কমিয়ে দিতে পারবে।

বাঁশের মাচার মেঝে, ওপরে খড়ে ছাওয়া ছোট একখানি ঘর—এটি অতুলের নিজের। রান্নাঘরে মাছের জায়গাটা নামিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে অতুল নিজের ঘরে চলে এলো। ঘরটা কেমন ফাঁকা, অগোছালো। কোণে ময়লা কাপড়ের স্তূপ, টেবলটা ওলোট পালোট, তক্তপোশের পাটির উপর কে এক দোয়াত কালি উপুড় করে গেছে। অতুল তাড়াতাড়ি সব সাফ করতে বসলো। গায়ের জামা-কাপড়গুলি কি বিচ্ছিরি নোংরা, পনেরো দিনেও ধোপার দেখা নেই। ঘাটে গিয়ে সাবান দিতে হবে দেখছি। তার আগে, এই ঘরটা—যতো রাজ্যের ধুলো আর জঞ্জাল—সাফ করা দরকার। খোকাটা আম খাবার আর জায়গা পায় নি, এখানে-ওখানে রাজ্যের আঁঠি আর খোসা ছড়িয়ে গেছে। ঘর এমন একহাঁটু করে রাখলে কেউ দু'দণ্ড স্নিগ্ধ মনে বসতে পারে নাকি এখানে।

মা রান্নাঘর থেকে তাকে স্নান করতে যাবার জন্যে তাড়া দিচ্ছেন। তার আপিসের বেলা হয়ে গেলো যে।

আশ্চর্য! আজও আপিসের বেলা!

রোদ লেগে তরল কুয়াসাটুকু যেন মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। এখুনি তার ব্যস্ত হবার এতো কী হয়েছে! এই অপদার্থ ঘর নিয়ে তার এই অকারণ মত্ততার বা কী দরকার! যেদিন খুশি ঝাঁট পড়বে, যেদিন খুশি হাওয়া এসে আমের শুকনো খোসা উড়িয়ে নিয়ে যাবে! ধোপা ঘন-ঘন না এলেই তো খরচ বাঁচে, নিজে কাচতে পারলেই তো জামা-কাপড়ে আয় দেয়। থাক্, ঘর-দোর নিয়ে এতো কাব্য করার কিছু মানে নেই—গৌরী তো আর এই ঘরে আসছে না। বসছে না নিরিবিলিতে।

অফিস থেকে ফিরে অতুল সামান্য একটু জলখাবার খেয়ে নিরালায় তার ঘরে এসে বসলো। দরজাটা টেনে দিলে, আলো জ্বালালো না। সে ঘরে আছে জান্‌লে মা এসে নানারকম অভাব-অভিযোগের পালা গাইতে সুরু করবেন। শরীর খারাপ বলে তা এড়ানো যাবে না, এবং শরীর একবার খারাপ সাব্যস্ত হলেই উলটে নানারকম পীড়াগ্রস্ত হতে হবে। তাই সে দরজা ভেজিয়ে ঘর অন্ধকার করে, নিজের উপস্থিতিটা স্তব্ধ, সঙ্কুচিত করে আনলে। ছোট ঘরের ঘনিষ্ঠ অন্ধকারটুকু ছেড়ে বিপুল আকাশের সীমাহীন অপরিচয়ের মধ্যে গিয়ে পড়তে তার ভয় করে। ছোট টাইম্-পিস্ ঘড়িটি কানের কাছে এনে অন্ধকারে সে তার মৃদু-মৃদু ধুক্‌ধুক্ শুন্‌ছে। এ যেন কোন এক কিশোরীর ক্ষীণশ্বাস হৃদয়ের স্বর।

ট্রেন ছেড়ে গৌরী এখন ষ্টিমারে উঠেছে। চাঁদপুর পৌঁছুতে এখনো ঘণ্টাখানেক। অতুল তার স্তব্ধ ঘরে সেই চঞ্চল কালো নদীর শব্দ শুনতে পেলো। দূরে গাছপালা সব অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, গ্রামগুলি ঘুমে আচ্ছন্ন, ওপরের আকাশে অনেক তারা ও অনেক প্রশান্তি—আর তার চারপাশে খালি জল আর জল, ষ্টিমারের চাকার শব্দ, খালাসিদের জল-মাপার গেঁয়ো স্বর, যাত্রীদের অসংলগ্ন কোলাহলের টুক্‌রো। সমস্ত কোলাহল নিবিড়তরো হতে হতে তার ঘরে এসে যেন নিঃশব্দ হয়ে গেছে—তার অনুভূতিতে মিশে গিয়ে সমস্ত বেগ-চাঞ্চল্য এখন স্তব্ধ, স্থির! কী করেছে না জানি গৌরী! কী ভাবছে! হয়তো রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জল দেখছে, কিন্তু জল যে কোথায় শান্ত আর স্থির, ছোট একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ, তা আর আনতে পারছে না হিসেবে।

গৌরী সেবার যখন কলকাতা যায়—তখন তার এই ফেরবার দিনটিকেই

অতুল তার নিজস্ব অধিকারের সম্পত্তি বলে মনে করেছিলো। ফিরতে-ফিরতে পুরো এক বছর কেটে গেলো, অতুলের এখন কেবলই মনে হচ্ছে সে-গৌরী আর নেই। যার সঙ্গে ছেলেবেলায় সে পোলের থেকে নুয়ে পড়ে বৃষ্টির জলে ভরা নর্দমায় কাগজের নৌকো ভাসিয়েছে, সেই গৌরী নিশ্চয়ই এখন রঙ বদলেছে, তাকে আর চেনা যাবে না। এখন তাকে হয় তো সব কথা মনে করিয়ে দিলে তবে পরিচয়ে সন্নিহিত হতে হবে—সেই চুল আঁচল এলো করে তার কাণা-মাছি খেলা, সেই বোশেখি ঝড়ের রাতে শিল কুড়ানো, সেই বউ সেজে মাথায় ঘোমটা দিয়ে তাকে ভূত দেখানোর ভয়। তারপর বছর আরো গড়িয়ে গেলো—কিন্তু গৌরী সেই তেমনি একফালি ছিপ্‌ছিপে মেয়ে, তেমনি চঞ্চল, তেমনি অনর্গল, তেমনি খেয়ালি। গাছের ছায়ায় বই-খাতা ছড়িয়ে সকালে দুপুরে তার পড়া, টুপ্‌ করে একটা আম ঝরে পড়লে অমনি নুনের খোঁজে আঁচল ফাঁপিয়ে তার দৌড়। পথে অতুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে এককামড়ে তাকে আধখানা ভাগ করে দেওয়া। সব এখন তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে!

সেই গৌরী আর নেই। তার চোখে ছিলো আগে গভীরতা, এখন নিশ্চয়ই দীপ্তি—তরল সরলতা এখন সন্দেহে প্রখর হয়ে উঠেছে! তার আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে আগে বাঁধভাঙা অপরিমিতির একটা ঐশ্বর্য ছিলো, এখনকার আনন্দের অন্তরালে জাগ্রতবুদ্ধি চেতনার সূক্ষ্ম প্ররোচনা আছে। আগে ছিলো অনুভব, এখন বিচার। আগে উৎসায়ু, এখন সংযম। তাই অতুলের মনে আজ সহজ স্বাধিকারের কথা উঠছে না, কথা উঠছে যোগ্যতার, সাধনার।

স্টেশনে সে যাবে কোন ভরসায়! গেলে গৌরী তাকে চিনতেও পারবে না। চিনলেও, অলক্ষ্য অন্তরঙ্গতার সেই অনির্বচনীয় সুরটি সে সহরের ধূলায় হারিয়ে এসেছে। এখন সে নিতান্ত ভদ্র, মৌখিক, ফরমায়েসি—তার সেই স্বতঃপ্রেরিত স্নেহ এখন বিবর্ণ, বিস্মৃত। তার সেই নিঃশব্দতার শূন্যতা বহন করবার চেয়ে এই অর্বাচীন স্তব্ধতায় অতুল ঢের বেশি তৃপ্তি পাচ্ছে। ঘৃণা বরং সহ্য করা যায়, উপেক্ষাই কঠিন।

অতুল নিজের কথাও ভাবতে পারছে বৈ কি। গেলো বছরের আগের বার সেও ম্যাট্রিক দিয়েছিলো, পাস্‌ করতে পারে নি। আবার চেষ্টা করার তার সময় ছিলো না, বাবা ইতিমধ্যে মারা গেলেন, সংসার-প্রতিপালনের ভার তার কাঁধে এসে পড়লো। মুন্সেফ-কোর্টে সামান্য নকলনবিশের কাজ পেয়েছে—তাও অনেক কষ্টে, অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুতের পর। পরের বছরই গৌরী পাস করলো—অনন্ত

মনোযোগ ও একান্ত দৃঢ়সঙ্কল্পের জোরে—তাই নিয়ে তার প্রতি মার কতো ব্যঙ্গ, কী কঠিন বাক্যযন্ত্রণা! একটা মেয়ে যা পারে, তা সে পারে না, তাতে সে এমন বোকা বনলো কী করে—ঘেন্নায় সে মরে না কেন? তুচ্ছ পরীক্ষা পাসের চেয়েও জীবনের মহত্তর পরিচ্ছেদ রচনা চলতে পারে—মা তা বুঝবেন না। অনেক দেব-দেবী মানৎ করে পঁচিশ টাকার চাকরিটা জুটিয়ে মা'কে কতক সে তবু শান্ত করতে পেরেছে। বোঝাতে পেরেছে মূল্য।

অতুলের এই উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস—যে দিন-রাত্রিগুলি ভাবে নিবিড়, স্বপ্নে আচ্ছন্ন ও কল্পনায় অলস হয়ে থাকে। রুক্ষ সংসারে পা রেখেও সে এই মোহটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। গৌরী তার চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট, কিন্তু দেখতে একেবারে একটুখানি। বরং তাই তো সে ছিলো। অপরাজিতার ক্ষীণ একটি বৃন্ত—তাতে এতোটুকু লজ্জা বা আত্মচেতনার ছটা ছিলো না। কেমন এটা মৃদুগন্ধ কোমল তন্ময়তা ছিল। সে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে?

এখন না-জানি সে কেমন হয়েছে দেখতে! তার সেই গ্রাম্য শ্যামলতার উপর সহর কোন্ রঙ এনে দিয়েছে না জানি! বিদ্যার তেজ, বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, ভাষার প্রাখর্য্য—কী অদ্ভুত পরিবর্তনই না তার হলো। অনেক ফ্যাসান্, অনেক ঔদ্ধত্য! আত্মপ্রচারের অনেক রকম কৌশল, আয়াস-সাধিত অনেক রকম লীলা ও লঘুতা। কপালে অহঙ্কার, চোখে জিজ্ঞাসা, ঠোঁটে উপেক্ষা, হাতে কার্পণ্য। সে-গৌরী আর নেই। সে এখন যতো ব্যস্ত, ততো মুখর। যতো ধারালো ততো চতুর।

সে আসছে শুনে এতো বেশি উচাটন হবার কী আছে। এমন কেউ কোনো রাণী মহারাণী তো আসছে না!

অতুল ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে পড়লো। দেশলাই জ্বেলে ঘড়ি দেখলো। মোটে এগারোটা। ঘড়ি ঠিক চলছে বৈ কি।

আবার পাশ ফিরে শুল। বারোটার সময় বেরুলেই হবে। সাইকেল ঠিক করে রেখেছে।

তিন

সেরেস্তাদারকে দিয়ে হাকিমের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে অতুল দুটোর সময় ছুটি পেলো। রোদে মাঠ ঘাট ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কোঁচার খুঁটে ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে চললো সে চণ্ডীতলা—ভবনাথবাবুর বাড়ি।

পাড়ার যতো রাজ্যের মেয়ে বুড়ি সব এসে এ-বাড়িতে ভেঙে পড়েছে। পাস-

করা মেয়ের মধ্যে তারা বিশেষ মাহাত্ম্য পায় নি, কেননা গৌরী তো এইখান থেকেই পরীক্ষা দিয়েছিলো, যেমন সে পড়েছে তেমনি সে কলসী কাঁখে করে ঘাট থেকে জলও এনেছে বৈ কি—কিন্তু কলেজে-পড়া কলকাতাই মেয়ে তারা এর আগে কখনো দেখেনি। বিয়ে হয়নি অথচ পথে চলতে মাথায় কাপড় টেনে দেয়—ও না-জানি কেমন মেয়ে! কেমন না-জানি ঠোঁট বেঁকিয়ে টাস টাস কথা কয়, কেমন না-জানি চোখ ঢুলিয়ে হাসে! কেমন না-জানি নাটুকে ঠাটে দাঁড়ায়। চল দেখে আসি। শুনিয়ে আসি। চারদিক থেকে ভিড় লেগে গেছে।

বেড়ায়-ফোটানো জানলার সঙ্গে সমান-করা তক্তপোশের ওপর নিচু একটা বালিশের ওপর চুল ছড়িয়ে গৌরী শুয়ে আছে—তার গা ঘেঁসে পাশে বসে মা, হাতে তাঁর একটা সেলাই। মুখুজ্জে-গিন্নী তক্তপোশের কাছে এসে বললেন,—এই বুঝি তোমার মেয়ে? এক গা তো বয়েস, কৈ, বিয়ে দেবে না?

মুখ ঘুরিয়ে মনোরমা বললে,—বিয়ে করতে যাবে কোন দুঃখে? কলকাতার মেয়েরা সব আজকাল মদ্দ হয়ে গেছে পিসিমা।

—কিন্তু কাঠামোটা তো আর বদ্‌লাচ্ছে না। মেয়ের বিয়ে দাও গৌরীর মা, অমন ন্যাড়া কপালটা আর দেখা যায় না। পাস করাবার সখ একটা ছিলো, মিটে গেছে—এখন, না-মরে মেয়েকে আর ভূত সাজতে দিয়ো না। সময় থাকতে সামলে নাও মেয়েকে। ফন্‌ফন্ করে কেমন বেড়ে গেছে দেখেছ?

ভিড়ের মধ্যে থেকে আরেক জন কে বললে,—সময় এখুনিই বা কিছু আছে নাকি? আর ষ্টেজে বিবি সেজে পুরুষের বগল ধরে নাচা যখন একবার সুরু করেছে, তখন মেয়ের আর থাকলো কী! কী কুক্ষণে এ-বাড়িতে টেনে এনেছিলে বড়দি, ছি-ছি!

—নাচ কখন সুরু হবে জেঠাইমা? কে একটা ছোট মেয়ে খ্যানখেনে গলায় আবদার করে উঠল।

—এ বুঝি নতুন নাচ। শয়ন-নৃত্য। বাঁকা গলায় কে আরেকজন টিপ্পনী কাটল।

গৌরী হাত দিয়ে আড়াল করে মুচ্‌কে-মুচ্‌কে হাসতে লাগল। তার মা স্বরে আদর ঢেলে বললেন,—মেয়ে আমার কিছুতেই এখন বিয়ে করতে চায় না, বলে বি-এ পাস করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে চাকরি করে তবে বিয়ে করবো।

গৌরী অসহিষ্ণু হয়ে অস্পষ্ট স্বরে মাকে ধমকে উঠল। বললে—কিছু জান না বোঝ না, তুমি কেন মা এর মধ্যে কথা বলতে যাও?

—চাকরি! ঘোষালের মা মহূর্ত্তকাল হাঁ করে রইলেন. ঢোঁক গিলে বললেন.

সেই চাকরির পয়সা তোমরা খাবে গৌরীর মা ? তবে মিছিমিছি মেয়ের বয়েস বয়ে যাচ্ছে কেন, এখুনি চাকরিতে বসিয়ে দিলেই পারো !

এক ঝটকায় গৌরী তক্তপোষের উপর উঠে বসলো। কান দুটো গরম হয়ে রাগে চোখ ছলছল করে উঠলো। সহসা মেঝের উপর নেমে পড়ে ডান হাতটা দরজার দিকে প্রসারিত করে রুক্ষ গলায় সে বললে,—আপনারা দয়া করে এখন বাড়ি যান বলছি।

—যাবোই তো। ঘোষালের মা ঝাম্‌টা দিয়ে উঠলেন : তবে তোমার এই কুকিত্তি দেখবার জন্যে এইখেনে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি ? চল রে কালিদাসি, চল, দেখেছিস কলেজে-পড়া মেয়ে ! সাধ মিটেছে ? আঁচল হাটরে দেখবি নাকি একবার ?

এমনি সময় উঠোনে অতুল এসে হাজির।

তাকে দেখেই গৌরী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে পালিয়ে গেলো। অতুল ততক্ষণে দাওয়ায় উঠে এসেছে। তার পায়ের কাছে নত হতে যেতেই অতুল একলাফে সরে দাঁড়ালো, বললে—এটা করছ কী।

—বা, তুমি আমার বয়সে বড়ো না ? গৌরী গাঢ় চোখে অতুলের দিকে তাকালো।

অতুল হেসে বললে,—বয়সে বড়ো হলেই নমস্য হয় নাকি ? প্রণামের মাঝে কেমন একটা দূরত্বের ভাব থেকে যায়।

চোখ দু'টি ম্লান করে গৌরী বললে,—তোমার আসবার আর সময় হয় না, না ? সেই সকাল থেকে তোমার কথা ভাবছি। স্টেশনে যাও নি যে।

—গাড়িতে আমার জায়গা হতো না।

—না, তা কী আর হতো ? নিজে দিবি বিছানায় গা ঢেলে ঘুমোলে আর আমি বেচারি সারা রাত ছইয়ের তলায় ঠায় চুপ করে বসে রইলাম—এতো তোমার উপর রাগ হচ্ছিল—

—জানো, শেষ মুহূর্তে কেমন ঘুম এসে গেল।

—তা বুঝেছি। ঘুম পেলে তুমি আর কিছু চাও না। গৌরী ত্বরান্বিত হল : চলো, ও-ঘরে নয়—ও-ঘরে আমার বিবাহসহায়ক সমিতির অধিবেশন হচ্ছে,—চলো, বাবার কাছে যাই।

কিছু বুঝতে না পেরে অতুল গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

উঠোনটুকু পেরিয়ে ও দিকের ঘরের দিকে যেতে-যেতে গৌরী বললে,- আর বোলো না, আমার বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত এদের স্বস্তি নেই। মেয়ে হয়েছি বলেই

যেন আমাকে বলা-কওয়া নেই বিয়ে করতেই হবে। আর যেন আমার কোনো কাজ থাকতে নেই। আর, কী সব যাচ্ছেতাই কথা! দাঁড়িয়ে আর শোনে না অতুলদা, চলো। লেখাপড়া শিখতে গিয়ে আমি যেন কী অপরাধটাই করেছি! এদের কোনোকালে যদি চোখ ফুটতো!

ঘরের মধ্যে এসে দেখা গেলো ভবনাথবাবু গৌরীর এস্রাজটা কাঁধের কাছে বাগিয়ে ধরে তাতে ছড় টানবার চেষ্টা করছেন। ছড় টানা ও গাঁটে-গাঁটে আঙুল চালনা—ছ'হাতে ছ'টো কাজ তিনি সমানে কিছুতেই পেরে উঠছেন না। এ একফালি কাঠ ও কয়েকটা তার থেকে গৌরী যে কী করে অনর্গল সুরের তুফান তুলতে থাকে ভবনাথবাবুর কাছে এ একটা অলৌকিক রহস্য!

অতুলকে ঘরে ঢুকতে দেখে ভবনাথবাবু লাফিয়ে উঠলেন: এই যে অতুল। এসো, এসো। এই দেখ গৌরীর এস্রাজ। দেখতে এতোটুকুন, দাম একুশ টাকা। আর কী সুন্দর যে বাজায়! তোর অতুলদাকে একটু শুনিয়ে দে না, গৌরী!

গৌরী হেসে বললো,—তুমি পাগল হলে বাবা? আর সব কাজকর্ম ফেলে বাজনা?

ভবনাথবাবু বললেন,—বোসো, অতুল। তোর সেই সোনার মেডেলটা দেখা না অতুলকে। প্রায় ভরিটাক হবে, কী বল? সেই যেটা থিয়েটারে প্লে করে পেয়েছিলো, খাসা মেডেল। আর সেই তোদের ম্যাগাজিনে তোর সেই পদ্যটা, গৌরী?

গৌরী লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে বললে,—ছেলেমান্‌সি করো না, বাবা। দাও, তার চেয়ে বরং খানিকটা বাজাই। আত্মঘোষণার লজ্জা ঢাকবার জন্যে গৌরী অগত্যা বাজনা নিয়ে বসলো।

প্রবল উৎসাহে ভবনাথবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। অতুলকে উদ্দেশ করে বললেন, —এবার শুনবে অতুল, গায়ে একেবারে কাঁটা দিয়ে উঠবে। আমি যে বুড়ো, বাজনা শুনে আমার পর্যন্ত শিরগুলি শিউরে ওঠে। বাজা মা, গৌরী, স্টার্ট।

বাঁ হাতের আঙুলের ডগাগুলি চুলের ওপর ঘসতে ঘসতে গৌরী হেসে বললে, —তুমি এখন আর বাড়ী যেতে পাবে না, অতুলদা। বিকেলের জলখাবার এখানেই খাবে আজ,—কলকাতা থেকে ছ' ঝুড়ি ল্যাংড়া আম এনেছি। আম এবার দারুণ সস্তা। তারপর বিকেল হলে আমরা ছ'জনে বেড়াতে বেরুবো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

ভবনাথবাবু অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠেলেন : সে হবে খন তোর অনেক কথা। এখন সুরু কর্।

গৌরী তারের ওপর আস্তে ছড় বুলালো, সঙ্গে সঙ্গে তার বাঁ হাতের দৃশ্যমান আঙুলচারটি ধীরে-ধীরে লীলাচঞ্চল হয়ে উঠলো।

এতক্ষণে অতুল গৌরীর দিকে পরিপূর্ণ করে তাকাতে পারছে। কোথায় যে তার পরিবর্তন হয়েছে সহসা সে তা খুঁজে পাচ্ছে না। মাত্র বয়সে আরো বড়ো হয়েছে। ভারী হয়েছে। দেহে এখন উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, মদির পরিপূর্ণতা। অতুলের অপরিচয়ের অন্ধকারে এই একটি বছর অজ্ঞাতবাস করে গৌরী এখন প্রখর বর্ণে ও রেখায় ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—তার এই শরীরময় প্রপূর্ণ প্রকাশটিই অতুলের নতুন আবিষ্কার। সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার বুঝি বা তার চোখকে, মনকে, বাসনাকে। গরমের জন্যে মাথায় চূড়-খোঁপা বাঁধা, বসবার ভঙ্গিতে নম্র শোভা, বাঁ হাতের নামা-ওঠার সঙ্গে বুকে ও বাহুতে একটু-একটু মৃদু লাবণ্যের হাওয়া বইছে—অতুল নিবিষ্ট মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগলো শরীরী সুর।

ঘরটি এরি মধ্যে গৌরী গুছিয়ে ফেলেছে। ছুটির ক'টা দিনও সে পড়বে দেখছি—টেবিলের উপর থাকে-থাকে বই সাজানো। সবুজ ফাউণ্টেন পেন্, রঙচঙে পেপারওয়েইট, একটা ব্লটার। আলনায় কয়েকখানা শাড়ি—একটার জমি রঙিন—এটা পরেই হয়তো সে আজ তার সঙ্গে বেড়াতে বেরুবে; নিচে এক জোড়া মখমলের নাগরা, সম্প্রতি তার পায়ে ছিলো সবুজ ঘাসের চটি। খালি পায়ের গৌরীর চেয়ে এই গৌরীতে অনেক বেশি রহস্য প্রচ্ছন্ন। আর আবরণই সমস্ত রহস্যের মূল। সমস্ত রসের সঙ্কেত।

সুরের বর্ষায় সমস্ত ঘর ঠাণ্ডা, স্তব্ধ হয়ে এসেছে। ভবনাথবাবু চোখ বুজে তন্ময় হয়ে বসে আছেন, আর অতুল যা শোনবার তাই দেখছে আর যা দেখবার তাই শুনছে একমনে।

এমন সময় বেড়ার বাইরে থেকে কে সহসা খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো : ও কালিদাসি, দেখবি আয়। গৌরী ঘুঙুর পায়ে দিয়ে নাচছে।

উঠোনের ওপর বহুকণ্ঠের ঐক্যকলতান সুরু হলো। অনেক সব চঞ্চল পদশব্দ, বেড়ার ফাঁকে অনেক সব কুটিল কৌতূহল!

গৌরী বাজনা বন্ধ করলে।

ভবনাথবাবু বললেন,—কী হলো? থামলি কেন?

পা দুটির অবস্থান-ভঙ্গি সেই ভাবেই রেখে গৌরী আলগোছে শুয়ে পড়লো। বললে,—বাইরে একবার গিয়ে দেখ। দস্তুরমতো হাট বসে গেছে।

ভবনাথবাবু খুশি হয়ে বললেন —বেশ তো, সব্বাইকে শুনিয়ে দে না ডেকে এনে। বলে তিনি নিজেই বাইরে এলেন। তাঁকে দেখে ভিড়টা নিমেষে ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেলো।

গৌরী হেসে জিগগেস করলে—কী, ওদের নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে আনলে না?

বিরক্তমুখে ভবনাথবাবু বললেন,—এই যে একটু কী শুনে গেলো না, অমনি সারা গাঁয়ে হাজার-রকম অপবাদ রটাতে থাকবে! দীনবন্ধু মুখুজ্জের স্ত্রী ছিলো না ঐ দলে? বুঝলে অতুল, যতো সব কুৎসিত কথা আর নোংরা ইতরামো। সাধে কি আমি আর গৌরীকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি? ওরা কেবল বয়সই বাড়তে দেখে—বিদ্যেবুদ্ধির কাণাকড়িরও ধার ধারে না। ওদের তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—কিন্তু একেকটি যেন বদ্ধ দুর্গন্ধ পাতকো—যতো সব কুৎসিত কুসংস্কারের কৃমি চারদিকে কেবল কিলবিল করছে! মেয়েরা না জাগলে যে দেশ জাগে না এ ওদের শেখায় কে!

গৌরী সারা শরীরে লাবণ্যের একটা ঘূর্ণি দিয়ে উঠে পড়লো। বললে,—বেলা পড়ে আসছে। আরেকটু পরেই আমরা বেরুবো, অতুল-দা। সেই নিমাই-চণ্ডীর বিল পর্য্যন্ত, কেমন?

শিশুর মতো ভবনাথবাবুও লাফিয়ে উঠলেন: আমিও যাবো তোদের সঙ্গে।

গৌরী বললে,—তুমি অতোদূর হাঁটতে পারবে নাকি?

মুখ গম্ভীর করে ভবনাথবাবু বললেন,—কিন্তু তোদের একসঙ্গে বেড়াতে দেখলে অনেক কথা উঠবে।

—ইস্! নাকের পাশটা ঈষৎ কুঞ্চিত করে গৌরী বললে—উঠুক না! আমি যেন ওদের কথা কতো কেয়ার করি! তুমি একটু বোস অতুল-দা, মাকে বলে তোমাকে এবার আম কেটে দিচ্ছি। এমন মিষ্টি আম খাওনি কখনো। এখুনি বেরিয়ে পড়া ভালো। অন্ধকারের আগেই আমাদের ফিরতে হবে। নিমাই-চণ্ডীর বিল তো আর একটুখানি রাস্তা নয়।

চার

বেরোতে-বেরোতে বিকেল হয়ে গেলো। তাই অন্ধকারের আগে বাড়ি ফেরা আর সম্ভব নয় বলে নিমাইচণ্ডীর বিল পর্য্যন্ত আজ যাওয়া হলো না। সামনের মাঠেই একটু বেড়িয়ে আসবে চলো।

হ্যাঁ, সামনের মাঠটুকুই ভালো। নিমাইচণ্ডীর বিলে যেতে হলে যাওয়াটাই সেখানে মুখ্য হত, সান্নিধ্যের স্বাদ হতো অসার। শরীরে তখন অকারণ ক্ষিপ্রতা, কতক্ষণে ফিরবে তার জন্যে ক্লান্তিকর উদ্বেগ, মুহূর্তগুলি তখন অতিমাত্রায় প্রখর, বেগবান,—কোথাও এতোটুকু বিশ্রাম থাকতো না। তার চেয়ে এই মাঠ অনেক ঠাণ্ডা, মুহূর্তগুলি মন্থর, সমস্ত আকাশটি অতি পরিচিত, সহজ ও সাধারণ। চোখের সামনেই বাড়ি—অন্ধকার একটু ঘন হয়ে এলেও তাড়াতাড়ি ফেরবার জন্যে কোনো তাড়া নেই।

অতুল বললে,—কলকাতা তোমার কেমন লাগে?

দুই চোখ বড়ো করে গৌরী বললে,—চমৎকার! ওকে দু'দিন ছেড়ে থাকলেই ওর জন্যে মন পুড়তে থাকে। আমি তো বেশি দিন এখানে টিঁকতেই পারবো না।

—নিজের জন্মভূমি তোমার ভালো লাগে না?

খিলখিল করে হেসে গৌরী বললে,—সামান্য একটুকরো মাটির জন্যে অমন জলো কবিত্ব আমার আসে না। পরীক্ষায় রচনা লিখতে দিলে কলমের ডগায় অনায়াসে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারবো, কিন্তু জীবনে কখনো তাকে আঁকড়ে থাকতে পারবো না।

শুকনো গলায় অতুল বললে,—যেখানে তুমি জন্মালে, শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে দিলে, যে তোমাকে রোদে-ছায়ায় বড় করল, তার জন্যে তোমার মায়া হয় না?

—নিজের জীবনের জন্যে মায়াই তো সব চেয়ে আগে হওয়া উচিত। শৈশব-কৈশোর কেটেছে, কেননা তার বিরুদ্ধে কোনো উপায় ছিলো না। শৈশবটা চিরকালই অসহায়, পরের উপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু যৌবন থেকেই সত্যিকারের শুরু, তখন জীবনে একবার এড়িয়ে চলবার চেতনা জাগলে আর পিছু হটতে ইচ্ছে করে না। জন্মভূমি তো আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বৃদ্ধির পক্ষে একটা বাধা, অতুল-দা।

অতুল ম্লান হয়ে গেলো। অনেক কষ্টে কথা পেয়ে বললে,—কলকাতা তোমার এতো ভাল লাগে?

—নিশ্চয়! তার ব্যস্ততায় মনের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য জাগে—এগিয়ে যাবার, বড়ো হবার, নিজেকে বিস্তারিত করবার। অনেক লোকের জনতায় নিজেকে সকলের উপরে প্রসারিত করবার জন্যে জীবনে প্রবল একটা প্রেরণা আসে। দৃষ্টি বড় হয়ে যায়, নিজের মাঝে যে কতোখানি শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা লুকানো আছে তা হঠাৎ আবিষ্কার করতে পারি।

অতুল যেন সহসা কোথাও দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে পেল না। নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললে,—আর এই গ্রাম তোমার কাছে এমন কী অপরাধ করলো?

—গ্রাম? গৌরী সতেজ ঘৃণার সঙ্গে বললে,—যতো সব পুরোনো কথার জঞ্জালে পচন ধরেছে। এখানে থাকা মানেই একশো বছর পিছিয়ে যাওয়া। ভাগ্যগুণে যে-কালে পৃথিবীতে এসে জন্মেছি, গ্রামে থাকলে সে কালকেও চিনতে পেতাম না। স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আমাদের এই অবতরণের মাহাত্ম্যই যেতো ব্যর্থ হয়ে।

কথোপকথনকে তরল করবার চেষ্টায় অতুল হেসে বললে,—যাই বলো, তোমার কলকাতায় এমন হাওয়া নেই। খালি ইট আর কাঠ, ধুলো আর ধোঁয়া।

—নাই থাক হাওয়া! স্পীড আছে। দিকে-দিকে গতির ঝড়, সামনে এগিয়ে-চলার প্রাবল্য। দেখতে-দেখতে সমস্ত শরীরে, সেই যাত্রার ছন্দ বেজে ওঠে, অতুল-দা। কলকাতা কি—একদিন আমি ইউরোপ যাবো—সেই বিরাট কর্ম ও চেতনার মহাদেশে। আমার কতো যে করবার আছে, কী যে হতে পারি আমি—কলকাতা আমার অন্ধ চোখে দৃষ্টি এনে দিয়েছে। জীবনে কতো আশা—কত স্বপ্ন, কতো নবীনের সম্ভাবনা!

বলতে বলতে গৌরী আকাশের প্রথম তারাটির মতো আনন্দে ও উজ্জ্বলতায় মৃদু-মৃদু কাঁপতে লাগলো।

মুহূর্তে অতুলের মনে হলো গৌরী যেন তার থেকে কতো দূরে চলে গিয়েছে। হাতের নাগালের মধ্যে তার শরীরের উপস্থিতিটা মাত্র, কিন্তু আসলে সে ঐ তারাটির মতোই দূর—বৃহৎ অপরিচয়ের আকাশে তার অমনি নির্জন নিষ্ঠুর দীপ্তি। আর সে এই পুরোনো অচল স্থবির মাটি—তার কাছে ঐ তারা অনাবিষ্কৃত, রহস্যাবৃত। গৌরীকে সে চেনে না। গৌরী যেন বিদেশিনী।

—আর ধরো না তোমাদের এই গ্রাম! গৌরী অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলো: বড়ো হলে তাকে ধরে-বেঁধে একটা বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর তার কোন গতি করতে পারে না। এখানে এসে পা ফেলতে না ফেলতেই মা ধুয়ো ধরেছেন আমাকে যত শিগগির সম্ভব কোথাও না কোথাও চালান করে দিতেই হবে। তারপর দুপুরে যখন বাড়ি জাঁকিয়ে হিতৈষিণীদের বক্তৃতা সুরু হলো তখন আর আমার রক্ষে নেই।

অতুল যেন কোন দূর দেশের বাসিন্দে এমনি বিবর্ণ স্বরে বললে,—ধরে-বেঁধে কেন, নিজের ইচ্ছেতেই মনমতো কাউকে বিয়ে করলেই হয়!

গৌরীর দু' চোখের দৃষ্টি সহসা ধারালো হয়ে উঠলো: তুমিও এ-কথা বলছ? তুমিও ওদের দলে?

অতুল কী বলবে কিছু ভেবে পেল না। দূরে-দূরে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলো।

—বিয়ে যদি করতে হয়, নিজের ইচ্ছেতেই করবো বৈ কি। সে সম্বন্ধে সন্দেহ কী! কিন্তু জীবনের সমস্ত মূল্য ঐ ওটার ওপরেই চাপিয়ে দিতে হবে এ আমার কাছে অত্যন্ত অপমানের বলে মনে হয়। প্রায় অসহ্য উৎপীড়ন। কতো কাজ এখনো পড়ে আছে।

—কাজ, তোমার আবার কাজ কী!

—কেন মেয়ে হয়েছি বলে কি আমি কাজের বার হয়ে গেছি? প্রায় ফণা তুলল গৌরী।

—না, তা কেন হবে? হাসবার চেষ্টা করে অতুল। বললে,—মেয়েদের আসল যে কাজ, ঘরে আর সংসারে, তাই সম্পন্ন করবে।

—বাজে কথা। ঠোঁট উলটোলো গৌরী: মেয়েদের কাজ শুধু রান্না আর আঁতুড় ঘরেই নয়, বাইরে, বৃহত্তর বিশ্বে। কাজ, শুধু কাজের মধ্য দিয়েই বাঁচবার ডাক আজ চারদিকে।

অতুল বললে,—কাজের তো অন্ত নেই, তাই বলে বিয়েটাও কি একটা মহৎ কাজ নয়? না কি ওটা তোমার শাড়ি-পরা বা চুলবাঁধার ধরনের মতোই একটা সস্তা ফ্যাসান! সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীতে যতো লোক বড়ো কাজ করেছে সবাই বিবাহিত।

গৌরী হেসে বললে—বেশ তো করা যাবে বিয়ে, কিন্তু এখুনি এতো ব্যস্ত হবার কী হয়েছে? আগে শান্ত হই, জীবনের স্বপ্ন একবার ভাঙুক—কী বলো?

—লোকে বুঝি শ্রান্ত হলেই বিয়ে করে? অতুলের গলায় বুঝি একটু বিষাদের ছোঁয়া লাগল: বিয়ের মধ্যে বুঝি কোন শান্তি নেই, স্বপ্ন নেই, আশা নেই?

লঘু হবার চেষ্টা করল গৌরী: কী করে বলব? তুমিও করোনি। আমিও করিনি। স্বপ্ন আছে, না স্বপ্নভঙ্গ আছে কে জানে।

হঠাৎ যেন কথা ফুরিয়ে গেল। দু'জনে কয়েক পা হাঁটল নীরবে। নিরুদ্দেশের মত।

অতুল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললে—ব্যাপার হচ্ছে এই, গৌরী, এখনো তোমার জীবনে সেই পুরুষের আবির্ভাব হয় নি। হলে এমনি আর উদাসীন থাকতে পারতে না।

কথাটা গাঢ় একটা স্পর্শের মতো গৌরীকে আচ্ছন্ন করে ধরলো। বিহ্বল

চোখে সে অতুলের মুখের দিকে তাকালো—অন্ধকারে তাতে কথার শেষাভাসের কোনো পরিচয় পাওয়া গেলো না। সহজ গলায় সে বললে—আমি অতোশতো বুঝি না, অতুলদা। আপাততো বিয়ে করার কোনো দুর্বলতাই আমার নেই। বি-এ টা পাশ করে যে করে হোক ইউরোপটা একবার ঘুরে আসবো—এখন এই স্বপ্নই আমাকে রঙিন করে রেখেছে। চলো, এবার ফিরি।

—এখুনি ফিরবে?

—নইলে কোথায় আর যাব অন্ধকারে?

—অন্ধকার? এখুনি অন্ধকার কোথায়? অতুলের মনে হল সে-অন্ধকার বুঝি সে নিজে। পরিচিতিহীন প্রতিশ্রুতিহীন—আদ্যোপান্ত নিরর্থক।

দু' জনে ফিরলো।

তবু গৌরী এখুনি বিয়ে করবে না, এখুনি পর হয়ে যাবে না, এই একটি মাত্র উচ্চারণে যেন সে আবার সন্নিহিত হল, অন্তরঙ্গ হল। অতুল জিগগেস করল,—ইউরোপ থেকে আবার ফিরে আসবে তো?

খিলখিল করে হেসে উঠলো গৌরী। বললে,—ফিরে আসব বৈকি। আমার পুরুষ তো বিদেশে নয়, আমার পুরুষ এদেশে।

—হ্যাঁ, তখন তাকে ঠিক-ঠিক চিনতে পারো তা হলেই হয়। কোনো মানে হয় না, তবু অতুল বললে সাহস করে।

গৌরী বললে,—আর তেমন পুরুষের আবির্ভাব যদি সত্যিই হয়, আগে কিংবা পরে, আমার চিনতে এতটুকুও দেরি হবে না।

এখনো হয়নি। পরে হবে। এখনো সূর্যকে ঘিরে রয়েছে কুয়াশা, সহসা তা অপসৃত হবে, দেখা দেবে জ্যোতির্ময়।

হাওয়ায় চুল-আঁচল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সমুখে-পিছনে অন্ধকার। দূরে গৌরীদের বাড়ির আলো মিটিমিটি দেখা যাচ্ছে। না, লণ্ঠন হাতে নিয়ে ভবনাথবাবু নিজেই খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন।

ভবনাথবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন,—কী যে তোদের কাণ্ড! রাত হয়ে গেলো, এখনো ফিরছিস না?

গৌরী বললে,—বা, কতটুকু আমরা বেড়ালুম। তাকাল অতুলের দিকে: কোথাও আমরা একটু বসলাম না পর্যন্ত। আর কী এমন রাত হয়েছে শুনি!

ভবনাথবাবু বললেন,—তা কী আর হয়েছে! খেয়ে-দেয়ে সবার কি না এখন এক ঘুম হয়ে গেলো।

—এখুনি? এরি মধ্যে?

—তা ছাড়া আবার কী! খাওয়া আর ঘুমোনো ছাড়া এখানে কোন্ কাজটা আছে শুনি?

গৌরী মজা পেয়ে বললে,—শুনলে অতুলদা, করবার কিছু আর কাজ নেই। দিব্যি গোল একটি খাওয়া আর লম্বা একটি ঘুম! একেবারে কাল সকাল। এমন সময় কলকাতায় আমরা হস্টেলের মেয়েরা মিলে দোতলা বাস-এ খোলা উপরতলায় বসে হাওয়া খেতে বেরুই।

অতুল অন্য রাস্তা নিলে। না, গৌরীর তেমন কিছু অসাধারণ পরিবর্তন হয় নি। খালি আর তেমনি শীর্ণ, অপরিপূর্ণ নেই। অবয়বে ছন্দোময় একটি তরঙ্গ এসেছে। তাতে প্রত্যেকটি রেখা উচ্চারিত, উচ্চকিত। কোনো দম্ভ নেই। দুরত্ব নেই। সেই গৌরী। একমাত্র পরিবর্তন এই যে সে তার জীবনে পরম পুরুষের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছে। সে পুরুষ কে, কোথায়? কবে? কতো তার রূপ, কতো তার খ্যাতি, কতো তার ঐশ্বর্য্য! তাকে সে কিসে চিনবে, কোন্ পরিচয়ে? সে কি প্রেম, না আর-কিছু?

যদি সে প্রেম হয় তা কি করে বোঝানো যায়, কি দিয়ে? শক্তি দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, উৎসর্গ দিয়ে? শুধু তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে বুকে নিয়ে, বুকে না নিয়েও, মরে যেতে পারি, ডুবে যেতে পারি অতলে, এই বললেই চলবে? এই বললেই যথেষ্ট হবে?

পাঁচ

কলকাতার বন্ধুরা শীতল পানীয় চায়। কাল অনেক রাত পর্যন্ত তিক্ত, বিস্বাদ, ঝাঁঝালো পানীয়ের তরল আগুনে জলে একটু জুড়োতে চায় সবাই। চাকর বললে, ভবনাথবাবুদের বাগানে বিস্তর কচি ডাব, অনুমতি পেলে সে পেড়ে দিতে পারে। বন্ধুরা সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

অনঙ্গ বললে,—দাঁড়া আমি যাচ্ছি।

অনঙ্গেরো জীবনের সমস্যা অবকাশরঞ্জনের সমস্যা। অর্থোপার্জনের জন্য তার বংশধর শ্রম করবে, তার পালা হচ্ছে অমিতব্যয়িতার। বিশেষ একটি নারীর জন্যে বিলাসী হয়ে ওঠার মধ্যে এই অমিতব্যয়িতার ঐশ্বর্য নেই। নিতান্তই তা নিজেকে জীবনে কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত করে আনা। তাই তার মাঝে একপত্নিত্বের আদর্শ নেই, আছে বহুচারিতার অদম্য স্পৃহা। গ্রামে নতুন

বাড়ি তুলে অবকাশযাপনের মাঝে তার অবান্তর কোনো কবিত্ব ছিলো না, ছিলো নিতান্ত রূঢ় বৈচিত্র্যের আস্বাদ, নতুনতরো পারিপার্শ্বিকতার মোহ, একটি বা গ্রামীণ লাবণ্যের প্রতি লালসা।

অনঙ্গ তাড়াতাড়ি সাজগোজ সমাধা করলে। সঙ্গে কোনো লোক নিলো না। পিছনে খালি চাকর। চণ্ডীতলা বেশি দূরে নয়,। ভবনাথবাবুর বাড়ি সে চেনে।

বেলা পড়ি-পড়ি করছে— মাঠ জুড়ে গাছগুলির অবসন্ন দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ায় শুকনো পাতার স্তূপের ওপর কে একটি মেয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে কোলের ওপর কনুই ও করতলের ওপর গাল রেখে চোখ নামিয়ে কি-একটা বই পড়ছে। পিঠ ছেয়ে ঝুরো-ঝুরো চুল নেমে গেছে সাপের মতো, আঁচলটা কাঁধের থেকে খসে পড়ে কোলের ওপর এলোমেলো।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত অনঙ্গর সির্ সির্ করে উঠলো। একেবারে প্রত্যক্ষের মতো তার কাছে এসে বললে,—এটা বুঝি ভবনাথবাবুর বাড়ি?

মাথার সামনে এমন লম্বা-চওড়া প্রকাণ্ড একটা জোয়ান লোক দেখে গৌরী প্রথমটা আঁতকে উঠলো। একেবারে এতো কাছে এগিয়ে এসেছে—অপরিচিতের পক্ষে যেটুকু দূরত্ব রাখা শোভন তাও পর্যন্ত অতিক্রম করে এসেছে। তবু সামান্য বিচলিত না হয়ে সেই অবস্থায় বসে থেকেই গৌরী রুক্ষ, বিরক্ত মুখে বললে,—কেন, কী দরকার?

অনঙ্গর স্বভাবে দেরি সয় না কোনো কালে, তার মাঝে অনিবার্য ও নির্ভীক স্পষ্টতা আছে। বিনিয়ে বা ঘুরিয়ে বলা তার ধাতে নেই। যা কিছু করো বলো, মুখের ওপর, সোজাসুজি। হয় হবে, নয় হবে না। ফন্দি ফাঁদবার জন্যে স্নায়ুর ওপর অযথা অত্যাচার নেই, ব্যর্থ হয়ে অনর্থক অনুতাপ করবার সময় হয় না। প্রশান্ত মুখে হেসে বললে,—আর তুমিই বুঝি তার মেয়ে?'

গৌরী রীতিমত অপমান বোধ করলো, উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধমুখে বললে,—তা দিয়ে আপনার কী হবে? আপনার কী চাই তাই বলুন।

তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে অনঙ্গ বললে—তোমাদের বাগান থেকে কতোগুলো ডাব পাড়তে চাই।

কী রকম বন্য শোনাল! অনঙ্গর মুখের দিকে চেয়ে গৌরী বললে,—আমাদের বাগানে ডাব কই? নেই ডাব।

অনঙ্গ হেসে বললে,—ডাব নেই, না তোমার মাথা নেই? হাতের লাঠি উচিয়ে নারকেল-গাছের মাথাগুলি দেখিয়ে সে বললে— ওগুলো কী?

আশ্চর্য নির্লজ্জ লোকটা। গৌরীও কঠিন হল। বললে,—ওগুলো যাই হোক, পাড়তে দেবার মত ডাব নয়। বলে সে বাড়ির দিকে রওনা হবার ভঙ্গি করল।

এক পা বুঝি আরো এগুলো অনঙ্গ। বললে,—তুমি বলতে চাও ওদের মধ্যে এখনো জল হয়নি, না, ওরা পেকে ঝুনো হয়ে গেছে? কী, পেড়ে এনে দেখাবো অবস্থাটা?

—না, যাকে-তাকে পাড়তে দিই না আমরা।

—তোমার কথায় নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। তোমার বাবাকে ডেকে আনো। বাড়িতে গণ্যমান্য অভিভাবক থাকতে সামান্য মেয়ের কথা মাথা পেতে নিতে পারবো না। যাও, আমার চাকর দাঁড়িয়ে আছে, বেশি সময় নেই।

অসহ্য,—এই নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য দেখে গৌরীর আপাদমস্তক জ্বলে যেতে লাগলো। দু'পা যেতে-যেতে সে আবার ফিরলো। রুক্ষ কটাক্ষ হেনে বললে—আমার কথাই কথা। দেব না পাড়তে। কী করতে পারেন।

কঠিন কণ্ঠে অনঙ্গ বললে,—জোর করে পেড়ে নিতে হবে তাহলে।

—জোর করে?

—তা ছাড়া উপায় কী! আরো অনেক কিছুই করতে পারি—সে-জন্য কিছু ভেবো না। লুঠ-তরাজ দাঙ্গা-লড়াই মামলা-মোকদ্দমা কোনটাতেই আমি পেছপা নই। ভালোয়-ভালোয় গাছ ছেড়ে দিলেই সুবিধে, কেন মিছিমিছি উৎপাত সইতে যাবে?

ভবনাথবাবুকে আর ডাকতে যেতে হলো না। নিজেই তিনি এসে পড়েছেন। অনঙ্গকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে আনন্দে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেন—এই যে, অনঙ্গবাবু যে। কতোদিন আপনার কাছে যাবো-যাবো করছি, আর হয়ে উঠছে না কোনোরকমে। আশ্চর্য—কী মনে করে? আসুন, আসুন, বসবেন আসুন।

অনঙ্গ বললে,—কিছু ডাব নিতে এসেছিলাম। বন্ধুদের ভারি ডাব খেতে ইচ্ছে গেছে।

—স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে। যতো আপনার খুশি। রাজ্যের হয়ে আছে গাছ ভরে। যে পারছে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। লোক লাগিয়ে দেব নাকি?

গৌরীর দিকে চেয়ে অনঙ্গ মুচকে হেসে বললে,—না, সঙ্গে আমি চাকর নিয়ে এসেছি। এই কালাচাঁদ, গাছে ওঠ। কি রে, পারবি তো উঠতে?

—যতো আপনার খুশি। ভবনাথবাবু শতমুখে বলতে লাগলেন: গাড়ি

বোঝাই করে নিয়ে যান না। আমার গৌরী তো কলকাতা থেকে কি-এক চা খাওয়া শিখে এসেছে—ডাব ফাব আর মুখেই তোলে না। হ্যাঁ, এই আমার মেয়ে, গেলো বছর ম্যাট্রিক পাস করেছে—প্রাইভেট দেওয়ার দরুন মেয়েদের মধ্যে থার্ড হয়েও জলপানি পেলো না। কী আপনাদের ইউনিভার্সিটির যাচ্ছেতাই সব নিয়ম। আসুন, আসুন, ভেতরে বসবেন চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কী!

—না, বসব না। ঊর্ধ্বমুখে গাছের দিকে তাকিয়ে রইল অনঙ্গ।

—না, না, বসবেন আসুন। গৌরী চমৎকার এস্রাজ বাজাতে পারে, তাই আপনাকে একটু শোনাবে এখন।

—না। কখনো না। দৃপ্ত কঠিন কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে গৌরী বাড়ির দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ভবনাথবাবু বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

রিস্ট-ওয়াচের দিকে তাকিয়ে অনঙ্গ বললে,—আজকে আমার সময় নেই। বন্ধুদের নিয়ে ইনামগঞ্জের হাটে যাবার কথা আছে। আরেকদিন এসে আপনার মেয়ের বাজনা শুনে যাবো। যদি অবশ্যি শোনায়।

অনুনয়ের সুরে ভবনাথবাবু বললেন—ঠিক আসবেন কিন্তু।

—বা, আপনি এত করে বলছেন!

—আজই আসুন না কেন। গৌরী অমনি সবতাতেই না বলে। একটু দেখবেন একবার, কী রকম বাজায়। বাপ হয়ে মেয়ের প্রশংসা করতে নেই, অনঙ্গবাবু। আর, এখন ইনামগঞ্জে গিয়েই বা লাভ কী! হাট তো ভেঙে গেছে।

—ভাঙা হাটেই বন্ধুরা সদলবলে যাবে বলে বায়না ধরেছে। ডাক বাংলোয় খবর গেছে—গাড়িও তৈরি। আমিও এবার যাই, আর একদিন আসবো।

ভবনাথবাবু বললেন,—কিন্তু আজকে এলেই যে ভালো ছিলো, অনঙ্গবাবু। গৌরী ঠিক বাজাবে। আপনার বন্ধুরা যান না, আপনি যখন গরিবের ঘরে ভুল করে একবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন দয়া করে একটু বসে যান। আমি আপনাকে বলছি ইনামগঞ্জে কিছুই নেই। খালি জঙ্গল আর মশা।

অনঙ্গ হেসে বললে,—তবু সেখানেই আমাদের আজ যেতে হবে। জায়গাটাই উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে যাওয়াটা। আমি না গেলে ওদের সব ফুর্তিই পণ্ড হয়ে যাবে। আমাকে ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। বেশ তো, আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, খবর দিয়ে আরেক দিন আসা যাবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দয়া করে আগে থেকে একটু খবর দিয়ে আসবেন। বিনীতমুখে কয়েক পা এগিয়ে দিলেন ভবনাথবাবু।

অথচ বাংলোয় ফিরে অনঙ্গ অনায়াসেই বন্ধুদের এড়াতে পারলো। বললো, তার শরীর ভালো নেই, ভয়ানক মাথা ধরেছে। আলো নিভিয়ে বাইরের বারান্দায় খানিকক্ষণ সে জিরোতে চায়।

কথা শুনে বন্ধুরা তো অবাক। কাঠের বাক্সে প্যাক্-করা হুইস্কির বোতল, গোটা ছয় আস্ত মুরগি, চিনেবাদাম আর পাঁপর—আর সেখানে ডাক-বাংলোর বেয়ারার জিম্মায় গোটা তিন-চার গেঁয়ো শিকার। সমস্ত রাত ভরে আজ প্রচণ্ড তাণ্ডব। সন্ধ্যার মুখেই অনঙ্গ হঠাৎ কালিয়ে গেলো দেখে সবার মুখ ম্লান হয়ে গেলো। অথচ শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ন্যাকামি করবার ছেলে তো সে নয়।

সুরেন তার কপালে হাত রেখে বললো,— সে-কী জ্বর এসে গেলো নাকি?

প্রমোদ বললে,—ও কিছু নয়। একটুখানি পেটে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে অনঙ্গ বললে,—না, শরীরটা বেসুর হয়ে গিয়েছে। যে-কোনো সময়ে জ্বর এসে যেতে পারে। তোরা সবাই যা, আমি বাড়িতেই থাকবো।

অনঙ্গর মুখ থেকে কথাটা যখন একবার বেরিয়েছে তখন নড়চড় হবার জো নেই।

সুরেন জিগগেস করলো,— একলা থাকবি?

অনঙ্গ বললে,—দুটো চাকরই তোরা সঙ্গে নিসনি। কালাচাঁদ বাংলোয় থাকুক।

সুরেন ব্যাপারটায় খুশি হলো না। বললে,—তুইই এতো সব জোগাড়-যন্ত্র করলি, শেষকালে কি না তোরই যাওয়া হলো না? ফুর্তি সব মাটি হয়ে যাবে।

অনঙ্গ বললে,—কী আর করা যায় বল? শরীর নিয়েই তো ফুর্তি—সেই, শরীরই যদি বিকল হয়ে পড়ে তবে আর উপায় কী! তা ছাড়া ফুর্তি একবার সুরু হয়ে গেলে—আমি আছি কি নেই—তাতে বিশেষ কিছু এসে যাবে না।

বন্ধুদের নিয়ে বনের পথ দিয়ে গরুর গাড়ি অদৃশ্য হ'লো। ছোট বাংলো-খানিতে এখন চমৎকার নির্জনতা। এই একলা থাকবার আরামটুকু অনঙ্গর এখন ভারি ভালো লাগছে। কোনো দিন এমন থাকেনি বুঝি একলা।

অনঙ্গ ডাকলে: কালাচাঁদ।

কালাচাঁদ এক ডাকে হাজির।

অনঙ্গ বললে,—আমার তক্তপোশের নিচে একটা বোতল আছে। ওটা নিয়ে আয়। তার আগে দৌড়ে স্টেশন থেকে সোডা নিয়ে আয় দুটো। ওমার টেবলের ওপর থেকে আমার সিগারেটের টিনটা এনে দে।

খুচরো আদেশগুলো পালন করে কালাচাঁদ স্টেশনের দিকে ছুটলো।

এখন আরো একলা। এই নিঃসঙ্গতার অর্থটা গভীরতরো করবার জন্যে বাড়িময় অন্ধকার। আকাশে তারা ছাড়া কোথাও এতোটুকু আলোর ছিটে নেই। দূরে-দূরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। স্টেশনে মালগাড়ির একটা এঞ্জিন বোধহয় অনর্গল ধোঁয়া ছাড়ছে। তারই যা একটু শব্দ।

অনঙ্গ একটা সিগারেট ধরালো। সামনের টিপয়টার ওপর পা দুটো লম্বা করে তুলে দিলে।

চমৎকার মেয়ে এই গৌরী। তাকে অনঙ্গর চাই। রূপ নিয়ে মনে-মনে ধ্যান করবার তার সময় নেই, আঙুরগুলি টক বলে নিশ্চেষ্ট পরাজয়ের মাঝে কোনো মোহ নেই। অতি সহজেই সে সরল স্থূল সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে জানে। তাকে তার চাই। আদ্যোপান্ত চাই। অনঙ্গ টিপয় থেকে পা নামিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে সোজা হয়ে বসলো।

কিন্তু এই চাওয়াটার মধ্যে কেমন যেন একটা নতুন রকমের আবেশ আছে। এর আগে অনেক নারীকে সে কামনা করেছে, কিন্তু সে-কামনায় এমন অপরূপ স্নিগ্ধতা ছিল না। তার মাঝে ভোগের একটা অমিতাচার ছিলো, আপনাকে অপব্যয়িত করবার একটা অন্ধ উত্তেজনা ছিলো—কিন্তু এই কামনায় যেন কি এক অনিঃশেষিত সুষমা আছে। হাতে যেন তার তবু অনেক কিছু থেকে যাবে, নিজেকে কিছুতেই সে ফুরিয়ে ফেলবে না। প্রচুরের ঘরে তবু থেকে যাবে উদ্বৃত্ত।

হ্যাঁ, এক রাত্রির চাওয়া নয়, জীবনের সমস্ত দিন-রাত্রির চাওয়া। দাসী করে চাওয়া নয়, রাণী করে চাওয়া।

ভবনাথবাবুর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে সে পাঠাবে নাকি কাউকে? অনঙ্গ চেয়ারের মধ্যে নড়ে-চড়ে উঠলো। শূন্য উদাস, সাদা চোখে এ তার কেমন নেশা ধরে গেলো আজ? অবশেষে সে বিয়ে করতে চায়?

আজ তার সত্যিই কোনো অসুখ করলো নাকি?

হ্যাঁ অবশেষে বিয়েই সে করবে। তাছাড়া বুঝি পূর্ণ করে পাবার নয়। ঝোড়ো আকাশে আর সে পাখা চালাতে পারে না—এবার সে মাটিতে নেমে

আসতে চায়। তার চরিত্র বাঁচাবার জন্যে মা তো কতো দিন ধরেই পাত্রী খুজে ফিরছেন—দু' একজনকে অনঙ্গ স্বচক্ষে দেখেওছে। সবাই তারা রূপসী বটে, কিন্তু বোতলে রঙিন মদের মতোই তাদের রূপ—খানিকটা জ্বালা, এবং পরবর্তী মুহূর্তের অবশ্যম্ভাবী অবসাদেই তাদের অবসান! কিন্তু গৌরী যেন আগাগোড়া একটা ইসারা, কোথাও যেন তার শেষ নেই—ইতির রেখা টানা নেই—তার আগে কোনো মেয়েকে সে এমন অর্থে আর দেখেনি কোনোদিন।

বিয়েই না হয় সে করলো। একদিন করতে তো তাকে হতোই। চরিত্র বাঁচাবার জন্যে অবিশ্যি নয়, কামনায় ছন্দ আনতে, স্বাস্থ্যে আনতে লাবণ্য। কেননা অনঙ্গর বিশ্বাস তার চরিত্রে কোথাও এতোটুকু মর্চে পড়ে নি। বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে অনর্গল ওজস্বী ভাষা প্রয়োগ না করে বা মাসিকে সাপ্তাহিকে অনর্গল লেখনী চালনা না করে সে একটু বেশি মদ খায় বা ধোঁয়া ছাড়ে—সেটা তার জীবনের পক্ষে সামান্য একটা ঘটনা মাত্র। দেহে তার সবল স্বাস্থ্য, জীবনে তার কঠোর ভঙ্গি। কোথাও কোনোদিন সে এতোটুকু দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দেয় নি—এইখানেই তো তার চরিত্রের গরিমা। সে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রেমনিষ্ঠ হতে পারবে। যে-সব নারী তার বাহুর বন্ধনে আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের সেই আত্মদানের মর্য্যাদা না রাখলে তারা অন্যত্র বন্দিনী হত। তাদের বিমুখ করলেই সেটা কিছু কৃতিত্বের হতো না। সুযোগ হাতে এলে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত—এটাই চরিত্রের খাঁটি নিরিখ।

সে-সব কথা আগের কথা। অনঙ্গ সারা জীবন ধরে নিয়মের অনুবর্তী—বিজ্ঞানই তার বিবেক। সে কামনার দাসত্ব করে জীবনকে জীর্ণ করে নি—কামনাই ছিলো তার ক্রীতদাস। তাই আজো অনঙ্গ এই নিয়মকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। চায় একটি স্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ ছন্দানুবর্তিতা। জীবনের রঙ্গমঞ্চে পটান্তরের রোমাঞ্চ চাই। এই পরিবর্তনটি অত্যন্ত শান্ত ও এই অন্ধকারমথিত গ্রাম্য আকাশটির মতো শীতল।

মাত্র চোখ দেখেই এতো সব কথা অনঙ্গ সরাসরি ঠিক করে ফেললো নাকি? যদি এক পলকে না চেনা যায়, সহস্র চক্ষেও চেনা যাবে না। হ্যাঁ, এইবার সে বিয়ে করবে। অপরিচয়ের কুয়াশা সরিয়ে সুমধুর অন্তরঙ্গতার আবির্ভাবের মধ্যে কী যে জাদু আছে তা তার জানা চাই। এক রাত্রিতেই অপরিচ্ছন্ন ব্যস্ততার মধ্যে তাকে নিঃশেষ করবার পালা নয়, ধীরে ধীরে জয় করবার ও বশীভূত হবার অপর্যাপ্ত সময় তার হাতে। সে সত্যই এবার বিশ্রাম চায়।

সে তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে শুনে ভবনাথবাবু আনন্দে পাগল হয়ে

যাবেন। তার মতো পাত্র বাংলা দেশে কটা আছে? রূপ বিদ্যা অর্থ ছেড়ে দাও—তবু তার মতো পাত্র! এতো দুর্নিবার প্রেম আর কোথায় মিলবে—জীবনের অপরিহার্য দুঃখ ও ব্যর্থতার সম্মুখে এমন বলদৃপ্ত বাহু! তার নিজের ওপর এই কঠোর বিশ্বাস, অবস্থার ওপর জয়ী হবার এই নিদারুণ সঙ্কল্প। এত বড়ো চরিত্রের সত্যিকারের পরিমাপের জন্যে নতুন নিয়মকানুন চাই। নতুন পদ্ধতি। অনঙ্গ টিপয়ে একটা চড় মেরে নিজের মনে হেসে উঠলো।

কিন্তু বিয়ে যদি করতেই হয় অমনি চালচুলোহীন সাধারণ মেয়েকে কেন, ঢের-ঢের মেয়ে তো পড়ে আছে—রূপের সঙ্গে যাদের দাম্ভিকতা আছে, টাকার সঙ্গে যাদের কুলমর্যাদা। নাচার অনঙ্গর আলাদা রুচি—সে নারী চায় না, চায় ব্যক্তি। আর রূপ যদি বলো, তা তবে এই আত্মচেতনার ঔদ্ধত্যে, অবিনয়ে; অপ্রতিবাদ আত্মবিতরণে নয়। অনঙ্গ অসহায়, উন্মুখ মনকে সে প্রতীক্ষায় জীর্ণ করতে পারে না—হাতের কাছে যা এসে পড়লো মুঠো মেলে তখুনি তা আয়ত্ত করাই তার অভ্যাস। তা ছাড়া, গৌরীকেই যদি তার ভালো লেগে থাকে সেজন্যে গৌরীকেই দোষ দেওয়া ভালো। অনঙ্গর কী দোষ!

কালাচাঁদ স্টেশন থেকে সোডা নিয়ে এলো।

গ্লাস তৈরি। অনঙ্গ হেসে তাতে চুমুক দিলে। মুখে নতুন একটা সিগারেট।

যে-গৌরী ঘৃণায় ঠোট কুঁচকে সারা দেহে কর্কশ একটা ভঙ্গি এনে তার সমুখ থেকে চলে গিয়েছিলো সেই আবার একদিন শরীরের রেখাগুলি ওয়াটার কালার-এর তুলির টানের মতো নরম করে তার ঈষৎস্ফুরিত ঠোঁট দু'খানি মুখের কাছে নামিয়ে আনবে—এই স্বপ্ন দেখতে-দেখতে অনঙ্গ গ্লাসে আরেকটা দীর্ঘ চুমুক দিলে।

ছয়

একে-একে অনঙ্গ বন্ধুদের বিদায় দেবার সুবিধা করলে কিন্তু সুরেনকে সে কিছুতেই ছেড়ে দিলো না। সুরেনই তো তার হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। সকলের চেয়ে বিশ্বাসভাজন।

এবং ক্রমে-ক্রমে দু'জনের বন্ধুতা বাহ্যিক ব্যবহার বা মতামতের কৃত্রিম সমতা অতিক্রম করে গভীরতরো অন্তরে সঞ্চারিত হলো।

অনঙ্গ বললে,—সত্যি আমি সিরিয়াস, সুরেন। কথাটা তুমি ভবনাথবাবুর কাছে গিয়ে আজই উত্থাপন করো। নিজে উপযাচক হয়ে যাওয়াটা সামাজিক রীতিতে বাধবে। সেটা ভালো দেখাবে না।

—বেশ দেখাবে।

—না, সস্তা-সস্তা দেখাবে। অন্তরকম মানে হয়ে যাবে। আমার সাধুতাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে না। অনঙ্গ স্বচ্ছ মুখে বললে: বরপক্ষের হয়ে তুমি প্রস্তাবটা নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেই শোভন হবে, সামাজিক হবে।

স্বরেন ঠাট্টা করে বললে,—তুমি যে দেখছি সমাজকে বড্ডো বেশি মানছ হঠাৎ!

—মানবো না? সামাজিক কাণ্ড করতে যাচ্ছি যে। সরল শিশুর মুখে অজস্র হেসে উঠল অনঙ্গ।

মুখ গম্ভীর করে স্বরেন বললে,—পাগলামি করো না, অনু। এ ছেলেখেলা নয়, হেলাফেলা নয়, দস্তুরমতো বিয়ে। জলজ্যান্ত একটা জীবন নিয়ে কারবার।

—হ্যাঁ, জানি জীবন নিয়ে কারবারই তো করতে যাচ্ছি আমি। এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল অনঙ্গ: আমার মূলধনের অভাব কি।

স্বরেন উড়িয়ে দিতে চাইল—ছাই! তুমি কি কোনোদিন কোনো মেয়েকে ভালবাসতে পারবে নাকি?

অনঙ্গ চেয়ারে খাড়া হয়ে উঠে বসলো: না, আমি পারবো কেন? পারবে তোমার ঐ রামা-শ্যামা-আবদুল গণি! তোমাকে একটা কথা বলে রাখি স্বরেন যে জীবনে যতো বেশি ভোগ করে, সেই ততো বেশি ভালোবাসতে পারে। যে বেশি নিতে জানে সেই দিতে পারে বিলিয়ে।

—মিথ্যে কথা। দু'দিন পরেই বেচারি মেয়েটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুমি আর কোথাও ভেসে পড়ো। এ যে-সে নয়, এ স্ত্রী। ধর্মের চোখে আইনের চোখে স্বত্ববতী।

—হ্যাঁ, স্ত্রী। স্বত্ববতী। জুতোর সুখতলা নয় যে ছুঁড়ে ফেলা যায়। আমি আইন পাশ করেছি, সে-কথা তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। ভোগ আর ভালোবাসায় কোথায় যে কতোটুকু তফাৎ সে আমার জানা আছে। নইলে এতো দিন কী ছাই মরীচিকার পিছনে ধাওয়া করলাম বলো।

—দু'দিন পরে এও না মরীচিকা হয়ে যায়! স্বরেন অন্যমনে তাকালো বাইরে: আবার যে মরুভূমি সেই মরুভূমি।

অনঙ্গ বললে,—যাকে জীবনে একবার আঁকড়ে ধরেছি সহজে ছাড়িনি, স্বরেন। ধরো তুমি, ধরো মদ। আমার আসক্তি প্রবল। গৌরীকে যদি পাই আমূল করে অফুরন্ত করেই পাবো। আরো তফাৎ আছে, তোমাকে

ছাড়বার কখন কী ঘটনা হবে জানি না, শরীরে কোনো ব্যাধি ঘটলেই চোখের নিমিষে মদ ছেড়ে দেবো—

—তবেই তো মারাত্মক কথা।

—কিন্তু কথাটা আমার শেষ করতে দাও নি। স্ত্রী এখানে একেবারে একটা নির্জীব পদার্থ নয়—চলমান একটা ব্যক্তি। যাকে বলে আপন স্বত্বে আপন শক্তিতে সমুজ্জ্বল। তার মধ্যে যে অনেক রহস্যের সম্ভাবনা সেটা ভুলে যেয়ো না।

সুরেন হেসে বললে,—তার প্রভাবে অদ্ভুত কিছু তোমার পরিবর্তন হতে পারে বলে আশা রাখো?

—রাখি। তবে সেটা কিসের আশা তা জানিনা। পরের কথা পরে, তুমি আজই গিয়ে কথাটা পেড়ে এসো। মাকে আচমকা খানিকটা খুশি করা যাবে'খন।

ঠোঁট উলটিয়ে সুরেন বললে,—নিদারুণ মাতৃভক্তি।

অনঙ্গ চেয়ারের পিঠে গা ছেড়ে দিয়ে বললে—খুশি আমিই অবিশ্যি হবো। কিন্তু আমি খুশি হলেই মা আর কিছু চাইবেন না পৃথিবীতে।

এবং যদিও সুরেন জানে সবই ক্ষণিকের বর্ণোচ্ছ্বাস তবুও দেখা যাক কী হয়, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, বিকেল বেলা ভবনাথবাবুর কাছে কথাটা সে উত্থাপন করলে।

ভবনাথবাবু একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন,—বলেন কী, আমার এতো ভাগ্য হবে? আপনি ঠাট্টা করছেন না তো?

—না, বিদ্রূপে লাভ কী?

—অনঙ্গবাবু কোথায় গেলেন?

বিনীত হয়ে সুরেন বললে,—আপনাদের মতটা আগে জানতে চায়, তাই আমাকে পাঠিয়েছে, আমি ওর বন্ধু। পরে দিন ঠিক করে দিলে আমরা এসে মেয়ে দেখে যেতে পারব।

ভবনাথবাবু খুশিতে চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বললেন,—আমাদের আবার মত! অনঙ্গ গরিবের ঘরের মেয়ে নেবার জন্যে যদি রাজি হন তাই আমাদের অভাবনীয় সৌভাগ্য। আপনার নামটা তো জানতে পারলাম না।

সুরেন নাম বললে।

ভবনাথবাবু বললেন,—বসুন, কিছু মিষ্টিমুখ করে যান। এমন একটা সুখবর নিয়ে এসেছেন! কিন্তু অনঙ্গবাবুর মার তো কোনো আপত্তি হবে না?

—না, তাঁর আপত্তির কিছু নেই। অনঙ্গ শুধু বিয়ে করলেই বরং তিনি

কৃতার্থ হন। বিয়ের নামেই এতোদিন ও নিদারুণ বিমুখ ছিলো, হঠাৎ আপনার মেয়েকে দেখে মেজাজটা একটু দ্রবীভূত হয়েছে দেখছি। কিন্তু আরেক দিন ভালো করে দেখতে চায় মুখোমুখি। ধরুন না কেন, এই এক-আধটু কথাবার্তা, গান-বাজনা শোনা—বুঝলেন না, আজকালকার ছেলে—আর আমরা বন্ধুরাও আসব ওর সঙ্গে।

—নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! সে আবার একটা কথা নাকি? ব্যাপারটা আমি এখনো ঠিক আয়ত্ত করতে পারছি না সুরেনবাবু। এ যে বামনের হাতে চাঁদ এনে দেওয়া। বলে তিনি বাড়ির ভেতর যাবার দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

সুরেন বললে,—প্রজাপতির নির্বন্ধ। কিংবা বলতে পারি প্রজাপতির পাখার চাঞ্চল্য! খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হবেন না, আমাকে এখুনি উঠতে হবে। যেদিন আপনাদের সুবিধে, খবর পাঠাবেন—আমরা সদলে এসে মেয়ে দেখে যাব। আর সেদিনই খাওয়া যাবে খাবার।

—দাঁড়ান, পাঁজি দেখে এখুনি আমি দিন ঠিক করে দিচ্ছি। সবই যেন এখুনি স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে। হাতে-পায়ে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভবনাথবাবু।

দিন-ক্ষণ ঠিক করে নিয়ে সুরেন নিষ্ক্রান্ত হলো।

ভবনাথবাবু অন্তঃপুরে গেলেন স্ত্রীকে খবর দিতে। উঠোনের রোদে উবু হয়ে বসে তিনি পাথরের থালায় গোলা-আম ঢেলে ধীরে-ধীরে হাত বুলিয়ে আমসত্ত দিচ্ছেন, আর কোমরে আঁচল জড়িয়ে একটা ভাঙা লাঠি হাতে নিয়ে গৌরী কাক তাড়াচ্ছে।

ভবনাথবাবু দাওয়ার থেকে বললেন,—এদিকে এগিয়ে এসে শোনো একবার।

মুখ এমন গম্ভীর করে কথাটা তিনি বললেন যেন কী ভয়ানক দুঃসংবাদই না জানি শুনতে হবে। কাদম্বিনী শুকনো মুখে চোখ কপালে তুলে রুদ্ধ নিশ্বাসে কাছে এসে দাঁড়ালেন। পাথরের উপর পাতলা চাদর বিছিয়ে কোমরের বাঁধনটা আলগা করে দিয়ে গৌরীও দাওয়ায় উঠে এলো।

ভবনাথবাবু মুখের থমথমে ভাবটা তরল করে বললেন,—খুব সুখবর। অনঙ্গ গৌরীর সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে।

কথা শুনে কাদম্বিনী প্রথম হকচকিয়ে গেলেন: কে অনঙ্গ?

—সে কি, অনঙ্গকে চেনো না? আমাদের হরিবাবুর নাতি। বাপ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলো,—চমৎকার ছেলে, যেমন দেখতে, তেমন লেখাপড়ায়। এম-এ বি-এল—চারটিখানি কথা নয়, সে যে কতগুলি পাশ বুঝবে না—তার ওপর অবস্থা —ব্যাঙ্কে নগদই বোধকরি লাখ পাঁচেক টাকা আছে—

কাদম্বিনীর বুক ধড়ফড় করতে লাগলো, দম নিয়ে ঢোঁক গিলে বললেন,—বলো কী? প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে? কাকে দিয়ে পাঠাল?

—বন্ধুকে দিয়ে।

—বলো কী! এতক্ষণে এক গাল হাসতে পারলেন কাদম্বিনী।

—হ্যাঁ, আমাদের এগোবার কোনো কালে সে সাহস হত না—নিজেরাই এসেছে দেখছি। গৌরীকে দেখে নাকি পছন্দ হয়েছে অনঙ্গর।

গৌরী নিদারুণ ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বলল,—ইস্? পছন্দ হলেই হল?

কাদম্বিনী ধমকে উঠলেন: ইস কী? পছন্দ হয়েছে তো সেটা ভাগ্যের কথা। হ্যাঁ গা, কখন দেখলে গৌরীকে?

—এই এখানে-ওখানে এক আধটু দেখে থাকবে হয়তো। আবার একদিন ভালো করে দেখবে মুখোমুখি।

—এক নজরে পছন্দ হয়েছে বলেই তো ভালো করে দেখতে চায়। আবার আরেক গাল হাসলেন কাদম্বিনী: কার চোখে যে কে কখন ভালো লেগে যায় দেবতারাও বলতে পারে না।

—দেবতারা যে একটু মুখ তুলে চেয়েছেন এই আমাদের ভাগ্য।

—তোমাদের ভাগ্য নিয়ে তোমরা থাকো। বিয়ে আমি করছি না।

ঝটকা মেরে গৌরী বেরিয়ে যাচ্ছিলো, ভবনাথবাবু বাধা দিলেন। মেয়ের বিয়ে না-করার আবদার তিনি এতোদিন পালন করে এসেছেন একমাত্র মেয়ের কল্পিত উচ্চাদর্শে মুগ্ধ হয়ে নয়, তাঁর প্রতিকূল অবস্থাই তাঁর প্রধান কারণ। আর, পর-পর বড়ো দুই ছেলের মৃত্যুর পর তাঁর গৌরী—বড়ো ঘরে ভালো পাত্রের হাতে পড়ুক—ভাগ্যের কাছে এই ছিলো তাঁর প্রার্থনা। আর আজকালকার ভালো ছেলেরা একটু লেখাপড়ার চটক চায়—হয়তো গৌরীর এই বিদ্যানুশীলনের লাবণ্য তাকে উপযুক্ত পাত্রের চোখে সহজেই মনোনীত করে তুলবে। তা ছাড়া, তার সেই অপরিমিত অধ্যবসায় ও সাধনাকে বাধা দিতে তাঁর তখন মায়া করতো, সামর্থ্যও ছিলো না হয়তো।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে মেয়ের এই ঔদাসীন্যকে তিনি ক্ষমা করতে অক্ষম। ভাগ্য প্রসন্ন, উপযুক্ত পাত্র উপযাচক হয়ে দ্বারস্থ হয়েছে! এ-সময়ে মুখ ফিরিয়ে থাকার এই নির্বুদ্ধিতা তাঁর অসহ্য লাগলো। স্বর তবুও নরম রেখেই তিনি বললেন,—বিয়ে করবি না মানে? যা তা পাগলামি করলেই তো হয় না। ভবিষ্যৎ তো দেখতে হবে।

গৌরী বললে বিয়ে ছাড়া আমার আরো অনেক কাজ আছে। সংসারে

সকলকেই বিয়ে করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। একই নিয়ম সকলের বেলায় খাটে না।

কাদম্বিনী মুখ ঝামটে উঠলেন : বিয়ে না করে ধুমসো হয়ে বসে থাকাই তোমার কাজ! কেলেঙ্কারি বাধাসনি বলছি! এমন ছেলে—নিজে সেধে পছন্দ করে যাচ্ছে, আর উনি—

মুখের কথা শেষ করতে পারলেন না। গৌরী বললে,—আমি বড় হয়েছি, আমার পছন্দ বলেও তো একটা জিনিস থাকা সম্ভব।

ভবনাথবাবু বললেন,—এই ছেলেকে পছন্দ না করলে আর কোন্ রাজপুত্র নেমে আসবে তোর জন্যে! আমার অবস্থার কথাটাও তো একবার ভাববি।

—আমি সেই পছন্দর কথা বলছি না বাবা। গৌরী মাটির দিকে তাকালো : নিজের জীবন কী ভাবে গড়বো, কী ভাবে চালাবো, সেই সম্বন্ধে আমার একটা মত থাকা স্বাভাবিক।

কাদম্বিনী তেড়ে এলেন : দিন কে দিন তুই লম্বা কাঠ হবি, শাঁকচুন্নি হবি, ঝাঁটার কাঠির মতন গড়বি তুই নিজেকে। এদিকে সারা গাঁয়ে কান পাতবার জায়গা নেই। সবখানেই নামকীর্তন চলেছে। স্বামীর দিকে ভস্মলোচনের দৃষ্টি হানলেন : মেয়েকে শহরে পাঠিয়ে ঢের ফ্যাসান শিখিয়েছিলে বাপু।

ভবনাথবাবু বিরক্ত হলেও নরম স্বরেই বললেন,—বিয়ে করবে না কী। মুখের কথা বললেই তো আর হলো না। কলকাতায় রেখে কলেজে আর আমি পড়াতে পারবো না—পয়সা কই? এমন পাত্র হাতছাড়া হতে দিলে আমি কোথায় যাবো, কোন্ শূন্যে হাত বাড়াবো?

গৌরী অসহায় কণ্ঠে বললে,—আমাকে সামান্য বি-এটাও অন্ততঃ পাশ করতে দেবে না?

কাদম্বিনী মুখ নেড়ে বললেন,—বি-এ. পাশ কি লো ছুঁড়ি? পাশ করে তুই করবি কী? কোন হবি দশভুজা!

—নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো। গৌরী দাঁড়াল স্থির হয়ে। স্থির কণ্ঠে বললে,—এমনি করে নির্বিবাদ আত্মহত্যার অপমান সইতে হবে না।

ভবনাথবাবু বললেন,—বেশ তো। অনঙ্গই তোকে বি-এ পাশ করিয়ে দেবে। দেশ-বিদেশ ঘুরিয়ে আনবে। জাহাজে নয়, প্লেনে করে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ওদের কিসের কী ভাবনা!

কাদম্বিনীও প্রবোধের স্বর আনলেন, বললেন,—স্বামীর ঘর করাই তো মেয়েদের লক্ষ পাশের সমান। তার পর এমন ছেলে—জগৎ জোড়া যার নাম-

যশ! বিদ্যা আর বিত্ত এক সঙ্গে। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন,—মেয়ে কবে দেখতে আসবে কিছু বললো?

ভবনাথবাবু বললেন,- অমনি একদিন একটু চোখের দেখা দেখেছিলো, তো শুনলে। তা, আরেকদিন বন্ধু-বান্ধবসহ মেয়ে দেখার মতো করে দেখতে চেয়েছে। বাজনা-টাজনা সেদিন শুনিয়ে দিতে হবে। কথা-বার্তাও বলতেও তো একটু চাইতে পারে! আজকালকার ছেলে—

রাগের ঝাঁজে গৌরীর দু' চোখ ছলছল করে উঠলো। নাম শুনেই তার সন্দেহ হয়েছিলো—এবার স্পষ্ট বুঝলে লোকটা কে? বোঝামাত্রই জ্বলে উঠল দপ করে, কর্কশ গলায় বললে,—লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়।

—আস্পর্ধা তুই কী বলছিস?

—একশোবার বলব। লোকটা বর্বর। ভদ্রলোকের মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকে পছন্দ করে,—বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসর জমিয়ে বসে বাজনা শুনতে চায়, এমন লোককে তুমি বাড়ি ঢুকতে দেবে, বাবা? মেয়ে হয়েছি বলে কি আমার কোনোই সম্মান থাকতে নেই?

ভবনাথবাবু তার মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধস্বরে বললেন,—মেয়ের যা শ্রেষ্ঠ সম্মান তাই তো তোকে দিচ্ছি। ভগবান হয়তো এতো দিন মুখ তুলে চেয়েছেন। গোঁয়ারতুমি করিস নে মা। আস্পর্ধা নয় করুণা। বর্বরতা নয় অনুগ্রহ।

কাদম্বিনী বললেন—ওর কথায় কেন তুমি কান পাতছো? তখনই বলেছিলুম কলকাতায় পাঠিয়ে কাজ নেই—যতো সব ফিরিঙ্গি ফ্যাসান শিখে এসেছে! মেয়ে দেখতে কবে আসবে? ছেলে নিজেই আসবে নাকি?

—ছেলে নিজেই তো কর্তা—বাপ তো রিটায়ার করতে করতেই মারা গেলো। মা আছে বটে, ছেলের পছন্দেই তার পছন্দ। পরশু ভালো দিন, সকাল বেলার দিকেই আসতে বলে দিয়েছি। এর আগে আমিও একবার অনঙ্গর সঙ্গে দেখা করে আসবো।

—হ্যাঁ, তুমি নিজে একবার মোকাবিলা করে এসো। সত্যি মিথ্যে জেনে এসো—

—না, না, মিছিমিছি মিথ্যে খবর সে পাঠাবে কেন?

গৌরী দরজা বন্ধ করে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তার কান্না। বিয়ে হবে না বলে নয়। নিতান্তই বিয়ে হবে বলে। তাঁর জীবনের সমস্ত আদর্শ সহসা বিবর্ণ, হতশ্রী হয়ে গেলো। নিজের ওপরেও তার আর অধিকার থাকবে না। জীবনকে সঙ্কুচিত, বিশীর্ণ করে অন্যের আকাঙ্ক্ষার

সঙ্গে সুসদৃশ করে তুলতে হবে! অন্যের গ্রাসে জল হয়ে গ্রাসের রঙ ধরতে হবে। একটা ছায়া হয়ে যেতে হবে। এ কী অত্যাচার! এই অপমৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে সে ত্রাণ করতে পারবে না? অনায়াসে বলি হয়ে যাবে?

সে, কেমন না জানি তার কুৎসিত চেহারা। তার অস্তিত্বের আর দীপ্তি নেই, পরিচয়ে নিজস্বতা নেই। সে আর স্বয়ম্প্রতিষ্ঠিতা নয়, নিতান্তই পরানুগতা, মুখাপেক্ষী। তার এতো তেজ, এতো সাধনা, এতো আকাঙ্ক্ষা, এতো পরিশ্রম—আকাশ সমুখে রেখে তার এতোদিনের এই অগাধ স্বপ্ন—শুধু একটা লোকের মুখের কথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে রুচিরা হবে আরেকজনের রুচিতে। সে একটুও প্রতিবাদ করবে না, ক্ষুধার্ত শ্বাপদের হিংস্র থাবার নিচে তার এই জীবনকে অনায়াসে ডালি দেবে!

হয়তো বিয়ে সে একদিন করতো। কিন্তু এমনি অক্লেশে, যাকে-তাকে? শুধু টাকা আর বিদ্যা—এই জোরে যে কেউ তাকে দখল করে বসবে? আর সেও তারি মোহে বিকিয়ে যাবে একেবারে? ছি, ছি, কী জঘন্য নির্লজ্জতা! নিজে কী গৌরী কিছুই আবিষ্কার করবে না, খুঁজে নেবে না তার বল্লভকে, তার দুর্লভকে? এতো যার আশা ও কল্পনা, তা দিয়ে মনে কি তার কোনো পুরুষেরই অস্পষ্ট মূর্তিরচনা হয় নি? পুরুষ ও নারীর মিলনের অন্তরালে কোনো তপস্যাই প্রচ্ছন্ন থাকবে না? প্রেমে জয় না করে কামনার আত্মসমর্পণে কী নিদারুণ অপমান, কী কুৎসিত পরাজয়! তাই সে মেনে নেবে ঘাড় পেতে? চোখের জল মুছে গৌরী দু' কান রাঙা করে উঠে বসলো। তাকে আগে থেকে সে খুঁজবে না, চিনবে না, সৃষ্টি করবে না, বিরহের মাধুর্য মিশিয়ে মিলনের ক্ষণটিকে সে রমণীয় করবে তুলবে না? শুধু একটা শরীরসর্বস্ব হিংস্র পশুর লেলিহান রসনার কাছে সে নিজেকে আহুতি দেবে? নইলে সে একমাত্র চোখে দেখেই লালসায় এমন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে কেন? আর তাকেই কি না সে প্রশ্রয় দেবে? সে—গৌরী? যার জীবনের বাতায়নে উন্মুক্ত আকাশের অপরিমেয়তা উদ্ঘাটিত হলো, অনেক যার সঙ্কল্প ও অনেক যার প্রচেষ্টা, সে এমনি করেই পরাভব স্বীকার করবে? কলঙ্কিত মুখে, নতমস্তকে? এই তার পরিণতি?

তারপর সে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে আসবে। গৌরী সেজেগুজে মুখে পাউডার ঘসে পেণ্ট মেখে চুল বেঁধে গা-ভরা গয়না নিয়ে রেখায়-চূড়ায় ঢেউ তুলে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে হোয়াইটএওয়ের শো-কেসে নাইট-গাউনের মতো—আর সে বিচার করবে এ তাঁর শয্যাসঙ্গিনী হবার উপযুক্ত কি না, লোভনীয় কিনা। তখন তার কাছে গৌরী একস্তূপ মাংস ছাড়া কিছু নয়, একটা শারীরিক স্থূলতা

মাত্র! একটা নৈবেদ্যের পিণ্ড! যদি নিতান্ত চাইতেই হয়, গৌরী এমন পুরুষ চায় যার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে শরীর অনুপস্থিত, নির্বাক, নেপথ্যচারী—যেখানে অন্তরই হচ্ছে মুখপাত্র। বিরাট স্পর্শহীনতার সমুদ্র পেরিয়ে তবে সে শরীরের কূল চায়। সে সমুদ্রের নামই তো ভালোবাসা। কিন্তু এখানে রূঢ় শরীরই স্পষ্ট কণ্ঠে সবার আগে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। অপরিচ্ছন্ন চিন্তায় গৌরী বিমর্ষ হয়ে উঠলো। সাধনা নেই, সহিষ্ণুতা নেই, প্রতীক্ষা নেই, কোনো মূল্য দেবার কঠিন তপশ্চারণ নেই—এই বর্বরতা কিছুতেই গৌরী ক্ষমা করতে পারবে না। যে বিবাহের পূর্ব পরিচ্ছেদে প্রেম নেই, জন্মের পূর্বে জনকের পরিচয়-হীনতার মতোই তা অশুচি। কায়মনোবাক্যে গৌরী তা পরিহার করবে।

অনুগ্রহ! গৌরী নিজেই নিজেকে পারবে অনুগ্রহ করতে।

সাত

অনঙ্গ আর সুরেন গৌরীকে দেখতে এলো। দলবল বলতে তারা শুধু দুইজন। দেখতে এলো আরো কাছে রেখে স্পষ্ট করে চিত্রাপিত স্পর্শসহ স্থিরতার মধ্যে।

কিন্তু পাশের ঘরে গৌরী কিছুতেই না পরবে একখানা ভালো শাড়ি, গায়ে না তুলবে একখানা গয়না। পরনে রাতের শাড়িটা—ময়লা ও কোঁচকানো—কালকের বাঁধা ঢলঢলে খোঁপাটা—শুকনো রুক্ষ; সারা রাত্রির উদ্বেগে ও অনিদ্রায় শরীরে কঠিন জড়িমা, মুখে এক রাজ্যের ঔদাস্য।

খবরটা ভবনাথবাবু চারদিকে চাপা দিয়ে রেখেছেন। লুকিয়ে অতুলকে জানাতে পর্যন্ত গৌরী লজ্জায় মরে যাচ্ছিলো। না কোনো আপন জনেরই সাহায্য সে চায় না। সে নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে। তার প্রতিজ্ঞাই তার নিষ্ঠুর ভাগ্যের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রেরণা।

গৌরী চেঁচিয়ে বললে,—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রোজ আমি সিল্কের শাড়ী পরি নাকি? আমার গয়না যা নয় তা আমি পরতে যাবো কেন? আমি কি পুতুল?

ভবনাথবাবু দাঁতে দাঁত ঘসে চাপা গলায় বললেন—আস্তে।

গৌরী ততোধিক চেঁচিয়ে উঠলো: কেন আস্তে বলতে যাবো? ভদ্রলোকরা জানেন না মেয়েরা বাড়িতে কেমন শাড়ি পরে থাকে? সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের বাঙালি বাড়িতে যে পিচে কথা বলে তেমনি করে বলবো। তাঁরা যদি আমাকে

সাজগোজ করে পটের বিবি হয়ে দেখা দেওয়ার দাবি করে থাকেন তবে কখনোই তাঁদের আমি ভদ্রলোক বলবো না।

কাদম্বিনী হতাশ হয়ে বললেন,—তার চেয়ে হারামজাদির গলায় কলসি ঝুলিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে এসো। সব ওরা শুনতে পাবে যে!

গৌরী বুকের ওপর দিকে শাড়ির আঁচলটা জড়িয়ে নিতে নিতে নির্ভীক গলায় বললে,—বেশ তো, ভদ্রলোকরা এসেছেন, আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান—আমি যাচ্ছি। সেজে-গুজে বসে এই আলাপের কদর্থ করতে পারবো না। তুমি জলখাবারের থালা গুছোও, বেশ তো, আমিই গিয়ে দিয়ে আসবো খন।

ভবনাথবাবু বুঝিয়ে বললেন,—লৌকিকতা একটু মানতে হয়, মা। এমনি ভাবে গেলে হয়তো অনঙ্গ খুশি হবে না। বিয়ে শেষ পর্যন্ত হোক বা না হোক, মিনতিতে বিগলিত হলেন: একটু ভদ্রভাবে দেখা দে লক্ষ্মী—এটুকু শুধু কথা শোন—

গৌরী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে,—লৌকিকতার চেয়ে স্বাভাবিকতাই বেশি ভদ্র। আমি যা, আমি তাই। সত্যই সহজ,—মেকি কিছুতেই হতে পারবো না বাবা। আর কেউ খুশি হোক বা না হোক, কিছু এসে যায় না—আমার ভগবান খুশি হবেন।

বলে ভবনাথবাবুর আগে-আগেই সে বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

যেন সে এক বাক্যে বাতিল হয়ে যায়। তার অবাধ্যতা তার ঔদ্ধত্যই যেন তাকে উদ্ধার করে।

অনঙ্গ অবাক, সুরেন তো বজ্রাহত।

গৌরী কারুর বলার অপেক্ষা না করে নিজেই একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। বিতৃষ্ণায় ভরা মুখ তার পাশের দেওয়ালের দিকে।

বেশে সামান্য শালীনতা পর্যন্ত নেই—আগাগোড়া কেমন একটা উগ্র উচ্চণ্ড রুক্ষতা। সুরেনের সমস্ত গা জ্বালা করে উঠলো। মেয়েটা যেন ঘুম থেকে উঠে এসেছে। চুলে চিরুনি পড়ে নি, হাতে-মুখে পুরু ময়লা, চুলের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে কান দুটো অতিমাত্রায় প্রখর, বসবার ভঙ্গিটা রূঢ়—দুই হাত হাঁটুর উপর দৃঢ় করে উদ্ধত হয়ে বসেছে, গায়ের ব্লাউজটা পিঠের দিকে খানিকটা ছেঁড়া। এ কী মূর্তি! একে দেখেই অনঙ্গর মাথা ঘুরে গেছে? কোথাও এতটুকু বিনয়নম্র চারুতা নেই, লজ্জার সঙ্কেত নেই, ভয়ঙ্করী অল্পবিদ্যার মর্মান্তিক উদ্ঘোষণ। নিতান্ত কৃত্রিম, মারাত্মক রকম শহুরে।

অনঙ্গ সমস্ত দেহ চক্ষুষ্মান করে গৌরীর দিকে চেয়ে রইলো।

এ কী পরমসুন্দর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক আবির্ভাব! যা এতো সহজ তা যে এতো সুন্দর হতে পারে এর আগে তার ধারণা ছিলো না। আটপোরে শাড়িটির সাদাসিধে পাড় থেকে সুরু করে আঁচলের খুঁটে চাবির ছোট রিঙটি পর্যন্ত সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এলো খোঁপাটা যেন অনেক বিদ্যুতে ভরা মেঘস্তূপ। সারা দেহে উত্তাল লীলা নয়, অস্তিত্ববোধের দৃঢ়তা। যেন তার একটা প্রবল বক্তব্য আছে, সমস্ত উপস্থিতি দিয়ে তাই সে প্রচার করছে। অনঙ্গর দুই চোখে এত রূপ আর ধরছে না। কোথাও এতোটুকু সচেষ্ট কৃত্রিমতা নেই, বাণিজ্যপনা নেই, দিনের আলোর মতো টলটলে পরিষ্কার, কালো পাথরের গ্লাসের মিছরিপানার মতো স্নিগ্ধ—গৌরী যেন সাক্ষাৎ গ্রামলক্ষ্মী! স্বভাবলক্ষ্মী!

ঘাড় বেঁকিয়ে তার দিকে তেরছা করে চেয়ে সুরেন বললে,—তুমি বুঝি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ো?

গৌরী দেওয়ালের দিকে চেয়ে উত্তর দিলো, না, সেকেণ্ড ইয়ার।

—কি-কি সাবজেক্ট?

তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর গৌরীর: পিওর আর্টস।

—কোনটা তোমার ভালো লাগে এরি মধ্যে?

—কোনোটাই না।

ভবনাথবাবু আপত্তি করলেন: না, ফার্স্ট ইয়ার থেকে ওঠবার সময় লজিকে ও নয়ের ঘরে নম্বর পেয়েছে। লেখাপড়ায় দস্তুরমতো তুখোড়, কবিতা পর্য্যন্ত লিখতে পারে—

—কবিতা! এবার বুঝি অনঙ্গ বললে।

—কলেজের ম্যাগাজিনে তো লিখেইছে, কি-একটা 'আরতি' না 'সারথি' কাগজেও বেরিয়েছে একটা। ভবনাথবাবু তপ্ত হয়ে উঠলেন।

—কী নিয়ে কবিতা? প্রেম নিয়ে! জিগগেস করল সুরেন।

—না, না, স্বদেশপ্রেমের কবিতা। ভবনাথবাবু মর্যাদাবানের মত বললেন: আহা, কী না জানি নাম কাগজখানার!

গৌরী চুপ করে রইলো। তার এই অশোভন বসে থাকাটাকে সহজ করবার চেষ্টায় হাতের কাছের টেবিল থেকে বহুদিনকার পুরোনো একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ টেনে নিয়ে অতি মনোযোগে সে পড়তে লাগলো।

সুরেন বললে,—যে-কাগজে তোমার কবিতা বেরিয়েছে, আরতি না সারথি, সেই কাগজখানা নিয়ে এসো।

গৌরী অস্ফুটস্বরে বললে,—যা আরতি তাই সারথি।

ভবনাথবাবু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন,—এ নিয়ে কথা কী। যা নিয়ে আয় গে। হাঁটাটাও অমনি দেখা হয়ে যাবে।

গৌরী নড়লো না, হাতের কাগজে তেমনি চোখ রেখে কঠিন গলায় বললে,—আমার কাছে নেই। পত্রিকার আফিসে দাম পৌঁছে দিলেই পাঠিয়ে দেবে।

সুরেন আর অনঙ্গ দু'জনেই কথার ভঙ্গিতে চমকে উঠলো।

সুরেন বললে,—ভালো কথা। তাই একখানা কেনা যাবে, এখন হাতের ঐ ইংরিজি কাগজটা থেকে আমাদের একটু পড়ে শোনাবে?

ভবনাথবাবু খুশিতে হেসে দুলে বললেন,—চমৎকার পড়তে পারে। কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে মুখে-মুখে এমন সব ইংরিজি বক্তৃতা দেয় যে প্রফেসারদের পর্যন্ত কথা সরে না! পড়, অন্য কোনো বই দেব?

আরো নুয়ে পড়ে কাগজটার ছোট ছোট অক্ষরগুলি তীক্ষ্ণ চোখে অনুধাবন করতে করতে গৌরী বললে—আমি এখানে পরীক্ষা দিতে আসিনি।

সুরেন বিদ্রূপের সুরে বললে,—তবু তোমার ইংরিজি উচ্চারণগুলি শোনা যেত।

গৌরীর কান দুটো গরম হয়ে উঠলো। ঘাড় তুলে এবার স্পষ্ট সে সুরেনের দিকে তাকালে। বললে,—বাঙালি মেয়ের মুখে ইংরিজি পড়া শুনে কী হবে? উচ্চারণ? আপনি—আপনারা একবার দয়া করে পড়ে শোনান না—দেখি ক'টা য়্যাকসেন্ট ঠিক দিতে পারেন।

—ও কী হচ্ছে, গৌরী? ভবনাথবাবু ধমকে উঠলেন। অনঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন,—উনি এম-এ-বি-এল।

গৌরী বললে,—উচ্চারণের বেলায় তবু তিনি ইংরেজ হতে পারবেন না। বেশ তো পরীক্ষকেরাই আগে দিন না পরীক্ষা।

ভবনাথবাবু অতিথিদের দিকে চেয়ে বিনীত স্বরে বললেন,—যাক্‌গে কিছু মনে করবেন না আপনারা। আই-এ পড়ছে—মেয়ের পক্ষে এই তো মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে আপনাদের। তার লেখা-পড়ার সম্বন্ধে কী আর জিগগেস করবেন। তবে ওর চুলটা আপনাদের খুলে দেখাবো? বলে, যেন সমস্ত কিছু ভুলে, ভবনাথবাবু গৌরীর খোঁপাটা আকর্ষণ করবার জন্যে এগিয়ে এলেন।

—না, না, ও-সব কী অত্যাচার। অনঙ্গই প্রবলকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠলো।

কণ্ঠস্বরে এমন একটা পরিপূর্ণ আবেগ ও উদারতা ছিলো যে গৌরী তার দিকে

সবিস্ময়ে না তাকিয়ে পারলো না। এতোক্ষণ যেন স্বপ্নে বিভোর ছিলো, হঠাৎ কি আকস্মিক উত্তেজনায় যেন আমূল শিউরে উঠেছে। সেই লোকটা - বন্য, বর্বর—চতুঃসীমা যার একমাত্র দেহ দিয়ে তৈরি, যে ভদ্রবেশে ও ভদ্র সমাবেশের মধ্যে ঐখানে বসে তাকে মনের গোপনে কামনা করছে – ওরই প্রভুত্বের কাছে নিজেকে তার বলি দিতে হবে! গৌরীর দেহে যৌবন, চোখে বিদ্যানুরাগের দীপ্ত ও জীবনে কঠোর ব্যক্তিত্বময় ভঙ্গি—সে শুধু অমনি লোলুপ পুরুষের প্রেমহীন অপরিচ্ছন্ন ভোগের জন্য! কামুক পুরুষ তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিবাহের বন্ধনে বশীভূত করতে চাইবে, আর ও অমনি খুশিতে ডগমগ হয়ে হেলতে-দুলতে চরিতার্থের মত তার শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? এইখানে নারীর সম্ভ্রমরক্ষা করবার জন্যে আইন কি কোনোই বিধান করে নি? পুলিশে খবর দেওয়া যায়না? এ বিকার কি একরকমের বলাৎকার নয়?

ভবনাথবাবু হাত গুটিয়ে নিলেন। গৌরী নড়ে-চড়ে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলো—পায়ের ওপর পা তুলে। তার সমস্ত ভঙ্গিটাতে অমানুষিক উপেক্ষা।

অনঙ্গ বললেন,—শুনেছি তুমি খুব ভালো এস্রাজ বাজাতে জানো। একটা কিছু বাজাও না, শুনি।

ভবনাথবাবু ফের উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন: ভারি মিঠে হাত। আমি যে বুড়ো, শুনতে-শুনতে আমিও মাঝে মাঝে তন্ময় হয়ে পড়ি। যাই, আমি বাজনাটা নিয়ে আসি!

গৌরী তেমনি উদাসীন কণ্ঠে বললে, - যার-তার কাছে যখন-তখন আমি বাজাই না।

ভবনাথবাবু খেপে উঠলেন: যার-তার কাছে মানে? এ-সব তুই বলছিস কী! একটু বাজাতে শিখে তোর মেলাই অহঙ্কার হয়েছে দেখছি।

গৌরী বললে,—আমার বাজনা শোনবার জন্যে ভদ্র ও সুরুচিসম্পন্ন শ্রোতা চাই। অনুকূল পরিবেশ চাই। এঁরা বাজনার কী বোঝেন তাও জানা দরকার।

—যে বাজনা কিছু বোঝে না সেও তো জানে মুগ্ধ হতে। অনঙ্গ বললে।

—একটা লোক দগ্ধ হচ্ছে তা দেখেও তো মুগ্ধ হওয়া যায়। আনাড়ির আর দায়িত্ব কী! ফিরিয়ে দিল গৌরী।

সুরেন ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠলো। হাতের ভঙ্গি করে বললে,—এবার তুমি যেতে পারো।

গৌরী পায়ের পাতাটা সামান্য দোলাতে-দোলাতে বললে,— এটা আমার বাড়ি, যেমন খুশি আমি যাবো বা থাকবো, আপনাদের মতের অপেক্ষা রাখবো না। অর্ডার দেবার মানে হয় না আমাকে। কথা কয়টা বলে চেয়ারে আরো একটু প্রশস্ততরো হয়ে বসে পুরোনো খবরের কাগজটা দু'হাতে চোখের সামনে আপ্রান্ত মেলে ধরলো।

সুরেন ব্যস্ত হয়ে বললে,—তাহলে এবার আমরা উঠি।

ভবনাথবাবু সকাতরে বললে—সে কী কথা! একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে বৈ কি! বসুন একটু।

মেয়ের প্রতি রাগে ও অভিমানে তাঁর সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছিলো। জীবনে এমন সৌভাগ্য যে প্রত্যাখ্যান করে তার প্রতি আর তাঁর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।

সুরেন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। বললে,—না, মাপ করবেন, মিষ্টিমুখ-ঠুক হবে না এখন। ওঠো হে অনু।

—নিশ্চয় হবে। গৌরী একলাফে উঠে দাঁড়ালো: বাড়িতে অতিথি এসেছেন, কাল রাত্ত থেকে মা জলযোগের ব্যবস্থা করছেন—বসুন, আমি নিয়ে আসছি। বলে পাশের দরজা দিয়ে গৌরী অন্তর্ধান করলে।

অনঙ্গ হেসে বললে,— আর একটু বসেই যাই, সুরেন। ফলারের ব্যবস্থা যখন হচ্ছে, মন্দ কি। বলে জামা ধরে টেনে সুরেনকে সে বসিয়ে দিলে।

মেয়ের এই ভঙ্গিটা বিশেষ আশাপ্রদ। অনেক আমতা আমতা করে ভবনাথবাবু বললেন,—মেয়ে কিছুতেই সাজগোজ করলে না,—আর মেকি পোশাকে-গয়নায় মেয়েকে ঢেকে-ঢুকে রঙচঙে করে দেখানোটা ভারি লজ্জার ব্যাপার, কী বলেন? মেয়ে যদি একটু কালো হয়ই, তা লুকিয়ে কী লাভ আছে? কেমন দেখলেন বলুন?

অনঙ্গ সুরেনের দিকে চেয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো। কী হে, কেমন দেখা হল?

সুরেন বললে,—চেহারায় বিশেষ কিছু এসে যায় না কিন্তু মেয়ে আপনার সাধারণ ভদ্রতা পর্যন্ত শেখে নি।

ভবনাথবাবু ক্ষমাপ্রার্থীর মতো সানুনয়ে বললেন,—ওকে আগে থেকে জানানো হয়নি কিনা তাই, বুঝতেই পাচ্ছেন, সকাল থেকেই মেজাজটা ওর ভালো নেই।

সুরেন বললে—আর আমাদের মেজাজটাই যে খুব ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে এমন

নাও হতে পারে। আমরা তো আর মিছিমিছি এই অপমান নিতে পারি না গা পেতে। এই মেয়েকে ঘরে নেবার মত আমাদের সাহস কই?

হতাশ হয়ে ভবনাথবাবু তাকালেন অনঙ্গর দিকে। ভীরু চোখে বললেন,—আপনারো কি সেই মত, অনঙ্গবাবু?

অনঙ্গ হাসি মুখে বললে,—সুরেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তবুও এ ব্যাপারে সামান্য পার্শ্বচর মাত্র, আমার অভিভাবক নয়। নয় আমার বিবেকের জিম্মাদার। আপনি ভাববেন না, মায়ের মত জেনে আপনাকে আমি পরে জানাবো।

—কী জানাবে? সুরেন চেঁচিয়ে উঠলো।

—বিয়ের তারিখ। মন স্থির হয়ে গেলে দেরি করে আর লাভ কী! যাতে শিগগির হয় তারই ব্যবস্থা করা দরকার।

প্রবল উত্তেজনায় সুরেন দাঁড়িয়ে গেলো। তপ্ত কণ্ঠে বললে,—তুমি এই মেয়েক বিয়ে করবে? এই অর্ধশিক্ষিত, বন্য, অভদ্র, কটুভাষী মেয়েকে? যে মুখে-মুখে অপমান করে, অহঙ্কারের ডিপো, সাধারণ শিষ্টাচার পর্যন্ত জানে না? একটা রূঢ়তার প্রতিমূর্তি—তাকে? বলো কী?

অনঙ্গ নির্লিপ্ত মুখে হাসল, বললে,—সবারই পছন্দ তো আর সমান হয় না। আর তোমার ভালো-মন্দর বিচারই যে আমারো পক্ষে ঠিক বিচার হবে তা কে বলতে পারে? ভবনাথবাবুর দিকে তাকাল প্রসন্নচোখে: আমার বন্ধুটিরো মেজাজ কিছু খারাপ যাচ্ছে, কিছু মনে করবেন না।

—আমার বিচার না হয় ছাড়লে কিন্তু পাত্রীর বিচার তো অগ্রাহ্য করতে পারবে না। সুরেন আবার তড়পে উঠল।

ভবনাথবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন: না, না, গৌরীর আবার বিচার কী!

—শুনলে না সকাল থেকেই মেজাজ ওর ভালো নেই, তাছাড়া স্বচক্ষে দেখলেই তো খাণ্ডার মূর্তি, তার মানে, সুরেন বললে,—এ বিয়েতে তার মত নেই, তুমি অবাঞ্ছিত।

কথাটা অনঙ্গ গায়েও মাখল না। বললে, প্রথম প্রথম ওরকমই মনে হয়। প্রথম প্রথম অমৃতকেও তেতো লাগে।

প্রসন্ন হাসিতে ভবনাথবাবুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অনঙ্গর দিকে তাকিয়ে বললে,—তা আপনার পছন্দ হয়েছে তো?

অনঙ্গ ঘাড় হেলিয়ে বললে,—হ্যাঁ। মনে হল শত সহস্র কথা বললেও যেন এই একটা শব্দের চেয়ে বেশি হত না।

এমনি সময় দু' প্লেট খাবার নিয়ে গৌরী ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। কথাটা

তার কানে গেলো। প্লেট দুটো টেবিলের ওপর নামিয়ে সে গম্ভীর গলায় বললে,—একা আপনার পছন্দ হলেই তো চলবে না,—আমারো তো স্বাধীন একটা মত থাকতে পারে।

কথাটা তীক্ষ্ণ একটা চাবুকের মতো অনঙ্গর মুখের ওপর ছিটকে পড়লো। খানিকক্ষণ পরে সে স্তম্ভিতের মতো চেয়ে রইলো—কথাটার ঠিক যেন অর্থবোধ হলো না।

সুরেন উৎসাহিত হয়ে বললে,—কেমন? হলো এবার?

ভবনাথবাবু রেগে বললেন,—তুই মেয়ে, তুই কেন এর মাঝে ফোঁপরদালালি করতে আসিস? যা, ভেতরে যা বলছি।

খানিকটা পিছিয়ে এসে সতেজ নির্ভীক গলায় গৌরী বললে,—আমার এখানে আসবার একেবারেই কোনো দরকার ছিলো না। তবে এঁরা যখন হঠাৎ আমার প্রতি এমন প্রচণ্ড দয়া করতে চাচ্ছেন, তখন এঁদের মুখের ওপরই জানিয়ে দেওয়া ভালো যে সে-দয়া নিতে আমি ঘৃণা বোধ করি। আমার নিজেরো পছন্দ কিছু একটা থাকতে পারে। অন্তত থাকা উচিত।

বলতে-বলতে গৌরীর মুখ মেঘলা হয়ে এলো। যেন শাণিত অস্ত্রের মতো ঝকঝকে কতোগুলি শুধু কথা নয়—গভীর উপলব্ধি। রুক্ষ চুল থেকে ময়লা শাড়িটির শিথিল আবেষ্টনের মধ্যে পুঞ্জিত তেজ।

অনঙ্গর কনুইয়ে একটা ঠেলা মেরে সুরেন বললেন,—খুব মিষ্টিমুখ করো এবার। হয়েছে তো? আর কতো অপমান সইবে? পছন্দ হয়েছে তো ভালমতো? তারপর ভবনাথবাবুর দিকে চেয়ে কথায় ব্যঙ্গের টান আনল: বা, মেয়েকে বেড়ে ভদ্রতা শিখিয়েছিলেন মশাই। একেবারে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেবার মত।

বিমূঢ়, বিপর্যস্ত ভবনাথবাবুর কিছু বলবার আগে গৌরী বললো: এইবারে এতোক্ষণেও আপনারা যদি কিঞ্চিৎ ভদ্রতা শেখেন তা হলে অত্যন্ত বাধিত হব। বলে সে অবিন্যস্ত আঁচল গায়ের ওপর গুছোতে গুছোতে রাগের ঝলস দিয়ে চলে গেলো।

সুরেন ধমকে উঠলো: আবার কী! ওঠ এবার।

অনঙ্গ তখনো এই ঘর ভরে একটি জ্যোতির্ময় তিরোধান দেখছে। অন্যমনস্কের মতো বললে: উঠি!

ভবনাথবাবু তবু বিনয়ে নম্র হয়ে রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন,—হঠাৎ মাথায় কী-সব মেয়েটার পোকা ঢুকেছে, আমাকে একটু

সময় দিন—আমি ঠিক বাগিয়ে নিতে পারবো। শরীরটা ওর ঠিক নেই। কিছু মনে করবেন না, অনঙ্গবাবু।

সুরেন মুখ বেঁকিয়ে বললে,—আর সময় আছে বলে মনে হয় না। যা বলছি, মেয়েকে আপনার থিয়েটার ঢুকিয়ে দিন, নয়তো রাজনীতিতে। আমরা চললাম। নমস্কার।

ভবনাথবাবু রাস্তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। বসবেন না দাঁড়াবেন, চলবেন না ফিরে যাবেন পারলেন না ঠিক করতে। নৌকো পারে এসে কখনো এমন ভরাডুবি হয়?

আট

রাস্তায় তখুনি গাড়ি বা ফাঁকা পাল্কি পাওয়া গেল না, অগত্যা দুই বন্ধু হাঁটা সুরু করলে। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটলো, অপমানটা নিঃশব্দে দুই জনে হজম করে নিলো যা-হোক। সুরেন হাতের লাঠি-গাছটায় হঠাৎ একটা পাক দিয়ে বললে,—কী জাঁদরেল অসভ্য মেয়ে, মেয়ে তো নয়, জানোয়ার। দু' পৃষ্ঠা ইংরিজি পড়ে আর দু'দিন কলেজে বাস-এ চড়ে ভাবলে কী একটা হয়েছি। ছারপোকার ডিম—দুখানা কাঠির ওপর গোবরে ভরতি চৌকো একটা মাথা—তার ফুটুনি দেখ একবার! আমাদের আবার ভদ্রতা শেখায়। ভদ্র যদি না-ই হতাম তো পলকে কী করে বসতাম কে জানে।

অনঙ্গ হাসল, স্বরে মমতা ঝরিয়ে বললে,—একটুখানি মিষ্টিমুখ করে এলে পারতে, সুরেন।

—মিষ্টিমুখ? সুরেন জলে উঠল: গলা দিয়ে গলত ঐ খাবারগুলো?

—নাইবা গলত! তবু খানিকক্ষণ বসে থাকা যেত। দেরি করা যেত।

—তার মানে গরু মারা যাবার পরেও জুতোর জন্যে বসে থাকবার ইচ্ছে! ধিক্কারের মত মুখ করল সুরেন: উচিত ছিল এক চড়ে মেয়েটার দাঁতগুলো ভেঙে দেওয়া—

—আমার কিন্তু ভাই অন্যরকম ইচ্ছে করছিল।

—কী ইচ্ছেটা শুনি?

ঠিক অবিশ্যি চড় মারতে নয়।

—তবে কি চুমু খেতে? সুরেন মুখ খিঁচিয়ে উঠলো। দু' হাতের বুড়ো আঙুল দুটো অনঙ্গর মুখের কাছে তুলে ধরে বললো: খাও এবার কলা।

ও-মেয়ের মুখে আগুন। তোমার পছন্দকে বলিহারি অনু, সমস্ত বাঙলা-দেশে তুমি এই মেয়ের জন্যে সেধে নিজে থেকে এসে হাত পাতলে! ছি-ছি, শিক্ষাও তেমনি হলো। মুখের ওপর দিব্যি থুতু ছুঁড়লো। কেলে হাড়গিলে চেহারা—তার কী না এতো তেজ!

—কিন্তু কতক্ষণ বসে থাকলে হয়তো অন্যরকম দেখতে পেতে। ঝড় উড়ে যাবার পর হয়তো বা স্থির আকাশের শান্তি।

—ঝড়ের ধুলোতেই চোখ কানা হয়ে গেছে, আর কিছু দেখবার সুযোগ কোথায়?

অনঙ্গ বললে,—কিন্তু সব মিলে স্বতন্ত্র একটি রূপ তোমার চোখে পড়লো না? অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু এমনি অভিনব মেয়ে কখনো দেখিনি। আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি ভাই।

—অবাক তো হবেই, কিন্তু কেমন ঘাড়ধাক্কাটি খেলে জিগগেস করি? মুখে একটি কথা ফুটতে দিলে না। সাবাস বীরবাহু! সুরেন হো-হো করে হেসে উঠলো: হাঁটু গেড়ে ভিক্ষে করতে গেছলে না? আর কী মেয়ের আস্পর্ধা—এমন পাত্রকে কি না কান ধরে বাড়ির বার করে দেয়!

অনঙ্গ বললে—ঠাট্টা করতে চাও করো, কিন্তু তুমি আশ্চর্য হচ্ছ না সুরেন, মেয়েটির নিজের একটা মত আছে আর সে মত সে জোর গলায় ঘোষণা করতে একটু দ্বিধা করে না? সঙ্কোচ নেই, লজ্জা নেই, একটা স্বপ্রকাশ নিষ্ঠুর বিদ্রোহ! ভুল বুঝতে পারে তা বুঝুক, কিন্তু তার সমস্ত ব্যবহারে ও ভঙ্গিতে জীবনের অপূর্ব একটা চেতনা আছে। তোমাকে বলে রাখি সুরেন বিয়ে যদি করতেই হয় তো একেই। উদ্ধতকে পরাভূত করতেই তো সুখ। খাঁচা যদি তৈরিই করতে হয় তো নিরীহ পাখির জন্যে নয়, অভব্য বাঘিনীর জন্যে।

সুরেন যেন দিনের আলোয় অনঙ্গর ভূত দেখছে। সে এতো চমকে উঠলো যে গলা দিয়ে ভালো করে তার স্বর ফুটলো না: এই মেয়েকে? এই অহঙ্কারের ডিপো, এক প্যাকেট ঘুণে-ধরা হাড়? এক ফুঁয়ে নিবে যাবার মোমবাতি? তুমি যে দেখছি ওর চেয়েও নির্বোধ, নিতান্ত ছেলেমানুষ। বলো কী হে? বাজারে দাঁড়ালে কত দাম হয় মেয়েটার?

অনঙ্গ হাতের উপর হঠাৎ একটা কিল মেরে বসল। বললে,—হ্যাঁ, এই মেয়েকেই চাই। রূপসী না হোক সুন্দরী—আর সে-সৌন্দর্য তার ঐ অহঙ্কারে, ঐ নির্লজ্জ তেজে। ঐ তার প্রত্যাখ্যানের স্পষ্টতায়। তাকে আমার পেতেই হবে। তাকে আমি বশীভূত করবোই, আনবোই আমার অধিকারের এলেকায়।

সুরেন কথাটার ইঙ্গিত যেন এতোক্ষণে বুঝেছে। উল্লাসে চোখ দু'টো বিস্ফোরিত করে বললে,—এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তো? তা হলে ঠিক আছে। আমি আছি তোর পিছনে।

—হ্যাঁ, চাই, তাকেই আমার চাই। প্রতিজ্ঞায় ঋজু হয়ে অনঙ্গ উঠে দাঁড়াল।

—আলবৎ চাই। তবে ধরে আনা যাক ছুঁড়িটাকে। খানিকটা নেড়ে চেড়ে দেব শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে। তখন বিষ-দাঁত কোথায় থাকে একবার দেখবে। এই তো এতোক্ষণে খাঁটি ব্যবসাদারের মতো, বুদ্ধিমানের মতো কথা বললে। নিবিড় বন্ধুতায় সুরেন অনঙ্গর কাঁধের ওপর হাত রাখলো।

হাতটা নামিয়ে দিয়ে অনঙ্গ বললে,—সত্যি তুমি আজো সিরিয়াসে হতে শেখনি, সুরেন।

—কেন, আবার কী হল? সুরেন থমকাল একটু: ভালো কথাই তো বললাম, ছলে-বলে নিয়ে আসা যাক মেয়েটাকে, অবাধ্যতার শিক্ষা দেওয়া যাক।

ঐখানেই অন্য মেয়ের সঙ্গে গৌরীর তফাৎ আজ টের পেলাম। তাকে আমি আনব মানে বিয়ে করে আনব, মন্ত্র পড়ে আগুন জেলে যজ্ঞ করে গাঁটছড়া বেঁধে। আর তোমাকেও দেখাবো, অনঙ্গ হাসলো: একদিন নুয়ে পড়ে তোমার বৌদিকে পেন্নাম ঠুকতে হবে।

তেমনি সদর্পে বুড়ো আঙুল দুটো উত্তোলন করে সুরেন বললে,—কলা! সে তোমাকে বিয়ে করলে তো? মুখের ওপর এমন একখানা সাফ জুতো মেরে দিলো, তবু তোমার হুঁস হলো না?

—তারো হয়তো এখনো স্পষ্ট হুঁস হয়নি— কোথায় তার জীবনের সার্থকতা। আমাকে নিয়ে সত্যি তার জীবনের স্বপ্নভঙ্গ হবে না, হয়তো বা তার সমস্ত স্বপ্ন সফল হয়ে উঠবে।

সুরেন লাঠিগাছটা দৃঢ় করে চেপে ধরে থেমে পড়লো। বললে,—আশ্চর্য, এরি মধ্যে দেউলে হয়ে গোল্লায় গিয়ে পৌচেছো? সটান একেবারে গরুর গাড়ির যুগে? হলো কী তোমার! চলো পেটে পদার্থ কিছু আজ পড়ে নি বুঝি।

তারপর চলতে-চলতে গম্ভীর পরামর্শের স্বর আনল: যাই বলো, ও-মেয়ে রাশ মানবার মেয়ে নয়। বুড়ো বাপ যে ওকে কোনদিন কায়দায় আনতে পারবেন তা মনে হয় না। বাপের মুখের সামনে—অমন করে যে কথা কইতে পারে সে দুনিয়ায় না পারে কী! বিয়ের কনে হবার মেয়েই ও নয়, আর জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে যদি কারু সঙ্গে কোনদিন হয়-ও, স্বামীর জীবনটা সে জালিয়ে পুড়িয়ে

থাক করে দেবে। বিশেষত তোমার সঙ্গে! যার ওপর তার জাতক্রোধ, সর্বনেশে ঘৃণা। প্রতিহিংসার ফণা সে একদিন তুলবেই তুলবে। তাই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলো, কাঁচা দু পেগ টেনে বুঁদ হয়ে বসে থাকা যাক।

অনঙ্গ বললে—তবেই তো বুঝতে পারছ কেমন অসাধারণ মেয়ে। আমাকে পর্যন্ত তার অস্বীকার। কতো আলাদা, কতো দুষ্প্রাপ্য। আর দুষ্প্রাপ্যই যদি না হবে তবে ওর আর মূল্য কোথায়, মাধুর্য কোথায়? এ তো আর তোমার ইনামগঞ্জের হাটুরে মেয়ে নয়, এর জন্যে দস্তুরমতো দাম দিতে হয়। সে দাম হয়তো ত্যাগে, কিছুটা বা তপস্যায়।

সুরেন শাসিয়ে বললে,—মারা পড়বে, অনু! মেয়েটা শেষকালে কিছু একটা কাণ্ড করে না বসে।

—কাণ্ড! তার মানে? কী বলতে চাও তুমি? অনঙ্গর ভয়-ভয় করে উঠল।

—বিয়ে করতে যখন চায়ই না, হয়তো শেষকালে জবরদস্তির ফলে আত্মহত্যা করে বসতে পারে। মেয়েগুলো তো মানুষ নয়, একপিপে ভাবের ধোঁয়া, এক বাণ্ডিল একগুঁয়েমি। আর সে-আত্মহত্যা সে বিয়ের পরেও করতে পারে।

—না, আত্মহত্যা করবে কেন? অনঙ্গ এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল কথাটা।

—তোমাকে কী বলেই বা সে ভালবাসবে জিগগেস করি? মদ তো আর ছাড়তে পারবে না? তারপর সুরেন গলা খাঁখরে উঠলো: এ-দিক ও-দিকও কি আর বন্ধ হবে?

অনঙ্গ বললে,—ও ছাড়াও আমার চরিত্রের আরো অনেক গুণ ছিলো। তারা কি মুখ লুকিয়েই বাস করবে চিরকাল? আসবে না বাইরে? সে-কথা ভাবছি না। তুমি বলছ হঠকারী মেয়ে হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসবে। বেশ, বিয়ের প্রস্তাবটা একদমে তুলে নিলে তো আর সে ভয় নেই?

সুরেন কথাটা বুঝতে পারলে না। বললে—তার মানে?

—আমি যদি আর উচ্চবাচ্য না করি, তবেই তো ব্যাপারটা এখানে চুকে গেলো—কী বলো? তবে আর ও-সব হাঙ্গামার কথাই ওঠে না—মেয়েদের সাইকোলজি কী বলে?

—মেয়েদের আবার সাইকোলজি কী! ওরা তো ভেবে চিন্তে কিছু করে না, যা করে ঝোঁকের মাথায়।

—কিন্তু ও মেয়ে এতো সহজে জীবন দেবে এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি

না। জীবনের মূল্য বুঝেছে বলেই তো তার এই বিদ্রোহ! এই উজ্জ্বয়িনী মূর্তি। অনঙ্গ প্রগাঢ় হয়ে উঠল।

সুরেনের বুদ্ধি তবু পরিষ্কার হলো না। আচ্ছন্নের মতো বললে,—বিয়ের প্রস্তাবই যদি তুলে নাও, তবে আর এতো উৎসাহিত হবারই বা কী আছে? গেলো তো সব মিটে।

—মিটবে কেন? আত্মহত্যা না কী বললে- সেটা সে না করলেই হলো।

সুরেন আবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো: একেবারে গেছ দেখছি। ও মরলে তোমার কী অসুবিধে! ও বেঁচে থাকবে আর তুমি ওর সুনজরে পড়বে একদিন এই তোমার আশা? সুরেন বিদ্রূপ করে উঠল: কিন্তু তার খপ্পরে যদি পড়ো কখনো প্রাণটি হারাবে শেষকালে। খুনে মেয়ে—ডাকাত মেয়ে।

অনঙ্গ বললে, - তা হোক। তবু আমার প্রতীক্ষা করবার সময় নেই।

—ব্যাপারটা বড্ডো ধোঁয়া হয়ে গেলো যে। বিয়েও করবে না, অথচ পেতে হবে—অথচ আবার এইখানেই তার সঙ্গে ইনামগঞ্জের ইনামউলিদের সঙ্গে তফাৎ—প্রণয়ের এটা কোন লক্ষণ? চলো, পা চালিয়ে চলো—ওষুধ জুড়িয়ে গেলো। এদিকে ওষুধ না পড়লে কাটবে না এ অসুস্থতা।

বিকেলে সুরেন অনঙ্গকে শত টানাটানি করেও বাড়ির বার করতে পারলো না। অগত্যা সে একাই বেরিয়ে পড়লো। কালাচাঁদ টেবিলে মদ রেখে গেছে, কিন্তু অনঙ্গর তা মুখে তোলবার কথা মনেও পড়ছে না। মদের চেয়েও আর কিছু আছে নাকি বিহ্বল-করা?

এই গৌরীকেই তার চাই। যে তাকে চায় না, তাকেই তার পেতে হবে। নির্জীব অপদার্থের মতো অপমান সয়ে চুপ করে চলে আসতে হবে এই অপৌরুষের গ্লানি অনঙ্গকে দেহে-মনে অসুস্থ করে তুললো। তার কামনার এইটুকু মাত্র পরিমাণ! মাত্র এইটুকু বাধাকে সে পরাভূত করতে পারবে না?

অনঙ্গ বারান্দায় অস্থির হয়ে পাইচারি করতে লাগলো। কিন্তু কী-ই উপায়! যে মেয়ে নিজের প্রেরণায় এগিয়ে আসে না, তাকে বশীভূত করবার মতো প্রবলতম শক্তি বা প্রভুত্ব কী থাকতে পারে? এ-ক্ষেত্রে বিয়ে করতে গররাজি তো বটেই, বিশেষ করে, অনঙ্গকে সে দস্তুরমতো ঘৃণা করে—লালসা ছাড়া যার বিজ্ঞাপন নেই কুটিল মুখভঙ্গি করে স্পষ্ট সে তা জানিয়ে দিয়ে গেলো! অবস্থা ও ঘটনার পাকেচক্রে ফেলে তাকে আয়ত্ত করার মাঝেও বা উন্মাদনা কই! সে পাবে শুধু গৌরীর নিষ্প্রাণ নিরুত্তাপ দেহটা,—মন তার মিউনো, নিরুত্তেজ, তাতে আর স্বতোৎসারের অজস্রতা কই। গৌরী সেই জাতীয় মেয়ে নয় যে স্বামী

আখ্যার যে কোনো একটা থাপের মধ্যেই নিজেকে মানিয়ে নেবে সহজে—স্বামীর চেয়ে ব্যক্তির সে সাধিকা।

সব বিষয়ে তার একটা স্পষ্ট হাঁ-না আছে, রুচি বলে একটা দুর্লভ গুণের সে চর্চা করে, এবং যে-মত সে পোষণ করে তাকে আঁকড়ে থাকার মতো বলিষ্ঠ দৃঢ়তার সে অধিকারী। সময়ে হয়তো সে মত আরো প্রসারিত হবে—ধরা যাক, কালক্রমে বিয়ে সে একদিন হয়তো করবেও, কিন্তু তা তার নিজের মনোনয়নের স্বপ্নে রঞ্জিত করে—অনঙ্গর এই রূঢ়, অশোভন ও অনাবৃত প্রস্তাবের মতো তা একমাত্র শরীর-বিজ্ঞানের বিধি-নিয়ম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে না।

দরকার নেই এই মন নিয়ে খেলা করবার। পদে পদে তখন অমিল, পদে-পদে যতিভঙ্গ। হয়তো বা নানা রকম ছোটখাট অনুদারতা, হয়তো বা কদর্য বিদ্রোহ! ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু-শুধু একজনের মনকে কুঁকড়ে পঙ্গু করে দিয়ে লাভ কি? মন নিয়ে কারবার করবার আইন-কানুন কিছুই তার জানা নেই—অসংখ্য তার অনাবিষ্কৃত গলি-ঘুঁজি! তার চেয়ে দেহটা অনেক সহজ, অনেক স্থূল, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সহজেই তা বোধগম্য। কিন্তু গৌরী সম্বন্ধে তেমন একটা অপরিচ্ছন্ন চিন্তা মনে আনতেও অনঙ্গর গায়ে এখন ছুঁচ ফুটতে লাগলো। মন দিয়ে পাবার মতো এ মেয়ে—যার জন্যে জীবনে দুঃখ সহ্য করতে হয় না।

অনঙ্গ সিগারেট ধরালো। ক্ষণিক আগুনের কণার মাঝে সে গৌরীর সেই তেজোদ্দীপ্ত মুখের নিষ্ঠুর লাবণ্য দেখলে। কপাল ছাড়িয়ে প্রায় গালের ওপর আঁকাবাঁকা দুচারটি চুল উড়ছে, নির্ভীক দৃষ্টিতে স্বাধিকারবোধের দুঃসহ দীপ্তি, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে অটল সঙ্কল্প। সব মিলে যেন একটা স্বতন্ত্র ও স্বরূপময় অভিব্যক্তি। এই মেয়ে যাকে নিজে থেকে ভালোবাসবে পৃথিবীতে সেও নিশ্চয় অসামান্য! সেই অজ্ঞাত পুরুষের প্রতি তীব্র ঈর্ষায় তার গা জ্বলতে লাগলো। সেই দিন থাকলে তাকে সে ডুয়েল লড়বার জন্যে আহ্বান করতো। তার হাতে তবু সে মরতো, কিন্তু এমন নিরানন্দ পরাজয়ের লজ্জা বহন করে চুপচাপ তাকে বাঁচতে হতো না।

সুরেন ফিরে এলো। চেঁচিয়ে বললে,—সে কি হে, গ্লাস যে ভরতি! এখনো সেই নেশাতেই মশগুল নাকি?

টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে অনঙ্গ বললে—হচ্ছে, বোস। তোমার সঙ্গে আমার জরুরি পরামর্শ আছে। আমি কিছুতেই ঐ প্রত্যাখানের অপমান সইতে পারবো না।

সুরেন চেয়ে দেখলো অনঙ্গর মুখটা স্ফীত, চোখ দুটো ঠিকরে পড়ছে হিংস্রতায়।

—কখনো না। সায় দিল সুরেন।

নয়

ননীকে দিয়ে গৌরী অতুলকে ডেকে পাঠালো।

এমনি করে সত্যি সে হেরে যাবে নাকি? বাবা-মা যাকে খুশি ধরে নিয়ে এসে স্বামীর আসনে বসিয়ে দেবেন, আর তাকেই অম্লানমুখে তার দাসত্ব করতে হবে? এই উৎপাতের কোনো প্রতিবিধান থাকবে না? এই বন্ধন ও আত্ম-বিলোপের অসম্মানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই তার পাপ হবে? বাবা অনেক কিছু শাসাচ্ছেন—অবস্থা তাঁর খারাপ, জীবনে এমন একটা দাঁও পাওয়া তাঁর বহু জন্মের সঞ্চিত সৌভাগ্য, এখন, মেয়ে হয়ে বাপ-মাকে না রক্ষা করলে কিসের সে লেখাপড়া শিখেছে! দিক তবে পড়াশুনা বন্ধ করে—কে তাকে আর পড়াবে, কার এতো পয়সা। তার জন্যে জীবন নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলবে? তার এখন অনেক সময়, অগাধ ভবিষ্যৎ। তা সে এমনি এককথায় বাপ-মায়ের তুচ্ছ আত্ম-তৃপ্তির জন্যে নিঃশেষ করে ফেলবে নাকি? বাপ-মা আর কদিনই বা বাঁচবেন? তাঁদের বুড়ো বয়সের মিথ্যে সুখের জন্যে এই এমন একটা মূর্তিমান অত্যাচারের কাছে তার মাথা নোয়াতে হবে! না পড়ান, নাই পড়াবেন—যতোটুকু তার জ্ঞান হয়েছে তাতেই সে এই অকল্যাণকে পরিহার করতে পারবে। এ তো বাপ-মায়ের জন্যে আত্মত্যাগ নয়, অপমৃত্যু; তাতে মহিমা নেই—নিজেকে সে এমনি করে কলঙ্কিত ও লুণ্ঠিত করবে না।

অতুল আসতেই ভবনাথবাবু তাকে নিয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা বিশদ করে তাকে বুঝিয়ে দিলেন, এবং এ-ক্ষেত্রে গৌরীর এমনি ঘাড় বেঁকিয়ে বসে থাকাটা যে কী প্রকাণ্ড মূর্খতা সে সম্বন্ধেও তাঁর বক্তৃতা বিস্তারিত হলো। পরে বললেন,—তুমি একটু বুঝিয়ে বলো। তোমার কথা ও খুব মানে—ছেলেবেলা থেকেই। মাথায় যে ওর কী ঢুকেছে—কিছুতেই বাগাতে পারছি না। তুমি বললেই বোধকরি হবে।

গৌরী যে বিয়ে করতে চাইবে না—অতুলের কাছে এ-খবরটায় কোনো নতুনত্ব নেই, তবু কথাটা শুনে তার গায়ের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললে—কেন বিয়ে করতে চায় না?

—ফ্যাশান, ফ্যাশান, কলকাতায় পড়তে গিয়ে যতো রাজ্যের ঢং শিখে এসেছে। বলে, বিয়ের জন্যে এখনো প্রস্তুত হই নি। এতো বড়ো ঢেঁকির মুখে এমন আজগুবি কথা শুনেছ কোনোদিন?

চারদিকে চেয়ে অতুল বললে,—কিন্তু অনঙ্গ এমন কী যোগ্য পাত্র!

—তুমি বলো কী, অনঙ্গ যোগ্য পাত্র নয়?

—খালি টাকাই দেখেছেন বুঝি?

অসহিষ্ণু হয়ে ভবনাথবাবু বললেন,—টাকা কেন, শিক্ষা দীক্ষা স্বাস্থ্য সব মিলিয়ে এমন চমৎকার পাত্র বাংলা দেশে ক'টা মেলে?

—কিন্তু চরিত্র?

—তোমাদের ও-সব কথায় বিশ্বাস করি নে বাপু। তা একটু যদি দুর্বলতা থাকেও, সহজেই তা সে কাটিয়ে উঠতে পারবে। তার সে উদ্বৃত্ত শক্তি আছে। তা ছাড়া নিজে সে গৌরীকে পছন্দ করেছে—নিজে সে সেধে বিয়ে করতে চায়।

অতুল চমকে উঠলো: নিজে?

—হ্যাঁ, তার জন্যেই তো গৌরী বেশি বিগড়েছে। বলে অপর পক্ষের মতো তার নিজেরো একটা পাত্র বাছবার স্বাধীনতা আছে, তা সে খাটো করতে পারবে না। বিয়েতে একেবারে তার অমত নেই, অমত হচ্ছে ঐ বাছাই নিয়ে।

ঠিকই তো। তাকে তার নির্বাচনের স্বাধীনতা দেবেন বই কি। বলতে কী আনন্দ অতুলের।

—কিন্তু যদি সে ভুল করে? মূর্খতা করে?

—তবু তার নির্বাচনের মর্যাদা ম্লান হবে না।

—এই কান মলছি অতুল, এইখেনেই খতম,—মেয়েকে আর আমি মেমসাহেব বানাতে পারবো না। থাক ধুমসো হয়ে ঘাড়ে চেপে—নিজেই পস্তাবে শেষকালে। ভবনাথবাবু বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: তাও বা বাপ হয়ে কী করে হতে দিতে পারি বলো? তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলো না,—তুমি বললেই বোধহয় হয়। বিয়ে যখন একদিন করবেই, তখন রূপে-গুণে টাকা পয়সায় এমন পাত্র ওর মিলবে কোথায়? বয়েস বেড়ে-বেড়ে চেহারাটাই শুধু দড়ি পাকিয়ে যাবে। সোনার সুযোগ আর আসবে না।

অনেক কথা একসঙ্গে বলাই ভবনাথবাবুর অভ্যাস: কিন্তু এতোগুলি কথার মধ্যে থেকে কোন কথাটা যে বেছে নেবে সহসা অতুল ঠিক করতে পারলো না। নিজে নির্বাচন করে গৌরী আত্মদান করবে—বিদ্যা বা খ্যাতি, রূপ বা সম্পত্তি, আর কোনো কিছুকেই সে মূল্য দেয় না—সে চালিত হবে একমাত্র নিজের ইচ্ছায়,

নিজের প্রেমের প্রবলতায়; কথাটার এই সত্য অর্থ কি না, ঠিক নিঃসংশয় না হলেও অতুল গভীর সুখাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে রইলো! মনে হলো গৌরীর সেই সর্ত সে-ও হয়তো পূর্ণ করতে পারে! ভালোবাসাই কি বিদ্যা নয়, খ্যাতি নয়, রূপ নয়, নয় কি সমস্ত সম্পদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ? আশ্চর্য, ভাবতে সাহস হল অতুলের।

এমনি সময় গৌরী ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। পরনে একরঙা পাতলা একখানা খদ্দর—জমিটা বিকেলের আকাশের মতো ম্লান নীল, গায়ে সেই রঙেরই ঢিলে একটা ব্লাউজ, কাটা-হাতের ওপর সরু একটু কাজ, আঁচলটা এখানে-সেখানে এলোমেলো—যেন সমস্ত দেহে অসহ চঞ্চলতা। এসেই বললে,—তোমার সঙ্গে মাঠে একটু বেড়াতে যাবো। চলো। বলে সে ভবনাথবাবুর দিকে চাইল।

ভবনাথবাবু নিজে আজ আর সঙ্গে যেতে চাইলেন না; বললেন,—যাবি যে, শিগগির ফিরিস। বলে অতুলের দিকে চেয়ে চোখ টিপে তিনি তাকে আগের কথাটা মনে করিয়ে দিলেন,—যেন অন্যথা না হয়।

—চলো। উৎসাহে উথলে উঠলো অতুল।

দুজনে মাঠে নামলো। কারু মুখে কোনো কথা নেই। জোরে হাওয়া বইছে, আকাশে অল্প-অল্প মেঘ। পড়ন্ত দিনের আলোয় এই স্তব্ধতাটি অতুলের মনে নতুন একটি স্তোত্রের ভাষা নিয়ে এসেছে। কী তার অর্থ কে জানে, কিন্তু মন্ত্রের পরিবেশটি যে পবিত্র তাতে সন্দেহ কী।

গৌরীই প্রথমে কথা কইলো। বললে,—তোমার সঙ্গে আমার গুরুতর একটা কথা আছে, অতুলদা।

অতুল ঢোঁক গিলে জিগগেস করলো: কি? তোমার জন্যে একটি ভালো বর দেখে দিতে হবে, এই তো?

হাওয়ায় আঁচলটা গায়ের ওপর সামলাতে-সামলাতে গৌরী বললে—সেই জন্যে তোমাদের কারুর কষ্ট করতে হবে না, সে আমি নিজেই পারবো।

—পারবে? চিনবে তো ঠিকঠাক?

—তাকে চিনতে দেরি হয়না কখনো। গৌরী হঠাৎ থামলো, বললে,—এসো এই গাছতলাটায় বসি।

—না আরো এগিয়ে চলো। সহসা সমস্ত দেহে উদ্দীপ্ত গতির ঢেউ জাগলো অতুলের।

—হ্যাঁ, থামলেই কেমন যেন দুর্বল মনে হয়। কথাটা হচ্ছে এই তোমার সঙ্গে আজ শেষরাত্রের গাড়িতে লুকিয়ে আমি কলকাতা যাবো।

—কলকাতায়? সহসা অতুলের চোখের সামনে এক ইন্দ্রপুরীর দরজা যেন খুলে গেল আকস্মিক।

—হ্যাঁ—আপ-গাড়িটা কখন আসে এখানে? তিনটে চুয়ান্ন, না? সেই গাড়িতেই।

অতুল আচ্ছন্নের মতো বললে,—হঠাৎ? কী হলো?

গৌরী বললে,—বাবার মুখে সব কথাই তো শুনলে—কেন মিছিমিছি জিগগেস করছ! আমাকে জোর করে তাঁরা কে-কোথাকার এক বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াবেন। জোর আমারো থাকতে পারে, আর তা খাটাতেও পেছপা হব না। আমার অবাধ্যতায় মা উপোস করে আছেন, বাবা শতমুখে শাপ দিয়ে চলেছেন, তা হোক গে, আমি কিছু মানবো না। আমাকে বাঁচতে হবে। আমি কলকাতা পালাবো।

—কলকাতায় কী আছে?

—আমার বাঁচবার জায়গা। বুক ভরে নিশ্বাস নেবার জায়গা। ওঁরা পড়তে আমাকে আর পয়সা দেবেন না,—বয়ে গেলো, আমি অনায়াসে একটা টিউশানি বা অন্য কিছু জোগাড় করে নিতে পারবো। আমাকে তোমায় নিয়ে যেতে হবে—আজই।

—আজই? আনন্দ না আতঙ্ক, নিজের অগোচরে প্রতিধ্বনিত হল অতুল!

—হ্যাঁ, আজই—

—পারবে না? না পারলে চলছে না। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

সর্বাঙ্গে শিউরে উঠলো অতুল।

—দিন তিনেক তো মোটে লাগবে, আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে এসো। মাঝে তো একটা রবিবার পড়ছে—দু'দিনের কামাইয়ে তোমার চাকরির ক্ষতি হবে না।

অতুল কি আবার সহসা ম্লান হয়ে গেল? বা, ঠিকই তো বলেছে গৌরী। ফিরে না এলে তার চাকরি বিপন্ন হবে না, সংসার যাবে না ছত্রখানে? তাছাড়া কলকাতায় অতুলের স্থান কোথায়, সংস্থানই বা হবে কিসে? সব দিকেই চোখ খোলা গৌরীর, অতুলকে তাই সে জড়াতে চায় না সমস্যায়।

অতুল তার দিকে গাঢ় চোখে চেয়ে বললে,—কিন্তু বিয়ে করলেই তো সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। যার জন্যে পড়া তারও সহজে সিদ্ধি মেলে।

রুক্ষ গলায় গৌরী বললে,—হোমরাচোমরা বিয়ে করবার জন্যেই আমি লেখাপড়া শিখছি নাকি? কুৎসিত মেয়ের বিয়েতে বরপণ নেওয়ার মতো লেখাপড়ার সস্তা মোহে বরপণ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাও সমান বিশ্রী। তার জন্যে নয়, জীবনে আমার তার চেয়েও বড়ো আকাঙ্ক্ষা আছে। সেই জন্যেই লেখাপড়া আমি করবো।

—বেশ তো। বিয়ে করলেই কি তা আরো সহজ হয়ে উঠবে না? অতুলের গলা কেঁপে উঠলো: এমন বড়লোক ছেলে—

—এ কি শ্বশুরের পয়সায় বিলেত যাওয়া নাকি? কেন, আমার নিজের হাত-পা নেই, নিজের প্রতিজ্ঞা নেই, বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করবার শক্তি নেই? আমি নিজে বড়লোক হতে পারি না? আজ বড়লোক নই বলে নিজেকে ছোট মনে করে নীচ ভিক্ষুকের মতো অত্যাচারীর পায়ের তলায় বসে দাসত্ব করতে হবে?

গৌরীর দিকে অতুল পরিপূর্ণ করে চেয়ে রইলো। নক্ষত্রাকীর্ণ আকাশের মতো ধীরে ধীরে সে তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। তবু তাকে আরো পরীক্ষা করবার জন্যে কথায় সামান্য একটু ব্যঙ্গের সুর মিশিয়ে সে বললে,—রূপে গুণে এমন চমৎকার পাত্র—ব্যাঙ্কে যার অগাধ টাকা, নিজে যেচে যে বিয়ে করতে চায়, কোনো দাবি-দাওয়া নেই,—এমন বিয়ে তুমি অত্যাচার বলো?

গৌরী জোর গলায় বললে,—একশো বার। তার চেয়ে আরো কঠিন কথা বলা উচিত ছিলো—বাঙলা পত্রিকার ভাষায় দস্তুরমতো এ ধর্ষণ। চিনি না জানি না—হঠাৎ আমাকে অধিকার করবার জন্যে সে লেলিহান হয়ে উঠবে? আমাকে দেখেই সে যেচে বিয়ে করতে চায়, তার এই চাওয়ার মধ্যে উগ্র ও কুৎসিত কামনা ছাড়া আর কী থাকতে পারে? তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই অতুল-দা—এই ব্যাভিচারকে আমি শাসন করবো। বাবা মা ঘায়েল হন—কী করা যাবে, কিন্তু এই নির্লজ্জ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার অধিকার আমার আছে। তুমি আমার সহায় হও।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিয়ে অতুল বললে,—কিন্তু বিয়ে তো তুমি একদিন করবেই।

—তা হয়তো করবো। সমস্ত জীবন মেয়েমানুষ বিয়ে না করে আছে এই মর্মান্তিক দৃশ্য আমি ভাবতে পারি না! কিন্তু সেই বিয়েতে আমার সমান ভোট থাকবে। সেই পাত্র আমি রচনা করবো. তার বিচার থাকবে আমারই হাতে!

তার কাছে আমার কাম্য, রূপ না বিত্ত, না আর কিছু, আরো অনেক বড়ো কিছু, তা আমি বুঝবো। সমাজের চোখে দুর্ধর্ষ ও বলশালী একজন সামনে এসে দাঁড়ালেই সম্মান বিসর্জন দিয়ে নির্বিবাদে তার সেবাদাসী সাজবো না। দাঁড়াও, হাত ধরো অতুল-দা—সামনে যে চওড়া একটা আল পড়ে গেলো। না ধরলে যে পারবো না পেরোতে।

গৌরীর হাত ধরে অতুল তাকে পার করে দিলো।

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ। পাশাপাশি দুখানি হাত তেমনি পরস্পর সংলগ্ন, দুই দেহের ব্যবধান অতিমাত্রায় সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। যেন দূর হয়েও কোন দিগন্তে আকাশ আর পৃথিবী পরস্পরকে ছুঁয়ে এক হয়ে গিয়েছে।

এই স্পর্শটুকু আবহাওয়াকে আরো গভীর করে আনলো। আরো রহস্য-রঙিন।

প্রেম অমিতশক্তিশালী দুর্ধর্ষ দেবতা—দুর্দমনীয় তার আকর্ষণ। সংসারে কী না সে অঘটন ঘটায়! কী না অসম্ভব সাধন করতে পারে! অতুল আজ, এখন, এ মুহূর্তে, এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে যদি সত্যি-সত্যিই কাউকে ভালোবাসা যায় তাকে পাওয়া যায় না। এ নিতান্ত মিথ্যা কথা; সৃষ্টির এ বিরাট সমন্বয়ের মাঝখানে এই অসামঞ্জস্য শোভা পায় কী করে! দিনের পর রাত্রির মতো ধ্যানের পর পরমসিদ্ধির মতো এ একটা অতি সাধারণ সহজ সত্য কথা। সমস্ত বাধা সে লঙ্ঘন করে, সমস্ত ব্যবধান সে ভরাট করে আনে। সমস্ত শূন্যতাকে দেখে সে ক্ষমার চোখে। তার কাছে আর কোনো-কিছুর বিচার নেই, আগুনের মতো সে সর্বভুক, শিখার মতো সমস্ত দূরায়ত্তের সে নাগাল পায়।

হাতের স্পর্শের মাঝে অতুল সমস্ত দেহের চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করে আনলো। মনে হ'লো এই ক্ষীণতম স্পর্শের মাঝেই প্রেম তার স্বাক্ষর রেখে গেছে—একদিন গৌরী তার নাম পড়তে পারে। থাক সে কলকাতায়, এতটুকু তার ভুল হবে না ঠিকানায়।

হাতখানা আরো নিবিড় করে ধরে অতুল বললো,—যাকে তুমি বাছাই করবে, গৌরী, সে এর মতো লাভজনক না-ও হতে পারে। ধরো, খুব গরিব, খুব অখ্যাত, অহঙ্কার করবার কিছুই তার নেই।

স্পর্শের মাঝে সমস্ত যৌবন ঢেলে দিয়ে গৌরী বললে—হোক, তবু তাকেই আমি নিজে বেছে নিলাম, জীবনে সেই আমার প্রকাণ্ড লাভ। প্রকাণ্ড সৃষ্টি। প্রয়োজনের জগতে যতো অযোগ্যই সে হোক, আমার ভালোবাসা সে পাবে এই তার পরম অহঙ্কার। আর সে দেবে আমাকে পৌরুষ এই আমার পরম দীপ্তি।

কিন্তু আর এগোয় না, অতুল-দা, এবার ফেরা যাক। আকাশে এরি মধ্যে দিব্যি মেঘ করে এলো যে।

দুজনে ফিরলো। মাঠ অন্ধকার—চারদিকে গাছের পাতাগুলি হাওয়ায় সন্‌সন্‌ করছে।

গৌরী ব্যস্ত হয়ে বললে—তবে সেই কথা রইলো। আমাকে আজ কলকাতায় নিয়ে যাবে।

অতুল কঠিন মাটিতে নেমে এলো। বুঝি হাঁসফাঁশ করে উঠলো। বললে—কী করে?

গৌরী হেসে বললে—কী করে আবার! এমনি হাত ধরে। দুটো বাজতে না-বাজতেই বিছানা ছেড়ে উঠে আসবে, রাস্তার ধারে সিঁদুরে আমগাছটার তলায় চুপ করে ঘুপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি টুক করে বেরিয়ে আসবো। তার পরেই দু'জনে দে ছুট।

ভয় পেয়ে অতুল বললে,—বলো কী! জানাজানি হয়ে যাবে না?

হাতে চাপ দিয়ে গৌরী বললে,—তা তো হবেই। জানাজানি হওয়াই তো চাই! নিজেকে এমন করে যে অপমান করলুম না, এ-কথাটা সবাইকে উঁচু গলায় জানিয়ে দিতে হবে না?

অতুল হতভম্বের মতো বললে—কলকাতায় আমি যাবো কোথায়? আমি কী করবো? সেখানে আমি কাকে চিনি?

—তোমার কাউকে চিনতে হবে না। সটান আমি মীরা দত্তদের বাড়ি গিয়ে উঠবো—ঝামাপুকুর লেন-এ। টাকা পয়সারো কিছু ভাবনা নেই, আমার কাছে আছে। কেবল তোমার একটু অভিভাবকত্ব দরকার। পথটা যাতে নিরাপদ হয়। সন্দিগ্ধ কৌতুহল কারু না জাগে। দাঁড়াও, আবার সে আল্‌। আস্তে। এখানটা যে দেখছি ঢের চওড়া। পথ ভুল হল নাকি? কালকের বৃষ্টিতে এতো জল জমে গেছে?

হাত ধরা ছিলো, অতুল খানিক্ষণ একটু দ্বিধা করে—হঠাৎ গৌরীকে পাঁজাকোলে করে নিলো। আকস্মিক চাঞ্চল্যে গৌরী উঠলো অনর্গল হেসে। পায়ের দিকের সাড়িটা ক্ষিপ্রহাতে টেনে দিতে-দিতে সে বললে—দাও এবার লাফ!

শুধু একটা আল নয়, গৌরীকে বুকে নিয়ে এমনি করে উত্তরঙ্গ জীবনসমুদ্র পারবে কি সে উল্লঙ্ঘন করতে? বাহুতে আছে তার সেই শক্তি, বুকে আছে তার সেই বিশ্বাস?

একলাফে জলটা পেরিয়ে এসে অতুল বললে,—তুমি কী হাল্কা! যেন একটা ছোট্ট পাখি।

কোল থেকে নামতে-নামতে গৌরী বললে—অনায়াসে তুমি এমনি করে আমাকে নিয়ে মাঠ দিয়ে ছুটে যেতে পারো না?

—কোথায়? শূন্য চোখে তাকাল অতুল।

—ইস্টিশানে। আবার কোথায়?

—সে যে অনেকটা পথ।

—ভয় নেই, আমি হেঁটেই যেতে পারবো। তা হলে আরো আগে বেরতে হবে। আসবে তো ঠিক? দেখো—

অতুল চিন্তিত মুখে বললে—আমাকে যেতেই হবে বলছ?

—নইলে আর আমার আছে কে?

—কিন্তু বলছি কী, না গেলেই কি নয়? আর কটা দিন—

—না, আর দেরি নয়। পালাতে জানাও বাঁচাতে জানা। বাবার সঙ্গে সঙ্গে হরিশ-খুড়োও চটে-মটে আগুন হয়ে আছেন। তাই তোমার কাছে আসা। বেশ, না পারো, ইস্টিশানে পৌঁছে দিয়েই এসো অন্তত। একাই আমি যেতে পারবো। তোমার কথা কেউ কিছু জানতেও পাবে না। কেমন? এটুকু রাজি তো? মাঠ দিয়ে একা-একা তো আর যেতে পারি না! না, তাও পারবে না?

অতুল গৌরীর অন্য হাতখানা এবার অন্য হাতে তুলে নিয়ে বললে,—খুব পারবো। কলকাতাতেই নিয়ে যাবো তোমাকে।

গৌরী খুশি হয়ে বললে,—তুমিই তো যাবে—নইলে, এ-বিপদে কার ওপর আমি নির্ভর করবো বলো? কাচারি পর্যন্ত গিয়ে বাস নেবে, অতুল-দা? তা হলে তো সেই বারোটার সময় বেরোতে হয়।

—না, না বাস-এ বিস্তর চেনা লোক বেরুবে। আর তুমি তো নিদারুণ ফেমাস। বরং একটা গাড়ি ঠিক করে রাখবো। নাজির মিঞাদের পুকুরের ধারে বাদামতলায় দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে। সেই গাড়িতে করে ঢাকাঢুকি দিয়ে চলে যাবো দুজনে।

গৌরী চিন্তিত মুখে বললে,—তাইতেও তো গাড়োয়ানের সন্দেহ হবে না এমন নয়। তাছাড়া আমাদের এ-পালানোয় কেউ সাক্ষী থাকে এ আমি পছন্দ করি না।

অতুল অভিভূতের মতো বললে,—আমরা তা হলে সত্যিই পালাচ্ছি, তাই না? কিন্তু তার পর?

—তুমি নও, আমি পালাচ্ছি।

—আর আমি?

—তুমি তো আমাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছো এখানে। তুমি পালাতে যাবে কেন?

অতুল ভারি গলায় বললে,—হ্যাঁ, আমাকে তো আসতেই হবে ফিরে। ঠিকই তো! কলকাতায় আমার ডেরা কই, চাকরি কই? আমার ঘরবাড়ি চাকরি সব যে এখানে। কিন্তু যাই বলো, ফিরে এলে পরে আমার আর রক্ষে থাকবে না।

আঙুলে আঙুলগুলি জড়িয়ে গৌরী বললে,—কেন, তোমার ভয় কিসের?

—সবাই বলবে আমিই তোমাকে বার করে নিয়ে গেছি।

—বলুক না, যার যা খুশি। বার করে নিয়ে গেছ তাই বা বলুক না, তাতে আমাদের কী এসে যায়? হোক অন্যায় নিন্দা, আমার জন্যে কী তুমি তা পারবে না সইতে? এই অন্যায় নিন্দার ভয়ে তুমি যদি পিছিয়ে থাকো, অতুল দা—

অতুল বললে,—তোমার জন্যে আরো অনেক কিছু আমি সইতে পারি, কিন্তু এখন তো তোমাকে শুধু কলকাতায় পৌঁছে দিয়েই আমায় ফিরে আসতে হবে।

—হ্যাঁ,—গৌরী বললে—বেশি দিন তুমি থাকবে কী করে? তোমার আপিস আছে না? মা-ভাই আছে না? তবে সেই কথাই রইলো, ভুলো না। বরং পায়ে হেঁটেই স্টেশনে যাবে। আগেভাগেই এসো, ছুটোর সময় নয়—ধরো বারোটায়, তখুনি বেরিয়ে পড়বো, কেমন? অন্ধকার মাঠ দিয়ে গভীর রাত্রে দু'জনে তখন আমরা চলেছি।

আঙুলগুলি আস্তে-আস্তে ছেড়ে দিয়ে অতুল বললে,—কিন্তু যত দূরেই যাই আমাকে তো আবার ফিরেই আসতে হবে। গিয়ে তবে আমার লাভ কী!

—লাভ কী মানে! তুমিও সংসারে খালি লাভ খোঁজ! আমাকে আশ্রয়ে উত্তীর্ণ করে দেবে এই তোমার লাভ। বেশ, যাও, তোমাকে নিয়ে যেতে হবে না। দয়া করে স্টেশন-অবধি পৌঁছে দিতে পারবে?

অতুল চুপ করে রইল।

গৌরী কঠিন গলায় বললে,—না, তারো দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারবো। পৃথিবীতে আমি একাই এসেছি, একাই থাকতে চাই। যাও, তোমাকে আর জড়াবো না, যা হবার তা খালি আমার একলারই হবে। গৌরীর

এই অভিমান সহসা মাঠ ভরে অন্ধ ঝড়ে ফুঁপিয়ে উঠলো। কথার রেশটা না কাটতেই ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে এসেছে। দেখতে দেখতে—পায়ের নিচে নরম মাটি কাদা হয়ে গেলো। কোনোদিকে কিছু আর দেখা যায় না—আগাগোড়া অন্ধকার। শুধু ঝড়ের শাসানি। বৃষ্টির প্রহার।

কোমরে-বুকে আঁচলটা রাশীভূত করে গৌরী তার পদক্ষেপের ক্ষিপ্রতা বাড়িয়ে দিলে। সেই সঙ্গে পা মিলিয়ে অতুলও চললো পাশাপাশি। দু'জনে অনর্গল ভিজে চলেছে। পায়ের দিকের শাড়ি জলে-কাদায় সপসপ করছে, ফাঁস খোঁপাটা কিছুতেই মাথার উপর এঁটে বসছে না—পিঠময় চুল ছড়িয়ে গৌরী এগিয়ে চললো! অতুলের মুখেও কথা নেই। সে শুধু ঝড় দেখছে, ঝড় শুনছে, অন্তরে বইছে তার বোবা কান্না।

সামনেই রাস্তা—তার পরে আরো কয়েক পা মাঠ পেরিয়ে তবে গৌরীদের বাড়ি। খানিক বাদে দেখা গেলো কে-একজন সেই দিক থেকেই এগিয়ে আসছে। মাথায় ছাতি, হাতে টর্চ, কোঁচাটা হাঁটুর কাছে গুটোনো। আলোটা আর একটু কাছে আসতেই বোঝা গেলো—আর কেউ নয়, ভবনাথবাবু। অবাধ্য মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন।

রাস্তায় উঠে গৌরী বললে—এবার তুমি বাড়ি যাও, বাবাই এসে পড়েছেন যা-হোক। জলে ভিজিয়ে অনেক তোমাকে কষ্ট দিলাম।

অতুল হেসে বললে,—তোমার জন্যে আরো অনেক কষ্ট সইতে পারি—সেজন্যে তুমি ভেবো না। বেশ, আমি আসবো বারোটায়—সিঁদুরে আমগাছের তলায়। যেখানে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে—যতোদূরে।

হায়, গৌরীই তো তাকে নিয়ে যাবে। সে নিয়ে যাবে না গৌরীকে। সে শুধু পার করে দেবে, বার করে নেবে না।

ভবনাথবাবু এসে পড়েছেন।

চাপা গলায় গৌরী বললে,—ঠিক এসো কিন্তু। এই তো কথার মতো কথা।

—আসবো! তুমিই যেন ভুলো না। তবে আমি যাই। ঐ তো জ্যেঠামশাই এসে গেছেন। ঠেসে বকুনি খেয়ে নাও। আর ক'টি মাত্র তো ঘণ্টা। বলে অতুল তার বাড়ির দিকের অন্য রাস্তা ধরলো।

—শোনো, শোনো, অতুল। ভবনাথবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

দূর থেকে অতুল বললে,—কাল সকালে আসবো, জ্যেঠামশাই। প্রায় বাগিয়ে এনেছি। প্রায় রাজি হয়েছে। আর দেরি নেই—সব ঠিক হয়ে যাবে।

অতুলের মুখে এই কথা শুনে মেয়ের ওপর রাগ তাঁর কিছু কম পড়লো।

নইলে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে এখনো মাঠে বেড়ানোর মধ্যেও তার সেই দুর্বিনীত বিদ্রোহাচারণেরই আভাস আছে। কিন্তু অতুলের কথায় আশ্বাস পেয়ে ভবনাথবাবু নরম গলায় বললেন,—এ কী হয়েছিস ভিজে ? এই নে, ছাতা নে।

দু'জনে ছাতার নিচে মাথা গুঁজলো।

হু-হু করছে হাওয়া, প্রবল জলের ঝাপটায় পথ ঘাট ঝাপসা, টিপ টিপ বাতির আলোতে ঠাহর হলো। আর কয়েক পা এগোলেই বাড়ি। অন্ধকারে নিঝুম হয়ে আছে—ঘুমে বিভোর। কেবল মাঠ ভরে অনর্গল জলোচ্ছ্বাস। গৌরী সেই জলের শব্দে তার নিরুদ্দেশ যাত্রার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তার জয়যাত্রার শব্দ।

সেই জলের মধ্যে কোথা থেকে চার-পাঁচটে প্রকাণ্ড লোক হঠাৎ তাদের সামনে এসে খাড়া হলো। লোকগুলির মুখ চেনবার জন্যে ভবনাথবাবু হাতের টর্চটা পর্যন্ত উঁচু করতে পারলেন না। বলা-কওয়া নেই, তাঁকে তারা ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিলো। আকস্মিক আক্রমণে তিনি এতো হকচকিয়ে গেলেন যে মুখ দিয়ে তাঁর একটা প্রতিবাদের ভাষা পর্যন্ত বেরুলো না। হুঁস যখন হলো, দেখতে পেলেন গৌরীকে তারা জাপটে ধরে কোলে কাঁধে করে অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। গৌরীর আর্তনাদে সমস্ত আকাশ টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ মানুষের আর্তনাদ না ঝড়ের গোঙানি তা কে বলবে।

হাতের ছাতা পড়েছে ছিটকে, টর্চ কোথায়—কোনোদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করে ভবনাথবাবুও তারস্বরে চীৎকার পাড়তে-পাড়তে তাদের পিছু-পিছু ছুটতে লাগলেন। মুহূর্তে যে কী হয়ে গেলো কিছুই তিনি ধারণা করতে পারলেন না। তবু তিনি প্রাণপণে ছুটে চলেছেন। গৌরীর চীৎকার বন্ধ হয়ে গেছে, খাঁচায়-পোরা পাখির মতো শেকল ছেঁড়বার অন্ধ চেষ্টায় সে ঝটপট করে ক্ষান্ত হয়েছে অনেকক্ষণ। খালি জল আর জল, জনবিরল মাঠের মধ্যিখানে কোথাও এতোটুকু আশ্রয় নেই। একটা মাটির ঢিবির উপর হোঁচট খেয়ে ভবনাথবাবু উলটে পড়ে গেলেন। অন্ধকারে গৌরীকে আর দেখা গেলো না। হঠাৎ দূরে আওয়াজ শুনলেন বন্দুকের। আর দেখতে-দেখতে তাঁরো চোখের দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে এলো।

এবার—আরো অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর—ভবনাথবাবুকে খোঁজবার জন্যে লোক বেরুলো। না ফিরলো মেয়ে, না স্বামী—কাদম্বিনী কান্নাকাটি তুলে বহু কষ্টে সেই ঝড়-জলের মধ্যেই লোক জোগাড় করলেন। বেরুলো হরিশ আর গোবর্ধন—লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে—সঙ্গে আরো সব লোক। কেউ নামলো মাঠে, কেউ নিলো রাস্তা। ভবনাথবাবুকে পাওয়া গেলো। জলে নিজেই আবার কখন

জ্ঞান পেয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এগোচ্ছেন। চেহারার কিছু আর নেই—গলা দিয়ে স্বর ফুটছে না।

তাঁকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসা হলো। কিন্তু গৌরী? গৌরী কোথায়!

বাড়িময় সোরগোল পড়ে গেলো।

হরিশ বললে—কান্নাকাটি করে লাভ নেই, বৌঠান, ওঁকে এখন দেখ। সব ব্যবস্থা করছি।

বলে হরিশ দল পাকালো। কেউ গেলো থানায় খবর দিতে, কেউ ধরলো মাঠ। কিছুতেই ওদের পার পেতে দেবে না।

আর—সেদিন রাত বারোটার সময়ও জল একেবারে ধরেনি। বাঁশের বাঁটের তালি দেওয়া ছাতাটা মাথায় দিয়ে অতুল সিঁদুরে আম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে গৌরীর প্রতীক্ষা করছিলো কখন সে আসে। তার সঙ্গেই সে যাবে—যেখানে তাকে সে নিয়ে যায়—বহুদূরের পথে। অনিশ্চয়তার উত্তাল সমুদ্রে। হোক কলকাতা নিরাত্মীয় নিরর্থক, আর সে ফিরবে না। সে জানে না ফিরে আসতে।

চারদিকে ঘন, জমাট অন্ধকার। সোঁ-সোঁ করছে হাওয়া, গাছপালাগুলোর আর্তনাদ থামছে না। বগলের নিচে পুরোনো খবরের কাগজে মোড়া তার সামান্য দু'খানা কাপড় ও শার্টের ছোট্ট পুঁটলিটি চেপে ধরে অতুল তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে—জলের ছাঁট এড়াতে কোঁচাটা তার হাঁটুর উপর উঠে এসেছে। চোখ তার ভবনাথবাবুর বাড়ির দিকে—কোথাও এক ফোঁটা আলোর আভাস নেই। দরজা-জানলাগুলি বন্ধ, কোনো সময় খুলবে বলে মনে হয় না। তবু প্রতীক্ষায় সমস্ত শরীর উচ্চকিত করে অতুল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো—কখন ক্ষীণ ও অচপল একটি বিদ্যুৎরেখার মতো গৌরী সমস্ত অন্ধকার—লজ্জার অন্ধকার, সংকোচের অন্ধকার, অপরিচয়ের অন্ধকার—সরিয়ে স্পষ্ট ও প্রখর হয়ে উঠবে!

তারপর সে আর জানে না। কতোদূরের পথ, কতো ক্ষণের উন্মাদনা—কিছুরই সে কোনো কূল পায় না। তবু সেই একমাত্র গৌরীর নির্ভর, তার অন্তরঙ্গতম আত্মীয়—সে ছাড়া তার আর কেউ নেই, কে বা থাকতে পারে সংসারে। আরো বিস্তৃত পরিচয়, আরো গম্ভীর অন্তর্নিবেশ, আরো সন্নিহিত উপস্থিতি—মনে ও শরীরে, দুঃখে ও সুখে, ত্যাগে ও কামনায়! গৌরীর জন্যে এইটুকু সাধনায় যদি সে বিমুখ হয়, তবে তার দুঃসাহসী যৌবনকে সে কী বলে অভ্যর্থনা করবে?

এই জলটা একটু ধরলো, হাওয়াটা পড়েছে। এখন রাত না-জানি কটা?

এইবারই সে আসবে। এতোক্ষণ বৃষ্টি থামবার আশায় শুয়ে ছিলো বলে শাড়িটা আর নির্ভাজ নেই, সেমিজের ওপর ব্লাউজটা এতো তাড়াতাড়ি হাতের ভেতর দিয়ে গলিয়ে নিয়েছে যে হুকগুলি লাগাবার পর্যন্ত সময় পায় নি, কাঁধের ওপর আলতো খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে। গুঁড়ো-গুঁড়ো জল এখনো পড়ছে বটে, তারই মধ্যে দু'হাত তুলে একটা ফাঁস দিতে-দিতে গৌরী এই ছুটে এলো। সঙ্গে কোনো জিনিস-পত্র নেই, বাধা-বন্ধন নেই—যেন নির্বারিত নিরাবরমূর্তি। এই এসে এক্ষুণি তার হাত ধরে নাড়া দিয়ে বলবে: চলো, পালাও, আর সময় নেই। এতো বড়ো আকাশের নিচে খালি আমি আর তুমি।

তার চাকরটি নেই, সংসার নেই, পিছ-টান নেই। ছাতা নেই, পুঁটলি নেই, কোনো হিসেব নেই। শুধু সে আর গৌরী। দুই দীপ এক শিখা।

এই এসে পড়লো বলে। এলোমেলো আঁচলে, ঘুমো-ঘুমো চোখে, হাওয়ার মুখে পল্‌কা পালকের মতো। তার আবির্ভাবের সম্ভাবনায় অতুল প্রতি রক্তবিন্দুতে রোমাঞ্চিত হতে লাগলো।

কিন্তু কোথায় গৌরী? মধ্যরাত্রির ট্রেন সিটি দিয়ে চলে গেল, গৌরী এল না। ঠাণ্ডা রাত পেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। হয়তো বা ভুলে গেছে। মত বদলেছে।

আচ্ছা ঘুমোক। শান্তিতে থাক।

পুঁটলিটা বগলে চেপে ছাতা বাগিয়ে ধরে বাড়ির দিকে রওনা হল অতুল। সে তো দিয়েই আসত, ফিরেই চলেছে সে।

দশ

গৌরীর তন্দ্রা যখন ভাঙলো তখন রাত্রির ঘোর প্রায় কেটে গেছে। ঘরময় নরম পাতলা অন্ধকার। থেকে-থেকে হালকা সুরে পাখিরা ডাকাডাকি করছে, বৃষ্টির পর সমস্ত শূন্যে শীতল একটি স্তব্ধতা।

আস্তে-আস্তে একটু-একটু করে তার এখন মনে পড়ছে। অকস্মাৎ কারা তাকে বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে, ব্যাপারটা ভালো করে আয়ত্ত করতে-করতেই সে জ্ঞান হারালো। কিন্তু সেই মূর্ছার মধ্যেও সে যেন আচ্ছন্নের মতো ব্যাপারটা অনুধাবন করে চলেছিলো—কতদূর এগোতে-না-এগোতেই কে-একজন সে গুণ্ডাদের সম্মুখীন হলো, দস্তুরমতো পথ রুখে দাঁড়ালে। উজ্জ্বল তেজস্বী চেহারা—হাতে একটা বন্দুক। সেই জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের তেজে গৌরীর

মূর্চ্ছা তখন ভেঙে গেছে। তারপর সেই গুণ্ডাদের সঙ্গে লাগলো তার সজ্ঘর্ষ—হোক সে একা, কিন্তু হাতে তার যে আগ্নেয়াস্ত্র শোভা পাচ্ছে তার সামনে দাঁড়ায় ওদের সাধ্য কী! সে তার হাতের বন্দুক টিপল। ঘনপুঞ্জিত বন শব্দের প্রবল আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। গৌরী আবার পড়লো নেতিয়ে—তারপর কিছু তার আর মনে পড়ছে না।

কী অভাবনীয় দৈব! ডাকাতের দল মাঠ থেকে মেয়ে লুট করে নিয়ে পালাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে অসম্ভব নয়। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে নিয়তি পাঠিয়ে দেয় পরিত্রাতাকে, ডাকাতদের হটিয়ে দিয়ে উদ্ধার করে মেয়েকে—এ প্রায় রূপকথার কাহিনী। কিন্তু আশ্চর্য, বাস্তবের মাটিতেই এ রূপকথার রাজ্য!

চোখ চেয়ে গৌরী প্রথমেই নিজের দিকে চেয়ে দেখল। বলক-দেওয়া দুধের মতো সাদা ও গরম বিছানায় সে শুয়ে, পরনে শুকনো একটা কাপড়—বুকে জামা নেই, গায়ের ওপর মোলায়েম ও মোটা একটা চাদর চাপানো। ঠুন্ ঠুন্ করে হাতের চুড়ি ক'গাছ বাজছে, গলার হারটাও খোয়া যায় নি। ধড়মড় করে উঠতে গেলো, কিন্তু গা ভরে তার কঠিন অবসাদ। চোখ আবার বুজে এলো আস্তে আস্তে।

এবার যখন জাগলো তখন বেড়ার ফাঁকে রোদের ঝিকিমিকি। দেখা গেলো কে একটা লোক ঠিক তার বিছানারই কয়েক হাত দূরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কোথায় যে আছে ঠিক বুঝতে না পেরে হঠাৎ সে বিকৃত কণ্ঠে শব্দ করে উঠলো।

লোকটা কাছে এসে স্নিগ্ধস্বরে বললে—কিছু ভয় নেই তোমার, চুপ করে শুয়ে থাকো!

গৌরী ক্লান্ত গলায় বললে,—এ আমি কোথায়?

উত্তর হলো: আমার কাছে।

স্বরটা এমন প্রসন্ন ও অমায়িক যে বুঝতে গৌরীর দেরি হলো না। আর তার ভয় নেই। এই সেই ভদ্রলোক যে তাকে রক্ষা করে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু পরের আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দুর্বলের মতো তার বদান্যতাকে প্রশ্রয় দিতেও তার কেমন বাধতে লাগলো! বিছানার থেকে ওঠবার চেষ্টা করে বললে,—বা, আমার কী হয়েছে? কেন এখানে শুয়ে আছি? আমি এবার যাবো।

—না, না, উঠো না। তোমার শরীর ভালো নেই।

তবু জোর করে গৌরী উঠতে গেলো। কিন্তু গায়ে তার উপযুক্ত আচ্ছাদন নেই—লজ্জার অরুণিমা সর্বাঙ্গে গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি আবার সে চাদরের তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলে।

দুই চোখে অসহনীয় দীপ্তি নিয়ে সে জিগগেস করলে : আপনি কে ?

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললে,—চেয়ে দেখ দিকি ভালো করে, চিনতে পারো ? সম্প্রতি আর কোনো আমার পরিচয় নেই · গুণ্ডাদের হাত থেকে তোমাকে আমি বাঁচিয়েছি। মনে পড়ে না ?

—আপনি ? গৌরী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অনঙ্গর দিকে চেয়ে রইলো। আনন্দ ও লজ্জায় শিহরিত হয়ে বললে : তারা কোথায় ?

অনঙ্গ বললে,—তাদের খোঁজে আমাদের দরকার নেই, তোমাকে উদ্ধার করা গেলো এই যথেষ্ট। এখন শরীর বেশ ভালো আছে ?

গলা পর্য্যন্ত চাদরটা টেনে গৌরী সমস্ত দেহ সঙ্কুচিত করে বললে,—আপনি পারলেন তাদের সঙ্গে ?

—না পেরে থাকি কী করে ? তেমন মায়ের দুধ খেয়ে বড়ো হইনি যে।

গৌরী গাঢ় দৃষ্টিতে দুই চক্ষু বিহ্বল, পরিপূর্ণ করে অনঙ্গর দিকে চেয়ে রইলো। সমস্ত শরীরে দৃপ্ত পুরুষত্ব, বলিষ্ঠ ভঙ্গিমা, দুর্গপ্রাকারের মতো দুর্ভেদ্য কাঠিন্য। এবং সেই সঙ্গে তার বসনের দীনতা মনে করে লজ্জায় তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। দস্যুদের কবলে পড়ে সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলো, এবং তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাকে সেবা করবার সময় অনঙ্গ তার সর্বাঙ্গে কৌতূহল-দৃষ্টি বর্ষণ করেছে ভাবতে পরাজয়ের নিদারুণ ধিকারে তার মন তিক্ত হয়ে উঠলো।

কিন্তু আত্মদৌর্বল্যকে আর সে প্রশ্রয় দেবে না। দুই হাতে চাদরটা গায়ের সঙ্গে লেপটে নিয়ে এবার সে উঠে বসলো। তক্তপোশ থেকে নামবার ভঙ্গি করে বললে,—শরীরে এখন আমি বেশ জোর পাচ্ছি, এবার আমি বাড়ি যাবো।

—বাড়ি যাবে ? অনঙ্গ হেসে বললে,—তোমার বাড়ি যে এখান থেকে প্রায় মাইল পাঁচেকের রাস্তা।

গৌরী চমকে উঠলো : পাঁচ মাইল ? আপনি এখানে এলেন কী করে ?

ঢোঁক গিলে অনঙ্গ বললে,—বন্ধুকে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিলাম—বন্দুকের আমার লাইসেন্স আছে। এবং এই বন্দুকের সাহায্যেই তোমাকে উদ্ধার করা গেলো। কোথাও শিকার মিললো না, এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফিরছিলাম, দেখলাম কাদের কাঁধে সওয়ার হয়ে তুমি কোথায় চলেছ। এ-সব দেশে ব্যাপারটা নেহাৎ নতুন নয়, সন্দেহ হলো। তাড়া করতেই তোমাকে ফেলে রেখে লোকগুলি পিট্টান দিলে—বন্দুকের সামনে এগোবার মতো সাহস কারুর ছিলো না। এবং মূর্চ্ছিত অবস্থায় তোমাকেই যখন পাওয়া গেলো তখন ওদের

খোঁজে ছুটাছুটি করে লাভ কী। সে-খোঁজ পরে হবে। সেবা করে তোমাকে সুস্থ করাই তখন প্রথম কাজ।

আর্টিস্টের মতো কথাগুলি গুছিয়ে বলতে পেরে অনঙ্গ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললে।

গৌরী চারদিকে বিমূঢ় চোখে তাকাতে লাগলো। জায়গাটা অপরিচিত, ঘর-দোর শ্রীহীন—পাতার চাল ও বাঁশের বেড়ায় গরিব একটা কুঁড়ে ঘর। অথচ শয্যার পারিপাট্য, শিয়রের কাছে ছোট টিপয়ে নানাজাতীয় ওষুধ-পত্রের রঙবেরঙের শিশি বোতল। গৌরী মুগ্ধ হয়ে অনঙ্গর মুখের দিকে চেয়ে বললো: আপনারা আগে থেকেই এখানে ছিলেন বুঝি?

—কাল সকাল থেকে! রিক্তহস্তে আবার ফিরে যেতে হবে ভেবে আসোয়াস্তি ছিলো। কিন্তু অধ্যবসায়ীরা কখনো কোনোদিন ব্যর্থ হয় না। ঈশ্বর তা বোঝেন। বলে অনঙ্গ আবার হাসল।

—আমি বুঝি আপনার শিকার?

—তা কেন, তুমি আমার দৈবের অনুগ্রহ! প্রগাঢ় চোখে তাকাল অনঙ্গ।

—তা হোক। নিচে নামবার চেষ্টায় একটা পা তক্তপোষের প্রান্তের দিকে সামান্য চালিয়ে দিয়ে গৌরী বললে,—কিন্তু আমাকে দয়া করে এবার বাড়ি পৌঁছে দিন। আপনাদের কাছে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকবো।

অনঙ্গ বললে,—বাড়ি ফেরবার জন্যে এখুনি এতো ব্যস্ত হয়ে উঠেছ কেন? ভালো করে আগে সুস্থ হয়ে নাও। তোমার নামে সারা গাঁয়ে এতোক্ষণে তো ঢি-ঢি পড়ে গেছে। গ্রামকে তো আর চেনো না? সেই কলঙ্কের সামনে একা তুমি দাঁড়াবে কী করে?

গৌরী দুই পা নামিয়ে দিয়ে বলল,—যা মিথ্যা, তার সামনে দাঁড়াতে আমার ভয় নেই। আমি যাবো।

—কিন্তু কেউ তোমাকে নেবেনা। মাঠের মধ্যে গুণ্ডার হাতে পড়া মেয়ের আর আছে কি!

—সব আছে। আমার বাবা-মা আছেন—

—কিন্তু সেখানে ফিরে গিয়ে লাভ কী! তাঁরা ব্যস্ত হয়ে আছেন, তাঁদের আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গৌরী অস্থির হয়ে উঠলো: না, না, আমায় যাবার ব্যবস্থা করে দিন।

অনঙ্গ নিশ্বাস ফেলে বললে,—তোমার জন্যে এতো করলাম, তবু তোমার আমাকেই অবিশ্বাস? এই তোমার কৃতজ্ঞতা! তা ছাড়া এখুনি গাড়িই বা পাবো

কোথায় এখানে ? এতোখানি পথ তো আর তুমি পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না ? পারবে ?

গৌরী উঠে দাঁড়ালো, বললে,—পারবো।

—মিথ্যা কথা। পারলেও এ-বেশে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না। উপযুক্ত আচ্ছাদনও তোমার নেই, তা ছাড়া পথও বিশেষ নিরাপদ নয়। ওরা আবার না কোনো নতুন প্রতিশোধ নেয়। বলা যায় না।

গৌরী অসহায় ভঙ্গি করে তক্তপোশে ফের বসে পড়লো। গাঢ় চোখে চেয়ে বললে,—আপনি সঙ্গে থাকলে কেউ কিছু করবার বা বলবার সাহস পাবে না। আপনিও বন্দুক হাতে নিয়ে সঙ্গে চলুন। আপনার কীর্তিতেই আমি উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়াবো।

অনঙ্গ তার দিকে চেয়ে থমকে গেলো। দৃষ্টিতে তার নতুন ভাষা এসেছে। তবু সে কপট অভিনয়ের ছল করে বললে,—কিন্তু আজ রাত্রেই আমরা কলকাতা যাচ্ছি। ও-গ্রামে ফিরে যাবার আর কোনো আকর্ষণ নেই। আমি বলি কি, আমাদের সঙ্গে তুমিও কলকাতা চলো। কেমন ?

গৌরী পাংশু মুখে বললে,—কিন্তু বাবা-মা ?

—তাঁরা যথারীতি খবর পাবেন তুমি সুস্থদেহে কলকাতা চলে এসেছ। তাঁদের নিশ্চিন্ত করবার ভার আমার হাতে। স্টেশনে পৌঁছেই টেলিগ্রাম করে দিলে চলবে। গুণ্ডারা তো তোমাকে অনায়াসে কলকাতায়ও নিয়ে যেতে পারতো ! একা তুমি তাদের সঙ্গে লড়তে কী করে—যদি আমি না এসে পড়তাম ! আর, তুমি আমার জিম্মায় আছো জানলে তোমার বাবা-মা আশা করি খুব বেশি আপত্তি করবেন না। কী বলো ?

গৌরীর চোখের পাতার দীর্ঘ পক্ষ্মগুলি লজ্জায় নুয়ে এলো। সত্যি বাবা-মা'র আপত্তি হবে না—এ-কথাটা মনে করতে কতকটা স্বস্তি সে পায় বটে, কিন্তু তাই বলে নিজেরই বা এতে এমনি অকাতর সম্মতি থাকবে কেন ? বাবা-মার আপত্তি নেই বলেই তো তার আপত্তি। তবু, প্রতিবাদ করবার বিরুদ্ধেও কতো প্রতিবন্ধক এসে যাচ্ছে। অনঙ্গর আনুকূল্য না থাকলে কী করেই বা সে বাড়ি ফেরে, তাকে সাক্ষী না পেলে আত্মপক্ষে কীই বা সে বলতে পারে জোর গলায় ? অনঙ্গকে তার এখন বিশেষ প্রয়োজন ; তাকে সে ছাড়তে পারে না, তবু তার এক কথায় তার সঙ্গে ট্রেনের একই কামরা অধিকার করতে হবে ভাবতে তার মন কুণ্ঠিত হয়ে উঠছিলো।

অনঙ্গ বললে,—আর ঐ গ্রামে ফিরে গিয়েই বা লাভ কী ! পদে-পদে বাধা,

পদে-পদে অপমান। সময় কোনোকালে স্থির নয় বলে তোমার বয়েস বাড়ছে—এই তো তোমার এক প্রকাণ্ড অপরাধ! তারপর গুণ্ডার দল তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—আর কি তোমার রক্ষে আছে নাকি? ঐখানে গিয়ে মুখ তুমি কাকে দেখাবে—আর, ঐখানে মুখ দেখাবার জন্যে এতো আগ্রহই বা কিসের? কেউ তোমাকে মর্য্যাদা দেবে না, ভাঙা কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করবে। সেই বিদ্রোহই তোমাকে করতে হবে—চিরকাল গাঁয়ের মাটি তুমি আঁকড়ে থাকতে পারবে না। কী, সত্যি নয়?

গৌরী চুপ করে চাদরের খুঁটটা আঙুলে জড়াতে লাগলো। কথাটা সত্যি। সেই বিদ্রোহই তাকে করতে হতো।

অনঙ্গ বললে,—ওখানে কিসের জন্যে তোমার মায়া? তুমি তো তোমার বাবা মার ভার হয়ে থাকবার জন্যে জন্মাওনি, নিজের পথ বেছে নেবার জন্যে নিজেই তোমাকে একদিন বেরিয়ে পড়তে হতো। মিছিমিছি ঐ পাপের মাঝখানে গিয়ে তুমি কেন দাঁড়াবে? কিসের আশায়?

গৌরীর দু চোখ ছলছল করে উঠলো। মৃদু গলায় বললে,—কাল রাত্রে তো আমি কলকাতায়ই যাবো ভেবেছিলাম।

অনঙ্গ মৃদু হেসে জিগগেস করলে,—কেন বলো তো?

সেই জলম্লান নিবিড়াভ দু'টি চক্ষু তুলে অস্ফুটস্বরে গৌরী বললে,—আপনার অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে।

অন্যমনস্কের মতো অনঙ্গ তক্তপোশের দিকে এক পা এগিয়ে এলো: বললে,—আমি খুব অত্যাচারী, তাই তোমার মনে হয়? এতক্ষণ তোমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছি, তাই না?

গৌরীর মুখে কথা নেই। ঠোঁটে এখন একটি ফুরফুরে হাসি ফুটি-ফুটি করছে।

অনঙ্গ পাইচারি করতে-করতে বললে,—বেশ তো, আজ রাত্রেই তুমি কলকাতা যাবে। এ যাওয়া তোমার ভীষণতরো অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। আত্মবিকাশের বাধার মতো অত্যাচার কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে? পরে কাছে এগিয়ে এসে অনঙ্গ থামলো: কলকাতায় কোথায় তুমি যেতে?

চোখ তুলে গৌরী বললে—আমার কলেজের একটি ছাত্রীর বাড়ি।

—বেশ, ঠিকানাটা আমাকে দিয়ো: সেখানেই তোমাকে রেখে আসবো। আমার সঙ্গে যেতে তো তোমার আপত্তি নেই? উপায় কি বলো, ভাগ্যচক্রে আমাকেই তোমার সঙ্গী হতে হলো—অন্তত কলকাতা যাওয়ার এ পথটুকু।

আপত্তি করলেই বা চলছে কেন? যাকে এড়াতে চাইছিলে নিয়তি তাকেই এনে দিল তোমার রক্ষকরূপে, তোমার আশ্রয়দাতারূপে! তা, কতটুকুই বা সময়, কতটুকুই বা রাস্তা। কলকাতা গিয়েই তো তোমার ছুটি।

দুশ্চিন্তার শক্ত বাঁধনগুলো গৌরীর গা থেকে হঠাৎ আলগা হয়ে গেলো। বাড়ি ফিরে যেতে সত্যিই তার মন নেই। অনঙ্গ কিছুই মিথ্যা বলে নি—সেই অপবাদের দংশন আর তার অসহ্য জ্বালা! তাকে নিয়ে বাবা মা নাকাল হয়ে পড়বেন—গলায় কলসি বেঁধে পুকুরে ডুবে মরা ছাড়া তার পথ থাকবে না। শুভানুধ্যায়িনীদের সেই চিবিয়ে-চিবিয়ে ঠেস দিয়ে কথা বলা—সেই সব জঘন্য কটূক্তির আর শেষ নেই। গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গেছে অথচ তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি এ বিশ্বাস করবে না। আর যিনি রক্ষা করলেন তিনি অভক্ষ্য রাখলেন এও অকল্পনীয়। আর সত্যিই তো, সেই সব প্রবল মিথ্যার বিরুদ্ধে অকারণ বিদ্রোহে তার মহিমা কোথায়, কোথায় তার প্রতিষ্ঠা। শুধু নিজেকে ক্ষয় করা, তিলে তিলে আত্মহত্যা করা, আচারের কাছে দাসী বনে যাওয়া। না, তার চাই মুক্তি, বিস্তৃত প্রসার, অসীম উজ্জীবন। কলকাতায়ই সে যাবে—বিরাট রাজধানীতে, বিপুল কর্মমুখর জীবনের মোহনায়। কলঙ্কবহনের নিৰ্জ্জীবতায় তার আশ্রয় নেই; আশ্রয় অজস্র স্রোতে, তীক্ষ্ণ ও বেগময় প্রাণস্রোতে। দুর্নিবার ধাবমানতায়।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটা তার জীবনকে আরো অনেকখানি জাগিয়ে দিয়েছে। আরো অনেক সাহস দিয়েছে, অনেক শক্তি। অত্যাচার দমনের আরো তীব্র তেজ। সমাজের যতো ঘৃণ্য আচার যেন হিংস্র নোখ বাড়িয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করতে এসেছিলো, এর শাসন চাই। মিথ্যা নীতির দৌরাত্ম্য সে সইবে না।

কলকাতায়ই সে যাবে। সেখানে বিপুল জনতার মাঝে গভীর নির্জনতা ও অনির্বাণ একটি আকাঙ্ক্ষার মুখোমুখি হবে। কে বা তখন অনঙ্গ, কী বা এই একরাত্রির অভিজ্ঞতা!

গৌরী প্রসন্ন মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বললে,—কিন্তু আমার এই পোশাকটাই বা কলকাতা যাওয়ার উপযোগী নাকি?

—তবে কি অরণ্যে যাওয়ার উপযোগী?

—না, এ প্রায় শ্মশানের পোশাক। গম্ভীর শোনাল গৌরীকে।

অনঙ্গ ব্যস্ত হয়ে বললে,—না, না, সুরেন তোমার জন্যে শাড়ি আনতে তাঁতির বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। এই সে এলো বলে। যাওয়ার আগে তোমার ঐ ভেজা জামা-কাপড়গুলোও শুকিয়ে উঠবে। ভয় নেই।

—আচ্ছা, আমি তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম? সারা মুখে আতঙ্ক নিয়ে জিগগেস করল গৌরী।

—ভাগ্যিস পড়েছিলে। বদান্য স্নেহে অনঙ্গকে গৌরবোজ্জ্বল দেখাল: তাই তো তখন ভিজে কাপড়-চোপড় থেকে তোমাকে শুকনোতে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। শুনেছিলাম তোমার অব্যক্ত প্রার্থনা—আমাকে তমসা থেকে জ্যোতিতে নিয়ে চলো, সিক্ত থেকে শুষ্কে, খণ্ডিত থেকে অখণ্ডে—

মুখ ফেরাল গৌরী, কিন্তু তাতে রাগ না ফুটে ফুটল বুঝি লজ্জার অরুণিমা।

কালাচাঁদ দু কাপ চা নিয়ে এলো। পরে আবার দু'প্লেটে কিছু বিস্কুট আর সন্দেশ।

গৌরী বললে,—শিকারের সরঞ্জাম দেখি সব দিক দিয়েই আপনাদের সম্পূর্ণ।

অনঙ্গ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললে,—শেষকালে তোমাকেই পাওয়া যাবে জানলে কিছু কাপড়-জামাও সংগ্রহ করে রাখতাম।

ঠোঁট দুইয়ে গৌরীও কাপ-এ চুমুক দিলো। একটু মিষ্টি করে কথা বললে কিছু ক্ষতি নেই—কথায় ওঁকে সেদিন কম জখম করা হয় নি। শত হলেও উপকার তো একটা করেছেন। মোটে তো আর দেড় দিনের সাহচর্য—তার পরেই তার মুক্তি, সানন্দ স্বাধীনতা! কোনো উপায়ে কলকাতায় একবার যেতে পারলেই হলো—এই লজ্জিত দিনের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্যে সে নিদারুণ অস্থির হয়ে উঠেছে। তখন আবার তার অন্য রকম চেহারা—প্রখর, প্রতিষ্ঠিত,—কে আর তার নাগাল পাবে।

হ্যাঁ, একটু মিষ্টি করে কথা বলাটাই এখন শোভন হবে। যে তাকে এমন ভয়ানক বিপদ থেকে রক্ষা করলো তার প্রতি সদাশয় হওয়াই তো উচিত—তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, অনঙ্গর এতো কাছে এসে পড়ে তার ব্যবহারে লজ্জার জড়িমা এসে যাচ্ছে, কথায় কোমল অন্তরঙ্গতার টান। আর, এই যে ঘটনাচক্রে তাকে অনঙ্গরই কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলো এটার মাঝেই ভাগ্য তার পরাভবের, তার বলহীনতার পরিচয় রেখে গেলো বোধ হয়। কথাকে কোমল না করে আর উপায় কী! দু'টি দিন পরেই আবার সে সেই গৌরী। নাগালের বাইরে, আপন ব্যক্তিত্বে আপনি স্বতন্ত্র, একেবারে স্বাধীন, স্বয়ংমুক্ত।

মৃদু হেসে গৌরী বললে—দেখবেন ঠিকঠাক কলকাতায় পৌঁছে দেবেন যেন!

অনঙ্গ বললে—সে সম্বন্ধে এখনো তোমার সন্দেহ আছে নাকি? যাই বলো, ঠিক অত্যাচার করতে কোনোদিন আমি চাই নি। কিন্তু সে-বিজ্ঞাপন নিজে চাক

পিটিয়ে জাহির করতে চাই না। তুমি নিজেই তা বুঝতে পারছ হয় তো। বরং তুমি ইচ্ছা করলে আমারই সর্বনাশ করতে পারো।

—আমি? কী করে?

—তোমাকে নিয়ে যখন ট্রেনে-স্টিমারে যাবো, অনায়াসে তুমি চেঁচামেচি করে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারো! বলতে পারো যে আমি তোমাকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছি। আত্মরক্ষা করবার তখন আমার কোনো পথই থাকবে না। কেননা এ-সব ক্ষেত্রে, আমি তোমাকে ভালোবাসি বা বিয়ে করতে চাই—এ-সব যুক্তি একটা ডিফেন্স-ই নয়। ছ'টি বচ্ছর আমার জেল হয়ে যাবে।

কাপ-শুদ্ধ সসারটা গৌরীর হাতে কেঁপে উঠলো। সহজ হবার চেষ্টায় মৃদু হেসে গৌরী বললে—বলেন কী? চেঁচামেচি করে আপনাকে ধরিয়ে দেবো? একেবারে রহস্যলহরী সিরিজের নবতম উপন্যাস! আপনার এতো বড়ো কীর্তিটা এমনি করে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে?

অনঙ্গ গম্ভীর অথচ সস্নেহ কণ্ঠে বললে,—ইচ্ছে করলে একটা হৈ চৈ বাধাতে পারো বৈকি! তুমি যেমন মেয়ে—তোমাকে তো আমার ভয়ই করে।

—ভয় করাই তো উচিত। গৌরীর ভুরু দুটি হাসির ঘায়ে ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো: কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ভয়টা আমারও কম নয়। আপনাকে ধরিয়ে না-হয় দিলাম, কিন্তু তারপর? আমি যাই কোথায়? আমাকে কে ধরে? আমাকে বিয়ে করতে চান, মাত্র এই ডিফেন্স নিয়েই কি আপনি তখন ক্ষান্ত হবেন? যা মুখে আসবে তাই বলবেন। যা মুখে আসবে না তাও। অন্তত লোকে বলবে। নিজে তো যাবেনই, আমাকেও তলিয়ে দেবেন। অতএব ভয় নেই।

অনঙ্গ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—তবেই দেখছ বিশ্বাস এখানে আমাদের পরস্পরকেই করতে হচ্ছে। আর দু'জনে আমরা এমন অবস্থার মধ্যে এসে পড়লাম যে বিশ্বাস করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

নীরবে গৌরী চা খেতে লাগলো। তার এই ভঙ্গিটার থেকেও বন্ধুতার সুর একটু বাজছে নাকি?

তার দিকে চেয়ে অনঙ্গর কী যে মায়া পড়ে গেলো বলে শেষ করা যায় না। দুর্বল নরম দেহখানি ঘিরে মোটা একটা চাদর, তার অন্তরালে পেলব ও পরিপূর্ণ একটি সুশুভ্র রিক্ততা, ভিজে চুলগুলি কাঁধ ছাপিয়ে নেমে এসেছে, করুণ মুখখানি আলো করে বড়ো-বড়ো দু'টি চোখ! কাননচারিণী দময়ন্তীর লাবণ্য। অনর্থক তাকে এতো কষ্ট দেওয়া হলো। সর্বাঙ্গ বেষ্টন করে কী দুঃসহ তার ক্লান্তি—যেন অনঙ্গর অগাধ স্নেহের মতোই তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। ভাগ্যিস্ তাকে সে

বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছে। সে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছে! সে যদি একদিন দূরে চলেও যায়, তবুও অনঙ্গর দুঃখ নেই। তার তিরোধানের দুয়ার দিয়ে জীবনে নতুন জ্যোৎস্না এসে পড়বে।

এগারো

হরিশ-খুড়ো লোকজন লাগিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু রাতারাতি গৌরীর আর কোনো খবর পাওয়া গেলো না। সকাল বেলায়ও সবাই তেমনি নিরুত্তর। মা কান্নাকাটি করে পাড়া মাথায় করছেন, ভবনাথবাবুর জীবনধারণে আর কোনো সুখ নেই।

দীনবন্ধু মুখ-চোখ রসালো করে বললেন—তখন বলেছিলাম না ভবনাথ, মেয়েকে মেমসাহেব করতে যেয়ো না। কার সঙ্গে দিব্যি যড় করে তোমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছে। ও-সব মেয়ের ধরনই ঐ রকম।

সান্ত্বনা দিতে এসে ঘোষালের মা মুখ ঘুরিয়ে বলে গেলো: কান্না কিসের দিদি! মেয়ে তোমার চাকুরে হবে বলে বড্ড সখ ছিলো না? চাকরিই তো এবার পেলো খাসা।

ভবনাথবাবু শূন্য চোখে চারদিকে চাইতে লাগলেন। এতো বড়ো একটা আকস্মিকতা কিছুতেই যেন তিনি মানতে পারছেন না। মুহূর্তে সমস্ত জীবন যেন সাদা হয়ে গেছে। আর যেন কোনো আশ্রয়, কোনো অবলম্বনই তাঁর নেই। তবুও, এই বিপদে অনঙ্গকেই তিনি অন্তরঙ্গ বলে গ্রহণ করলেন। ইচ্ছা করলে অনঙ্গ হয়তো একটা পথ করতে পারবে। তার চোখে গৌরীকে একদিন ভালো লেগেছিলো, হয়তো এ-ব্যাপারে তার অর্থ ও সামর্থ্যের সে কার্পণ্য করবে না। পুলিশ যা করবার করছে, অনঙ্গকেও খবর একটা দিয়ে রাখা ভালো। একদিন এমনি খবর তো তার কানে যাবেই।

ভবনাথবাবু অনঙ্গর বাংলোর দিকে চললেন। কিন্তু দরজায় তালা দেওয়া, জানালাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ। খবর নিয়ে জানলেন, কাল সকালেই সে পাততাড়ি গুটিয়েছে—এই গ্রামে আর তার আকর্ষণ নেই।

মাথায় হাত দিয়ে ভবনাথবাবু বসে পড়লেন। গৌরী না-হয় শেষকালে মত বদলেছিলো, কিন্তু অনঙ্গ গা পেতে সেই অপমান সইবে কেন? তা ছাড়া ঐ ঘটনার পর গৌরীর আর কী মূল্য তার কাছে থাকতে পারে? গৌরীর জন্যে তার কী এমন মাথা-ব্যথা।

দীনবন্ধু বললেন,—আর ওর জন্যে মায়া কিসের, ভবনাথ? ও তো গেছে—একেবারে গেছে। পেলেও, ওকে নিয়ে তো আর ঘর করা চলবে না।

কাঁদ-কাঁদ গলায় ভবনাথবাবু বললেন—কিন্তু প্রাণে যাতে বেঁচে থাকে সে-চেষ্টাটাও তো দেখতে হবে। ঘর? ওকে ছাড়া ঘরের আমার মানে কী! কী নিয়ে আমি থাকবো? আমার আর কে আছে?

অতুলেরো সেই কথা। গৌরী বেঁচে থাকলেই তার যথেষ্ট। আর কিছু সে বেশি প্রত্যাশা করে না, আর কিছুর ওপর তার মায়া নেই। তার অসহায় শরীরের উপর যে অত্যাচার তা দিয়ে তার জীবনের মূল্য নির্ধারিত হবে না—সে একটা তুচ্ছ ঘটনা মাত্র। সেটাকে পরিহার করেও তার জীবনে অপরিমিত স্থান আছে। জোর করে বিয়ে দেওয়াটাও সেই অত্যাচারের সামিল—এর চেয়ে তাতে একতিল মহত্ত্ব ছিলো না। পরাক্রান্ত রোগের কাছে দেহের পরাভব স্বীকার করার মতোই ওটায়ও একটা নিষ্ঠুর অনিবার্যতা আছে, তার জন্যে গৌরীকে অপরাধী করার মতো পাপ আর কী থাকতে পারে সংসারে? শারীরিক নিঃসহায়তার মাঝে তুচ্ছ নীতির কথা ওঠে কী বলে? অতুল আর কিছু চায় না, গৌরী বেঁচে আছে এই সামান্য সংবাদটুকুই তার স্বর্গ।

বৃহৎ পৃথিবীর জনতায় কোথাও তার আশ্রয় না হয়, অতুল আছে। দেহের সামান্য একটি ক্ষতচিহ্নে জীবনের সমস্ত লাবণ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। আর কেউ তাকে স্থান না দেয়, অতুল তার সমস্ত ভবিষ্যৎ তারই জন্যে প্রসারিত করে দেবে। শুধু তাকে বাঁচানো চাই। প্রেমের শক্তি দুর্ধর্ষ—সমস্ত পাপ সে দগ্ধ করে, সমস্ত ব্যবধান সে ভরাট করে আনে। নীতির গণ্ডী সে কবে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—শরীরে কখনো কোনো অশুচিতা আছে বলে সে স্বীকার করে না।

অতুল সমস্ত গ্রাম দলবদ্ধ করে গৌরীর উদ্ধারে প্রাণপণ করতে লাগলো। জায়গায় জায়গায় বাহিনী পাঠালে, পুলিশকে নানা খবরাখবর দিয়ে সাহায্য করতে লাগলো—কিন্তু কোথাও কিছু সুরাহা হলো না। আকাশ বেষ্টন করে গৌরীর সেই তিরোধানের নিদারুণ শূন্যতা! সেই শূন্যতা অতুল তার অসীম প্রতীক্ষায় পূর্ণ করে রেখেছে। একদিন তাকে পাওয়া যাবে ফিরে—যে-দিন অতুল ছাড়া আর তার কেউ নেই।

আরো একদিন কাটলো।

পরদিন সকালবেলা গৌরীর এক টেলিগ্রাম এসে হাজির! কলকাতা থেকে করেছে। সে ভালো আছে, নিরাপদ আছে, কোথাও এতোটুকু তার জন্যে চিন্তা করবার নেই।

ভবনাথবাবু আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন : মেয়ে আমার কি তেমন মেয়ে দীনবন্ধু ? কখন সে চালাকি করে ছাড়া পেয়ে দিব্যি গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছে —একেবারে কলকাতা ! পারফেক্টলি সেইফ ! সাধে কি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম হে ! বুদ্ধিতে সে ভীষণ পাকা। কে তার সঙ্গে এঁটে উঠবে ?

বাড়িময় খুশির তুফান ছুটলো। কাদম্বিনী চোখের জল মুছে বিছানায় উঠে বসলেন। বললেন—কী করে গেলো সেখানে ? এখুনি ওর খোঁজে কলকাতায় বেরিয়ে পড়ো সব।

হরিশ-খুড়ো বললেন—ঠিকানা কী দিয়েছে ?

ভবনাথবাবু উলটে-পালটে কাগজটা দেখতে লাগলেন—কোথাও কিছু ঠিকানা নেই।

দীনবন্ধু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন—ও-সব ধোঁকা ভবনাথ, যারা নিয়ে গেছে তাদেরই এ কারসাজি।

চোখমুখ পাংশু করে ভবনাথবাবু চুপ করে রইলেন। কাগজ-ধরা হাতটা নিস্পন্দ হয়ে গেলো।

অতুল বললে—টেলিগ্রামে কখনো কোনোদিন ঠিকানা দেওয়া থাকে নাকি ? আপনাদের যেমন সব বুদ্ধি। রসুন, কাল-পরশুই তার চিঠি এসে যাবে। সব ডিটেইল্স্ পাওয়া যাবে তখন। আর ভাবনা নেই।

ভবনাথবাবুর দেহ আবার লঘু হয়ে গেলো। শিশুর মতো আনন্দে হাত তুলে বললেন—ঠিক, ঠিক, ঠিকানা আবার কে লিখে পাঠায় ! তুমি আমাকে বাঁচালে, অতুল। লেখাপড়া না শিখলে বুদ্ধি এমন খুলবে কেন ? হ্যাঁ, গুণ্ডারা গেছেন সখ করে তার করতে ! তাদের ভীষণ দায় পড়েছে আর কি। আর কথাটি নয়, চিঠি এলেই বেরিয়ে পড়ো, হরিশ'। আবার একটু তোমাকে কষ্ট করতে হবে ভাই।

হরিশ-খুড়ো বললেন—স্বচ্ছন্দে। কিন্তু গৌরীর এমন পালিয়ে চলে আসাটা দস্তুরমতো বাহাদুরি বলতে হবে।

চশমার তলা থেকে চোখ দুটো কুঁচকে দীনবন্ধু বললেন—বাহাদুরি না হাতি ! পালিয়ে গিয়েও যদি থাকে, ধর্ম নিয়ে তো আর পালাতে পারে নি। গেছে, যাক —আবার ওর জন্যে কেন মিছিমিছি কষ্ট করা ! কী বিপদ !

সেই কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হরিশের কাঁধে হাত রেখে ভবনাথবাবু বললেন —আরে, এ কি আমার যেমন তেমন মেয়ে ! বলে না পারুক, কৌশল তো শিখেছে। এ ক'বছর শহরে থেকে চোখ-মুখ তার খুলে গেছে যে। শুধু কি আর

অতো পয়সা খরচ করেছি ভাই? কালকেই চিঠি এসে যাবে—যদি পারো, একেবারে ওকে ধরেই নিয়ে আসবে। আর নেহাৎ যদি না আসতে চায়, আমরাই সটান চলে যাবো সেখানে। ওকে ছাড়া কিসের আমাদের ঘর-দোর! তোমাদের সব বিলিয়ে দিয়ে যাবো, দীনবন্ধু। ভবনাথবাবু খুশিতে আবোল-তাবোল বকতে সুরু করলেন।

কিন্তু চিঠি আসার দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা করা অতুলের সইলো না। ঐ রাত্রে অমন একটা দুর্ঘটনা না ঘটলে গৌরী তো তারই সঙ্গে কলকাতা যেতো। লোক-চক্ষু এড়িয়ে, চুপিচুপি বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, আকাশময় গাঢ় অন্তরঙ্গতায়। গৌরী তার পিছনে সেই সঙ্গে-যাওয়ার স্মৃতি রেখে গেছে। তার শারীরিক এই অনুপস্থিতিতে কিছু এসে যাবে না, আজো সে তারই সঙ্গী—এই নিঃসঙ্গতাটিই তার নিবিড় নৈকট্য। আজো সেই রাত্রি, শরীরময় সেই যাত্রার রোমাঞ্চ। গৌরী সঙ্গে নেই বটে, কিন্তু দূরে আছে। পৃথিবীতে দূরত্ব কিছু আছে বলে প্রেম স্বীকার করে না।

সেই রাত্রে অমন দুর্ঘটনা না ঘটলে তারা দু'জনে এতোক্ষণে কলকাতায়—কিন্তু তখনকার আবহাওয়া যেন এর মতো ঘনিষ্ঠ ও অনুভব-নিবিড় হতো না। তখন গৌরী খুঁজছে প্রতিষ্ঠা, এখন সে চায় আশ্রয়, সহানুভূতি। তখন তার বিদ্রোহিনীর রূপ, এখনকার রূপ তার নমিতা পূজারিণীর। এখন সে অতুলের আরো কাছে এসে পড়েছে। এখন গৌরীর অহঙ্কারের দীপ্তিতে পরাভবের মলিন একটু ছায়া পড়লো। তাই সে তার আজ এতো আপন, এতো কাছে।

মাকে বললো, আজ রাত্রে সে পাশের গাঁয়ে বরযাত্রী যাচ্ছে—ফিরতে পারবে না। কলকাতা গিয়ে পরে এক তার করলেই চলে যাবে। চাকরি? সিক্-লিভ-এর দরখাস্ত একটা পেশ করে যাবে। সেরেস্তাদার মশায় ভালো লোক। ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে পারবেন না।

মীরা দত্ত—ল্যান্সডাউন রোড—কিছুই অতুল ভোলে নি।

গৌরী হবে তারই প্রথম আবিষ্কার—অতুলই হবে তার প্রথম অশ্রয়স্থল। তারপর চারিদিকে রুক্ষ উদাসীন সংসার, আর তার মাঝে অতুলের এই বলদৃপ্ত বন্ধুত্ব। অতুল ছাড়া গৌরীর তখন আর কেউ নেই। তার প্রতীক্ষার তীব্র আলোয় গৌরী তখন একদিন অবলীলায় আত্মার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে ধরবে।

দুর্দ্ধর্ষ এই প্রেম, অমেয় তার পরাক্রম। তার কাছে সমস্ত শক্তি ব্যাহত, সমস্ত কামনা পরাস্ত হয়ে গেছে। তার কোনো ঐশ্বর্য্য-সমারোহ নেই, রণসজ্জা নেই—

মাত্র একটি অনির্বাণ প্রতীক্ষা। মাত্র গৌরীকে সে ভালোবাসে। গৌরীর সে ভালো চায়।

অতুল কলকাতার ট্রেন ধরলো। আজ রাত্রে সে একেবারে একা। আকাশে আজ একটুও মেঘ নেই।

বারো

শেয়ালদায় পৌঁছে অনঙ্গ ট্যাক্সি নিলো। দরকারী জিনিসপত্র সব সে বাংলোয় রেখে এসেছে—কলকাতায় তার নিজের বাড়িতে একবার পৌঁছুতে পারলে আর কিছুরই কোনো অভাব বা অসুবিধে হবে না।

স্থরেন বললে—সেই তোমার পার্ক-সার্কাসের বাড়ি তো?

অনঙ্গ বললে—হ্যাঁ, বড়ো বাড়িটা তো এখন ফাঁকা। মা ছেলে-পিলে নিয়ে মেহেরপুর গেছেন, বোনেরা দার্জিলিঙ। আমাদের ও-দিকে এ-বছর বেজায় আম হয়েছে, মাকে কিছু পার্শেল করে পাঠিয়ে দিতে লিখবো।

কথাটাকে অনঙ্গ তরল করতে চেয়েছিলো, কিন্তু গৌরী তার ভয়াবহ তাৎপর্যটা বুঝতে পেরে চমকে উঠলো। শরীরকে সিট-এর এক প্রান্তে সঙ্কুচিত করে শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—যে বাড়িতে আমাকে নিয়ে তুলবেন ভাবছেন, সেখানে কোনো মেয়েছেলে নেই বুঝি? দরকার নেই তবে, অনেক কষ্ট দিয়েছি আপনাদের, চলুন ল্যান্সডাউন রোড। মীরাদের বাড়ি যাবো।

অনঙ্গ গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—মেয়েছেলে নেই, কিন্তু আমি তো আছি। কিসের তোমার ভয়। আমাকে এখনো তুমি বিশ্বাস করতে পারো না? এতো রাত্রে অচেনা বাড়িতে তাঁদের বিব্রত করে লাভ নেই—কাল সকালেই সেখানে পৌঁছে দেবো ঠিক। যেটুকু সময় আমার জিম্মায় থাকবে, এতোটুকুও তোমার অসুবিধে ঘটতে দেবো না।

দোতলা সুন্দর বাড়ি। দেয়ালে প্রখর চুণকাম করা, মেঝেয় শ্বেত-পাথর—ফিটফাট, পরিষ্কার—এতোদিনের প্রবাস-বাসেও তাতে কণামাত্র ধুলো জমেনি। আগে থেকেই তার করা হয়েছিলো, খাবার-দাবার প্রস্তুত, চাকর-ঠাকুর তটস্থ। দু'বন্ধুর জন্যে পাশাপাশি দু' ঘরে দুই খাট জুড়ে বিছানা পর্যন্ত পাতা হয়েছে। ও-দিকে একটা সম্পূর্ণ ঘর গৌরীকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

সামনেই বাথরুম—স্নান করে পরনের শাড়ি ছেড়ে তাঁতের শাড়িখানি সে পরলে। পুরু করে গায়ে জড়ালে সিল্কের চাদর, বাহুদুটি ঢেকে জড়োসড়ো হয়ে

বিছানার উপর সে বসে রইলো। কিন্তু বসে থাকবার যো নেই। ঘরময় সেল্ফ-এর পাহাড় উঠে গেছে—তাতে রাশি-রাশি বই, রঙচঙে মলাট জাঁকালো নাম। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে গৌরী বই দেখতে লাগলো। পাতায় পাতায় পেন্সিল দিয়ে নোট করা, অনঙ্গর স্নিগ্ধ দৃষ্টির মতো সেই কাঁচা অক্ষরগুলি যেন গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে আছে! বইয়ের গায়ে গায়ে তার স্নেহ যেন আর ধরে না।

খাবারের থালা-হাতে চাকর ও তার পেছনে অনঙ্গ। অনঙ্গ বললে—আগে খেয়ে নাও, পরে বই-টই দেখবে 'খন।

গৌরী টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে খেতে বসলো। সদ্য স্নানের নির্মল প্রসন্ন আভা তার সমস্ত শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হেসে বললে—আপনি অমনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে খাই কী করে?

—আচ্ছা, আমি যাই। সব খেতে হবে কিন্তু। খেয়েই দোর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। তোমার শরীর ভালো নেই, আর বই ঘাঁটে না, বুঝলে?

খাওয়া-দাওয়া সেরে তোলা-জলে আঁচিয়ে একখানা বই হাতে করে গৌরী পিঠময় চুল ছড়িয়ে বিছানায় বসলো আধো শোয়ার নরম ভঙ্গিতে। দরজা ভেজানো, পাড়াটা নিঝুম। ঘরে সে ভীষণ রকম একা, নিজের কাছে নিজেই সে অচেনা। সব তার অভিনব বিস্ময়কর লাগছে, কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে এই বইটার লেখা। কাল সকালেই মীরাদের বাড়ি চলে যাবে ভেবে মন তার সহসা ম্লান হয়ে গেলো, একটা বইও তার তাহলে পড়া হবে না।

ঘটনার ঘূর্ণিতে কোথায় সে এসে পড়লো! নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুরই কোনো দাবি রইলো না—এতো সেবা ও স্নেহ সব সে অম্লান মুখে গ্রহণ করলে—কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবার বেলায় কাল সকালে উঠেই তাকে অন্য আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যেতে হবে!

মাত্র এইটুকু সম্পর্ক! এইটুকু মাত্র তার কৃতজ্ঞতা!

তা ছাড়া আবার কী! কাল সূর্যের প্রথম উদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তার মুক্তি, বন্ধনমোচনের অবারিত উৎসব। এখন রাত না-জানি ক'টা। বইটা গৌরীর এতো ভালো লাগছে যে ঘুমুবার কথা ভাবতে পারছে না, আর এই রাত পোহালেই তো তার ছুটি!

বই ছেড়ে তন্ময় হয়ে কী সে ভাবছিলো, হঠাৎ বাইরে থেকে দরজায় কে ঠেল দিলে। ঘুমুবার তাড়া দিতে ফের অনঙ্গ এলো বুঝি, এলে মন্দ হয় না, গল্পই না-হয় সে করবে, কেউ তাকে কিছু বলবার নেই। কিন্তু ভঙ্গিটা প্রকৃতিস্থ করবার আগেই দরজা গেলো খুলে এবং পা টিপে-টিপে ঢুকলো এসে সুরেন।

তার প্রবেশটা যেমন নিঃশব্দ, তেমনি নিঃশব্দ বলেই অতিমাত্রায় রূঢ় ও লজ্জাহীন।

দু' পা কাছে এগিয়ে এসে স্বরেন জড়িয়ে-জড়িয়ে বললে—তুমি এখনো ঘুমোও নি তো? বেশ, ভালো কথা। অনঙ্গ তো ঘুমে পাথর হয়ে পড়ে আছে। ভালোই হলো। ও ঘুমোক।

অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবে গৌরী চমকে উঠেছিলো, তারপর কথা বলার এই অশোভন ভঙ্গিটায় সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বললে—কী চান আপনি?

স্বরেন ব্যস্ত হয়ে বললে—আরে, উঠছো কেন? তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম যে। দরজাটা খোলা রেখে ভালোই করেছ।

—সে কী কথা? আপনি যান। আমি এবার ঘুমুবো। দরজা বন্ধ করে দি।

স্বরেন দস্তরমতো টলছে: আমি থাকতেও দরজা বন্ধ করে দিতে পারো। ঘুম তো আমারো পেতে পারে।

তীব্র কণ্ঠে গৌরী বললে—আপনি যান বলছি, অনঙ্গবাবুকে ডাকবো এক্ষুনি।

ঘর ফাটিয়ে স্বরেন হেসে উঠলো: অনঙ্গ? সেও আসছে পেছনে। শিকার সে শুধু-শুধু সংগ্রহ করে না—ব্যবহার করে তার সম্মান করতে জানে। ভয় নেই কিছু—হাতে আবার তার বন্দুক।

গৌরী দৃপ্ত ভঙ্গিতে অটল হয়ে দাঁড়ালো, বললে—তার মানে? ভয় আবার কী! যদি ভালো চান তো সরে পড়ুন বলছি। এক্ষুনি। বলে ডান হাতটা সে দরজার দিকে প্রসারিত করে ধরলো।

স্বরেন বললে—খেয়ে-দেয়ে চমৎকার তেজী হয়েছ যে। অসুস্থ দেহের মাদকতা কিছু কম বলে কাল রাতটা তুমি রেহাই পেয়েছ, আজ আর নয়। হ্যাঁ, অনঙ্গও আসবে বৈ কি! বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে নেবে। বলে গৌরীর সেই প্রসারিত হাত সে ধরে ফেললে।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গৌরী দূরে সরে গিয়ে প্রবল আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো।

এবং স্বরেনের সামান্যতম স্থান-পরিবর্তন করবার আগেই পিস্তলের গুলির মতো তীব্রবেগে অনঙ্গ ঘরে প্রবেশ করলে। দেখলে অদূরে দাঁড়িয়ে গৌরী আগুনের শিখার মতো কাঁপছে, আর স্বরেন খাটের বাজুটা ধরে ফেলে তার পদস্খলনের সম্ভাবনাকে সম্বৃত করছে। তার আবির্ভাবে আবহাওয়াটা হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে উঠলো।

অনঙ্গ বললে—কী, কী গৌরী ?

গৌরী দুই চক্ষু উদ্দীপ্ত করে বললে—ঐ, ঐ আপনার বন্ধু। আমাকে অপমান করতে রাত করে আমার ঘরে ঢুকেছেন! এর জন্যে আমাকে নিয়ে এসেছেন এখানে? এর জন্যে আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম ?

অনঙ্গ সুরেনের কাছে সরে এসে বললে--তুমি এতোদূর অন্ধ হয়েছ সুরেন ?

সুরেন গলা ছেড়ে তেমনি হেসে উঠলো : অন্ধ হয়েছি আমি ? ঐ এক-চলতে মেয়ে—তাকে অন্যায় মূল্য তো তুমিই দিতে চাও। আমি অন্ধ ?

কোমরে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বুক বিস্ফারিত করে দাঁড়িয়ে অনঙ্গ বললে—ভদ্র মেয়ের ঘরে তোমার এই নির্লজ্জ আচরণ আমি কখনো সইবো না, সুরেন। মাতলামি করবার আর জায়গা পাওনি। তুমি চলে যাও এ-ঘর ছেড়ে।

সুরেন বললে—মানে, এ-ঘর আগে তোমাকে ছেড়ে দিতে বলছ ?

হঠাৎ তার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে অনঙ্গ বললে—মুখ সামলে, সুরেন। নইলে এক্ষুনি দারোয়ান ডাকবো বলছি।

ঘাড়টা সঙ্কুচিত করে আঘাতের তীব্রতা কমাবার চেষ্টায় সুরেন বললে—সিভ্যাল্‌রি দেখাতে গিয়ে মাতালকে জখম করার কোনো মহত্ত্ব নেই। ছাড়ো, তুচ্ছ একপিণ্ড মাংসের জন্যে এমন গৌরচন্দ্রিকা না করলেও কিছু বেমানান হতো না।

—সে-সব কথা তোমার কাছ থেকে শিখতে চাই না। অনঙ্গ হাত সরিয়ে নিলে : তুমি এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় আর আসতে পারবে না। যাও এই মুহূর্তে।

সুরেন কোঁচা ঝেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। বললে—পুলিশে গিয়ে খবর দিতে পারতাম, কিন্তু মেয়েমানুষ বিচিত্র চিজ, হয়তো উনি বলে বসবেন যে স্বেচ্ছায়ই উনি এসেছেন, গুণ্ডা দিয়ে তুমি ওঁকে ধরিয়ে আনো নি !

অনঙ্গ বললে—যা খুশি পাগলামি তুমি করতে পারো, কিন্তু এখানে নয়। যাও বলছি, এখুনি।

—যাচ্ছি গো যাচ্ছি। তোমাদের ঘুমের যে ব্যাঘাত হচ্ছে তা আমি আর বুঝছি না ? কিন্তু যাবার আগে বৌদিদিকে একটা পেন্নাম ঠুকে যাই। বলে সুরেন না এগিয়েই সেখানে মেঝের ওপর মাথা নোয়াল। বললে—কিছু আর আমার বলবার নেই। অনঙ্গকে নতুন মানুষ, মহৎ মানুষ করে রেখে গেলাম আমার মতো অভাজনের পক্ষে তাই যথেষ্ট। অনঙ্গর চরিত্রে সুরেনের দানের কথা পরে কোনোদিন একবার ভেবে দেখো, বৌদি।

আর সে দাঁড়ালো না! চাকর তাকে সদর পর্যন্ত তাড়িয়ে দিল।

বন্ধুর এই অপকর্মের লজ্জা যে সে কী করে মোচন করবে, ভেবে কিছু ঠিক করবার আগেই গৌরী এগিয়ে এসে বললে—আর দেরি নয়, এক্ষুনি আমাকে মীরাদের বাড়ি রেখে আসতে হবে।

অনঙ্গ বললে—আর ভয় কী! বাড়িতে এখন তো কেবল আমি আর তুমি।

অস্থির হয়ে গৌরী বললে—না, আমি যাবো।

অনঙ্গ হেসে বললে—এবং যাবে তো তুমি আমারই সঙ্গে। এই মুহূর্তেও আমিই তোমার সব চেয়ে বড়ো বন্ধু। মীরাদের বাড়ি রেখে আসতে হলে আমিই রেখে আসবো।

গৌরী চুপ করে রইলো। তাঁতের রঙিন শাড়িটিতে তাকে উড়িয়ে নিচ্ছে।

—আচ্ছা, দাঁড়াও। বলে অনঙ্গ পাশের ঘর থেকে তার বন্দুকটা নিয়ে এলো।

—ও কী! গৌরী চমকে উঠেছে।

অনঙ্গ বললে—এটা তোমার কাছে থাক। আজ রাতে এই তোমার নির্জনতার সঙ্গী হোক! আমার মাঝে যদি কিছু অমিতাচারের লক্ষণ দেখ, এটা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবে।

—সর্বনাশ! না, না, ওটা অতো কাছে আনবেন না। গৌরী হেসে বললে—গুলি কী করে ছোঁড়ে তাই বা আমি জানি নাকি?

—একেবারে সোজা। এই কাঁধের সঙ্গে এমনি আটকে নিয়ে ঘোড়াটা সামনের দিকে টেনে দিলেই—ব্যস্। একটা চীৎকার আর একঘর ধোঁয়া।

—দেখি, দেখি। গৌরী অজানতে অনঙ্গর কাছে এগিয়ে এলো।

অনঙ্গ বললে—থাক, গুলি-ভরা আছে, ছুটে যেতে পারে।

গৌরী হেসে বললে—সর্বনাশ। তবে আর ওটার দরকার নেই। ওটা আপনিই রাখুন নিজের কাছে। আমাকে রক্ষা করবার জন্যে আপনি তো আছেন।

অনঙ্গ জোর গলায় বললে—নিশ্চয়, আমিই তো আছি। আমার দায়িত্বের কথা আমি ভুলি নি। আমি যার ট্রাসটি প্রাণ দিয়েও তার মর্যাদা রাখতে কসুর করবো না।

গৌরী বললে—তাইতেই ঐ বন্ধুটিকে আশ্রয় দিয়েছেন।

মর্মাহত হয়ে অনঙ্গ বললে—সেই জন্যে লজ্জায় আমি মৃত্যুকামনা করছি—

—সাবধান, দিন—বন্দুকটা আমার হাতে দিন—কখন কী করে বসেন, আপনাকে বিশ্বাস নেই। উনি হয় তো থানায় গেছেন খবর দিতে আপনি কোন ভদ্র মেয়েকে চুরি করে নিয়ে এসেছেন। আর পুলিশ এলেই তো এতোখানি কথা

বলে আপনাকে ধরিয়ে দেবো। বন্ধুও হারালেন, আমাকেও চলে যেতে হলো। বলে গৌরী তরলকণ্ঠে হেসে উঠলো।

অনঙ্গ বললে—মানে মানে যে চলে যেতে পারলো সেই ওর সৌভাগ্য।

গৌরী গাঢ়চোখে বললে—এখন মানে-মানে আমি যেতে পারলেই বাঁচি।

—তুমি তো পুলিশেই আমাকে ধরিয়ে দেবে বলছ।

—নিশ্চয়, এতো সব অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করলেন. সেটাই তো একটা প্রচণ্ড অত্যাচার! কিন্তু সেটাও কাল সকাল পর্য্যন্ত পোস্টপোন্‌ড থাক, কী বলেন?

অনঙ্গ বললে—বেশ, থাক। তবে এবার তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। দরজায় খিল চাপিয়ে দাও।

—আর আপনি?

—আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বন্দুক কাঁধে করে সারা রাত তোমাকে পাহারা দেব। বলে সে ঘরের বাইরে চলে গেলো। বললে—রাত অনেক হয়েছে। তোমার শরীর ভালো নেই, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো এবার।

সমস্ত ঘর নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেলো। কালকের ভোরের চেহারাটাও এর চেয়ে বেশি শূন্য মনে হবে না।

দরজায় খিল চাপাতে এসে গৌরী দেখলে অনঙ্গ বারান্দার অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় শাসনের সুরে বললে—আপনিও এবার ঘুমুতে যান। বন্দুক নিয়ে আর নাড়া-চাড়া করতে হবে না।

—না, এই যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকেও এখুনি শুয়ে পড়তে হবে। আলো জ্বালিয়ে রাখলে আমার ঘরের জানলা দিয়ে কিন্তু টের পাবো।

গৌরী হেসে বললে—কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লাম কি না সে-খবর তো আর পাবেন না।

—সে খবরে কী দরকার! আজ রাতটা কষ্ট করে কোনোরকমে কাটিয়ে দাও, কী করবে? কাল বন্ধুর ওখানে গিয়েই তো তোমার আর কোনো অভাব থাকবে না।

শরীরের দু' পাশে দরজা দুটোকে ঘনতর করে সংলগ্ন করে গৌরী বললে—আর কষ্ট হচ্ছে বলেই তো ঘুমুতে যাচ্ছি। বলেই নিজেকে সে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে দরজায় খিল চাপিয়ে দিলে।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে গৌরীর কেবলই মনে হচ্ছে, কাল সে এখানে আর থাকবে না, কাল সে মীরাদের ওখানে চলে যাবে।

মাত্র আজকের এই রাতটুকু। এক নিশ্বাসেই তা ফুরিয়ে যাবে। তারপর কাল থেকে প্রখর রৌদ্র, নিষ্ঠুর সংগ্রাম! শরীরের সমস্ত স্নায়ু-শিরা দিয়ে ঘরের এই অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার গৌরী আঁকড়ে ধরলো। সমস্ত অন্ধকারে কার যেন সে

স্নেহস্পর্শের স্বাদ পাচ্ছে—এই বালিশে-বিছানায়, দেয়ালে-মেঝেয়, এই সুন্দর পরিচ্ছন্ন অনুপস্থিতিতে।

দূর থেকে যাকে এত বিষ মনে হত কাছ থেকে তাকে মধু-মধু মনে হচ্ছে কেন? না কি বিষের মধ্যেই মধুরের বাসা? মধুরের আরেক নামই বুঝি হলাহল।

এই বুঝি দরজায় কার আঘাত পড়ল। আর আবার বোধ হয় তাকে রূঢ়কায় কঠিন হয়ে উঠতে হবে। কিংবা কে জানে কোনো কৌশলে, ঘরের মধ্যে অন্ধকারেই তার আবির্ভাব হল বলে।

না, শব্দ নেই, ইসারা নেই, শুধু এক পাষাণ স্তব্ধতা।

কিন্তু এখান থেকে না গিয়েই বা তার পথ কই? গৌরী দু'চোখ বুজে পথ খুঁজতে লাগলো। সমস্ত পথ রুদ্ধ করে অনঙ্গর সেই বলিষ্ঠ বাধা; এই বাধার ওপর জয়ী হতে না পারলে তার চলবে কেন? কী তবে এতদিন সে বলে এসেছে, সাধনা করেছে মনে-প্রাণে?

সকালবেলা চাকর ট্যাক্সি ধরে আনলো।

গৌরী বললে—এই পোশাকে যাই কী করে?

অনঙ্গ বললে—বন্ধুর ওখানে গিয়েই তো সব পেয়ে যাবে। পরে সব কিনে দেবার ব্যবস্থা করা যাবে'খন।

—সঙ্গে আমার একটিও পয়সা নেই।

—কিন্তু আমাকে তুমি একটা কাণা-কড়ির চেয়েও তুচ্ছ মনে করো নাকি? পয়সা তো তুমি তোমার বন্ধুর থেকেও চেয়ে নিতে পারবে।

গৌরী বললে—তা তো নেবো, কিন্তু শোধ করবো কোত্থেকে?

—শোধ না-ই বা করলে।

অনঙ্গর মুখের দিকে চেয়ে গৌরী বললে—মীরার সম্বন্ধে এ-কথা বলছেন? মীরা কি আমার তেমন বন্ধু নাকি? বলে সে শব্দ করে হেসে উঠলো: যাক, সে ব্যবস্থা হবে'খন একটা। আপনাকে ভাবতে হবে না।

অনঙ্গ বললে—তোমার জন্যে কিছু আর ভাববো না বলেই তো ঠিক করেছি।

—একেবারে ঠিক করেছেন? আমার জন্যে না ভাবলেন, কিন্তু আমার বাবা-মা'র জন্যে? উঠুন, উঠুন—যতো শিগগির হয় আপনাকে রেহাই দিতে পারলেই আপনি হাঁপ ছাড়েন, না?

ট্যাক্সিতে উঠে গৌরী বললে—হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে যাবেন না যেন। আপনার ঘরে একরাশ বই পড়ে রইলো, মাঝে-মাঝে আমি এসে পড়ে যাবো কিন্তু।

অনঙ্গ পাশে বসে বললে—আমার বাড়িতে তো মেয়েছেলে নেই।

গৌরী হেসে বললে—আপনিই তো আছেন।

এই কথার উত্তরে অনঙ্গ চুপ করে রইলো বলে কথাটার অর্থ যেন স্পষ্ট ও গভীর হয়ে উঠলো। সান্নিধ্যও ঈষৎ তপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্থানের পরিসরকে সঙ্কুচিত করবার জন্যে গৌরী মনে কোনো তাগিদ পেলো না। তাদের মাথার উপরে উদ্যত কোনো শাসন নেই, তাদের বেষ্টন করে অমিত ও অগাধ একটি প্রশ্রয়। ট্যাক্সির ছুটে চলার সঙ্গে অন্তরেও তারা উদ্দাম স্বাধীনতা পাচ্ছে।

গৌরী নম্বর বললে। ট্যাক্সিটা দাঁড়ালো।

জানা গেলো মীরাও কলকাতায় নেই। তার মা কামাখ্যায় তীর্থ করতে গেছেন, সেই সঙ্গে সেও গেছে--গৌহাটি হয়ে সোজা সে শিলং যাবে। আর শিলং না গেলেই বা কী!

অনঙ্গ বললে—এখন কী হবে?

লঘুপক্ষ পাখির মতো গৌরীর সমস্ত শরীর হালকা, চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললে,—আপাতত একটা দোকানে চলুন তো,—দরকারি কিছু কাপড়-চোপড় কিনে ফেলি।

ট্যাক্সিটায় ফের উঠে আসতে-আসতে অনঙ্গ বললে,—কিন্তু শোধ করবে কোত্থেকে?

গৌরী স্মিত মুখে বললে,—তা আশা করি আপনিই পরামর্শ দেবেন। এখন চলুন তো।

অনঙ্গ আগের ব্যবধান অনেকটা এবার সঙ্কীর্ণ করে এনেছে। বললে,—তারপর?

গুঁড়ো রুক্ষ চুলগুলি কানের দু'পাশে তুলে দিতে-দিতে গৌরী বললে,—গরমের ছুটিতে কেউ আর কলকাতায় নেই দেখি।

অনঙ্গ বললে,—আমরাও কোথাও বেরিয়ে পড়লে পারি, কি বলো?

ভীরু, আবছা গলায় গৌরী বললে,—মন্দ কি! তারপর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে: কিন্তু তার আগে বাবাকে একটা বড়ো চিঠি লিখতে হবে সব জানিয়ে! ওঁরা নিশ্চয়ই খুব ভাবছেন।

অনঙ্গ ট্যাক্সিটাকে চলতে বলে বললে—বিশেষ নয়। আমার কাছেই যখন তুমি আছ ভাববার তবে আর কী আছে!

মুখে-চোখে প্রচুর হাওয়া এসে গৌরীর কথাটা ডুবিয়ে দিলে: হ্যাঁ আশ্চর্য, আপনার কাছেই যখন আছি।

সংকলন

বিঃ দ্রঃ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের বহুতর রচনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলেও অনেক রচনা অগ্রন্থিত রয়েছে। এই সকল আদি রচনা পরবর্তীকালে কোনও গ্রন্থভুক্ত হলে গবেষকগণের তুলনা করা সহজসাধ্য হবে। সাহিত্যানুরাগী পাঠক, গ্রাহক এবং বাংলা সাহিত্য বিষয়ে গবেষণারত বিদগ্ধজন এই প্রকার অগ্রন্থিত রচনার অনুসন্ধান দিলে বাধিত হবো।

বলা বাহুল্য, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অপ্রকাশিত রচনার সংখ্যাও কম নয়, সেগুলিও ক্রমশ এই অংশে প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক

নিজেই গরজ করিয়া বলিলাম,—থিয়েটার দেখতে যাবে ইন্দু ?

ইন্দু রাজি হয় না সংসারে তাহার নাকি অনেক কাজ আছে। মাস ছয়েক ধরিয়া বিয়ে করিয়া উহার অহঙ্কারের আর শেষ নাই—একেবারে স্বাধীনকর্তৃকা হইয়া উঠিয়াছে। বলিল—আমার কি ওসব বাজে আমোদ করবার ফুরসৎ আছে ? আজ বিকেলে ধোবার কাপড় নিয়ে আসবার কথা। আমার গেলেই হ'ল আর কি ! তা ছাড়া—

একটু গম্ভীর হইয়া ইন্দু থামিয়া গেল দেখিয়া কান খাড়া রাখিয়া বলিলাম—বল, বল।

—তা ছাড়া দেশব্যাপী এই মুক্তি-প্রচেষ্টার দিনে তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে আমার মন ওঠে না।

চারিদিক ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম ধারে-পারে কেহ আছে কিনা। স্বর নীচু করিয়া বলিলাম—যখন-তখন গলা জড়িয়ে ধরে যে চুমু খাও—সেও তো একটা আমোদ। তোমার দেশব্যাপী এই মুক্তি প্রচেষ্টার দিনে এটা কি ক'রে সইবে ?

হাসি লুকাইবার চেষ্টা করিয়া ইন্দু বলিল,—কিন্তু ওতে তো আর পয়সা খরচ করতে হয় না।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—সমস্যাটা তা হ'লে অর্থনৈতিক। তাই যদি বল, তবে তুচ্ছ কেরানি জেনে আমাকে বিয়ে করাই তোমার ভুল হয়েছে। বিয়ে না করলে আমার অনেক খরচ বাঁচাতে পারতে। কিন্তু গরিব হয়েছি বলে সামান্য অপব্যয় করতে পাবো না—এ দীনতা আমি সইবো না। স্বগত উক্তির মত করিয়া বলিলাম- সমস্ত বিয়েটাই তো জীবনের একটা প্রকাণ্ড অপব্যয়।

তারপর মোটামুটি একটা বক্তৃতাই দিয়া ফেলিলাম। আমোদ না থাকিলে জীবন বহন করা যে একটা প্রকাণ্ড শাস্তি—মহাত্মা গান্ধীর হাতের চরকা যে তাঁহার কাছে খানিকটা একটা আনন্দদায়ক খেলনা মাত্র; সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরাও যে আমোদ পাইবার জন্য গাঁজার কলকি ধরে—একমাত্র আমোদ পাইবার জন্যই যে নিরো রোম পুড়াইয়া প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়াইয়া বেহালা বাজাইয়াছিল তাহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়া ইন্দুর মনটা ভিজাইয়া দিলাম। পরে, গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করিতেছি মুখে তেমনি একটি গাম্ভীর্য্য আনিয়া

কহিলাম,—বিবাহিত জীবন থেকে বাইরের আমোদকে আমরা নির্বাসন করেছি বলেই আমরা এমন স্থূল, দেহসর্বস্ব হয়ে উঠেছি। জীবনে বৈচিত্র্য নেই বলে স্বাদও খুঁজে পাইনে। ইত্যাদি মামুলি বুলি আওড়াইয়া ইন্দুকে রাজি করিয়া ফেলিলাম। বলিলাম—সাতটায় সুরু হবে। আমি একটু এখন বেরচ্ছি, ছটার সময় ফিরবো। তুমি সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে থেকো কিন্তু।

ইন্দুর মুখের হাসিটুকু মিলাইতে না দিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম।

ফিরিতে একটু বোধ হয় দেরি হইল। আসিয়া দেখি ইন্দু নিবিষ্ট মনে ঘুঁটে গুনিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত রাগ হইল; কহিলাম—আর মোটে তিন কোয়ার্টার বাকি, তুমি এখনো কাপড়-চোপড় পরনি যে? চট করে এস—বেশি সাজবার দরকার নেই। যতই সাজ, সুন্দর ত' আর দেখাবে না, বরং একখানা সাদাসিধে শাড়ি পরে এস, অন্তত ভদ্র বলে মনে হবে।

—আচ্ছা, খুব হয়েছে। আমি যাব না।

—যাবে না মানে? টিকিট কেটে আনলাম। দু' দুটো টাকা অমনি ফেলে দিলেই হল!

টাকার কথা ভাবিয়া ইন্দুর মন বোধ করি নরম হইল। ধামা করিয়া ঘুঁটে-গুলি দুই হাতে তুলিয়া কহিল—এই যাচ্ছি, দু' মিনিট।

দু' মিনিট ছাড়িয়া দশ মিনিট কাটিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম ইন্দু পিঠের উপর চুল ছড়াইয়া দিয়া তন্ময় হইয়া চিরুনি চালাইতেছে। রুদ্ধকণ্ঠে কহিলাম—চুল বাঁধবার অত ঘটা না করলেও চলবে, এমনি একটা এলো খোঁপা বাঁধলে কি জাত যেত?

ইন্দু কহিল,—হ্যাঁ, এমনি ভর সন্ধ্যেয় কেউ বুঝি চুল না বেঁধে বেরোয়। দিন দিন তোমার বিদ্যেবুদ্ধি খুলছে দেখছি।

কিছু না বলিয়া ইন্দুর ক্ষিপ্রহাতে চুল আঁচড়ানো লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কেশ-প্রসাধন শেষ করিয়া তাক হইতে একটা মুখে মাখিবার স্নো বাহির করিয়া গালে গলায় ঘসিতে সুরু করিল। রুখিয়া উঠিলাম—মুখে যতই কেননা রং লাগাও, কেউ ফিরে তাকাবে না। অত গুমোর কিসের? এখুনিই তুমি সাড়ে ছটা বাজিয়ে দিলে—বাস-এ আর যাওয়া যাবে না। কিন্তু এতটা পথ ট্যাক্সিতে কত উঠবে খেয়াল আছে?

ইন্দুও প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিল—তার জন্যে আমাকে নোংরা ছেঁড়া কাপড়টা প'রে পাঁচজনের সমুখে দাঁড়াতে হবে নাকি? মুখটা কেমন চটচট করছে—একটা কিছু না মাখলে আমি মরে যাবো। তারপর সিঁথিতে সিঁদুর দিতে হবে। বলিয়া

রূপার সিঁদুরের কৌটো খুলিয়া চিরুণীর ধারে সিঁদুর মাখিয়া সীমান্তে একটি রেখা টানিয়া দিল। মুগ্ধ চক্ষে তাহাই একটু দেখিলাম।

হঠাৎ খেয়াল হইল আকাশে নিদারুণ মেঘ করিয়াছে—এখুনি বৃষ্টি নামিয়া সমস্ত আমোদ পণ্ড করিয়া দিবে। তাই, ভাগ্য ও প্রকৃতির অবিচারের এক সঙ্গে প্রতিবাদ করিতে গিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলাম—শিগগির শাড়িটা জড়িয়ে নাও, বৃষ্টি এলে গেলে সব মাটি হবে।

কিন্তু ইহার পরেও ইন্দুর হুঁস হইল না। শাড়ির আঁচলটা যেন একটুও ভ্রষ্ট না হয় সেই দিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোযোগ দেখাইতে লাগিল। ঐ দিকে থিয়েটার যে আরম্ভ হইয়া গেল তাহাতে যেন কিছু আসিয়া যাইবে না, বিয়ের ছমাস পরে এই যে প্রথম বাড়ির বাহির হইতে পারিবে ইহাই তাহার কাছে বড় কথা। তাই, পেছনের শাড়ির ঝুলটা ঠিক জুতার গোড়ালিতে প'ড়ল কিনা তাহাই দেখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। তাড়াতাড়িতে গলার হার ছিঁড়িল, কানের দুলের সঙ্গে চুল আটকাইয়া রহিল, ঘোমটার লেস্-পিনটা খুলিয়া পড়িল। সেই সব ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করিবার জন্য ইন্দু আবার মনোযোগী হইয়া উঠিল দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া একেবারে বাহিরে টানিয়া আনিলাম; কহিলাম—ঢের হয়েছে; এখন বেরোও দিকি।

বাড়ি হইতে বড় রাস্তাটা বেশিক্ষণের পথ নয়, কিন্তু পথে পা দিতে না দিতেই আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি সুরু হইল। বুদ্ধি করিয়া একটা ছাতা লইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে মাথা কুলাইল না; আমোদ পাইবার অভিলাষে দুইজন পরস্পরের নিকট হইতে কোথায় একটু বিচ্ছিন্ন থাকিব, না, বৃষ্টি আসিয়া আবার আমাদের ব্যবধান ঘুচাইয়া একই ছাতার নীচে আনিয়া ফেলিল। একবার ইচ্ছা হইল বাড়ি ফিরিয়া যাই, কিন্তু টাকা ব্যয় করিয়া তাহার সুবিধাটুকু লইতে কৃপণতা করিব—এতটা মূর্খতা আমার ছিল না। তাই সেই বৃষ্টির মধ্যে সোজাসুজি বাস-এ আসিয়াই উঠিলাম।

এক কোণে বসিয়া পড়িয়া এইবার ইন্দুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ হইল। মনে হইল এই মুহূর্তে বাসটা যদি বিপরীতগামী আর একটা মোটরের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া চৌচির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ বুজিতে পারি। ইন্দুর আড়াই টাকা দামের নাগ্‌রা জুতো জোড়া কাদায় লেপিয়া গেছে, শাড়ির ঝুলটা জলে কাদায় সপ্‌ সপ্‌ করিতেছে, ঘোমটার লেস্-পিন্‌টা কিছুতেই আটকাইয়া বসিতেছে না। যাহাকে এক রাত্রে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বোধ করিয়াছিলাম তাহাকে কোনদিন এমন হতশ্রী অবস্থায় পাশে বসিয়া

থাকিতে দেখিব বিশ্বাস করি নাই। ইচ্ছা হইল উহার পাশের জায়গাটা খালি রাখিয়া ঘণ্টার দড়িটা টানিয়া দিয়া আলগোছে নামিয়া পড়ি। কিন্তু কখন যে ষ্টার থিয়েটারের দোর-গোড়ায় আসিয়া পড়িয়াছি শ্বশুরকুলকে অভিশাপ দিতে দিতে, তাহার আর খেয়াল ছিল না।

থিয়েটার আরম্ভ হইল। অভিনয় আরম্ভ হইয়া গেল, তবু তখনও লোক ঢুকিতেছে। লোকগুলি এতক্ষণ কবরের তলায় শুইয়া হাই তুলিতেছিল নাকি? লোকগুলির ব্যস্ত কোলাহল শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিতেই পেছন হইতে একটি লোক 'অর্ডার' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—এবং এই শেষোক্ত লোকটিকে থামাইবার জন্য তাহার পেছন হইতে আরো দশজন প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল 'অর্ডার'—এবং এই অপ্রাসঙ্গিক আদেশকে শাসন করিবার জন্য চতুর্দিক ও চারিকোণ হইতে যে সমুদ্রসমান 'অর্ডার'-গর্জ্জন সুরু হইল তাহা শেষ হইলে বুঝিলাম প্রথম দৃশ্যের অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

দেখিলাম পাশের ভদ্রলোকটি অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন—আগে দেখেছেন? গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া না করিলাম। তিনি উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—চমৎকার মশাই। এই নিয়ে আমার তিনবার হল। নাটকের 'থিম্‌টা' মশাই 'মার্ভেলাস্'। হাসিয়া কহিলাম—গল্পটা যদি আমাকে নিজে দেখেই বুঝতে দেন তা হলে ভালো হয়। আপনি কষ্ট করে কেন বলতে যাবেন?—ভদ্রলোকটির তাহাতে দমিবার কোনো কারণ দেখিলাম না। আমার পাশে সদ্যযৌবন-সমাগতা একটি নারী দেখিয়াই যে তিনি এতটা উৎসাহ দেখাইতেছেন তাহা বুঝিলাম বলিয়াই তাঁহাকে বাধা দিতে ইচ্ছা হইল না।

ব্যাপারটা তিনি যাহা বিবৃত করিলেন তাহা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—একটি মেয়ে বিবাহের পর স্বামীসঙ্গ অস্বীকার করিয়া একলা থাকিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু-বিবাহের মন্ত্রের এমনি জোর যে সেই মেয়ে সহসা তাহার সকল সঙ্কল্প জলাঞ্জলি দিয়া স্বামীর জন্য একেবারে ভেউ-ভেউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। বিবাহ যে শুধু নরনারীর সাংসারিক একটি মীমাংসা বা দৈহিক একটা রফা নয়—সেই ইঙ্গিত করিয়া ভদ্রলোকটি আমার স্ত্রীর উদ্দেশে এমন সব উপদেশ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে তাঁহার এই বাক্যস্ফূর্তিকে শাসন করিতে প্রেক্ষাগৃহে আবার একটি তুমুল কোলাহল উঠিল।

নাটক দেখিতে দেখিতে মনে হইতে লাগিল ভাটপাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঝিমাইয়া লইতেছি বুঝি, কিন্তু দেখিলাম ইন্দু ভাবে একেবারে গদ্‌গদ্ হইয়া

উঠিয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত কিছুর থেকেই যে স্বামী বড়, এবং তিনি প্রহার করিলেও যে স্ত্রীকে নতপৃষ্ঠে তাঁহার পদসেবাই করিতে হইবে—এই জাতীয় মতগুলিতে সায় দিয়া সে আমাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। ব্যক্তিত্ব বলিয়া স্ত্রীর যে কোনো আলাদা সম্পদ থাকিতে পারে না, স্বাতন্ত্র্যই যে অসতীত্ব, রঙ্গমঞ্চের উপর এ-সব কথা যখন সদর্পে উচ্চারিত হইতেছিল, দেখিলাম ইন্দুর গাল বাহিয়া জলধারা নামিয়া আসিয়াছে। আমার এত রাগ হইতেছিল যে জরিমানা দিবার পয়সা থাকিলে আমি রঙ্গমঞ্চের উপর উঠিয়া সব ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া একাকার করিয়া দিয়া আসিতাম।

থিয়েটার দেখাইয়া উল্টা ফল হইল। ইন্দু এক রাত্রেই এত ভক্তিমতী হইয়া উঠিল যে তাহার লক্ষণটা ঠিক সাধু মনে হইল না। দেখিলাম টেবিলের উপর কাঁচের গ্লাশ ভরিয়া জল রহিয়াছে, একটা খবরের কাগজের উপর গোটা তিনেক পান। শুইলে পর শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল, আর শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেলে স্পষ্ট দেখিলাম আমার পায়ের তলায় বসিয়া ইন্দু তাহার কোলের উপর আমার পা দুইটা তুলিয়া লইয়া তাহাতে হাত বুলাইতেছে। বেশ আরাম লাগিতেছিল বলিয়া পা সরাইয়া লই নাই; তবে এইটুকু বেশ বুঝিতে পারিলাম পা তুলিয়া উহাকে ভর্ৎসনা করিলেও ইন্দু তখনও পদপ্রার্থিনী হইয়া বসিয়া থাকিবে।

মহা ফাঁপরে পড়িলাম। ইন্দু দিনে দিনে এত নিকটবর্তী হইয়া উঠিতে লাগিল যে তাহার সঙ্গে সম্পর্কে শ্লীলতা বজায় রাখা কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। এবং সেই কারণেই তাহাকে কী যে কুৎসিত লাগিতে লাগিল বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাহার সঙ্গে যে দূরত্বের ব্যবধান রাখিয়া চলিতেছিলাম—সমস্ত অন্তরাল নিমেষে অতিক্রম করিয়া ইন্দু একেবারে আমার হৃদয়ে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া সবলে বাধা দিলাম। সেই বাধার ফলে যে-সঙ্ঘর্ষ সুরু হইবার কথা, তাহা ইন্দু হইতে দিল না। নারীত্বের প্রতি যাহা অবমাননাকর বলিয়া মনে হওয়া উচিত তাহাকেই স্ত্রীত্বের পরম পুরস্কার মনে করিয়া ইন্দুর তৃপ্তির আর শেষ রহিল না।

কত কিছুই ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম ইন্দুকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে হইবে—স্বামী-সংজ্ঞাটাই যে উহার জীবনের জপমন্ত্র নয়—পরিবারের পরিধিটুকুর বাহিরেও যে একটি বৃহৎ জগৎ ও জীবন আছে—সে একদিন আমারই সান্নিধ্যে আসিয়া তাহা বুঝিবে ও বৃহত্তর উপলব্ধির আশায় দরকার হইলে একদিন সমস্ত সংসার ও সংস্কার ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু বাহিরের সমস্ত জগৎ অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া রহিল—ইন্দু তাহার আত্ম-

মর্যাদা ভুলিয়া আমাকে ভাল না বাসিয়াই একমাত্র সংস্কারের খাতিরে এমন সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিল যে রীতিমত হাঁপাইয়া উঠিলাম। ইন্দু এত বাড়াবাড়ি সুরু করিয়া দিয়াছে যে সে এ-কথা বলিতে পর্যন্ত সঙ্কোচ করিতেছে না যে জন্ম-জন্ম সে নাকি আমারই ঘাড় ধরিয়া বিচরণ করিয়া আসিয়াছে ও বহু জন্ম ধরিয়া নাকি এইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইবে। মৃত্যুর পরেও মুক্তি পাইব না—ইন্দুর এই প্রকার জবরদস্তিকে শাসন করিতে গিয়া হার মানিলাম; কখন ধরা পড়িয়া গেলাম জানি না—এক বৎসর পুরা না হইতেই ইন্দু আমার কাছে এত পুরোনো হইয়া উঠিল যে জুতা হইলে তৎক্ষণাৎ উহাকে রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতাম।

হঠাৎ খবর পাইলাম পাবনা হইতে অক্ষয় আসিতেছে—লাহোর যাইবার মুখে কলিকাতায় কয়েকদিন জিরাইয়া যাইবে। বন্ধু আসিতেছে শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম; কিন্তু বন্ধু-র সামনেই ভাতের থালা ও তেলের বাটী লইয়া বাহির হইতে হইবে শুনিয়া ইন্দু ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল। পর-পুরুষের সঙ্গে কথা কহিলেও নাকি তাহাকে মৃত্যুর পর উত্তপ্ত কটাহে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে হইবে—তাহার এই সব মত শুনিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার সাধ হইল। বলিলাম- তুমি যে বেরোও তা আমারো ইচ্ছে নেই।

ইন্দু সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল—কেন?

মুখভঙ্গী করিয়া বলিলাম—ঐ ত ছিরি; টাকার লোভে এমন হাড় বের করা আম্‌সিকে বিয়ে করেছি। তোমাকে দেখে আমার বন্ধু যে আমার রুচিজ্ঞানের প্রশংসা করবে না তা ঠিক জেনো।

এই কথা শুনিয়া স্বভাবতঃ যেটুকু অভিমান করিবার কথা, ইন্দুর রাগটা তাহারও নীচে পড়িয়া রহিল। আমার পায়ের তলা দুইটি তৈলাক্ত করিতে করিতে কহিল—আমি ওসব পারবো না, সত্যি। আধুনিক কালে জন্মেছি বলেই যে সব লজ্জা-সরম ছেড়ে আমাকে একেবারে অধার্মিক হতে হবে তার কোনো মানে নেই। বন্ধুদের সঙ্গে অমন ছেনালি করা আমার পোষাবে না। আমি পারবো না বাপু।

অক্ষয় আসিল, কিন্তু লাহোরে যাইবার কথা ভুলিয়া মারিয়া দিয়াছে হয় ত'। এখান হইতে আর উঠিবার নাম নাই। একদিন সোজাসুজি কথাটি পাড়িয়া বসিলাম। অক্ষয় বলিল, লাহোরে যাওয়া আর হয়ে উঠবে না, কলকাতার ব্রাঞ্চ আফিসের কাজটা সেরে নেওয়া যাবে। তাহার অর্থ—আরো কয়েক দিন এখানে থাকিয়া না গেলে তাহার চলিবে না। অক্ষয়ের সঙ্গে আমার এমন সম্পর্ক নয় যে তাহাকে মেসে যাইতে বলিব। অথচ অক্ষয় যে সারাক্ষণ বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে

তাহাতে ইন্দু চটিতে লাগিল। আগে ত তবুও আনাচে-কানাচে ইন্দুকে দেখা যাইত, এখন ভাতের থালা বা ডালের বাটিটা পর্য্যন্ত চাকরকে আগাইয়া দিতে হয়; অক্ষয়ের কাছে মিথ্যা করিয়া বলি—ইন্দুর পায়ের ওপর গরম দুধ পড়ে গিয়ে ফোস্কা পড়েছে। অক্ষয় 'আহা' করিয়া উঠে!

ইন্দুর প্রতি অক্ষয়ের সম্ভ্রমের আর সীমা নাই—ইন্দু এমন সতর্কভাবে আত্ম-গোপন করিয়াছে বলিয়াই অক্ষয়ের কাছে সে কবিতার মত রহস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিল। একদিন সে আমাকে বলিল বৌদিকে নিয়ে চল একদিন করিন্থিয়ান্ থিয়েটারে। পার্শিদের কীর্তি দেখে আসি। পর-পুরুষ সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে পথে পদার্পণ করিলে যে ইন্দুর জন্ম মৃত্যুর পরে উত্তপ্ত কটাহের ব্যবস্থা হইবে—সেই ভয়ে সে যাইতে মোটেই রাজি হইল না। অক্ষয় নিজে আসিয়া অনুরোধ করিলে মাথায় এত বড় একটা ঘোমটা টানিয়া বসিল যে পিঠের কাপড়টা ঠিক রহিল না।

অক্ষয়কে ট্রেনে তুলিয়া দিবার সময় সে আমার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া কহিল—চমৎকার বৌ পেয়েছ হে। বাঙলা দেশে এমনতর মেয়ে আজকাল কোথাও কেউ দেখেছে বলে শুনিনি। তোমার ভাগ্য দেখে সত্যিই এতদিন বাদে হিংসে হচ্ছে।

মজা এই, ইন্দু যদি আমার সৌভাগ্যক্রমে অক্ষয়ের স্ত্রী হইত, তাহা হইলে আমিও সত্য সত্য ইন্দুকে এমন অকাতরে প্রশংসা করিতে পারিতাম।

পান

দেবাশিস বিয়ে করে বউ ঘরে নিয়ে এলো।

মেয়েরা সবাই ফিসফিস করে বলাবলি করতে লাগলো: এ আবার কেমন-ধারা পছন্দ। দেবুর মাথা-টাথা বিগড়ে গেলো নাকি?

—'যেমন দাদা গুণমণি, তেমনি বউ রায়মণি।' দু'জনেই যে সমান কালো, দিদি।

—এই তো বাবা ছুরৎ তার বউয়ের চলন দেখ না। ঠিক যেন তুর্কি ঘোড়া লাফিয়ে চলছে। কলকাতা থেকে এ তুই কী ধরে নিয়ে এলি, দেবু?

—পান সাজতে জানে না, দু'পায়ে আবার আলতা পরেছে। যেমন রূপের ডালি, তেমনি গুণের জাহাজ। কোন্ গুণে ও তোকে বশ করলো শুনি?

স্মিতসচ্ছ মুখে দেবাশিস বললে : এদের তুমি একটা গান শুনিয়ে দাও তো, মনো।

গান! গান! মনোবীণা যখন গান গায় তখন তার সমস্ত শরীর সুরের আগুনে দেদীপ্যমান হ'য়ে ওঠে। অন্ধকার অপসারণ করে সূর্যোর আদিম উদয়ের মতো তার কালো দেহের ওপর জ্যোতির্ময় আত্মার আবির্ভাব হয়, সুরের রক্তচ্ছটা স্নায়ুতে-শিরায় বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তখন তাকে আর একটা শরীর মনে হয় না, মনে হয় আগুনের একটা শিখ।

দেবাশিস মুগ্ধ হয়েছিলো মনোবীণাকে দেখে নয়, শুনে। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মাঝে চোখকেই কেবল খাতির করতে হবে দেবাশিসের রূপ জিজ্ঞাসায় এমন কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিলো না। মনোবীণাকে সে উদ্ঘাটিত দেখলো তার শ্রুতির মাধ্যস্থে; প্রত্যক্ষদৃষ্টির বর্ণচ্ছটায় নয়, অনুভূতির বিহ্বল গভীরতায়। তাই, যা আমরা দেখি, তার চেয়ে বেশি সত্য বেশি গভীর যা আমরা শুনি। দেখার যে প্রতিক্রিয়া তা সুরু হয় আমাদের দেহে, শোনার প্রতিক্রিয়া অলক্ষ্য গোপনে অন্তরে চলতে থাকে। দেখা হচ্ছে সীমাবদ্ধ, কিন্তু শোনার স্থায়িত্ব বহুক্ষণের। দেখায় আমরা আক্রান্ত হই, কিন্তু শোনায় হই অভিভূত। দেখার দীপালোকে সমস্ত রূপ যেন একসঙ্গে সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু শোনার থেকে মনে যে সম্মোহ উপস্থিত হয় তা'তে রূপ যেন সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, তাকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যে মন আপনা থেকেই ইচ্ছামতো সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে।

এবং এই গোপন সৃষ্টিক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেবাশিস মনে-মনে মনোবীণাকে অপূর্ব সুন্দরী বলে অভিবাদন করলে। তার বি-ই কলেজের বন্ধু সত্যভূষণ **'C, N, R,'** হ'য়ে চলে যায় গ্লাসগোয়। সেখান থেকে কৃতিবিদ্য হয়ে কলকাতায় ফিরে এসে সরকারি চাকরি পেয়ে বালিগঞ্জে বাড়ি ফেঁদেছে। তারি ওখানে বেড়াতে এসে দেবাশিস তার বোন মনোবীণার গান শুনলো। তার গান শুনলো না বলে মনোবীণাকে শুনলো—এমন কথা বলতে পারলেই অর্থটা জোরালো হতো। অন্য চতুরিন্দ্রিয় সম্পর্কে ব্যক্তিকে সোজাসুজি কর্মকারকরূপে ব্যবহার করা যায়, কেবল শোনার বেলায় শুনতে হবে তার কথা, তার গান, তার সোচ্চার হাসি। সত্য কথা বলতে কি, দেবাশিস তার গান শোনেনি, শুনলো গীতপরা এই মনোবীণাকে। তার সমস্ত শ্রুতিশক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে সে মনোবীণাকে উপলব্ধি করলে।

কারো বা রূপ শারীরিক লীলা-উল্লাসে, কারো বা বিভ্রমমণ্ডনে, কেউ বা জন্ম থেকেই এমন রূপাঙ্কিতা যেন "আভাতি মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থা চাপযষ্টিরিব।" কিন্তু

মনোবীণার রূপ গোচরীভূত শরীরে নয়, অধিষ্ঠান করেছে তার দীপ্ত—তার উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বরে। অর্থাৎ এ-রূপ সে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেনি, জন্মাধিকার-সূত্রে সৃষ্টি করেছে। এবং যা সন্তান সৃষ্টির ফল তা'তেই যে ব্যক্তিত্ব বেশি প্রকাশিত হবে তা না বললেও চলে। দেবাশিসের এমন বয়েস নয় যে গ্রীক ম্যাগ্‌ডেলিন বা ভিক্টোরিয় যুগের ডলিকে ভালো লাগবে, ততো রূপকে নয়, যতো সে প্রাধান্য দেয় ব্যক্তিত্বকে। তাই মনোবীণাকে যে তার সাধারণের কিছু অতিরিক্ত বলে ভালো লাগবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

দেবাশিস এটোয়ায় ইঞ্জিনিয়ার—লম্বা ক' মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতা এসেছিলো শরীর সারাতে, স্থান-পরিবর্তনে ততো নয়, যতো চিকিৎসায়। মনোবীণার গান শুনে সে যেন টের পেলো অসুখটা তার শরীরে নয়, মনে। ডাক্তারি ইলেক্‌ট্রিক ট্রিট্‌মেণ্টে শরীরের যতো না সে উপকার বুঝেছে তার বেশি ফল হলো তার মনে এই মনোবীণার গানের আকস্মিক তড়িৎ-সঞ্চারে। সুরের সেই সূক্ষ্ম তাড়িত তরঙ্গগুলি যেন তার অবসন্ন স্নায়ুমণ্ডলীকে উজ্জীবিত করে তুললো।

সংস্কৃতকাব্যে যাকে বলেছে বেদিবিলগ্নমধ্যা, তেমনি কৃশ কিশলয়ের মতো কমনীয় একটি কালো মেয়ে এই মনোবীণা দু'হাতে অর্গ্যানের চাবি টিপে সুরের তুফান তুললো। Bull's Eye-র মতো এক টুকরো ছোট কালো মেঘ যেমন কোথা থেকে দ্রুত ছুটে এসে আকাশের দশদিঙ্মুখ আচ্ছন্ন, অন্ধ করে দেয়,—সুরু হয় তুমুল ঝড় আর বৃষ্টি, তেমনি মনোবীণার গলা থেকে প্রথম একটি করুণ, মিঠে আওয়াজ বার হয়ে পরে বহুবিসর্পিত হতে-হতে ঘরের সমস্ত শূন্যতা ভারাক্রান্ত করে তুললো. সুরু হলো গমকের বিদ্যুৎ, মূর্চ্ছনার তুফান। দেবাশিসের মনে হলো এ তা'র কণ্ঠের স্বর নয়, আত্মার প্রার্থনা। তার দেহ সমাহিত, স্থির; মুখে কোমল শান্ত লাবণ্য; দুই চোখ স্ফুরিতোজ্জ্বল; মাখনের মতো নরম, চঞ্চল আঙুলের প্রান্ত থেকে পলায়মান লীলা ক্ষণে-ক্ষণে পিছলে পড়ছে। দেবাশিস বিভোর হয়ে একটার পর একটা গান শুনতে লাগলো। সে-শোনার প্রতিধ্বনি বাজছে তার রক্তে নয়, তার কোমল ভাবতন্তুতে। কেননা দেখতে মনোবীণা গোলাপ নয়, এনিমোন্; আর আমরা সবাই জানি রক্ত থেকে গোলাপের জন্ম, এনিমোনের জন্ম হচ্ছে অশ্রুজলে।

বলাই বাহুল্য হবে যে দেবাশিস শরীর সারাতে এসে উঠেছিলো এই বালিগঞ্জে, সত্যভূষণের বাসায়। বহুলতরো হবে এ বলা যে গানের অলৌকিক সুর ছেড়ে দিব্যি সাদাসিধে মাজা-ঘসা কথায় মনোবীণার সঙ্গে তার আলাপ-আলাপন

হলো। এবং এদের নিয়েই গল্প যখন লিখতে বসেছি তখন না বললেও চলবে এদের মৌখিক পরিচয়টা দিনক্রমে আন্তরিক সৌহার্দ্যে রূপান্তরিত হলো। সে-সৌহার্দ্য মনোবীণা কী ভাবে নিয়েছিলো জানি না, কিন্তু দেবাশিসের কাছে মনে হতে লাগলো একপেশে, অসম্পূর্ণ। মানুষের সম্পূর্ণতা তার আত্মিক ও কায়িক চেতনার সমন্বয়ে; তাই অর্ধসুপ্ত বা অর্ধপ্রচ্ছন্ন বন্ধুতায় সে খুসি নয়, কেননা তাতে তার জীবনের সর্বাঙ্গীনতাই হচ্ছে ব্যাহত। অতএব, এক কথায়, মনোবীণাকে সে বিয়ে করতে চাইলো।

প্রস্তাবটা যেমন শ্রুতিমধুর, তেমনি লোভনীয়—সত্যভূষণ উঠলো লাফিয়ে। মনোবীণার যে এমন ভাগ্য হবে এ কেবল এতোদিন তার বিধাতাই জানতেন, খবরটা এবার তার আত্মীয়-স্বজনের কানে উঠলো। পড়ে গেলো সোরগোল, এবং দেখা গেলো গোলে হরিবোল দেয়ার মতো সেই কোলাহলে মনোবীণাও কখন তার সুর মিলিয়েছে।

বিয়ে করে মনোবীণাকে নিয়ে চললো সে তার দেশের বাড়ি—অজ পাড়াগাঁয়ে। তার মা-বাবা নেই, কিন্তু আছে তবু এক বৃহৎ পরিবার, যাদের দূর পশ্চিমে গিয়ে দেশের প্রথা-আচারে জলাঞ্জলি দেয়ায় ঘোরতর আপত্তি, যাদেরকে সে মাসে-মাসে মোটা টাকা পাঠিয়ে সম্পর্কের সম্মান রাখছে।

দেবাশিস ইঞ্জিনিয়ার—ময়দানবের প্রতিনিধি, মূর্তিমান যন্ত্রদেবতা। মনোবীণা হচ্ছে যন্ত্রের অতীত সেই অসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশ। দেবাশিসের কাজ উৎপাদন, মনোবীণার হচ্ছে সৃষ্টি! দুই ভিন্নগুণের গ্যাস মিলিয়ে যেমন জল তৈরি হয়, তেমনি তাদের বাহু ও কণ্ঠের যোগফলে কী অপূর্ব ভবিষ্যৎ সূচিত হবে তা কেউ বলতে পারে না!

দেবাশিস হেসে বললে,—হলো তো তোমার পাড়া-গাঁ দেখা?

হেসে মনোবীণা পালটা জবাব দিলে: হলো তো এদের তোমার শহর দেখানো?

শরীর সেরেছে, ছুটিও ফুরিয়ে এসেছিলো; দেবাশিস বললে,—চলো এবার এটোয়ায় ফিরে যাই।

মনোবীণা বললে,—Amen.

আগ্রা-বিভাগে এই এটোয়া, যমুনার থেকে আধ মাইল পূর্বে, কলকাতার থেকে সাতশো মাইলেরো বেশি তার ব্যবধান—স্বামীর সঙ্গে মনোবীণা ঘর করতে এলো। হিউমগঞ্জে তাদের বাসা, বাঙলো প্যাটার্নের, চারদিকে মাঠ—চাকর-

চাপরাশি, বয়-খানসামা। মনোবীণার সেখানে অবাধ আধিপত্য। তার মোটর-সাইকেল করে দেবাশিস সকালে চারটি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়ে, আজ গোয়ালিয়র, পরশু আবার ফরাক্কাবাদ ; কখনো বা আগ্রা. কখনো বা মৈনপুরি। সমস্ত দিনটা মনোবীণার একলার এলেকায়, ঘর সাজিয়ে বই পড়ে ছবি দেখে স্বামীর ফেরবার প্রতীক্ষা করে কোনোরকমে গোঁজামিল দিয়ে সে চালায়। রাত্রের দিকে দেবাশিস ফিরে এলে সে তখন তার বাজনা নিয়ে বসে। আগে সে নিজেকে শোনাবার জন্যে গান গাইতো, এখন স্বামী শুনবেন না ভাবলে তার আর মুখ খুলতে ইচ্ছে করে না।

মাঝে মাঝে যখন ছুটি-ছাটা হাতে আসে, তখন তারা বেরিয়ে পড়ে শহর দেখতে। রোমে এসে রোম্যানদের মতোই ব্যবহার করা উচিত। বেরিয়ে পড়ে তারা সেই পুরোনো দুর্গ দেখতে—তার সেই বিপুল বলবান ধ্বংসস্তূপে, জুম্মা-মসজিদে, কখনো বা 'অথালায়', হিন্দু-মন্দিরে। সমস্ত শহরের গায়ে এখনো যেন সেই বীর-বর্বর ঘোরীর তেজস্বী অস্ত্রাঘাত লেগে আছে। কখনো বা যায় তারা যমুনার স্নানের ঘাটে মেলা দেখতে, কখনো বা চলে আসে শহর ছাড়িয়ে সেই 'ত্রিজী মহাদেও'র মন্দিরে, কৃত্রিম সেই টিলার ওপর, সেখান থেকে শহর ও তার চারধারের গ্রামবসতিগুলি কী সুন্দর যে দেখায়!

তা ছাড়া, মনোবীণা একেবারে একলা। সমস্ত দিনব্যাপী তার ধু ধু নির্জনতা। মনে হয় এই নীরবতাও যেন তার গান, অন্তরায় খাদের মতোই স্তিমিত, বিষণ্ণ। পরক্ষণেই দেবাশিসের বাইকের শব্দে সে-নীরবতা হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে! তার অন্তরে জাগবে ঢেউ, শরীরে ফুটবে রেখা। এই মহামৌন ছেড়ে মনোবীণা হঠাৎ গানে-গল্পে উন্মুখর হয়ে উঠবে।

ভুখারি গাছের ছায়ায় অন্ধকার রাস্তায় দেবাশিসের সাইকেলের আলো দেখা যায়···তার আগে আসে শব্দ! মনোবীণা বাইরের বারান্দায় ছুটে আসে, থল্‌থল্ করে কথা বলতে সুরু করে। সে কতো কথা! দেবাশিস খোলস খুলে ভদ্র হয়ে জলখাবারের টেবল নিয়ে বসলে সুরু হয় গান। ফরমায়েসি গান ছেড়ে পরে নিজের ইচ্ছেমতো! অনর্গল গান, অনবরত গান। গানের উত্তরঙ্গ সমুদ্র। গানের ঘূর্ণি, গানের টর্নেডো। দেখতে-দেখতে মনোবীণার শরীরে সৌন্দর্য্যের জোয়ার ডাকে, তাকে ঘিরে লাবণ্য যেন মথিত হতে থাকে। তারপর হাতের কাছে আর বাজনা থাকে না, তবু ঘুরে-ফিরে হাতের কাজ করতে গিয়ে তার ক্ষিপ্র পদক্ষেপে, শরীর-লীলায় গান ঝরে পড়ে। মনোবীণার এই প্রাণ-অণু সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ছে তার দেহে। শেইক্‌সপিয়রের সেই কথা মনে হয়:

'There's not the smallest orb which thou behold'st

But in his motion like an angel sings.'

তারপর গান থামিয়ে মনোবীণা স্বামীর সঙ্গে বাইরে চেয়ার টেনে বসে। তখনো সেই গানের বিরতি নেই। আকাশের তারায়-তারায় সে-গান সহসা স্বরময় হয় ওঠে—পিথাগোরাস যা শুনেছিলো; প্রতি গ্রহে, প্রতি তারায় প্লেটো দেখেছিলো এক সাইরেন্, পার্শ্ববর্তিনী সাইরেনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে গান গেয়ে চলেছে। মনোবীণা হচ্ছে এই পৃথিবীর সাইরেন্, তার সুর মিলেছে ঐ তারার সুরের সঙ্গে। স্ত্রীকে আর দেবাশিসের মর্ত্যাচারিণী মানবী বলে মনে হয় না।

গানের ঢেউয়ে তার সারাদিনের ক্লান্তি যায় ধুয়ে, রুক্ষতা হয়ে আসে কোমলতরো। তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন সে-গানের জলে স্নান করে ওঠে, সে-গানের হাওয়ায় তার মনের লাখো-লাখো জানলা দিকে-দিকে খুলে যায়। তারপর রাতের গভীরতার সঙ্গে-সঙ্গে সে-গান ফেনায়িত নিঃশব্দতায় স্পন্দিত হতে থাকে। তারপর রাত পুইয়ে গেলে সেই প্রাচীন Provencal-দের মতো তারা গান গেয়ে ওঠে: 'Ah God! Ah God, that day should come so soon!'

দেবাশিসের অসুখ ছিলো পেটে। পেটের সেই ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠলো।

বিয়ের পর মনোবীণা রেখেছিলো তাকে নিয়মে বেঁধে, খাওয়া-দাওয়ার সীমাবদ্ধ পরিমিতির মধ্যে। কিন্তু ছ'মাস যেতে-না-যেতেই সেই আধো নিবন্ত ব্যাথাটা হঠাৎ দাউ-দাউ করে জলে উঠলো।

ডাকা হলো বড়ো ডাক্তার, চললো আপ্রাণ শুশ্রূষা—ব্যথাটা দু'দিন যদি বা থামে, তৃতীয় দিনে স্থূল একটু পথ্য পড়লেই তা আবার দেখা দেয়। নাভিমূল থেকে সুরু করে একটা সাপ যেন সমস্ত পাকস্থলীতে কুণ্ডলী পাকাতে থাকে—আর একটা কঠিন তপ্ত শলাকা যেন বুকের ডান দিকের পাঁজরা থেকে উঠে এসে মেরুদণ্ডে গিয়ে ধাক্কা মারে।

ব্যথা যখন দেখা দেয় তখন দেবাশিসের সমস্ত শরীর দুমড়ে-মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সে যে সেই মানুষ তখন আর তাকে চোখ চেয়ে চেনা যায় না—মনে হয় জড় একটা মাংসপিণ্ড। সূর্যের সমস্ত আলো তেতো, পৃথিবীর সমস্ত হাওয়া বিষ! তারপর ব্যথাটা যখন একটু পড়ে, ভীত, স্তিমিত চোখে চেয়ে দেখে মনোবীণা তার মাথায় হাত রেখে শিয়রে চুপ করে বসে আছে! দুশ্চিন্তায় সে-মুখ কালো, গভীর নিরাশায় একেবারে

কুৎসিত। তার শরীরে নেমেছে ভয়-গাঢ় মন্থরতা, একটা মুহ্যমান আবেশ। চোখে সেই দীপ্তির বদলে শুভ্র একটা বিবর্ণতা মাত্র।

প্রথম-প্রথম ভাঙা শরীর নিয়েই দেবাশিস কাজে বেরোতে গেছলো, বাইকে নয় টাঙায় করে, কিন্তু পথের লোক ধরাধরি করে তাকে যখন বাড়ি ব'য়ে আনলো, দেখা গেলো সে অজ্ঞান, মূর্চ্ছিত হয়ে আছে। তারপর কাজে আর তাকে যেতে দেয়া হয়নি, কিন্তু কামাইয়েরো একটা সীমাবিধি আছে। দেবাশিস ফের ছুটির জন্যে দরখাস্ত করলো। দরখাস্ত মঞ্জুর হলো না।

—এখন উপায়? মনোবীণা আঁৎকে উঠেছে।

বালিশটা দৃঢ় করে পেটের ওপর চেপে ধরে উপুড় হয়ে দেবাশিস প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো: উপায় আবার কি! কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যেতে হবে।

—কোথায় যাবে?

—কোথায় আবার যাবো! কলকাতায়। এখানে থাকলে আমি আর বাঁচবো না।

সত্যভূষণ এর মধ্যে রাজসাহী বদলি হয়ে গেছে, বাসাটা রেখে গেছে ভাড়াটের জিম্মায়। পত্রপাঠ সে-বাসা পাওয়া যাবে না। তার এক আত্মীয় ভবানীপুর অঞ্চলে ছোট্ট একখানা বাড়ি ঠিক করে দেবাশিসকে টেলি করে দিলো।

এটোয়ার বাড়ির সঙ্গে কলকাতার বাড়ির তুলনাটা নিতান্তই অনর্থক শোনাবে। সব চেয়ে বড়ো পার্থক্য হচ্ছে আবহাওয়ায়, চারদিকের নিকটতম পরিবেশে। সেখানে দেবাশিসের ছিলো কর্মোদযাপনের বহুব্যস্ততা, আর মনোবীণার ছিলো বহুবিস্তীর্ণ বিশ্রাম। দাঁড়ি-পাল্লা গেছে উলটে, কাজের ঠেলায় মনোবীণা উঠেছে উঁচুতে, আর বিশ্রামের ভারে দেবাশিস গেছে নিচে তলিয়ে।

এতো সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবারো তার কারণ ছিলো না, কিন্তু মনোবীণার গলায় আর গান নেই। তার এই আকস্মিক নিরুচ্চারতায় চারদিক থেকে ক্লান্তিময় অপার শূন্যতা উথলে উঠেছে। তার গীতহারা কণ্ঠ যেন মৃত্যুর নির্বাক-গম্ভীর নিষ্ঠুর এক সঙ্কেত।

থেকে-থেকে সেই ব্যথা শত-লক্ষ ফণা ফুলিয়ে পেটের মধ্যে ছোবল মারতে থাকে, যন্ত্রণায় অন্ধ, অন্ধকার চোখে দেবাশিস তার সেই পরিচিতা মনোবীণাকে যেন আর দেখতে পায় না। মনোবীণা অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় কখনো মাথায় পাখা করে, হট-ওয়াটার ব্যাগ এনে ফোমেণ্ট করতে চায় কখনো, কখনো-বা কী

করবে বুঝতে না পেরে তার গায়ের ওপর দুর্বল হাত বুলায়। দেবাশিস চেয়ে দেখে মনোবীণার অবাধ্য দুই চোখে জল নেমেছে। সেই অশ্রু-আবিল মুখের চেহারা তার মনে হয় কুৎসিত—এই পারিপার্শ্বিকতার মতোই অপরিচ্ছন্ন। সে মুখের প্রতিটি রেখা বেদনায় রুক্ষ, কঠিন—তাতে আর সেই গীতস্ফূর্তির তরল পেলবতা নেই, নেই সেই কোমলতার আভা। সে-মুখ যেন একটা কলঙ্কপিণ্ড।

দেবাশিসের স্পষ্ট মনে হয় এ-মনোবীণাকে সে ভালোবাসে নি। তার গলায় গানই যদি ফুরিয়ে গেলো, তবে আর তার অস্তিত্ব ব্যক্ত রইলো কোথায়? সে তো এখন একটা নিঃশব্দতার মৃতস্তূপ। শোকান্ধকারের কালিমায় তার বর্ণ, সেখানে আর নেই সেই প্রাণের শাণিত বিদ্যুৎ-দীপ্তি। সে যেন এখন তার সেই উদ্দাম প্রথম প্রেমের মুমূর্ষু দীপশিখা!

যন্ত্রণার মধ্যেই দেবাশিস চেঁচিয়ে ওঠে: গান, একটা গান গাও, মনো। আমি মরি তো মরি, কিন্তু তুমি বাঁচো। তুমি বাঁচো। আমারই মতন তুমি গলা খুলে দাও, গান গেয়ে ওঠো।

তার আর-আর কাতর প্রলাপোক্তিরই একটা মনে করে মনোবীণা বিছানার ধারে চুপ করে বসে থাকে। ডাক্তারের কথা মতো ওষুধ ঢেলে দেয়, ফলের খোসা ছাড়াতে বসে। আবার সংসারের অন্য কোন কাজে উঠে যায়।

ব্যথাটা খানিক জুড়িয়ে এলে নিজের রোগজীর্ণ ব্যথা-বিক্ষত দেহটার দিকে দেবাশিস খানিকক্ষণ সস্পৃহচোখে চেয়ে থাকে। কী সে পরের গলায় গান শোনবার জন্যে এমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে, গান ছিলো তার নিজের দেহে, উচ্ছল মাংসপেশীতে, সতেজ রক্তধারায়। সে-গানই সে এতোদিন শোনে নি। প্রাণের সেই মহান, অপূর্ব ব্যঞ্জনা—এখন আর গান নেই, আর্তনাদ। দুই মুঠোয় চুল টেনে ধরে দেবাশিস নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। প্রতি লোমকূপে, প্রতি রক্তকণায় মুহূর্তে-মুহূর্তে যে সঙ্গীতসুর অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিলো তাই সে উপেক্ষা করে এসেছে। সে মাত্র স্বরের সুরা নয়, রক্তের কল্লোলফেনা। সে গান সে দেহের অঞ্জলিপুটে প্রাণ ভরে পান করতে পারলো না।

শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে সে পথের লোকজন দেখে। দেখে মনে হয় তারা যে বেঁচে আছে, তাদের দেহে যে রয়েছে প্রাণধারণের অপরিমিত ছন্দ—এই কথাই তাদের মনে নেই। দেহের দুয়ারে কান পেতে তারা এই রক্তের গান শুনতে পাচ্ছে না। অথচ গানের তৃষ্ণায় আর্ত, পীড়িত হয়ে তারা এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করছে। নিজের শারীরিক অস্তিত্বের মাঝেই যে তাদের আত্মার পরিপূর্ণতা, এ-কথা তাদের কে শোনাবে?

ছিপির সঙ্গে শক্ত করে আঁটা প্যাচালো কর্ক-স্ক্রুর মতো ব্যথাটা আবার পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো। থাক্-থাক্ করে দেবাশিস উঠলো চীৎকার ক'রে। হাতের কাজ ফেলে মনোবীণা ছুটে এলো, শক্ত ক'রে স্বামীকে আঁকড়ে ধরলো, মৃত্যুর মহাশূন্যে মনে-মনে যেন তাকে মাটির আশ্রয় দিলে। দেবাশিসের চোখ এসে পড়লো তার মুখের ওপর—শোকপাণ্ডুর অশ্রু-আচ্ছন্ন মনোবীণার এই মুখ কী ভয়ানক কুৎসিত হয়ে গেছে! যা-কিছুকে রোগ স্পর্শ করলো তাই দেবাশিসের মনে হয় কুৎসিত। মনোবীণার মুখেও এই রোগের পঙ্কিলতা—এই তার গানহারা ম্লান মুখ, এই তার উদাসীন নিষ্প্রভ দৃষ্টি! মনোবীণাকে সম্পূর্ণ আবৃত ক'রে অস্বাস্থ্যকর একটা ছায়া যেন সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু দেবাশিস এই দুঃসহ যন্ত্রণাতেও সেই বিরাট সৌধ-মণ্ডলের গীতনৃত্য শুনতে ও দেখতে পাচ্ছে। গ্রহ নক্ষত্রের ঐক্যতানে বেজে উঠেছে মৃত্যুর অর্কেষ্ট্রা। অজানা জগতের বিপুল উদ্বোধনী। মনোবীণা কেন তাকে এখানে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়? এখানে গান নেই, ছন্দোচ্ছ্বাস নেই, নৃত্য-তরঙ্গিমা নেই—এখানে শুধু অস্বাস্থ্যকর অসম্পূর্ণতা,—তিলে-তিলে দেহের গোপন অপচয়।

হঠাৎ মনোবীণার দুই নোয়ানো বাহু সজোরে ঠেলে ফেলে দেবাশিস চেঁচিয়ে ওঠে: তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও, দূর হয়ে যাও। আমাকে তুমি ছুঁয়ো না, খবরদার, কাছে এসো না কক্খনো? তোমাকে আমি চাই না, তোমাকে আমি কোনোদিন চাইনি।

প্রবল আঘাতে মনোবীণা দূরে ছিটকে পড়ে। ব্যথায় বিবর্ণ মুখ ক'রে এক পাশে আলগোছে সে সরে বসে। ওষুধ খাবার সময় হয়েছে কি না দেখবার জন্যে টেবলের ঘড়ির দিকে তাকায়। কতোক্ষণ বাদে ব্যথাটা ফের উঠলো, চাটে পেন্সিল দিয়ে টুকে রাখে। অপারেশান সইবার জন্যে কবে তার শরীর শিগগির মজবুত হয়ে উঠবে তারই কথা ভেবে সে বেদনার দানা চিপে রস করতে বসে।

তীব্র, তপ্ত যন্ত্রণায় শূলবিদ্ধ সাপের মতো পাক খেতে খেতে দেবাশিস ফের চীৎকার ক'রে ওঠে: না, না, তোমাকে চাইনি কোনোদিন, কোনোদিন না। তোমাকে আমি ভালোবাসি—মিথ্যা কথা। আমি মরবো, তুমি আমার চোখের সমুখ থেকে দূর হয়ে যাও বলে তার মুখের কাছে তুলে ধরা ওষুধের গ্লাসটা সে হাতের ধাক্কায় মেঝের ওপর ছুঁড়ে মারে। আরেকটা শিশি তুলে সে উঁচিয়ে ওঠে: শিগগির পালাও এখান থেকে বলছি, নইলে তোমার মাথা তাক্ ক'রে—

যন্ত্রণায় আরেকটা মোচড় উঠতেই শিশিটা হাত থেকে মেঝের ওপর খসে পড়ে। দেয়ালের দিকে পিঠ ক'রে মনোবীণা চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অনুচ্চার্য্য নিবিড় ব্যথায় তার সারা দেহ তখন কাঁপছে।

তারপর দেবাশিসের ব্যথাটা আবার জুড়িয়ে আসে। হাতের ইসারায় মনোবীণাকে কাছে ডেকে কোলের কাছে বসতে দেয়। কতোক্ষণ কোনো কথা কইতে পারে না। টোষ্টের মতো মৃদু-মৃদু গরম মনোবীণার ডান হাতখানি দিয়ে সে মুখ চেপে ধরে। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে ক্লান্ত, ব্যথিত স্বরে সে বলে: মনো, একটা গান গাইবে?

আট বৎসর

রাত্রের ট্রেনটায় বিশেষ ভিড় নাই দেখিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলাম। হাত-পা ছড়াইয়া ঘুমাইয়া নিতে পারিব। কামরাটা একদম ফাঁকা।

শীত পড়িয়া গিয়াছে। বেঞ্চির ধারের জানলা তিনটা তুলিয়া ধরিয়া মোটা কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

গড়াইয়া গড়াইয়া গাড়ি কখন বহরমপুরে আসিয়া থামিয়াছে খেয়াল করি নাই। সমস্তটা রাস্তা যেন এক নিশ্বাসে ফুরাইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দরজার সামনে কাহার পুরুষ কণ্ঠের চীৎকারে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম।

এই যে এই গাড়ি। চলতেও যে সাত মাইল পিছিয়ে থাকে। ওরে রামহরি, লণ্ঠনটা একবার ধর এদিকে। দেখে চলতে শেখোনি? হোঁচট খেয়ে পড়ছ যে হুমড়ি খেয়ে? বাপের জন্মে কোনো-কালে ট্রেনে চাপো নি বুঝি? চোখ দুটোই বা আছে কী করতে? লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দিলেই হয়!

বলিতে বলিতে একটি মোটা-সোটা জোয়ান ভদ্রলোক কামরার ভিতর উঠিয়া আসিলেন। গায়ে কালো সার্জের গলা-বন্ধ কোট, গলায় পুরু করিয়া উলের কম্ফার্টার জড়ানো, মাথায় কান-ঢাকা মাঙ্কি-ক্যাপ। সঙ্গে স্ত্রীলোক আছে আভাস না পাইলে রীতিমতো ভয় পাইতে হইত। উপরে উঠিয়া কুলির মাথা থেকে মোটঘাটগুলি নামাইতেছেন—কী বিশাল থাবা, কী চওড়া কব্জি! ট্রাঙ্ক একটা আমার মাথার উপরকার বাঙ্কে তুলিয়া দিতে দিতে ভদ্রলোক বলিলেন: একেবারে ষ্টেশনের দিকের জানলাগুলো তুলে দিব্যি যে ঘুম মারছেন মশাই, গাড়ি ফাঁকা কি ভর্তি লোকে বাইরে থেকে টের পায় কী ক'রে? খাসা আরামেই

আছেন যা হোক। বলিয়াই দরজার ধারে গিয়া হাঁক পাড়িলেন; এসো, মাল-পত্তরের মধ্যে তুমিই শুধু বাকি আছো দেখছি। উঠে পড়ো চট্ ক'রে। গাড়ি কি তোমার বাবার টাট্টুঘোড়া নাকি যে চলতে বললে চলবে, থামতে বললে থামবে। দিক্ করবার আর জায়গা পাওনি। বলিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া নীচে হইতে যাহাকে তিনি টানিয়া তুলিলেন তাহার দ্রুত আবির্ভাবের ঔজ্জ্বল্যে অকস্মাৎ ত্রস্ত, চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। উপমা দিলে কথাটা হয়তো নিতান্ত অবাস্তব ঠেকিবে, কিন্তু মনে হইল জুঁইফুলি জ্যোৎস্নায় অন্ধকার যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মেয়েটিকে অন্য দিকের বেঞ্চিটার দিকে ঠেলিয়া দিয়া ভদ্রলোক নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: ঝক্মারি। সখ ক'রে কেউ আবার এ-ঝক্কি মাথা পেতে নেয়। ইডিয়ট্ কোথাকার!

গাড়ি বহরমপুরে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না, আবার টিমাইয়া-টিমাইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গাড়ির শব্দ ছাপাইয়া ভদ্রলোকের গালিবর্ষণও বিরাম মানিতেছে না। আমার দিকের জানলা তিনটা সশব্দে ফেলিয়া দিয়া গলাবন্ধটা একটু আলগা করিয়া আমারই পায়ের দিকে তিনি বসিলেন। পা দুইটা গুটাইয়া নিয়া বিরক্ত হইয়া কহিলাম,—এ কী মশাই, ঠাণ্ডায় মারা যাবো যে!

জানলা দিয়া মাথাটা বাহিরে গলাইয়া দিয়া ভদ্রলোক কহিলেন,—রাখুন মশাই, দাঁড়ান। আমার বলে মাথা গেলো ফেটে, সারা গায়ে কালঘাম বেরচ্ছে —আর আমি এখন অন্ধকূপে মারা যাই আর-কি। দিব্যি একলা যাচ্ছেন কি না, তাই এতো আয়েস—বৌ নিয়ে তো আর পথে বেরুতে হয় না, ঠেলা বুঝবেন কী ক'রে?

বলিয়াই তিনি মুখ ভিতরে আনিয়া অপরপ্রান্তে স্ত্রীলোকটির নীরব উদাসীন মূর্তিকে উদ্দেশ করিয়া বিকৃত স্বরে কহিলেন,—কী গো, হাত-পা গুটিয়ে বসে রইলে যে, বিছানাটা পেতে ফ্যাল, বড্ড যে ঘুম হল না বলে তখন তড়পাচ্ছিলে।

স্ত্রীলোকটি তেমনি নিশ্চল ভঙ্গিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভদ্রলোক হঠাৎ আমাকেই বিচারক মানিয়া বসিলেন: দেখলেন, দেখলেন মশাই। কথা বললে কথা শোনে না—এ সব অবাধ্য স্ত্রীকে কী করতে ইচ্ছে হয়? জানলা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয় কি না বলুন। হাসছেন কী মশাই? বিয়ে করেছেন?

হাসিয়া বলিলাম,—না।

মুখভঙ্গি করিয়া ভদ্রলোক কহিলেন,—না! তবে ঠাট্টা করেন কোন মুখে? নতুন জুতো পায়ে না দিলে কী ক'রে বুঝবেন ফোস্কা পড়বার জ্বালা কী! তারপর

হঠাৎ আবার মেয়েটির দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন: কী, কথাটা কানে গেলো না? কানটাও অসাড় হলো নাকি এতোদিনে? খুব যে কবিয়ানা করে বসে রইলে? ঠাণ্ডা লেগে টন্‌সিল ফুললে কে তখন গলায় বেলেস্তারা লাগবে?

মেয়েটি তেমনি নির্বিকার হইয়াই বসিয়া রহিল। ভদ্রলোক মুখ-চোখের ভঙ্গি কুটিলতর করিয়া জায়গা হইতে উঠিয়া পড়িতেছিলেন, কী একটা অনর্থক বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে বাধা দিলাম। কহিলাম,—বসুন, ওঁর হয়তো এখন ঘুম পাচ্ছে না। হাওয়ায় মাথাটা কিছু ততোক্ষণ আপনি ঠাণ্ডা ক'রে নিন।

—ঘুম পাচ্ছে না কী মশাই? ভদ্রলোক শেষকালে আমারই উপর খাপ্পা হইয়া উঠিলেন: ঘুম ছাড়া আর ওরা ত্রিভুবনে জানে কী! ঘুম পাচ্ছে না, না হাতী! সব বদমায়েসি মশাই। ষ্টেশনে আসবার আগে কেন ঘুম ভাঙিয়ে তুলে আনলাম তাই রাগে উনি অমনি ফ্যাসান করছেন। একলা বিছানায় ফেলে এলেই যেন ওর মোক্ষ মিলতো! মায়া ক'রে সঙ্গে নিয়ে এলুম কি না তাই এই প্রতিশোধ। বুঝলেন মশাই, এদের মতো ছ্যাচ্‌ড়া প্রতিশোধ নিতে আর কাউকে কোনদিন দেখলুম না—সোজাসুজি কিছু করতে পারবে না, হিম লাগিয়ে না-খেয়ে অবেলায় চান্ ক'রে যতো রাজ্যের অসুখ ক'রে ডাক্তারের পিছে গুচ্ছের আপনার পয়সা খসিয়ে তবে ওরা ঠাণ্ডা হবে। আট বচ্ছর ধরে বিয়ে হয়েছে মশাই, কিন্তু হাড় ক'খানা ভাজা-ভাজা ঝর্‌ঝরে ক'রে ছাড়লো। গলার কাঁটা নেমেও যায় না, উঠেও আসে না—কি-জানি বলে সেই ত্রিশঙ্কুর অবস্থা।

গ্যাসের এক টুকরা নরম আলো মেয়েটির মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় ব্যক্তির সন্নিধানে অশোভন সন্ত্রাসে মেয়েটি মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া দেয় নাই। ছোট্ট কপালটির উপর দুই একগাছি চূর্ণ কুন্তল হাওয়ায় অন্ধকারের ক্ষীণ শিখার মতো কাঁপিতেছে দেখিলাম। বসিবার ভঙ্গিটি ভারি কোমল, দুইটি চোখে ও চিবুকে করুণ একটি ঔদাস্য। সব মিলিয়া মেয়েটিকে ভারি স্নিগ্ধ ও সুন্দর লাগিল। গভীর একটি স্তব্ধতা সর্বাঙ্গে তাহার একটি অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছে। বিবাহের দীর্ঘ আট বৎসর অতিবাহিত করিয়াও মেয়েটি তাহার দেহের একটি ললিত রেখাও হারাইয়া ফেলে নাই, এই রূঢ়ভাষী, বর্বরভাবাপন্ন স্বামী-সান্নিধ্যে আসিয়াও তাহার চরিত্রের দীপ্তিটি যেন আজো তাহার মুখমণ্ডলে অম্লান রহিয়াছে। আমিও অন্তরের নিবিড় মৌনে তাহাকে সহানুভূতি জানাইতে লাগিলাম।

কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা

করিয়াছেন। তিনি আমার গা ঘেঁসিয়া আসিলেন; কহিলেন,—আট বচ্ছরের একটা মিনিটও নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলতে দিলো না মশাই। অবাধ্যের একশেষ। যেমন মুখের ছিরি, তেমনি স্বভাব। আমাকে তো চেনে নি এখনো? ভেবেছে লেজুড় সঙ্গে ক'রেই আমাকে ত্রিভুবন চষে ফিরতে হবে। হিন্দু আইন মশাই, ইচ্ছে করলেই জুতোর সুখতলার মতো ছুঁড়ে ফেলতে পারি, করুক না মামলা— মাসে পাঁচটি টাকা দিয়েই খালাস। এতো জেনেও তেজ যদি একবার দেখেন। দেখুন, দেখুন, এই ভরা হাড়-কাঁপানে শীত, শালটা গা থেকে খুলে ফেলবার কী হয়েছে! সয়তানির নমুনা দেখুন একবার। বলুন, কী করতে ইচ্ছে হয় এখন?

অসহ্য লাগিতেছিল, নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিলাম,—চুপ করুন। অন্য পুরুষের কাছে স্ত্রীর নিন্দে করতে আপনার লজ্জা করে না?

—সুখ্যাতি করবার আছে কী যে ঢাক পিটিয়ে বেড়াতে হবে? আমি বিশ্বসংসারের কাছে গলা খুলে সত্যি কথা বলবো তাতে কার কী যায় আসে? ভদ্রলোক কথার তোড়ে অনর্গল থুতু ছিটাইতে লাগিলেন: শুনতে ইচ্ছে না করে, পরের ষ্টেশনে নেমে অন্য গাড়িতে চলে যান্ না, কে আপনাকে ধরে রাখছে? আমি তখন একবার ওকে দেখে নেব। ও কিসের জোরে আমাকে এমন অমান্য ক'রে বেড়ায়? এতো বড়ো সংসারে আমি ছাড়া ওর আছে কে?

কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম,—ঘুম না পেলেও ওঁর ঘুমোতে হবে নাকি?

—না, তাই বলে রাত জেগে অসুখ করবে? তখন তো এই শৰ্ম্মা ছাড়া আর কেউই আসবে না ডাক্তারের পয়সা জোগাতে। এই যে কাশিমবাজার এসে গেলো, মশাই। যান্, নেমে যান্, পরের স্ত্রীর নিন্দে শুনলে মহাভারত যদি অশুদ্ধ হয় মনে করেন, যান্ না নেমে। মাথার দিব্যি দিয়ে কে আপনাকে এখানে বেঁধে রাখছে?

হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। গাড়ি আবার চলিতে লাগিল। ভদ্রলোক মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন,—পরের স্ত্রীর জন্যে খুব যে দরদ দেখছি আপনার। আমার চেয়ে আপনারই দেখছি অঢেল মায়া। ঘর করতে হয় না কি না, তাই মনে-মনে দিব্যি কবিয়ানা খেলছে। দিব্যি চাঁদপানা মুখখানা দেখেছেন আর দয়ার সাগর একেবারে উথ্‌লে উঠেছে। বলিয়া ভদ্রলোক বিকট, ক্ষিপ্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

নিদারুণ লজ্জায় সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হইয়া গেল। কী কুক্ষণে সহানুভূতির ঐ কথাটা মুখ দিয়া বেফাঁস বাহির হইয়া পড়িয়াছিল ভাবিয়া পাইলাম না। ভদ্রলোকের নির্লজ্জ কটুভাষণে পীড়িত বোধ করিয়া থাকিলে অন্যত্র চলিয়া গেলেই

তো হইত। মাল-পত্রের বিশেষ কিছুই তো হাঙ্গামা ছিল না। কিন্তু অন্ত কামরায় গিয়া উঠিলে পাছে এই অবাঙ্মুখী অপরাধিনী মেয়েটির প্রতি স্বামীত্বের নিষ্ঠুর অধিকারে ভদ্রবেশী এই বর্বরটা কিছু অত্যাচার করিয়া বসে, তাহাই ভাবিয়া হয়তো সেই বেঞ্চিতেই অনড় হইয়া বসিয়াছিলাম। কিন্তু অত্যাচারটা শেষকালে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এমন বিসদৃশ হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিতে পারি নাই।

হাসি থামাইয়া ভদ্রলোক কহিলেন,—নিন্ না, দু'দিন ঘর ক'রে দেখুন না—আমি তো তা হলে বাঁচি।

রাগ করিয়া বলিলাম,—কী বলছেন যা-তা? উনি আপনার বিবাহিতা স্ত্রী নন্?

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন,—একশো বার। তাই তো আমার চেয়ে আপনার বেশি মায়া।

—তাই বলে ভদ্রমহিলাকে আপনি আরেকজনের সামনে অকারণে যা-তা অপমান করবেন?

—কারণ অকারণের আপনি কি জানেন শুনি? তাই তো বলছিলাম, নিয়ে দেখুন না দু'দিন ঘর ক'রে।

এই লোকটি ঐ মেয়েটির স্বামী না হইলে তখন যে কি করিয়া বসিতাম ঠিক নাই, কিন্তু কাহার দুইটি চক্ষু যেন সানুনয় নীরবতায় আমাকে নিরস্ত করিল। হাতজোড় করিয়া কহিলাম,—যা খুসি আপনি বলে যান আমাকে আর এর মধ্যে টানবেন না। ঘাট হয়েছে, মাপ চাইছি—আমাকে এবার একটু ঘুমোতে দিন দয়া ক'রে।

সেই ঘুমাইয়া লইবার ফাঁকে মেয়েটির দিকে আরেকবার তাকাইলাম। স্তব্ধতার পাষাণে উৎকীর্ণ একটি প্রশান্ত মুখ—তাহাতে কোথাও একটি অসহিষ্ণু রেখা নাই। তেমনি জানালার বাহিরে পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। এই নির্লজ্জ অপমানের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদের ভঙ্গি সেইখানে দেখিলাম না, চুপ করিয়া সব সে নির্বিবাদে সহ্য করিল। অথচ তাহার মুখশ্রীতে কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন একটা তেজ ছিল, সর্বাঙ্গে তাহারই আভা যেন লাবণ্য বিস্তার করিয়া আছে। কী যে তাহার অপরাধ, কেন যে সে গত আট বৎসরে তাহার স্বামীকে জর্জ্জর করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কণামাত্র কারণ আবিষ্কার করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল! বসুন্ধরার মতো এমন যাহার অবিচলিত সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা সে কেমন করিয়া তাহার স্বামীকে এতোটা অমানুষ করিয়া তুলিতে পারে? মুখের মুকুরে যাহার চরিত্রের দীপ্তি এতো সহজে প্রতিফলিত হইতেছে—সে কি না এই

বন্য পুরুষটার কাছে এমন নিঃস্ব ও নিরুত্তর হইয়া বসিয়া আছে? তাহাকেই কি না সে পুরুষ ত্যাগ করিবার ভয় দেখায়?

ভদ্রলোকের অসীম উৎসাহ! তিনি তখনো বলিয়া চলিয়াছেন: আমার পাঁঠা, ল্যাজের দিকে কোপ বসালে-কার কি খেতি হচ্ছে? গায়ে পড়ে মায়া দেখাতে এসেছেন। ইষ্টুপিড্ ই-স্ত্রীর ওপর আবার মায়া। চলো না একবার। তোমার সুন্দর মুখের জাদু এবার বার করবো। বলিয়া বলা-কহা নাই ভদ্রলোক আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

* *

লালগোলায় ষ্টিমার তৈরি। তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলাম।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ডেকে দাঁড়াইয়া চা খাইতেছি। মেয়েটি তাহার স্বামী-সমভিব্যাহারে কখন আসিয়া ষ্টিমারে চাপিল বা আদৌ চাপিল কি না কিছুই কোনদিকে খেয়াল করি নাই। কেবল কুজ্ঝটিকা-ধূসর স্তিমিত নদীর দিকে চাহিয়া সেই মৌনময়ী মেয়েটির বিধুর মুখচ্ছায়া মনে পড়িতে লাগিল।

আকাশটা সেই তরুণীর সিঁথির মত লালচে হইয়া উঠিয়াছে, ষ্টিমারের শিকলে টান পড়িল। ঘুরিয়া চাহিয়া দেখি সেই মেয়েটি অস্থিরভাবে এদিক ওদিক তাকাইতেছে। ব্যাপারটা চট করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। বেশবাস কেমন বিপর্য্যস্ত, চাউনিতে কেমন একটা অসহায় আতঙ্কের ছায়া। আমার সঙ্গে হঠাৎ চোখোচোখি হইতেই সে তাড়াতাড়ি হাতছানি দিয়া আমাকে ডাকিয়া উঠিল।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। মেয়েটি না-জানি কোন ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে!···কিন্তু উহাদের মধ্যে গিয়া আমি আটকাইয়া পড়ি কেন? ধারে-কাছে মেয়েটির স্বামীকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। আমার কাছে কি-যেন তাহার একটা প্রবল বক্তব্য আছে এমনিভাবে ব্যাকুল ভঙ্গি করিয়া সে আবার আমাকে ডাকিল। তবুও ইতস্তত করিতেছিলাম, কিন্তু মেয়েটিই দেখি আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

তাহার সেই শূন্য নিরবলম্ব দৃষ্টি দেখিয়া গভীর সহানুভূতিতে তাহার স্বেচ্ছাচারী স্বামীর সকল সতর্ক-বাণী বিস্মৃত হইলাম। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কী হয়েছে?

মেয়েটি কিছুই কহিল না, সেইখানে বসিয়া পড়িয়া নীরবে কাঁদিতে সুরু করিল।

অসহিষ্ণু হইয়া কহিলাম,—কাঁদছেন কেন? আপনার স্বামী কোথায়?

মেয়েটি তবুও মুখ খুলিল না, অশ্রুম্লান গভীর দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কহিলাম,—বলুন কী হয়েছে। কিছু না বললে আমি প্রতিবিধান করি কী ক'রে?

তবুও মেয়েটির কথা নাই। ও বোবা নাকি? ডাকিয়া আনিতে পারে, শুধু অভিযোগ জানাইতেই তাহার যত বাধা।

চলিয়া যাইবার ভঙ্গি করিয়া বলিলাম,—এ-অবস্থায় আপনার স্বামী আপনাকে দেখে ফেললে আর আস্ত রাখবেন না। আমি যাই। তিনি থাকতে আপনার ভাবনা কী!

মেয়েটি গলার মধ্য হইতে কেমন একটা শব্দ করিয়া উঠিল। থামিলাম। মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধস্বরে কী যে বলিল স্পষ্ট বুঝিলাম না। এইটুকু শুধু মনে হইল যে সে তাহার স্বামীকে উপরে-নীচে কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে।

বলিলাম,—স্পষ্ট ক'রে বলুন। ভালো ক'রে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। আপনার স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছেন না? শালটা মুখ থেকে সরিয়ে নিন দয়া ক'রে।

আঁচল সরাইয়া মেয়েটি কহিল,—না।

—কোথায় গেছেন?

মেয়েটি অতি কষ্টে তোতলাইয়া কহিল,—জ্‌—জানি না।

—জানেন না মানে? কা'র সঙ্গে ষ্টিমারে এসে উঠলেন?

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে চটপট উত্তর দিবার তাহার নাম নাই। আঁচলে মুখ ঢাকিয়া আবার সে কাঁদিতে বসিল।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম,—সব কথা স্পষ্ট ক'রে না বললে আমি বুঝি কী ক'রে? উনিই আপনাকে ষ্টিমারে পৌঁছে দিয়েছেন তো?

মুখ তুলিয়া মেয়েটি কহিল,—হ্যাঁ।

—আর খুঁজে পাচ্ছেন না?

—না।

—দাঁড়ান, আমি দেখে আসি।

তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ষ্টিমারে সেই বিরাট বপুমানকে দেখিতে পাইলাম না। ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম,—পেলাম না কোথাও। ষ্টিমার থেকে নেমে গেছেন বলে মনে হয়?

মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বলিলাম,—বলুন। ষ্টিমার থেকে নেমে যেতে দেখেছেন ?

মেয়েটি গোঁজ হইয়া উত্তর দিল: না।

—নিশ্চয়ই গেছেন। নইলে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? ঝগড়া করেছিলেন ওঁর সঙ্গে ?

মেয়েটি চুপ করিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—কেন আপনাকে ফেলে গেলেন ? বলুন, আমাকে লুকোবেন না।

ঠোঁট-মুখ বাঁকাইয়া অতি কষ্টে তোৎলাইতে-তোৎলাইতে মেয়েটি আবার কহিল,—জ্-জ্-জ্—জানি না।

মুখ দিয়া সঙ্গে-সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল: জানেন না! সঙ্গে আর কেউ আছে ?

মেয়েটি আবার আমার দিকে গাঢ় চোখে তাকাইল কহিল,—না।

বলিলাম,—যাচ্ছিলেন কোথায় ? সব কথার উত্তর না দিলে চলবে কেন ? কোথায় যাচ্ছিলেন ?

এই প্রশ্নের একটা নির্দিষ্ট উত্তর আবশ্যক। হাঁ, না বলিয়া এই প্রশ্নকে এড়াইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু বুঝিলাম কথাটার উত্তর দিতে মেয়েটির নিদারুণ পরিশ্রম হইতেছে। কথাটা ঠোঁটের মধ্যে আটকাইয়া রহিয়াছে, কিছুতেই স্খলিত হইয়া পড়িতেছে না। উচ্চারণের পরিশ্রমে সমস্ত মুখ বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে, তবুও কথাটা নির্গত না-হওয়া পর্য্যন্ত মেয়েটি যেন শান্তি পাইবে না। হঠাৎ সে হাল ছাড়িয়া দিয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বলিলাম,—কাগজ-কলম এনে দিচ্ছি, জায়গার নামটা লিখে দিন। কিন্তু লিখে-লিখেই বা কয়টা প্রশ্নের উত্তর দেয়া চলবে ?

মেয়েটি আবার অস্থির হইয়া উঠিল। ঠোঁট-মুখ বিকৃত করিয়া, ডেকের উপর দুই হাতের কঠিন ভর রাখিয়া, কান দুইটা রাঙা করিয়া অবশেষে অনেক কষ্টে সে বলিয়া ফেলিল: ফ্-ফ্-ফ্—ফরবেস-গ্-গ্-গ্—গঞ্জ।

সামান্য একটা কথা আওড়াইয়াই মেয়েটি হাঁপাইতে লাগিল। সমস্ত মুখ তাহার কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে।

'লিডিং কোশ্চেনই' করিব ঠিক করিলাম। বলিলাম,—সেখানে আপনার কোনো আত্মীয় আছে ?

—না।

—তবে সেখানে যাচ্ছিলেন কেন ? বেড়াতে ?

—না। মেয়েটির সাহস এইবার বাড়িয়া গিয়াছে। বলিল,—ওঁর সেখানে একটা চ্-চ্-চ্ চ্—কথাটা আর সে শেষ করিতে পারিল না।

বলিলাম,—চালের আড়ৎ আছে?

—না। আবার সে দাঁতের তলায় ভারি জিভ ঠেকাইয়া চোখ বুজিয়া বলিতে চেষ্টা করিল,—চ্-চ্-চ্-চ্-চ—

বলিলাম,—চুরির তদন্ত করতে যাচ্ছেন? চাকরি হয়েছে ওখানে?

মেয়েটির মুখ দিয়া টুপ করিয়া বাহির হইয়া আসিল: চাকরি হয়েছে। প-প--প—পরশু তা-তা-র জ-জ-জ-জ—আবার সে থামিয়া পড়িল।

তাহার মুখের দিকে আর তাকানো যায় না। এমন মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে ভয় করে।

বলিলাম,—বুঝেছি, পরশু তাঁর জয়েনিং ডেইট্। কিন্তু তিনি না থাকলে সেখানে আপনি কী ক'রে যাবেন? ওঁর দেখা না পেলে কী করবেন ভাবছেন তবে?

মেয়েটি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। চুপ করিয়া কাঁদা ছাড়া তাহার আর কোনো উপায় নাই বলিয়াই মনে হইল।

মহা মুস্কিলেই পড়া গেল দেখিতেছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গোদাগারি আসিয়া পড়িয়াছে। এই নিরভিভাবিকা মেয়েটিকে নিয়া আমি কী করি?

আমার তো ভারি বহিয়া গেছে। আমিও এক্ফাঁকে আলগোছে সরিয়া পড়িব। বেশিক্ষণ কাছে থাকিলে কখন খিল খিল করিয়া অসভ্যের মত হাসিয়া উঠিব ঠিক নাই।

সরিয়া পড়িতেছিলাম, মেয়েটি প্রাণপণ শক্তিতে বলিতে লাগিল,—আমাকে ফে-ফে-ফে-ফেলে কো-কো-কো—

—কোথাও যাচ্ছি না। আবার একটু ওঁকে খুঁজে দেখি।

দেখিলাম মেয়েটিও আমার পিছু-পিছু আসিতেছে। বলিলাম,—আমার সঙ্গে এসে কী করবেন?

নামিবার সিঁড়ি দিয়াছে। তাহারই উদ্দেশে পা বাড়াইতেছিলাম, মেয়েটি আবার কহিতে চেষ্টা করিল,—আমাকে আপনার সঙ্গে নি-নি-নি নিয়ে চ-চ-চ-চ—সামনের দিকে হাতের ভঙ্গি করিয়া সে অগ্রসর হইবার ইসারা করিল।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম,—কোথায় আপনাকে নিয়ে যাবো? ও-সব নষ্টামি আমার সঙ্গে চলবে না। বলিয়া মেয়েটিকে পিছনে ফেলিয়া ভিড়ের মধ্যে আগাইয়া গেলাম। মেয়েটি যে সেই কুৎসিৎ মুখে কি-একটা উচ্চারণ করিতে গিয়া অবশেষে

আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল তাহা স্পষ্ট আমার কানে গেল। তবুও মেয়েটি হয়তো আমাকেই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

পিছন হইতে আসিয়া কে মেয়েটির হাত চাপিয়া ধরিল। নির্দয় কণ্ঠে কহিল,—কী ঐ লোকটার কাছে তুমি আশ্রয় চাচ্ছ? আমি আছি না?

চমকাইয়া চাহিয়া দেখিলাম সেই ভদ্রলোক, মেয়েটির স্বামী। কোথা হইতে হঠাৎ ঠিক সময়ে হাজির হইয়াছেন! তাঁহাকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমার দিকে নিষ্ঠুর ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিলেন,—একজন অসহায় ভদ্রমহিলা আশ্রয় চাইতে গেলে তার প্রতি এমনি ব্যবহারই করতে হয়, মশাই? ছি-ছি! আপনি আবার তখন ট্রেনে গায়ে পড়ে এঁকে মায়া দেখাতে এসেছিলেন? শেইম্! শেইম্! বলিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া তিনি দ্রুতপায়ে কাটিহারের ট্রেনের দিকে অগ্রসর হইলেন। মোট মাথায় পেছনে কুলিয়া আসিতেছে। কোনো ব্যবস্থারই তিনি এতটুকু ত্রুটি রাখেন নাই।

মেয়েটি আবার পাষাণে উৎকীর্ণ মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে অম্বর মুখখানি আবার ভারি ভালো লাগিল।

ডাক-নাম

মাইল সাতেক দূরের গাঁ থেকে সকালবেলায়ই কল্ এসে হাজির। পীরপুরের জোতদার সনাতন ঘোষালের ছেলের কাল থেকে রক্তবমি সুরু হয়েছে—ডাক্তার বাবুকে এখুনি সেখানে যেতে হবে। পাল্কি তৈরি করে পাঠিয়েছে—যতো টাকা ভিজিট লাগুক্, সনাতন পেছপা নয়।

খবরটা পেয়ে সত্যব্রত লাফিয়ে উঠলো। তারপর কলমের ডগায় যা এলো ঝট্ পট্ প্রেশক্রপ্শান লিখে হাতের রুগীগুলোকে বিদায় করে, ষ্টেথিস্কোপ্‌টাকে মালার মতো গলায় ঝুলিয়ে পর্দা সরিয়ে সোজা শোবার ঘরে এসে ঢুকলো। বীণার হাতে যখন কাজ থাকে না তখন সে টেবিল গুছোয়, নয় ট্রাঙ্ক থেকে তার শাড়ির স্তূপ বার করে ফের ভাঁজ করতে বসে। ঘর সাজাতে পারলে তার আর কিছু চাইনে।

সত্যব্রত ব্যস্ত হয়ে বল্লে,—একটা জরুরি কল্ পেলাম—এক্ষুনি বেরুতে হবে। সেই পীরপুর—ফিরতে কোন্ না দুপুর বারোটা হবে! প্র্যাকটিস্ প্রায় জমিয়ে ফেলেছি—কী বলো?

বীণা ঠোঁট কুঁচকে বললে,—কিন্তু এদিকে আমি মরছি শুকিয়ে। আমার ত' কোন চিকিৎসাই হচ্ছে না দেখছি—

তাড়াতাড়ি তাকে দুই বাহুর মধ্যে ধরতে যেতেই বীণা পালিয়ে গেল, মুচকে হেসে বললে,—থাক্। কিন্তু এত টাকা করে তুমি কী করবে?

—টাকা লোকে কেন করে?

—আরামের জন্য। সকাল আটটায় বেরিয়ে সাত সাত চোদ্দ মাইল মাঠ যদি চষতে হয় তবে আরাম কোনখানটায়? আর আমি বেচারা জান্‌লা দিয়ে কাঠ-ফাটা রোদ্দুরের দিকে চেয়ে থেকে থেকে চোখ দুটো ক্ষয় করে ফেলি। একটা কেউ কোথাও নেই যে দু' দণ্ড সময় কাটাই—তুমি যেন কী!

বলেই স্বামীর প্রসারিত বাহুর কামনা থেকে সে ফের ছুটে পালায়।

তবু স্বামীকে সে নিশ্চয় আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখতে চায় না। যা তিনি রোজগার করে আনবেন তা ও-ই হাত পেতে নেবে, বাক্সে সাজিয়ে রাখবে, প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করবে—স্বামীর উপার্জনের উপর শুধু অসীম কর্তৃত্ব। অবাধ স্বাধীনতা। গরিব বাপের বাড়িতে একটি পয়সা নিয়েও ও নাড়া-চাড়া করতে পায় নি।

সত্যব্রত পাল্কিতে গিয়ে উঠলো—সঙ্গে ব্যাগভরা ওষুধ, যন্ত্রপাতি। মুখোমুখি বস্‌লো এসে সনাতনের মুহুরি। বেয়ারারা কনুই দুলিয়ে-দুলিয়ে হুম্ হুম্ করতে করতে বেরিয়ে গেলো।

বীণার চোখে জান্‌লার ওপারে নির্জন ফাঁকা মাঠ রৌদ্রে ঝিম্ ঝিম্ করছে। আকাশ ভরে বিরহের সুন্দর শূন্যতা। ডানা মেলে একটা শঙ্খচিল উড়ে চলেছে—তার ওড়ার অশ্রুত শব্দে আকাশের স্তব্ধতা আরো মন্থর হয়ে এলো।

কাজ অবশ্যি তার অনেক—পাশের সাব-রেজিস্ট্রার বাবুর বাড়িতে গেলেই সে কথা কয়ে হাঁপ ছাড়তে পারে। নতুন যে-উপন্যাসটা এখনো তার শেষ হয় নি, সেটাও পড়তে পারে অনায়াসে। চিঠি লিখবার আর লোক নেই—এইটেই মস্ত অসুবিধে। স্বামী যখন প্রথমটায় বিদেশে থাকতেন চাকরির খোঁজে, তখন চিঠি লিখে লিখে নিঃশব্দ দুপুর ও অতন্দ্র রাত্রি সে তার অশ্রুসিক্ত কোমল দৃষ্টির মতো করুণ করে তুলত—দুপুর এখন অতিমাত্রায় রুক্ষ, রাত্রি সর্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ পুরুষ স্পর্শের মতো স্পন্দনময়। সে-লাবণ্যটি আর নেই। তার জন্যে সে সংসার গুটিয়ে বাপের বাড়ির বনবাসে যেতে চায় না।

শ্বশুর-ঠাকুর তাদের সঙ্গে বাড়ির খোদ ঠাকুর ও দুটিয়া চাকর দিয়ে দিয়েছেন। তারা এত বেশি কর্মঠ ও কুশলী যে বীণাকে রাত্রি-দিন শুয়ে থালি দুঃসহ আলস্য

ভোগ করতে হয়। খালি জানলা দিয়ে চেয়ে থাকো—কখন তিনি আসবেন, আর যখন উনি এলেন তখন সব সময় কান খাড়া ক'রে থাকো—কখন আবার রুগীর ডাক আসে! বিকেলে মাঠেও সে একটু স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে পারে না, কোন রুগী নাকি সময় বুঝে আকাশ-অন্তরালের অন্ধকারে বেড়াতে চলেছে! সামনে কোথায় নাকি একটা পাহাড়ে নদী আছে—বীণার চোখের মতো কালো তার জলের রঙ, সাম্পানে ক'রে সেখানেও তার আজ অবধি বেড়ানো হল না।

অগত্যা-বীণা স্নান করতে গেল। বেড়া দিয়ে ঘেরা পুকুরে নেমে সে গায়ের কাপড় খুলে রাজহংসের মত সাঁতার কাটছে। কলমী-লতাটির মত শ্যামল তার গায়ের রঙ, সাবানের মতো নরম আর পাথরের থালার মতো ঠাণ্ডা। জলে সাঁতার কাটতে কাটতে সর্বাঙ্গে তার লীলার বন্যা, মুহূর্তে-মুহূর্তে রেখার ঢেউ।

তারপর—স্নান ত' সে করলো, চুল আঁচড়ে সিঁথিতে সিঁদুর দিলে, মুখে পাউডার ঘষলে, ঘোমটা খসিয়ে পিঠময় চুল ছড়িয়ে সে বসলো এসে স্বামীর বসবার ঘরে। জানলা দুটো বন্ধ ক'রে দিলো—জানলা ছুঁয়েই রাস্তা। সামনের দরজাটা অবশ্যি খোলা—পথের খানিকটা মাত্র আভাস আসে। বসে বসে সে পড়তে লাগলো কালকের রাতের উপন্যাসটা নয়—মোটা ডাক্তারি একটা বই—ছবিগুলিই অবশ্যি বীণার কাছে ইনটারেস্টিং লাগছে।

ঠাকুর জিগগেস ক'রে গেল এখুনি সে খেয়ে নেবে কি না। বেলা আগুনের মতো বেড়ে চলেছে।

ঠাকুরের কথা শোন একবার! বীণা বললে,—তোমরা খেয়ে নাও গে। আমাদের ভাত হাঁড়ির মধ্যে থাক, উনি ফিরলে পরে বেড়ে নেব'খন।

কিন্তু ফিরবার ওঁর নাম নেই।

এত টাকা নিয়ে উনি করবেন কী!, একটিবার কোথাও যে বেড়াতে যাবেন ওকে নিয়ে সেদিকে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। বলেন, রুগী দিতে পারো সেখানে, নিয়ে যাচ্ছি। অন্তত ট্রেন আর হোটেল ভাড়াটাও ত' উঠে আসা চাই। বিনে পয়সার ছুটি নিলে চলবে কেন?

অথচ বীণার এই ক্লান্তিকর দীর্ঘ ছুটির সমাপ্তি নেই।

বারোটা কখন বেজে গেছে! বাইরে তাকান যায় না, চোখে কান্না জড়িয়ে আসে। স্বামীর ফিরতে তবু দেরি হচ্ছে বলে ডাক্তারি ছবিগুলো অতিমাত্রায় অর্থহীন হয়ে ওঠে।

কাগজে ব্লটিংএ টেবিলটা একাকার হয়ে আছে—তাই বরং গুছোনো যাক! এমনি সময় ঠিক চলন্ত একটা মোটরের ব্রেইক-কসার মতো—খুব জোরে ছুটতে

গিয়ে আচমকা থেমে যাবার মতো—একটি যুবক খোলা দরজা দিয়ে ঠিক বীণার টেবিলটার সামনে হুড়মুড় করে পড়লো। পড়েই সে সামলে নিলো। বলা-কহা নেই দরজাটা দিলে সে বন্ধ ক'রে।

মুহূর্তে বীণার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেলো, টুটি চেপে ধরে কে যেন তার গলার স্বর বন্ধ ক'রে দিয়েছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পর্য্যন্ত সে দাঁড়াতে পারলো না। পা দুটোর আর কোনো চেতনা নেই।

যুবকটি তাড়াতাড়ি ফিরে বিনয়-স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ কমনীয় করে আনলে—তারপর হাত তুলে বীণাকে নমস্কার করে বললে—দরজাটা বন্ধ করে দিলাম বলে ভয় পাচ্ছেন? ভীষণ গরম হাওয়া,—ধূলো উড়ছে—বলেন ত' এই খুলে দিচ্ছি।

বলে দরজা খোলবার সামান্যতম চেষ্টাও না করে সে অনায়াসে একটা চেয়ারে পরম আরামে বীণার মুখোমুখি বসলো।

চোখ তুলে পরিপূর্ণ ক'রে বীণা এবার আগন্তুকের দিকে চাইতে পারছে। মাথার চুল রুক্ষ, পরণের কাপড়-জামা ঘামে-ময়লায় অপরিচ্ছন্ন, পায়ের স্যাণ্ডেলের ষ্ট্রাপ একটা ছেঁড়া, এক হাঁটু ধূলো। চেয়ারে বসে কাপড়ের কোঁচায় নির্ব্বিবাদে গলার ও জামা সরিয়ে বুকের খানিকটার ঘাম মুছছে। চওড়া কপালের নীচে দুটো প্রকাণ্ড গর্তের ভেতর থেকে দু'টো আগুনের ঢেলা জ্বলন্ত দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ বিকর্ণ করছে। ঝড়ের মতো এখুনিই যেন সব কেড়ে-কুড়ে দলে-পিষে লণ্ডভণ্ড ক'রে একাকার করে দেবে। তার ঐ দুই চোখে সে এই দুপুরের সমস্ত রোদ জমা করে এনেছে। স্নান ক'রে উঠেও বীণার সর্ব্ব শরীরে ঘাম দিল।

তবু বীণা সাহস সঞ্চয় ক'রে প্রশ্ন করলো—কী চান এখানে?

যুবকটি নির্লিপ্তের মতো হাসলে, ডান হাতটা মুখের কাছে তুলে একটা ভঙ্গি ক'রে বললে,—এক গ্লাশ জল খেতে পারি। রোদে সবটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

এইবার চোখ থেকে ভয়ের কুয়াসা কাটিয়ে বীণা প্রকৃতিস্থের মতো লোকটার দিকে চাইতে পারছে। তারও চোখের দৃষ্টি কেমন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এলো। বীণা তাড়াতাড়ি উৎসুক কণ্ঠে বললে,—তুমি রতন, না?

যুবকটি হেসে তার দক্ষিণ তর্জনীটি মুদ্রিত ওষ্ঠাধরের উপর রেখে একটা ভঙ্গি ক'রে বললে,—চুপ। রতন নই, রাজেন। আর তুমি ত' বীণা—তা আমি আগে থেকেই জানি।

পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,—ছুটে এখানে যখন এলাম, তখন

আমার কেন-জানি আগে থেকেই মনে হয়েছিলো কোনো আত্মীয়ের দেখা পাবো। ভাগ্য ভালো, বীণা, নইলে এ-রোদে কি জল পাবার আশা রাখি ?

পরে ঘরের চারিদিকে দেয়ালে-মেঝেয়, টেবিলে-আলমারিতে, বীণার সারা দেহের উপরে চকিতে চোখ বুলিয়ে রাজেন বললে,—তা তুমি এখানেই আছ,—বিয়ে হয়েছে, বেশ ! স্বামীটি বুঝি ডাক্তার ! কই, জল আনলে না।

বীণা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, আমতা-আমতা ক'রে বললে—তুমি ত' রতন, রাজেন কী বলছ ?

রাজেন শিশুর মতো হেসে উঠলো, বললে—নামেতে কী আসে যায় ! একটা কিছু বলে চিনতে পারলেই ত' হল ! নাই বা কিছু হলাম—তাই বলে কি এক গ্লাশ জল পাবো না তোমার কাছে ?

বীণার তবু স্বস্তি হল না, চেয়ারের পিঠটা ধরে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে শুধোল : তুমি সেই হরকুমার বাবুর ছেলে না? আমাদের বাড়ীর পাশে যিনি থাকতেন, মোক্তার ছিলেন—

—একেবারে বাপের নাম ধরে টানাটানি সুরু করলে যে ! বাপের নাম কি আর মনে আছে নাকি—বাপের নাম কবে ভুলিয়ে ছেড়েছে। বাড়ীর পাশে থাকাথাই বুঝি বড়ো কথা, তোমার পাশে এসে যে বসেছি সেইটে বুঝি কিছু নয় ! বিয়ে করেও তোমার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি দেখছি।

—তবু—বীণা কী যে বলবে কিছু ভেবে পেলে না।

রাজেন বললে,—তোমার স্বামী বাড়ি আছেন নাকি ? তাঁর নামে আমার যেমন ইণ্টারেষ্ট নেই, তেমনি আমার নামেও তাঁর কৌতূহল থাকা উচিত নয়। কী বলো ? তোমার যা ইচ্ছা তাই বলে আমার পরিচয় দিয়ো। যখন চিনতে একবার পেরেছ তখন রতনই হই আর রাজেনই হই, কিছু আসে যায় না। কী নাম—রতন ! আমাকে তুমি হাসিয়ো না বলছি। অনেক দিন হাসবার অভ্যেস নেই, হাসতে গেলে ভেতরটা কেমন যেন ব্যথা করে ওঠে।

দেখতে দেখতে সে-মুখ কেমন ভারি হয়ে উঠলো। মুখের সে-ভাব না-কাটিয়েই রাজেন বললে,—জল দেবে না এক গ্লাশ ?

—আনছি। বীণা ভেতরে চলে গেলো।

কাঁচের গ্লাশে করে, কুঁজোর ঠাণ্ডা জল এনে সে হাত বাড়িয়ে দিলে। বীণার আঙুল ক'টি বাঁচিয়ে রাজেন গ্লাশটা তুলে এক ঢোঁকেই সবটা খেয়ে ফেললে, গলায় হাত বুলিয়ে বললে,—গলাটা একেবারে কাঠ হয়ে ছিলো। কিন্তু বীণা, আমি

এমনি লোভী যে এক-গ্লাশ জল পেয়ে একেবারে এক-পুকুর জল চেয়ে বসছি। তোমাদের এখানে স্নান করতে পাবো?

বীণা এতক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে। বল্‌লে,—পাবে, কিন্তু কোত্থেকে তুমি আসছ আগে বলো।

—আসছি অনেক দূর থেকে। তার আগে দরজাটা খুলি।

—না, না, ভীষণ গরম হাওয়া—ও থাক্ বন্ধ। বলো তোমার এমন দুর্দশা কেন?

হেসে রাজেন বল্‌লে,—দুর্দশা কই? এই জামা কাপড় দেখে বলছ? এ আবার একটা দুর্দশা নাকি? পিপাসায় জল পেলাম, স্নান করতে পাচ্ছি—তুমি বলো কী বীণা? সব বলবো। স্নান করে, খেতে বসে সব বলবো তোমাকে।

একটু থেমে বীণার মুখের দিকে চেয়ে সে বল্‌লে—তোমার স্বামী নিশ্চয়ই বাড়ী নেই। তাঁর ভাতটাই আমি খেতে পারবো, তাকে পরে না হয় রেঁধে দিয়ো।

সামান্য লজ্জিত হয়ে বীণা বললে,—তার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। আমরা কেউ এখনো খাইনি।

—তা হলে আর দেরি করে লাভ নেই। রাজেন উঠে দাঁড়ালো। গল্প করবার সময় পরে ঢের পাওয়া যাবে—কী বলো? খেয়ে-দেয়েই ত এক্ষুনি পালাচ্ছি নে।

অভিভূতের মত বীণা রাজেনের দিকে তাকালো। সহজে সে এখন চোখ তুলে তাকাতে পারছে যা-হোক্। রাজেনের মুখ-চোখের সেই রুক্ষ উগ্র অসহিষ্ণু ভাবটা—যে-ভাবটা তার ক্লিষ্ট মুখের শীর্ণ ক্ষুধিত রেখায় ছুরির ফলার মতো স্পষ্ট হয়ে এসেছিলো—আস্তে-আস্তে কখন জুড়িয়ে এসেছে। এখন তার মুখের দিকে চাইলে চোখ ভয়ে বা ঘৃণায় আহত হয় না, অতি সহজে চাওয়া যাচ্ছে বলে বরং লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে আসে।

রাজেন বল্‌লে, তার আগে দাড়িটা কামিয়ে নিলে হতো। তোমার স্বামীর কামাবার সরঞ্জামগুলো নিয়ে এসো না—হ্যাঁ, জানি. অনেকে অন্যেরটা দিয়ে কামাতে পছন্দ করে না, কিন্তু কী করব বলো, ভিক্ষুকের চাল কাঁড়া না-কাঁড়া ভাববার অধিকার কই।

কথাটা বলেই সে হেসে ফেল্‌লে। বললে,—তোমাকে আমি বিপদে ফেলছি নাকি?—

না, এ আবার বিপদ কিসের! ভেতরের ঘরে এসো—জিনিস পত্র টেবিলের ওপর সব গোছানো আছে।

রাজেন বীণাদের শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হল। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে ঢোঁক গিলে সে বললে,—শোবার তোমাদের এই একখানাই ঘর নাকি? আমাকে তবে কোথায় বিছানা ক'রে দেবে?

আমৃতা-আমৃতা ক'রে বীণা বল্‌লে—ও-পাশে আরেকখানা ঘর আছে। তোমার ভাবনা নেই—আমি চাকরটাকে দিয়ে ততক্ষণে ঘরটা সাফ ক'রে ফেলছি। বলে সে অদৃশ্য হল।

দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড আয়না ঝুলছে—অতি ধীরে, সন্তর্পণে, প্রিয়জনের মৃত মুখ দেখতে এগিয়ে আসার মতো স্তব্ধ পায়ে, রাজেন আয়নার দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো। এখুনি সেখানে তার মুখের ছায়া পড়বে। নিজের মুখ যে তার কেমন তা সে মনেই করতে পারে না। আয়নায় সে মুখ যে তারই নিজের প্রতিবিম্ব এ-সম্বন্ধেও তার বিশ্বাস নেই! এই দুপুর-গরমেও একটা শীতের কাঁপুনি সূক্ষ্ম সূচের ডগার মতো তার মেরুদণ্ড ভেদ ক'রে মাথার মধ্যে উঠে গেল!

না,—এ তারই মুখ বৈ কি, শীতের ঝরা পাতার মতো পাণ্ডুর, বিবর্ণ। সেই বিবর্ণতা গাঢ় হতাশার, মৃত্যুকে যারা ব্যর্থ বলে ভাবে সেই অমানুষিক দুর্বলতার। নিজের জন্য নিজেরই তার ভারি মায়া করতে লাগলো। সে হঠাৎ এমন গম্ভীর ও কমনীয় হয়ে উঠলো কেন? তার মুখ দেখতে এখনো সুকুমার, ঠোঁট দুটি পাৎলা—যে-কথা উচ্চারিত হয় তার পেছনে অর্দ্ধেক থাকে সঙ্কেত, দৃঢ় চোয়ালে দুর্দমনীয় ব্যক্তিত্বের আভাস—যে ব্যক্তিত্ব জোর করে জাহির করতে হয় না, তার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় সে ব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এখনো এই মুখ দেখে মেয়েরা প্রেমে পড়তে পারে। কিন্তু বিষাদের ভাণ করতে গেলেই সে-মুখের দৃঢ়তা ফিকে হয়ে আসবে—এবং কোমলতাই হচ্ছে প্রেমের পরিপন্থী। অথচ, আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ না হয়েই বা তার উপায় কী!

দাড়ি-কামানো সেরে গালে হাত বুলিয়ে রাজেন বল্‌লে,—এখন তেমন মন্দ দেখাচ্ছে না—কী বলো!

বীণা না বলে পারলে না—মন্দ আবার তুমি কবে দেখতে ছিলে!

—এখনো তেমনি সুন্দর আছি নাকি? হবে। বলে রাজেন আয়নায় ফের মুখ দেখলে। কপালের কর্কশ কুটিল রেখা, শীর্ণ গাল, শুকনো ঠোঁট, কোটর থেকে ঠিকরে পড়া জলন্ত চোখ দুটোর ক্ষুধা—কিছুই বীণার চোখে পড়েনি। মেয়েরা কি তলিয়ে কিছু দেখতে পারে? কিন্তু—রাজেন চোখ কচলে আয়নায় আবার তাকালো—অজানতে কখন তার নিজেকেই সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। এখনো সময় যায় নি।

সময় যায় নি! সে বীণার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেলো হাতে তেলের শিশি, সাবান, শঙ্খ, তোয়ালে, কাপড়, গেঞ্জি—এক রাশ জিনিস নিয়ে হাজির। বল্‌লে,—সাঁতার কাটতে জানো ত'? না, তোলা জলে স্নান করবে?

—পুকুরে নামলে যদি ডুবে যাই। অত সহজে মরতে চাই নে।

স্নান সেরে রাজেন একেবারে ভদ্রলোক ব'নে গেল। বীণা হেসে বল্‌লে,—তুমি রতন না হয়েই যাও না।

রাজেন হেসে বল্‌লে,—রতনেই রতন চেনে—কী বল? কিন্তু তোমার স্বামীর এইসব জামা-কাপড় যে আমার গায়ে চাপালে—ভদ্রলোক যদি কিছু মনে করেন? আমাকে কি এ-সবে মানায়? তোমার কি মত?

—আমার মত হচ্ছে এখন খেতে চলো।

খেতে বসে রাজেন বল্‌লে,—তুমিও ও-পাশে আসন পেতে বসে যাও না—

বীণা বল্‌লে,—আমার এখনো খিদে পায়নি, উনি আগে ফিরুন।

—ও! আমার সে-কথা মনেই ছিলো না। আমার মনে হচ্ছিল এ-বাড়িতে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ। বলে বড়-বড় হাঁ ক'রে সে ভাত গিলতে লাগলো।

খেয়ে আঁচিয়ে, পান চিবোতে-চিবোতে তৃপ্ত প্রফুল্ল মুখে রাজেন আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। সত্যিকারের সে কোথায় চাপা পড়ে গেছে—কিম্বা কে জানে এই তার সত্যিকারের চেহারা কি না।

হঠাৎ তার মনে হলো, বহুদিন আগেকার আর-আর দিনের মতো সে দুপুর বেলায় কলেজ করতে যাচ্ছে—সে-সব দিনের কোথাও এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। কলেজ যেতে রাস্তার ধারের দোতলা বাড়ির জানালায় চকিতে যে একটি অপরিচিতা মেয়ে দেখা যেত—বীণা যেন সেই মেয়েটির মতোই বহু দূরের মেয়ে।

পাশের ঘরে বীণা বিছানা করে রেখেছে—শিয়রে টুলের উপর কাঁচের গ্লাশে জল আর রূপোর ডিবেয় পান। সাবানের ফেনার মতো নরম বিছানার মধ্যে ডুবে গিয়ে রাজেন বল্‌লে,—তুমি এখন কী করবে?

অসঙ্কোচে বীণা বল্‌লে,—এই চেয়ারটায় খানিক বসছি—তোমার গল্প শুনি এবার। খুব গরম হচ্ছে কী! একটা পাখা এনে দি।

একটা পাখা নিয়ে এসে গায়ের উপর আস্তে-আস্তে চালাতে চালাতে বীণা রাজেনের গল্প শুনতে বসে।

এবং তখুনিই রোদে তেতে-পুড়ে সত্যব্রত ভেতরের বারান্দায় এসে পড়েছে। ফাঁসির আসামীকে ফাঁসি কাঠে চড়াবার আগে যদি দেখা যায় যে সে ভয়ে আগে থেকেই মরে আছে তখন আবিষ্কর্তার মুখের যে-চেহারা হয় রাজেনের মুখ তেমনি সাদা হয়ে গেলো। আর, দ্বিরুক্তি না করে পাখাটা হাত থেকে ফেলে রেখে বীণা স্বামীর কাছে ছুটে এলো।

সত্যব্রতকে মুখ ফুটে কিছু প্রশ্ন করতে হলো না।

বীণা বল্লে,—ও আমাদের দেশের চেনা—হরকুমার বাবু মোক্তার ছিলেন, তার ছেলে। টেনে-বুনে সম্পর্কও একটা বা'র করা যায়। বাপ ত মোক্তারি ক'রে বিস্তর টাকা জমিয়েছে,—ছেলে নাকি তার একটি পয়সাও ছোঁয় নি, বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সন্ন্যাসী সেজে বেরিয়ে পড়েছে। খিদের জ্বালা আর সইতে না পেরে শেষকালে হঠাৎ এখেনে এসে হাজির। আমি ত' অবাক। প্রথম ত' ভালো ক'রে চিনতেই পারলাম না।

সত্যব্রত নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্যে টাই-কলার খুলতে থাকে।

বীণা তাড়াতাড়ি স্বামীর জুতো-শুদ্ধ্ পা দুটো কোলের কাছে টেনে এনে জুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে হেসে বললে,—সবাই অমনি সন্ন্যেসি সাজে! তুমিও ত' একবার সন্ন্যেসি সাজবে বলেছিলে।

সত্যব্রত নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে,—সাজলেও খিদে মেটাবার জন্যে দুপুর বুঝে গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে ককখনো বিছানায় গড়াগড়ি দিতাম না। স্কাউণ্ড্রেল!

বীণার আঙুল ক'টি অসাড় হয়ে এলো। স্বর নামিয়ে বললে,—ছি! কী বলছ তুমি যা-তা। শুনতে পাবে যে—

যাতে না শোনে দরজাটা গিয়ে বন্ধ করে এসো।

বীণা অপ্রতিভ হ'য়ে বললে,—রোদে মাথা তোমার গরম হয়ে উঠেছে দেখচি।

মুখ ভেঙ্‌চে সত্যব্রত বললে—না, মাথাটি গ'লে বরফ হয়ে যাবে। আমার বাড়িটা কি একটা সন্ন্যেসির ডেরা নাকি? নধর বাবুটি সেজে মোলায়েম বিছানায় শুয়ে খোস মেজাজে হাই তুলবেন!

—তুমি দস্তরমতো অভদ্র হচ্ছ দেখছি। কোথায় এর মধ্যে দোষটা আছে শুনি? বুঝিয়ে দাও আমাকে। একজন পরিচিত দূর সম্পর্কের আত্মীয় ভদ্রলোক যদি অভুক্ত অবস্থায় এসে দু'টি খেতে চায় তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে? মানুষ মেরে-মেরে তুমি না-হয় কসাই হয়েছ, কিন্তু অমন বুনোর মতো আমি কথা বলতে পারি না।

সত্যব্রত একটানে কোটটা খুলে ফেলে বললে,—তবে যাও ও-ঘরে, পাখার হাওয়া করোগে—এখানে এসেছ কেন ?

বীণার মুখের ওপর কে যেন সপাং ক'রে চাবুক মারলে, হঠাৎ তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো।

সত্যব্রতের গলার স্বর খানিকটা নরম হলো, বললে,—কবে যাবে বললে ?

মুখ ঝামটা দিয়ে বীণা বলে উঠলো,—তুমি নিজে গিয়ে জিগগেস করতে পারো না ?

—আবার জিগগেস করতে হবে নাকি ? সোজা ঘাড় ধরে বাড়ির বার করে দেব। এবং তা এখুনিই। বলে সত্যব্রত রাজেনের ঘরের দিকে অগ্রসর হলো।

প্রাণপণে চোখ বুজে, সুধাভাস ধ্যানলীন বুদ্ধের মুখের মতো সৌম্য প্রশান্ত ক'রে রাজেন তার সমস্ত চেতনা স্তিমিত করে আনলে।

পেছন থেকে বাধা দিয়ে বীণা বললে,—ছি, এখন বলবে কী ! এখন একটু-খানি উনি ঘুমুচ্ছেন—কত দিন নাকি চোখে এক ফোঁটা ঘুম আসে নি। বিকেলে বরং বলো। এটুকু সময় আর সবুর করতে পারো না ?

সত্যব্রত থমকে দাঁড়ালো। চাপা ক্রুর কণ্ঠে শুধু বললে,—হুঁ !

বিকেলে মেহেরখালি থেকে এক কল এসে হাজির—কিন্তু ঐ অভ্যাগতকে তাড়িয়ে তবে সত্যব্রতর অন্য কাজ। ঐ লোকটা তাদের জীবনের অবারিত প্রবাহের মাঝে একটা কুৎসিত ছন্দোহানি—কয়েক ঘণ্টায়ই সে সত্যব্রতর শরীর-প্রক্রিয়ায় অনেক সব বিকৃতি ঘটিয়েছে। রুগী ফেলে রেখে সত্যব্রত সোজা রাজেনের ঘরে ঢুকলো। বীণা ম্লান মুখে ঘরের কাজকর্ম ক'রে যেতে লাগলো, কিন্তু কান রইলো সজাগ হয়ে।

রাজেন বিছানায় চুপ করে বসে আছে।

সত্যব্রত ঘরে ঢুকতেই রাজেন হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললে—আসুন। আরো আগে আপনার দেখা পাবো ভেবেছিলাম।

সত্যব্রত রুক্ষস্বরে বললে,—দেখা পাবার এত কী দরকার !

একটুও কুণ্ঠিত না হয়ে রাজেন বললে,—আপনি ডাক্তার, আপনি ছাড়া কে আর দেখবে বলুন।

অবাক হয়ে সত্যব্রত বললে,—কেন, কী হয়েছে ?

বিরস গলায় রাজেন বললে,—সমস্ত গায়ে ব্যথা, মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে, দেখুন গায়ে হাত দিয়ে—একেবারে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। কী করা যায় বলুন তো ?

—বলেন কি ?

সত্যব্রত বিছানার এক পাশে বসে রাজেনের জামা তুলে গায়ে হাত দিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলে। বললে,—বসে আছেন কেন? শুয়ে পড়ুন। শীত করছে নাকি? দাঁড়ান্ ষ্টেথিস্কোপটা নিয়ে আসি।

দরজার কাছেই বীণার সঙ্গে দেখা। সত্যব্রত বললে,—মোটা একটা-কিছু চাদর ওকে গায়ে দিতে দাও, ভীষণ জ্বর এসে গেছে। পড়া গেলো হাঙ্গামায়—ঠিকানা জেনে বাপকে টেলি করে দাও একটা।

ম্লান হয়ে বীণা জিগগেস করলো,—অসুখ খুব কঠিন নাকি ?

—নাই বা হলো কঠিন। পরের ঝক্কি মাথা পেতে নিতে কার এমন সাধ হয় ? বাপ এসে নিয়ে যাক।

তবু ভালো। স্বামী তা হলে অতিথিকে আর তাড়াতে পারলেন না—অতিথিকে রুগ্ন জেনে তাঁর গৃহস্থ চিত্তের সঙ্কীর্ণতা মানবহিতৈষীর মহাপ্রাণতার কাছে পরাভূত হয়েছে।

বীণা বললে,—কল-এ গেলে না ?

—না, তোমাকে নিয়ে আজ একটু বেড়াতে যাবো ভাবছি।

কথাটায় দস্তুরমতো চমক আছে। বীণাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে নয়, রুগীর আহ্বান উপেক্ষা করলো বলে। তবু এর কারণটা যেন বীণার দৃষ্টি এড়ালো না। কল-এ চলে গেলে বীণা কোন্ না চুপি-চুপি রাজেনের শিয়রে গিয়ে বসবে, আর শিয়রে গিয়ে বসলে তার জ্বরো কপালে কোন্ না হাত রাখবে! ভাবতেই সত্যব্রতর সমস্ত স্নায়ু-শিরা কেঁচোর মতো কিল্‌বিল্ করে উঠলো।

তবু বাইরে স্ফূর্তির ভান না করে বীণার উপায় ছিলো না।

সত্যব্রত নিচু গলায় বললে,—কিন্তু আমাদের শোবার ঘরটা তালা দিয়ে বন্ধ ক'রে যেতে হবে।

বীণা মানেটা বুঝতে পারলো না, বললে,—কেন ?

—কেন কী! কোথাকার কে লোক—যদি এই ফাঁকে সব চুরি ক'রে চম্পট দেয়! বলা যায় না তো। দেখতে ত' একটা 'লোফার্।'

কথাটা বীণার অসহ্য লাগলো, ঝাঁজালো গলায় বললে,—তোমার কত সম্পত্তি আছে যা চুরি করবার জন্যে ওঁর ঘুম হচ্ছে না। তোমার মতো পঞ্চাশটা ডাক্তারকে ও কিনতে পারে।

স্ত্রীর কথায় কান না পেতে সত্যব্রত দরজায় তালা লাগালো, চাকরকে হুকুম দিয়ে গেল ঘরের দিকে কড়া নজর রাখতে।

বীণা বললে,—তা হলে আমি যাবো না।

মুখ কুটিল ক'রে সত্যব্রত বললে,—অন্তত এ-সম্পত্তিটি ত' আমি নিজের জিম্মাতেই রাখি। লড়াই ত' অন্তত করতে হবে। অগত্যা বীণা আর প্রতিবাদ করতে পারে না। বলে,—রুগী ছেড়ে হঠাৎ তোমার এ কী সখ হলো আজ?

সত্যব্রত উদাসীনের মতো বললে,—সন্ন্যেসি না সাজলে কি আমাদের একটুও সৌখিন হতে নেই?

পর দিন সকালে রুগী দেখতে না বেরুলেই নয়। যাবার সময় সত্যব্রত বলে গেলো ঘরে ঢুকে ওকে যেন বিরক্ত করো না, দেখো। হার্টের অবস্থা ভালো নয় বিশেষ। ও এখন যতো চুপ করে থাকতে পারে ততই ভালো। ওষুধ পথ্য যা দরকার আমি ফিরে এসেই খাওয়াতে পারবো, বুঝলে? ততক্ষণ তুমি আমার জন্যে দুটো ফতুয়া সেলাই ক'রে রেখো—ঘরে লং-ক্লথ ত' আছেই।

সত্যব্রত বেরিয়ে গেলো। এতক্ষণে রাজেন ছুটি পেলো, এতক্ষণে তার জ্বর নেমেছে!

ডাকলে,—বীণা।

বীণা যেন তার ডাকের জন্যে প্রস্তুত ছিলো। তাড়াতাড়ি তার ঘরে গিয়ে বললে,—এখন আছ কেমন?

—খুব ভালো আছি।

—ভালো আছ কী! বীণা তার কপালে হাত রেখে বললে,—গা যে তোমার পুড়ে যাচ্ছে। জ্বরটা সকালেও নামলো না।

হেসে রাজেন বললে,—তুমিও দেখছি তোমার স্বামীর মতো মাতব্বর ডাক্তার হয়ে উঠেছ। জ্বর নামে নি কী! গায়ে কি-রকম ঘাম দিয়েছে দেখতে পাচ্ছ! আমি ভাবছিলাম তুমি পাশে বসে আজো আমাকে চারটি ভাত খাওয়াবে।

বীণা বললে,—পাগল আর-কি!

—তবে এক গ্লাস জল খাওয়াও না-হয়—

—তেষ্টা পেয়েছে? তা এনে দিচ্ছি।

বীণা জল নিয়ে এলো। আঙুল ক'টি বাঁচিয়ে রাজেন জলের গ্লাসটা গ্রহণ করলে।

বীণা বললে,—তোমার বাড়িতে একটা খবর পাঠাই। আমাদের এখানে কি আর তেমন সেবা-শুশ্রূষা হবে?

—নাই বা হলো।

—পরের ছেলেকে এমনি করে মরতে দিতে পারি নাকি ?

হেসে রাজেন বললে—পারো না ? আশ্চর্য্য ত' ! কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোস না।

পাশে বসে বীণা বললে,—খুব কষ্ট হচ্ছে ? মাথাটা টিপে দেব ?

—না। খুব ভালো আছি।

—তবু দিই না।

—তুমি আমার মাথায় হাত রাখলেই বরং কষ্ট হবে।

বীণা দুঃখিত হয়ে বললে,—তবে ঠিকানা দাও, তোমার বউকেই বরং আসতে লিখে দিই।

শুকনো শীর্ণ মুখে হাসি ভেসে উঠলো। রাজেন বললে,—বউ ? বিয়ে একটা করলে মন্দ হত না। তা হলে বউয়ের জন্যে উদ্বেগ না করে এমনি বিছানায়ই শুয়ে থাকতে পারতাম। কী বলো ?

—কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছিলে বলো দিকি ?

—কোথায় আবার যাবো ? মরতে যাচ্ছিলাম।

—মরতে ? বীণা চমকে উঠলো।

হেসে রাজেন বললে,—পৃথিবীতে কে না মরতে চলেছে ? তুমি অত অবাক হচ্ছ কেন ?

বীণা ব্যস্ত হয়ে বললে—উনি ফিরুন, আজই আমি তোমার বাড়িতে টেলি ক'রে দেব।

—তার এখনো দেরি আছে।

ব'লে চোখ বুজে রাজেন আস্তে আস্তে নিশ্বাস টানতে লাগলো।

ভয় পেয়ে বীণা মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলে— রতন-দা !

রাজেন চোখ চেয়ে হাসলে,—বললে,— আমাকে তোমার রতন-দাই বলে মনে হয় নাকি ? ভালো করে চেয়ে দেখ তো।

বীণা বললে,—নিশ্চয়।

—রতনদা বলেই যদি নিশ্চিন্ত হও, আমার আপত্তি কী ! কিন্তু কাউকে যেন বলো না রতন বলে এখানে কেউ এসেছে। যদি কেউ নেহাৎ জিগগেস করে, বলো রাজেন না-কে রাজমোহন বলে একজন এসেছিলো।

—রাজেন বুঝি তোমার ভালো নাম ? আমার একদম মনে পড়ছে না।

—হ্যাঁ, বাইরের লোককে কি ডাক-নাম বলতে আছে ? এটা গোপনে ডাকবার নাম—কী বলো ?

—কিন্তু তুমি এখন চুপ করলে পারো। তোমার হার্ট নাকি দুর্বল।

—হোক দুর্বল, তবু এত সহজে মরতে এসেছি বলে কি তোমার মনে হয়? সে তুমি চট করে বুঝবে না—সত্যব্রত বাবুর ফেরবার বুঝি সময় হলো?

অপ্রস্তুত হয়ে বীণা বললে,—না, না, আমি বসছি তোমার কাছে। তোমার বার্লি এনে দেব? খিদে পায় নি?

রাজেন হেসে বললে—না, উনি আগে ফিরুন।

কিন্তু,—সত্যব্রত অনেক দিন বাঁচবে,—বলা মাত্রই সে চলে এসেছে। মোটকথা কলে সে আজ মোটে বেরোয়ই নি,—রাস্তায় এমনি একটু পাইচারী করে অকস্মাৎ বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ঢুকে পড়েই তার চক্ষু স্থির।

নিলর্জ্জের মতো স্ত্রীকে সে মুখের ওপর ধমক দিয়ে উঠলো—এই তুমি আমার ফতুয়া সেলাই করছ?

বীণা নীরবে রাজেনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীর শোবার ঘরে ঢুকলো। তেজী গলায় বললে,—

বাড়ীতে এমন একজন রুগী, আর আমি বসে সেলাইয়ের কল্ চালাবো?

—কিন্তু দিব্যি দেখছি রুগীর সঙ্গে বক্‌বক্ করছ। তোমাকে বারণ ক'রে দিয়ে গেলাম না?

কিন্তু জল চাইলে এক গ্লাশ জলও আমি দিতে পারবো না, না কি? সাত জন্মে এমন কথা ত' কোনোদিন শুনি নি।

—ঠাণ্ডা জল দিয়েছ ত'? সত্যব্রত মুখ চোখ কঠিন ক'রে বললে,—সব তাতে তুমি কেন ফোঁপর দালালি করতে আস। তুমি ডাক্তারির বোঝ কি!

ঠোঁট উল্টে বীণা বললে,—তুমিও ছাইয়ের ডাক্তার। তুমি বলছ রুগীর অবস্থা খারাপ, আর রুগী ও দিকে দিব্যি চাঙ্গা হয়ে কথা কইছে।

—চাঙ্গা ওকে কে করলে? আমার ওষুধ, না আর কারুর? বলে সত্যব্রত রাজেনের ঘরে ঢুকে সৌজন্যের কিছুমাত্র ভণিতা না করে বললে,—কেমন আছেন এখন?

প্রশ্নটা শুনে রাজেন বিস্মিত হলো। সকালে উঠে বেরবার আগেই সত্যব্রত একবার তাকে পরীক্ষা ক'রে গেছে। আবার এখুনি তার কী দরকার হ'তে পারে ঠিক বুঝতে না পেরে রাজেন বললে,—বেশ ভালই আছি।

—ভালো যখন আছেন তখন আস্তে-সুস্থে বেরিয়ে পড়ুন মশাই। বেশি

ভালো থাকা এখেনে আর চলবে না। বলেই সত্যব্রত বাইরের ঘরে রুগীর গন্ধ পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো।

বীণা দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা প্রান্ত একটু কামড়ে মুখের ভাবকে তার পক্ষে যতদূর সম্ভব হিংস্র ক'রে তুললে। স্বামী অন্তর্হিত হ'তেই বীণা কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা রাজেনের ঘরে এলো। তার কপালে হাত রেখে বললে,—আমি, বীণা। ভয় নেই তোমাকে তাড়িয়ে দিতে আসি নি। বলতে এলাম, তোমার বার্লি এবার নিয়ে আসবো ?

রাজেন বললে— ডাক্তারবাবু যখন বলবেন তখনই নিয়ে এলে চলবে।

—কিন্তু তুমি যেন রাগ ক'রে বেরিয়ে যেয়ো না।

—বেরোতে গেলেই ত' তুমি দু' হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলবে। মুখের কথা বললেই ত' আর বেরুনো যায় না।

—নিশ্চয় না। বাড়ি ত' খালি একমাত্র আমার স্বামীর নয়,—আমারো। আমার কথায়ই বা থাকবে না কেন! আমি বলছি—তুমি থাকো। যদ্দিন না ভালো হও।

—নিশ্চয়। রাজেন হেসে বললে,—ভোটের সংখ্যা দু পক্ষেই সমান, আমার কাস্টিং ভোট দিয়ে তোমাকে জিতিয়ে দিলাম। কিন্তু যদ্দিন না ভালো হই—মনে থাকে যেন।

সামান্য অপ্রতিভ হয়ে বীণা বললে—ভালো তুমি শিগগিরই হবে।

—বা, ভালো ত' আমি এখনই হয়েছি। আমার জন্যে তোমার ভাবনা হয় নাকি ?

—তা হয় না ?

—কেন হয় ?

—ধরো তোমার বাড়িতে গিয়ে যদি আমার অসুখ হত, তোমার ভাবনা হত না? আমার সেবা করতে না? বলে বীণা রাজেনের কপালের ওপর থেকে লম্বা চুলগুলি তুলে তুলে কানের পিঠের কাছে গুঁজতে লাগলো।

পেছনে কার ছায়া পড়েছে। পড়ুক। বীণা একটিবার চেয়েও দেখবে না। তার সমস্ত মন বলছে, রুগীর সেবা করার মধ্যে কোথাও এতটুকু অপরাধ নেই। তবু পেছন ফিরে স্বামীকে সে বললে, বার্লি এখন খেতে দেব নাকি ?

—তা তুমিই জানো। তুমিই ত এখন বড় ডাক্তার। বলে সত্যব্রত শোবার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়লো।

রাজেন বললে,—তুমি এখন যাও,—স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই।

—আমি কোথায় ওঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলাম। তুমি ত' স্বকর্ণে সবই শুনতে পাচ্ছ। বল ত' কার দোষ?

রাজেন হেসে বললে,—তোমাদের ঝগড়ায় আমাকে সালিশ মানছ নাকি?

—হ্যাঁ, ক্ষতি কী!

দোষ তোমারই। অচেনা লোককে তুমি কেন সেবা করবে!

—হ্যাঁ, তুমি আমার অচেনা বৈ কি। চুপ করো দিকি দয়া করে। পুরুষ হয়ে পক্ষপাতিত্ব তুমি করবে না? জানি না তোমাদের?

—জানো না কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যাই বলো, আমি যাচ্ছি না।

দুপুরে তুমুল কাণ্ড ঘটে গেলো যা-হোক। সত্যব্রত যতো স্ত্রীকে শাসন করতে আসে ততোই সে মুখের ওপর কথা ছুঁড়ে মারে—জিহ্বার বলগা আর কেউ টেনে রাখতে পারে না—পরস্পরের উপর কথার তীব্র কশাঘাত চলতে থাকে। সত্যব্রত তার স্ত্রীকে দুর্বল চরিত্র বলে গাল দেয়, আর বীণা স্বামীর চিত্তদারিদ্র্য থেকে নৈতিক অধোগতির সিদ্ধান্ত ক'রে তাতে যে কিছুই ভুল হয়নি তা সপ্রমাণ করবার জন্য কণ্ঠস্বরকে অতিরিক্ত স্পষ্ট করে তোলে।

বাড়িতে নেহাৎই একটা অপরিচিত লোক রোগ শয্যায় পড়ে আছে, নইলে সত্যব্রত স্ত্রীর গায়ে দস্তুরমতো হাত তুলতো। ঈর্ষায় তার গায়ের রক্ত জ্বলন্ত অঙ্গারের কণার মতো তাকে দগ্ধ করছে। আরেকটু হলে সে রাগের মাথায় বীণার টুঁটিটাই হয়তো টিপে ধরত।

আর রতন-দা যদি অমনি অসুস্থ হয়ে পড়ে না থাকতেন, তবে বীণাই বা এমনি চুপ করে থাকতো নাকি? দস্তুর মতো রতন-দার হাত ধরে বলতো আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। হ্যাঁ, বলতো বৈ কি,—মুখ দিয়ে অনায়াসে বার হয়ে আসতো—রতন-দা ওকে তখন সঙ্গে করে নিতেন বা না নিতেন! বলতে ত আর বাধতো না।

বিকেলের সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়ার ঝাঁজটা জুড়িয়ে এলো—এবং রাত্রিতে সত্যব্রত ও বীণা একই শয্যা গ্রহণ করলে। অভিমানের কুয়াসাটা কাটিয়ে উঠতে দেরি হলো না। তারপর দুজনই পড়লো ঘুমিয়ে।

কিন্তু মাঝরাতে বীণার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। মনে হলো পাশের ঘরে কে যেন চাপা গলায় আর্তনাদ করছে। কার সে-আর্তনাদ বীণার বুঝতে আর দেরি হলো না। তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা সে জ্বালিয়ে টিপি টিপি পা ফেলে পাশের ঘরে চলে এলো।

পাশের ঘরে কেউ কোথাও নেই। বিছানাটা শূন্য। সেদিনের কাপড় জামা-গুলি ফেলে রেখে নিজের সেই ময়লা জামা কাপড় পরেই রাজেন রাতের অন্ধকারে কোথায় চলে গেছে।

তবু নীচু হয়ে বীণা অবুঝের মতো তক্তপোষের তলাটা খুঁজতে লাগলো।

পেছন থেকে ভারি গলায় সত্যব্রত বললে,—ও বুঝি ঐখানে গিয়ে লুকোল?

স্বামীকে দেখে বীণা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। বললে,—রতন-দা কোথায় চলে গেছেন।

—সত্যব্রত কর্কশ গলায় বললে,—কী করে টের পেলে শুনি?

—এমনি একবার এসেছিলাম স্বপ্নের মধ্যে তার গোঙানি শুনে। ভাবলাম যন্ত্রণা খুব বেড়ে গেছে হয় ত? কিন্তু এসে দেখি ঘরে তিনি নেই। তুমি অমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছ কেন। সত্যি একবার খোঁজ করে দেখ না—কোথায় গেলেন! এই অসুখ—এক গা জ্বর নিয়ে—

সত্যব্রত শুধু বললে,—হুঁ! দাও দিকি লণ্ঠনটা।

বলে ঘরের আনাচ-কানাচ সে খুঁজতে লাগলো। বললে,—ব্যাটা এখেনেই কোথায় লুকিয়ে আছে? বলেই হাঁক পাড়লে—ভিখন!

ভিখন এক লাঠি নিয়ে এসে হাজির।

কিন্তু না-ঘরে না-বাইরে—রাজেনকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না।

তিন দিন পরে বাঙলা দৈনিক খবরের কাগজখানা বীণারই হাতে পড়লো আগে। সত্যব্রত ঘুম থেকে উঠেই শাম্পানে করে বেরিয়েছে। খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া ছাড়া বীণার আর কাজ কই?

একটা খবরে এসে তার দুই চোখ সহসা আটকে গেল। লাইন ঠেলে আর সে এগোতে পারলো না। নামটা স্পষ্ট লেখা—মনে-মনে বীণা বানান করে পড়ে নিলো, ভুল নেই—ঠিক, জানলা দিয়ে বাইরে একবার চেয়ে আবার কাগজের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলে—ঠিক,—শ্রীরাজেন্দ্র ভূষণ বসু—হরকুমার বাবুরা বসুই তো ঠিক? হ্যাঁ, যতদূর তার মনে পড়ে। বাবা তাঁকে হরকো বোস বলেই ত' ঠাট্টা করে ডাকতেন। পত্রিকা ভুল নাম লিখতে যাবে কেন? তাদের স্বার্থ কী! বীণা হেড-লাইন ছেড়ে নিচে নামলে। হ্যাঁ,—রাজেন্দ্র ভূষণ—কী, কী করেছে? খুন করেছে। খুন করে এতদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো। বীণা আবার থামলে, চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। রাজেন সত্যিই চলে গেছে এ-সত্য যখন সাব্যস্ত হল তখন স্বামী ট্রাঙ্ক-বাক্স উলটে-পালটে তছনছ করে দেখছিলেন কিছু

সে সরিয়ে নিয়েছে কি না। না, কারুর কিছু চুরি করেনি—খুন করেছে। খুন ক'রে এত দিন সে নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সম্প্রতি সে ধরা পড়েছে। ধরা যখন পড়ে তখন তার গায়ে একশো চার ডিগ্রি জ্বর—পেছনে তাড়া করলে সে পালাবার একটুও চেষ্টা করে নি। জ্বর?—বীণা তার ডান হাতখানি নিজের কপালের ওপর এনে রাখলো। তার কপাল বরফের মত ঠাণ্ডা—মাথা যেন চিন্তার ভার বইতে পারছে না। কাকে খুন করলো? কবে? বীণা খবরের কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়লো। খুন করেছে এক স্ত্রীলোককে—প্রায় দিন পনেরো আগে। স্ত্রীলোককে? স্বামীও সেদিন তার ঘাড়ের ওপর হাত রেখেছিলো—আর একটু চাপ দিলেই সে মরে যেতো। কে সে স্ত্রীলোক? চোখ মেলে মনে-মনে বীণা বানান করে পড়তে লাগলো—সে স্ত্রীলোকটি চরিত্রহীনা।

দূর করে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বীণা উঠে দাঁড়ালো। যতো সব আজগুবি মিথ্যা কথার কারবার করে কাগজগুলো ব্যবসা ফাঁপায়। ঘৃণায় বীণা কাগজটাকে একটা লাথি মারলে।

কিন্তু কে জানে খবরটা ওঁর চোখে পড়তে পারে! বীণা তাড়াতাড়ি কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে ফের পড়লে। পড়ে কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে উনুনে ফেলে দিয়ে এলো।

বাঙালা দেশে রাজেন্দ্র ভূষণ বলে লোকের আর অভাব নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই এ তার রতন-দাদা নয়। কাগজটা পুড়িয়ে ফেলে সে ভালোই করেছে, নইলে স্বামীর চোখে পড়লে তিনি এ থেকে প্রকাণ্ড এক মহাভারত ফাঁপিয়ে তুলতেন। কান পেতে বীণা তার রতন-দার সেই কলঙ্ক কথা শুনতে পারতো না।

অন্ধ-কূপ

রাত্রির অন্ধকারের পানে উৎসুক হয়ে চেয়ে আছি। এ আঁধারটুকু যেন আর পোয়াবে না। এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের সমস্ত সঞ্চিত অশ্রু ও বেদনা যেন ঐ রাত্রির তিমিরপুঞ্জে জমাট বেঁধে আছে।…হে আকাশের নিঃশব্দ বিনিদ্র প্রহরীর দল, প্রভাতের সিংহদ্বার খুলে দাও, সমস্ত অন্ধকারের মর্মস্থল জ্যোতির প্রসব-বেদনায় চীৎকার করছে!

সারারাত চোখে ঘুম আসেনি। দুই চোখ ভরে অনন্ত রাত্রির প্রতীক্ষা নিয়ে বাইরের পানে চেয়ে আছি। পাঁচ বছর পরে আজ আমার মুক্তির দিন, আলোকের প্রথম চরণাঘাতে আমার এ বন্দীশালার অবরুদ্ধ লৌহদ্বার খুলে যাবে।…

কত কথা যে আজ মনে পড়্ছে। এমনি এক অন্ধকার সুগভীর রাত্রে আমি লুণ্ঠন করতে গিয়েছিলাম জমিদারের গৃহে নিষ্ঠুর তস্করের বেশে। আমার সমস্ত দেহে তখন জঘন্য হিংসার তীব্রতা জলছিল। আমি একমুঠো ভাত খেতে না পেয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি দিনে দিনে, আর এই অযোগ্য বিলাসী জমিদার সহস্র অনর্থক ব্যসনে লক্ষ লক্ষ টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে। এই অন্যায়ের প্রতিবিধান চাই। স্ত্রীর রোগাবশীর্ণ জরাকুৎসিত দেহ আমার কাপুরুষতার ইঙ্গিত করছিল। ছেলের কাতর মর্মভেদী কান্না আমি সহ্য করতে পারলাম না। অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম একা নিঃসঙ্গ দুর্দ্ধর্ষ দস্যু!...

কিন্তু জমিদারের সেই ঘুমন্ত সন্দেহলেশহীন সুন্দর মুখখানার পানে চেয়ে সমস্ত দেহ জ্বলে উঠল। পিস্তল তুলতে পারলাম না। তার পাশে আষাঢ়-শর্বরীর মেঘসম্ভারের মতো পুঞ্জে পুঞ্জে নিবিড় কেশভার লুটিয়ে দিয়ে স্থির বিদ্যুতের মতো একটি নারী শুয়ে! এ আমি কী করতে এসেছি! আমার মাথার সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে উঠল। পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে একটা বীভৎস শব্দ হয়ে গেল।...তারপর কী হল আর ভাবতে পাচ্ছি না।......

অন্ধকার তরল হয়ে আসছে। দু'একটা ঘরছাড়া পাখী ঘুমভরা স্বরে ডেকে উঠল। একটা ময়লা-গাড়ী চলে যাচ্ছে। কী মিষ্টি লাগছে তার চাকার আওয়াজ! কিরণাবগুণ্ঠিতা ঊষা নববধূর মতো আলোর অঞ্জলি নিয়ে আকাশে প্রতীক্ষা করছে।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে আজ আমি মুক্তি পাব। কিন্তু তারপর?

আমার সেই পল্লবঘন গাঁ, সেই শীর্ণ নদীর পাড় ঘেঁষে বালুচরের পথ, আর সেই আমার ছায়াশীতল পর্ণগৃহ।...আমার আশা, আমার রতন! তারা কি আজও বেঁচে আছে? সেই কদর্য্য কুটীরে বীভৎস দারিদ্র্যের মাঝখানে তাদের নিশ্বাস কি আজো বইছে? আমার আশা! সেবাময়ী স্নেহশীলা লজ্জাবনতা ব্যথাবিধুরা আমার আশা! আর এই আলোকের নির্মাল্যের মতো শুচিশুভ্র আমার রতন। পাঁচ বছর পর তাদের দেখব। রতন না-জানি আজ কত বড়টি হয়েছে! আশা না জানি দারুণ প্রতীক্ষার তপস্যায় কত শীর্ণ কত সুন্দর হয়ে চেয়ে রয়েছে পথের পানে! কিন্তু...

দ্বার উন্মোচন হচ্ছে। শিকলের আর্তনাদের পরিবর্তে আজ আনন্দ বর্ষণ হচ্ছে। দ্বাররক্ষীর ভ্রুকুটিকুটিল জঘন্য মুখের ওপর আকাশের রৌদ্র এসে পড়াতে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। শিকলের বেড়ী খুলে ধীরে ধীরে চলে এলাম। অন্ধ-কূপের অন্তরালে আমার বিরহিনী শিকল-প্রিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রইল।

কয়েদীগুলি করুণ দীন নয়নে আমার পানে তাকাচ্ছে। যেন ওদের থেকে কি অমূল্য সম্পদ আমি হরণ করে নিয়ে যাচ্ছি। ওদের দৃষ্টির দীনতায় ঈর্ষার বেদনা ফুটে উঠছে।

আকাশ তখন রোদে তেতে উঠেছে। পথের ওপর চলে এলাম। এই পথ, এই আলো, এই বাতাস! বুক ভরে আনন্দে বাতাস গ্রহণ করলাম। সমস্ত শরীরে আলোর আশীর্বাদ ভরে নিলাম। আমার শীর্ণ দেহের শিরায়-শিরায় রৌদ্রের সুরায় রক্তের ছন্দ বেজে উঠল।

কত মানুষ ছুটে চলেছে, কত গাড়ী, কত সজ্জা, কত কোলাহল, মুক্ত অবাধ স্বচ্ছন্দ সবারই গতি। সবখান থেকে আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর ঐ পাশে প্রাচীরাবদ্ধ আলো-বাতাসের রাজ্য থেকে নির্বাসিত বুভুক্ষু হতভাগ্যদের দল শিরে করাঘাত হান্‌ছে।...ওগো আকাশের অধীশ্বর, আলোকের দেবতা, তুমি ঐ সংকীর্ণ ঘৃণ্য বায়ুহীন, আলোহীন, নরকে বাঁচ কেমন করে? ব্যধিগ্রস্ত কঙ্কাল...এ তোমার কী রূপ ভগবান্!

পথ আমাকে ডাকছে! মুক্ত আকাশের তলে প্রস্তর-ব্যথিতা বন্দিনী অভাগিনী নগরীর পথ শত নির্য্যাতন বুক পেতে সহ্য করছে। পথের ধারে বসে পড়লাম একটা হিজলগাছের তলায়। চলতে পারছিলাম না। সমস্ত পায়ের গিটে গিটে অসহ্য বেদনা ধরে আছে। ক্ষুধায় সমস্ত নাড়ীতে টান পড়ছে। এক মুঠি ভাত যদি পেতুম এখন!

কিন্তু, না আমাকে চলতেই হবে। দীর্ঘ পাঁচ মাইল কি চলতে পারব? প্রায় একরকম ছুটে চললাম বাড়ীর মুখে। পায়ের রগ্‌গুলি মোচড় খাচ্ছিল, মাথাটা ঘুরছিল—তবুও থামলাম না। দুয়ার ধ'রে আমার আশা এই দীর্ঘ দিন-রজনী প্রতীক্ষার অনন্ত ক্লান্ত বিরহব্রত উদ্‌যাপন করছে, তার চোখে যে কী গহন কালিমা ...আর আমার রতন মুখখানি বিষাদে ম্রিয়মান করে মার দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে...না আমি আর দেরী করব না।

ভীষণ রোদ উঠেছে। পা চলছিল না। তবুও পা টেনে নিচ্ছিলাম সুমুখের দিকে। ভাবলাম কিছু খেতে পারলে হত। একজন ভদ্রলোক পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তাঁর কাছে হাত পেতে মিনতি করে বল্লাম—বড্ড খিদে পেয়েছে, কিছু দেবেন দয়া করে। ভদ্রলোক ঘৃণায় মুখ ফেরালেন। আবার কাকুতি করে চাইলাম। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভদ্রলোক বল্লেন—গতর আছে খেটে খানা। বলে, হন্‌হন্ করে চলে গেলেন।

গাঁয়ের কাছে এসে পড়েছি। ভারী পিপাসা পাচ্ছিল। দেখি সামনেই

একটা ডোবা পড়ে আছে। আস্তে আস্তে জলে নেমে অঞ্জলি করে অনেকখানি জল খেলাম। বাঁচলাম।

পথের যেন ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। এ কোথায় এসেছি? একজন পসারিণী যাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁগা সুখনগঞ্জ যাবার রাস্তা কোথায়?

পসারিণী বল্লে—এইত সুখনগঞ্জ।

এই সুখনগঞ্জ! কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন না হয়ে গেছে এর এ পাঁচ বছরের মধ্যে। একে আর যেন চেনা যাচ্ছে না। সেই দিগন্তবিস্তৃত ঘন সবুজের ক্ষেত-গুলির পরিবর্তে আজ কুঠিয়ালের ধূমকলঙ্কিত উচ্চশির কারখানার সারি। আমার সুখনগঞ্জের নীল অবাধ আকাশ ম্লান মুখে চীৎকার করছে। এ কোন্ গোলক-ধাঁধাঁয় এসে পড়েছি......আমার আশা রতন কৈ?

কেউ যেন চিনতে পাচ্ছে না। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা মশাই, এখানে প্রবোধ ঘোষাল বলে কাউকে চিনতেন আপনারা? তার ছেলে রতন? তারা কোথায় বলতে পারেন?

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। পরে বল্লেন—আমি মশাই বেশী দিন আসিনি। যার কথা বলছেন, তাকে আমি চিনিনা বটে, কিন্তু শুনেছি।

একান্ত উৎসুক হ'য়ে বল্লাম—কি শুনেছেন?

ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল্লেন—প্রবোধ ঘোষাল? সেই খুনে জালিয়াৎটা তো? সে শুনেছি জেলে পচছে। তার ছেলের কথা বলতে পারি না বটে, তবে তার স্ত্রী আমাদের বাড়ীতেই ইদানীং দাসী ছিল। বেচারী ছ'মাস হ'ল মারা গেছে।

মারা গেছে? আমার আশা নেই? আমি সেখানে বসে পড়লাম। আমার হৃৎপিণ্ডে কে যেন অবিশ্রান্ত হাতুড়ীর ঘা হান্‌ছিল। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বল্লাম—কিন্তু আমার রতন? প্রবোধ ঘোষালের ছেলে? সে কোথায় বলতে পারেন? সে ভালো আছে ত?

—জানিনা। বলে ভদ্রলোক চলতে সুরু করলেন।

ছুটে ভদ্রলোকের পা ত্নটো জড়িয়ে ধরলাম। কেঁদে বল্লাম—আমাকে আজকের জন্যে কিছু খেতে দিন দয়া ক'রে। আমি কলকাতা থেকে পাঁচ মাইল হেঁটে আসছি। আর চলতে পাচ্ছি না। দেবেন কিছু খেতে? আমিই প্রবোধ ঘোষাল?

ভদ্রলোকের কুটিল মুখ তীক্ষ্ণ ঘৃণায় ভরে গেল। তিনি পা দিয়ে আমার বুকে

সজোরে এক আঘাত ক'রে বল্লেন—প্রবোধ ঘোষাল? সেই খুনেটা? খেতে দেবে না, আরো কিছু······বলে তিরস্কার করতে করতে চলে গেলেন।

মাটির ওপর বসে পড়লাম। নবতৃণমঞ্জরী প্রাণের প্রাচুর্য্যে উন্মত্ত হ'য়ে বিজয়ধ্বজা তুলে চলেছে। পদাহত কোটী কোটী জীবন। মৃত্তিকা-মাতার আনন্দ দুলাল। রৌদ্রের আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে চলেছে সব। চেয়ে থাকতে থাকতে দু-চোখ জলে ভরে উঠল। কিন্তু বসে থাকলে তো আমার চলবে না।

অনেক কষ্টে খুঁজে বার করলাম আমাদের সেই বাসস্থান। সেই ভাঙা কুটির আর নেই, তার বদলে আজ সেখানে ফিরিঙ্গি সাহেবদের মদের মজলিস্-ঘর গড়ে উঠেছে। কোথায় আশা, কোথায় আমার রতন! দীর্ঘ অনন্ত রাত্রির প্রতীক্ষা বুকে চেপে কলঙ্কিত ধুলার তলে কোথায় তোমরা প্রিয়জনের ধ্যান করছ?

একটি কিশোরী পুকুরে নেমে জল ভরছে। আমার মুখের দিকে অপলক চোখে চেয়ে আছে।···মৃন্ময়ী। এগিয়ে এসে বল্লুম—কে মৃণু, আমাকে চিনতে পারছিস?

দু-চোখে বিস্ময় পুরে মৃন্ময়ী বল্লে—তুমি? প্রবোধ খুড়ো? কবে এলে?

বল্লাম—আজকেই এসেছি মা। আজকেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমার রতন কোথায় বলতে পারিস?

মৃন্ময়ীর মুখখানি একটি বেদনার আভা লেগে কমনীয় হ'য়ে এল। তার দুটি চোখের তারায় একটি অশ্রুহীন রোদন কেঁপে কেঁপে উঠল। সে মৃদুকণ্ঠে বল্লে—খুড়ীমা মারা যাবার আগেই সে কলকাতা চলে গেছে। খুড়ীমার অসুখের সময়ও আসেনি। কত চিঠি লিখলাম জবাব পর্য্যন্ত দিলেনা। শুনলাম সে ঠিকানায় সে নেই।

কি সুন্দর এ কিশোরীর মুখ! নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ মুখের ওপর একটা অস্ফুট ম্লানিমা কাঁপছে! সুমধুর সুগোপন একটি ব্রীড়ায় দুটি চোখের পাতা সন্ধ্যার মতো নুয়ে পড়েছে। কল্যাণী এ কিশোরী! তাকে বল্লাম—আমাকে কিছু খেতে দিতে পারিস মা, মৃণু? ভারী ক্ষিদে পেয়েছে।

মৃন্ময়ী ব্যাকুল কণ্ঠে বল্লে—চলনা আমাদের বাড়ী। বাবা তোমাকে দেখে ভারী খুসী হবেন। চল।

প্রিয়াহীন, পুত্রহীন নিরাশ্রয় পথের কাঙাল একটি কিশোরীর কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করছি।

কিন্তু তাদের বাড়ী পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই মৃণ্ময়ীর বাবা—আমার বাল্যবন্ধু নবীন চাটুর্য্যে কর্কশকণ্ঠে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে—ও আবার কে?

মৃণ্ময়ী বল্লে—প্রবোধ খুড়ো।

আমি বল্লাম—চিনতে পাচ্ছনা নবীন? জেল থেকে ছাড়া পেয়েই আসছি এখানে।

কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই নবীন তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠে ব'লে উঠল—না বাপু, এসব এখানে হবে না। তুমি আমার বাড়ী ওঠ, আর পুলিশ এসে আমার বাড়ী খানা-তল্লাশি করুক। পুলিশের হাঙ্গামা আমি পোয়াতে পারব না। সোজাসুজি বলে রাখছি।

গলা কাঠ হয়ে আসছিল। বল্লাম—এই কি বন্ধুত্বের প্রতিদান?

বিদ্রূপ করে নবীন বল্লে—হ্যাঁ বাপু, বন্ধুই যদি বটে, তা'হলে আর এখানে এসে বন্ধুকে পুলিশের ফাঁদে ফেল কেন? আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না। সটান চলে যাও।

ফিরে চেয়ে দেখি মৃণ্ময়ী মূর্তিমতী বেদনার মতো নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা গাছের তলায় শুয়ে দুই কঠিন হাত দিয়ে বুকের মধ্যে মাটিকে চেপে ধরলাম। চোখ দিয়ে জল ঝরছিল। ভাবলাম—আমার মেয়াদ ত ফুরিয়ে গেছে, আজও কি আমি কোথাও স্থান পাব না? কি করব আমি? এই প্রশ্নের কে উত্তর দেবে? কাঁদতে কাঁদতে চোখে ঘুম ভরে এল। ডালে ডালে পাখীদের ঘর-কন্নার কোলাহল চলেছে। বাতাসে গাছের পাতাগুলি কি মধুর মর্মর তুলছে!

ঘুম যখন ভাঙল, চেয়ে দেখি সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। আর বসে থাকলে চলবে না। এক্ষুনি রতনের খোঁজে কলকাতা যেতে হবে। কিন্তু হায়…

এ-দিক ও-দিক পাগলের মতো ঘুরে দেখি পথের ধারে কতকগুলি নোংরা ভাত পড়ে আছে। ক্ষুধায় আমি তখন একেবারে উন্মত্ত হ'য়ে গেছি। খুঁটে খুঁটে সেগুলি মুখে তুলতে লাগলাম। সৌম্য গোধূলি-লগনে তখন দু-একটি ক'রে শিশুর চাউনির মতো তারা ফুটে উঠছে। বৃষ্টি-ভেজা ধানের ক্ষেত থেকে একটি ম্লান মিষ্টি গন্ধ উঠছে। পাখীগুলি পাখা মেলে উড়ে চলেছে।

নদীর পারে এসে দেখি একটি শিশু বালুভূমিতে খেলা করছে। শিশুর শেফালি-শুভ্র মুখখানি কি সুন্দর! গলায় তার সোনার হারটি কি সুন্দর দুলছে। …থমকে দাঁড়ালাম। আমি বাঁচতে চাই, আমাকে বাঁচতে হবে। ধীরে ধীরে শিশুর কাছে এসে তার গলা থেকে হারটি তুলে নিলাম। আমার মুখের দিকে চেয়ে মাটির শিশু হেসে উঠল। আমি হারটা হাতের মুঠিতে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ছুটলাম, ছুটলাম—মনে হ'ল, হাতের মাঝে আগুনের ফুলকি!

* * *

কলকাতার এই নোংরা গলিতে এই নোংরা খোলার ঘরে আজ এক সপ্তাহ হ'ল বাস করছি। এর মধ্যে পকেট কেটে বেশ দু-পয়সা রোজগার ক'রে নিয়েছি। খবরের কাগজে-কাগজে এখানে সেখানে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি রতনের জন্য – কলকাতার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পাগলের মতো খুঁজছি, তবু তার দেখা মিলছে না।

ভাঙা ঘরের স্যাঁৎসেঁতে মেঝের ওপর কাপড় বিছিয়ে শুয়ে ভাঙা চালের ফুটো দিয়ে তারায়-ভরা আকাশ দেখি আর রতনের কথা খালি মনে পড়ে। সে কি এখনো বেঁচে আছে? এই পৃথিবী কি তাকে বাঁচবার সুযোগ দিয়েছে? তার মুখের অন্ন বুকের নিশ্বাস দেহের স্বাস্থ্য কেড়ে নেয়নি ত? যদি দেখি সে এখন একজন প্রকাণ্ড লোক হয়েছে! আমার কপালে এত সুখ কি আছে দেবতা?

চারদিন কিছু খেতে পাইনি। অন্ধকার নিশীথে নিদ্রাহীন চোখে বসে ছিলাম, এমন সময় আমার ভাঙা দরজায় কার ঘনঘন করাঘাত বাজতে লাগল। ভয়ে ভয়ে খুললাম না, শেষকালে দেখি দুয়ার ধরে কে সবলে ঝাঁকানি মারছে। খুলে অবাক হয়ে খানিকটা পিছিয়ে এলাম। এই রতন—আমার ছেলে!

পরণে জীর্ণ নোংরা তেলচিটে একটা কাপড়, খালি পা কাদায় ভরা, মাথায় রুক্ষ চুলের জটা, চোখ কোটরে সেঁধিয়েছে, হাড়বেরুনো গালভাঙা বিকৃতমুখে মদের তীব্র গন্ধ, শীর্ণ কুৎসিত দেহে মরণের কালিমা মাখানো। সে আমাকে দুই হাতে উন্মত্তের মতন বেষ্টন করে ব্যাকুল কণ্ঠে বল্লে—বাবা আমাকে বাঁচাও।

তৃষাদীর্ণ বুকটার মধ্যে তাকে সজোরে চেপে ধরলাম। হু হু করে কান্না ছুটে এল। বল্লাম এ মাঝরাতে কোত্থেকে রতন? কি করে চিনলি আমার ঘর? এতদিন কোথায় ছিলি বাবা?

পাগলের মতো রতন বল্লে—আমার বেশী কথা বলবার সময় নেই বাবা, আমাকে বাঁচাও।

—বাঁচাব? কেন কি হয়েছে?

রতন কাতরকণ্ঠে বলতে লাগল—আমি চুরি করে এসেছি বাবা, এই দেখ মোহরের থলিটা! পুলিশ আমাকে তাড়া করেছে। আমি পালিয়ে এসেছি। কিন্তু ওরা এক্ষুনি এখানে এসে পড়বে।

আমি একবার চমকে উঠেই সামলে নিলাম। বললাম—তার জন্যে তুই কিচ্ছু ভয় করিসনি রতন। দে আমার হাতে মোহরের থলিটা; যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ আমার কাছ থেকে কেউ তোকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

অশ্রু গদ্‌গদ্ কণ্ঠে রতন ডাকলে—বাবা!

বললাম—বোস্ বাবা এইখানে আমার বুক ঘেঁষে। তোদের দুঃখের কাহিনী

আমাকে বলে শোনা। আমার আশা কত নির্য্যাতন কত যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে না জানি আর এ পৃথিবীর নিশ্বাস নিতে পারলে না। তাকে একটিবার দেখতে পেলাম না। তবু তোকে পেলাম একটি রাতের জন্যে। তোকেও এ পৃথিবী বাঁচতে দিতে চাচ্ছে না। তোকেও মারছে?

অস্থির হয়ে রতন ডাকলে—বাবা! আমাকে যে জেলে যেতে হবে···

বললাম—কারুর সাধ্য নেই তোকে জেলে টেনে নিতে পারে। আমি আছি, আমি তোকে সত্যই রক্ষা করব। বলব, আমার ছেলে চুরি করেনি, চুরি করেছি আমি। আমি জেল ফেরৎ কয়েদী, আমি দাগী চোর, পুলিশ তোর কেশ স্পর্শও করবে না। তুই বোস্, কিচ্ছু তোর ভয় নেই। থাক্ এই থলি আমার হাতে; পুলিশ বিশ্বাস করবে।

রতন কাতরকণ্ঠে অভিযোগ করে উঠল—না বাবা সে কিছুতেই হতে পারে না।

তার মাথায় হাত রেখে তার দীর্ঘ চুলগুলিতে আঙুল বুলোতে বুলোতে বললাম—খুব হতে পারে বাবা। এই হয়। আমাকে অন্ধকূপ আবার ডাকছে, সেখানে আমি তোর মা—আশাকে ফেলে এসেছি রতন। তার দুই শিকল-বাহু আমার আলিঙ্গনের আশায় উৎসুক ব্যগ্রতায় আমাকে ডাকছে। আমিই আবার ফিরে যেতে চাই সেখানে।

রতন আমার কাঁধে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল—বাবা!

—তা ছাড়া রতন, আমার ঘর এখন সেই অন্ধকূপ। এখান থেকে ছুটি পেলেও আবার সেখানে যেতে হবে। তোর কাজ নেই সেখানে গিয়ে। আর একবার চেষ্টা কর, ঐ তারাভরা রাত্রির সুনিবিড় আকাশ, এই সুন্দর পৃথিবী—তাকে ভালবাসতে শেখ্। পারবি রতন?

রতন আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—ঐ পুলিশ আসছে বাবা। আলো দেখা যাচ্ছে। ঐ পাগ্ড়ী।

তাকে বুকে আরো জোরে চেপে বললাম—আসুক ওরা, কিন্তু ওরা কেউ তোকে নিতে পারবে না। কিছু ভয় নেই তোর, আমি তোকে রক্ষা করব।

তখন গভীর রাত্রির রন্ধ্রহীন সূচীভেদ্য অন্ধকার অসহ্য ভারের মতো ধরণীর নিশ্বাস চেপে ধরছে।

শীতের নিশ্বাস

একটি আসন্ন-যৌবনা শ্যামা কৃশতনু কিশোরীর মত সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নেমে এল মাটির বুকে।

পালঙ্কের ওপর একটি রোগা ম্লান মেয়ে একমুঠো বাসি ফুলের মত লুটিয়ে পড়েছিল, তার শিয়রে বসে সেবা করছিল—একটি কৃশ ম্লান ছেলে।

আকাশে দু-একটি ক'রে তারা ফুটে উঠছে।

ছেলেটি বললে, 'আলোটা জ্বালিয়ে দিই ?'

মেয়েটি করুণ সুরে বললে, 'না চাইনে আলো। তুমি উঠো না।—উনি কোথায় ?'

'বেড়াতে পাঠিয়েছি জোর ক'রে। খালি ভাবে, আর মুখ ভার ক'রে পড়ে থাকে।'

'হাঁ বেশ করেছ। বালিশটা থেকে মাথাটা তোমার কোলের ওপর টেনে নাও না একটু।—একটু নাও।'

ছেলেটি ধীরে-ধীরে মেয়েটির রুক্ষ শুকনো চুলগুলি, সিঁথির দুই পাশে একটু গুছিয়ে দিলে। আস্তে-আস্তে বালিশটা থেকে মাথাটি কোলের ওপর তুলে নিয়ে কপালে আলগোছে আঙুলগুলি বুলিয়ে দিতে লাগল।

অন্ধকারে চোখ দুটি একটু তুলে মেয়েটি বললে, 'আমি জানতাম তুমি আসবেই। তুমি না এসে পার না।—তোমাকে না দেখে আমি মরতে পারছিলাম না। আমার হাতটা একটু ধর।'

মেয়েটির শুকনো একখানি হাত ছেলেটি আস্তে স্পর্শ করলে।

মেয়েটি বললে, 'তোমাকে আজ কি যে বলব ভেবে পাচ্ছি না! কত কথা যে বলতে ইচ্ছা হয়, পারি না! সেদিনও পারি নি, আজও পারব না।'

ছেলেটি বললে, 'চুপ ক'রে লক্ষ্মীটির মতো ঘুমোও। বেশী বকলে যে বুক-ব্যথা ক'রে উঠবে আমার।'

'হাঁ ভারী ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে, কিন্তু তোমার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে। ভারী মিষ্টি লাগছে তোমার আঙুলগুলি!—আজ আমাকে একটু কথা বলতে দাও। তুমি আরেক বার না বললে হয়ত তোমার কথার অবাধ্য হতে ইচ্ছা করবে না। কিন্তু আমি ত চলেই যাচ্ছি। গোপনে একটি কথা না হয় আজ বলেই যাই। শুনবে না ?'—

'শুনব, কিন্তু—'

'কটা বেজেছে বলতে পার?'

'সাতটা বাজে।'

'আজকের দিনটি ভারী সুন্দর লাগছে! তুমি এ ক'বছর কোথায় ছিলে, কি করছিলে? ভারী জানতে ইচ্ছা করে।'

'ঘরছাড়া হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।'

মেয়েটি ফিকা একটু হাসতে চেষ্টা করলে, পারলে না। বললে, 'লোকে তোমার কথা শুনে হাসবে, টিটকিরি দেবে।—বলবে সামান্য একটা মেয়ের জন্য এমন ভাবে কেউ অনাবশ্যক দিন খোয়ায়!—ভুয়ো দুর্বলতাকে সম্বল করে? আমি যদি ছেলে হতাম, আর কোনো একটা মেয়ে অহঙ্কারে আমাকে আঘাত করত, আমি কি করতাম জান?'—

মেয়েটির সরু একটি আঙুলে কয়েকটি চুল ছেলেটি জড়াতে লাগল, আস্তে আস্তে।

মেয়েটি বললে, 'আমি প্রতিশোধ নিতাম। আমার জীবনকে এত কম মূল্য দিতাম না কখনো। একটা সামান্য অহঙ্কারী মেয়ের স্পর্ধার কাছে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে কোন দিন পূজো করতাম না তাকে।'

'মায়া!'

'আমাকে ডাকছ? কথাগুলি বলতে পারলাম না স্পষ্ট ক'রে। আমাকে ক্ষমা কর।'

'তুমি ত জান, তুমি আমার সমস্ত কিছুর বাইরে। তোমাকে কিছু দিয়েই ত আর নাগাল পেতে চাইনে। তবে কেন ক্ষমার কথা বলছ? তোমাকে দেখতে আসবার প্রয়োজন কিছু ছিল কিনা জানি না। ভারী দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।'

'না, প্রয়োজন ছিল বৈ কি। নইলে আজকের চোখের কোণে যে শেষ জলটুকু জমে উঠছে তা আর কে মুছিয়ে দিত? আজকে আর নিষ্ঠুর হয়ো না। দাও মুছিয়ে চোখের জল।'

মেয়েটির চোখের পাতা দুটি ছেলেটি একবার মুছে দিলে।

মেয়েটি বললে, 'তোমার হাতের মুঠির মধ্যে আমার দুর্বল কৃশ হাতটি অনুভব করতে পারছি। এই ত আমি, নারী। সেদিনও হয়ত এমনি হাতখানি ধরে-ছিলে, আমি ছিনিয়ে নিয়েছিলাম!—মনে আছে?'

'সে সব কথা ভুলে যাও।'

'না, আমি কিছু ভুলি নি। দেখ ঐ বাক্সটার মধ্যে আমার একটা ডায়রী খাতা আছে। ওটা আমি তোমাকে দিলাম, তোমার কাছে রেখে দিও।

'কিছু দরকার ছিল কি তার ?—

'না-ও থাকতে পারে। যদি দরকারী না বোঝ, তবে পুড়িয়ে ফেলো। তোমাকে না পেলে ওঁকে হয়ত তোমার নাম করেই বলে যেতাম, তোমাকে দিয়ে দিতে। তা তিনি খুঁজে পেতে যেমন ক'রে হোক তোমাকে বা'র করতেনই। কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না।' পরে একটু থেমে বললে, 'আচ্ছা একটা কাজ করলে কেমন হয় ? খাতাটা আমার সামনে পুড়িয়ে ফেলো। আমি এমনি শুয়ে শুয়ে দেখি।'

ছেলেটি ব্যাগ্র কণ্ঠে বললে, 'তুমি এবার সত্যিই চুপ কর মায়া।'

'তোমাকে আজ পেলাম! এ জানি কি রকম পাওয়া ঠিক বুঝতে পারছি না! এই উনিশ বছরের জীবন! তোমাকে দিলাম আঘাত, তাঁকে দিলাম আনন্দ। আনন্দ না দিলে সেই আঘাতের জ্বালা সইতে পারে না কেউ, তুমি জান। না, মনে হচ্ছে তোমাদের দুজনকেই আমি ঠকিয়েছি। তোমাদের কাছে আমি ঋণী। মধুময় মৃত্যু দিয়ে এ ঋণ শোধ করতে চাই।'

ছেলেটি বললে, 'দরজাটা খুলে দিই গে। শেখর এসেছে।—যাই ?'

মেয়েটি বললে, 'যাও।'

বালিশের ওপর আস্তে-আস্তে মাথাটি রেখে ছেলেটি চলে গেল।

*　　　　*

প্রায় বারোটা রাত হবে। শেখর তার স্ত্রীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বললে, 'ওষুধটা খেয়ে ফেল মায়া!'

মায়া চোখ তুলে একটি বার চাইলে। বললে, 'না ওষুধ আর খাব না। ভারী তেতো। তার চেয়ে আমাকে একটা—' ভারী খুশী হব।'

শেখর বললে, 'লক্ষ্মী আমার, মাণিক আমার, খাও।'

'না আমি খাব না। ডাক্তারগুলো মাথামুণ্ড কিছু বোঝে না। এমন সময় আবার ওষুধ খায় ?—কি, রাগ করলে ? দাও তবে।'—

জানলা দিয়ে কয়েকটা তারা দেখা যাচ্ছিল।

মায়া বললে, 'আজ সাতই শ্রাবণ, না ? একুশে অঘ্রাণ আমাদের বিয়ে হয়েছিল ঠিক এমনি মাঝ রাতে। কোনো আদল নেই, সে ছিল শীত আর এ বর্ষা, তবুও আজকের দিনটি ভারী চেনাচেনা লাগছে! মনে হচ্ছে কি যেন আজ পেলাম আবার। আজ চলে যাচ্ছি কিনা একেবারে, হয়ত তাই।'

শেখর বললে, 'একটু ঘুমোও।'

'এ পৃথিবী আর দেখতে পাব না। কোথায় যেন চলেছি সেই আনন্দে বুক ভরে আছে। আচ্ছা, আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে?'

'তুমি এমন কথা বোলো না মায়া!'

'হাঁ কাঁদবে আমি জানি। দেখ, যেদিন আমাদের বিয়ে হয়, সেদিন কত আলো জলেছিল, কত সানাই বেজেছিল। মনে আছে? আমি সেদিন একটু কেঁদেছিলাম। কেঁদেছিলাম এই জন্য যে আজ আমরা পরম আনন্দে মিলতে যাচ্ছি, আর এই রাত্রেই কোথায় হয়ত কোন এক বিরহী, চোখের জলে অন্ধকার ধুয়ে দিতে চাচ্ছে! আজ সবাইকে ফেলে যাচ্ছি ভেবেও কিন্তু কাঁদতে ইচ্ছে করে না! মনে হচ্ছে কে যেন কোথায় আবার—'

'হাওয়া করি, তুমি ঘুমোও লক্ষীটি।'

মায়া বললে, 'সুন্দর ক'রে কপালে তোমার আঙ্গুলগুলি বুলিয়ে দাও। আচ্ছা, তোমার বন্ধুটি কোথায়? তাকে কোথায় পেলে?'

'পথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কি বিশ্রী যে চেহারা হয়ে গেছে! ভারী দুঃখী। বিছানা ক'রে দিয়েছি নীচে ঘুমুতে। অনেকক্ষণ তোমার কাছে বসেছিল, না? গিয়ে দেখলুম চেয়ারে চুপ করে বসে আছে। বললুম—ঘুমুবে না? বললে—ঘুম আসছে না!—ভারী দাগা পেয়েছে জীবনে।'

'দাগা? কিসের?' মায়ার বুকের পাঁজরাগুলি একবার কেঁপে উঠল।

শেখর বললে, 'একটি মেয়েকে ভারী ভালোবেসেছিল, মেয়েটি ওকে—'

'ছি ছি ছি! তার জন্যে এমন করে সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে হয় এত বড় কর্মের সংসারে? আমি যদি ছেলে হতাম তবে যে এমন করে প্রেমের অবমাননা করে তার টুঁটি টিপে।—'

মায়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে। পরে ম্লান কণ্ঠে ফের বললে, 'কিন্তু জান কি, মেয়েরা বন্ধনের আঘাত পেয়ে পেয়ে এত কঠিন হয়ে পড়ে যে তারাও আঘাত দিতে চায়। তুমি আমার কথা শুনছ না, না?'

'শুনছি। কিন্তু তুমি ঘুমোও।'

'ঘুমোব। কিন্তু বল, আমি মরে গেলে তুমি ফের বিয়ে করবে।'

'মায়া!'

শেখর মায়ার মুখ চেপে ধরলে।

মেয়েটি বললে, 'বেশ! আমি তোমাকে কতটুকু দিয়ে যেতে পারলাম যে তুমি তা নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে? একটা কাল্পনিক আদর্শ খাড়া

ক'রে নিজেকে ফাঁকী দিও না। আবার বিয়ে করো। আমি যেমন তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, মেয়েটিও তোমায় তেমনি ভালোবাসবে কিম্বা তার চেয়েও বেশী।'

'তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না!'

'বাঁচবে। সবাই বাঁচে। তোমার বন্ধুও বেঁচে আছে।'

'কিন্তু তার প্রিয়া ত নিঃশেষে মুছে যায় নি পৃথিবী থেকে। সে এই পৃথিবীতে আছে এই আকাশের তলে, তাই এ পৃথিবী তার কাছে এত মিষ্টি!'

মায়া তার শীর্ণ বাহু দুটি দিয়ে স্বামীকে বেষ্টন করে বললে, 'তার প্রিয়া হয়ত এমনি রাতে তার স্বামীকে বুকের মাঝে বন্দী ক'রে ঘুমুচ্ছে, না? এমনি করে থাকি শুয়ে কেমন? তুমিও আমাকে জড়িয়ে ধর। আলোটা হাওয়াতেই নিবে যাবে, থাক, খোলা জানলাটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে! বৃষ্টি আসবে হয়ত!—'

———